Contents

زاد المعاد

যাদুল মা'আদ

[পরকালের সম্বল]

মূল

হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম আল-যাওযী (র)

তাখরীজ

শাইখ আব্দুল কাদের ইরফান (বইরুত)

বঙ্গানুবাদ

হাফেয মুফতি মোবারক সালমান

زاد المعاد

যাদুল মা'আদ

[পরকালের সম্বল]

মূল
ইমাম ও মুহাদ্দিস ফকীহ শামসুদ্দিন আবু-আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু
আবী বাকার আযযারঈ আদদিমাশকী
হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম আল-যাওযী (র)

তাখরীজ
শাইখ আব্দুল কাদের ইরফান (বইরুত)

বঙ্গানুবাদ
হাফেয মুফতি মোবারক সালমান
এম.এম. (হাদীস- মুমতায) স্টার মার্কস
ইফতা, ইসলামিক ল (ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট)
সাবেক লেকচারার, জামেয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ (র)
ডিপার্টমেন্ট অব মর্ডান এ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড রেটরিক, ঢাকা
শিক্ষাসচিব, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা।

www.waytojannah.com

যাদুল মা'আদ

মূল: হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম আল-যাওযী (র)

অনুবাদক: হাফেয মুফতি মোবারক সালমান

প্রকাশক
শাইখ আবুল কাশেম মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান জিলানী
৩৯৬ নং গ্রীন লেইন, লন্ডন, ইউ.কে

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০১২ ঈসায়ী

গ্রন্থস্বত্ব
অনুবাদক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অক্ষর বিন্যাস
পিংকে কম্পিউটার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
আলমোবারক প্রিন্টার্স
প্যারিদাস রোড, ঢাকা

বিনিময়: ৪৫০.০০ (চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।)

Published by **Shake Abul Kashem Muhammad Zillur Rahman Zilany**, 396 Green Lane, London, UK. Translated by: **Hafiz Mufti Mubrak Salman**, Dhaka, Bangladesh. Published: October 2012, Price: 450/-

www.waytojannah.com

بسم الله الرحمن الرحيم

তাখরীজকারকের কথা

প্রশংসা জগৎসমূহের একমাত্র প্রতিপালক মহান রব্বুল 'আলামীনের জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টির সেরা মানব আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ি কিরাম এবং সকলের উপর।

ইমাম হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (র)-এর রচিত অনবদ্য গ্রন্থ "যাদুল মা'আদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ"-এর তাহক্বীক্ব ও তাখরীজের কাজ সমাধা করেছি।

পাঠকবৃন্দের নিকট আমার আকুল আবেদন, এ পুস্তকে যত প্রকার ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে তার সবই আমার পক্ষ থেকে হয়েছে। সেইসাথে পুস্তকের সকল পূর্ণতা আর বৈশিষ্ট্যাবলীর যা কিছু পরিলক্ষিত হবে সবই হয়েছে মহান রব্বুল 'আলামীনের তাওফীকে।

মহামহীম আল্লাহর নিকট আমার প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন আমার এ সামান্য খিদমাতটুকু কবুল করেন এবং আমার সকল পদস্খলন ও গুনাহসমূহকে ক্ষমা করেন– আমীন।

বিনীত
শাইখ আব্দুল কাদের ইরফান
বইরুত।

www.waytojannah.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবজাতিকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন কেবল তাঁরই ইবাদাত করার জন্য। ইসলামে ইবাদাত বলতে সীমিত কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠান পালন করা বুঝায় না। এমন না যে, প্রত্যহ পাঁচবার সালাত আদায় করলাম, বছরান্তে একমাস সাওম পালন করলাম, সামর্থ্যবান হলে জাকাত দিলাম, হাজ্জ করলাম– ব্যস, কর্তব্য শেষ। এই একটি বিষয়েই ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে বড় পার্থক্য যে, অন্যান্য ধর্ম সীমিত কয়েকটি নীতিবাক্য বা আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। সেখানে পূর্ণাঙ্গ মানবজীবনের গাইড লাইন নেই। কিন্তু ইসলাম শাশ্বত চিরায়ত ধর্ম। একজন, দু'জন একটি গোত্র কিংবা একটি দেশ-মহাদেশ নয়– একই সঙ্গে ধর্ম-বর্ণ, সমাজ-জাতি নির্বিশেষে সারা বিশ্বের জন্য পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত, সুনিয়ন্ত্রিত ও নির্মল একটি গাইড লাইন– জীবনব্যবস্থা হল ইসলাম। লাখো নাবী-রাসূল যুগে যুগে এসেছেন ধরাধামে, শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ ছিল। যে যুগে নাবী ছিল না সে যুগ ছিল অন্ধকার।

ইসলাম নামক মহা সূর্যবিহীন এক যুগ যাকে 'আইয়াম আল-জাহিলিয়্যাহ' বলা হয়। এটি এমন এক যুগ ছিল যেখানে সর্বপ্রকার অন্যায়-অবিচার হানাহানি-মারামারিসহ যাবতীয় অনিয়মই যেন তখন নিয়মে পরিণত হয়েছিল। এরূপ তমসাচ্ছন্ন যুগে আগমন ঘটেছিল সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হিদায়াতের আলোক দ্যুতির। যাঁর জ্যোতিচ্ছটা কিয়ামত অবধি তিমির পথের আলোকবর্তিকা হয়ে রয়েছে। তিনি হলেন সাইয়্যিদুল আম্বিয়া মহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এ মহামানব মাত্র তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে শান্তি, সৌহার্দ্য, সাম্য ও সম্প্রীতির এক বিশাল দৃষ্টান্ত হাতে কলমে সমাজে রেখে গেছেন, তা-ই গোটা বিশ্বের একমাত্র শান্তির কলকাঠি হয়ে রয়েছে। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক তৎপরবর্তীকালে খুলাফায়ি রাশিদিন খিলাফাত নামে যে শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তোলেন তা সর্বযুগে সাম্য ও ন্যায় শাসনের দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। কারণ এ খেলাফাত ওই মহামানবেরই অবিকল অনুসরণ কিছুই ছিল না। এ মহামানবের দিক-নির্দেশনগুলো আমাদের মাঝে রয়েছে আল-হাদিস তথা হাদিসু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামে। রাসূলল্লাহর হাদিস যে ব্যক্তি, যে সমাজ, দল, সমাজ, দেশ ও জাতি স্বীয় জীবন-ব্যবস্থায় মান্য করে চলেছে সে-ই উন্নতির চরম শিখরে পৌছেছে। আখিরাতেও সুনিশ্চিতভাবে এরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের জন্য মহাসম্মানের অঙ্গীকার রয়েছে; যদি সে বা তারা মুসলিম হয়। কাজেই ইহ-পারলৌকিক জীবনে শান্তি ও মুক্তির জন্য আমাদের জীবনে হাদিসের বিকল্প নেই। আরেকটু পরিষ্কার করে বলতে পারি যে, বিশুদ্ধ হাদিসের বিকল্প নেই। কারণ, বিশুদ্ধ হাদিস যেমন জীবনকে বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ করে তোলে, ইসলাম-বিদ্বেষীদের দ্বারা রচিত ও প্রচারিত নামধারী অশুদ্ধ হাদিস যা আল-হাদিস নামে প্রচারিত প্রসারিত– তা জীবনকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে টেনে নিয়ে যেতে পারে অনায়াসেই। কারণ, সেগুলো হাদিসের নাম নিয়ে বসে থাকলেও তা প্রকৃত হাদিস নয়।

www.waytojannah.com

Contents

মানবসমাজ বিশেষত বাঙলাভাষী মুসলিমসমাজ যেন বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের আলোকে জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হয় সে লক্ষ্যে আমরা জগদ্বিখ্যাত হাদিসবিজ্ঞানী আল্লামা হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ-এর বিশ্বখ্যাত "যাদুল মা'আদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ" গ্রন্থের অনুবাদ করার ন্যায় কঠিন কাজে উদ্যত হই। মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে তা সম্পূর্ণ করারও তওফিক লাভ হয়েছে। এ গ্রন্থটি অনেক বড়। কাজেই যে-অধ্যায়গুলো অতীব জরুরি বলে আমরা মনে করেছি সেগলোর স্বচ্ছ অনুবাদসহ তাখরিজ করেছি। অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে হাদিসের সানাদ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ও যেন পাঠকের অবগতিতে এসে যায়।

অনুবাদ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতার দিকটি খেয়াল রেখেছি। তথাপি ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া একান্তই স্বাভাবিক। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা, আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো আমাদের গোচরে আনুন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে– ইনশাআল্লাহ। এতে আপনিও অশেষ সাওয়াবের অংশীদারী হবেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সহীহ হাদীস মোতাবেক জীবন গড়ার তাওফিক দিন– আমীন।

বিনীত

অনুবাদক

www.waytojannah.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	১৩
কিয়ামাত দিবসে প্রশ্নোত্তর	১৩
মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্রত	১৩
মু'মিনদের পুরস্কার	১৪
মু'মিনের মাহাত্ম্য	১৪
মু'মিনের চলার রাজপথ	১৫
সৃষ্টির রকমভেদ	১৫
সৎ ও অসতের পরিচয়	১৫
কুরআনের সাক্ষ্য	১৬
দু'দলের পরিণতি	১৭
দুনিয়ায় সহ-অবস্থান	১৭
বিচার দিবসে সাধু ও অসাধুর পৃথকীকরণ	১৭
সন্দেহ নিরসন ও সত্য উদ্ঘাটন	১৮
দু'দলের সনাক্তকরণ	১৮
হতভাগার দল	১৮
মুশরিকদের পরিণতি	১৯
নাবী ﷺ-এর আদর্শ কেন আবশ্যক	১৯
আল্লাহর সৃষ্টি নির্বাচন	২০
মক্কার ফাযাইল এবং বৈশিষ্ট্য	২২
উক্ত মাসআলায় ফেকাহবিদদের তিনটি উক্তি	২৪
যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখের ফযীলত	২৮
বৃদরের ও মি'রাজ রজনীর মধ্যকার শ্রেষ্ঠত্বে প্রতিযোগিতা	২৯
হাজ্জুল আকবারের ফাযীলাত	৩১
যেসব আ'মাল ইত্যাদিকে আল্লাহ নির্বাচন করেছেন	৩৪
রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশানুক্রম	৩৭
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশতালিকা	৩৮
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিপালন এবং তাঁর মাতা-পিতা ও পিতামহের মৃত্যু	৪০
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাৎনা	৪৩
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুধ-মাতাগণ	৪৪
রাসূল ﷺ-এর তত্ত্বাবধায়কগণ	৪৪
প্রথম ওয়াহী	৪৫
ওয়াহীর প্রকারভেদ	৪৭
দাওয়াতের শ্রেণিবিন্যাস	৪৯
রাসূল ﷺ-এর নাম প্রসঙ্গ	৪৯
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামসমূহের অর্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ	৫০
প্রথম ও দ্বিতীয় হিযরাতের আলোচনা	৫৫
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তানাদি	৫৮
রাসূল ﷺ-এর চাচা ও ফুফুগণ	৫৯
রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীগণ	৫৯
রাসূল ﷺ-এর উপপত্নীগণ	৬৪
রাসূল ﷺ-এর দাস-দাসীগণ	৬৪
রাসূল ﷺ-এর খাদিমগণ	৬৪
রাসূল ﷺ-এর লেখক/কাতিবগণ	৬৫
শরীয়ত সম্পর্কিত যেসব চিঠিপত্র তিনি মুসলমানদের নিকট প্রেরণ করেছেন	৬৫
বিভিন্ন বাদশাহদের উদ্দেশ রাসূল ﷺ-এর চিঠি ও দূত প্রেরণ	৬৫
রাসূল ﷺ-এর কবি ও বক্তাগণ	৬৮
যে সেব বীর বাহাদুরগণ সফরে সর্বদা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে থাকতেন	৬৮
রাসূল ﷺ-এর গাযওয়া, সারিয়া এবং প্রতিনিধিদল প্রসঙ্গে	৬৯
রাসূল ﷺ-এর অস্ত্রশস্ত্র এবং ঘরের আসবাবপত্র	৬৯
রাসূল ﷺ-এর আরোহণের ও বাহনের পশুসমূহ	৭১
রাসূল ﷺ-এর পোশাক ও জামা কাপড়	৭২
রাসূল ﷺ-এর পায়জামা	৭৪
ঘুমানো এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার রাসূল ﷺ-এর জীবন পদ্ধতি ও দিকনির্দেশনা	৭৮
লেনদেন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকনির্দেশনা	৮১
রাসূল ﷺ-এর একাকী এবং সাহাবাদের সঙ্গে পথ চলার বিবরণ	৮১
স্বভাবজাত এবং ততসম্পর্কিত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পথনির্দেশ	৮৩
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বচনভঙ্গি নীরবতা এবং হাসি কান্নার বর্ণনা	৮৪
রাসূলল্লাহ ﷺ-এর খুতবার বিবরণ	৮৬
নামাজ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকনির্দেশনা	৮৯
রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে ওযূ করতেন?	৯৩
রাসূলুল্লাহ ﷺ মোজার উপর মাসেহ করতেন	৯৬
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাইয়াম্মুম করার তরীকা	৯৬
তাকবীরে তাহরীমাহ	৯৭
তাকবীরে তাহরীমার বলার সময় 'রফে ইয়াদাইন' করা	৯৮

www.waytojannah.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
তাকবীরে তাহরীমার পর কী পড়তেন	৯৮
সূরা ফাতিহা পড়া	১০০
আমীন উচ্চারণ	১০০
কিছুক্ষণ নীরব থাকা	১০১
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিরাত পড়ার পদ্ধতি	১০২
বিভিন্ন নামাজে তাঁর কিরাত	১০২
তাঁর রুকূ করার পদ্ধতি	১০৬
তিনি যেভাবে রুকূতে দাঁড়াতেন	১০৮
রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে কী বলতেন	১০৯
তাঁর সাজদায় যাবার পদ্ধতি	১১০
হাত আগে না হাঁটু আগে	১১১
তিনি কিসের উপর সাজদা করতেন?	১১৫
তিনি কিভাবে সাজদা করতেন?	১১৫
তিনি সাজদায় কী বলতেন?	১১৬
সাজদার বিরাট মর্যাদা	১৮৮
তিনি সাজদায় কতক্ষণ থাকতেন?	১১৮
তাঁর সাজদা থেকে উঠে বসা	১১৯
দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে যে দু'আ পড়তেন	১২০
দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠক লম্বা করা	১২০
দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে দাঁড়ানো	১২০
দ্বিতীয় রাকাত কিভাবে আদায় করতেন	১২০
প্রথম তাশাহ্হুদের বৈঠক ও প্রাসঙ্গিক কর্মপদ্ধতি	১২১
প্রথম তাশাহ্হুদে কী পড়তেন	১২৩
প্রথম তাশাহ্হুদের বৈঠক থেকে দাঁড়ানো	১২৪
তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে কী পড়তেন?	১২৫
নামাজে তাঁর রীতি এবং কোন সময়ে এর ব্যতিক্রম	১২৫
প্রথম দুই রাকাত এবং প্রথম রাকাত লম্বা করা প্রসঙ্গ	১২৯
শেষ তাশাহ্হুদের বৈঠক	১২৭
আঙ্গুল কিবলামুখী রাখতেন	১২৯
প্রত্যেক বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়তেন	১২৯
রাসূলুল্লাহর প্রতি সালাত (দরূদ)	১২৯
তিনি নামাজের ভিতর সাত জায়গায় দু'আ করতেন	১৩০
সালাম ফিরানোর পূর্বে রাসূলুল্লাহর বিভিন্ন দু'আ	১৩১
ইমাম একবচনে নাকি বহুবচনে দু'আ করবে	১৩৪
রাসূল ﷺ-এর সালাম ফিরানো পদ্ধতি	১৩৫
সালামের পরে মুক্তাদিদের নিয়ে মুনাজাত (দু'আ) করা প্রসঙ্গ	১৩৬
জুতা পরে এবং এক কাপড়ে নামাজ পড়া	১৩৮
নামাজে তাঁর আনন্দ, প্রশান্তি, বিনয় ও কান্না	১৩৮
নামাজে রাসূল ﷺ-এর সতর্কতা	১৩৯
ফরয নামাজে দু'আ কুনূত (তথা কুনূতে নাযিলা)	১৪১
সাহ্ সাজদা (ভুলের সাজদা)	১৪৩
সন্দেহের সাজদা	১৪৫
নামাজে চোখ বন্ধ করা	১৪৬
সুতরা বা আড়াল দেয়া	১৪৬
সুতরা না থাকলে কি নামাজ ভেঙে যাবে	১৪৭
সালাম ফিরানোর পর রাসূল ﷺ কী করতেন কী পড়তেন	১৪৭
নামাজ শেষে যেসব যিকর ও দু'আ পড়তেন	১৪৮
নামাজ শেষে ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা	১৫০
নামাজ শেষে সাক্ষ্য (শাহাদাত) প্রদান	১৫০
নামাজ শেষে তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর বলা	১৫১
নামাজের পরে পড়ার জন্য সাহাবাগণকে যা শিখিয়েছেন	১৫১
রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরজের আগে-পরে যেসব নামাজ পড়তেন	**১৫৪**
ফরজের আগে-পরে তিনি কয় রাকাত পড়তেন	১৫৪
যুহরের আগে চার রাকাত, না দুই রাকাত?	১৫৫
আসরের পূর্বে কি তিনি কোন নামাজ পড়তেন	১৫৬
মাগরিবের আগে কি কোনো নামাজ আছে	১৫৬
সুন্নত নামাজ ঘরে পড়া সুন্নত	১৫৭
সফরের নামাজ	**১৫৮**
সফরে রাসূল (ফরজ) নামাজ দু'রাকাত করে পড়তেন	১৫৮
রসূল ﷺ সফরে সুন্নত পড়তেন না	১৬০
তিনি যানবাহনে নামাজ পড়েছেন	১৬১
তিনি দুই ওয়াক্ত একত্রে পড়েছেন	১৬২
নামাজ কসর ও একত্র করার জন্যে সফরের দূরত্ব	১৬৩
শত্রুভীতিকালীন নামাজ	১৬৩
জুমু'আর নামাজ	**১৬৬**
জুমার নামাজ কিভাবে শুরু হলো	১৬৬
জুমার দিনের মর্যাদা	১৬৭
দুআ কবুলের এক পরম মুহূর্ত	১৬৮
জুমার দিনের উত্তম বৈশিষ্টসমূহ	১৬৯
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুমার নামাজ	১৭২
রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক জুমায় খুতবার (ভাষণের) অনুষ্ঠান	১৭২
তিনি খুতবায় কী বলতেন	১৭৪
জুমার সুন্নত নামাজ	১৭৫

www.waytojannah.com

বিষয় পৃষ্ঠা

কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ নামাজ ১৭৮
তাহাজ্জুদ কি রাসূল ﷺ-এর জন্য ফরয ছিল ১৭৮
তিনি তাহাজ্জুদ কত রাকাত পড়তেন ১৭৯
রাসূল ﷺ রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ) কখন পড়তেন ১৮০
তাহাজ্জুদের সময় এবং তাহাজ্জুদ নামাজে কী পড়তেন ১৮০
বিতির নামাজ ১৮৫
তিনি বিতির তাহাজ্জুদের সাথে পড়তেন ১৮৫
কখন কিভবে পড়তেন ১৮৭
বিতিরে দু'আয়ে কুনুত ১৮৭
বিতিরের পরে দু' রাকাত ১৮৮
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনিয়মিত নফল নামাজসমূহ ১৮৯
সালাতুদ্দোহা (চাশ্‌তের নামাজ) ১৮৯
শোকরানার সাজদা ১৯০
তিলাওয়াতের সাজদাহ ১৯২
ইসতিসকা ও সূর্যগ্রহণের নামাজ ১৯৩
সালাতুল ইসতিসকা ১৯৩
কসূফ তথা সূর্যগ্রহণের নামাজ ১৯৫
দুই ঈদের নামাজ ১৯৮
ঈদের নামাজ মাঠে আদায় করতেন ১৯৮
ঈদের দিন কী করতেন ১৯৮
ঈদের নামাজ কিভাবে পড়তেন ১৯৯
তিনি নামাজের পরে খুতবা দিতেন ২০০
ঈদগাহে যাওয়া-আসার পথ পরিবর্তন করতেন ২০০
জানাজার নামাজ ২০১
মাইয়্যেতের সঙ্গে সর্বোত্তম আচরণ ২০১
মাইয়্যেতের গোসল ও কাফন ২০২
মৃতব্যক্তিকে চুমু দেয়া ২০২
শহীদদের গোসল ও জানাজা দিতে হবেনা ২০২
জানাজার পূর্বে ঋণ আদায় ২০২
তিনি কিভাবে নামাজে জানাজা পড়াতেন ২০৩
জানাজা নামাজে তাকবীর কয়টি ২০৫
জানাজার নামাজে কয়টি সালাম ২০৫
জানাজার নামাজে রফে ইয়াদাইন ২০৬
তিনি কবরে জানাজা পড়েছেন ২০৬
শিশুর জানাজা ২০৬
আত্মহত্যাকারী, প্রতারক ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির জানাজা ২০৬
কফিনের সহগামী হওয়া ২০৭
গায়েবানা জানাজা ২০৭
দাফন ও কবর সংক্রান্ত অন্যান্য প্রসঙ্গ ২০৮
সাদাকাহ এবং যাকাত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকনির্দেশনা ২১০
যাকাতের খাতসমূহ ২১১
নফল দানের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা ২১২
রমযান সম্পর্কে তাঁর দিকনির্দেশনা ২১২
রমজান মাসে রাসূল ﷺ-এর ইবাদত প্রসঙ্গ ২১৩
রোযা ভাঙ্গার কারণসমূহ ২১৬
শনি এবং রবিবারের রোযা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা ২১৭
সারা বছর রোযা রাখা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা ২১৮
হজ্জ ও ওমরাহ পর্ব ২১৯
হজ্জ ও ওমরাহ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা ২১৯
উপর্যুক্ত উক্তিসমূহের আপত্তি উত্থাপন এবং তাদের ভুল ধ্যান-ধারণার উৎস বর্ণনা প্রসঙ্গ ২২১
আইয়ামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিনে তাঁর ভাষণ ২২২
আকীকা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা ২২৩
সন্তানের নাম রাখা এবং খৎনা করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকনির্দেশনা ২২৬
নাম ও উপনাম সম্পর্কে তাঁর দিকনির্দেশনা ২২৬
যুগকে গালি দেয়া নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে ২২৭
নতুন চাঁদ দেখার দু'আ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা ২২৮
আহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকনির্দেশনা ২২৯
সালাম দেয়া, অনুমতি প্রার্থনা করা এবং হাঁচিদাতার হাঁচির উত্তর দেয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকনির্দেশনা ২৩০
বিবাহের দু'আ সম্পর্কে তাঁর দিকনির্দেশনা ২৩২
কেউ তার পরিবার ও সম্পদে আশ্চর্যকর কিছু দেখলে কী বলবে ২৩৩
বিপন্ন ব্যক্তিকে দেখে যে দু'আ পড়তে হয় কেউ যদি ২৩৩
কারো সাথে অশুভ লক্ষণ দেখা দিলে সে কি পড়বে ২৩৪
কেউ স্বপ্নে খারাপ কিছু দেখলে কী বলবে ২৩৪
ওয়াসওয়াসাগ্রস্ত কী বলবে এবং কী করবে এবং কী দ্বারা ওয়াসওয়াসার উপর সাহায্য কামনা করবে ২৩৫
"আমি", "আমার" এবং "আমার কাছে" বলা প্রসঙ্গে ২৩৬

www.waytojannah.com

বিষয় পৃষ্ঠা

কুরাইশদের লেখা চুক্তি ও রাসূল ﷺ এবং মুসলিমদের শিয়াবে আবূ তালিব উপত্যকায় বন্দি জীবনযাপন ২৩৭
রাসূল ﷺ-এর তায়িফ গমন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান ২৩৮
রাসূল ﷺ-এর ইসরা প্রসঙ্গ.....২৩৯
বাইতুল মাকদিস সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর বর্ণনা.....২৪১
রাসূল ﷺ-এর মিরাজ দৈহিক না আত্মিক ২৪১
ইসরার সংখ্যা ২৪২
হিযরত প্রসঙ্গ.....২৪৩
সঙ্গীকে নিয়ে মদিনায় হিজরতের পূর্বে রাসূল ﷺ-কে হত্যার ব্যাপারে মক্কার মুশরিকদের সলাপরামর্শ.....২৪৬
রাসূল ﷺ-এর মাদিনার উদ্দেশে গমন ২৪৮
রাসূল ﷺ ও তাঁর সঙ্গীর মাদীনায় গমন.....২৪৯
মাসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গ ২৫০
আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ২৫১
আব্দুল্লাহ ইবনুস সালামের ইসলাম গ্রহণ ২৫১
জিহাদের প্রকারভেদ ২৫২
শয়তানের সঙ্গে জিহাদ প্রসঙ্গ ২৫২
মুনাফিক ও কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ প্রসঙ্গে.....২৫২
অত্যাচারী ও বিদ'আতীদের সঙ্গে জিহাদ প্রসঙ্গ.....২৫৩
শহীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে ২৫৩
জিহাদের অবশ্য কর্তব্যতা ২৫৮
পূর্ণতম মানব.....২৫৮
জিহাদের বাস্তব রূপ.....২৫৮
কুরআন দ্বারা জিহাদ
তলোয়ারের মাধ্যমে জিহাদ.....২৬১
গাযওয়ায়ে বাদ্‌র ২৬১
বাদ্‌র যুদ্ধের বিবরণ ২৬২
আবূ জাহ্‌লের সিদ্ধান্ত ২৬৩
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অগ্রযাত্রা: বাদ্‌র প্রান্তরে উপস্থিতি ২৬৪
প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ.....২৬৪
সময় মত বৃষ্টি: আল্লাহর গায়িবী সাহায্য ২৬৪
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছাউনী.....২৬৫
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রার্থনা ২৬৫
যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২৬৬
ক্ষুদ্র অভিযান ২৭৩
কুরাইশদের নবতর ষড়যন্ত্র ২৭৩
আর একটি মারাত্মক ষড়যন্ত্র ২৭৪
বানী কাইনুকার নির্বাসন.....২৭৬
উহুদের যুদ্ধ ২৭৭
আবূ সুফইয়ানের অভিযান.....২৭৭
সাহাবীদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরামর্শ.....২৭৭
অধিকাংশের রায় অনুসারে উহুদের দিকে যাত্রা শুরু ২৭৮
'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই-এর পশ্চাদপসরণ ২৭৮
যুদ্ধের ময়দানে.....২৭৮
নওজোয়ানদের জিহাদী জোশ.....২৭৯
বিপর্যয়ের সূচনা.....২৮০
আনাস ইবনু নাযারের বাহাদুরী ২৮১
মুসলিমদের স্বস্তিদায়ক সংবাদ ২৮১
উহুদ যুদ্ধে মহিলাদের বীরত্ব ২৮২
যুদ্ধ শেষে আবূ সুফইয়ানের চিৎকার ২৮২
'উমারের জওয়াব.....২৮২
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জখম ২৮৩
আনাস ও হুযাইফা (রা)-এর উদারতা ২৮৩
সা'দ ইবনু রাবী'র কথা ২৮৪
উহুদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের কারণ ২৮৪
বিপর্যয়ের ফল ২৮৫
মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গীর সংশোধন ২৮৫
অতীতের আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিদের আত্মবিসর্জন ২৮৬
হানযালা (রা)-এর শাহাদত ও মর্যাদা ২৮৭
'আম্‌র (রা)-এর শাহাদত-অভিলাষ.....২৮৭
এক মহিয়সী মহিলার ধৈর্য ও নাবী প্রেম.....২৮৮
আর একজন নাবী প্রেমিক মহিলা ২৮৮
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহ্বান.....২৮৯
উহুদ যুদ্ধের পর ২৮৯
চতুর্থ হিজরীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা.....২৯১
খুবাইব (রা)-এর অগ্নি পরীক্ষা ২৯১
মা'উনা কূপের হত্যাকাণ্ড.....২৯৪
বানী নাযীর গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান.....২৯৫
যাতুর রিকা.....২৯৮
দ্বিতীয় বাদ্‌র.....২৯৮
গাযওয়া-ই দূমাতুল জান্দল.....২৯৮
গাযওয়া-ই-মুরাইসী'আ ২৯৯
গাজওয়ায়ে আহযাব বা খন্দক যুদ্ধ ৩০০
যুদ্ধের কারণ.....৩০০
মুকাবেলার জন্য মুসলিমদের প্রস্তুতি.....৩০০
বানী কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতা ৩০০

www.waytojannah.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাদীনা অবরোধ	৩০১
আল্লাহ তা'আলার হস্তক্ষেপ	৩০২
নু'আঈমের কূটনৈতিক তৎপরতা	৩০২
গায়িবী সাহায্য ও বিজয়	৩০৪
বানী কুরাইযার সন্ধিভঙ্গ ও তার শাস্তি	৩০৪
হুদায়বিয়ার অভিযান ও সন্ধি	**৩০৫**
অভিযানের বিবরণ	৩০৬
সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর	৩১১
মুহাজির নারীদের সম্বন্ধে হুকুম	৩১২
খায়বারের যুদ্ধ	**৩১৩**
ইয়াহূদীদের সঙ্গে সন্ধি	৩১৪
এক নও মুসলিম দাসের আত্মোৎসর্গ	৩১৪
সাফিয়্যা (রা)-এর সাথে নাবী ﷺ-এর বিবাহ	৩১৫
রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিষ খাওয়ানো	৩১৫
আবিসিনিয়া থেকে মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন	৩১৬
অন্যান্য ইয়াহূদী গোত্রসমূহের বশ্যতা স্বীকার	৩১৭
বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দলের মাদীনায় আগমন	৩১৮
মুলতবী উমরাহ	৩১৮
মাইমূনা (রা)-এর সাথে রাসূল ﷺ-এর বিবাহ	৩১৮
মূতার যুদ্ধ	**৩১৯**
বিপুল খৃস্টান বাহিনীর সাথে মুসলিমদের মুকাবেলা	৩১৯
ফাতহুল মাক্কাহ	**৩২৩**
মাক্কা অভিযান ও তার কারণ	৩২৩
মাক্কায় দূত প্রেরণ	৩২৪
আবূ সুফ্ইয়ানের মাদীনা আগমন	৩২৫
অভিযানের প্রস্তুতি	৩২৬
এক বাদ্‌রী সাহাবীর ভুল পদক্ষেপ	৩২৬
হাতিব (রা)-এর কৈফিয়ত	৩২৭
যাত্রা শুরু	৩২৮
আবূ সুফ্ইয়ানের ইসলাম গ্রহণ	৩২৮
মাক্কায় প্রবেশ	৩৩২
বিজয়ী বেশে কা'বা গৃহে	৩৩৩
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অতুল্য ভাষণ	৩৩৪
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অতুল্য ক্ষমা– সাধারণ মার্জনা	৩৩৪
হিন্দা	৩৩৬
ইকরিমা	৩৩৬
সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া	৩৩৭
হাব্বার ইবনু আসওয়াদ	৩৩৮
'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবী সরাহ	৩৩৮
ফুযালা ইবনু উমাইর	৩৩৯
মৃত্যুদণ্ড	৩৩৯
ইবনু খাতাল	৩৪০
মাকীস	৩৪০
কা'বা গৃহের চাবি	৩৪০
উম্মু হানী (রা)-এর গৃহে সালাতে শুকর	৩৪২
কুরাইশদের ইসলামে দীক্ষা ও বাই'আত গ্রহণ	৩৪২
মুহাজিরদের সয়-সম্পদ	৩৪৩
দেব-দেবীর প্রতিমা অপসারণ	৩৪৩
আনসারদের অভয় দান	৩৪৩
মাক্কা বিজয়ের দু'টি প্রতিক্রিয়া	৩৪৪
হুনাইনের যুদ্ধ	**৩৪৫**
যুদ্ধ যাত্রা	৩৪৫
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসাধারণ দৃঢ়তা	৩৪৬
তায়েফ অবরোধ	৩৪৮
গনীমতের মাল বিতরণ	৩৪৯
আনসারদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া	৩৫০
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবিস্মরণীয় ভাষণ	৩৫০
দুধ-ভগ্নি শাইমার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যবহার	৩৫১
হাওয়াযিন প্রতিনিধি দলের আগমন	৩৫১
গাজওয়ায়ে তাবূক বা তাবূকের অভিযান	**৩৫৩**
একটি অবিস্মরণীয় ভাষণ	৩৫৫
তাবূকে অবস্থিতি	৩৫৮
প্রত্যাবর্তন পথে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র	৩৫৮
মাসজিদে যিরার	৩৫৯
মাদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যর্থনা	৩৬০
মাদীনার মাসজিদে মুনাফিকদের কৈফিয়ত গ্রহণ	৩৬০
কা'ব ইবনু মালিকের ঘটনা: মুসলিম বান্দার অগ্নিপরীক্ষা	৩৬০
একটি মহৎ জীবন ও তাঁর অবসান	৩৬৫
আরবের বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে মাদীনায় প্রতিনিধি দলসমূহের আগমন	**৩৬৮**
তায়েফের সাকীফ প্রতিনিধি দলের কথা	৩৬৮
'আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল	৩৭৩
বানী হানীফার প্রতিনিধি দল ও মুসাইলামাহ কায্যাবের কথা	৩৭৪
নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধি দল	৩৭৫
নাজরানের দ্বিতীয় ডেপুটেশন	৩৭৭
আযদ গোত্রের প্রতিনিধি দল	৩৮০
বনু উযরা গোত্রের প্রতিনিধি দল	৩৮১
মুররা গোত্রের প্রতিনিধি দল	৩৮১
গাসসান গোত্রের প্রতিনিধি দল	৩৮২

www.waytojannah.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্যান্য প্রতিনিধি দল	৩৮২
মক্কা বিজয় ও প্রসঙ্গিক কিছু আলোচনা	**৩৮৩**
ইফকের হাদীস	৩৮৪
গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম প্রসঙ্গে	৩৮৬
মুত'আ বিবাহ হারাম হওয়া প্রসঙ্গে	৩৮৭
উৎপাদিত শস্যের বিনিময়ে বাগান ও জমিন বর্গা	৩৮৮
গুপ্তচর হত্যা প্রসঙ্গে	৩৮৮
মহিলা গুপ্তচরকে উলঙ্গ করা জায়েজ কি না	৩৮৮
হুনাইন যুদ্ধের কতিপয় ফিকহী মাসআলা-মাসায়েল এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ বর্ণনার বিবরণ	৩৮৮
রাসূল ﷺ-এর উক্তি- "আমি তোমাদের উদ্বুদ্ধ করিনি বরং আল্লাহ তোমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন"-এর অর্থ প্রসঙ্গে	৩৯০
মুনাফিক ও তাদের স্বজাতীয় অন্যান্যদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর ধৈর্য	৩৯১
রাত্রে দাফন দেয়া প্রসঙ্গে	৩৯১
দুনিয়াতে শাস্তি ত্বরান্বিত করা বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রাহমাতস্বরূপ	৩৯২
বিদ'আতী এবং কুপ্রবৃত্তি অনুসারীদের সঙ্গে লেনদেন প্রসঙ্গে	৩৯৩
সদকার (দানের) পরিমাণ সম্পর্কে	৩৯৩
সত্যবাদিতা প্রসঙ্গে	৩৯৪
চুক্তি বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কেউ যদি কোন অপরাধ করে তখন কী করণীয়	৩৯৬
বনী আসাদের প্রতিনিধি দল	৩৯৬
নাবী ﷺ-এর চিকিৎসা প্রসঙ্গে	**৩৯৭**
আত্মিক অসুস্থতা	৩৯৭
শারীরিক রোগ	৩৯৮
শারীরিক চিকিৎসার প্রকারভেদ	৩৯৯
আরোগ্য লাভে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা	৪০০
প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা আছে	৪০১
রোগ নিরাময়ে নাবী (রা)-এর চিকিৎসা	৪০২
জ্বরের চিকিৎসায় রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা	৪০৩
পাতলা পায়খানার চিকিৎসা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা	৪০৪
শোথ রোগ এবং এর চিকিৎসা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা	৪০৬
ক্ষত, জখম, এবং নাকের রক্তক্ষরণ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা	৪০৭
মধু-সেবন, সিঙ্গা এবং তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ দেয়া সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা	৪০৭
ফোড়া, পাঁচড়া এবং চিকিৎসা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা	৪০৮
তিন আঙ্গুলে খাবার খাওয়া সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা	৪০৮
শরবত পানে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা	৪০৯
দাঁড়িয়ে এবং বসে পানি পান প্রসঙ্গ	৪১১
পানি পানের মাঝে শ্বাস নেয়া প্রসঙ্গ	৪১১
ব্যায়াম ও শরীরচর্চা প্রসঙ্গে	৪১২
সহবাস সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশ না	৪১৩
সহবাসের সর্বোত্তম সময় এবং সর্বোত্তম পদ্ধতি প্রসঙ্গে	৪১৫
ক্ষতিকর সহবাস প্রসঙ্গে	৪১৯
ফটো প্রেম প্রসঙ্গে	৪২২
প্রেম রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা	৪২৩
বিবাহ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নাবী ﷺ-এর রায় ও বিধি-বিধান	**৪২৪**
কুমারী ও বিধবাদের বিবাহ প্রসঙ্গে নাবী ﷺ-এর বিধিনিষেধ	৪২৪
অভিভাবকহীন বিবাহের ব্যাপারে নবী ﷺ-এর বিধান	৪২৪
যদি দু'জন অভিভাবক বিবাহ দেয়	৪২৪
মহর নির্ধারণ করা ব্যতীত বিবাহের বিধান	৪২৫
বিবাহের পর স্ত্রীকে গর্ভবতী দেখলে	৪২৫
ঐ ব্যক্তি যে একই সঙ্গে তিন তালাক দিয়েছে	৪২৬
সন্তানকে লালন-পালন করার ব্যাপারে কে অধিক হকদার প্রসঙ্গত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিধান	৪২৮
শিশুর ব্যাপারে বাবা-মার মাঝে কে হকদার বেশি?	৪২৯
সন্তানের প্রতি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার রকমফের	৪৩০
কুকুর ও বিড়ারের মূল্য গ্রহণ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিধান	৪৩১
ব্যভিচারের বিনিময় প্রসঙ্গ	৪৩১
গণক-ঠাকুরের পারিশ্রমিক	৪৩২
রক্তমোক্ষণ ব্যবসা প্রসঙ্গ	৪৩৪
ষাঁড় দ্বারা পাল বা প্রজননের মজুরি গ্রহণ সম্পর্কে নবীর ﷺএর নির্দেশ	৪৩৫
যৌথ মালিকানাধীন পানি বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর নির্দেশ	৪৩৬
প্রবাহমান পানি প্রসঙ্গ	৪৩৯
নিজের দখলে নেই এমন বস্তু বিক্রি করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিধান	৪৪০
হাসাত, গরর, মুলামাসা এবং মুনাবাযা এর ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুকুম	৪৪৩
"গারার" এর বিক্রয় প্রসঙ্গ	৪৪৩

www.waytojannah.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুখবন্ধ

الحمد لله رب العالـــمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له، وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أثاب – فسبحان الله وتعالى عما يشركون

কিয়ামাত দিবসে প্রশ্নোত্তর

কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ দুটো প্রশ্নের সম্মুখীন হবে:

প্রথম প্রশ্ন হবে: "কার ইবাদাত করতে?"

দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে: "রাসূলের উপর ঈমান এনেছিলে?"

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হবে: "আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ"; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তবে এই উত্তর শুধু তারাই দিতে পারবে যারা তাঁকে পৃথিবীতে চিনেছিল, তাঁর উপর ঈমান এনেছিল এবং ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুযায়ী 'আমাল করেছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হবে: "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। এ উত্তরও ঐ সকল ব্যক্তির পক্ষেই দেয়া সম্ভব হবে যারা দুনিয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চিনেছিল, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল, তাঁকে মেনে চলেছিল এবং তাঁর একনিষ্ঠ অনুসরণ করেছিল।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্রত

মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন আবদুল্লাহর পুত্র, তিনি হলেন আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল–পয়গামবাহক, তাঁর ওয়াহীর ধারক, সৃষ্টিকুলের সেরা, আল্লাহ এবং তাঁর বান্দাদের মধ্যে সফীর (দূত)। তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে এক সুন্দর ও সুদৃঢ় জীবন ব্যবস্থাসহ ও সরল সোজাপথের সন্ধান দিয়ে। তিনি বিশ্বজগতের জন্য রহমাতের প্রতীক, মুত্তাকীনদের মহান নেতা এবং তিনি কুল-মাখলুকের উপর দেদীপ্যমান দলীল তথা প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে প্রেরিত। সকল রাসূলের শেষে তাঁর শুভ অভ্যুদয়, হিদায়াতের সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রদীপ নিয়ে তিনি শুভাগমন করেছেন এবং লোকদেরকে সরল সঠিক পথ– সিরাতে মুসতাকীমের পানে পরিচালিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সকলের উপর কেবল তাঁরই আনুগত্য করণ, তাঁর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন এবং তাঁর প্রতি ভক্তি ও প্রেম নিবেদন আবশ্যক করেছেন। জান্নাতে

www.waytojannah.com

Contents

প্রবেশের যত পথ উন্মুক্ত ছিল সকল পথ বন্ধ করে দিয়ে আল্লাহ কেবল তাঁর প্রিয় রাসূলের পথটিই খোলা রেখেছেন, অতঃপর একমাত্র এই পথে চলেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারে, তাঁর আবির্ভাবের পর জান্নাতে প্রবেশের অন্য কোন পথ আর উন্মুক্ত নেই।

আল্লাহ তাঁর বক্ষ-বিদারণ করেছেন– তাঁর হৃদয়ের উপলব্ধির দরজা খুলে দিয়েছেন, তাঁর পূর্বাপর সকল ত্রুটি বিচ্যুতি মাফ করে দিয়েছেন আর যারা তার বিরোধিতা করেছে তাদের প্রতি তিনি অসম্মান ও অপমানের মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন।

মুসনাদে ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর হাদীসে এসেছে– আবূ মুনিব আল-জুরাশী 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আমি তরবারি সহকারে কিয়ামাতের প্রাক্কালে প্রেরিত হয়েছি যেন কেবল সেই আল্লাহ্‌রই 'ইবাদাত করা হয় যিনি এক এবং যাঁর কোন শরীক নেই, আমার জীবিকা আমার বর্শা ফলকের ছায়ায় রাখা হয়েছে, অপমান ও অধঃপতন অবধারিত তাদের জন্য যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে, আর (খেয়াল রেখো!) যারা অন্য জাতির অনুকরণ করবে তারা সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

মু'মিনদের পুরস্কার

বিরুদ্ধবাদীদের ভাগ্যে যেমন লিখিত আছে অপমান ও অধঃপতন, তেমনি মু'মিনদের ভাগ্যে আছে সম্মান ও উন্নয়ন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

"এবং তোমরা সাহস হারিও না, উৎকণ্ঠা বোধ করো না, তোমরাই জয়ী হবে যদি তোমরা সত্যিকার মু'মিন হয়ে থাক।" (সূরা আলে-'ইমরান- ১৩৯)

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ.

"আর সম্মানের (শক্তি) অধিকারী হলেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ও মু'মিন সমাজ।" (সূরা মুনাফিকূন- ৮)

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ.

"(হে মু'মিন সমাজ!) তোমরা নিরুৎসাহ (হীনবল) হবে না আর (আগে ভাগে) সন্ধির আহ্বানও জানাবে না, মূলতঃ তোমরাই প্রবল হয়ে থাকবে আর তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন আল্লাহ।" (সূরা মুহাম্মাদ- ৩৫)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"হে নাবী (মুহাম্মাদ)! আপনার জন্য আর মু'মিনদের মধ্যে যারা আপনার অনুসরণ করে থাকে তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা আনফাল- ৬৪)

মু'মিনের মাহাত্ম্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ কসম করে বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না সে আমাকে তার নিজের চেয়ে, নিজের সন্তান-সন্ততির চেয়ে, নিজের পিতা-মাতার চেয়ে এবং অন্যান্য সমুদয় লোকের চেয়ে অধিক ভালোবাসবে। অপরদিকে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন স্বয়ং কসম করে বলেছেন, সেসব ব্যক্তি মু'মিন পদবাচ্য নয় যারা তাদের সমস্ত মতভেদের মীমাংসার জন্য আল্লাহর

www.waytojannah.com

Contents

রাসূলকে বিচারক না মানে আর তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা সন্তোষের সঙ্গে নত মস্তকে মেনে না নেয়। ওই সন্তোষও এমন হতে হবে যে, অন্তরের ভিতর কোন প্রকার দ্বিধা ও সংকোচ যেন বাকি না থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.

"আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল যখন কোন হুকুম প্রদান করেন কিংবা ফায়সালা জানিয়ে দেন তখন কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীর এ বিষয়ে অন্যথা করার কোন সুযোগ নেই।" (সূরা আহযাব- ৩৬)

মু'মিনের চলার রাজপথ

কাজেই কোন মু'মিনের জন্য আল্লাহর নাবীর হুকুম-আহকাম জানার পর নিজের মর্জি অনুযায়ী চলার চিন্তা করাটাই হলো অনধিকার চর্চা। কারণ নাবী ﷺ-এর হুকুম হচ্ছে অটল ও শাশ্বত। কোন ব্যক্তির জন্যই আল্লাহর রাসূল ছাড়া অপর কোন ব্যক্তির আনুগত্য স্বীকার করা মোটেই সিদ্ধ নয়। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি সেই হুকুম প্রতিপালনের আহ্বান জানায় যে হুকুম খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদান করেছেন, তবে সে অবস্থায় তিনি কেবলমাত্র একজন মুবাল্লিগ বা প্রচারকের ভূমিকা পালন করছেন বলে ধরে নেয়া যেতে পারে, তিনি খোদ হুকুমদাতা হবেন না। অপরপক্ষে যিনি স্বাধীনভাবে সরাসরি বিধান জারি করবেন এবং নিজের থেকে শরীআতের মৌলনীতি ও নিয়মাবলী চালু করবেন, তার অনুসরণ উম্মাতের উপর ওয়াজিব হবে না– যে পর্যন্ত না তার বিধান, তার নীতি এবং নিয়মাবলী নাবী ﷺ-এর বিধানের অনুগত ও অনুকূল হয়। যদি অনুগত ও অনুকূল হয়, তবেই তা গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি প্রতিকূল বা বিরোধী হয় তাহলে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কিন্তু কোন বিধান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুকুমের সুস্পষ্টভাবে অনুকূল, না প্রতিকূল– তা যদি বুঝা না যায় তবে সে হুকুমটিকে অমীমাংসিত বিষয়রূপে ছেড়ে দিতে হবে। এ অবস্থায় না গ্রহণ আর না বর্জন নীতি গ্রহণ করতে হবে।

সৃষ্টির রকমভেদ

সব কিছুর স্রষ্টা হলেন মহান আল্লাহ, মানবজাতিকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এ সৃষ্টি থেকে তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে বেছে নেন, যেমন তিনি বলেছেন–

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ.

"আপনার প্রভু তাঁর ইচ্ছামত সৃষ্টি করেন এবং সে সৃষ্টি থেকে তিনি যাকে ইচ্ছা বেছে নেন।"
(সূরা কাসাস- ৬৮)

সৎ ও অসতের পরিচয়

আল্লাহর সেরা সৃষ্টি– মানবকুল দু'ভাগে বিভক্ত। একটির নাম তৈয়্যেব– নিষ্কলুষ তথা সৎ ও সাধু, অপরটির নাম খবীস– কলুষিত বা অসৎ ও অসাধু। আল্লাহ তা'আলার নির্বাচনী দৃষ্টি সদা সৎ ও সাধু ব্যক্তির প্রতি নিপতিত– এ দৃষ্টিকোণ থেকেই মানুষের মধ্যে কে ভাগ্যবান এবং কে হতভাগ্য তা চিনতে পারা যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিচারে ভাগ্যবান এবং তাঁর দৃষ্টিতে সৎ ও চরিত্রবান এ জগতে প্রকৃতিগতভাবে তার ঝোঁক ও প্রবণতা সবসময় পবিত্রতার দিকে থাকবে। তাঁর 'আমাল তথা কার্যকলাপের

www.waytojannah.com

Contents

দিকে যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তবে দেখতে পাবে যে, সে কেবল একক আল্লাহরই উপাসনা আরাধনা করছে। কাউকেই সে তার সঙ্গে শরীক করছে না, আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিকেই সে নিজের প্রবৃত্তি-পরায়ণতার উপর স্থান দিচ্ছে। মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্ট প্রাণীর সঙ্গে যথাসম্ভব সে সদ্ব্যবহার করে থাকে। সে অপরের নিকট থেকে নিজের প্রতি যেরূপ ব্যবহারের আশা পোষণ করে, অপরের প্রতিও সে তদ্রূপ ব্যবহারই করে থাকে। তাঁর চরিত্রেও উক্ত আদর্শের প্রতিফলন ঘটে থাকে। তাঁর হৃদয় চরিত্রের সুউচ্চ মহিমায় সমুন্নত। সে সহিষ্ণুতা, দয়া, ধৈর্য, প্রেম, সাহস, সহনশীলতা, বিনয়, দানশীলতা, মানবতা, গাম্ভীর্য, উদারতা, হৃদয়ের প্রশান্তি, মু'মিনদের সঙ্গে সহৃদয়তা ও বিনয়, আল্লাহর শত্রুদের মুকাবেলায় অটল দৃঢ়তা ও কঠোরতা–মোটের উপর সে সর্বপ্রকার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সৌন্দর্যে হবে পূর্ণ বিভূষিত। পৃথিবীর যাবতীয় প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম-বিধি, মানবীয় প্রকৃতি, বিবেক ও প্রজ্ঞা চরিত্রের এই দৃঢ়তা ও স্বভাব–সৌন্দর্যের সমর্থনে একমত।

তদ্রূপ পানাহার ব্যাপারেও নির্দোষ ও হালাল বস্তুর প্রতিই তার অনুরাগ পরিদৃষ্ট হবে– কেননা এ বস্তুগুলি তার দেহ, মন ও আত্মার জন্য উপকারী এবং পুষ্টিকর।

ঠিক এভাবেই তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীরাও হবে সৎ মানুষ। দুষ্ট লোকদের সান্নিধ্য তার নিকট খুবই অপ্রিয় বিবেচিত হবে। ফলকথা, তাঁর সমগ্র সত্তাই তাঁকে উত্তম, পবিত্র, সাধু ও সৎ হওয়ার প্রেরণা যোগাবে। অন্যায়, অনাচার, অপবিত্রতা ও অশ্লীলতার একটা চিহ্নও তার মাঝে পাওয়া যাবে না।

কুরআনের সাক্ষ্য

এ ধরনের ব্যক্তিদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে:

الَّذِيْنَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

"যাদের রূহ ফেরেশতারা কবজ করে তাদের প্রসন্ন-পবিত্র অবস্থায়, আর তারা বলে: সালাম তোমাদের প্রতি, তোমরা জান্নাতে দাখিল হও তোমাদের আচরিত কর্মের প্রতিফলে।" (সূরা নাহল- ৩২)

আর এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদেরই জান্নাতের প্রহরীরা স্বাগত সংবর্ধনা জানিয়ে বলবেন:

سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ.

"তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও; কাজেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর চিরস্থায়ীভাবে।" (সূরা যুমার- ৭৩)

আবার অন্যত্র বলা হয়েছে:

الْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

"অসাধু (ও অশ্লীল) কথাসমূহ নির্ধারিত হয়ে রয়েছে অসাধু লোকদের জন্য, আর অসাধু লোকদের জন্যই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে অসাধু (ও অশ্লীল) কথাসমূহ, অপরদিকে সাধু ও সৎ কথাসমূহ নির্ধারিত হয়ে আছে সাধু ও সৎ লোকদের জন্য, আর সাধু ও সৎ লোকদের জন্যই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে সাধু ও সৎ কথাসমূহ। এ সাধু সৎ ব্যক্তিগণ অসাধু ব্যক্তিদের অপবাদ থেকে কলুষমুক্ত, অধিকন্তু তাদের জন্য রয়েছে মার্জনা ও মহান জীবন-সম্পদ।" (সূরা নূর- ২৬)

www.waytojannah.com

Contents

প্রকৃতপক্ষে হক্ব ও সত্য কথা বলা, ন্যায়সঙ্গত কাজ করা সাধু ও পবিত্রাত্মা লোকদের স্বভাবসুলভ আচরণ, আর পবিত্র-স্বভাব নারী হলো তাদের সঙ্গত সঙ্গিনী। অপরদিকে না-হক বাক্য ও অশ্লীল কথা এবং অন্যায় অসঙ্গত কার্য অসাধু লোকদের স্বভাবগত আচরণ–এ ছাড়াও অসাধু ভ্রষ্টা নারী তাদের জীবন সঙ্গিনী। সাধু ও পবিত্রাত্মা ব্যক্তিদের সঙ্গে অসাধু ও অসৎ লোকদের মিলন ও মেলামেশা কস্মিনকালে সম্ভাবিত নয়।

দু'দলের পরিণতি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শুধু সৎকর্মশীল পুরুষ ও সৎকর্মশীলা নারীর জন্য জান্নাত নির্ধারিত করে রেখেছেন। অপরদিকে অসাধু ও পথভ্রষ্ট পুরুষ এবং অনাচারী ও ভ্রষ্টা নারীর জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন জাহান্নাম। অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ যেরূপ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, তদ্রূপ তাদের ঠিকানাও করে রেখেছেন দু'রকম। একটি ঠিকানা হলো জান্নাত–যা হবে শুধু সাধু ও সৎকর্মশীল লোকদের চিরস্থায়ী বাসস্থান– অসাধু দুষ্কর্মশীলরা তার ধারে কাছেও যেতে সক্ষম হবে না। অপর ঠিকানা হচ্ছে– জাহান্নাম যা হবে কেবল অসাধু এবং দুষ্ট ও ভ্রষ্ট লোকদের অবস্থিতি স্থান। সেখানে সাধু লোকদের প্রবেশ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

দুনিয়ায় সহ-অবস্থান

কিন্তু এ দু'ঠিকানা ব্যতীত আরও একটি স্থান রয়েছে যেখানে সাধু অসাধু, সৎপথপ্রাপ্ত এবং ভ্রষ্টপথ লোক একই সঙ্গে মিলিতভাবে বসবাস করে– সে জায়গাটি হল আমাদের এ দুনিয়া। এখানে সাধু লোকের যেমন অভাব নেই, অসাধু লোকেরও তেমনি অভাব নেই। এখানে উভয় প্রকারের লোক পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যাবে। এরূপ সংমিশ্রিত বসবাসই হল এ পৃথিবীর বৈশিষ্ট্য আর এজন্যই আল্লাহর হিকমাত এটাকে একটা পরীক্ষার স্থানরূপ নির্বাচন করে নিয়েছে। এখানে কে সৎ কে অসৎ, কে সাধু আর কে অসাধু তা আল্লাহর কষ্টি পাথরে জীবনভর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করা হয়।

বিচার দিবসে সাধু ও অসাধুর পৃথকীকরণ

পৃথিবীতে মানুষের সমগ্র জীবনে আমৃত্যু এ পরীক্ষার কাজ অব্যাহত থাকবে। তারপর এসে পড়বে হিসাব-নিকাশের সেই ভয়াবহ দিবস। সেই দিন প্রত্যেককেই নিজ নিজ 'আমালনামা নিয়ে রাব্বুল ইয্যতের সম্মুখে হাজির হতে হবে। ঐ সময় রাব্বুল 'আলামীন সৎ ও সাধু ব্যক্তিদেরকে দুষ্ট ও ভ্রষ্ট লোকদের থেকে পৃথক করে ফেলবেন। সাধু ব্যক্তিদেরকে তাদের স্থায়ী আবাসস্থল জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে–যেখানে তাঁরা ব্যতীত আর কেউ থাকবে না। আর দুষ্ট ও ভ্রষ্ট লোকদেরকে তাদের পাপাচারের 'আমালনামাসহ' জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, সেখানে তারা তাদের সহযাত্রী পাপীতাপী ব্যতীত কোন সাধু লোক দেখতে পাবে না।

আল্লাহ তাবারক ওয়াতা'আলা উভয় শ্রেণির পারলৌকিক প্রতিদান ও প্রতিফল পুরস্কার ও শাস্তি তাদের পার্থিব কর্মক্রিয়ার মাঝেই রেখে দিয়েছেন। সাধু ও সৎ ব্যক্তিদের কথা ও কাজ, আচরণ ও চরিত্রই তাদের জন্য জান্নাতের আনন্দ ও কল্যাণ আশীর্বাদে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাতে ঢেলে দেবেন তাঁর বারাকাত–ফলে প্রাচুর্যের অজস্র ধারায় ও গুণের সুউচ্চ মহিমায় সে সব হয়ে উঠবে তাদের আনন্দ সম্ভোগের ও সুখ সন্তোষের সীমাহীন উপকরণ। তদ্রূপ কলুষ হৃদয় ভ্রষ্ট লোকদের কথা, কাজ, চরিত্র ও আচরণ তাদের জন্য কষ্টকে রূপান্তরিত হয়ে দুঃখ ও যাতনা, ক্লেশ ও বেদনার আকারে দেখা দেবে।

www.waytojannah.com

Contents

সন্দেহ নিরসন ও সত্য উদ্ঘাটন

ঐ মহিমাময় মহান প্রভুর কী সে সুবিজ্ঞ কৌশল! এভাবেই তিনি তাঁর প্রভুত্বের সার্বভৌমত্ব, হিকমাতের পরিপূর্ণতা, জ্ঞানের সর্বব্যাপকতা, বিচারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতা আর রহমাতের বিপুলতা প্রদর্শন করে থাকেন– যেন তাঁর শত্রুরা অবহিত হয়ে যায় যে, তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট, অপবাদ প্রদানকারী এবং মিথ্যাবাদী ছিল, না কি পাক-পবিত্র নিষ্কলঙ্ক ও সত্যসাধক আল্লাহর রাসূল ﷺ?

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأَقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوْتُ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ– لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّهُمْ كَانُوْا كَاذِبِيْنَ.

"তারা আল্লাহর নামে বড় বড় কসম খেয়ে বলেছিল যে, যারা একবার মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাদেরকে পুনরুত্থিত করেন না। না, আল্লাহ অবশ্যই পুনরুত্থিত করবেন, এ হলো তাঁর সাচ্চা ও পাক্কা ওয়াদা, তবে অধিকাংশ লোকই (এর তত্ত্ব) জানে না–তিনি এজন্যই সকলকে পুনরুত্থিত করবেন যে, তারা এ সম্পর্কে যে আলাদা মত পোষণ করছিল তার সত্য স্বরূপ তিনি উদ্ঘাটিত করে দেবেন আর কাফিরদের বুঝিয়ে দেবেন যে, তারাই ছিল সত্যের অস্বীকারকারী– মিথ্যাবাদী।" (সূরা নাহল– ৩৮-৩৯)

দু'দলের সনাক্তকরণ

মোটকথা, আল্লাহর সৃষ্ট মানব সমাজের মাঝে কতক রয়েছে যারা সাধু ও নিষ্কলঙ্ক আর কতক অসৎ ও কলুষিত, কতক ভাগ্যবান এবং কতক হতভাগ্য। প্রত্যেক শ্রেণীর রয়েছে পরিচয় চিহ্ন ও নিদর্শন– যার মাধ্যমে তাদের বেছে বের করা সম্ভব। খবীস তথা কলুষ হৃদয় অসাধু ব্যক্তি সে-ই যার অন্তরদেশ, জিহ্বা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে অপবিত্রতা ও অশ্লীলতার কলুষ কালিমা সবসময় প্রবাহিত হয়। আর তৈয়্যিব তথা পাক-পূতঃ সাধু লোক সেই যার অন্তরদেশ, জিহ্বা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্রতা ও সাধুতার ফোয়ারা সবসময় বিচ্ছুরিত ও প্রবাহিত হয়। কিন্তু এমন লোকের সংখ্যাও কম নয় যাদের মধ্যে এ দু' অবস্থার সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয়। এদের মধ্যে কতকের মধ্যে ন্যায় ও অন্যায়, হক ও বাতিলের আকর্ষণ বিকর্ষণের পর পরিণামে একটি মৌল প্রকৃতি অন্য মৌল প্রকৃতির উপর বিজয়ী হয়। আল্লাহ যাদের জন্য কল্যাণ মঞ্জুর করেন মৃত্যুর পূর্বে তাদেরকে কলুষ প্রকৃতি থেকে পুত-পবিত্র করে দেন। ফলে কিয়ামাত দিবসে তারা আল্লাহর নিকট পবিত্র ও পরিশুদ্ধ অবস্থায় উপনীত হওয়ার তাওফীক লাভ করে। কাজেই তাদের পুনঃপরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য জাহান্নামের ভাঁটিতে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, তাদেরকে সরাসরি জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আল্লাহর আনুগত্য বরণ, অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন, গুনাহর জন্য কাফ্ফারা প্রদান ইত্যাদি কর্মক্রিয়ার প্রতিদানে বান্দা আল্লাহর উপযুক্ত অনুগ্রহের তাওফীক লাভে ধন্য হয়।

হতভাগার দল

কিন্তু যে সকল হতভাগার দল তাদের কর্মফলে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হয়, তাদের কলুষ স্বভাব অপরিবর্তিতই থেকে যায়, বরং তাদের হৃদয়ে কালিমার পর কালিমা বৃদ্ধি পেতেই থাকে, অবশেষে কলুষ কালিমার স্তূপসহ তারা আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়, এ কারণে তারা জাহান্নামের অতল গহ্বরে

www.waytojannah.com

Contents

নিক্ষিপ্ত হয়, কারণ কলুষ-কালিমা লেপিত অবস্থায় তারা পবিত্র জায়গা জান্নাতে যেতেই পারে না। ফলে জাহান্নামের ভাঁটিতে তাপিত ও দগ্ধীভূত হয়ে তাদেরকে কলুষ-বিবর্জিত ও পবিত্র হয়ে আসতে হয়। সেখানে যখন যে ব্যক্তি পূর্ণ পরিশুদ্ধতা লাভ করতে সক্ষম হয় তখনই সে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসার তাওফীক লাভ করে। তখন সে স্বীয় প্রতিপালকের আশ্রয় এবং জান্নাতের অধিবাসীদের সান্নিধ্য লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। এ শ্রেণীর লোকের জাহান্নামের কয়েদখানায় কেবল সেই মেয়াদ পর্যন্ত থাকার প্রয়োজন হয় যে সময়ের মধ্যে তারা কলুষমুক্ত হতে পারে। যারা যতশীঘ্র পাক-পবিত্র হতে পারে, তারা ততশীঘ্র মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। আর যাদের পবিত্রতা অর্জনে যতটা বিলম্ব হয়ে থাকে তাদের ততটাই সেই কষ্টদায়ক জীবনের দুর্ভোগে নিপতিত হতে হয়। আল্লাহর ন্যায় বিচারে এটাই হলো– جَزَاءً وِّفَاقًا 'আমালের সমুচিত প্রতিফল। (সূরা নাবা- ২৬)

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

"আর তোমার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি যালিম নন।" (সূরা হা-মীম আস্-সাজদাহ- ৪৬)

মুশরিকদের পরিণতি

অবশিষ্ট থাকল মুশরিকদের কথা। তারা তো প্রকৃতিগতভাবেই খবীস, তাদের সমগ্র সত্তাটাই কলুষ কালিমাময় কলঙ্কিত। ফলে জাহান্নামও তাদের কলঙ্ক-কালিমা দূর করতে অক্ষম। সেখানে যত দীর্ঘকালই থাকুক, তারা কলুষিতই অবশিষ্ট থাকবে। তাদের দৃষ্টান্ত দেয়া চলে কুকুরের সঙ্গে। কুকুরকে লক্ষ বার গোসল দাও, সে না-পাক কখনই পাক হবে না, কেননা তার সত্তাটাই যে না-পাক! এজন্য আল্লাহ না-পাক মুশরিকদের জন্য পাক-পবিত্র জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।

ঠিক তার বিপরীত হল সত্যিকার মু'মিন–যার জন্য জাহান্নাম হারাম। কারণ সে ভিতরে বাইরে পবিত্র। তার অভ্যন্তরে কলুষ কালিমার কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই– কাজেই যা নেই তা দূর করার জন্য জাহান্নামে যাওয়ার প্রয়োজনও নেই।

পূত-পবিত্র সেই আল্লাহ যাঁর হিকমাত হৃদয়ঙ্গম করতে বুদ্ধি ও মন-মানস হতবাক!

নাবী ﷺ-এর আদর্শ কেন আবশ্যক

নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনা, তাঁর হুকুম মানা এবং তাঁর অনুসরণ করা আবশ্যক এবং অবধারিত; এজন্য যে, তৈয়্যিব পাকপূতঃ এবং খবীস কলুষ হৃদয় ব্যক্তির পরিচয় লাভের একমাত্র মাধ্যম হলেন তিনি। সত্যকে পরখ করে বেছে নেয়ার কষ্টিপাথর এবং তুলাদণ্ড হলেন তিনি। একমাত্র তাঁরই কথা, তাঁরই কর্ম আর তাঁরই চরিত্রের ওজনকৃত অবস্থায় অন্য সকলের কথা, কাজ এবং চরিত্র ওজন করা যেতে পারে। এসব যাচাই করার অপর কোন কষ্টিপাথর নেই, সকল বিষয় মাপার আর কোন তুলাদণ্ড নেই। কাজেই মানুষের যত প্রয়োজন আছে এবং থাকতে পারে তার মধ্যে সব চেয়ে গুরুতর এবং অপরিহার্য প্রয়োজন হল আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পবিত্র জীবন কথা খুব ভালোভাবে জেনে নেয়া– যেন করে তাঁর আদর্শ নমুনা সামনে রেখে যে কোন মানুষ তার জীবনকে গড়ে তুলতে পারে আর তাঁর পদচিহ্নের উপর চলে পার্থিব ও পরমার্থ সুখসৌভাগ্য অর্জনের তাওফীক লাভ করতে পারে। ওয়াস্সালাম!

–হাফেয ইবনুল কাইয়্যিম (র)

www.waytojannah.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর সৃষ্টি নির্বাচন

আপনি যখন এই সৃষ্টিকে নিয়ে গবেষণা করবেন, দেখবেন সৃষ্টির এ নির্বাচন আর নির্ধারণ মহান স্রষ্টা আল্লাহর কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, একত্ববাদ তাঁর পূর্ণপ্রজ্ঞা, অসীম জ্ঞান এবং কুদরতের পরিচায়ক এবং আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর এমন কোনো অংশীদার নেই যে তাঁর সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি করতে পারে। তাঁর ইচ্ছার ন্যায় ইচ্ছা করতে পারে বা তাঁর ন্যায় কর্মপরিচালনা করতে পারে। সুতরাং তাঁর এ নির্বাচন নির্ধারণ আর সুনিপুণ ব্যবস্থাপনা তাঁর প্রভুত্বের মহান নিদর্শনাবলীর অন্যতম এবং তাঁর একত্ববাদের, পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলগণ সত্য হবার অন্যতম দৃষ্টান্ত। সুতরাং আমরা এখানে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করব।

আল্লাহ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করলেন। এরপর প্রথম আকাশকে তাঁর নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের নিবাস বানালেন। এ আকাশকে তিনি তাঁর কুরসীর এবং আরশের নৈকট্য লাভের মর্যাদা দিয়ে বিশেষিত করলেন এবং তিনি তাঁর সৃষ্টির যাঁকে ইচ্ছে সেখানের অধিবাসী করেন। অন্য সকল আকাশের উপর প্রথম আকাশের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। যদি এমনটি না হয় তবে আল্লাহ এ প্রথম আকাশকে তাঁর নৈকট্য প্রদান করলেন কেন? সকল আকাশের বস্তুমূল এক হওয়ার পরও প্রথম আকাশকে এ বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যকরণ তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা আর প্রজ্ঞার সুস্পষ্ট প্রমাণ। প্রমাণ তাঁর ইচ্ছে মত সৃষ্টি করার। এ জাতীয় আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, সকল জান্নাতের উপর জান্নাতুল ফিরদাউসকে বৈশিষ্ট্য প্রদান। আল্লাহ তাঁর আরশকে জান্নাতুল ফিরদাউসের ছাদ বানিয়েছেন। কিছু 'আসারে' এসেছে–

إن الله سبحانه غرسها بيده، واختاره لخيرته من خلقه.

"আল্লাহ তা'আলা জান্নাতুল ফিরদাউসকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য তা নির্বাচন করেছেন।"

এমনি আকেরটি দৃষ্টান্ত হলো, নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের মধ্য থেকে জিবরীল, মিকাইল এবং ইসরাফীলকে নির্বাচন করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, "হে জিবরীল, মিকাইল এবং ইসরাফীলের প্রভু, আসমান জমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য-অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী! আপনি আপনার বান্দাদের মাঝে তাঁরা যে বিষয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত সে বিষয়ে মীমাংসা করবেন। তারা যে বিষয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত তাতে আপনার পক্ষ হতে আমাকে সঠিকটির পথনির্দেশ করুন। আপনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হাদীসে তাদের বিশেষ মর্যাদার কারণে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণে বিশেষভাবে তাদের কথা আলোচনা করেছেন। তাদের ছাড়াও আকাশে কত যে ফেরেশতা রয়েছেন তা বলার বাইরে। কিন্তু তাদের নাম উল্লেখ না করে শুধু এ তিনজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. **জিবরীল:** তিনি ছিলেন ওহীবাহক যার মাধ্যমে রুলবসমূহ এবং আত্মাসমূহ জীবন লাভ করে।
২. **মিকাইল:** তিনি হলেন, বৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকারী। আর এ বৃষ্টির মাধ্যমে মাটি, পশু-পাখি, গাছ-পাতা, তরুলতা প্রাণ ফিরে পায়।
৩. **ইসরাফীল:** তিনি হলেন, শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার কাজে নিয়োজিত ফেরেশতা। তিনি যখন শিঙ্গায় ফুঁ দিবেন তখন তাঁর এ ফুৎকার আল্লাহর নির্দেশে মৃতদের জীবিত করে দিবে এবং তাদেরকে তাদের কবর থেকে বের করে দিবে।

www.waytojannah.com

Contents

এমনি আরো একটি দৃষ্টান্ত হলো, বনী আদম থেকে ১ লক্ষ ২৪ হাজার জনকে নবী এবং ৩১৩ জনকে রাসূল হিসেবে নির্বাচন করা। যার বর্ণনা আবূ যর এর হাদীসে এসেছে এবং হাদীসটি ইমাম আহমাদ এবং ইবনু হিব্বান তার 'সহীহ্'-তে বর্ণনা করেছেন এবং তাদের মধ্য থেকে পাঁচ জনকে 'উলিল আমর' হিসেবে মনোনীত করেছেন যার আলোচনা সূরা 'আল-আহযাব' এবং আশশূরার নিম্নোক্ত আয়াতেসমূহে এসেছে–

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ.

"আমি যখন পয়গম্বরগণের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও মরিয়মতনয় ঈসার নিকট থেকে অঙ্গীকার নিলাম।" (সূরা: আল-আহযাব- ৭)

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ.

"তিনি তোমাদের জন্য দীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করেছেন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠা করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।" (সূরা: শুরা- ১৩)

আর তাদের থেকে দু'জনকে খলীল হিসেবে মনোনীত করেছেন।

১. ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও

২. মুহাম্মাদ ﷺ।

এমনি আরো একটি দৃষ্টান্ত হলো, আদম সন্তানদের থেকে ইসমাঈলের বংশধর নির্বাচন করা এবং তাদের থেকে খুযাইমার বনু কিনান নির্বাচন এবং তাদের থেকে কুরাইশদের এবং কুরাইশদের থেকে বনী হাশেমকে এবং বনী হাশিম থেকে মুহাম্মাদ ﷺ-কে নির্বাচন করা। এমনিভাবে তিনি সকল সৃষ্টি থেকে সাহাবাদের নির্বাচন করেছেন; আবার তাদের থেকে পূর্ববর্তী অগ্রবর্তীগণকে এবং আবার তাদের থেকে আহলে বাদর এবং আহলে বাইতে রিদওয়ানকে নির্বাচন করেছেন এবং তাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ দীন মনোনীত করেছেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাতকে সকল নাবীর উম্মাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমনটি মুসনাদে আহমাদ ইত্যাদি হাদীসের গ্রন্থে বাহয ইবনু হাকীম ইবনু মুআবিয়া ইবনু হাইদাহ তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদার পরম্পরায় বর্ণনা করেছেন। তার দাদা বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন–

انتم موفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله.

তোমরাই সত্তরটি জাতি পূর্ণ করবে, তাদের মধ্যে তোমারই শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়। ইবনুল মাদীনী এবং ইমাম আহমাদ বলেছেন, হাদীসটি সহীহ্।

এই নির্বাচন ও নির্ধারণ তাদের কাজকর্মে, নীতি-নৈতিকতায় একত্ববাদে এবং জান্নাতের স্থান নির্ণয়ে প্রভাব ফেলেছে। তিরমিযী শরীফে বুরাইদা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতীদের ১২টি কাতার হবে তন্মধ্যে ৮০টি এ উম্মাতের আর অবশিষ্ট ৪০টি কাতার হবে অন্যান্য উম্মাতের।" ইমাম তিরমিযী বলেন, "হাদীসটি হাসান।"

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত জাহান্নাম উত্থিতকরণ সম্পর্কিত একটি সহীহ্ হাদীসে এসেছে–

والذى نفسى بيده إن لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة.

www.waytojannah.com

Contents

"ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি আশাবাদী জান্নাতীদের অর্ধেক সংখ্যা হবে তোমাদের।"

এরপর অন্য কিছু বৃদ্ধি করেন নি। এখন হয় বলতে হবে, হাদীসটি সহীহ্ অন্যথায় বলতে হবে হাদীসটি সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর নাবীকে অবগত করে দিয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন–

إنكم ثمانون صفا من مائة وعشرين صفا.

সুতরাং হাদীসদ্বয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।

আল্লাহ এ উম্মাতকে যেসব বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন তার মাঝে অন্যতম হলো, তিনি এ উম্মাতকে এ পরিমাণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রদান করেছেন যা তিনি অপর কোন জাতি বা উম্মাতকে দেন নি।

মুসনাদে বায্যার ইত্যাদি কিতাবে আবূ দারদা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন– "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মারিয়ামতনয় ঈসাকে বলেছেন, আমি তোমার পরে এমন একটি জাতি সৃষ্টি করব যারা তাদের প্রিয় জিনিসকে পেলে আমার প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আর অপ্রীতিকর কোন কিছু ঘটলে তারা ধৈর্য ধারণ করবে। (তাদের মতো কোনো) জ্ঞান এবং সহিষ্ণুতা নেই।" ঈসা বললেন, "এটা কিভাবে সম্ভব?" আল্লাহ বলেন, "আমি তাদেরকে আমার জ্ঞান ও সহিষ্ণুতার অংশবিশেষ প্রদান করেছি।"

মক্কার ফাযাইল এবং বৈশিষ্ট্য

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা সকল শ্রেষ্ঠ ও উত্তম শহর এবং স্থানের মধ্য থেকে হারাম শরীফকে নির্বাচন করেছেন। আল্লাহ এ শহরটি তাঁর নাবী ﷺ-এর জন্য নির্বাচন করেছেন যেখানে হাজ্জ করাকে বান্দাদের জন্য ফরয করেছেন। দূরের এবং কাছের সকলের জন্য এখানে আগমন করাকে ফরয করেছেন। সকলেই এখানে নম্র, বিনীত, মাথা খোলা রেখে এবং দুনিয়াদার পোশাক বর্জন করে প্রবেশ করবে। একে নিরাপদ শহর বানিয়েছেন। যেখানে কোনো রক্তপাত করা হবে না এবং বৃক্ষকে কর্তন করা যাবে না। কোনো পশু শিকার করা যাবে না যেখানে কোন খালি স্থানে নির্জনতা অবলম্বন করা যাবে না এবং কোনো কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু নিজে নেয়ার জন্য কুড়ানো যাবে না। তবে ইশতেহারের উদ্দেশ্যে এমনটি করা বৈধ। সেখানে গমনকারীর গমন তার পূর্ববর্তী সকল অপরাধের কাফ্ফারা হয়ে যায় সহীহাইনে এসেছে, আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত ; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

من أتى هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه.

"যে এ ঘরে আসবে অতঃপর কোন অশ্লীলতা ও দুষ্কর্মে লিপ্ত হবে না সে সেখান থেকে এমতাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে যে, সে যেন আজই ভূমিষ্ঠ হয়েছে।"

সেখানে গমনকারীর প্রতিদান হলো জান্নাত।

সুনানের কিতাবসমূহে এসেছে যে, ইবনু মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে–

تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة.

www.waytojannah.com

Contents

"তোমরা হাজ্জ ও উমরা করো। কেননা হাজ্জ ও উমরা অভাব-অনটন এবং গুনাহসমূহকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যেমন হাপর লোহা ও স্বর্ণ-রুপার গাদ ও আবর্জনাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর মাকবুল হাজ্জের প্রতিদান কেবলই জান্নাত।"

সহীহাইনে আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

"এক উমরা থেকে অপর উমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সকল গুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ এবং মাকবুল হাজ্জের প্রতিদান কেবলই জান্নাত।"

সুতরাং হারাম শরীফ তথা মক্কা নগরী যদি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রিয় নগরী না হত তা হলে সেখানে গমন করাকে ফর্‌য বা আবশ্যকীয় করতেন না। মক্কা নগরীতে গমন করা ইসলামের একটি মৌলিক ফর্‌য। আল্লাহ আল-কুরআনের দু'জায়গায় এই পবিত্র ভূমির শপথ করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ.

"এই নিরাপদ শহরের শপথ।" (সূরাঃ ত্বীন- ৩)

অন্যত্র এসেছে–

لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ.

"এই নগরীর শপথ!" (সূরাঃ আল-বালাদ- ১)

পৃথিবীতে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে সামর্থ্যবানদের যাওয়া তওয়াফ করা আবশ্যক। রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ ব্যতীত পৃথিবীর বুকে এমন কোনো জায়গা নেই যাকে চুম্বন করা শরীয়ত স্বীকৃত এবং যেখানে গেলে পাপ মোচন হয়।

তাছাড়া মাসজিদুল হারামে নামাজ পড়লে একলক্ষ নামাজের সাওয়াব পাওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। সুনানে নাসায়ী এবং 'মুসনাদে' আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ্ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة.

"আমার এ মাসজিদে নামাজ পড়া অন্যান্য মাসজিদে এক হাজার (রাকাত) নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম, তবে মাসজিদে হারাম এর ব্যতিক্রম। কারণ, মাসজিদে হারামে নামাজ পড়া আমার এ মাসজিদে একশত নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম।"

হাদীসটি ইবনু হিব্বান তাঁর 'সহীহা'-তে সহীহ্ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। উল্লিখিত হাদীস থেকে মাসজিদে হারামের শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্ট তাই তো তার উদ্দেশে সফর করা ফর্‌য। আর অন্যান্য স্থানের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব। বেশির চেয়ে বেশি ওয়াজিব। মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী এবং নাসায়ীতে আব্দুল্লাহ ইবনু আদী ইবনু আলহামরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূল ﷺ-কে মক্কার হাজওয়ারাহ নামক স্থানে তাঁর সওয়ারীর উপর আরোহিত অবস্থায় বলতে শুনেছেন যে, "নিশ্চয়ই (হে হারাম নগরী,) তুমিই আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ভূমি এবং আল্লাহর নিকট তাঁর ভূমিসমূহের মাঝে সর্বাধিক প্রিয়। আমাকে তোমার থেকে বের করে

www.waytojannah.com

Contents

দেয়া না হলে আমি কখনো তোমার থেকে বের হতাম না।" ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্।

মক্কার বৈশিষ্ট্য এখানেই শেষ নয়। বরং এর বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি হলো, আল্লাহ এ নগরীকে সকলের কেবলা বানিয়েছেন। এ ছাড়া এখানে দ্বিতীয় কোনো কেবলা নেই। এ মাসআলায় বিশুদ্ধ মাযহাব হল, মক্কার এ বৈশিষ্ট্যে শহর, গ্রাম এবং নির্জন স্থানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দশের অধিক দলিলের কারণে যা আমি অন্যত্র উল্লেখ করেছি। যারা পার্থক্যের প্রবক্তা তাদের পক্ষে কোনো মজবুত দলিল নেই। এই স্বল্প পরিসরে উভয়পক্ষের দালিলিক আলোচনা সম্ভব নয়।

মক্কার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, মাসজিদে হারাম পৃথিবীর সর্বপ্রথম মাসজিদ। যেমনটি সহীহাইনে আবূ যার থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-কে পৃথিবীর সর্বপ্রথম মাসজিদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, পৃথিবীর সর্বপ্রথম মাসজিদ হলো 'মাসজিদুল হারাম'। আমি বললাম, "এরপর কোনটি?" তিনি বললেন, "মাসজিদুল আকসা।" আমি বললাম, এতদুভয়ের মাঝে কত দিনের ব্যবধান। উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, "চল্লিশ বছর।" এ হাদীসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যারা অজ্ঞ তারা হাদীসটি প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন, এ কথা সুপ্রসিদ্ধ যে, মাসজিদে আকসার নির্মাতা হলেন, সুলাইমান ইবনু দাউদ তাঁর মাঝে এবং ইব্রাহীমের মাঝে প্রায় হাজার বছরের বেশি ব্যবধান। এ উক্তি তার প্রবক্তাদের মূর্খতার পরিচায়ক। কারণ সুলাইমান মসজিদে আকসাকে নতুন করে নির্মাণ করেছেন। প্রথম নির্মাতা তিনি নন। বরং মসজিদে আকসার প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম। তিনি ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের কা'বা নির্মাণের পরে এটি নির্মাণ করেন।

মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার আরো একটি প্রমাণ হল, আল্লাহ মক্কাকে সকল নগরীর 'মা' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং বাকি সকল নগরী মক্কার অনুসারী আর মক্কা অনুসৃত। এ নগরী সকল নগরীর মূল। সুতরাং এর সমকক্ষ বা সমতুল্য কোনো নগরী হতে পারে না। বিষয়টি ঠিক এমন যেমনটি রাসূল ﷺ সূরা 'ফাতিহা' সম্পর্কে বলেছেন। তিনি তাকে উম্মুল কুরআন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এই কারণে ঐশী গ্রন্থে সূরা ফাতিহার সমতুল্য অন্য কোনো সূরা নেই।

মক্কার আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো, সেখানে ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করা বৈধ নয়। এ বৈশিষ্ট্যে অন্য কোন নগরী মক্কার সমতুল্য নয়। লোকেরা এই মাসআলাটি ইবনু আব্বাস (রা) থেকে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর থেকে দলিল হিসেবে পেশ করা যায় না এমন ইসনাদে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে–

لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها ومن غير أهلها.

"মক্কা ও অন্য নগরীর কেউ এখানে ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করতে পারবে না।"

হাদীসটি ইবনু আদী উল্লেখ করেছেন। তবে এই সূত্রে নয় বরং হাজ্জাজ ইবনু আরতাত এর সূত্রে এবং অন্যান্যরা দুর্বলদের থেকে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন।

উক্ত মাসআলায় ফেকাহবিদদের তিনটি উক্তি

সম্পূর্ণভাবে অবৈধ, বৈধ ও মীকাতে অবস্থানকারী এবং যে অবস্থানকারী নয় তাদের মধ্যে পার্থক্যকরণ। যে অবস্থানকারী নয় সে ইহরাম ব্যতীত সেখানে প্রবেশ করবে না। আর যে সেখানে পূর্ব থেকেই অবস্থান করছে সে মক্কবাসীর হুকুমে এবং এটাই ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর উক্তি। আর প্রথম উক্তি দুটি ইমাম শাফেয়ী এবং আহমাদের।

www.waytojannah.com

Contents

মক্কা নগরীর অন্য আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, সেখানে অন্যায়ের ইচ্ছা করলেই শাস্তি দেয়া হবে। যদিও সে অন্যায়ে লিপ্ত না হয়।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ.

"যে মাসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোনো ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব।" (সূরা: হাজ্জ- ২৫)

একটু ভেবে দেখুন, এ আয়াতে الإرادة ক্রিয়াকে কিভাবে باء বর্ণের দ্বারা متعدى করা হয়েছে। هم ক্রিয়ার অর্থ অন্তর্ভুক্ত হওয়া ব্যতীত اردت لكذا বলা বৈধ নয়। কেননা هممت بكذا-এর ব্যবহার পাওয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা করেছেন যারা সেখানে ধর্মদ্রোহী কাজের ইচ্ছা করেছে।

মক্কার আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে অন্যায়ের কারণে শাস্তির পরিমাণ বড় (অধিক)। তার ধরন দ্বিগুণ হয়ে থাকে। আমরা জানি শাস্তির বদলে শাস্তি। অন্যায় বড় হলে শাস্তি বড় হবে আর ছোট হলে শাস্তিও ছোট হবে। মাসজিদে হারামে অন্যায়ের শাস্তি পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার শাস্তির তুলনায় দ্বিগুণ। তাই তো বাদশাহের রাজপ্রাসাদের অন্যায়কারী এবং নিজের খাদেমের বিছানায় বা ঘরে অন্যায়কারী সমান নয়। এই পবিত্র ও নিরাপদ নগরীকে ভালোবাসা, হৃদয়ের আকর্ষণ ও আসক্তিতে এর নির্বাচন এবং বৈশিষ্ট্যের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। এই পবিত্র নগরীর হৃদয় আকর্ষণ লোহার চম্বুকের আকর্ষণের চেয়েও অনেক বেশি। কবির ভাষায় এই নগরী সর্বশ্রেষ্ঠ ও উন্নত–

مَحَاسِنُهُ هُيُولَى كُلِّ حُسْنٍ

وَمَغْنَاطِيسُ أَفْئِدَةِ الرِّجَالِ

এ পবিত্র ভূমির সৌন্দর্য, প্রত্যেক সৌন্দর্যের মূল এবং মানব হৃদয়সমূহের চম্বুক স্বরূপ।

এ কারণেই মহামহিয়ান আল্লাহ কা'বাগৃহকে মানুষের জন্য সম্মিলিত স্থান এবং শান্তির আলয় করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। মানুষ যত বেশি সেখানে গমন করবে ততই তার প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। কবি বলেন–

لا يَرْجِعُ الطَّرْفُ عَنْهَا حِينَ يَنْظُرُهَا

حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهَا الطَّرْفُ مُشْتَاقاً

"ঐ নগরীর দিকে তাকালে তার থেকে চোখের পলক পড়ে না। বরং তার দর্শনে দৃষ্টি আগ্রহের সঙ্গে বার বার সেদিকেই ফিরে যায়।"

আল্লাহর শোকর তাঁর জন্য কত মানুষ শহীদ হয়েছেন, হয়েছেন কারাবন্দী আর ক্ষতবিক্ষত। কতজন তার জন্য ধন-সম্পদ এবং নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন পরিবার-পরিজন ছাড়তে রাজি হয়েছেন এ সবই করেছেন ভালোবাসা ও আগ্রহভরা হৃদয়ে। আর তিনি এর থেকে স্বাদ আস্বাদন করতে থাকেন এবং একে মনোমুগ্ধকর নেয়ামতসমূহ, সৌখিন জীবন-যাপন এবং আনন্দ-বিনোদনের চেয়ে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট বলে মনে করেন। কবি বলেন–

www.waytojannah.com

Contents

وَلَيْسَ مُحِبًّا مَنْ يَعُدُّ شَقَاءَهُ

عَذَابًا إِذَا مَا كَانَ يَرْضَى حَبِيبُهُ

"সে প্রকৃত প্রেমিক নয় যে তার প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টির পরও নিজের দুঃখ-কষ্টকে দুঃখ মনে করে।"

এ সকল বক্তব্যই হলো, কা'বাগৃহকে আল্লাহ নিজের দিকে সম্বন্ধ করার রহস্য। যেমনটি আল্লাহ বলেন–

وَطَهِّرْ بَيْتِي.

"তোমরা আমার কা'বাগৃহকে পরিষ্কার করো।" (সূরা: হাজ্জ– ২৬)

সুতরাং এই বিশেষ সম্বন্ধকরণ বিশেষ সম্মানের দাবিদার হওয়ার কথা বুঝায়। যেমনি বান্দা এবং রাসূলদেরকে আল্লাহ নিজের প্রতি সম্বোধন করার কারণে তাদের মর্যাদাও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনি যেখানে মু'মিন বান্দাদেরকে তিনি নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। সেখানে মু'মিনদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। মোটকথা তিনি যে জিনিসকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন তার সম্মান-মর্যাদা এবং প্রশংসা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এমন সব সম্মানে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে যা সৃষ্টির অন্য কাউকে প্রদান করা হয়নি এবং এটি তাদের নির্বাচিত এবং মনোনীত হবার দলিল। অতঃপর তাদেরকে এ সম্বন্ধের পরে আরো এমন একটি সম্মানে সম্মানিত করেছেন যা সম্বন্ধের পূর্বে তাদের ছিল না। যারা এ বিষয়টিকে বস্তু, ধর্ম, কাল এবং স্থানের মধ্যে বরাবর বলে মনে করে তারা বিষয়টিকে বোধগম্য করতে সক্ষম হন নি। তারা মনে করেন এদের একটির অপরটির উপর কোনো সম্মান বা মর্যাদা নেই। এটি অগ্রাধিকারী বা প্রাধান্যমূলক কিছু ছাড়াই অগ্রাধিকার প্রদান করা ছাড়া বৈ কিছুই নয়। উক্তিটি মিথ্যা ও অবাস্তব হওয়ার চল্লিশটিরও অধিক কারণ আমি অন্যত্র উল্লেখ করেছি।

এই ভ্রান্ত, অসার ও অবাস্তব মতাদর্শের চিন্তা-চেতনা তার ভ্রান্তির জন্য যথেষ্ট। কারণ তাদের দাবি হলো, রাসূলের (ﷺ) ব্যক্তিসত্তা বস্তুত তার শত্রুদের ব্যক্তিসত্তার অনুরূপ। বৈশিষ্ট্য বা মর্যাদা এমন মর্যাদা বা গুণাবলী দ্বারা সত্তা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার কারণে নয় যা অন্যদের মাঝে পাওয়া যায় না। এমনিভাবে সত্তাগতভাবে ভূমির কোন মর্যাদা নেই ভূমি হিসেবে মর্যাদার ক্ষেত্রে সকলেই সমান। মর্যাদা শুধুমাত্র নেককর্ম সম্পাদনের উপর নির্ভর। সুতরাং মক্কা, বাইতুল্লাহ, মাসজিদে হারাম, মিনা, আরাফা এবং মাশায়ের ইত্যাদি স্থান অন্য স্থানের উপর শুধু সত্তাগত দিক দিয়ে মর্যাদামণ্ডিত হতে পারে না। মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য একটি ভিন্ন ও প্রাসঙ্গিক কারণে যার সাথে সেই ভূমির আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ তাদের এই অসার মতাদর্শের অসারতা প্রমাণে এবং ভ্রান্তির অপনোদন ও এর প্রতিউত্তরে ইরশাদ করেন–

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ.

"যখন তাদের কাছে কোনো আয়াত পৌঁছে তখন বলে, আমরা কখনই মানব না যে পর্যন্ত না আমরাও তা প্রদত্ত হই– যা আল্লাহর রাসূলগণ প্রদত্ত হয়েছেন।" (আল-আনআম– ১২৪)

আল্লাহ এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গম্বর প্রেরণ করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই তাঁর রিসালাত বহনে সক্ষম নয় বরং এর জন্য একটি যোগ্য ও যথার্থ পাত্র রয়েছে এবং এই স্থান বা পাত্র সম্পর্কে আল্লাহ সুপরিজ্ঞাত। প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তা যদি সমান ও বরাবর হত যেমনটি তারা বলেছে। তবে আল্লাহ এমনটি কখনোই ইরশাদ করতেন না। অন্যত্র ইরশাদ করেন–

www.waytojannah.com

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ.

"আর এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি যাতে বলে যে, এদেরই কি আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহর স্বীয় অনুগ্রহ দান করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন?" (সূরা: আল-আনআম- ৫৩)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর নিয়ামাতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত। তাই তিনি তাকে বিশেষ মর্যাদায় মর্যাদামণ্ডিত করেছেন। আর অকৃতজ্ঞকে তিনি এ সম্মান ও মর্যাদায় সম্মানিত করেননি। সুতরাং যে সত্তা, স্থান, কাল ও ব্যক্তিকে তিনি মনোনীত করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন তাদের ব্যক্তিসত্তা অন্যান্যদের ব্যক্তিসত্তার অনুরূপ হতে পারে না। এ কারণেই তো তিনি তাদের বাছাই করেছেন। সৃষ্টি তাঁর; সুতরাং বাছাই ও নির্বাচনের অধিকারও শুধুই তাঁর।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ.

"আপনার প্রভু যেমনটি ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং যাকে চান নির্বাচিত করেন।" (সূরা কাসাস- ৬৭)

বাইতুল্লাহ তথা মাসজিদে হারামের মর্যাদা অন্যান্য স্থানের সমতুল্য, হাজরে আসওয়াদ মর্যাদার দিক দিয়ে অন্যান্য পাথর সমতুল্য এবং রাসূলের ﷺ সত্তা অন্য মানুষের সত্তার মতো, এধরনের বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের অসারতা ও অবাস্তবতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

এ জাতীয় অনেক অসার বক্তব্যের দ্বারা ধর্মতত্ত্ববিদগণই শরীয়তকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এবং অযৌক্তিক অসার ও অবাস্তব বক্তব্য পূত-পবিত্র শরীয়তের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন। ব্যাপক ও সাধারণ বিষয়ে সকল সত্তা শরীক এর চেয়ে বেশি দলিল তাদের কাছে নেই। আর এটা প্রকৃতিতে এক হওয়াকে আবশ্যক করে না। কারণ, ভিন্ন ও বিপরীত বস্তুসমূহেরও অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিসত্তার গুণাবলীতে ভিন্নতর সঙ্গে সাধারণ ও ব্যাপক বিষয়ে একত্রিত হওয়া সম্ভব। আল্লাহ কখনো মৃগনাভির সত্তা এবং পেশাবের সত্তার মাঝে সমন্বয় করেননি। করেননি আগুন ও পানির সত্তার মাঝে সমন্বয়। মক্কা ও অন্যান্য স্থানের মধ্যকার পার্থক্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এমনিভাবে মূসা আলাহিস সালামের ব্যক্তিসত্তা ও ফেরাউনের ব্যক্তিসত্তার মধ্যকার ব্যবধান মেশক ও মলের ব্যবধানের চেয়েও সুস্পষ্ট। এমনিভাবে স্বয়ং বাইতুল্লাহর এবং বাদশাহের রাজপ্রাসাদের ব্যবধানও অনেক অনেক গুণে বেশি। সুতরাং ইবাদত যিকির আয্কার এবং দাওয়াতকে কেন্দ্র করে হাকীকাত ও মর্যাদায় উভয় স্থান ও ভূমিকে এক বলা কিভাবে সম্ভব?

এখানে তাদের ঐ অসার বক্তব্যের বিস্তারিত খণ্ডন বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু চেয়েছি একটি চিত্র তুলে ধরতে। বিস্তারিত খণ্ডনের ভার বুদ্ধিমান বিচারক পাঠকের কাছে অর্পণ করছি। আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় বান্দারা আল্লাহ ব্যতীত কখনো কোনো জিনিসকে ভয় করে না। আল্লাহ কোন জিনিসকে এমনি এমনিই সম্মানিত ও মনোনীত করেন না বরং এর পিছনে থাকে এক রহস্য। হ্যাঁ, তিনিই বস্তুকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন এবং তিনিই তাকে সৃষ্টি করেছেন। আর সৃষ্টির পরে নির্বাচিত করেছেন। আর আপনার প্রভু যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন ও নির্বাচিত করেন।

www.waytojannah.com

Contents

যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখের ফযীলত

পূর্বের ন্যায় কতিপয় দিবস ও মাসকেও তিনি অন্যান্য দিবস ও মাসের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ দিবস হলো, কুরবানীর দিবস। একে "হাজ্জুল আকবার" এর দিবসও বলা হয়। সুনানের কিতাবসমূহে এসেছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন–

أفضل الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر.

"আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় দিবস হলো, কুরবানীর দিবস এরপর কার্‌র এর দিবস।"

অনেকের মতো আরাফার দিবস এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের মাঝে এটাই বেশি প্রসিদ্ধ। তাদের বক্তব্য হলো, "কারণ এ দিবসটি হলো, 'হজ্জুল আকবারের' দিবস এবং এ দিবসে রোযা রাখলে ৬০ বছরের গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলা এ আরাফার দিবসে অন্যান্য দিবসের তুলনায় বেশি মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রদান করেন। তাছাড়া এ দিবসে আল্লাহ তাঁর বান্দার খুব নিকটে চলে আসেন। ফেরেশতারা আরাফার ময়দানে অবস্থানকারীদের নিয়ে গর্ব করেন। তবে প্রথম উক্তিটিই সর্বাধিক সঠিক। কারণ প্রথম উক্তি খণ্ডন করার মত কোন হাদীস নেই। আর সঠিক হলো, 'হাজ্জুল আকবারের' দিবসই হলো, কুরবানীর দিবস। কেননা আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ.

"আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে।" (সূরা: আত্-তাওবাহ- ৩)

সহীহাইনে এসেছে যে, আবূ বকর ও আলী (রা) কুরবানীর দিবসে এ ঘোষণা প্রদান করেন। আরাফার দিবসে নয়।

সুনানে আবূ দাউদে সহীহ্ সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন–

يوم الحج الأكبر يوم النحر.

" 'হজ্জুল আকবারের' দিবসটি হলো, কুরবানীর দিবস।" এমনটি বর্ণনা করেছেন আবূ হুরাইরাহ্ (রা) ও সাহাবাদের একটি জামাত। আরাফার দিবস হলো, কুরবানীর দিবসের ভূমিকা স্বরূপ। কারণ আরাফার দিবসে উকূফ তথা অবস্থান করতে হয়, তাওবা, ইস্তিগফার অনুনয়-বিনয় এবং কাকুতি মিনতি করতে হয়। এরপর কুরবানীর দিবসে বেফাদা ও তাওয়াফে যিয়ারত করতে হয় এবং মক্কায় আগমন ও যিয়ারত করতে হয়। আর এ কারণেই এ দিনের তাওয়াফকে তাওয়াফে যিয়ারত বলা হয়। কেননা হাজীরা আরাফার দিবসে তাদের সকল পাপ থেকে ধুয়ে মুছে পবিত্র হয়ে গেছে। এখন তাদের প্রতিপালক কুরবানী তথা নহরের দিবসে তাঁর যিয়ারত করার এবং তাঁর গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেছেন। আর এ কারণেই এ দিবসে পশু কুরবানী মাথা মুণ্ডানো রমমিল জিমার এবং হাজ্জের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিধান পালন করা হয়ে থাকে। আরাফার দিবসের কাজগুলো কুরবানীর দিবসের উদ্দেশ্যে পবিত্রতা অর্জন ও গোসল করে প্রস্তুত হওয়ার মত। অন্যান্য দিবসের উপর যিলহাজ্জের দশ তারিখের মর্যাদা এবং বৈশিষ্ট্যও ঠিক এমনই। কারণ এ দিবসটি আল্লাহর নিকট অন্যান্য দিবসের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

সহীহ্ বুখারীতে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر.

www.waytojannah.com

Contents

"আল্লাহর নিকট এই দশ দিনে ইবাদত করার চেয়ে অধিক প্রিয় কোনো নেক আমল নেই।"

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও কি এর সমতুল্য নয়? রাসূল ﷺ বললেন, না, আল্লাহর রাস্তার জিহাদও এর সমতুল্য বা সমকক্ষ নয়।

ولا الجهاد فى سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشىء.

"তবে হ্যাঁ, আল্লাহর নিকট এর চেয়েও অধিক প্রিয় নেক আমল হলো, ঐ ব্যক্তির আমল যে, তার জান-মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বেরিয়ে পড়েছে এবং সেখান থেকে কোনো কিছু নিয়ে আর ফিরে আসেনি।" এই দশটি দিনের শপথ করে আল্লাহ আল-কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَالْفَجْرِ . وَلَيَالٍ عَشْرٍ.

"শপথ ফজরের। শপথ দশ রাত্রির।" (সূরা: আল-ফাজর– ১-২)

এ কারণেই এই দিনগুলোতে বেশি বেশি 'আল্লাহু আকবার', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল-হামদুলিল্লাহ' ইত্যাদির যিক্‌র করতে হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد.

"তোমরা এ দিবসগুলোতে বেশি বেশি 'তাকবীর', 'তাহলীল' এবং 'আল্লাহর প্রশংসা' করতে থাকো।"

এই দিবসগুলোর ন্যায় অন্যান্য মাসের উপর রমযান মাসের মর্যাদা অন্যান্য রাতের উপর রমযানের শেষ দশদিনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং হাজার রজনীর উপর লাইলাতুল কদরের বৈশিষ্ট্যও ঠিক অনুরূপ।

ক্বদরের ও মি'রাজ রজনীর মধ্যকার শ্রেষ্ঠত্বে প্রতিযোগিতা

যদি আপনি প্রশ্ন করেন, যিলহজ্জ মাসের শেষ দশদিন এবং রমযানের শেষ দশ দিনের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? এবং লাইলাতুল ক্বদর এবং লাইলাতুল ইসরার মধ্যে কোন রাত্রটি অধিক উত্তম?

উত্তরে আমি বলব, প্রথম প্রশ্নে সঠিক হলো, একথা বলা যে, রমযানের শেষ দশদিনের রজনী যিলহাজ্জ মাসের শেষ দশ দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং যিলহাজ্জ মাসের শেষ দশ দিন রমযানের শেষ দশদিন দিন অপেক্ষায় উত্তম। এখান থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, রমযান মাসের শেষ দশ দিনের রাত্রিকে লাইলাতুল ক্বদরের কারণে মর্যাদামণ্ডিত করা হয়েছে এবং লাইলাতুল ক্বদর রাত্রে হয়ে থাকে। আর যিলহজ্জ মাসের শেষ দশককে দিন হিসেবে মর্যাদামণ্ডিত করা হয়েছে। কারণ এ দিনগুলোতে ইয়াওমুল আরফাহ, ইয়াওমুল নহর এবং ইয়াওমুত তারবিয়ার মত মর্যাদাপূর্ণ দিনগুলো পালিত হয়।

বাকি রইল দ্বিতীয় প্রশ্ন, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এক ব্যক্তি এ কথা বলেছে যে, মিরাজের রজনী লাইলাতুল ক্বদরের চেয়ে ফযীলতপূর্ণ এবং অপর জন বলে, না বরং লাইলাতুল ক্বদর সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ। এদের মধ্যে কার বক্তব্য সঠিক?

তিনি উত্তর দিলেন, আল-হামদুলিল্লাহ প্রশ্নকারী যদি তার প্রশ্ন দ্বারা এ কথা উদ্দেশ্য নেয় যে, রাসূল ﷺ-এর মিরাজে গমন করার দিবসটি এবং প্রতি বছরের ঐ রাত্রিটি উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য লাইলাতুল ক্বদরের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং এই রজনীতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা দু'আ এবং কান্নাকাটিতে লিপ্ত থাকা

www.waytojannah.com

Contents

ক্বদরে রজনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ তবে এটি ভুল হবে। কোনো মুসলমান কখনো একথা বলেনি। এটা একটি ধর্মবিরোধী আসার বক্তব্য এই বক্তব্যটি তখনই যুক্তিসঙ্গত হতো যখন লাইলাতুল ইসরা নির্দিষ্ট হতো। অথচ তা নির্দিষ্ট নয়। তা হলে লাইলাতুল ইসরাকে কিভাবে শ্রেষ্ঠ বলা সম্ভব? শরীয়তের এমন কোনো দলিল বা প্রমাণ নেই যাতে দ্বারা লাইলাতুল ইসরা কোন মাসে হয়, কোন দশকে বা কোন দিনে হবে তা নির্দিষ্ট রয়েছে। বরং এক্ষেত্রে এমন সব বিভিন্ন প্রকারের বিচ্ছিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায় যার ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন হয় না। আর ক্বদরের রজনী ছাড়া মুসলমানদের জন্য লাইলাতুল ইসরা বলা হয় এমন কোনো রজনীকে জাগ্রত থেকে ইবাদতের নির্দেশ করা হয়নি। তবে ক্বদরের রজনীর বিষয়টি সহীহাইনে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন–

تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.

"তোমরা রমযানের শেষ দশকে লাইলাতুল ক্বদর অন্বেষণ করো।"

সহীহাইনে রাসূল ﷺ থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে–

من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه.

"যে ব্যক্তি ক্বদরের রজনীতে বিশ্বাস এবং সাওয়াবের প্রত্যাশায় রাত্র জেগে ইবাদাত করবে তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

আল্লাহ এ রজনীটিকে হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন এবং এই রজনীতেই তিনি পবিত্র কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছেন। তবে প্রশ্নকারী যদি লাইলাতুল ইসরাকে কোনো ইবাদতের সঙ্গে খাস না করে কেবল এই রজনীর বৈশিষ্ট্যের উপর সীমিত রাখে এবং বলে, এ রজনীতে রাসূল ﷺ-কে এমন এমন মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে, তা হলে এতে কোনো সমস্যা নেই। আর আল্লাহ তাঁর নাবীকে কোন স্থানে বা কোনোকালে বৈশিষ্ট্য প্রদান করলে ঐ স্থান বা কালটি অন্যান্য সকল স্থান এবং কালের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়া আবশ্যক নয়। এ কথাগুলো ঐ সময়ই হবে যখন এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, রাসূল ﷺ-কে লাইলাতুল ইসরাতে যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে সম্মানিত এবং নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে তা ক্বদরের রজনীতে কুরআন অবতীর্ণ এবং এ রজনীর অন্যান্য নিয়ামাতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য বস্তুকুলের প্রকৃতির জ্ঞান সম্পর্কে অবগতি আবশ্যক। আবশ্যক নিয়ামাতরাজির পরিমাণ সম্পর্কেও ধারণা থাকা যা ওহী ছাড়া সম্ভব নয়। কারো জন্য জ্ঞান ব্যতীত এ বিষয়ে মুখ খোলাও জায়িয নেই। মুসলমানদের কেউ ইসরার রজনীকে অন্যান্য রজনীর উপর প্রাধান্য দিয়েছে বলে আমার জানা নেই। বিশেষ করে লাইলাতুল ক্বদরের উপর প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি আমার একেবারেই অজানা। সাহাবীগণ এবং তাদের পূর্ণ অনুসারী তাবিয়ীদের কেউ-ই 'লাইলাতুল ইসরা'কে কোন জিনিস দ্বারা বিশেষিত করেন নি এবং এ ব্যাপারে তারা তেমন আলোচনাও করেন নি। তাই তো ইসরার রজনী কোনটি এটাই জানা যায় না। যদিও ইসরা রাসূল ﷺ-এর অন্যতম ফযীলাত ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়। তদুপরি এই রজনীতে কোন ইবাদাতের বিধান দিয়ে কোনভাবেই বিশেষায়িত করা হয়নি। বরং হেরা গুহা যেখান থেকে প্রত্যাদেশের সূচনা শুরু সেখানে নাবী ﷺ নাবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে ধ্যানমগ্ন থাকতেন এরপর মক্কায় বসবাসকালীন সময়ে না তিনি সেখানে গিয়েছেন না তাঁর সাহাবীগণ। ওহী অবতীর্ণের সূচনার দিনকেও কোনো ইবাদতের দ্বারা বিশেষায়িত করেন নি। ওহী অবতীর্ণের স্থান এবং সময়টিকেও বিশেষ ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করেন নি। এ মর্যাদার কারণে কোনো স্থান বা কালকে নিজের মনগড়া ইচ্ছেমত কোন

www.waytojannah.com

Contents

ইবাদাত বা উপাসনার জন্য নির্ধারিত করে নেয়া ঠিক সেসব আহলে কিতাবদের মত যারা ঈসাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময় ও কালকে ইবাদাতে পরিণত করেছে। যেমন, জন্মদিন, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ইত্যাদি ইত্যাদি।

উমার কতিপয় ব্যক্তিকে একস্থানে নামাজ আদায় করতে দেখে বললেন, "কী হয়েছে তোমরা এখানে কী করছ?"

তারা বলল, "এখানে রাসূল ﷺ নামাজ পড়েছিলেন (তাই আমরা এখানে নামাজ পড়ছি)।"

প্রতিউত্তরে উমার (রা) বললেন, "তোমরা কি তোমাদের নবীর নিদর্শনাবলীকে মসজিদ বানিয়ে ফেলবে? তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে।" এখানে আসার পরে কারো উপর নামাজ ফরয হয়ে গেলে সে শুধু এখানে নামাজ পড়তে পারবে অন্যথায় সে এখানে নামাজ পড়বে না।

অনেকে বলেছেন, রাসূল ﷺ-এর নিকট লাইলাতুল ইসরা লাইলাতুল কদরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর তাঁর উম্মাতের জন্য লাইলাতুল কদর লাইলাতুল ইসরার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং কদরের রজনী এ উম্মাতের জন্য মর্যাদাপূর্ণ আর মিরাজের রজনী রাসূল ﷺ-এর জন্য ফাযীলাতপূর্ণ।

হাজ্জুল আকবারের ফাযীলাত

যদি প্রশ্ন করা হয়, জুমু'আর দিবস শ্রেষ্ঠ নাকি আরাফার দিবস? আবূ হুরাইরাহ (রা) থেকে ইমাম ইবনু হিব্বান তাঁর 'সহীহতে' একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ হুরাইরাহ (রা) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন:

لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة.

"যেসব দিবসের উপর দিয়ে সূর্যোদয় হয় এবং অস্ত যায় সেসব দিবসগুলোর মাঝে জুমু'আর দিবস সর্বশ্রেষ্ঠ।"

বলা হয়, কিছু আলেমগণের মতে আরাফার দিনের চেয়ে জুমু'আর দিবস সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তারা দলিল হিসেবে এ হাদীস উল্লেখ করেন এবং কাযী আবূ ইয়ালা ইমাম আহমাদ থেকে এমন আরো একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। তবে সঠিক কথা হলো, জুমুআর দিবসটি সপ্তাহের অন্যান্য দিবসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর ইয়াওমুল আরাফা এবং ইয়াওমুন নাহার বছরের দিনগুলোর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। লাইলাতুল কদর এবং লাইলাতুল জুমু'আর বিষয়টিও এমন। আর এ কারণেই আরাফার দিবস এবং জুমু'আর দিবস একত্রে হলে ঐ দিনটি বছরের সকল দিনের সেরা এবং নিম্নোক্ত কারণে সবচেয়ে বেশি ফাযীলাতপূর্ণ:

১. বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ দুটি দিবস একত্র হওয়ার কারণে।
২. দিবসটিতে এমন একটি সময় রয়েছে যে সময় দু'আ কবুল করা হয়। অধিকাংশ আলেমদের মতে সে সময়টি হলো, আসরের পরের সময়। তাছাড়া আরাফাতে অবস্থানকারীদের সকলেই সেসময় দু'আ এবং কাকুতি মিনতির জন্য আরাফার ময়দানে অবস্থান করেন।
৩. দিবসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাজ্জের দিবসের অনুরূপ হওয়ায়।
৪. এ দিবসটিতে খুতবাহ শ্রবণ এবং জুমু'আর নামাজের উদ্দেশ্যে বিশ্বের দূর-দূরান্ত হতে লোকেরা আগমন করে থাকে আর এটি আরাফার দিবসে আরাফার ময়দানে আরাফায়ে অবস্থানকারীদের সমাগমের অনুরূপ। সুতরাং মাসজিদসমূহে মুসলমানদের সমাগমের কারণে দু'আ এবং কান্নাকাটি করার এমন একটি সুযোগ লাভ হয় যা অন্যান্য দিনে সম্ভব হয় না।

www.waytojannah.com

৫. জুমু'আর দিবসটি হলো, ঈদের দিবস আর আরাফার দিবসটি আরাফায় অবস্থানকারীদের জন্য ঈদের দিবস। এ কারণেই আরাফার দিবসে রোযা রাখা মাকরূহ। নাসায়ী শরীফে আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফার দিবসে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। হাদীসটির সানাদে সমস্যা আছে। কারণ সানাদের মাহদী ইবনু হারব আবদী নামক রাবী প্রসিদ্ধ নয়। আর হাদীসটির মাদারও তিনি। তবে সহীহতে উম্মুল ফযল থেকে ভিন্ন একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একদল লোক তার সামনে আরাফার দিবসে রাসূল ﷺ-এর রোযা নিয়ে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। তাদের একদল কেউ বলল, তিনি রোযা রেখেছেন। অন্যরা বলল, তিনি রোযা রাখেন নি। অতঃপর উম্মুল ফযল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি দুধ ভর্তি পেয়ালা পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটের পিঠে আরাফার ময়দানে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর তিনি সেই দুধ পান করলেন।"

আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে রোযা না রাখা মুস্তাহাব হওয়ার কারণ নিয়ে মতানৈক্য আছে। একদল বলেন, যাতে দু'আয় শক্তি সঞ্চার হয়। উক্তিটি খিরাকী এবং অন্যান্যদের। অন্যান্যদের মতে, তাদের মধ্যে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রয়েছেন। কারণ, দিনটি আরাফায় অবস্থানকারীদের জন্য ঈদের দিন। সুতরাং তাদের জন্য এ দিনে রোযা না রাখা মুস্তাহাব। আর এর দলিল হলো, সুনানের নিম্নোক্ত হাদীসটি।

রাসূল ﷺ বলেছেন–

يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام منى عيدنا أهل الإسلام.

"হে মুসলমানগণ, আরাফার দিনে, কুরবানীর দিন এবং মীনার দিনগুলো আমাদের মুসলমানদের ঈদের দিন।"

শাইখ ইবনু তাইমিয়্যাহ (র) বলেছেন, আরাফার দিনটি আহলে আরাফাদের জন্য ঈদের দিন। সেখানে তাদের সমাগম হওয়ার কারণে। তবে এটি অন্যান্য শহরের লোকদের ঈদের দিন নয় বরং তাদের জন্য ঈদের দিন হলো, কুরবানীর দিন। যাই হোক, যে দিনে আরাফা ও জুমু'আর দিন একত্রিত হবে সেদিনে কেমন যেন দুটি ঈদের দিন একত্রিত হলো।

৬. দিনটি আল্লহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে দিবসে তাঁর দীন এবং নিয়ামাতসমূহকে পরিপূর্ণ করেছেন সে দিনটির অনুরূপ। বুখারীতে তারিক ইবনু শিহাব এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন ইয়াহুদী উমার ইবনুল খাত্তাবের নিকট এসে বলল, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবে এমন একটি আয়াত আছে যা আপনারা পাঠ করেন। আমাদের ইহুদীদের উপর যদি আয়াতটি অবতীর্ণ হতো এবং আমরা জানি আয়াতটি কবে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে আমরা দিনটিকে ঈদের দিন মনে করতাম।" উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "কোন আয়াতটির কথা বলছ?" সে বলল–

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً.

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা: আল-মায়িদাহ- ৩)

www.waytojannah.com

Contents

অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব বললেন, আয়াতটি কখন কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে আমি অবগত। আয়াতটি জুমু'আর দিন আরাফার ময়দানে রাসূল ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আর আমরা তখন তাঁর সাথে আরাফায় অবস্থান করছিলাম।

৭. দিনটি জামউল আকবার এবং আলমাওকিফুল আ'যমের দিনের অনুরূপ। কেননা জুমু'আর দিবসে কিয়ামাত প্রতিষ্ঠিত হবে। যেমনটি রাসূল ﷺ বলেছেন–

خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق ادم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه.

"সূর্য যেসব দিনের উপর উদিত হয় তার মাঝে জুমু'আর দিন সর্বোত্তম। এ দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এই দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে এবং এ দিনেই কিয়ামাত সংঘটিত হবে। দিনটিতে এমন একটি মুহূর্ত আছে সে সময় আল্লাহর কোনো মুসলমান বান্দা তাঁর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাকে তা প্রদান করেন।"

এ কারণে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য একটি দিনে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ দিনে তাঁরা ইহকাল-পরকাল এবং জান্নাত-জাহান্নাম নিয়ে ভাববে এবং এই উম্মাতের জন্য জুমু'আর দিনটিকে নির্বাচন করেছেন। কারণ এ দিনেই মানব সৃষ্টি হয়েছে এবং এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর এ কারণে রাসূল ﷺ জুমুআর দিন ফজরের নামাজে সূরা (সিজদা) এবং 'হাল আতা আলাল ইনসান' তিলাওয়াত করতেন। কারণ এ দিনে কী হবে বা কী হয়েছে এর বিস্তারিত আলোচনা সূরা দু'টিতে রয়েছে। যেমন আদমের সৃষ্টি, সৃষ্টির শুরু-শেষের আলোচনা এবং জান্নাত-জাহান্নামে প্রবেশের আলোচনা ইত্যাদি। এ কারণে রাসূল ﷺ তাঁর উম্মাতকে এ দিনে কী ঘটেছে এবং কী ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিতেন। এমনিভাবে মানুষ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থানের স্থান আরাফার ময়দানে বসে এই দিনেই আবার মহান প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার বিষয়টি শিক্ষা গ্রহণ করে।

৮. সপ্তাহের অন্যান্য দিনের চেয়ে জুমু'আর দিন এবং রাতে মুসলমানগণ বেশি বেশি আমল করে থাকেন এমনকি অধিকাংশ পাপীষ্ঠরাও জুমু'আর দিন এবং রাত্রকে সম্মান করে, আর মনে করে এ দিনে যে অন্যায়ে লিপ্ত হবে আল্লাহ তাকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দিয়ে দেন। বিষয়টি তাদের নিকট প্রসিদ্ধ এবং অভিজ্ঞতার আলোকে পরীক্ষিত। আর এটা কেবল দিনটি আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান এবং সম্মানিত হওয়ার কারণে। অন্যান্য দিন থেকে এ দিনটিকে নির্বাচন করার কারণে। নিঃসন্দেহে এ দিনের একটি সময় অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক অনেক শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান।

৯. এ দিনটি জান্নাতের ইয়াওমুল মাযীদের অনুরূপ। ইয়াওমুল মাযীদ হলো সেই দিন যেদিন আফয়ি উপত্যকায় সকল জান্নাতীদের সমবেত করা হবে। তাদের জন্য মেশকের টিলার উপর, মতি, স্বর্ণ নীলকান্তমণি এবং পীতবর্ণের মণির মিম্বর নির্মাণ করা হবে। অতঃপর তারা তাদের মহান প্রতিপালককে দর্শন করবে। তিনি তাদের সম্মুখে প্রকাশিত হবেন। অতঃপর তারা তাঁকে প্রকাশ্য দেখতে পাবে। তাদের মাঝে যে সর্বাগ্রে মাসজিদে গমন করতো সে

www.waytojannah.com

Contents

সেখানে সর্বাগ্রে প্রবেশ করবে এবং যে মাসজিদে ইমামের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হতো সে হবে সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী। জান্নাতীগণ জান্নাতে এই সম্মানের আশায় এই ইয়াওমুল মাযীদের অপেক্ষায় থাকবে। আর এ দিনটি হলো, জুমু'আর দিন। সুতরাং যখন আরাফা ও জুমু'আর দিন একদিনে হবে তবে সে দিনটি অন্যান্য দিনের চেয়ে অত্যাধিক মর্যাদার অধিকারী হবে।

১০. আরাফার দিনের সন্ধ্যায় আল্লাহ আরাফার ময়দানে অবস্থানকারীদের নিকট নেমে আসেন। ফেরেশতাদের উপর তাদেরকে নিয়ে গর্ব করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন–

ما أراد هولاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم.

"তারা কী চায়, তোমরা সাক্ষ্য থাক, আমি তাদের সকল গুনাহকে ক্ষমা করে দিলাম।"

এ দিনে এমন একটি সময় আছে যাতে কোন মানুষ আল্লাহর নিকট কোনো কল্যাণ কামনা করলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয় না। আর লোকেরা এ সময়ে দু'আ এবং আহাজারির মাধ্যমে আল্লাহর অতিনিকটবর্তী হয়ে যায়। আর এ সময় তারা আল্লাহর দু'টি বিশেষ নৈকট্য অর্জন করে–

ক. সে সময় সুনিশ্চিতভাবে দু'আ কবুল হয়;

খ. আরাফায় অবস্থানকারীদের নিকট তাঁর বিশেষ অবতরণের নৈকট্য এবং ফেরেশতাদের উপর তাদের নিয়ে গর্ব করার নৈকট্য।

এ সকল কারণে মু'মিনদের হৃদয় কেঁপে উঠে এবং ধীরে ধীরে আরো মজবুত হতে থাকে। বৃদ্ধি পেতে থাকে অনন্ত উল্লাস এবং উচ্ছলতা। আর এসব কারণেই জুমু'আর দিন অন্যান্য দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

জুমু'আর দিন ৭২টি হাজ্জের সমতুল্য বলে লোকমুখে যে কথা প্রসিদ্ধ এটি একটি অবাস্তব কথা রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেঈদের কারো থেকে এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় না। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানী।

যেসব আ'মাল ইত্যাদিকে আল্লাহ নির্বাচন করেছেন

উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির মধ্য থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতর জিনিসকে নিজের জন্য মনোনীত করেছেন অন্য কিছুকে নয়। কেননা আল্লাহ নিজে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র তাই তিনি শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র বস্তুকে নিজের জন্য পছন্দ করেছেন। তিনি কাজকর্ম, কথাবার্তা এবং দান-সদকার মধ্যে যেটা ভালো এবং শ্রেষ্ঠ সেটাকেই কেবল গ্রহণ করেন সুতরাং প্রত্যেক জিনিসের মাঝে যেটা ভালো এবং যেটা শ্রেষ্ঠ সেটাই আল্লাহর নির্বাচিত মনোনীত এবং পছন্দের বস্তু।

সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ ভালো-মন্দ উভয়টাই সৃষ্টি করেছেন। এর থেকে মানুষও যে ভালো খারাপ হয় সেটাও বুঝে আসে। ভালো মানুষ শুধু ভালো জিনিসকেই ভালোবাসে। এতে সে অনোন্যপায় তার হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে এবং এ ভালো জিনিসকে নিয়ে যে বেঁচে থাকতে চায়। আল্লাহ কালাম (বাক্য) সৃষ্টি করেছেন। আর সৎবাক্যেই কেবল তাঁর দিকে আরোহণ করে। তিনি অশ্লীল কথাবার্তাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন। ঘৃণা করেন রসনার নোংরামি, কটুবাক্য মিথ্যা বলা, গীবত করা, পরনিন্দা করা, কুৎসা রটনা, মিথ্যা অপবাদ এবং প্রত্যেক অশ্লীল কথাবার্তাকে। এমনিভাবে তিনি কেবল ভালো আমলকেই পছন্দ

www.waytojannah.com

করেন। অর্থাৎ এমন আমলকেই কেবল গ্রহণ করেন যা সুস্থ প্রকৃতি এবং শরীয়ত সমর্থিত এবং সুস্থ বিবেক যার পবিত্রতার ঘোষণা দিয়েছে। সব সৌন্দর্যের বিষয়ে বুদ্ধি-বিবেক শরীয়ত এবং প্রকৃতি একমত, উদাহরণত এক আল্লাহর ইবাদাতকারী তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের প্রবৃত্তির উপর প্রাধান্য দেয়া। তাঁর নিকট প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করা। যথাসম্ভব তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে সদাচারণ করা। অতঃপর তাদের সঙ্গে এমন আচরণ করা যেমনটি নিজে তাদের থেকে প্রত্যাশী। তাদেরকে ঐ নামে ডাকা যে নামে তারা তোমাকে ডাকুক বলে তুমি পছন্দ করো। নিজের জন্য যে কল্যাণের আশা করো তাদের জন্য সে কল্যাণের আশা করো। তাদের জন্য এমন বিচার করা যে বিচারের তুমি তাদের থেকে আশাবাদী। তাদের দেয়া সকল কষ্টকে সহ্য করা তাদের কখনো কষ্ট না দেয়া। তাদের সম্মান নষ্ট হবে এমন জিনিস থেকে নিজেকে বিরত রাখা, তাদের থেকে কোনো সৎকর্ম দেখলে তা প্রকাশ করা আর কোন অন্যায় অপরাধ দেখলে তা গোপন করা। শরীয়ত বহির্ভূত নয় এমন কর্মে লোকদের ওযর আপত্তি কবুল করা। আল্লাহর কোনো আদেশ নিষেধের বিরোধিতা না করা। আল্লাহর প্রিয় আরো কিছু চরিত্র রয়েছে যেমন, সহনশীলতা, গাম্ভীর্যতা, ধীরস্থীরতা, দয়া-অনুকম্পা, ধৈর্য, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, সহজ সাধ্যতা, নরম প্রকৃতি, সত্য বলা, হিংসা-বিদ্বেষ গোপন শত্রুতাকে ঘৃণা করা, প্রতারণা করা ইত্যাদি গুনাহ থেকে অন্তরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। বিনয়ী হওয়া ঈমানদার এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করা, আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়া গাইরুল্লাহর সম্মুখে অবনত হওয়া থেকে নিজেকে হেফাজত করা এবং চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, বীরত্ব, দানশীলতা, বদান্যতা এবং প্রত্যেক ঐ চরিত্র যার সৌন্দর্যের ব্যাপারে শরীয়ত প্রকৃতি এবং বিবেক বুদ্ধি একমত ইত্যাদি। এমনিভাবে খাবারের ক্ষেত্রেও আল্লাহ শুধু ভালো খাবারকেই মনোনীত করেছেন। ভালো ও পবিত্র খাবার হলো এমন খাবার যেটা হালাল। স্বাস্থ্যকর, তৃপ্তিদায়ক এবং দেহ ও আত্মার জন্য সর্বোত্তম পুষ্টিদায়ক। এমনিভাবে শুধু বিবাহ, সুগন্ধি এবং সঙ্গী গ্রহণের ক্ষেত্রেও তিনি কেবল প্রিয় ও ভালোকেই গ্রহণ করেন।

সুতরাং তাঁর সঙ্গী ও সহচরগণ হন পবিত্র তাদের দেহ হয় পূত-পবিত্র। পবিত্র হয় তাদের রূহ, চরিত্র, কাজকর্ম, কথাবার্তা, খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছেদ, বিবাহশাদী, আখলাক-চরিত্র, চলাফেরা, আসা-যাওয়া এবং বসবাস। এক কথায় তাদের সবকিছুই হয় পবিত্র। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

"ফেরেশতারা যাদের জান কবজ করেন তাদের পবিত্র থাকাবস্থায়। ফেরেশতারা বলে, তোমাদের প্রতি শান্তিবর্ষিত হোক। তোমরা যা করতে, তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ করো।" (সূরা: আন্-নাহল- ৩২)

তাদেরকে জান্নাতের রক্ষীরা বলবে–

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ.

"তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো।" (সূরা: আয্-যুমার- ৭২)

আয়াতের فاء বর্ণটি কারণের দাবিদার। তখন অর্থ দাঁড়াবে তোমরা তোমাদের পবিত্রতার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ.

www.waytojannah.com

"দুশ্চরিত্রা নারীকুল, দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য; সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য।" (সূরা: আন্-নূর- ২৬)

আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মন্দ ও অশ্লীল কথা-বার্তা, মন্দ ও দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য আর ভালো কথাবার্তা সচ্চরিত্রের পুরুষদের জন্য এবং আরো বুঝা যায় যে, সচ্চরিত্র নারীরাই কেবল সচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং দুশ্চরিত্রা নারীদের জন্য শুধুমাত্র দুশ্চরিত্র পুরুষ। বিষয়টি শুধু এতেই সীমাবদ্ধ নয় সুতরাং ভালো কথোপকথন, সৎ আ'মাল এবং সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য। এমনি অশ্লীল কথাবার্তা অসৎ আ'মাল এবং দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য।

আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রকার ভালোর জন্য জান্নাত এবং সর্বপ্রকার মন্দের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করেছেন এবং তিনটি ঘর নির্মাণ করেছেন–

ক. শুধু সচ্চরিত্র নারী-পুরুষদের বসবাসের ঘর।

খ. শুধু দুশ্চরিত্র নারী-পুরুষদের বসবাসের ঘর।

গ. সচ্চরিত্র এবং দুশ্চরিত্র নারী-পুরুষদের বসবাসের যৌথ বা মিশ্র ঘর।

প্রথমটি দুশ্চরিত্র লোকদের জন্য হারাম। এ ঘরটি হলো, জান্নাত। এখানে সর্বপ্রকার কল্যাণকর বস্তুর সমাবেশ ঘটবে। দ্বিতীয়টিতে হলো, জাহান্নাম শুধু দুশ্চরিত্র লোকেরাই প্রবেশ করবে এবং তৃতীয়টি হলো এই দুনিয়া। আর এ মিশ্রণের কারণে দুনিয়াতে মানুষকে পরীক্ষা করা হয়। এটাও আল্লাহর নিপুণ প্রজ্ঞার কারণেই হয়ে থাকে। পরকালে মানুষকে যখন উত্থিত করা হবে তখন আল্লাহ তা'আলা মন্দকে ভালো থেকে বিভাজন করবেন। এরপর ভালো এবং ভালো মানুষদের ভিন্ন একটি ঘর প্রদান করবেন। আর মন্দ ও খারাপ মানুষদেরও ভিন্ন একটি ঘর প্রদান করবেন। অবশেষে সকল মানুষ দুই ঘরে বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি জান্নাত, এটা শুধু ভালো ও সচ্চরিত্রের মানুষদের জন্য অপরটি জাহান্নাম আর এটা শুধু খারাপ ও দুশ্চরিত্রের মানুষের জন্য। আর তাদের উভয় দলের কৃতকর্ম থেকে সাওয়াব এবং শাস্তি সৃষ্টি করে তাদের সৎ কথোপকথন সৎকর্ম এবং আখলাক চরিত্রকে তাদের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিণত করবেন। অসৎ কথাবার্তা অপকর্ম এবং দুশ্চরিত্রকে অন্যান্যদের জন্য আযাব এবং শাস্তিতে পরিণত করবেন।

এসব করবেন বান্দাদের সম্মুখে নিজের পূর্ণ কর্তৃত্ব, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, ইনসাফ এবং দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। আর শত্রুদের এ কথা সম্পর্কে অবগত করার জন্য যে তারাই প্রকৃত মিথ্যাবাদী। তাঁর পবিত্র সত্যবাদী রাসূলগণ নয়। আল্লাহ ইরশাদ করেন:

وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَاذِبِينَ.

"তারা আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অবশ্যই এর পাকাপোক্ত ওয়াদা হয়ে গেছে। কিন্তু, অধিকাংশ লোক জানে না। তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেনই, যাতে সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল তা প্রকাশ করা যায়। আর যাতে কাফেররা জেনে নেয় যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল।" (সূরা: আন্-নাহল- ৩৮-৩৯)

এ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, একথা বুঝানো যে, তিনি সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের পরিচয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দুটি শিরোনাম তৈরি করেছেন। সুতরাং সৌভাগ্যবান সে যে, শুধু ভালো পাওয়ার যোগ্য। সে শুধু

www.waytojannah.com

Contents

ভালো কাজই করবে, পোশাক পরিধান করলে ভালো পোশাক পরিধান করবে। আর যে হতভাগা দুশ্চরিত্রের সে শুধু মন্দ প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য এবং সে শুধু মন্দ ও অশ্লীল কর্মই সম্পাদন করবে দুশ্চরিত্র মানুষের হৃদয় থেকে দুশ্চরিত্রের ঝরনাধারা উৎসারিত হয়ে রসনা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পায় আর সচ্চরিত্র মানুষের হৃদয় থেকে সচ্চরিত্রের ঝরনাধারা উৎসারিত হয়ে রসনা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায়। অনেক সময় একজন মানুষের মধ্যেই আবার এ ভালো-মন্দ উভয়টাই পাওয়া যায়। তখন এ উভয় চরিত্রের যেটি তার মাঝে প্রাধান্য লাভ করবে তাকে সেটির সে ধরনের লোক বলে গণ্য করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তার কল্যাণ চাইলে তাকে দুশ্চরিত্রের অভিশাপ থেকে মৃত্যুর পূর্বেই পবিত্র করে দিবেন। অবশেষে সে কেয়ামতের দিন পূত-পবিত্র হয়ে উঠবে। তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিয়ে পবিত্র করার প্রয়োজন হবে না। বরং তাওবা, ইস্তিগফার সৎকর্ম এবং মুসীবতে ধৈর্য ধরার তাওফীক দিয়ে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। অবশেষে সে পূত-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। আবার অনেকের থেকে সৎকর্ম ও পবিত্রতার তাওফীক ছিনিয়ে নেন। অবশেষে সে কিয়ামাতের দিবসে ভালো ও মন্দ উভয় চরিত্র নিয়ে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে। আল্লাহ যেহেতু চান না যে, কেউ তার গৃহে অপবিত্র অবস্থায় প্রবেশ করবে, তাই এ ব্যক্তিকে পূত-পবিত্র করণার্থে তিনি তাকে জাহান্নামে পাঠাবেন। অতঃপর তার সকল মন্দ চরিত্রগুলো শেষ হয়ে ঈমানের মত মূল্যবান স্বর্ণ যখন তার মাঝে ফুটে উঠবে তখন আল্লাহ তাকে সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিদের দলভুক্ত করবেন। আর এটা নির্ভর করবে দ্রুত ও ধীরগতিতে মন্দ অভ্যাসগুলোর বিলুপ্তির উপর। সুতরাং যার মন্দ ও দুশ্চরিত্র যত দ্রুত শেষ হবে সে তত দ্রুত জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে। আর যার মন্দ ও দুশ্চরিত্র যত দেরিতে দূর হবে সে তত দেরিতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে।

মুশরিক ব্যক্তি যেহেতু সত্তা ও জাতি হিসেবে অপবিত্র তাই জাহান্নাম তাদেরকে পবিত্র করবে না। বরং সে সেখান থেকে বের হলে তাকে পূর্বের ন্যায় অপবিত্র অবস্থায় সেখানে ফিরিয়ে দেয়া হবে। ঠিক যেন কুকুরের ন্যায়, যে সমুদ্রে প্রবেশ করল এবং পুনরায় সমুদ্র থেকে উঠে এল। এতে কি কুকুরকে পবিত্র হয়েছে বলা যাবে? ঠিক এই কারণে মুশরিকদের জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন। আর মুমিনগণ দুশ্চরিত্র থেকে পূত-পবিত্র হওয়ার কারণে তাদের জন্য জাহান্নাম হারাম করেছেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর হিকমত, প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতা কতইনা মহান! তাঁর সৃষ্টির প্রকৃতি তিনি আহকামুল হাকিমীন হওয়ার সাক্ষী। তিনি সকল সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা। এক ও অদ্বিতীয়।

রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশানুক্রম

এ অধ্যায়ে রাসূলের পরিচয়ের গুরুত্ব, রাসূল যা নিয়ে আগমন করেছেন তার প্রয়োজনীয়তা, তিনি যে বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন তা মান্য করার আবশ্যকতা এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী আমল করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। কারণ, ইহকাল ও পরকালের সফলতা ও কামিয়াবীর চাবিকাঠি শুধু রাসূলগণের হাতে। তাঁদের ছাড়া ভালো সম্পর্কে অবগতি অসম্ভব। আল্লাহর সন্তুষ্টিও তাঁদের ব্যতীত অসম্ভব। ভালো কথাবার্তা নেক আমাল অভ্যাস চরিত্রের সব কিছুই তাঁরা আমাদের নিকট নিয়ে আগমন করেছেন এবং এসব কিছুই তাঁদের পথনির্দেশ। তাঁরা সকল আমাল আখলাক আর সকল কথোপকথনের মাপকাঠি। তাঁদের আমাল ও আখলাক দিয়ে অন্যান্যদের আমাল ও আখলাকের মান নির্ণয় করা হবে। তাঁদের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমেই হিদায়াতপ্রাপ্তরা পথভ্রষ্টদের থেকে বিভাজন হয়ে যায়।

www.waytojannah.com

সুতরাং শরীর রূহের প্রতি যতটুকু মুখাপেক্ষী তার চেয়েও বেশি মুখাপেক্ষী মানবতা রাসূলদের প্রতি। এমনি চোখ আলোর প্রতি এবং রূহ জীবনের প্রতি যতটুকু মুখাপেক্ষী তার চেয়েও বেশি মুখাপেক্ষী মানবতা রাসূলের প্রতি। এর চেয়েও বেশি প্রয়োজন আর কী হতে পারে? একজন মানুষের জীবনে রাসূলদের প্রয়োজন অনেক। তোমার থেকে তাঁর পথনির্দেশনা এবং তার আনিত পয়গাম যদি কিছুক্ষণের জন্য আপনার নিকট থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় তবে এটা কি আপনি সামান্য কিছু মনে করছেন। না, এটা সামান্য কিছু নয় বরং এর কারণে আপনার হৃদয় ভুল পথে পরিচালিত হবে। আর পাত্রে রাখা পানিবিহীন মাছের ন্যায় হয়ে যাবে। ঠিক মানুষের হৃদয় থেকে রাসূলদের আনীত পয়গাম যখন বিলুপ্ত হতে শুরু করবে তখন তার অবস্থাও ঠিক এমনটি হবে। বরং এর চেয়েও করুণ হবে। কিন্তু এটাকে শুধু জীবন্ত কুলবই কেবল অনুধাবন করতে সক্ষম! হায়! মৃতের ক্ষতের কতই না যন্ত্রণা!

সুতরাং ইহকাল ও পরকালের সফলতা যেহেতু নাবী ﷺ-এর পথনির্দেশের সাথে সম্পৃক্ত তাই যে চায় সে সফলতা অর্জন করতে এবং পরকালের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে তার জন্য আবশ্যক হল নাবী ﷺ-এর জীবন-চরিত্র, তাঁর মান-মর্যাদা এবং তাঁর পথনির্দেশনা সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা। যা নিয়ে মূর্খরা বাড়াবাড়ি করে এবং নিজেদেরকে নাবীর ﷺ দলভুক্ত বলে দাবি করে। এ বিষয়ে মানুষ অনেক দলে বিভক্ত; কেউবা বাড়াবাড়ি সীমালঙ্ঘনের শিকার। কেউ বা শৈথিল্য ও অবহেলার আর কেউ বা একেবারেই বঞ্চিত। এ সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর কৃপা। যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন– আল্লাহ মহাকৃপার আধার।

নাবী ﷺ-এর জীবন-চরিত এবং পথনির্দেশ সম্পর্কে পরিচয় লাভের সামান্যতম ইচ্ছা রাখে এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য আবশ্যক এমন কিছু বিষয়ে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশতালিকা

বংশের দিক দিয়ে তিনি তাঁর বংশ পৃথিবীর সকল বংশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁর শত্রুরা পর্যন্ত এর সাক্ষ্য দিত। আর এ কারণেই রোমান বাদশাহের সম্মুখে তাঁর এককালের চরম শত্রু আবূ সুফিয়ানও তাঁর বংশের শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় বা গোত্র হলো, রাসূল ﷺ-এর গোত্র। সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ হলো, তাঁর বংশ। তাঁর বংশপরিক্রমা নিম্নরূপ:

মুহাম্মাদুবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব ইবনু হাশিম ইবনু আবদে মানাফ ইবনু কুসাই ইবনু কিলাব ইবনু মুররা ইবনু কা'ব ইবনু লুয়াই ইবনু গালিব ইবনু ফিহ্‌র ইবনু মালিক ইবনু নায্‌র ইবনু কিনানাহ ইবনু খুযাইমাহ ইবনু মুদরিকা ইবনু ইলয়াস ইবনু মুযার ইবনু নিযার ইবনু মা'আদ ইবনু আদনান। রাসূল ﷺ থেকে এ পর্যন্ত যতগুলো নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সকলে একমত এবং এই নিয়ে কোনো বিরোধ বা মতানৈক্য নেই। আদনান থেকে উপরে যারা আছেন তাঁদের নিয়ে মতানৈক্য আছে। তবে আদনান ইসমাঈলের (আলাইহিস সালাম) পুত্র হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই এবং বিশুদ্ধ মতে ইসমাঈল আলাইহিস সালামই ছিলেন যাবীহুল্লাহ অর্থাৎ তাঁকে আল্লাহর নামে যবেহ করার ইচ্ছা করা হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেঈনদের মাঝে কোনোরূপ বিরোধ নেই।

ইসহাক যাবীহুল্লাহ ছিলেন বলে যে কথা বলা হয়ে থাকে তা ২০ এরও একাধিক কারণে অবাস্তব ও মিথ্যা উক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমি শাইখ ইবনু তাইমিয়্যাহ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, এ ধরনের

www.waytojannah.com

Contents

বক্তব্য আহলে কিতাবদের থেকে গৃহীত। অথচ তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের ভাষ্য দ্বারাই এর অসারতা সুস্পষ্ট। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে এসেছে যে, আল্লাহ ইব্‌রাহীমকে তাঁর ছোট্ট বাচ্চাকে কুরবানীর নির্দেশ দিয়েছিলেন। অন্য জায়গায় তাঁর একমাত্র পুত্রকে যবেহ করার নির্দেশ দেন। মুসলমানসহ সকল আহলে কিতাব এ ব্যাপারে একমত যে, ইসমাঈল আলাইহিস সালামই ছিলেন ইব্‌রাহীম (আ)-এর ছোট্ট বাচ্চা। তারা হয়ত তাওরাতের "তুমি তোমার সন্তান ইসহাককে যবেহ করো" এই উক্তি হতে প্রতারিত হয়েছে। অথচ তাওরাতের এই উক্তিটি তাদের নিজের বানানো এবং মনগড়া বিকৃত ও মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা তাওরাতের অপর বক্তব্য, "তুমি তোমার শিশু সন্তান এবং একমাত্র সন্তানকে" এ বক্তব্যের বিরোধী। ইহুদীরা ইসমাঈলের মর্যাদা নিয়ে হিংসা ও বিদ্বেষের শিকার হয়ে এ কাজটি করেছে। আর তারা নিজেরাই এ মর্যাদার অধিকারী হতে চেয়েছে। কিন্তু আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম হলো, যে যোগ্য তাকেই কেবল তিনি মর্যাদা প্রদান করে থাকেন। যাবীহুল্লাহ ইসহাক ছিলেন এটা কোনোভাবেও বলা সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইসহাকের (আ) মাতাকে তার এবং তার পুত্র ইয়াকূবের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। আল্লাহ ফেরেশতাদের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, ফেরেশতারা সুসংবাদ নিয়ে আগমন করে ইব্‌রাহীমকে বলল–

لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ.

"(তারা) বলল, ভয় পাবেন না। আমরা লূতের কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি তার স্ত্রীও নিকটেই দাঁড়িয়েছিল, সে হেসে ফেলল। অতঃপর আমি তাকে ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পরে ইয়াকূবেরও।" (সূরা: হুদ- ৭০-৭১)

সুতরাং আল্লাহ তাকে সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিবেন এবং পরে তাকে হত্যার নির্দেশ দিবেন এটা আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব।

নিঃসন্দেহে ইয়াকূব আলাইহিস সালামও আয়াতের উক্ত সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত।

এখন কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, যদি বিষয়টি এমনই হয় যেমনটি আপনারা উল্লেখ করেছেন তাহলে يعقوب শব্দটি اسحاق শব্দের উপর আরোপ হয়ে মাজরূর হত এবং আয়াতের আরবি পাঠ হতো– وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ অর্থাৎ, "ইসহাকের পরে ইয়াকূবেরও।"

উত্তরে বলা হবে, ইয়াকূব আলাইহিস সালাম সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য يعقوب শব্দে "রফা" দিতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, সুসংবাদ হলো, একটি বিশেষ বাক্য এবং এটি বাস্তবসম্মত ও আনন্দদায়ক প্রথম সংবাদকে বলা হয়।

ইরশাদ হচ্ছে–

وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ.

"এবং ইসহাকের পরে ইয়াকূবেরও।"

বাক্যটি এসব শর্তের অন্তর্ভুক্তকারী বরং সুসংবাদের মূল হলো, জুমলায়ে খবরিয়্যাহ।

"বাশারাত" শব্দটি বাণী, বচন বা বাক্য হবার কারণে এ বাক্যটি হেকায়াতান মানসূব। তখন এর অর্থ দাঁড়ায়, আমরা তাকে বললাম, ইসহাকের পরে ইয়াকূবের কথা। কেউ যখন কাউকে বলে, "আমি অমুককে তার ভাইয়ের আগমনের এবং তার সাথে তার বোঝা বা আসবাবপত্রের আসারও সুসংবাদ

www.waytojannah.com

দিলাম।" তখন এ বাক্য থেকে উভয়ের উপস্থিতির কথাই বুঝে আসে। বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারেন না। তাছাড়া مررت بزيد ومن بعده عمرو বাক্য থেকেও যের দিয়ে পড়াটা দুর্বল হওয়া বুঝে আসে। কেননা, আতিফ হরফে যারের মর্যাদা রাখে সুতরাং যার ও মাজরুরের ন্যায় এখানেও উভয়ের মাঝে পার্থক্য করা যাবে না।

তাছাড়া আল্লাহ তা'আরা ইরশাদ করেছেন–

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ {١٠٣} وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ {١٠٤} قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ {١٠٥} إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ {١٠٦} وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ {١٠٧} وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ {١٠٨} سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ {١٠٩} كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ {١١٠} إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ.

"যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম তাকে যবেহ করার জন্য শায়িত করল। তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইব্রাহীম, তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ করার জন্য এক মহান জন্তু। আমি তার জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি যে, ইব্রাহীমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের একজন।" (সূরা: আস্-সাফ্ফাত– ১০৩-১১১)

এরপরে ইরশাদ করেন–

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ.

"এবং আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাকের যে সৎকর্মীদের মধ্য থেকে একজন নবী।"

(সূরা: আস্-সাফ্ফাত– ১১২)

আল্লাহর নির্দেশের উপর ধৈর্য ধরার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে এ সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এ আয়াত থেকে এ কথা সুস্পষ্ট বুঝে আসে যে, যার ব্যাপারে ইব্রাহীম (আ)-কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তিনি এবং প্রথম ব্যক্তি একই ব্যক্তি নন বরং তারা উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আয়াতে যে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে তা নবী হওয়ার ব্যাপারে ছিল। অর্থাৎ পিতা যখন আল্লাহর আদিষ্ট বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর আদেশ পালনার্থে পুত্র-সন্তানকে আল্লাহর সম্মুখে কুরবানীর জন্য পেশ করল তখন আল্লাহ তাঁকে প্রতিদান স্বরূপ নবুওয়াত প্রদান করলেন।

উত্তর: সুসংবাদ দেয়া হয়েছে সমষ্টিগতভাবে তার সত্তা, অস্তিত্ব এবং নবী হওয়ার ব্যাপারে। সুতরাং এটা বলা কোনভাবেই সহীহ্ না যে, প্রথমে তার সত্তার এবং এর পরে তার নবুওয়াতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিপালন এবং তাঁর মাতা-পিতা ও পিতামহের মৃত্যু

সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার প্রাণকেন্দ্রে হস্তীবাহিনীর বছর জন্মগ্রহণ করেন। হস্তী- বাহিনীর ঘটনাটি ছিল নবী ﷺ-এর আগমনের ভূমিকাস্বরূপ। অন্যথায় হস্তীবাহিনীরা আহলে কিতাব– নাসারা ছিল। আর সে সময় তাদের ধর্ম মক্কাবাসীদের ধর্মের চেয়েও ভালো ছিল। কারণ

www.waytojannah.com

Contents

মক্কাবাসীরা ছিল মূর্তিপূজারী। এরপরও আল্লাহর বাইতুল্লাহর সম্মান এবং মক্কায় যে নাবী আত্মপ্রকাশ করবেন তাঁর নিদর্শন এবং ভূমিকাস্বরূপ আল্লাহ মক্কাবাসীদেরকে আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে গায়বী সাহায্য করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতা আব্দুল্লাহর মৃত্যু নিয়ে মতভেদ রয়েছে বা এ ব্যাপারে দু'টি উক্তি পাওয়া যায়।

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন।

২. তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মেরও সাত বছর পর ইন্তেকাল করেছেন।

তবে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাতা তাঁর মক্কার বাড়ি থেকে মদীনায় ফেরার পথে মক্কা ও মদীনার মাঝে অবস্থিত "আবওয়া" নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন।

সে সময় নাবী ﷺ-এর বয়স ছিল ৭ বছরের কম। পিতামাতার মৃত্যুর পর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর লালন পালন শুরু করেন। অতঃপর ৮ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। কেউ বলেছেন ৬ বছর বয়সের কথা আবার কেউ ১০ বছরের কথা। এবার নাবী ﷺ-এর প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন চাচা আবূ তালিব। আর এভাবেই প্রতিপালন অব্যাহত থাকে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ১২ বছর বয়সে উপনীত হন তখন তাঁর চাচা তাঁকে নিয়ে শাম দেশে রওয়ানা হন। কারো মতে তখন তাঁর বয়স ছিল ৯ বছর। আর এ সফরে পথিমধ্যে বুহায়রা নামক এক খ্রিস্টান ধর্মযাজক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে চাচা আবূ তালিবকে বললেন, তাঁকে যেন শাম দেশে নিয়ে যাওয়া না হয় এবং বলেন, ইহুদীরা তাঁর ক্ষতি করতে পারে। সুতরাং আপনি তাঁকে সেখানে নিয়ে যাবেন না।

অতঃপর তাঁর চাচা কতিপয় কিশোরদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। তিরমিযী ও অন্যান্য কিতাবে বিলালের সঙ্গে প্রেরণের কথা বলা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল। কারণ, সম্ভবত বিলাল (রা) তখন জন্মগ্রহণ করেন নি। আর করলেও আবূ তালিবের সঙ্গে ছিল না। ছিল না আবূ বকরের সঙ্গেও। হাদীসটি ইমাম বায্যার (র) তাঁর মুসনাদে উল্লেখ করেছেন। আর তিনি সেখানে বিলালের কথা বলেন নি বরং একজন লোকের কথা বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ২৫ বছর বয়সে উপনীত হন তখন ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে গমন করেন অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এসে খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদকে বিবাহ করেন। কারো মতে তাকে বিবাহের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ছিল ত্রিশ বছর। কারো মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ছিলো, একুশ বছর আর খাদীজা (রা)-এর বয়স ৪০ বছর। খাদীজা (রা) ছিলেন তাঁর প্রথম স্ত্রী। তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় রাসূল ﷺ অন্য কাউকে বিবাহ করেন নি। জিবরীল আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম রাসূল ﷺ-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর উপর সালাম দেয়ার নির্দেশ করেছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্জনতা এবং আল্লাহর জন্য ইবাদাতে লিপ্ত থাকাকে নিজের প্রিয় জিনিস হিসেবে বেছে নেন। রাসূল ﷺ 'হেরা গুহায়' একা একা থাকতে শুরু করেন এবং রাতের পর রাত সেখানে ইবাদাতে লিপ্ত থাকেন। মূর্তিপূজা ও তাঁর সম্প্রদায়ের ধর্ম-কর্মে পূর্ব থেকেই ছিল তাঁর অনিহা। এর চেয়ে বড় শত্রু তাঁর আর কেউ ছিল না। রাসূল ﷺ যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হন। তখন তিনি নবুওয়াত লাভ করেন এবং আল্লাহ তাঁকে রিসালাতের মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করে তাঁর সৃষ্টির নিকট প্রেরণ করেন। তাঁকে তাঁর মর্যাদা দিয়ে বিশেষায়িত করেছেন। আর তাঁকে বান্দা ও স্রষ্টার মাঝে মধ্যস্থতাকারী বানিয়েছেন। সোমবার দিবসেই তাঁর নবুওয়াত লাভ করার ব্যাপারে সকলে একমত। তবে কোন মাসে

www.waytojannah.com

Contents

হয়েছে সে সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। কারো মতে রবীউল আউয়ালের অষ্টম তারিখে। হস্তীবাহিনীর ঘটনার ৪১ সালে তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। এটাই অধিকাংশদের অভিমত। কারো মতে রমযান মাসে হয়েছে।

আর এর প্রমাণে তাঁরা– شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ আয়াতকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন।

তারা বলেন, আল্লাহ সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করে তাঁকে নবুওয়াত প্রদান করে সম্মানিত করেছেন এবং এ মতটিকেই একদল আলেম গ্রহণ করেছেন এঁদের মধ্যে ইয়াহইয়া আস্-সারসারী (রহ) উল্লেখযোগ্য। তিনি তার কিতাবে লিখেছেন–

وَأَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُوْنَ فَأَشْرَقَتْ ◉ شَمْسُ النُّبُوَّةِ مِنْهُ فِيْ رَمَضَانَ

"তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে রমযান মাসে তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন।"

প্রথম উক্তির প্রবক্তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর রমযান মাসের লাইলাতুল ক্বদরে বাইতুল ইয্যায় পূর্ণ কুরআন একত্রে একই সঙ্গে অবতীর্ণ করা হয়। এরপর ধীরে ধীরে প্রয়োজন অনুসারে দীর্ঘ ২৩ বছরে তা অবতীর্ণ করা হয়।

একদল বলেন, রমযানের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য এবং রমযানের রোযা ফরয হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণ করেন।

কারো মতে, ওহীর সূচনা হয়েছে রজব মাসে এবং আল্লাহ তা'আলা এ ওহী একাধিক পদ্ধতিতে অবতীর্ণ করতেন।

১. সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে, এবং এভাবেই ওহীর সূচনা হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ যেই স্বপ্নই দেখতেন তাঁর সম্মুখে সে স্বপ্ন ভোরের আলোর ন্যায় উদ্ভাসিত হতো।

২. গায়বীভাবে ফেরেশতার মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর অন্তঃকরণে কোনো কিছু ঢেলে দেয়া। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, রূহুল কুদ্স ফেরেশতা আমার হৃদয়ে এ কথা ঢেলে দিয়েছে যে, কেউ তার রিযিক পরিপূর্ণ হবার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং বৈধ পন্থায় রিযিক অন্বেষণ করো। রিযিক অর্জনে বিলম্ব যেন তোমাদেরকে রিযিক অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ না করে। কারণ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা শুধু তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন সম্ভব।

৩. ফেরেশতাগণ মানবাকৃতিতে নবীগণের কাছে এসে কথা বলা। এক্ষেত্রে অনেক সময় সাহাবাগণও ফেরেশতাদের সাক্ষাৎ লাভ করে থাকেন।

৪. কখনো ওহী ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় আসত। অন্যান্য প্রকার অপেক্ষা এ প্রকার ওহী তুলনামূলক অধিক কষ্টদায়ক। এমনকি কঠিন শীতেও এ প্রকার ওহী অবতীর্ণ হবার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘেমে যেতেন। তিনি সাওয়ারীতে আরোহিত হলে ওহীরভারে সাওয়ারী বসে পড়ত।

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উরু যায়িদ ইবনু সাবিতের উরুতে ছিল এমতাবস্থায় এ ওহী অবতীর্ণ হলে ওহীর ভারে উভয়ের উরু একত্রিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল।

৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো ফেরেশতাকে তার প্রকৃত আকৃতিতে দেখতে পেতেন এরপর তাঁর উপর যা অবতীর্ণ করার তা অবতীর্ণ করা হত। এভাবে দু'বার ওহী অবতীর্ণ হয়েছে যার বিবরণ সূরা আল-আনআমে এসেছে।

www.waytojannah.com

Contents

৬. মিরাজের রজনীতে সপ্ত আসমানের উপরে যে ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছে উদাহরণতঃ নামাজ ফরয করণ ইত্যাদি।

৭. ফেরেশতার মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আল্লাহর কথোপকথন। যেমনটি আল্লাহ মূসা ইবনু ইমরানের সঙ্গে করেছেন। কুরআনের অকাট্য বর্ণনা দ্বারা এটি প্রমাণিত। আমাদের নাবীর সঙ্গে এটি ঘটেছিল ইসরার রজনীতে।

কেউ কেউ অষ্টম আরো একটি প্রকার বৃদ্ধি করেছেন। আর সেটা হলো, পর্দার আড়াল ছাড়া আল্লাহর কথোপকথন। এ মতাদর্শের প্রবক্তা তারাই যারা রাসূল ﷺ আল্লাহকে দেখেছেন বলে মনে করেন। এ মাসআলাটি একটি বিতর্কিত মাসআলা। যদিও জমহুরে সাহাবার প্রায় সকলেই আয়িশা (রা)-এর মতকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম দারিমী এ বিষয়ে সাহাবাদের একমত হবার কথা বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাৎনা

এ বিষয়ে তিন ধরনের উক্তি পাওয়া যায়:

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ খাৎনাকৃত এবং হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। আর এ বিষয়ে একটি গাইরে সহীহ্ হাদীস উল্লেখ করা হয় যা আবুল ফরজ ইবনুল জাওযী তাঁর 'আল-মাউযুআত' নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন এবং এ বিষয়ে কোনো সাবেত হাদীস পাওয়া যায় না। আর এটা শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য নয় বরং অনেকেই খাৎনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন।

মাইমুনী বলেন, আমি আবূ আব্দুল্লাহকে এমন মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যা আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে। মাসআলাটি হলো, "জনৈক খাৎনাকারী এক শিশুকে খাৎনা করার স্থান খতিয়ে না দেখেই তাকে খাৎনা করে দিয়েছে" এখন তার খাৎনা হয়েছে কি না?

উত্তরে আবূ আব্দুল্লাহ বলেন, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের অর্ধেকের চেয়ে বেশি পরিমাণ চামড়া যদি খাৎনা করা হয় তাহলে পুনরায় খাৎনা করার প্রয়োজন নেই। কারণ পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ মোটা হতে থাকে আর যখনই পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ মোটা হয় তখন পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের চামড়াও সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠতে থাকে।

তবে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের অর্ধেকের চেয়ে কম পরিমাণ চামড়া যদি খাৎনা করা হয় তা হলে আমার মতে পুনরায় খাৎনা করতে হবে। আমি বললাম, পুনরায় খাৎনা করা তো অনেক কষ্টের। তাছাড়া পুনরায় খাৎনা করলে পুরুষাঙ্গের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতিরও আশঙ্কা আছে। আবূ আব্দুল্লাহ বললেন, আমি বলতে পারি না। এরপর আমাকে বললেন, এখানে একজন লোক বাস করে তার একটি খাৎনাকৃত সন্তান জন্মেছে সে এ নিয়ে খুবই পেরেশান। আমি তাকে বললাম, আল্লাহই যখন তোমার খরচ বহন করেছেন তা হলে এতে পেরেশনা হওয়ার কি আছে!

আমাকে আমাদের সহপাঠি বাইতুল মাকদিসের মুহাদ্দিস আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু উসমান আল-খলীলী বর্ণনা করেছেন যে, সেও খাৎনাকৃত আবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এরপর তার পরিবারের লোকেরা তাকে আর খাৎনা করায়নি।

যে এভাবে জন্মগ্রহণ করে অনেকে "চাঁদ তাকে খাৎনা করেছে" বলে মনে করে। অথচ এটা কুসংস্কার, উপকথা এবং কল্পকাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

www.waytojannah.com

Contents

২. দুধমাতা হালীমা সা'দীয়ার নিকট থাকাবস্থায় ফেরেশতাগণ যে দিন তাঁর বক্ষবিদীর্ণ করেছেন সেদিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাৎনা করা হয়।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সপ্তম দিন তাঁর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব তার খাৎনা করেন এবং দাওয়াতের আয়োজন করেন। আর তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মাদ।

ইমাম ইবনু আব্দুল বার (র) বলেন, এ বিষয়ে মুসনাদে একটি গারীব হাদীস বর্ণিত আছে। যা আহমাদ ইবনু মুহাম্মার তার সানাদে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনু আব্বাস বলেন, আব্দুল মুত্তালিব সপ্তম দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাৎনা করেন এবং দাওয়াতের আয়োজন করেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম রাখেন মুহাম্মাদ।

ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ূব বলেন, আমি হাদীসটি অনুসন্ধান করেছি অবশেষে ইবনু আবীস সারী ছাড়া সমকালীন অন্য কোনো মুহাদ্দিসের কাছে হাদীসটি পাইনি। এ মাসআলা সম্পর্কে বড় বড় দু'জন আলিম স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। একজন মাতৃগর্ভ হতে খাৎনাকৃত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম হওয়া প্রমাণে। আর এ লেখক এক্ষেত্রে সানাদহীন একাধিক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি হলেন, আল্লাম কামালুদ্দীন ইবনু তালহা (র)। অতঃপর তা খণ্ডনে আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনুল আদীম (র) স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তার এ গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আরবদের সনাতন নিয়মে খাৎনা করার বিষয়টি প্রমাণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুধ-মাতাগণ

তাদের একজন হলেন, আবূ লাহাবের দাসী সুওয়াইবা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কয়েক দিন স্তন্যদান করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সঙ্গে তার সন্তান মাসরূহ এর দুধ দিয়ে আবূ সালামা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল আসাদ আল-মাখযুমীকে স্তন্যদান করেন। আর তাদের সঙ্গে রাসূল ﷺ-এর চাচা হামজাকেও স্তন্য দান করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন কি না সে ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হালীমা সা'দীয়া তার পুত্র উনাইসা এবং জুযামার ভাই আব্দুল্লাহর দুধ দিয়ে স্তন্য দান করেন। জুযামার নাম হলো, শীমা। তিনি হারিস ইবনু আব্দুল উজ্জা ইবনু রিফাআ আস্-সা'দীর সন্তানদের একজন। আর তাঁর সঙ্গে হালীমা আবূ সুফিয়ানকেও স্তন্য দান করেছেন। আবূ সুফিয়ান প্রথম অবস্থায় ইসলামের চরম শত্রু ছিল। পরে মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা হামযা সাদ ইবনু বকর গোত্রে মাতৃদুগ্ধ পান করতেন। হামযার দুধ-মাতা ও হালীমার নিকট থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একদিন স্তন্য দান করেছেন। সে হিসেবে হামযাহ দু'দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুধ-ভাই ছিলেন। প্রথমত সুওয়াইবিয়ার; দ্বিতীয়ত সা'দীয়ার দিক থেকে।

রাসূল ﷺ-এর তত্ত্বাবধায়কগণ

এঁদের একজন হলেন তাঁর মাতা আমিনা বিনতে ওহাব ইবনু আব্দে মানাফ ইবনু যুহরা ইবনু কিলাব।

তাদের মধ্যে হতে আরো হলেন, সুওয়াইবা, হালীমা এবং তার কন্যা রাসূল ﷺ-এর দুধ-বোন শীমা। শীমা তাঁর মা হালীমার সাথে নাবী ﷺ-এর পরিচর্যা করতেন এবং তিনিই হাওয়াজিন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে নাবী ﷺ-এর কাছে এসেছিলেন এবং রাসূল ﷺ তাঁর জন্য তাঁর গায়ের চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর হক্বের সম্মানে তাঁকে তিনি সেখানে বসিয়ে ছিলেন।

www.waytojannah.com

Contents

তাঁদের আরো একজন হলেন মহিয়সী রমণী উম্মু আইমান রাসূল ﷺ উত্তরাধিকারসূত্রে তার মালিক হন। তিনি রাসূল ﷺ-এর ধাত্রী ছিলেন। রাসূল ﷺ তাকে তাঁর প্রিয়পাত্র যায়িদ ইবনু হারিসার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন এবং তার গর্ভে উসামা জন্ম গ্রহণ করে তিনিই ঐ রমণী যার গৃহে রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর আবূ বকর ও উমারকে প্রবেশ করে তাকে ক্রন্দনরত পেয়েছিলেন। তারা উভয়ে উম্মু আয়মানকে বললেন, হে উম্মু আইমান কাঁদছেন কেন? আল্লাহ তাঁর রাসূলের জন্য তা-ই করেছেন যাকে তিনি ভালো মনে করেছেন? উম্মু আইমান বলল, আমি জানি আল্লাহ যা করেছেন তা তাঁর রাসূলের মঙ্গলের জন্যই করেছেন। আমি শুধু কাঁদছি আকাশের সংবাদ আগমন বন্ধ হবার কথা শুনে অতঃপর তার কথা শুনে আবূ বকর ও উমার কাঁদতে শুরু করলেন।

প্রথম ওয়াহী

ওয়াহীর সূচনা হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। বিভিন্ন রিওয়ায়াত মতে জানা যায়, ৬ মাস পর্যন্ত নবুওয়াতের স্বপ্ন দর্শন চলতে থাকে। তারপর এক শুভ দিবসে বাস্তব নবুওয়াতের মহা অবদান লাভে তিনি ধন্য হন।

হেরা গুহায় তখন তিনি ধ্যাননিরত। এমন সময় ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) আবির্ভূত হলেন। এসেই বললেন, "ইকরা বিস্‌মি রাব্বিকাল্লাযী খালাক্ব"।

'আয়িশাহ এবং অধিকাংশ সাহাবীর মতে সূরা 'ইকরা বিস্‌মি'র প্রথম পাঁচ আয়াতই সর্বপ্রথম ওয়াহী। আর এটাই বিশুদ্ধ মত। জাবির (রা)-এর বর্ণনা মতে প্রথম ওয়াহী– প্রত্যাদিষ্ট বাণী হচ্ছে– يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ....

ওহে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি....।[১]

---

১ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রথম ওয়াহীপ্রাপ্তি তথা নবুওয়াত লাভ সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (রা) যে বিশ্বস্ত বিবরণ প্রদান করেছেন এবং যা সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে লিপিবদ্ধ রয়েছে– তার অনুবাদ নিম্নে পেশ করা হচ্ছে:

'আয়িশাহ সিদ্দীকা (রা) বলেছেন: "আল্লাহর তরফ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রত্যাদেশের সূচনা হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা ছিল প্রত্যূষের বিকীর্ণ আলোকচ্ছটার মত। এরপর নির্জনতা তাঁর নিকট অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ ﷺ গারে-হেরায় নির্জন সাধনায় নিমগ্ন হলেন। রাত্রির পর রাত্রি পার হয়ে যেতো–তিনি একনিষ্ঠ সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন, তারপর ফিরে আসতেন তাঁর গৃহে, আহার্য বস্তু সঙ্গে নিয়ে আবার যেতেন হেরাগুহায়, আবার খাদ্য ফুরিয়ে গেলে আসতেন খাদীজাহ (রা)-এর কাছে, পুনঃ খাদ্য সামগ্রী নিয়ে চলে যেতেন সেই গুহায়। এমনিভাবে পার হয়ে যেতে লাগল দিনের পর দিন। অবশেষে সত্য আবির্ভাবের দিন হলো সমাগত।

তিনি তখন হেরা গুহায়। ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) আবির্ভূত হলেন। বললেন, "পড়ুন"। রাসূল ﷺ বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং বর্ণনা দিয়েছেন: জিবরাঈল (আ) আমাকে টেনে নিলেন এবং তাঁর আলিঙ্গনে আমাকে আবদ্ধ করে জোরে চাপ দিলেন–এত জোরে যে, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর বললেন, এখন পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। পুনঃ তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে তাঁর আলিঙ্গনে চেপে ধরলেন, সেই চাপে আমি আরও বেশি শ্রান্ত হয়ে পড়লাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, এখন পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পাঠক নই। তারপর তিনি তৃতীয়বার আমাকে আলিঙ্গন করে চাপ দিলেন, আমি এবার শ্রান্ত ক্লান্ত ঘর্মসিক্ত হয়ে গেলাম। তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে কুরআনের এই পাঁচ আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ – خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ – اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ – الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ – عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

www.waytojannah.com

রাসূল ﷺ-এর চল্লিশ বৎসর বয়স যখন পূর্ণ হয়ে গেল তখনই হেরা গুহায় নবুওয়াতের সূর্য উদিত হলো, রিসালাতের মুকুট পবিত্র মস্তকে স্থাপন করা হলো–বিশ্বমানবতার জন্য সৃষ্টির সেরা সত্তাকে পয়গাম্বররূপে উত্থিত করা হ'লু।

নবুওয়াত লাভের দিবসটি ছিল সোমবার। এ সম্পর্কে কারোর কোনই মতভেদ নেই। তবে মাসের নির্দিষ্টতা সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। কিন্তু প্রবণতা হচ্ছে হস্তী বর্ষের ৪১ সালের ৮ই রবীউল আউওয়ালের দিকে। কেউ কেউ বলেন, নবুওয়াত শুরু হয়েছিল পবিত্র রমাযান মাসে। তারা প্রমাণ পেশ করেন এই আয়াত থেকে–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ.

"সেই রমাযান মাস–যে মাসে অবতীর্ণ হয়েছে আল-কুরআন।" (সূরা বাকারাহ- ১৮৫)

"পড়ুন– সেই প্রভু পরোয়ারদিগারের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (সবকিছু), সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে। পাঠ করুন– বস্তুতঃ আপনার প্রভু প্রতিপালক হচ্ছেন অতীব দয়ালু–অত্যন্ত মর্যাদাবান–যিনি শিক্ষা দেন কলমের সাহায্যে, শিক্ষা দেন মানবজাতিকে সেসব বিষয়–যা তারা জানত না।" (সূরা 'আলাক- ১-৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ওয়াহী নিয়ে গৃহে ফিরলেন, তাঁর হৃৎপিণ্ড তখনও কম্পমান। তিনি খাদীজার কাছে গিয়ে উপনীত হলেন, ডেকে বললেন, ঢাকো, আমায় কম্বল দিয়ে ঢাকো। খাদীজাহ এবং ঘরের আর সকলে তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢাকলেন। অতঃপর তাঁর মনের ভীতি যখন দূর হয়ে গেল, তখন তিনি খাদীজাহ (রা)-কে সব ঘটনার বিবরণ দিলেন। তিনি বললেন, সত্যই আমার জীবনের উপর ভয় এসে গিয়েছিল। খাদীজাহ (রা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনার ভয়ের কোনই কারণ নেই। আল্লাহর কসম, আল্লাহ কক্ষনো আপনাকে অপদস্থ করবেন না, আপনি আপনজনকে ভালোবাসার ডোরে বেঁধে রক্ত বন্ধনকে দৃঢ় করে তুলেছেন, আপনি কথা ও কাজে সদা সত্যনিষ্ঠ, আপনি অপরের দুঃখ-কষ্টের বোঝা স্বীয় স্কন্ধে বহন করে চলেছেন। অভাবগ্রস্তের অভাব বিদূরণ করেন আপনি। অতিথির সেবা আপনার ধর্ম, বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ-নিরসন আপনার কর্ম। প্রতিকূল অবস্থাতেও সত্যের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেন আপনি; আল্লাহ আপনাকে খাটো করবেন না, করতে পারেন না।

এরপর খাদীজাহ (রা) তাঁর স্বামীকে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফলের কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন, ভ্রাতঃ! যেজন্য আপনার খিদমতে হাজির হয়েছি তা আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট শুনুন। ওয়ারাকা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! সব কথা খুলে বলুন, কী হয়েছে, কী ঘটেছে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দেখেছিলেন, যা ঘটেছে–সমস্তই আগাপোড়া এক এক করে খুলে বললেন। ওয়ারাকা সব শুনে বললেন, "এ হচ্ছে নামূস–ফেরেশতা শ্রেষ্ঠ, যাকে আল্লাহ মূসা (আ)-এর কাছে পাঠাতেন। হায়! যদি সে সময় আমি বেঁচে থাকতাম যখন আপনার গোত্রের লোক আপনাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে ওরা তাড়িয়ে দেবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আপনি যে আলোকবর্তিকা নিয়ে এসেছেন, তেমনি আপনার পূর্বে আর যারা তা নিয়ে এসেছিলেন তাদের প্রত্যেকেই নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত–নির্বাসিত হয়েছেন। যদি ততদিন আমি বেঁচে থাকি, আপনাকে আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে অবশ্য অবশ্যই সাহায্য করব।" কিন্তু এরপর ওয়ারাকা বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। এরপর কিছু দিনের জন্য ওয়াহীর অবতরণ বন্ধ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীতে এর অতিরিক্ত এ কথাগুলোও রয়েছে: "ওয়াহী অবতরণের সাময়িক বিরতির ভাবনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এতদূর চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে পড়েন যে, কয়েক দিন প্রত্যূষে মনের ঐ অস্থিরতা নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় নিজেকে নিয়ে যেতেন, সেখান থেকে নিজেকে নিচে নিক্ষেপ করে স্বীয় জীবন হালাক করে দিতে উদ্যত হতেন। কিন্তু ঐ উদ্দেশে যতবারই তিনি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেছেন ততবারই ঝাপ দেয়ার পূর্ব মুহূর্তে জিবরাঈল (আ) তাঁর সামনে এসে হাজির হয়ে ডাক দিয়ে বলেছেন: "হে মুহাম্মাদ! আপনি সত্য, সত্যই আল্লাহর রাসূল।" (অর্থাৎ আপনার বিচলিত হওয়ার কোনই কারণ নেই। সংকল্প পরিহার করুন, আল্লাহর বাণী আবার আসবে, পুনঃ পুনঃ আসবে, রিসালাতের বিরাট দায়িত্ব আপনাকে বহন করতে হবে। আপনি বারিত হোন, চিত্তচাঞ্চল্য দূর করুন।)

এই আশ্বাস বাণী শুনে দূর হয়ে গেল তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য, হৃদয়ে এল অনাবিল শান্তি, আবার লাভ করল পূর্ণ পরিতৃপ্তি, বক্ষে অনুভব করলেন অমিত শক্তি। *–অনুবাদক*

www.waytojannah.com

Contents

ওয়াহীর প্রকারভেদ

ওয়াহী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কয়েক প্রকারে আসত। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হলো:

১. **সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে:** ওয়াহীর সূচনা এই প্রকরণের দ্বারাই হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্ন দেখানো হ'ত। স্বপ্নে তিনি যা দেখতেন তাই পুরোপুরি রূপায়িত হ'ত।

২. **ফেরেশতা [জিবরাঈল (আ)] অদৃশ্যভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে কালাম প্রবেশ করিয়ে দিতেন।** যেমন তিনি নিজেই বলেছেন:

"রূহুল কুদুস–জিবরাঈল (আ) আমার অন্তরে এ কথা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি তার রিয্ক পরিপূর্ণ না পাওয়া পর্যন্ত কখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল এবং সঠিকভাবে তাঁর নিকট রিয্ক-রুজি প্রার্থনা কর, সঠিকভাবে রুজি-প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটলে তোমরা যেন আল্লাহর অননুমোদিত পথে পাপ কর্মের মাধ্যমে রুজির সন্ধানের পথে এগিয়ে যেয়ো না, কেননা আল্লাহর কাছে যা আছে তা পাপের মাধ্যমে নয়, বরং তাঁর আনুগত্যের পথেই অর্জিত হবে।"

৩. **ফেরেশতা মানুষের আকারে আত্মপ্রকাশ করতেন এবং ওয়াহী পৌঁছিয়ে দিতেন।** এ অবস্থায় যখন তিনি আসতেন, তখন কোন কোন সময় সাহাবীরাও তাঁকে দেখতে পেতেন।

৪. **ওয়াহী কোন কোন সময় ঘণ্টা-ধ্বনির মত শব্দ ক'রে আসত।** এ ধরনের ওয়াহী-প্রাপ্তির সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খুবই কষ্ট হ'ত। এমন কি প্রচণ্ড শীতের সময়েও তার কপাল ঘামে ভিজে যেতো। এ সময় যদি তিনি উটের উপর আরোহিত থাকতেন, তাহলে প্রবল বোঝার চাপে উট বসে পড়তো। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ যাইদ ইবনে সাবিতের জানুর উপর জানু রেখে বসেছিলেন–এমনি সময় ঐ ধরনের ওয়াহীর অবতরণ ঘটল। যাইদ (রা) বললেন, সে সময় আমার জানু এত ভারী বোধ হতে লাগল–মনে হ'ল যেন বোঝার চাপে আমার জানু ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

৫. **ফেরেশতা তার নিজস্ব আকারে আত্মপ্রকাশ করে ওয়াহী পৌঁছিয়ে দিতেন।** রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াতী জীবনে মাত্র দু'বার এরূপ ঘটে ছিল। সূরা নাজ্মে এর উল্লেখ রয়েছে।

৬. **সেই প্রকরণের ওয়াহী যা মি'রাজের রাত্রে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যাদেশ করেছিলেন।** ৫ ওয়াক্ত সালাত এ ওয়াহীর মাধ্যমেই ফার্য হয়। এছাড়া সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো এ ধরনের ওয়াহীর মাধ্যমে তিনি প্রাপ্ত হন।

৭. ওয়াহীর সপ্তম প্রকরণ হচ্ছে **আল্লাহ তা'আলার সেই সম্বোধন যা তিনি ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি পয়গাম্বরের সঙ্গে করেছেন** যেমন, মূসা (আ)-এর সঙ্গে আল্লাহ যেভাবে কালাম করেছেন। এজন্যই মূসার এক পদবী হচ্ছে কালীমুল্লাহ–আল্লাহর সঙ্গে কথা বলনেওয়ালা। মূসার এ ফাযীলাত কুরআনের আয়াত দ্বারা সুসাব্যস্ত, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গেও আল্লাহ অনুরূপভাবে মি'রাজের রাত্রে কথা বলেছেন। মি'রাজের হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত।

৮. কেউ কেউ ওয়াহীর আর এক প্রকরণেরও উল্লেখ করে থাকেন আর সেটা হচ্ছে **বিনা আবরণে মুখোমুখী আল্লাহর সঙ্গে কালাম করা।** কিন্তু এই সর্বশেষ অভিমতটি হচ্ছে তাদের–যারা বলে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বচক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে দর্শন করেছিলেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয়ের মধ্যে

www.waytojannah.com

Contents

এ বিষয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবা–বরং বলা যায় প্রায় সমস্ত সাহাবাই 'আয়িশাহ (রা)-এর এ সুদৃঢ় অভিমতের সঙ্গে একমত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (ইহজীবনে) তাঁর স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখেননি। 'উসমান ইবনে সা'ঈদ আদ্-দারিমী (রহ.) তো এ বিষয়ের উপর সাহাবীদের ইজমার (ঐকমত্যের) কথাই উদ্ধৃত করেছেন।[২]

---

২ বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী এবং তিরমিযী (রহ.) মাসরূক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি (মাসরূক) 'আয়িশাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন,

"হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ ﷺ কি স্বীয় প্রভু পরোয়ারদিগারকে দেখেছিলেন?

'আয়িশাহ (রা) তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ! তোমার এ প্রশ্ন শুনে আমার শরীর (বিস্ময়ের আধিক্যে) রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্বন্ধে এ তিনটি কথা কী করে সম্ভব? যদি কেউ তোমাকে এ ধরনের কোন কথা বলে থাকে তাহলে সে মিথ্যুক। কথা তিনটি এই:

ক. কোন ব্যক্তি–সে যে কেউ হোক, যদি বলে যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহকে দেখেছেন, সে নিশ্চিতভাবে মিথ্যুক: তারপর তিনি এ দু'টো আয়াত পাঠ করলেন:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

"চক্ষুসমূহ তাঁকে (আল্লাহকে) দেখতে পারে না, তিনিই দেখতে পান সকল চক্ষুখানকে। তিনি সকল বোধের অতীত–সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতম অথচ তিনি সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞানী।" (সূরা আন'আম– ১০৩)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ.

"কোন মানুষের জন্য এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন ওয়াহীর মাধ্যম ছাড়া অথবা পর্দার অন্তরাল ছাড়া, অথবা তিনি কোন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর যা ইচ্ছা সেই ফেরেশতা তাই ওয়াহী করে দেন, নিশ্চয় আল্লাহ অতি প্রবল, প্রজ্ঞাময়িত।" (সূরা শূরা– ৫১)

খ. কোন ব্যক্তি–সে যে কেউ হোক যদি বলে যে, মুহাম্মাদ ﷺ আগামীকালের (অর্থাৎ গায়িবের) খবর জানেন তাহলে জেনে রাখো যে, সে ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে মিথ্যুক। তারপর তিনি এ আয়াত পড়লেন:

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ.

"কোন প্রাণীই জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে–কী তার উপর ঘটে যাবে, আর এ কথাও কোন প্রাণী জানে না কোন্ ভূমিতে তাকে মরতে হবে।" (সূরা লুকমান– ৩৪)

গ. আর কোন ব্যক্তি– সে যে কেউ হোক, যদি বলে যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত ওয়াহীর কিছু অংশ লুকিয়ে রেখেছেন, সে নিশ্চিতভাবে মিথ্যুক। তারপর তিনি এ আয়াত পড়লেন:

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

"হে রাসূল! আপনার প্রভুর নিকট থেকে যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয় আপনি তার সমস্তই (লোকদের মধ্যে) পৌঁছিয়ে দিন, যদি তা না করেন তাহলে আপনি তাঁর পয়গামই পৌঁছালেন না–রিসালাতের যে দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়েছে আপনি তা পালন করলেন না। আল্লাহ আপনাকে (হে রাসূল) মানুষের অপকীর্তি থেকে রক্ষা করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (সূরা মায়িদাহ– ৬৭) –*অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

Contents

দাওয়াতের শ্রেণিবিন্যাস

১. নবুওয়াত;
২. নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ককীকরণ;
৩. নিজের সম্প্রদায়কে সতর্ককীরণ;
৪. এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক করা যাদের নিকট ইতঃপূর্বে কোনো নাবী-রাসূল আগমন করে নি।

রাসূল ﷺ-এর নাম প্রসঙ্গ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল নামগুলোই গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। শুধু পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্যে রাখা নাম নয়। বরং তাঁর প্রতিটি নামই তাঁর ﷺ সাথে সম্পর্কিত গুণাবলী থেকে নির্গত। একটি হল মুহাম্মাদ এ নামটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাওরাতেও সুস্পষ্টভাবে এ নামেই তাকে নামকরণ করা হয়েছে। যা আমি আমার দিলাউল আফহাম ফী ফাদলিস সালাতি ওয়াস সালামি আলা খাইরিল আনাম গ্রন্থে সুস্পষ্ট প্রমাণাদির আলোকে আলোকপাত করেছি। এটি এবিষয়ে একটি চমৎকার গ্রন্থ এবং উপকারিতার ক্ষেত্রে এ ধরনের আর কোনো গ্রন্থ লেখা হয়নি। আমি এ গ্রন্থে সালাত ও সালাম সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীস নিয়ে এসেছি এবং হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীসগুলো কোনটি সহীহ কোনটি হাসান এবং কোনটি মালুল তাও বর্ণনা করেছি এবং ইলাল বর্ণনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব বিস্তারিত বর্ণনার চেষ্টা করেছি। এরপর এসব দু'আর উপকারিতা এবং রহস্যগুলো বর্ণনা করেছি এবং কোথায় কোথায় সালাত পড়তে হয় এবং কতটুকু পড়া আবশ্যক, এবং এ বিষয়ে আলিমদের পারস্পরিক মতানৈক্যগুলো উল্লেখ করেছি এবং কোন্ মতটি সঠিক তাও উল্লেখ করেছি। যেসব বর্ণনা দিলাম গ্রন্থটি এর চেয়েও অনেক উর্ধ্বে।

আরো একটি হল: আহমাদ, এ নামেই ঈসা মাসীহর নাম রাখা হয়েছে।

আরো কয়েকটি হল: মুতাওয়াককিল, মাহী, হাশির, আকিব, মুক্বাফ্ফী, নাবীইয়ুত্তাওবা। নাবীইয়ুররাহমাহ, নাবীইয়ুল মালহামাহ, ফাতিহ এবং আল-আমীন।

উল্লিখিত নামসমূহের সঙ্গেও নিম্নোক্ত নামসমূহ যোগ হবে: শাহিদ, মুবাশ্শির, বাশীর, নাযীর, কাসিম, দাহ্ক, ক্বাত্তাল আব্দুল্লাহ, সিরাজুম্ মুনীর, সাইয়্যিদু উলদি আদাম, সাহিবু লিওয়াউল হামদ, এবং সাহিবুল মাকামুল মাহমুদ, ইত্যাদি নামসমূহ। কারণ তার প্রতিটি নাম যেহেতু প্রশংসার গুণাবলী বা আওসাফকে বুঝায় তাই তাঁর প্রতিটি গুণই একটা নাম। তবে এক্ষেত্রে যেসব গুণাবলী শুধুমাত্র তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত বা তার জন্যই বেশি ব্যবহৃত হয়, এর মাঝে এবং ব্যাপক গুণাবলীর মাঝে বিভাজন করা আবশ্যক।

যুবাইর ইবনু মুতঈম বলেন, আমাদের জন্য রাসূল তাঁর নামসমূহ বর্ণনা করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ, আমি মাহী, আমার দ্বারা আল্লাহ সবার কুফরীর অবসান ঘটাবেন। আমি হাশির আমার পরে সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে। আমি আকিব আমার পরে আর কোনো নাবী আসবে না।"

রাসূল ﷺ-এর নামসমূহ দু'ধরনের:

www.waytojannah.com

১. **শুধু তাঁর সঙ্গেই সম্পৃক্ত:** যেমন, মুহাম্মাদ, আহমাদ, আকিব, হাশির, আল-মুকাফ্ফী এবং নাবীইয়ুল মালহামাহ।

২. **শুধু তাঁর সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং অন্যান্য নাবী-রাসূলও এতে শরীক:** তবে এ নামসমূহে তাঁর পূর্ণতা অন্যান্যদের চেয়ে বেশি। যেমন– রাসূলুল্লাহ, নাবীইয়ুল্লাহ, আব্দুল্লাহ, মুবাশ্শির, নাযীর, নাবীইয়ুর রাহমাহ, নাবীইয়ুত তাওবাহ ইত্যাদি।

তাঁর প্রতিটি গুণকেই যদি নাম ধরা হয় তবে, তার সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে যাবে। যেমন, সাদিক, মাসদুক এবং রাউফ্‌র রাহীম ইত্যাদি। এ বিষয়ে জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, আল্লাহর নামের সংখ্যা হল এক হাজারটি এবং নাবীর ﷺ নামের সংখ্যাও এক হাজার। এমনটিই বর্ণনা করেছেন আবূল খাত্তাব ইবনু দিহয়া এবং এর দ্বারা নাবী ﷺ-এর আওসাফ বুঝানো উদ্দেশ্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামসমূহের অর্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ

মুহাম্মাদ: মুহাম্মাদ শব্দটি ইসমে মাফউল حمد ধাতু থেকে নির্গত। কারো কারো মাঝে যখন প্রশংসনীয় গুণাবলী অধিক হয় তখন তাকে মুহাম্মাদ বলা হয়। আর একারণেই মুহাম্মাদ শব্দটি 'মাহমুদ' শব্দের চেয়ে অধিকতর বিশুদ্ধ ও সৌকুমার্যমণ্ডিত। কারণ 'মাহমুদ' শব্দটি সুলাসি মুজাররাদ এর সীগাহ আর 'মুহাম্মাদ' শব্দটি মুযাআফ এর সীগাহ যা মুবালাগা যা অধিকতর বিশুদ্ধ ও সৌকুমার্যমণ্ডিত হওয়াকে বুঝায়। মুহাম্মাদ যিনি হন তিনি অন্যান্য মানুষের চয়ে বেশি প্রশংসাকারী হয়ে থাকেন। আল্লাহ সর্বাধিকজ্ঞানী।

তাওরাতে তাকে এ নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাওরাতে তাঁকে তাঁর দীনকে এবং তাঁর উম্মতকে যেসব প্রশংসনীয় স্বভাবে গুণান্বিত করা হয়েছে তার আধিক্যতার কারণে। এমনকি মূসা ﷺ তাদের দলভুক্ত হবার জন্য আকাঙ্ক্ষা পেশ করেছেন। আমি এ ব্যাপারে একাধিক সাক্ষ্য উল্লেখ করেছি। এবং এক্ষেত্রে আবূল কাসিম আস-সুহাইলীর ভ্রান্তিও উল্লেখ করেছি কারণ তিনি বিষয়টিকে উল্টো ভেবেছেন এবং মনে করেছেন যে তাওরাতে তাঁর নাম আহমাদ উল্লেখ করা হয়েছে।

আহমাদ: আহমাদ নামটি ইসমে তাফযীলের ওযনে একটি ইসম। যা الحمد ধাতু থেকে নির্গত। শব্দটি কি ইসমে ফায়িলের অর্থে নাকি ইসমে মাফউলের এ নিয়ে অনেকে অনেক মতামত ব্যক্ত করেছেন। এক দলের মতে শব্দটি ফায়েলের অর্থে অর্থাৎ তিনি অন্যদের তুলনায় আল্লাহর অধিক প্রশংসা করেন এবং তারা এ উক্তিটিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন যে, আফআলুত্ তাফযীল এর সীগার ক্ষেত্রে যুক্তির দাবি হল সীগাটি ফায়েলের তথা কর্তার ক্রিয়া থেকে তৈরি করা হয়েছে মাফউলের উপর পতিত ক্রিয়া থেকে নয়। সুতরাং ما اضرب زيدا এবং زيد اضرب من عمرو বাক্যের ব্যবহারও আমরের উপর পতিত প্রহারের হিসেবে বলা শুদ্ধ হবে না। এমনিভাবে ما أشربه للماء به এবং وآكله للخبز ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার শুদ্ধ নয়। তাদের মতে আফআলুত তাফযীল ও তা'আজ্জুবের ক্রিয়া লাযিম ক্রিয়া থেকে তৈরি করা হয়। আর একারণেই فَعَلَ এবং فَعِلَ ক্রিয়াদ্বয় فَعُلَ ক্রিয়াতে স্থানান্তরিত হয়েছে বলে মেনে নিতে হবে। তারা বলেন, এই কারণেই এ ক্রিয়াকে হামযা দ্বারা মুতাআদ্দী বানানো হয় যেমন, ما اظرف زيد এবং ما اكرم عمرا বাক্যে উল্লিখিত ক্রিয়া দু'টির মূল ছিল ظَرُفَ এবং كَرُمَ। কারণ এখানে প্রকৃত متعجب منه বা যার

www.waytojannah.com

Contents

ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে সেই ফায়েল তাই তার ক্রিয়া غيرمتعدى হওয়া আবশ্যক। আর ما اضرب زيدا لعمرو ও এ জাতীয় বাক্যের ক্রিয়াগুলো فَعُل থেকে فَعَل এর দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং এরপর মুতাআদ্দী করা হয়েছে। হাময্যা দ্বারা মুতাআদ্দীর অবস্থাও অনুরূপ। এর দলিল হল, মাফউলটি لام-এর দ্বারাও ব্যবহৃত হওয়া। যেমন, বলা হয় ما اضرب زيدا لعمرو। বাক্যটিকে শুধু যদি তাআদ্দীর উপরেই বাকি রাখা হত তবে ما اضرب زيدا عمروا বলতে হত।

অন্যান্যরা এক্ষেত্রে তাদের বিরোধিতা করে বলেন, আফআলুত তাফজীল এবং ফিলুত্‌তা'আজ্জুব উভয়টাকেই ফায়েলের ক্রিয়া এবং মাফউলের উপর পতিত ক্রিয়া থেকে গঠন করা ও বানানো সম্ভব। জনশ্রুতি ও প্রসিদ্ধিই এর বৈধতার প্রমাণ। আরবরা বলে থাকে ما اشغله بالشئ এ বাক্যের ক্রিয়া شغل থেকে ব্যবহৃত হয়েছে এমনিভাবে তারা বলে থাকে ما اولعه بكذا এ বাক্যের ক্রিয়াটিও اولع থেকে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর মাফউল হল مولع। উভয় ক্রিয়াটিই মাফউলের জন্য মাবনী। এমনিভাবে ما اعجبه بكذا বাক্যের ক্রিয়াটিও اعجب থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবরা ما احبه إلى বাক্যটিও মাফউলের ক্রিয়ায় আশ্চর্য হয়ে এরকম বলে থাকে। এধরনের আরো একটি ব্যবহার হল ما ابغضه إلى এবং وما امقته إلى বাক্যদ্বয়ের ব্যবহার।

এখানে একটি প্রসিদ্ধ মাসআলা আছে যা আল্লামা সিবাওইহী উল্লেখ করেছেন, মাসআলাটি হল তুমি যখন, وما أحبني له ما أبغضني له এবং وما أمقتني له বলবে তখন এর অর্থ হবে তুমি নিজেই অপছন্দকারী ও পছন্দকারী এবং তখন উল্লিখিত বাক্যসমূহে তুমি কর্তার ক্রিয়া থেকে আশ্চর্য প্রকাশকারী হবে। আর যখন وما أحبني اليه এবং وما أمقتني اليه ما أبغضني اليه বলবে তখন এর অর্থ হবে তুমি নিজে ঘৃণিত ও বিদ্বেষের পাত্র। আর তখন তুমি মাফউলের উপর পতিত ক্রিয়া থেকে বিস্ময় প্রকাশকারী হবে। সুতরাং যখন বাক্যটি لام বর্ণের সাথে ব্যবহৃত হবে তখন অর্থ বিস্ময় প্রকাশ করা হবে ফায়েলের জন্য আর إلى বর্ণের সাথে ব্যবহার করলে বিস্ময় প্রকাশ করা হবে মাফউলের জন্য। অধিকাংশ ব্যাকরণবিদগণ কারণ হিসেবে এটি উল্লেখ করেন না। বরং কারণ হিসেবে যেটি তারা উল্লেখ করেন তা হল, لام বর্ণটি অর্থের দিক দিয়ে ফায়েলের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন বলা হয় لمن هذه؟ এটি কার? অতঃপর উত্তরে বলা হয় যে, لزيد যায়িদের এবং উত্তরে لام বর্ণ বৃদ্ধি করা হয়। আর إلى বর্ণটি অর্থের ক্ষেত্রে মাফউলের জন্য ব্যবহৃত। যেমন, তুমি বললে, إلى من يصل هذا الكتاب "এই কিতাবটি কার কাছে পৌছবে? উত্তরে বলা হল, আব্দুল্লাহর কাছে। এর রহস্য হল لام বর্ণটি মূলত মালিকানাধীন এবং বিশিষ্টতা বুঝাবার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর যোগ্যতা বা অধিকার শুধুমাত্র কর্তার বা ফায়েলের হয়ে থাকে যে যোগ্য হয় এবং নেতৃত্ব দেয় এবং إلى বর্ণটি ইন্তেহায়ে গায়াহ এর জন্য ব্যবহৃত, আর গায়াহ বা চূড়ান্ত হল ক্রিয়ার দাবির সর্বশেষ অবস্থান আর এর জন্য মাফউলই বেশি উপযোগী। কারণ গায়াত হল ক্রিয়ার দাবির শেষ সীমা। মাফউলের ক্রিয়া থেকে আশ্চর্য প্রকাশের একটি উদাহরণ হল রাসূল ﷺ সম্পর্কে কা'ব ইবনু যুহাইরের উক্তি–

فلهو أخوف عندى إذ أكلمه ❁ وقيل إنك محبوس ومقتول

من خادر من ليوث الأسد مسكنه ❁ ببطن عثر غيل دونه غيل

আমি যখন তার সাথে কথা বলি তখন তিনি আমার সামনে সবচেয়ে বেশি ভীতিকর। কেউ কেউ বলেন, তুমি তো তার সিংহের রাজ্যের সিংহ দ্বারা বন্দী ও নিহিত। তার বসবাসের স্থান হল আস্‌সার বা ভয়ে পা-ফসকে যায় এমন উপত্যাকায় যার চার পার্শে শুধু বন আর কন্টকাকীর্ণ ক্ষুদ্র লতাগুল্ম।

www.waytojannah.com

Contents

কবিতাটিতে احوف শব্দটি حَيْف থেকে যার মাফউল হল خاف | مخوف থেকে নয়। এমনিভাবে ما أحسن زيدا বাক্যের حسن ক্রিয়াটি حسن فهو محسنون থেকে حسن থেকে নয় এবং এটাই হল কুফাবাসী ও তাদের সমমনা ব্যক্তিবর্গের মতামত। বসরাবাসীগণ বলেন, উল্লেখ্য সবকটি উদাহরণ শায বা বিরল। সুতরাং একে মাপকাঠি বানানো যাবে না। এবং একে কেন্দ্র করে কায়িদা বা নিয়ম নীতিতেও কোনো রূপ প্রভাব ফেলা যাবে না। বরং এগুলোকে শ্রবণের উপর ছেড়ে দিতে হবে। কুফাবাসীরা বলেন, আরবদের গদ্যে পদ্যে এর এতই ব্যবহার যে এর কারণে এটিকে শায বা বিরল বলা ঠিক নয়। কারণ শায বলা হয়, যা আরবদের ব্যবহার এবং কথোপকথন বিরোধী। আর আমাদের এ বিষয়টিতে সে রকম নয়। আর লাযেম ক্রিয়া উহ্য মেনে তা فُعِل এ স্থানান্তরিত হয়েছে বলে আপনারা যে কথা উল্লেখ করেছেন তা স্বেচ্ছাচারিতা আর নিজেদের খেয়াল খুশি ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং এর পক্ষে সামান্যতম কোনো দলিল নেই। আর হামযার দ্বারা মুতাআদ্দী হওয়ার যে বিষয়টি আপনারা উল্লেখ করেছেন তাও সঠিক নয়। কারণ এ জায়গায় হামযা তা'দিয়ার জন্য আসেনি। বরং হামযাটি শুধু তাআ'জ্জুব এবং তাফযীল বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এটি ঠিক فاعل এর আলিফ এবং مفعول এর 'মীমের' ও 'ওয়াও'-এর মত এবং ইফতি-আলের تاء এর মত এবং এ জাতীয় অতিরিক্ত বর্ণসমূহ যা সুলাসী ফে'লে বৃদ্ধি করা হয় মুজাররাদের উপর তাতে কী যিয়াদা হয়েছে তা বর্ণনা করণার্থে। আর একারণেই "হামযাকে বৃদ্ধি করা হয়েছে, ক্রিয়ার তা'আদ্দীর জন্য নয়। যে ফে'লকে হামযার দ্বারা মুতাআ'দ্দী করা যায় তাকে যে হরফে যর এবং মাদ্দ বা বর্ণের বৃদ্ধির দ্বারাও মুতাআ'দ্দী করা এর প্রমাণ হল, اجلسته، جلست به، قمت به، اقمته ইত্যাদি উপমাগুলো। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা বুঝা গেল যে, হামযা বর্ণটি শুধু তা'দীয়ার জন্য নয় কারণ হামযার সঙ্গে باء-এ তা'দীয়াহ যোগ করা হয় এবং বলা হয়, اكرم به وأحسن به ; কেননা নিয়ম হলো কখনো কোন ক্রিয়াকে দু'টি জিনিস দ্বারা মুতাআ'দ্দী করা হয় না।

তারা আরো বলেন, ما اعطاه للدراهم এবং أكساه للثياب বাক্যদ্বয় عطى এবং كسا মুতাআদ্দী ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং اعطى ক্রিয়াকে عطو ক্রিয়ার দিকে স্থানান্তরিত করা ঠিক হবে না।

আর ما اضربه لزيد ইত্যাদি বাক্যে لام বর্ণের দ্বারা মুতাআদ্দী করা হয়েছে বলে আপনারা যে কথাটি বলেছেন, তা ক্রিয়া লাযেম হবার কারণে নয় বরং এটি করা হয়েছে তাকে শক্তিশালী করণার্থে।

যা হোক আমরা এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দিকে ফিরে যাব এবং বলব আহমাদ নামটি প্রথম উক্তিদ্বয়ের ভিত্তিতে احمد الناس لربه ছিল এবং তাদের বক্তব্য অনুযায়ী احق الناس وأولاهم بأن يحمد ছিল। এ হিসেবে আহমাদ নামটি অর্থের বিবেচনায় محمد নামের মত। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল, মুহাম্মাদ বলা হয় তাকে যার মাঝে প্রশংসনীয় গুণাবলী অধিক হয়। আর অন্যের চেয়ে যার প্রশংসা বেশি করা হয় তাকে বলা হয় আহমাদ। সুতরাং রাসূল ﷺ আধিক্য ও পরিমাণের হিসেবে হলেন মুহাম্মাদ। আর ধরণ ও গুণাবলীর বিবেচনায় তিনি হলেন, আহমাদ। সুতরাং তিনি অন্যের চেয়ে অধিক প্রশংসার যোগ্য। এই নাম দুটি মাফউলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যদি ফায়েলের অর্থে ব্যবহৃত হত তবে তাকে حماد হাম্মাদ বলা হত যার অর্থ অধিক প্রশংসাকারী আল্লাহর প্রশংসা বিবেচনায় তাকে যদি احمد আহমাদ নাম রাখা হত তবে এ হিসেবে হাম্মাদ নাম রাখা আহমাদ নামের চেয়ে বেশি উত্তম হত। তাছাড়া নাম দুটি তার আখলাক ও চরিত্রের প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য থেকে নির্গত এবং এ উন্নত আখলাকের কারণেই তিনি মুহাম্মাদ নাম রাখার

www.waytojannah.com

যোগ্য। আর আহমাদ বলা হয় আসমানবাসী জমিনবাসী দুনিয়াবাসী ও পরকালবাসী যার জন্য দো'আ করে তাকে। তার অগণিত প্রশংসনীয় চরিত্রের আধিক্যতার কারণে। এ বিষয়ে আমি আমার "কিতাবুস সালাত ওয়াস সালামে" বিস্তারিত আলোচনা করেছি। প্রয়োজনে তা দেখা যেতে পারে।

মুতাওয়াক্কিল: সহীহ্ বুখারীতে ইবনু উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাওরাতে রাসূল ﷺ-এর গুণাবলী পড়েছি: মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল আমার বান্দা এবং রাসূল। আমি তার নাম রেখেছি মুতাওয়াককিল। তিনি বদ স্বভাব এবং কঠোর হৃদয়ের নন। তিনি বাজারে বাজারে ঘুড়ে বেড়াবেন না, তিনি অন্যায়ের প্রতিদান অন্যায়ের দ্বারা দেবে না বরং তিনি ক্ষমা ও করুণা প্রকাশকে ভালোবাসবেন। তার মাধ্যমে বক্র জাতিকে সোজা করা অর্থাৎ তারা "লা- ইলাহা ইল্লাহু" বলার আগ পর্যন্ত আমি তাঁর মৃত্যু দেব না। সে এ নামের সর্বাধিক উপযুক্ত। কারণ দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সে আল্লাহর উপর ভরসা করেছে। তাঁর মত এ ধরনের ভরসা আর কেউ করেনি।

মাহী: হাশির মুফাফ্ফী এবং আকিব নামসমূহের ব্যাখ্যা যুবাইর ইবনু মুতঈমের হাদীসে এসেছে। 'মাহী' অর্থাৎ, যার মাধ্যমে আল্লাহ কুফুরীর অন্যায় মিটিয়ে দিয়েছেন। নবী ﷺ-এর মাধ্যমে কুফুরী যে পরিমাণ বিদূরীত হয়েছে সৃষ্টির অন্য কারো মাধ্যমে সে পরিমাণ বিদূরীত হয়নি। কারণ তিনি এমন সময় প্রেরিত হয়েছিল যখন গোটা বিশ্ব ছিল কুফুরীতে নিমজ্জিত। তবে আহলে কিতাবদের কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত। তাদের কেউ তো ছিল মূর্তিপূজারী কেউ গযব অবতীর্ণ ইহুদী সম্প্রদায়, কেউ পথভ্রষ্ট খ্রিস্টান সম্প্রদায় আবার কেউ ছিল নাস্তিকতায় বিশ্বাসী। আল্লাহ ও পরকাল বলতে কিছুকেই তারা চিনত না। তাদের কেউ আবার তারকাপূজারী এবং অগ্নিপূজারী ছিল, আবার কেউ ছিল দার্শনিক, যারা শরীয়ত কাকে বলে তাও জানত না। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমের এ সকল কুফুরী ও অন্যায়কে বিদূরীত করেছেন। অবশেষে তাঁর দীনকে অন্য সকল দীনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন রাতে অন্ধকার এবং দিনের আলো যেখানে সেখানে পৌঁছেছে তার দীনও সেখানে সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। তার দাওয়াত আর আহ্বান পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে পৌঁছে গেছে।

হাশির: শব্দটি حشرٌ থেকে যার অর্থ জমা করা এবং একত্রিত করা। রাসূল ﷺ-এর পরে সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে। অর্থাৎ কেমন যেন মানুষকে একত্রিত করণার্থেই তাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

আকীব: যিনি সকল আম্বিয়গণের পরে আগমন করেছেন। তাঁর পরে কোন নাবী আসবেন না। কারণ, যিনি সবার শেষে আসেন তিনিই হন সর্বশেষ। তিনি মোহরের মত। আর একারণেই তাকে সর্বশেষ নবী বলা হয়।

মুকাফ্ফী: বলা হয় যিনি পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। শব্দটি القفو ধাতু থেকে নির্গত। বলা হয়, قفا يقفوه যখন সে বিলম্ব করে এবং পরে আসে; আর এর থেকেই قافية الرأس তথা কবিতার মিল ইত্যাদির ব্যবহার পাওয়া যায়। আর মুকাফ্ফী বলা হয় যিনি তার পূববর্তী রাসূলগণের পরে আগমন করেছেন। অর্থাৎ যেন তিনি তাদের শেষ নবী।

নায়ীইয়ুত্তাওবা: তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ পৃথিবীবাসীর জন্য তাওবার দরজা উন্মুক্ত করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তাদের এমনভাবে ক্ষমা করেছেন যে, সে ক্ষমা অন্য কোন জাতি লাভ করতে পারেনি। রাসূল ﷺ ছিলেন সবচেয়ে বেশি ইস্তেগফার এবং তাওবাকারী। এমনকি তিনি এক মজলিসে একশ বার– رَبِّ اغْفِرْلِى وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الغَفُور দু'আটি পাঠ করতেন। আর বলতেন–

www.waytojannah.com

Contents

يا أيها الناس توبوا إلى الله ربكم، فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة.

অর্থাৎ, "হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট তাওবাহ করো। কারণ, আমি দৈনিক একশ' বার আল্লাহর কাছে তাওবাহ করি।"

এমনিভাবে তাঁর এ উম্মাতের তাওবাহ্ অন্যান্য উম্মাতের তাওবাহর চেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও দ্রুত কার্যকর। এ উম্মাতের পূর্ববর্তীদের জন্য তাওবা ছিল অত্যন্ত কষ্টের। বানী ইসরাঈলদের গো-বৎসের পূজার কারণে তাওবাহ ছিল আত্মহত্যা করা। আর এ উম্মাতের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে আল্লাহ তাদের তাওবাহ বানিয়েছেন লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে আর কখনো না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়াকে।

নাবীয়ুল মালহামাহ: বলা হয়, যাকে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। রাসূল ﷺ এবং তাঁর উম্মতগণ যে পরিমাণ জিহাদ করেছেন অন্য কোন নাবী ও তাঁর উম্মাতগণ সে পরিমাণ জিহাদ করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মাত ও কাফেরদের মধ্যে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং যা সামনে সংঘটিত হবে পূর্ববর্তী কোন নাবীর উম্মাতের মধ্যে এমনটি হয়নি। রাসূল ﷺ-এর উম্মাতগণ সর্বযুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কাফেরদের সঙ্গে জিহাদরত থাকবে। তারা এমন এমন জিহাদ করেছে যা অন্য কোন নাবীর উম্মাত করেনি।

নাবীইয়ুর রাহমাত: আল্লাহ তাঁকে মহাবিশ্বের জন্য রাহমাত হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাঁর দ্বারা মু'মিন কাফের সকলই রাহমাত লাভ করেছে। যারা মু'মিন তারা তাঁর রাহমাতের এক বিশাল অংশ লাভ করেছে। আর যারা কাফের তাদের মধ্যে যারা আহলে কিতাব তারা সে রাহমাতের ছায়ায় বসবাস করেছে। তাদের মধ্য হতে যাকে নাবী ﷺ এবং তাঁর উম্মাতগণ হত্যা করেছেন তাকে তারা দ্রুত জাহান্নামে পৌঁছে দিয়েছেন। আর তাদেরকে পরকালের স্থায়ী জীবন যেখানে শুধু শাস্তি বৃদ্ধিই পেতে থাকবে সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা প্রশান্তি লাভ করেছেন।

ফাতিহ: তার মাধ্যমে আল্লাহ হিদায়াতের বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছেন। অন্ধদের চোখের দৃষ্টি, বধিরের শ্রবণশক্তি এবং মোহরকৃত অন্তরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর দ্বারা কাফিরদের শহর বিজীত করেছেন। তাঁর দ্বারা জান্নাতের দরজা খুলে দিয়েছেন। খুলে দিয়েছেন তাঁর মাধ্যমে উপকারী ইলম ও সৎ আমলের সকল পদ্ধতিসমূহকে। তাছাড়া তাঁর মাধ্যমে ইহকাল-পরকাল, শহর-গ্রাম, হৃদয় এবং অনেকের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি খুলে দিয়েছেন।

আল-আমীন: পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে তিনিই এ নামের সর্বাধিক উপযুক্ত। তিনি আল্লাহর ওহী এবং দীনের ব্যাপারে একজন বিশ্বস্ত মহামানব। তিনি আকাশবাসী এবং যমীনবাসী সকলের নিকটই বিশ্বাসী আর এ কারণে তাঁর নাবুওয়াতের পূর্ব হতে মানুষ তাকে আল-আমীন বলে ডাকত।

যাহ্ক এবং ক্বাত্তাল: নাম দুটি পরস্পরে মিলিত একটি থেকে অন্যটির পৃথক হওয়া অসম্ভব। তিনি মু'মিনদের সম্মুখে সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন কখনো তাদেরকে রাগ করতেন না। কোন বিষয়ে তাদের ধমকাতেন না। তাদের সঙ্গে কখনো দুর্ব্যবহার করতেন না। অন্যদিকে কাফেরদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন কঠোর। আল্লাহর শত্রু কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তিনি কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করতেন না।

বাশীর: যে তাঁর অনুসরণ করবে তিনি তাঁকে সাওয়াবের সুসংবাদদাতা। আর যে অন্যায় করবে তাকে শাস্তি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনকারী। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় রাসূল ﷺ-কে তঁর বান্দাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

www.waytojannah.com

Contents

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ.

"আর যখন আল্লাহর বান্দাহ তাঁকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হয়।" (সূরা: জ্বিন- ১৯)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ.

"পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফায়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন।" (আল-ফুরক্বান- ১)

আরো ইরশাদ হচ্ছে–

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا.

"এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি।" (সূরা: আল-বাকারা- ২৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন–

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر.

"আমি কিয়ামাতের দিনে বনী আদমের সর্দার হব এবং এটি কোন গর্বের বিষয় নয়।" আল্লাহ তাঁর নাম রেখেছেন, 'সিরাজুম মুনীরা' আর সূর্যের নাম রেখেছেন, 'সিরাজান ওহহাজান'।

মুনীর: বলা হয়, যে কোন জিনিসকে জ্বালানো ব্যতীতই আলোকিত করে। কিন্তু ওহহাজ এর বিপরীত। কারণ ওহহাজে জিনিসের কিছুটা ক্ষয়ক্ষতি হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় হিযরাতের আলোচনা

মুসলমানদের সংখ্যা যখন ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। আর কাফেররা মুসলিমদের এ বৃদ্ধিতে সঙ্কিত। তখন তারা রাসূল ﷺ-কে বিভিন্ন রকমের শাস্তি দিতে শুরু করল এবং মুসলিমদেরকেও নানা রকম নির্যাতন করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের আবিসিনিয়ায় হিজরাতের অনুমতি দিলেন। বললেন, "সেখানে একজন বাদশাহ আছেন, যার সম্মুখে মানুষকে নির্যাতন করা হয় না।"

অতঃপর মুসলিমদের মধ্য হতে বারোজন পুরুষ ও চৌদ্দজন নারী আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তাঁদের মধ্যে উসমান ইবনু আফ্ফানও ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন। তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী রাসূল ﷺ-এর কন্যা রুকাইয়্যাও ছিলেন। অতঃপর তাঁরা সেখানে সুখ-শান্তিতেই বসবাস করতে থাকেন। একদিন তাঁদের কাছে সংবাদ এল যে, কুরাইশরা মুসলিম হয়ে গেছে। সংবাদটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। সাহাবীগণ এ সংবাদ শুনে মক্কায় ফিরে আসেন। ফিরে এসেই তাঁরা যখন বুঝতে পারলেন যে, অবস্থা আগের চেয়ে আরো ভয়ানক। তখন তাদের অনেকেই ফিরে আসেন। আবার অনেকেই সেখানে গিয়ে কাফেরদের কষ্ট আর নির্যাতনের শিকার হন। যাঁরা মক্কায় ফিরে যান তাদের মধ্যে একজন হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ। অতঃপর তাদেরকে দ্বিতীয়বার আবিসিনিয়ায় হিজরতের নির্দেশ দেয়া হয়।

সে সময় ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন নারী আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। আর বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট ভালোভাবেই দিনাতিপাত করতে থাকেন। কুরাইশ সম্প্রদায় এ সম্পর্কে জানতে পেরে আমর ইবনুল আস ও আব্দুল্লাহ ইবনু রাবী'আকে একদল লোকের সঙ্গে বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে গিয়ে মুসলিমদের ব্যাপারে চক্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সেখানে প্রেরণ করে। আল্লাহ তাদের চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দেন।

www.waytojannah.com

Contents

অপর দিকে দুর্বৃত্তরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিভিন্নভাবে নির্যাতান করতে শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা তাঁকে ও তাঁর আহলে বাইতকে আবূ তালিব উপত্যকায় তিন বছর পর্যন্ত অবরোধ করে রাখে। কারো মতে দু'বছর পর্যন্ত অবরোধ করে রাখা হয়। অবশেষে ৪৯ বছর বয়সে সেখান থেকে মুক্তি লাভ করেন। কেউ কেউ বলেছেন, তখন তাঁর বয়স ছিল, ৪৮ বছর। এর কয়েক মাস পরে রাসূল ﷺ-এর চাচা আবূ তালিব মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৮৭ বছর। এ উপত্যকায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল ﷺ-এর চাচার মৃত্যুর কয়েকদিন পরে হারান আদর্শ জীবনসঙ্গিনী বিবি খাদিজাতুল কুবরাকে। যার ফলে কুরাইশদের নির্যাতন নতুন করে জেগে উঠে। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি তায়িফ গমনে মনস্থ করেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন, যায়িদ ইবনু হারিসা। কিন্তু তায়িফবাসী তাকে নানা রকম নির্যাতান করতে শুরু করে। তিনি সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করলেন কিন্তু তাঁর ডাকে তায়িফবাসীর কেউই সাড়া দিলে না। বরং তায়িফবাসী তাঁকে সেখান থেকে বহিষ্কার করার উদ্দেশ্যে অমানুষিক নির্যাতান চালাতে লাগল। এমনকি তারা একদল লোককে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। পাষাণ্ডরা প্রস্তরাঘাতে তাঁর পা রক্তাক্ত করে দিল।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখান থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পথ চলতে আদ্দাস নামক এক খ্রিস্টানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ঈমান আনেন এবং তাঁর নাবুওয়াতকে সত্যায়ন করেন। আর এ সফরেই নাসীবিয়ীনের অধিবাসী ৭ জন জিন এর সঙ্গে 'নাখলা' নামক স্থানে সাক্ষাৎ হয় ও তারা তাঁর কুরআন পাঠ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে তাঁর উপর ঈমান আনেন। সেই সময়ই আল্লাহ পাহাড়ের কাজে নিয়োজিত ফেরেশতা প্রেরণ করেন। ফেরেশতা তাঁকে তায়িফবাসীর জন্য বদ-দু'আ করতে বলেন। আরো বলেন, আপনি চাইলে আমি তায়িফবাসীকে মক্কার দুই পাহাড়েরর মাঝে চাপা দিয়ে চিরদিনের জন্য তাদের শেষ করে দিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, "না, বরং আমি তাদের জন্য এমনটি করবো না। কারণ, হতে পারে, আল্লাহ তাদের সন্তানাদির মধ্য থেকে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে এক আল্লাহর ইবাদাত করবে ও তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না।"

আর এ সময় প্রসিদ্ধ দু'আটি বারংবার পড়তে থাকেন–

اللهم إليك انى أشكو ضعف قوتى، وقلة حيلتى.....

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আমার অক্ষমতা, দুর্বলতা ও ব্যর্থতার অভিযোগ করছি।"

অতঃপর মুতঈম ইবনু আদীর প্রতিবেশী হয়ে মক্কায় গমন করেন। অতঃপর তিনি আত্মা এবং স্বশরীরে মিরাজ বা নভোভ্রমণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি সর্বপ্রথম মাসজিদে আকসা এরপর সেখান থেকে সপ্ত আকাশের দিকে যাত্রা করেন। এ সফরে আল্লাহ সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন হয় এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়। এ মিরাজ বিশুদ্ধ মতানুসারে কেবল একবারই হয়েছে। কারো কারো মতে, এ মিরাজ হয়েছে ঘুমে। আবার অনেকে বলেন, তাঁকে ভ্রমণ করানোর কথা বলা হয়েছে। সে ভ্রমণ ঘুমে না জাগ্রত অবস্থায় এর কোনো স্পষ্ট বিবরণ নেই।

কারো কারো মতে মিরাজ দুই বার হয়েছে। একবার ঘুমে আরেকবার জাগ্রত অবস্থায়। কারো মতে আরো তিনবার উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তবে নাবুওয়াতের পরে মিরাজ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। হাদীসের রাবী শরীক থেকে ওহী আসার পূর্বে মিরাজ হওয়ার যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তা শারীকের ৮টি ভুলের একটি এবং এটি হয়েছে তার মুখস্থ শক্তি দুর্বল হবার কারণে। কেউ কেউ বলেছেন যে ওহী

www.waytojannah.com

Contents

আসার পূর্বে যে ইসরা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় সেটি হয়েছিল ঘুমে। তার জাগ্রত অবস্থায় যে ইসরা হয়েছে সেটি হয়েছে নাবুওয়াত প্রাপ্তির পরে। অনেকের মতে ওহীই হল ইসরা। সুতরাং পূর্বে কোন সংবাদ না দিয়েই তাকে হঠাৎ করে মিরাজে ডেকে নেয়া হয়।

রাসূল ﷺ মক্কায় এসে অবস্থান করতে লাগলেন আর মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে থাকলেন। এবং প্রত্যেক হাজ্জের মাওসুমে তাদের নিকট গিয়ে গিয়ে আল্লাহর বাণী পৌছাতে লাগলেন। তাদের শুনাতে লাগলেন প্রতিপালকের বার্তা এবং ইসলাম কবুল করলে জান্নাত দেয়ার সুসংবাদ দিতে লাগলেন। কিন্তু কোন গোত্র তার এ ডাকে সাড়া দিল না। সকল গোত্রের নিকট থেকে যখন তিনি ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসলেন। তখন আল্লাহ আনসারদের জন্য এর সম্মান অর্জনের সুযোগ করে দিলেন। আল্লাহ যখন তাদের মাধ্যমে দীনের জয়, সাহায্য, সহযোগিতার এবং শত্রুদেরকে শাস্তি প্রদানের মনস্থ করলেন তখন তার নাবীকে তাদের নিকট পাঠালেন। তিনি ৭জন কিংবা ৮ জন আনসারী লোকের নিকট গেলেন। তারা হাজ্জের মওসুমে মিনার পাদদেশে বিশ্রাম করছিল। রাসূল ﷺ তাদের নিকট গিয়ে বসলেন এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। এবং তাদেরকে কোরআন পড়ে শুনালেন। তারা হযরতের মুখ নিঃসৃত অমীয় বাণী শুনে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে দেয় এবং মদীনায় চলে যায় এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে থাকে। ইসলামের কথা ও অমীয়মাখা বাণী আনসারদের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌছে যায় এবং মদীনায় সর্বপ্রথম যে মাসজিদে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় সেটি হল, মাসজিদে বনী যুরাইক।

অতঃপর পরবর্তী বছরে পূর্বের ৬ জনের মধ্য হতে ৫ জনসহ মোট ১২ জন আনসারী পুরুষ মক্কায় আগমন করে। অতঃপর তারা আকাবায় সমবেত হয়ে রাসূল ﷺ-এর হাতে বাইআতুননিসার বাইআত গ্রহণ করে সেবারের মত দেশে ফিরে যায়। পরের বছর হজ্জের সময় তাদের ৭৩ জন নারী-পুরুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে। তাদেরকে সর্বশেষ আহলে আকাবা বলা হয়। অতঃপর তারা তাদের স্ত্রীদের সন্তান-সন্ততি এবং নিজেদের জন্য যে জিনিস অপছন্দ করে রাসূল ﷺ-এর জন্যও তা আচ্ছন্ন করবে বলে রাসূল ﷺ-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করে। অতঃপর রাসূল এবং তাঁর সাহাবাদেরকে মদীনা হিযরতের নির্দেশ দেয়া হয়। অতঃপর কারো কারো মতে আবূ সালাম ইবনু আবদুল আসাদ আল মাখযুমী সর্বপ্রথম মাদীনায় হিযরত করেন। অনেকের মতে মুসআব সর্বপ্রথম মদীনা হিযরত করেন। যা হোক তারা যখন মাদীনায় হিযরত করেন তখন মদীনাবাসীরা তাদের আশ্রয় দিল, বুকে জড়িয়ে ধরল এবং সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করল। মদিনার আনাচে-কানাচে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ﷺ মাদীনায় হিযরাতের নির্দেশ দেন। তখন রাসূল ﷺ-এর বয়স ছিল ৫৩ বছর। রাসূল ﷺ আবূ বকর, (রা) তার ক্রীতদাস আমির ইবনু ফুহাইরা এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে আব্দুল্লাহ ইবনু উরাইকিত আল লাইসীকে সঙ্গে নেন। রাসূল এবং আবূ বাকর হিরা গুহায় আশ্রয় নেন এবং সেখানে তিন দিন অবস্থান করেন।

অতঃপর সাগরের উপকূল ধরে যখন তারা উভয়ে মদীনায় পৌছলেন তখন দিনটি ছিল রবীউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখের দিবাগত রাত্রির সোমবার দিন। অনেকে এর ভিন্ন মতও ব্যক্ত করেছেন। অতঃপর মদীনার কোবা পল্লীর বনী আমর ইবনু আউফ এর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মতান্তরে বনী উবাইদ বংশের কুলসুমের গৃহে আশ্রয় নেন। আবার কারো মতে সা'দ ইবনু খাইছামাহ এর গৃহে আশ্রয় নেন। তবে প্রথম উক্তিটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। অতঃপর তিনি ﷺ সেখানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। এসময়

www.waytojannah.com

Contents

তিনি সেখানে মাসজিদে কোবা প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর জুমু'আর দিন মদীনার দিকে যাত্রা করেন। বনী সালিম গোত্রের নিকট পৌছলে জুমু'আর নামাজের সময় হয়ে যায়। অতঃপর একশত জন মুসলমানকে নিয়ে সেখানে জুমু'আর নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষ করে তিনি তার উটের পৃষ্ঠে সওয়ার হলে মদীনার দিকে চলতে লাগলেন। রাসূল ﷺ-এর যাত্রার সংবাদে সর্বত্র আবার একটা উন্মাদনার সাড়া পড়ে গেল। লোকেরা এসে তার উটের লাগাম ধরতে লাগলো। নাবী ﷺ বললেন, "তোমরা তাকে ছেড়ে দাও কারণ সে আল্লাহর পক্ষ হতে আদিষ্ট"। অবশেষে বর্তমান মাসজিদে নববী যেখানে অবস্থিত সেখানে এসে উটটি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। জায়গাটি ছিল বনু-নাজ্জার গোত্রের সাহ্ল ও সুহাইল নামক এতিম বালকদ্বয়ের উট বাঁধার স্থান।

রাসূল ﷺ সেখানে উট থেকে নেমে আবূ আইয়ুবের গৃহে অবস্থান করেন এবং উট বাঁধার স্থানে তিনি এবং তার সাহাবীরা মিলে কাঁচা ইট এবং খেজুরের ডাল দিয়ে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এ মসজিদের পাশে নিজের জন্য এবং নিজের স্ত্রীদের জন্য একটি বাসভবন নির্মাণ করেন। সবচেয়ে নিকটবর্তী বাসভবন ছিল আয়িশা (রা)-এর। ৭ মাস পরে রাসূল ﷺ আবূ আইয়ুব আল-আনসারীর বাড়ি থেকে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেন। আবিসিনিয়ায় অবস্থানরত সাহাবার যখন তাঁর মদীনায় হিযরতের কথা জানতে পারল তখন তাদের মধ্য থেকে ৩৩ জন পুরুষ সেখান থেকে ফিরে আসে। পথিমধ্যে মক্কায় তাদেরকে ৭ মাস আটকে রাখা হয়। অতঃপর তারা ধীরে ধীরে মদিনায় চলে আসে এবং তাদের সকলেই সপ্তম হিজরীতে খাইবার যুদ্ধের সময় জাহাজে চড়ে মদীনায় কি করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তানাদি

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তানাদির একজনের নাম হল কাসিম এবং এ নামই ছিল নাবী ﷺ-এর উপনাম। কাসিম শিশু অবস্থায় মারা যান। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি সাওয়ারীতে আরোহণ করার উপযুক্ত হয়েছিলেন এবং সাওয়ারীতে করে সফরও করেছেন।

রাসূল ﷺ-এর কন্যাদের একজনের নাম হল যয়নাব। তিনি কাসিমের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। এরপর রুকাইয়্যা, উম্মে কুলসুম, এবং এরপরে ফাতেমা (রা) জন্ম গ্রহণ করেন। আবার প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে যে তিনি তার অপর দুবোন হতে বড়। ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের তিনজনের মধ্যে রুকাইয়্যা হলেন সবার বড় এবং উম্মে কুলসুম সকলের ছোট।

এরপর আব্দুল্লাহ নামের সন্তান জন্ম লাভ করেন। তিনি নাবুওয়াতের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন না পরে এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। অনেকে নাবুওয়াতের পরে জন্ম হওয়ার উক্তিটিকেই সহীহ বলেছেন। তার নামই কি তাইয়্যিব তাহির নাকি অন্য কিছু? এ ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে। সঠিক কথা হল, এ দুটি নামই আব্দুল্লাহর উপাধি। উপর্যুক্ত সকলেই খাদীজার সন্তান। অন্য কোনো বিবি থেকে তাঁর অন্য কোন সন্তান জন্মেনি। এরপর অষ্টম হিজরীতে তাঁর একটি সন্তান জন্ম লাভ করে। মারিয়ার মনিব আবূ রাফি পূর্বেই এ সন্তানের ব্যাপারে রাসূলকে সুসংবাদ দিয়েছিল। ইবরাহীম বাল্যকালেই মারা যান। রাসূল ﷺ তাঁর জানাযা পড়েছেন কি না এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়। ফাতিমা ব্যতীত রাসূল ﷺ-এর সকল সন্তানই তাঁর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন। ফাতিমা রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পরও ৬ মাস জীবিত ছিলেন। এরপর তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বের সকল নারীর শ্রেষ্ঠ নারী। রাসূল ﷺ-এর অন্যান্য সন্তানদের মধ্য

www.waytojannah.com

Contents

তিনি ছিলেন সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। অনেকের মতে তিনিই হলেন বিশ্বের সকল নারীদের শ্রেষ্ঠ নারী। কারো মতে তার মাতা খাদীজা হলেন সকল নারীদের শ্রেষ্ঠ নারী। এরপর আয়িশা (রা) এবং অনেকে এ বিষয়ে চুপ থেকেছেন।

রাসূল ﷺ-এর চাচা ও ফুফুগণ

রাসূল ﷺ-এর চাচাদের একজন হলেন শেরে খোদা ও শেরে রাসূল সকল শহীদদের সর্দার ﷺ হামযা ইবনু আব্দুল মুত্তালিব। আর অন্যান্যরা হলেন: ইবনু আব্বাস, আবূ তালিব, যার প্রকৃত নাম আবদে মানাফ। লাহাব যার প্রকৃত নাম আবদুল উয্যা 'যুবাইর', আব্দুল কা'বাহ, মুকাত্তভিম, যারার কুছাম, মুগীরাহ যার উপাধি হল হাযাল এবং কাইদাক, প্রকৃতনাম মুসআ'ব। কেউ কেউ বলেছেন তার নাম হল নাউফিল। অনেকে আবার আউয়াম নামের একজন বৃদ্ধি করেছেন। রাসূল ﷺ-এর চাচাদের মধ্যে শুধু হামযা ও আব্বাসই কেবল ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ দু'জন ব্যতীত অন্যান্যরা কেউ ইসলাম আনেনি। আর রাসূল ﷺ-এর ফুফুরা হলেন, যুবাইর ইবনুল আউয়াম এর মা সাফিয়াহ, আতিকা, বার্‌রাহ, আরওয়া, উমাইমা ও উম্মু হাকীম আলবাইয়া প্রমুখগণ। তাদের মধ্যে শুধু ছাফিয়াই কেবল ইসলাম এনেছেন। আতিকা এবং আরওয়া ইসলাম এনেছেন কি না এ নিয়ে মতানৈক্য আছে। অনেকে আরওয়ার মুসলমান হওয়াকেই সহীহ বলেছেন। রাসূল ﷺ-এর চাচাদের মাঝে সবচেয়ে বয়স্ক ছিলেন: হারিস এবং সবচেয়ে ছোট ছিলেন আব্বাস। আব্বাস মৃত্যুর সময়ে অনেক সন্তান-সন্ততি রেখে গিয়ে ছিলেন। বাদশাহ মামুনের যুগে তাদের সংখ্যা ছিল ৬ হাজার। তবে উক্তিটি খুবই দুর্বল। এমনি আবূ তালিবও এক ঠিক সন্তান রেখে যান। এমনি হারিছ ও আবূ লাহাবও। অনেকের মতে হারিছ যিনি তিনিই মুকাওভিম।

রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীগণ

রাসূল ﷺ-এর প্রথম স্ত্রী হলেন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ আল আসাদিয়্যাহ। নাবী ﷺ তাকে নবুওয়াতের পূর্বে বিবাহ করেন। তখন খাদীজা ছিলেন ৪০ বছরের প্রৌঢ়। খাদীজার জীবদ্দশায় তিনি অন্য কাউকে বিবাহ করেননি। ইবরাহীম ব্যতীত রাসূল ﷺ-এর সকল সন্তান-সন্ততি খাদীজা থেকে হয়েছে। খাদীজা ছিলেন একজন মহামানবী নারী যিনি নাবী ﷺ-কে নাবুওয়াতের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে অনেক কষ্ট করেছেন। নিজের জান ও মাল দিয়ে তাঁর সাহায্য করেছেন। তিনি এমন নারী যার নিকট ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহ সালাম পাঠিয়েছেন। তার বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল অতুলনীয় যা অন্য কোনো নারীর মাঝে পাওয়া দুষ্কর। তিনি হিজরতের তিন বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেন।

তার ইন্তিকালের কিছু দিন পরে নাবী ﷺ সাওদা বিনতে যাম'আ আল-কুরাইশীয়াহকে বিবাহ করেন। এ সাওদাই তার হক্বকে আয়িশার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং এরপর উম্মু আবদুল্লাহ আয়িশা বিনতে সিদ্দীকাকে (রা)-কে বিবাহ করেন যার পবিত্রতার ঘোষণা সপ্ত আসমানের উপর থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-এর প্রিয় সঙ্গীনী। তাকে বিবাহের পূর্বে ফেরেশতারা রাসূল ﷺ-এর নিকট তার আকৃতি দামি কাপড়ের টুকরাতে পেঁচিয়ে পেশ করেছিল এবং বলেছিল ইনি আপনার 'স্ত্রী'। রাসূল তার ৬ বছর বয়সে শাওয়াল মাসে তাকে বিবাহ করেন এবং তার ৯ বছর বয়সে প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে ঘর তুলে আনেন। তিনি তাকে ব্যতীত অন্য কোনো কুমারী নারী বিবাহ করেননি এবং তিনি ছাড়া অন্য

www.waytojannah.com

Contents

কোন স্ত্রীর ঘরে নাবী ﷺ লেপে আবৃত থাকা অবস্থায় ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-এর খুব প্রিয়। আসমান থেকে তার পবিত্রতার সনদ এসেছে। তার অপবাদ দাতা সর্বসম্মতভাবে কাফের। তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। শুধু রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীগণের মধ্যে নন; বিশ্বের সকল নারীদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন সমস্যার সামাধানও মাসআলা মাসাইল জানতে তাঁর নিকট আসতেন।

এরপর রাসূল হাফসা বিনতে উমার ইবনুল খাত্তাবকে বিবাহ করেন। ইমাম আবূ দাউদ উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল ﷺ তাকে তালাক দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তালাক উঠিয়ে নেন।

এরপর যয়নাব বিনেত খুযাইমাই ইবনুল হারিছ আল কাইসিয়্যাহকে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন হেলাল ইবনু আমির গোত্রের। তিনি বিবাহের দু'মাস পরে ইন্তেকাল করেন।

এরপর উম্মু সালামা হিন্দ বিনতে আবূ উমাইয়্যাহ আল-কুরাশীয়াহ আল মাখযুমীয়্যাহকে বিবাহ করেন। আবূ উমাইয়্যাহর নাম হল হুযাইফা ইবনুল মুগীরাহ। তিনি রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে সর্বশেষ ইন্তিকাল করেন। কারো মতে, সর্বশেষ ইন্তেকাল করেছেন সাফিয়্যাহ। রাসূল ﷺ-এর সাথে উম্মু সালামাকে বিবাহ দিতে কে অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছিলেন তা নিয়ে মতানৈক্য আছে। ইবনু সা'দ তার "আত্-তাবাকাত" এ বলেন, রাসূল ﷺ-এর সাথে উম্মু সালামাকে বিবাহ প্রদানে অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন সালামা ইবনু আবূ সালামা। উম্মে সালামার পরিবারের অন্য কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করেনি এবং নাবী ﷺ যখন সালামা ইবনু আবি সালামার সাথে উমামা বিনতে হামযাকে বিবাহ দিলেন যার ব্যাপারে আলী, হামযা এবং যায়িদ (রা) ঝগড়া করেছিলেন তখন রাসূল ﷺ বললেন: আমি কি সালামাকে প্রতিদান দিতে পেরেছি। আবূ সালামা রাসূল ﷺ-এর বিবাহের অভিভাবকত্ব গ্রহণের কারণেই নাবী এমনটি বলেছেন। এ কথাগুলো ইবনু সা'দ আবূ সালামার জীবনীতে এনেছেন। অতঃপর ইবনু সা'দ উম্মু সালামার জীবনীতে ওয়াকেদী থেকে বর্ণনা করেন যে, তাকে মুজামমি'য় ইবনু ইয়াকুব আবূ বাকার ইবনু মুহাম্মদ ইবনু ওমার ইবনু আবূ সালামা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছে যে,রাসূল ﷺ উম্মু সালামার ব্যাপারে তার পুত্র সন্তান উমর ইবনু আবী সালামার নিকট বিবাহের প্রস্তাব দেন। অতঃপর উমার ইবনু আবী সালামা তার আম্মাকে রাসূল ﷺ-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়। উমার ইবনু আবী সালামা এ সময় ছোট বাচ্চা ছিল।

ইমাম আহমাদ তার (মুসনাদে) বলেন, উম্মু সালামা থেকে বর্ণিত উম্মু সালামা যখন আবূ সালামের ইদ্দত পূর্ণ করল তখন নাবী ﷺ তাঁর নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। তখন উম্মু সালামা বলেন, রাসূল ﷺ-এর প্রস্তাবকে স্বাগতম। তবে আমি যে একজন আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন নারী এবং আমি এখন বিপদগ্রস্ত, তাছাড়া আমার অভিভাবকদেরও কেউ উপস্থিত নেই– (আল হাদীস)। এ হাদীসে এসেছে যে, উম্মু সালামা তার পুত্র উমারকে বললেন: উঠ, রাসূলকে ﷺ বিবাহ করিয়ে দাও। এতে সমস্যা আছে, কেননা নাবী ﷺ যখন মৃতুবরণ করেন তখন এ উমারের বয়স ছিল ৯ বছর যেমনটি ইবনু সা'দ উল্লেখ করেছেন। আর নাবী ﷺ তাকে বিবাহ করেছেন চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে এ হিসেবে তখন উমারের বয়স হওয়া দরকার তিন বছর। এত কম বয়সের শিশুর বিবাহ সহীহ নয়। এমনটি বলেছেন ইবনু সা'দ এবং অন্যান্যারা। ইমাম আহমাদকে যখন বলা হল যে, ওমার তখন ছোট ছিল। তখন তিনি বলেন, কে বলেছে উমার ছোট ছিল? ইবনুল জাওযী বলেন, সম্ভবত ইমাম আহমাদ উমারের বয়স সম্পর্কে অবগত হওয়ার পূর্বে এমনটি বলেছেন। ইবনু সা'দ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বয়সের পরিমাণ উল্লেখ করেছেন। কারো

www.waytojannah.com

Contents

কারো মতে যিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে উম্মু সালামাকে বিবাহ দিয়েছেন তিনি হলেন, উম্মু সালামার চাচাতো ভাই উমার ইবনুল খাত্তাব।

এরপর রাসূল ﷺ যয়নাব বিনতে জাহাসকে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন, রাসূল ﷺ-এর ফুফু উমাইয়্যাহর মেয়ে এবং আসাদ ইবনু খুযাইমা বংশের। তার ব্যাপারে কোরআনের এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে–

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا.

যায়িদ যখন যায়নাবের সম্পর্ক ছিন্ন করল। তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম। (আল-আহযাব: ৩৭)

আর এ নিয়ে তিনি অন্যান্য স্ত্রীদের উপর গর্ব করতেন এবং বলতেন তোমাদেরকে বিবাহ দিয়েছে তোমাদের পরিবার আর আমাকে বিবাহ দিয়েছেন যিনি সপ্ত আসমানের উপরে থাকেন। তিনি উমারের খেলাফাতের শুরু যুগে ইন্তেকাল করেন। প্রথমে রাসূল ﷺ-এর পালক পুত্র যায়িদের সংসারে ছিলেন। যায়িদ তালাক দিলে আল্লাহ রাসূল ﷺ-এর সাথে যয়নাবকে বিবাহ দিয়েছেন। যাতে পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করতে কেউ সংকোচবোধ না করে।

তিনি এরপর জুওয়াইরিয়া ইবনুল হাবিস ইবনু আবী দারার আল মুসতালিকিয়্যাহকে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন মুসতালিকের যুদ্ধে বন্দি হয়ে আসা দাসীদের একজন। জুওইরিয়্যা রাসূল ﷺ-এর নিকট মনিবকে উপর্জন করে টাকা পরিশোধ করার শর্তে মুক্তি নির্ধারণ করা বিষয়ে সাহায্যের জন্য এলে তিনি তাকে সাহায্য করনে এবং তাকে বিবাহ করেন।

এরপর উম্মু হাবীবাকে বিবাহ করেন। তার নাম ছিল রামলা বিনতে আবূ সুফিয়ান কারো মতে হিন্দা। নাবী ﷺ তাকে আবিসিনিয়ায় হিজরতর অবস্থায় বিবাহ করেন। তাঁর পক্ষ থেকে বাদশাহ নাজ্জাশী উম্মু হাবীবাকে মহর হিসেবে ৪ শত দীনার প্রদান করেন। তিনি তার ভাই মু'আবীয়ার শাসনামলে ইন্তিকাল করেন। এমনটি ঐতিহাসীকগণের নিকট প্রসিদ্ধ। তার বিবাহটি ঠিক মক্কায় খাদীজার এবং মাদীনায় হাফসা এবং খাইবারের পরে সাফিয়্যার বিবাহের মত হয়েছে।

ইকরিমা ইবনু আব্বাস থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, আবূ সুফিয়ান রাসূল ﷺ-কে বলল, আমি আপনার নিকট তিনটি জিনিস চাই। অতঃপর নাবী ﷺ তাকে তিনটি জিনিস দিলেন যার একটি হল: আমার নিকট আবরের সবচেয়ে সুন্দরী নারী উম্মু হাবীবা আছে আমি তাকে আপনার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই।

এ হাদীসটি ভুল। ইবনু হাযম বলেন, হাদীসটি নিঃসন্দেহে জাল, ইকরিমা ইবনু আম্মার এতে মিথ্যা বলেছে। ইবনু জাওযী বলেন, কতিপয় রাবী এতে ভুল করেছেন। অনেকে ইকরিমাকে এর দোষ দিয়েছেন। কারণ ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, উম্মু হাবীবাহ আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশের স্ত্রী ছিল। তার থেকে আব্দুল্লাহর সন্তানও হয়েছে এবং উভয়ে আবিসিনিয়ায় মুসলমান অবস্থায় হিজরত করেছেন। এরপর রাসূল নজ্জাশীর নিকট রাসূল ﷺ-এর পক্ষ হতে উম্মু হাবীবাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার কথা বলেন, পরে নাজ্জাশী তাকে রাসূল ﷺ-এর সাথে বিবাহ দেন। এটি ৭ম হিজরীর ঘটনা এরপর আবূ সুফিআন উম্মু হাবীবার গৃহে আসলে তিনি রাসূল ﷺ-এর বিছানার চাদর সরিয়ে দেন যাতে আবূ সুফিয়ান সেখানে বসতে না পারে। যা হোক এ হাদীস নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। কেউ তো বলেছে

www.waytojannah.com

Contents

হাদীসটি সহীহ হলে তিনি তাকে মক্কা বিজয়ের পরে বিয়ে করেছেন এবং ঐতিহাসিকদের বর্ণনার কারণে এ মতকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

একদল বলেছেন: আবূ সুফিয়ান রাসূল ﷺ-এর সন্তুষ্টি কামনায় নতুন করে বিবাহ চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছেন। কারণ তার উপস্থিতি ছাড়াই তিনি তাকে বিবাহ করেছিলেন। এ মতটি ভুল। রাসূল ﷺ সম্পর্কে এ ধরনের কল্পনাও করা যায় না। তাছাড়া আবূ সুফিয়ান থেকেও এমনটি হওয়া অসম্ভব। একদল বলেন, তারা হলেন ইমাম বাইহাকী এর মুনযিরী প্রমুখগণ, তাদের বক্তব্য সম্ভবত এটি হয়েছে আবূ সুফিয়ানের মদীনায় গমনের পর। আর আবিসিনিয়ায় যখন উম্মু হাবীবার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ প্রচার হয় তখন সে কাফির ছিল। আর তাদের মতে ঘটনা দু'টি হয়েছে মক্কা বিজয়ের পরে। কিন্তু বর্ণনাকারী উভয় ঘটনা এক সঙ্গে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তাদের বক্তব্যটি নিতান্তই দুর্বল তাই খণ্ডনের প্রয়োজন নেই।

অনেকের মতে: উল্লিখিত হাদীসের আরো একটি ব্যাখ্যা আছে তা হল: সে তোমার স্ত্রী হবার ব্যাপারে আমি এখন থেকে খুশি। এর কারণ আমি ইতঃপূর্বে খুশি ছিলাম না কিন্তু আমি এখন খুশি। তাই তুমি স্বামী হও এটা আমি চাই।

একদল বলে, আবূ সুফিয়ান যখন শুনল যে রাসূল ﷺ তার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন তখন রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে একথা বলেন। এমতটিও পূর্বের ন্যায় দুর্বল।

অনেকে বলেন: হাদীসটি সহীহ কিন্তু কোনো একজন বর্ণনাকারী উম্মু হাবীবার নাম বলায় ভুল করেছেন এবং আবূ সুফিয়ান চেয়েছিল উম্মু হাবীবার বোন রমলাকে বিবাহ দিতে। কিন্তু এমতটিও ঠিক নয়। কারণ দু'বোনকে একত্রে একসঙ্গে বিবাহ বন্ধনে রাখা হারাম। তাছাড়া উম্মু হাবীবা পূর্ব থেকেই জানতেন যে এ বিষয়টি হারাম, কারণ তিনি রাসূলকে ﷺ বলেছিলেন আপনি কি আমার বোনকে বিবাহ করবেন? রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কি তা চাও? উম্মু হাবীবা বললেন, আমার নিকট এটা সর্বাধিক প্রিয় যে আমার বোন আমার সঙ্গে কল্যাণে অংশীদার হোক। রাসূল ﷺ বললেন, এটা আমার জন্য ঠিক নয়। এ বিষয়টির প্রস্তাবই দিয়েছিল আবূ সুফিয়ান কিন্তু রাবী নিজের পক্ষ থেকে উম্মুই হাবীবার নাম বৃদ্ধি করেছে।

কারো মতে, রামলার উপনাম ছিল উম্মু হাবীবা। এ উত্তরটি যথার্থ হত যদি হাদীসের বাকি অংশ না হত।

এরপর নাবী ﷺ সাফিইয়্যাহ বিনতে হুয়াই ইবনু আখতাবকে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন এক নাবীর কন্যা এবং আমাদের নাবী ﷺ-এর স্ত্রী। তিনি ছিলেন বিশ্ব রূপবতীদের একজন। তিনি রাসূল ﷺ-এর একজন দাসী ছিলেন রাসূল ﷺ তাকে আযাদ করেন এবং এ আযাদ করাকে তার মহর হিসেবে নির্ধারণ করেন। তাই এটি পরবর্তী উম্মাতের জন্য সুন্নাত হয়ে গেছে। কেউ যখন বলবে, আমি আমার দাসীকে আযাদ করলাম এবং তার আযাদ হওয়াকে মহর ঠিক করলাম বা এ জাতীয় কোনো শব্দ বলবে তবে আযাদ করা এবং বিবাহ উভয়টাই শুদ্ধ হবে। নতুন করে বিবাহের চুক্তি বা ওলীর প্রয়োজন নেই। এটাই ইমাম আহমাদ এবং অসংখ্য আহলে হাদীসদের মতামত।

অনেকে বলেন, এটি শুধুমাত্র রাসূল ﷺ-এর জন্য খাস এ মতটি তিন ইমাম এবং তাদের অনুসারীদের মাযহাব। তবে প্রথম উক্তিটি সহীহ। কারণ খাছ না হওয়াই হল আসল। কেননা নারী যদি রাসূল ﷺ-এর নিকট নিজেকে সমর্পণ করে তবে তাকে বিবাহ করা রাসূল ﷺ-এর জন্য বৈধ এবং শুধু তার সাথেই খাস। ইরশাদ হয়েছে–

www.waytojannah.com

Contents

خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ.

অর্থাৎ, "এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য অন্য মুমিনদের জন্য নয়।" (আল-আহযাব- ৫০)

দাসীর ক্ষেত্রে কিন্তু আল্লাহ এমনটি করেননি এমনিভাবে নিজের পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহের ক্ষেত্রেও এমনটি বলেননি। সুতরাং এগুলোতে রাসূল ﷺ-এর উম্মতরা সমান।

এরপর রাসূল ﷺ মাইমুনা বিনতে হারিস আল-হিলালিয়্যাহকে বিবাহ করেছেন। তাকেই রাসূল ﷺ সর্বশেষ বিবাহ করেন। তাকে মক্কায় ওমরা থেকে হালাল হবার পর বিবাহ করেন। কারো মতে হালাল হাওয়ার পূর্বে বিবাহ করেন এবং এমনটিই ইবনু আব্বাসের মত। এ মাসআলায় ইবনু আব্বাস (রা) এর ভুল হয়ে গেছে। কারণ এ ঘটনা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন আবূ রাফি আর তিনি বলেছেন যে, রাসূল তাকে হালাল হওয়ার পর বিবাহ করেছেন।

তিনি মুয়াবিয়ার শাসনামালে ইন্তেকাল করেন এবং যারিফ নামক স্থানে সমাহিত হন।

কথিত আছে রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের আরেকজন হলেন রাইহানা বিনতে যায়িদ আন্‌নাযরিয়া। বনু কুরাইযার দিন তিনি বন্দি হল অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে আযাদ করে বিবাহ করেন। এরপর এক তালাক দেন এবং পরে এর থেকে রুজু করেন।

কারো কারো মতে, তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-এর দাসী। রাসূল ﷺ তার সঙ্গে মালিকানার ভিত্তিতে সহবাস করতেন এবং এ অবস্থাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি দাসীদের দলভুক্ত হুজুরে স্ত্রীদের নন। প্রথম উক্তিটি ওকেদী গ্রহণ করেছেন এবং দিময়াতী এ ক্ষেত্রে তাকে সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন, আহলে ইলমদের মতে এই মতটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

এ সকল রমণীগণ ছিলেন রাসূল ﷺ-এর বিবাহিত স্ত্রী। আর তিনি যাদেরকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন কিন্তু বিবাহ করেননি। এমনিভাবে যে সব নারীরা নিজেকে রাসূল ﷺ-এর নিকটে সমর্পণ করেছে কিন্তু তিনি তাদেরকে বিবাহ করেননি তাদের সংখ্যা প্রায় চার থেকে পাঁচ জন। অনেকে বলেছেন, এ রকমের নারীর সংখ্যা প্রায় ৩০ জন। বিশেষজ্ঞরা এ মত অস্বীকার করেছেন এবং প্রসিদ্ধ হল রাসূল ﷺ জাওনিয়া নামক মহিলার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর সে মহিলা রাসূল ﷺ-এর নিকট বিবাহের জন্য আসলে রাসূল ﷺ তাকে বিবাহ করা থেকে তাওবা করেন এবং তাকে আর বিবাহ করেননি। এমনটি হয়েছে কালবিয়া নামক জনৈক মহিলার সাথেও এবং ঐ মহিলার সাথেও যার বাহুর শুভ্রতা তিনি দেখেছিলেন। আর কোনো নারী তার সামনে নিজেকে সমর্পণ করেছিল অতঃপর তিনি তাকে অন্যের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন যেমনটি কুরআনের বর্ণনা এ সম্পর্কে আল্লাহ ভালো জানেন।

এতে এ ব্যাপারের কারো দ্বিমত নেই যে, তিনি নতুন স্ত্রীকে রেখে মৃত্যু বরণ করেন। আয়িশা, হাফসা, যয়নাব বিনতে জাহাশ, উম্মু সালামা, সাফিয়্যাহ উম্মু হাবীবা, মাইমুনাহ যাওদা জুওয়াইরিয়াহ, তিনি তাদের জন্য রাতকে আটভাগে ভাগ করতেন। রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর তাঁর সর্বপ্রথম যে স্ত্রী ইন্তে কাল করেন তিনি হলেন যায়নাব বিনতে জাহাশ। তিনি বিশ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন এবং সবার শেষে উম্মু সালামা ইন্তিকাল করেন। তিনি যা যায়িদ এর শাসনামলে ৬২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

www.waytojannah.com

Contents

রাসূল ﷺ-এর উপপত্নীগণ

আবূ উবাইদা বলেন, রাসূল ﷺ-এর চারজন উপপত্নী ছিল। একজন হলেন মারীয়ায়ে কিবতী তিনি হলেন রাসূল ﷺ-এর সন্তান ইবরাহীমের মাতা। দ্বিতীয়জন রাইহানা। বন্দিদের মধ্যে পাওয়া একজন সুন্দরী দাসী এবং যয়নাব বিনতে জাহাশের দেওয়া অপর আরেকজন দাসী।

রাসূল ﷺ-এর দাস-দাসীগণ

রাসূল ﷺ-এর আযাদকৃত দাসদের একজন হলন যায়িদ ইবনু হারিসা ইবনু সারাহীল। তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-এর প্রিয় পাত্র। রাসূল ﷺ তাকে আযাদ করে উম্মু আইমানকে তার সঙ্গে বিবাহ দেন এবং উম্মু আইমান থেকে উসামা নামে তার একজন সন্তান হয়। রাসূল ﷺ-এর অন্যান্য দাসসমূহের মধ্যে আসলাম, আবূ রাফি, ছাওবান, আবূ কাবশা সুলাইম, শুকরান, তার নাম হল সালিহ। রাবাহ নূবী এবং ইসার নূবী প্রমুখ অন্যতম। ইসার উরানিইয়ীনদের হাতে নিহিত হয়। এমনিভাবে মিদআম, কারকিরাহ এবং নূবী নামের দাসও তার ছিল। নূবী নামক দাস খাইবারের যুদ্ধে রাসূল ﷺ-এর সাওয়ারী নিজের নিকট আটকে রাখত। সহীহ বুখারীতে এসেছে। এই দাসই খায়বারের যুদ্ধে চাদর চুরি করে। রাসূল ﷺ জানতে পেরে তার সম্পর্কে বললেন, সে এ চাদরের কারণে জাহান্নামে জ্বলবে। মুআত্তায় এর নাম বলা হয়েছে মিদআম এবং তাদের উভয়েই খায়বার যুদ্ধে নিহিত হয়।

দাসদের আরো কয়েকজন হলো, আনজাশাহ আলহাদী এবং সফীনা ইবনু ফাররুখ তার নাম হল মিহরান রাসূল ﷺ তার নাম রেখেছেন সাফীনা কারণ সাহাবারা তাদের সফরের সকল বোঝা তাকে দিয়ে বহন করাত। তখন থেকেই তিনি সাফীনা নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। আবূ হাতেম বলেন, রাসূল ﷺ তাকে আযাদ করেন। অন্যান্য আলেমদের মতে উম্মু সালামা তাকে আযাদ করেন। তাদের আরো কয়েকজন হলেন, আনাসা যার উপনাম আবূ মিশরাহ, আফলাহ, উবাইদ, তাসমান, যার নাম কাইসান, যাকওয়ান, মিহরান, মারওয়ান হুনাইন, সানদার, ফাযালা ইয়ামেনী, মাবুর খাসসী, ওয়াকিদ, আবূ ওয়াকিদ আবূ আসীব এবং আবূ মুআইছিবাহ প্রমুখ দাসগণ। আর দাসীদের মধ্যে ছিলেন, সালমা উম্মু রাফি, মাইমুনা বিনতে সা'দ, খাযরা, রেজভী, রযীনাহ, উম্মে যুমাইরাহ, মাইমুনা বিনেত আবূ আসীব, মারিয়া এবং রাইহানা প্রমুখগণ।

রাসূল ﷺ-এর খাদিমগণ

তাদের এজকজন হলেন আনাস ইবনু মালিক (রা) তিনি রাসূল ﷺ-এর কখন কী প্রয়োজন সে দায়িত্ব আদায় করতেন। তাদের আরেকজন হলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) তার দায়িত্ব ছিল রাসূল ﷺ-এর জুতা মোবারক এবং মিসওয়াক বহন করা। আর উকবা ইবনু আমের আল জুহানীর দায়িত্ব ছিল রাসূল ﷺ-এর খচ্চর দেখা-শুনা করা। তিনি সফরে এ খচ্চরকে হাঁকিয়ে নিতেন। আসলাম ইবনু শরীক ছিলে রাসূল ﷺ-এর উটের রক্ষক ও দেখাশুনাকারী। তাদের ছাড়াও আরো যারা রাসূল ﷺ-এর খাদিম ছিল। তারা হলেন: মুয়াজ্জিন বেলাল ইবনু রাকাহ, আবূ বাকরের গোলাম সা'দ গিফারী, আইমান ইবনু উবাইদ, তার মাতা রাসূল ﷺ-এর দাসী উম্মু আইমান। উম্মু আইমানের দায়িত্ব ছিল রাসূল ﷺ-এর প্রবিত্রতা এবং প্রয়োজনাদীর খেয়াল রাখা।

www.waytojannah.com

Contents

রাসূল ﷺ-এর লেখক/কাতিবগণ

আবূ বাকর, উমার, উসমান, আলী, যুবাইর, আমির ইবনু ফুহাইরাহ, আমর ইবনুল আস, উবাই ইবনু কা'ব, আবদুল্লাহ ইনুল আরকাম, সাবিত ইবনু কায়িস ইবনু শাম্মাস, হানযালাতুবনুর রাবী আল-উসাইদী, মুগীরাতুবনু শু'বাহ আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা, খালিদ ইবনুল ওলীদ, খালিদ ইবনু সাঈদ ইবনুল আ'স, বলা হয় তিনিই হলেন সর্বপ্রথম লেখক, মু'য়াবীয়া ইবনু আবী সুফিয়ান এবং যায়িদ ইবনু সাবিত, এ কাজে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশি জড়িত।

শরীয়ত সম্পর্কিত যেসব চিঠিপত্র তিনি মুসলমানদের নিকট প্রেরণ করেছেন

তার একটি হল সদকা সংক্রান্ত বিষয়ের চিঠি যা আবূ বাকরের কাছে ছিল এবং জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে আবূ বাকর যখন আনাস ইবনু মালিককে বাহরাইনে প্রেরণ করেন তখন এ চিঠিটিই তার নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

এমনিভাবে রাসূল ইয়ামানবাসীদের নিকট পত্র প্রেরণ করেছিলেন। এ পত্রটিই আবূ বাকর ইবনুল আমর ইবনু হাযম তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে পরম্পরায় বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে পত্রটি হাকিম তার মুস্তাদারাক এবং নাসায়ী তার সুনানে মুত্তাসিল সূত্রে এবং মুসনাদ সূত্রে ইমাম আবূ দাউদ এবং অন্যরা মুরসাল সূতে রিওয়ায়াত করেছেন। পত্রটির কলেবর অনেক বড়। পত্রটিতে যাকাত, মুক্তিপণ এবং বিভিন্ন বিধি-বিধান সম্পর্কীয় একাধিক ফেকহী বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে। তা ছাড়া পত্রটিতে কবীরাগুনাহ, তালাক, দাস-দাসী, আযাদ, এক কাপড়ে নামাজ পড়ার বিধান, কাপড়ে নিজেকে পেঁচিয়ে নামাজ পড়ার বিধান, কোরআনের সর্বশেষ বিধান এবং ইত্যাকার বিষয় স্থান পেয়েছে।

ইমাম আহমাদ বলেন, নিঃসন্দেহে রাসূল ﷺ পত্রটি লিখেছেন এবং সকল ফিকাহবিদগণ পত্রে উল্লিখিত মুক্তিপণের পরিমাণ দিয়ে দলীল পেশ করেছেন।

এমনিভাবে যাকাতের পরিমাণ সম্পর্কে রাসূল ﷺ একটি পত্র লিখেন যা পরবর্তীতে উমারের নিকট ছিল। তা ছাড়া রাসূল ﷺ বনী যুহাইরের উদ্দেশ্যেও একটি পত্র প্রেরণ করেন।

বিভিন্ন বাদশাহদের উদ্দেশ রাসূল ﷺ-এর চিঠি ও দূত প্রেরণ

রাসূল ﷺ হুদাইবিয়া থেকে ফিরে এসে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন বাদশাহদের নিটক দূত এবং পত্র প্রেরণ করেন। রাসূল রোম সম্রাট কায়সারের নিকট চিঠি লিখলেন। লোকেরা বলল, তারা মোহর মারা ছাড়া কোন চিঠি গ্রহণ করে না। তাই রাসূল রূপার একটি আংটি তৈরী করেন। সেই আংটিতে তিনটি লাইন লিখা ছিল প্রথম লাইনে মুহাম্মদ, দ্বিতীয় লাইনে, রাসূল, এবং তৃতীয় লাইনে আল্লাহ শব্দ লিখা ছিল। এরপর চিঠিতে মোহর মেরে সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসের প্রথম তারীখে ৬ জন দূত মারফত বিভিন্ন সম্রাটের নিকট চিঠি প্রেরণ করেন। আমর ইবনু উমাইয়্যা আয়যামরীকে প্রেরণ করেন বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট।বাদশাহ নাজ্জাশীর নাম ছিল আসহামাহ ইবনু আবনুর আরাবিয়তে আসহামাহ শব্দের অর্থ হলো "দান"। তার নিকট রাসূল ﷺ-এর চিঠি পৌছলে সে সেই চিঠির যথার্থ সম্মান করে এবং ইসলাম কবুল করে এবং তাঁর ব্যাপারে সত্য সাক্ষ্য প্রদান করে। বাদশাহ নাজ্জাশী ইঞ্জিলের বড় আলেম ছিল। বাদশাহ নাজ্জাশী যখন হাবশায় মৃত্যুবরণ করে রাসূল তখন মদীনায় তার অনুপস্থিতে জানাযার নামাজ আদায়

www.waytojannah.com

Contents

করেন। এমনটিই মতামত একদল আলেমের তাদের মধ্যে ওকেদী অন্যতম। তাদের এ মতামত ঠিক নয় কারণ রাসূল আসহামাহ নামক যে নাজ্জাশীর জানাজা পড়েছেন সে এবং যে নাজ্জাশীর নিকট তিনি প্রেরণ করেছে উভয়ে এক নয়।

দ্বিতীয় জনের ইসলাম গ্রহণের কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ইমাম মুসলিম তার সহীহতে কাতাদার সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ কায়সার, নাজ্জাশী আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা এবং অন্যান্য সমস্ত যালিম রাজাদের নামে পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে আল্লাহর (দীনে ইসলামের) দিকে আহ্বান করেন। আর এই নাজ্জাশী সেই ব্যক্তি নয় যার মৃত্যুতে রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ আদায় করে ছিলেন।

আবূ মাহাম্মদ ইবনু হাযম বলেন, রাসূল যেই নাজ্জাশীর নিকট আমর ইবনু উমাইয়া আযযামরীকে পাঠিয়েছিলেন সে নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করেনি। প্রথম বর্ণনাটিকে ইবনু সা'দ ও অন্যান্যরা গ্রহণ করেছন। তবে ইবনু হাযম এর উক্তিটি বাহ্যত সঠিক মনে হয়। আর দেহিয়া কালবীকে রোমের সম্রাট কায়সারের নিকট দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। কায়সাররে নাম হল হিরাক্লিয়াস সে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করেও ইসলাম গ্রহণ করেনি। কারো কারো থেকে তার ইসলাম গ্রহণের কথাও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কথাটি সঠিক নয়। আবূ হাতিম ইবনু হিব্বান তার সহীহতে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন–

من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة؟ فقال رجل من القوم: وإن لم يقبل؟ قال: وإن لم يقبل، فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس قد جعل عليه بساط لا يمشى عليه غيره، فرمى بالكتاب على البساط، وتنحى، فلما انتهى قيصر إلى الكتاب، أخذه، فنادى قيصر: من صاحب الكتاب؟ فهو آمن، فجاء الرجل، فقال: أنا. قال: فإذا قدمت فأتني، فلما قدم، أتاه، فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر مناديا ينادى: ألا إن قيصر قد اتبع محمدا، وترك النصرانية، فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا به، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ترى أني خائف على مملكتي، ثم أمر مناديه فنادى: ألا إن قيصر قد رضى عنكم، وإنما اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم، فارجعوا فانصرفوا، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسلم، وبعث إليه بدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية، وقسم الدنانير.

আমার এ পত্র নিয়ে কায়সারের নিকট যে পৌছে দিতে পারবে তার প্রতিদান হল জান্নাত। অতঃপর লোকদের মধ্যে হতে একজন উঠে বলল, যদি কায়সার এ পত্র গ্রহণ না করে? উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, যদিও সে পত্র কবুল না করুক। অতঃপর লোকটি কায়সারের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। বাদশাহ কায়সার তখন বাইতুল মাকদিসের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল। তার জন্য বাইতুল মাকদিসে নতুন বিছানা বিছানো হয়েছে। যার উপর দিয়ে অন্য কারো আসা যাওয়ার অনুমতি সম্পূর্ণ নিষেধ। কায়সারকে পত্রটি দিলে সে তা বিছনায় ছুঁড়ে মেরে তার থেকে দূরে সরে গেলে। অতঃপর কায়সার যখন পত্রটির নিকট পৌছল তখন পত্রটি হাতে নিয়ে বলল, এ পত্রটি কার? সে নিরাপদে। এ কথা শুনে লোকটি এসে বলল, আমি। কায়সার বলল, এরপর তুমি যখনই আসবে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। পরবর্তীকালে

www.waytojannah.com

Contents

যখন লোকটি এলো কায়সারের সাথে সাক্ষাৎ করল, কায়সার তার মহলের সকল দরজা বন্ধের নির্দেশ দিল এবং একজন ঘোষণাকারীকে একথার ঘোষণা দিতে বলল, যে সাবধান কায়সার মুহাম্মাদের অনুসারী হয়ে গেছে এবং খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করেছে। এ ঘোষণা শোনা মাত্র তার সৈন্যবাহিনীরা সকলেই অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কায়সারকে বেষ্টন করে ফেলল। এ অবস্থা থেকে কায়সার রাসূল ﷺ এর দূতকে লক্ষ করে বলল, তুমি তো দেখতেই পাচ্ছে যে আমি আমার রাজ্য নিয়ে ভয় করছি। এরপর বাদশাহ কায়সার তার ঘোষণা কারীকে একথার ঘোষণা দিতে বলল যে, তোমরা ভালোভাবে জেনে রাখ কায়সার তোমাদের ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট সে তোমাদেরকে যাচাই-বাচাই করতে চেয়েছে যে, তোমরা তোমাদের ধর্মের উপর কতটা অটল। সুতরাং তোমরা ফিরে যাও। অন্য দিকে কায়সার রাসূলের ﷺ দূতের নিকট লিখে পাঠাল যে, আমি মুসলমান হয়ে গেছি এবং দূতকে অনেক দীনার দিয়ে পাঠিয়ে দিল। রাসূল ﷺ এ সংবাদ শুনে বলেছেন, আল্লাহর শত্রু মিথ্যা বলেছে যে মুসলমান হয়নি বরং সে তো খ্রিষ্টধর্মের উপরই আছে। এরপর দীনারগুলো বণ্টন করে দেন।

আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা আস্ সাহমীকে কিসরার নিকট দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। কিসরার নাম হলো পারভেজ ইবনু হুরমুয ইবনু নওশেরওয়া সে পত্র পেয়ে তা খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলল। অতঃপর রাসূল তার জন্য বদ-দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ, আপনি তার রাজ্যকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেন।" অতঃপর আল্লাহর তার রাজাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলেন। অবশেষে তার রাজ্যের মালিক হয়ে যায় তার প্রজারা।

হাতিব ইবনু আবী বালতা'আকে একটি পত্র দিয়ে প্রেরণ করেন মুকাওকিসের নিকট। তার নাম ছিল যুরাইজ ইবনু মীনাআ। সে ছিল ইস্কান্দারের অধিপতি। সে হাতিব (রা)-কে স্বাগতম জানায় এবং বিষয়টিকে খুব গুরুত্বসহ গ্রহণ করে কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেনি। সে রাসূলকে হাদীয়া স্বরূপ মারীয়া এবং তার দুবোন সীরীন এবং ক্বিসরাকে প্রদান করে। অতঃপর রাসূল মারীয়াকে উপপত্নী এবং দাস হিসেবে গ্রহণ করলেন তার সীরীনকে হাসসান ইবনু ছাবিতের জন্য উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করেন। মাকাওকিস বাদশাহ রাসূল ﷺ-এর জন্য আরো একটি দাসী এক হাজার মিসকাল (সারে চার মাশা পরিমাণ ওজন) স্বর্ণ, মিশরের বিশটি ক্বিবতী পোশাক, দুলদুল নামের খচ্চর উফাইর নামের গাধা, একটি কাঁচের পাত্র এবং কিছু মধু হাদীয়া হিসেবে প্রদান করেন। রাসূল বললেন, নরাধম ওর রাজ্য নিয়ে কৃপণতা করছে ওর রাজ্য বেশি দিন স্থায়ী হবে না।

শুজা'অ ইবনু ওহাব আল আসাদীকে বালকার বাদশাহ হারিস ইবনু আবী শামির আল গাস্সানীর নিকট পত্র দিয়ে প্রেরণ করেন। বর্ণনাটি ইবনু ইসহাক এবং ওকেদীর কারো কারো মতে তাকে পত্র দিয়ে জাবালা ইবনু আইহামের নিকট পাঠানো হয়। আবার কারো কারো মতে তাকে উভয়ের নিকটই প্রেরণ করা হয়।

আবার অনেকের মতে তাকে দেহিয়ার সঙ্গে হিরাক্লিয়াসের নিকট পাঠান। সালীত ইবনু আমরকে পত্র দিয়ে হাওযাহ ইবনু আলী আলহানাফীর নিকট ইয়ামামায় প্রেরণ করেন। হাওযাহ সালীতকে খুব সম্মান করেন। অনেকের মতে সালীতকে হাওযাহ এবং সুমামাহ ইবনু উসলে আল হানাফীর নিকট পাঠান। হাওযাহ ইসলাম গ্রহণ না করলেও ছুমামা পরে ইসলাম গ্রহণ করে। কোন কোন বর্ণনা মতে, উল্লিখিত ৬ জনকে রাসূল ﷺ একদিনে বিভিন্ন দেশের বাদশাহদের নিকট প্রেরণ করেন।

আমর ইবনুল আসকে অষ্টম হিজরীর যিলকদ মাসে ওমানের আযদ গোত্রের জুলানদীর পুত্রদ্বয় জাইফর এবং আবদুল্লাহ নিকট পত্র দিয়ে প্রেরণ করেন। তারা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূল

www.waytojannah.com

Contents

ﷺ-এর নবুওয়াতকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং আমরকে তাদের মাঝে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং আমর রাসূল ﷺ-এর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে বসবাস করতে থাকেন।

আ'লা ইবনুল হাযরামীকে "জিইররানা" নামক স্থান থেকে ফিরার পূর্বে বাহরাইনের বাদশাহ মুনযির ইবনু সাওয়া আল আবদীর নিকট পত্র দিয়ে পাঠান। অনেকের মতে এটি মক্কা বিজয়ের পূর্বের ঘটনা এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং রাসূলকে ﷺ সত্য নবী বলে বিশ্বাস করে। এমনিভাবে রাসূল (স:) মুহাজির ইবনু আবী উমাইয়্যাহ আল মাখযুমীকে হারিস ইবনু আবদে কুলাল আল হিময়ারীর নিকট পত্র দিয়ে ইয়ামানে প্রেরণ করেন। হারিস পত্র পেয়ে বলল, আমি আমার বিষয় ভেবে দেখব। তা ছাড়া আবূ মূসা আল আশআরী এবং মু'আয ইবনু জাবালকে তাবুক থেকে ফিরে আসার পরে ইয়ামানে প্রেরণ করেন। অনেকের মতে দশম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে একদল সাহাবাদেরকে ইসলামের পত্র দিয়ে দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে ইয়ামানে প্রেরণ করেন এবং সেখানের অধিকাংশ লোক কোন ধরনের যুদ্ধ জিহাদ ছাড়াই আনুগত্যের সঙ্গে ইসলাম কবুল করে। এরপর আলী ইবনু আবী তালিবকে তাদের নিকট পাঠানো হয় এবং জারীর ইবনু আবদুল্লাহ আল জাবালীকে ইসলামের দিকে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে যা কালা'অ আল হিময়ারী এবং যী আমরের নিকট পাঠান। অতঃপর তারা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করে এবং জারীর (রা) তাদের নিকট থাকা অবস্থাই রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেন।

আমর ইবনু উমাইয়্যাহ আযযামরীকে পত্র দিয়ে মুসাইলামাতুল কায্যাবের নিকট পাঠান। মুসাইলামার নিকট যুবাইরের ভাই সাইব ইবনুল আওওয়ামকে ভিন্ন আরেকটি পত্র দিয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করে এবং তাকে যারওয়া ইবনুল আমর আল জুযামীকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য পাঠানো হয়। কারো কারো মতে তার নিকট কাউকে পাঠানো হয়নি। যারওয়া বাদশাহ কায়সারের নিকট কাজ করত। যে ইসলাম কবুল করে তার ইসলামের সংবাদ দিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট একটি পত্র লিখে এবং মাসাউদ ইবনু সা'দের মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর নিকট কিয্যা নামাক একটি খচ্চর, যরব নামের একটি ঘোড়া ও ইয়াকূব নামের একটি গাধা হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে। রাসূল ﷺ তার উপঢৌকন কবুল করেন এবং মাসউদ ইবনু সা'দকে বার উকিয়া (আউন্স) হাদীয়া হিসেবে প্রদান করেন এবং আইয়াশ ইবনু আবী রাবী আ'কে পত্র দিয়ে হারেস, মাসরুহ এবং হিময়ারের নুআ'ইম ইবনু আবদে কুলালের নিকট প্রেরণ করেন।

রাসূল ﷺ-এর কবি ও বক্তাগণ

রাসূল ﷺ-এর যে সকল কবিগণ ইসলাম রক্ষায় কবিতা আবৃত্তি করেছেন তারা হলেন: কা'ব ইবনু মালিক, আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাহ ও হাসসান ইবনু সাবিত। কাফিরদের ব্যাপারে তাদের সবচেয়ে কঠোর ছিলেন হাস্সান ইবনু ছাবিত। আর কা'ব তাদেরকে কুফরী এবং শির্কের কারণে লজ্জা দিতেন। আর রাসূল ﷺ-এর বক্তা ছিলেন ছাবিত ইবনু কায়িস ইবনু শামমাস।

যে সেব বীর বাহাদুরগণ সফরে সর্বদা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে থাকতেন

তারা হলেন, আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাহ, আনজাশাহ, আমির ইবনুল আকওয়া এবং তাঁর চাচা সালামা ইবনুল আকওয়া প্রমুখগণ।

www.waytojannah.com

Contents

সহীহ মুসলিমে এসেছে: রাসূল ﷺ-এর একজন সুমিষ্টভাষী বীর বাহাদুর ছিলো। রাসূল ﷺ তাকে বললেন:

رويدا يا انجشة، لا تكسر القوارير.

"হে আনজাশা! ধীরস্থিরতা অবলম্বন কর। দুর্বল নারীদের মেরো না।"

রাসূল ﷺ-এর গাযওয়া, সারিয়া এবং প্রতিনিধিদল প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল গাযওয়া এবং সারিয়া এর দূত প্রেরণ শুরু হয় হিজরতের পর দশ বছর সময়ের মধ্যে। গাযওয়ার মোট সংখ্যা হল ২৭ টি। কারো মতে ২৫টি, কারো মতে, ২৯টি। আবার কেউ কেউ এর ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। এসব গাওয়ার মধ্যে শুধু নয়টিতে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন: বদর, উহুদ, খন্দক, কুরাইযা, মুস্তালিক, খাইবার, ফাতহ, হুনাইন ও তায়িফ। কারো কারো মতে তিনি বনী নাযীর, গাবাহ এবং ওদীউলকুরার যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন।

আর রাসূল ﷺ-এর সারিয়া ও প্রতিনিধিদলসমূহ প্রেরণের সংখ্যা প্রায় ৬০টি। বড় বড় গাযওয়াগুলোর সংখ্যা ৭টি। বদর, উহুদ, খন্দক, খায়বার, মক্কা বিজয়, হুনাইন ও তাবুক। এ গাযওয়াগুলোকে কেন্দ্র করে কোরআনের অনেক সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা আল-আনফালকে বদরের সূরা বলা হয়। আর সূরা আলে-ইমরানের–وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ থেকে শুরু করে এ সূরার প্রায় শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো উহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা আল-আহযাবের প্রথম অংশ খন্দক, কুরাইযা এবং খাইবারের যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। বানী নাযীর সম্পর্কে সূরা হাশর এবং হুদাইবিয়ার ও খাইবার ঘটনার প্রতি সূরা আল ফাতহতে আলোচনা করা হয়েছে। ফাতহ বা মক্কা বিজয়ের কথা সূরা আন্-নাসরে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব যুদ্ধসমূহের মধ্য হতে শুধু উহুদে রাসূল ﷺ রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। উহুদ ও হুনাইনের যুদ্ধে তার সঙ্গে ফেরেশতারাও যুদ্ধ করে ছিল। খন্দকের দিন আকাশ থেকে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়েছিল যার ফলে মুশরিকরা ভয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। অবশেষে তারা পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে রাসূল মুশরিকদের চেহারার দিকে কংকর ছুঁড়েছেন যার ফলে মুশরিকরা পালাতে বাধ্য হয়। মুসলমানরা দু'টি যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিজয় লাভ করে: বদর ও হুনাইন। তায়িফের যুদ্ধে মুসলমানরা কামান দিয়ে যুদ্ধ করে। নিজেদের জন্য খন্দকের যুদ্ধে দুর্গ তৈরি করে। খন্দকের অপর নাম হল আহযাব এবং খন্দকের পরামর্শ দিয়েছেন সালামান ফারসী (রা)।

রাসূল ﷺ-এর অস্ত্রশস্ত্র এবং ঘরের আসবাবপত্র

রাসূল ﷺ-এর নয়টি তরবারী ছিল: মাছুর যা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে সর্বপ্রথম মালিক হয়েছেন। আল আদবু, 'যুলফিকার' শব্দটি ফায়ে যের এবং যবর উভয়ের সাথেই পড়া যায়। (রাসূল এ তারবারিটি সর্বদা তার সঙ্গে রাখতেন।) তববারিটির রিং ছাড়া সম্মুখের অংশ, ধরার জায়গা এবং লম্বা অংশটি রূপার ছিল। আল-কালয়ী, আল বাত্তার, আল-হাতফ, আর-রাসূব, আল-মুখযাম এবং আল-ক্বাযীব ইত্যাদি তরবারিসমূহ। রাসূল ﷺ-এর তরবারীর ফিতা ছিল রূপার তৈরী। রাসূল যুলফিকার নামক তরবারিটি বদর যুদ্ধে গনীমতের মাল থেকে অতিরিক্ত হিসেবে প্রাপ্ত হন এবং এ তরবারি সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে।

www.waytojannah.com

Contents

মক্কাবিজয়ের দিন রাসূল ﷺ-এর তরবারীতে স্বর্ণ ও রূপা লাগানো ছিল।

রাসূল ﷺ-এর সাতটি লৌহ বর্ম ছিল: যাতুল ফুযুল– এ লৌহবর্মটি রাসূল আবূস সাহাম নামক জনৈক ইহুদীর নিকট পরিবারের জন্য যবের বিনিময়ে বন্ধক রেখেছিলেন। যার পরিমাণ ছিল ত্রিশ ছা, আর এ ঋণ ছিল দীর্ঘ একবছর মেয়াদী। বর্মটি ছিল লোহার, তৈরী। অন্যান্য লৌহ বর্মগুলো হল: যাতুল বিশাহ, যাতুল হাওয়াশী, আস্‌সা'দীয়াহ, ফিয্‌যা, আলবাতরায়ু আন্‌-নাহিরনিক।

রাসূল ﷺ-এর ছয়টি ধনুক ছিল: আয্‌যাওরাউ আর-রাওহাউ আস্‌-সাফরাউ, আলবাইযাউ, আল কাতুম, এটি উহুদের যুদ্ধে ভেঙ্গে যায় অতঃপর ভাঙ্গা অংশটি কাতাদা ইবনু নুমান নিজের জন্য উঠিয়ে নেন এবং আস্‌সাদ্দাদু।

রাসূল ﷺ-এর তূনীর: কাফুর এবং চামড়ার তৈরী কোমর বন্ধনী যাতে রূপার তিনটি রিং ও ছিটকিনি ছিল। ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন, রাসূল তার কোমরে কখনো বেল্ট বেঁধেছেন কি না এ ব্যাপারে আমাদের নিকট কোন তথ্য নেই।

রাসূল ﷺ-এর একটি ঢাল ছিল: যাকে যালুক বলা হত, আরেকটি ঢাল ছিল যার নাম যুতাক্ব, কারো কারো মতে, রাসূল ﷺ-কে মূর্তির ছবিসহ একটি ঢাল হাদিয়া দেয়া হলে রাসূল ﷺ তাতে হাত রাখা মাত্র মূর্তির ছবিটি দূর হয়ে যায়।

রাসূল ﷺ-এর ছয়টি বর্শা ছিল: যেগুলো নাম ছিল– মুছবী, মুছনী, একটিকে না'বাহ। আর একটি ছিল বড় যাকে আলবাইযা বলা হত, আর একটি ছিল ছোট যাকে আনাযা বলা হত, এটি দেখতে ছিল লাঠির মত। রাসূল ঈদের দিনে একে সঙ্গে রাখাতেন নামাজের সময় সামনে গেড়ে দিতেন এবং একে নিয়ে কখনো কখনো তিনি চলা-ফেরা করতেন।

রাসূল ﷺ-এর লোহার একটি শিরস্ত্রান ছিল: যাকে মুওয়াশাশাহ বলা হত। অপর আরেকটি শিরস্ত্রান ছিল যাকে আস্‌সাবুগ অথবা যুস্‌সাবুগ বলা হত।

রাসূল ﷺ-এর তিনটি যুদ্ধের পোশাক ছিল: যার একটি ছিল সবুজ রং এর উত্তম রেশমি কাপড়ের। প্রসিদ্ধ আছে যে, উতরওয়াতুবনুয যুবাইর-এর একটি রেশমী বস্ত্রের আচকান ছিল যার ভেতরের দিক ছিল সবুজ রেশমি কাপড়ের তিনি তা যুদ্ধে পেঁচিয়ে বেঁধে রাখতেন। ইমাম আহমাদ এক রিওয়ায়াতে উল্লেখ করেছেন যে, যুদ্ধে রেশমী বস্ত্র পরিধান করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি কালো পতাকা ছিল যাকে 'উকাব' বলা হত।

সুনানে আবূ দাউদে একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পতাকাকে পীত বর্ণের দেখেছি।

রাসূল ﷺ-এর একটি পশমের তৈরী ঘর ছিল: যাকে আলকান বলা হত একটি এক হাত পরিমাণ বা তার চেয়ে কিছুটা লম্বা লাঠি ছিল। রাসূল ﷺ সে লাঠিটি নিয়ে উঠা-বসা, চলা-ফেরা করতেন এবং তাঁর উটের সম্মুখে ঝুলিয়ে রাখতেন। একটি গদি ছিল যাকে বলা হয় উরজুন। বলা হত, বৃক্ষের একটি কাঠি ছিল যাকে মামশুক বলা হত এটিই পরবর্তীতে খুলাফায়ে কিরামগণ ব্যবহার করেছেন।

রাসূল ﷺ-এর বাইয়্যান নামের একটি পেয়ালা ছিল: যাকে মাগনিয়াতও বলা হত। তাঁর আরো একটি পেয়ালা ছিল যা ছিল রূপার তৈরী। কাওয়ারীরের একটি এবং কাঠের একটি পাত্র ছিল। কাঠের পাত্রটি খাটের নিচে রেখে দেয়া হত আর রাসূল ﷺ তাতে রাতে পেশাব করতেন। ছাদেরা নামের একটি পানপাত্র

www.waytojannah.com

Contents

ছিল কারো মতে একটি পাথরের তৈরী একটি পানপাত্র ছিল রাসূল তাতে ওযু করতেন। কাপড় ধোয়ার একটি পীত রংয়ের গোসলের একটি তেলের একটি এবং আয়না ও চিরুনী রাখার একটি পাত্র ছিল। সা'আহ নামের একটি বড় পেয়ালা ছিল। বলা হয় রাসূল ﷺ-এর চিরুনী ছিল হাতির দাঁতে তৈরী। একটি সুরমাদানী ছিল ঘুমানোর সময় যার থেকে প্রত্যেক চোখে তিন বার করে ব্যবহার করতেন। তাছাড়া তিনি গোলাকার পাত্রে কেচি এবং মিসওয়াক রাখতেন।

রাসূল ﷺ-এর গাররা নামের একটি বড় পাত্র ছিল: পাত্রে চারটি কড়া ছিল চারজন লোক এ পাত্রটি বহন করত। একটি খাট ছিল যার পায়াগুলো ছিল সেগুনের তেরী। খাটটি আসআদ ইবনুয যুবাবাহ তাকে উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছিল। চামড়ার একটি বিছানা ছিল যার তুলা ছিল খেজুরের বৃক্ষের পাতা। উপর্যুক্ত আলোচনাগুলো হাদীসে বিক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম তাবারানী তার "আল-মু'জামে" রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আসবাবপত্র সম্পর্কে ইবনু আব্বাস থেকে একটি জামে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। ইবনু আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট রূপার তৈরী একটি তরবারি ছিল। যার ধরার জায়গা ছিল রূপার। তরবারিটির নাম ছিল যুলফিকার। এমনিভাবে একটি ধনুক ছিল যার নাম ছিল সাদ্দাদ। আলজামউ নামের চামড়ার তৈরী একটি তুনীর ছিল। তামার কারুকর্য খচিত যাতুল ফুযুল নামের একটি লৌহবর্ম ছিল। রাসূল ﷺ-এর একটি বল্লম ছিল যার নাম নাবআ। একটি বাঁকা লাঠি ছিল যার নাম ছিল দাকান। মুজায নামের একটি সাদা ঢাল ছিল। আসসাকব নামের একটি কালো রংয়ের ঘোড়া ছিল। ছাজ নামের একটি জিন ছিল। দুলদুল নামক একটি খচ্চর, কাছওয়া নামের একটি উট, ইয়াকুব নামের একটি গাধা, আলফান নামের একটি বিছানা, আলকামরাহ নামের একটি লাঠি, ছাদেরা নামের একটি চামড়ার পানপাত্র, জামে নদান নামে একটি কেচি একটি আয়না এবং আলমাউত নামের একটি বৃক্ষের তৈরি লাঠি ছিল।

রাসূল ﷺ-এর আরোহণের ও বাহনের পশুসমূহ

রাসূল ﷺ-এর সাকব নামের একটি ঘোড়া ছিল। এটি ছিল প্রথম ঘোড়া যা তিনি ক্রয়সূত্রে মালিক হন যে বেদুঈন থেকে তিনি ঘোড়াটি ক্রয় করে ছিলেন তার নিকট থাকাবস্থা ঘোড়াটির নাম ছিল আদ্‌দরস। ঘোড়াটির কপাল ও হাত-পা সাদা বর্ণের ছিল তবে সম্মুখের ডান পা সাদা বর্ণের ছিল না আর ঘোড়ার দেহের রং ছিল খয়েরী রংয়ের। মুরতায়াজ নামে ক্রয়ের একটি ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি ছিল সাদা কলো রং বিশিষ্ট। এ ঘোড়াটির ব্যাপারেই খুযাইমা (রা) সাক্ষ্য দিয়ে ছিলেন। আরো কয়েকটি ঘোড়া ছিল যেমন: লুহাইফ, লিযায, জারিব, আবহা এবং আরদ এ সাতটি ঘোড়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ আশ-শাফেয়ী ঘোড়াগুলোর নাম একটি কবিতায় একত্র করে বলেন–

وَالْخَيْلُ سَكْبٌ لُحَيْفٌ سَبْحَةٌ ظَرِبٌ

لِزَازُ مُرْتَجَزٌ وَرْدٌ لَهَا أَسْرَارُ

তর সন্তান ইজ্জুদ্দীন আমাদের এ ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছে। কারো কারো মতে রাসূল ﷺ-এর আরো ১৫টি ঘোড়া ছিল, তবে এতে মতবিরোধ আছে। ঘোড়ার উভয় জিন ছিল খেজুরের পাতার তৈরী। দুলদুল নামের একটি খচ্চর ছিল। খচ্চরটি সাদা-কালো রং বিশিষ্ট ছিল। বাদশাহ মুকাওকিস রাসূলকে এটি হাদিয়া দিয়েছিলেন। ফায্‌যা নামের আরো একটি খচ্চর ছিল ফারওয়া আল জুযামী এটি রাসূলকে

www.waytojannah.com

Contents

হাদিয়া দিয়েছিল। সাদা-কালো রংয়ের আরো একটি খচ্চর ছিল যেটি আইলার বাদশাহ রাসূলকে দিয়েছিলেন। আরো একটি খচ্চর ছিল সেটি দাওমাতুল জানদালের বাদশাহ তাঁকে উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছিল। কাছওয়া নামের একটি উটনী ছিল, কারো কারো মতে এটিতে আরোহণ করেই নাবী ﷺ হিজরত করেছেন। তা ছাড়া আল আযযা বা জাদআ নামেরও দুটি উটনী ছিল। উটনী দুটির কোনটিরই কান কাটা বা কান ফাটা ছিল না। এমনিই এ নামে নাম রাখা হয়েছে। কারো কারো মতে গাধার কানে ফাটা ছিল তাই একে আযযা বলা হয়। আযযা এবং জাদআ দু'টি কি এক ঘোড়া নাকি ভিন্ন দুইটি উটনী এ নিয়ে মত বিরোধ আছে। আযযা উটনীটিকে কেউ পিছনে ফেলতে পারত না। একদা একজন গ্রাম্য আরব তার উটের পিঠে আরোহণ করে এসে হুজুরের ﷺ উটনীকে পাশ্চাতে ফেলে চলে গেল। এ অবস্থা মুসলমানদের জন্য পীড়াদায়ক হল। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর এটা নিয়ম যে, পৃথিবীর যে জিনিসই সমুন্নত হয়, তাকে তিনি অবনত করে দেন।

রাসূল ﷺ বদরের যুদ্ধে গনীমতের সম্পদ হতে একটি উট প্রাপ্ত হন উটটি ছিল অবূ জাহেলের। উটের নাকে পরানো ছিল রূপার রিং। রাসূল এটিকে হুদাইবিয়ার দিন মুশরিকদেরকে রাগান্বিত করার উদ্দেশ্যে হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেন। রাসূল ﷺ-এর ৪৫টি দুধের উটনী ছিল। একটি দ্রুতগামী উট ছিল। বনী আকীলের না'আম গোত্রের সা'দ ইবনু উবাদাহ রাসূলকে এ উটনীটি প্রদান করে। রাসূল ﷺ-এর একশ বকরী ছিল। তিনি এর সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ার কামনা করতেন। রাসূল ﷺ-এর রাখাল যখনই কোন মেষ-শাবক জন্ম দেওয়াতো। তিনি ﷺ ওর স্থলে আরেকটি বকরী যবেহ করে দিতেন। রাসূল ﷺ-এর ৭টি হাদিয়ার ছাগল ছিল যেগুলোকে উম্মে আইমান চড়াত।

রাসূল ﷺ-এর পোশাক ও জামা কাপড়

রাসূল ﷺ-এর সাহাব নামের একটি পাগড়ি ছিল। তিনি এ পাগড়ীটি আলীকে পড়িয়ে দেন। রাসূল ﷺ-এ পাগড়ী পড়তেন এবং এবং পাগড়ীর নিচে টুপি পড়তেন। রাসূল ﷺ পাঞ্জাবী ছাড়াও টুপি পড়তেন। আবার কখনো শুধু পাগড়ি পড়তেন। তিনি পাগড়ি পড়লে পাঞ্জাবীর পার্শ্বকে তার দুই স্কন্ধের মধ্য দিয়ে ঝুলে দিতেন। এমনটিই বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম তার সহীহ এ আমর ইবনু হুরাইছ থেকে। তিনি বলেন, আমি রাসূলকে মিম্বারে দেখেছি আর তখন তার মাথায় ছিল কালো পাগড়ী রাসূল পাগড়ীর দুই পার্শ্বকে তার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্য দিয়ে ছেড়ে দিতেন। মুসলিম শরীফে জাবির ইবনু আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তার মাথায় কালো পাগড়ী ছিল। জাবির এ হাদীসে পাগড়ীর লেজের কথা বলা হয়নি। এতে বুঝা যায় তিনি সবসময় এমনটি করতেন না। কারো কারো মতে রাসূল যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁর মাথায় শিরোস্ত্রান এবং গায়ে ছিল যোদ্ধাদের সাজ।

আমাদের শাইখ ইবনু তাইমিয়্যাহ পাগড়ীর লেজ ঝুলিয়ে রাখার কারণ সম্পর্কে একটি চমৎকার কথা বলেছেন, তিনি বলেন, রাসূল এমনটি করতেন ঐ স্বপ্নের কারণে যা তিনি মদীনায় দেখেছিলেন। তিনি স্বপ্নে আল্লাহকে দেখতে পেলেন। আল্লাহ তাকে বললেন, হে মুহাম্মদ তুমি কি জানো ঊর্ধ্বজগতের ফেরেশতারা কোন বিষয়ে ঝগড়া করে? আমি বললাম, না আমি জানি না অত:পর আল্লাহর তার হাতকে আমার দু স্কন্ধের মধ্যে রাখলেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম অসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে। হাদীসটি তিরমিযীতে এসেছে, ইমাম বুখারীকে হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, হাদীসটি সহীহ। ইমাম বুখারী বলেন, এরপর থেকে রাসূল ﷺ সব সময় পাগড়ীর পার্শ্ব তার দু স্কন্ধের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখতেন। অথচ এ বিষয়টিকে মূর্খরা অস্বীকার করে।

www.waytojannah.com

Contents

কামীস বা কোর্তা পরিধান করা ছিল রাসূল ﷺ-এর সর্ব প্রিয়। তার জামার হাতা ছিল কব্জি পর্যন্ত। তা ছাড়া জুব্বা এবং আলখেল্লা পরিধান করাও ছিল তাঁর নিকট অনেক প্রিয়। তিনি সব সময়ে আঁটসাট আস্তিন বিশিষ্ট জুব্বা পরিধান করতেন। তিনি লুঙ্গি এবং চাদর পরিধান করতেও খুব ভালবাসতেন। ওকেদী বলেন, রাসূল ﷺ-এর চাদর এবং জোরাদার কম্বলের দৈর্ঘ্য ছিল ৬ হাত আর প্রস্থ ছিল তিন হাত এক বিঘত। তার লঙ্গি ছিল ওমানের সূতায় তৈরী যার দৈর্ঘ্য ছিল চার হাত এক বিঘত এবং প্রস্থ ছিল দুই হাত এক বিঘত।

এক সেট লাল বর্ণের পোশাক পড়তেন। অনেকে এ ধরনের ভুল ধারণা করে থাকে যে, রাসূল একেবারে লাল পোশাক পরিধান করতেন এবং তাতে অন্য কোন রংয়ের সংমিশ্রণ ছিল না। বিষয়টি এমন নয় বরং তিনি যে লাল বর্ণের একসেট পোশাক পরিধান করতেন যে সেটি প্রস্তুত করা হয়েছে ইয়ামানী চাদর দ্বারা যে চাদর দুটিতে লাল ও কালো রংয়ের রেখা ছিল। চাদরটি ছিল ঠিক অন্যান্য ইয়েমানী চাদরের মত। তবে চাদরের লাল রেখার কারণে চাদরটি এ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। অন্যথায় লাল রংয়ের কাপড় পরিধান করা তো অনেক বড় গোনাহের কাজ। সহীহ বুখারীতে এসেছে যে, রাসূল ﷺ লাল বর্ণের জিন বা গদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। সুনানে আবূ দাউদে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ একদা তার গায়ে একা পাটের চাদর দেখতে পেয়ে বললেন, তোমার গায়ে এক পাটের চাদরটি কিসের? তার এই প্রশ্ন হতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি একে অপছন্দ করেছেন। সুতরাং আমি তাৎক্ষণাৎ ঘরে চলে এসে দেখতে পেলাম পরিবারের লোকেরা চুলায় আগুন ধরিয়েছে। তখন আমি আমার কাপড়টি আগুনে ছুঁড়ে দিয়ে জ্বালিয়ে ফেললাম। অত:পর আমি পুনরায় তাঁর নিকট উপস্থিত হলে রাসূল ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তোমার কাপড়টি কী করলে? আমি বললাম, তা (চাদরটি) জ্বালিয়ে ফেলেছি। তখন তিনি বললেন: তুমি কেন কাপড়টি তোমার পরিবারস্থ কোন মহিলাকে পরিধান করালে না? কেননা, তা মহিলাদের ব্যবহারে কোন দোষ নেই।

সহীহ মুসলিমে আছে, রাসূল ﷺ আমার পরনে উছফুরে রঞ্জিত গোলাপী রংয়ের দুখানা কাপড় দেখে বললেন। এগুলো কাফেরদের পোশাক সুতরাং তুমি তো পরিধান করো না।

সহীহ মুসলিমে আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ উছফুর রঙে রঞ্জিত পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। সুনানের কয়েকটি কিতাবে এসেছে যে সাহাবারা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিল। তখন রাসূল ﷺ তাদের সাওয়ারীর উপর লাল বর্ণের ডোরা কাটা আরেকটি চাদর দেখতে পেয়ে বললেন, "সাবধান আমার মনে হয় এ লাল রং তোমাদের মাঝে প্রাধান্য লাভ করেছে। এ কথা শোনামাত্র তাঁর কথার সম্মানার্থে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম এমনকি আমাদের অনেক উটগুলো পালাতে শুরু করল। অত:পর আমরা চাদরগুলোকে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললাম। (আবূ দাউদ)

লাল রংয়ের কাপড় পরিধানের অপছন্দনীয়তা অনেক বেশি। তা হলে এ ধারনা করার সুযোগ কোথায় যে, রাসূল ﷺ লাল রংয়ের চাদর পড়েছেন। এটা কখনো হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ সর্বদা তাঁর নবীকে ﷺ-এর থেকে হেফাজত করেছেন। রাসূল রেখা বিশিষ্ট এবং সাদাসিদে চাদর পরিধান করতেন। আবার কালো পোশাকও পরিধান করতেন। রেশমী কাপড়ের রেখা বিশিষ্ট উটের পশমের তৈরী কম্বল ব্যবহার করতেন।

ইমাম আহমাদ এবং আবূ দাউদ উভয়ে তাদের এসেছে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন রোম সম্রাট নাবীকে উন্নতমানের রেশমের তৈরী একটি কম্বল উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করে রাসূল ﷺ তা পরিধান করেন আমার এখনো তার হাত দ্বয়ের কথা মনে পড়ে যা কম্পিত হচ্ছিল।

www.waytojannah.com

Contents

রাসূল ﷺ-এর পায়জামা

রাসূল ﷺ পায়জামা ক্রয় করেছিলেন, বাহ্যত তিনি তা পরিধানের জন্য ক্রয় করেছিলেন। একাধিক হাদীসে রাসূল ﷺ-এর পায়জামা পরিধানের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীগণও রাসূল ﷺ-এর অনুমতিতে পায়জামা পরিধান করতেন। রাসূল চামড়ার মোজা পরিধান করতেন। তাসূমার নামক এক ধরনের জুতাও পরিধান করতেন। আগে ডান পায়ে পরতেন না বাম পায়ে সে ব্যাপারে মতোবিরোধ আছে। তবে প্রত্যেকটি সনদই শুদ্ধ। রাসূল ﷺ খুযাহ নামের হেলমেট এবং যারদিয়াহ নামের বর্ম পরিধান করতেন।

সহীহ মুসলিমে আসমা বিনতি আবূ বাকর থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, এটি রাসূল ﷺ-এর জুব্বা, একথা বলে একটি সূচকর্ম খচিত এমন একটি জুব্বা বের কবলেন যা রেশম দ্বারা নকশী করা ছিল এবং জুব্বার গলাতে বুকের পট্টিগুলো রেশম দ্বারা জড়ান ছিল এবং তিনি বলেন, এটা আয়িশা (রা)-এর নিকট ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর আমিই এটা হস্তাগত করেছি। রাসূল ﷺ এটা পরিধান করলেন। এখন আমরা এটা ধুয়ে উক্ত পানি দ্বারা রোগীদের রোগমুক্তি কামনা করি।

রাসূল ﷺ-এর দুটি সবুজ রংয়ের চাদর, একটি কালো চাদর, পশমের তৈরী একটি লাল রংয়ের চাদর এবং পশমের একটি চাদর ছিল। রাসূল ﷺ-এর কোর্তা ছিলা সূতি কাপড়ের। লম্বায় কোঁতাটি ছিল খাটো এবং আঁটসাট আস্তিন বিশিষ্ট এ যে লম্বা অস্তিন বিশিষ্ট কোর্তাগুলো দেখছো তিনি তা কখনোই তা পরিধান করতেন না। তার কোন সাহাবীও পরিধান করত না। এটি সুন্নাত বিরোধী এবং এর বৈধতার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার বিষয় আছে। কেননা এটি অহংকারীদের পোশাক। রাসূল ﷺ-এর হিবারা এবং কামীস (কোর্তা) পরিধান করতে অধিক পছন্দ করতেন।

নাবী ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয় রং ছিল সাদা। তিনি বলতেন, তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পোশাক হল সাদা রংয়ের পোশাক। তোমরা সাদা রংয়ের পোশাক পরিধান করে এবং এতে তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের কাফন দাও। বুখারীতে আয়িশা থেকে বর্ণিত তিনি একটি পশমের চাদর এবং সেট একটি লঙ্গি বের করে বলেন, এ কাপড় দুটি পরিহিত অবস্থায় তার রূহ কবজ করা হয়েছে।

রাসূল ﷺ প্রথমে স্বর্ণের আংটি পরিধান করে ছিলেন পরে তা খুলে ফেলেন এবং স্বর্ণের আংটি পরতে নিষেধ করেন। এরপর রূপার একটি আংটি বানান এবং এর থেকে নিষেধ করেননি। আবূ দাউদের হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ অনেকগুলো জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন এর একটি হল, বাদশাহ ব্যতীত অন্য কেউ আংটি পরিধান করা যার এ হাদীসটির অবস্থা সম্পর্কে আমার কোন কিছু জানা নেই। তিনি তার আংটির নাগীনা হাতের তালুর ভিতরের দিকে রাখতেন। তিরমিযীতে এসেছে, তিনি যখন বাথরুমে যেতেন তখন আংটিটি খুলে প্রবেশ করতেন। হাদীসটিকে তিনি সহীহ বলেছেন। তাঁর সূচকর্ম খচিত চাদর পরিধান করার ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর সাহাবারাও কখনো এ চাদর পরিধান করেননি। সহীহ মুসলিমে আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তার সাথে সত্তর হাজার ইস্পাহানের ইহুদীরা সূচকর্ম খচিত চাদর পরিহিতি অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করবে। আনাস (রা) একদল লোকের গায়ে এ চাদর দেখে বলেছেন, খাইবারের ইহুদীদের সঙ্গে তাদের কতইনা সাদৃশ্য। আর এ কারণেই সালফ এবং পরবর্তীদের সকলেই এ চাদর পরাকে অপছন্দ করেন।

www.waytojannah.com

Contents

আবু দাউদ এবং হাকিম তার মুস্তাদরাকে ইবনু ওমার (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে তাদেরই দলভুক্ত হবে। তিরমিযীতেও এসেছে ليس منا من تشبه بقوم غيرنا যে অন্য কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবারা সাধারণ সুতার তৈরী কাপড় পরিধান করতেন। কখনো কখনো আবার কাতান এবং পশমের তৈরী কাপড়ও পরতেন। সহীহ সূত্রে আবু ইসহাক আল আসহাবী জাবির ইবনু আইউব (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, গালিব ইবনু রাফি পশমের পাগড়ী ও পশমের লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় মুহাম্মদ ইবনু সীরীন এর নিকট আসলেন। মুহাম্মদ এ অবস্থা দেখে ঘৃণায় কুঁকড়ে গেলেন এবং বললেন আমার ধারণা এক শ্রেণির লোকেরা পশমের তৈরী পোশাক পরিধান করবে এবং বলবে ঈসা ইবনু মরিয়ম এমন কাপড় পরিধান করতেন। আমাকে একজন আস্থাভাজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। রাসূল ﷺ কাতান, পশম এবং সূতা দ্বারা তৈরী কাপড় পরিধান করতেন। আমার নবীর সুন্নত সর্বাধিক অনুসরণীয়। ইবনু সিরীনের এ কথা বলার উদ্দেশ্য হল। অনেকে সর্বদা পশমের কাপড় পরাকে অন্য কাপড়ের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করবে। তারা একে সাজসজ্জার বৃত্তে বানিয়ে নিবে এবং এর থেকে বের হওয়াকে অপছন্দ মনে করবে।

সঠিক হলে সর্বোত্তম পদ্ধতি সকল পদ্ধতির সেরা পদ্ধতি তথা রাসূল ﷺ-এর পদ্ধতি অনুসরণ করা। তিনি যে পদ্ধতিতে চলতে বলেছেন নিদের্শ দিয়েছেন। লোকদেরকে উৎসাহিত করেছেন এবং নিজে সর্বদা আমল করেছেন। সে পদ্ধতি অনুসরণ করে চলা এবং সে মোতাবেক আমল করা। তার পদ্ধতি ছিল যখন যে পাশাক পেতেন তাই পড়তেন। কখনো পশমের পোশাক কখনো সূতার কখনো কোর্তার। কখনো আবার ইয়েমানী চাদর এবং কখনো সবুজ রংয়ের চাদর পরিধান করতেন। তিনি জুব্বা, আলখেল্লা, কোর্তা, পায়জামা, লুঙ্গি, চাদর, মোজা এবং জুতা পরিধান করতেন। পাগড়ীর পিছনের অংশ পিছনে ঝুলিয়ে দিতেন কখনো বা স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে দিয়ে ঝুলিয়ে দিতেন। তিনি যখন কোন নতুন কাপড় পরিধান করতেন তখন কাপড়কে সে নামেই নামকরণ করতেন এবং বলতেন–

اللهم انت كسوتنى هذا القميص او الرداء او العمامة، اسالك خيره وخير ما صنع له، واعوذ بك من شره وشر ما صنع له.

অর্থ: "হে আল্লাহ আপনি আমাকে এই কোর্তা, এই চাদর বা এই পাগড়ী পরিয়েছেন এর সকল কল্যাণ আমি কামনা করছি এবং এর সকল অমঙ্গল হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

রাসূল ﷺ যখন কোর্তা পরিধান করতেন তখন ডান দিক দিয়ে শুরু করতেন। তিনি কালো চাদর পরতেন যেমনটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম তার সহীহতে আয়িশা (রা) থেকে রাসূল কালো রংয়ের নকশা করা রেশমী চাদর পরিধান করে বের হলেন। সহীহাইনে কাতাদা (রহ:) আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলের ﷺ সবচেয়ে প্রিয় পোশাক ছিল হিবরা। হিবরা হল ইয়ামানীদের চাদর। কারণ তাদের অধিকাংশ পোশাকই ছিল ইয়েমেনের সূতার তৈরী। কখনো বা আবার মিশর এবং শামের পোশাক পরিধান করতেন। যেমন কিবতীদের হাতের তৈরী কিতবী বস্ত্র। সুনানে নাসায়ীতে আয়িশা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি নাবী ﷺ-এর জন্য পশমের একটি চাদর তৈরী করেন। রাসূল তা পরিধান করলেন। যখন তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলেন এবং পশমের দুর্গন্ধ পেলেন তখন তা খুলে ফেললেন। তিনি সুগন্ধিকে ভালোবাসতেন।

www.waytojannah.com

Contents

সুনানে আবূ দাঊদে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর গায়ে একসেট সুন্দর পোশাক দেখেছি। সুনানে নাসায়ীতে আবূ রিমছা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে সবুজ রংয়ের দু'খানা কাপড় পরিহিত অবস্থায় খুতবা দিতে দেখেছি।

রাসূল ﷺ-এর বালিশ ছিল চামড়ার এবং ভিতরে ছিল খেজুরের আঁশ । সুতরাং যারা আল্লাহর বৈধ করা পোশাক খাবার এবং বিবাহ শাদীকে উপসনা এবং বৈরাগ্যতার জন্য বর্জন করে। আবার যারা তাদের বিপরীতে ভাল ভাল পোশাক এবং নরম নরম খাবার খাওয়াকেই, একমাত্র পন্থা বলে পছন্দ করে। তারা উভয় দলেই রাসূল ﷺ আদর্শ বিরোধী কর্মে লিপ্ত। এ কারণেই অনেক সালফে সালাহীন বলেছেন, তারা সুনামের পোশাক পরাকে অপছন্দ করতেন। সুনানের কিতাবে ইবনু উমার থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সুনামের পোশাক পরিধান করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন। এরপর যে জাহান্নামে জ্বলবে।"

সহীহাইনে ইবনু উমার থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কাপড়কে অহংকার করে হেঁচড়িয়ে চলবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে তাকাবেন না। সুনানের কিতাবে তার থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, ঝুলান (এর নিষেধাজ্ঞা) ইযার জামা ও পাগড়ীর মধ্যে প্রযোজ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি অহংকারবশত কোন একটিকে হেঁচড়িয়ে চলবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না। ইবনু উমার থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল ইযারের ক্ষেত্রে যে কথা বলছেন কামিসের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। এমনিভাবে ময়লা, অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন কাপড় একস্থানে পরিধান করা নিন্দার কারণ আবার এক স্থানে প্রশংসার কারণ। যখন এ কাপড় বিনয়, বশ্যতা আর আনুগত্যের সঙ্গে পরিধান করা হবে তখন এটা হবে প্রশংসার আর যখন সুনাম সুখ্যাতি এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হবে তখন এটি হবে নিন্দনীয়। সহীহ মুসলিম ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যার অন্তরে সরষে দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর যার অন্তরে সরষে দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। একজন লোক উঠে বলেন রাসূল আমি আমার জামা এবং জুতা ভালো হওয়াকে পছন্দ করি এটাও কি অহংকারের অন্তর্ভুক্ত? রাসূল বললেন, না নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। অহংকার হল সত্যকে গোপন করা এবং মানুষকে ছোট ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা।

খাবারের ক্ষেত্রেও রাসূল ﷺ-এর একই নিয়ম ছিল। তার সামানে যে খাবার দেয়া হত তিনি তা ফিরিয়ে দিতেন না। অর্থ যা নাই তার কামনা করতেন না। তার নিকট কোন হালাল পূত-পবিত্র খাবার দেয়া হলে তিনি তা খেতেন অন্যথায় নিজেকে তা খাওয়া থেকে বিরত রাখতেন। তবে এটা অন্যেদের জন্য হারাম হত না। তিনি কখনো খাবারের দোষ ধরনেনি। মন চাইলে খেয়েছেন মন না চাইলে খাননি। যেমন, তিনি অভ্যস্থ না হওয়ার কারণে গুইসাপ খাননি। কিন্তু গুইসাপ খাওয়াকে আবার হারামও বলেননি। বরং তাঁর দস্তরখানে বসে গুইসাপ খাওয়া হয়েছে কিন্তু তিনি তাতে কিছুই বলেননি।

তিনি মিষ্টি এবং মধু খেতেন এবং খুব পছন্দও করতেন। তিনি উট, মুরগী, ভেড়া, হুবারা পাখি, বন্য গাধা খরগোশ ইত্যাদির গোশত খেয়েছেন। সমুদ্রের খাবার ভুনা খাবার খেয়েছেন। ভিজা ও তাজা খেজুর খুরমা ও দুধ, পানি মিশ্রিত মধু, ছাতু, দুধ ও আঁটার তৈরী খামীরা তাছাড়া হালুয়া খেজুর ভেজানো পানি। কাকড়ির সঙ্গে তাজা খেজুর, রুটি দিয়ে খেজুর, গোশত দিয়ে খেজুর, সিরকা দিয়ে রুটি, পণির, গোশতের সাথে রান্না কারা লাউ কাদীদ, তেল দিয়ে রুটি তাজা খেজুর দিয়ে তরমুজ, মাখন দিয়ে খেজুর,

www.waytojannah.com

Contents

টুকরো টুকরো করে গোশতের ঝোলে ভিজিয়ে তৈরী খাবার বিশেষ এবং ওয়ার ইত্যাদি খাবার খেয়েছেন। তিনি ভাল খাবার কখনো ফেরত দেননি। আবার যা নেই তার আশাও করেননি। বরং যা পেতেন খেতেন। ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধেছেন। মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু তার ঘরের চুলায় আগুন জ্বলেনি। তিনি অধিকাংশ খাবারই সাধারণ দস্তরখানের উপর রেখে আহার করতেন। তিনি তিন আঙ্গুল দিয়ে খেতেন আবার শেষে আঙ্গুলগুলো চেটে খেতেন। আর খাওয়ার উত্তম পদ্ধতি এটাই। কিন্তু যারা অহংকারী তারা এক আঙ্গুলে আহার করে। আর লোভী পাঁচ আঙ্গুলে আহার করে।

তিনি হেলান দিয়ে আহার করতেন না। হেলান তিন ধরনের।

১. পার্শ্বে হেলান দেয়া;

২. আসন করে বসা;

৩. এক হাতে হেলান দিয়ে অপর হাতে আহার করা তিন প্রকারই নিন্দনীয়।

তিনি খাবারের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ' এবং শেষে 'আল হামদুলিল্লাহ' পড়তেন। এবং এ দু'আও পড়তেন–

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

অর্থ: "পাক-পবিত্র বরকতময় অনেক অনেক প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে পরওয়ার দেগার, তোমার নেয়ামত হতে মুখ ফিরানো যায় না। তার অন্বেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং তার প্রয়োজন হতে মুক্ত থাকা যায় না।"

কখনো কখনো বলতেন–

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ، مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، وَكُلَّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَلَا مُكَافَأٍ وَلَا مَكْفُورٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ ، وَسَقَى مِنَ الشَّرَابِ ، وَكَسَا مِنَ الْعُرْيِ ، وَهَدَى مِنَ الضَّلَالَةِ ، وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَى ، وَفَضَّلَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ تَفْضِيلًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থ: "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি খাওয়ান তাকে খাওয়ানো হয় না। তিনি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে হিদায়াত প্রদান করেছেন। খাইয়েছেন পান করিয়েছেন। আমাদেরকে চরম পারাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে খাবার খাওয়ালেন পানি পান করালেন। কাপড় ছিল না কাপড় পরিধান করালেন। পথভ্রষ্ঠতা থেকে পথ দেখালেন। অন্ধকার থেকে আলো দেখালেন। তাঁর অনেক সৃষ্টির উপর আমাদেরকে প্রাধান্য দিলেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। কখনো আবার পড়তেন সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি খাওয়ালেন পানাহার করালেন এবং উপভোগ ও সুশহনীয় করলেন। তিনি খাবার শেষে হাতের আঙ্গুলসমূহ চেটে খেতেন। তাতে মুছার কোনো রোমাল ছিল না এবং খাবার খাওয়ার পর হাত ধোয়ার অভ্যাসও ছিল না।

তিনি অধিকাংশ সময় বসে পান করতেন বরং যে দাঁড়িয়ে পান করত তিনি তাকে ধমক দিতেন। তিনি শুধু একবার দাঁড়িয়ে পান কররেছেন। কারো মতে এটা পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞাকে রহিত করে দিয়েছে। আবার অনেকের মতে উভয় ভাবেই পনে করা যে বৈধ তা বুঝাবার জন্য তিনি এমন করেছেন। বাস্তবতা হল তিনি ওযরের কারণে দাঁড়িয়ে পান করেছেন। আর এটি হয়েছে যমযমের পনির ক্ষেত্রে।

সঠিক মাসাআলা হল, দাঁড়িয়ে পান করা নিষেধ। তবে বসতে অক্ষম হলে দাঁড়িয়ে পানি পান করা যাবে। এভাবেই এ বিষয়ের সকল হাদীস একত্রিত করা সম্ভব। তিনি যখন পানি পান করতেন তখন তাঁর ডান দিকের লোক থেকে শুরু করতেন। তবে আর বামে বয়স্ক কেউ থাকলে তার থেকে তিনি পানি পান

Kiwbi Ci- Ki¥Zb|
www.waytojannah.com

Contents

ঘুমানো এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার রাসূল ﷺ-এর জীবন পদ্ধতি ও দিকনির্দেশনা

রাসূল ﷺ কখনো কাপড়ের বিছানায়, কখনো চামড়ার বিছানায়, কখনো বা চাটাইয়ে আবার কখনো মাটিতেও ঘুমাতেন। আবার কোন কোন সময় খাটে কাঠের উপর আবার, কখনো তার কালো কম্বলের উপর। আব্বাস ইবনু তামীত তাঁর চাচা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, আমি রাসূল ﷺ-কে এক পা আরেক পায়ের উপর রেখে চিত হয়ে মাসজিদে ঘুমাতে দেখেছি।

রাসূল ﷺ-এর বিছানা ছিল চামড়ার আর তাঁর তুলা ছিল খেজুরের আঁশ।

রাসূল ﷺ-এর একটি পশমের চাদর ছিল তিনি তা দু'ভাঁজ করে শুতেন। একদিন চার ভাঁজ করা হলে তিনি তা থেকে নিষেধ করেন এবং বললেন–

ردوه إلى حاله الأول، فإنه منعني صلاتي الليلة.

একে তার আগের অবস্থায় রাখো কারণ চার ভাঁজ করলে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে আমার সমস্যা হয় এবং তাঁর স্ত্রীদেরকে বললেন–

ما أتاني جبريل وأنا لحاف امرأة منكن غير عائشة.

আয়িশা ছাড়া তোমাদের কারো নিকট আমি লেপে শোয়া অবস্থায় আমার নিকট জিবরাঈল ফেরেশতা আগমন করেনি।

রাসূল ﷺ-এর বালিশ ছিল চামড়ার তৈরি আর তার ভেতরের অংশ ছিল খেজুরের আঁশের। রাসূল ﷺ যখন ঘুমাতে যেতেন তখন বলতেন–

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوْتُ

"হে আল্লাহ! আপনার নামেই শয়ন করছি এবং আপনার নামেই উঠব।"

তিনি তাঁর উভয় হাত একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিয়ে কুলহু ওল্লাহু আহাদ, কুল আউযুবিরাব্বিল ফালাক্ব এবং কুল আউযুবিরাব্বিন্নাস পড়তেন। এরপর যতটুকু সম্ভব উভয় হাতের তালু শরীরে মুছতেন এবং এরপর বলতেন–

اللَّهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

"হে আল্লাহ, আপনি যেদিন আপনার বান্দাদের পুনরুত্থিত করবেন সেদিন আমাকে আপনার শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন।"

তিনি যখন শোয়ার জন্য বিছানায় যেতেন তখন বলতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ

"সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। অনেক লোক এমন আছে যাদের পরিতৃপ্ত করার এবং আশ্রয় দানের কেউই নেই।" (মুসলিম)

ইমাম মুসলিম আরো উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল ﷺ যখন ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় যেতেন তখন বলতেন–

www.waytojannah.com

Contents

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ، وَالْفُرْقَانِ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

"হে আল্লাহ, আপনি সপ্ত আকাশের প্রভু। মহা মহীয়ান আরশের প্রভু এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রভু তুমিই হে আল্লাহ, বীজ ও আঁটি চিরে চারা ও বৃক্ষের অঙ্কুরিত তুমিই ঘটাও। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের নাযিলকারী একমাত্র তুমিই। আমি প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমার হাতে সকল বস্তুর তক্দীর। হে আল্লাহ, তুমি অনাদি, তোমার পূর্বে কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না; তুমি অনন্ত, তোমার পরে কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তুমি প্রকাশমান। তোমার উপরে কিছুই নেই, তুমি অপ্রকাশ্যে, তোমার চেয়ে নিকটবর্তী কিছুই নেই। প্রভু হে, তুমি আমার সকল ঋণ পরিশোধ করে দাও, আর আমাকে দারিদ্র্যতা থেকে বাঁচিয়ে রাখো।"

রাসূল ﷺ যখন রাত্রে ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখন বলতেন–

لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

"আপনি ব্যতীত আর কেউ উপাস্য নেই। সকল পবিত্রতা আপনারই জন্য। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আমার গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার রহমত কামনা করছি। হে আল্লাহ, আপনি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন এবং সরল পথের সন্ধান দেবার পর আমার অন্তরকে তার থেকে সরিয়ে দিবেন না। আপনার পক্ষ থেকে আমাকে রহমত প্রদান করুন। নিশ্চয় আপনিই একমাত্র দাতা।"

তিনি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখন বলতেন–

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার মৃত্যুর পর আমাকে জীবিত করেছেন, আর তাঁর কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে।"

এরপর রাসূল ﷺ মিসওয়াক করতেন এবং কখনো সূরা আলে-ইমরানের–

فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ {١٩١} رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ {١٩٢} رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ {١٩٣} رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ {١٩٤} فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِّن عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ

www.waytojannah.com

الثَّوَابِ {١٩٥} لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلاَدِ {١٩٦} مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ {١٩٧} لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ اللّهِ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ {١٩٨} وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ {١٩٩} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {٢٠٠}

থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত দুটি আয়াত পাঠ করতেন এবং বলতেন–

اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ، لَكَ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ

"হে আল্লাহ, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা, আপনি আসমান-জমিনের এবং এতদুভয়ের সকল কিছুর নূর এবং আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আপনি আসমান-জমিন এবং এতদুভয়ের সকল কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। সকল প্রশংসা শুধু আপনারই জন্য। আপনি সত্য, আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য। আপনার সঙ্গে (আমাদের) সাক্ষাৎ হবে তা সত্য। জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ ﷺ সত্য। কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ, আপনার সম্মুখে আমি আত্মসমর্পণ করেছি। আপনার উপরেই ঈমান এনেছি, আপনারই উপর ভরসা করেছি। আপনার নিকটই প্রত্যাবর্তন করেছি এবং আপনার কাছেই অভিযোগ পেশ করছি এবং আপনার নিকটই বিচার দিচ্ছি। অতএব আপনি আমার পূর্ব, পরের এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অন্যায়কে ক্ষমা করুন, আপনি আমার প্রভু। আপনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।"

রাসূল ﷺ রাতের প্রথম অংশে ঘুমাতেন এবং শেষাংশে নামাজ পড়তেন। আবার কখনো মুসলমানদের প্রয়োজনে রাতের প্রথমাংশে জাগ্রত থাকতেন। তাঁর চক্ষু ঘুমাত, ক্বলব ঘুমাত না। তিনি ঘুমালে নিজে নিজে জাগ্রত হওয়ার পূর্বে কেউ তাকে জাগাত না। তিনি কখনো সফরের জন্য রাত্রে বিশ্রামের ইচ্ছা করলে ডান পার্শ্বের উপর হেলান দিয়ে শুতেন। আর সকালে ইচ্ছে করলে বাহুকে বিছিয়ে দিতেন এবং হাতের তালুর উপর মাথা রেখে বিশ্রাম করতেন। এমনটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী। আবূ হাতিম তার "সহীহ"-তে বলেন, রাসূল সফরের জন্য রাত্রে বিশ্রাম করার ইচ্ছে করলে তার ডান হাতকে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম করতেন আর ভোরে বা সকালে তিনি তার বাহুকে বিছিয়ে দিতেন। আমার মনে হয় তিরমিযীর বর্ণনাটিই সহীহ।

রাসূল স্বাভাবিক ঘুম ঘুমাতেন এবং এটিই উপকারী ঘুম। ডাক্তারদের মতে, তাঁর পরিমাণ হলো রাতের ও দিনের এক ও তৃতীয়াংশ সময়। আর তা হলো আট ঘণ্টা।

www.waytojannah.com

Contents

লেনদেন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

লেনদেনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম মানব। তিনি কখনো কারো থেকে কোনকিছু ঋণ নিলে যা ঋণ হিসেব নিয়েছেন তার চেয়েও ভালো জিনিস তিনি তাকে দিতেন এবং তার জন্য দু'আ করতেন।

একদা এক ব্যক্তির থেকে ঋণ নিয়ে, তাকে তার চেয়ে ভালো জিনিস দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে তার জন্য দুআ করে বলেন, "আল্লাহ তোমার পরিবার-পরিজন এবং সম্পদে বরকত দান করুন নিশ্চয়ই অগ্রিম কোনকিছু গ্রহণের প্রতিদান হলো প্রশংসা করা এবং আদায় করা। একদা একজন থেকে চল্লিশ সা' ঋণ নিলেন আর লোকটির প্রয়োজন হলে রাসূল ﷺ-এর নিকট আসল। রাসূল ﷺ বললেন, এখনো তো ঋণ আদায়ের সময় হয়নি। লোকটি কথা বলতে চাইল। রাসূল ﷺ বললেন, শুধু ভালো কথাই বলবে। কারণ যারা ধার নেয় আমি তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এরপর লোকটিকে তার দেয়া চল্লিশ ছা ঋণ এবং তার সাথে অতিরিক্ত আরো ৪০ ছা' সর্বমোট ৮০ ছা' প্রদান করেন। (বাযযার)

তিনি একটি উট ঋণ করেছিলেন। মালিক এসে দাবি করলে, বিষয়টি রাসূল ﷺ-এর জন্য কষ্ট হয়ে যায়। এতে সাহাবাগণ চিন্তিত হন। রাসূল বললেন, তাকে তোমরা ছেড়ে দাও। কারণ পাওনাদারের বলার অধিকার আছে। তিনি একদা একটি জিনিস ক্রয় করেন। অথচ তাঁর নিকট জিনিসটি ক্রয় করার মত টাকা ছিল না এবং এতে তিনি খুব লাভবান হন। পরে জিনিসটি বিক্রি করে দেন এবং লভ্যাংশকে বনু আবদুল মুত্তালিবের বিধবা নারীদের মাঝে ছদকা করে দেন এবং ভবিষ্যতে কখনো এমন জিনিস ক্রয় করবেন না বলে সংকল্প করেন। যা ক্রয়ের মূল্য তাঁর কাছে নেই। (আবূ দাঊদ) এ প্রকারের লেনদেন এবং কোন সময়ের জন্য ক্রয়ের জিম্মা নেয়ার লেনদেন এক নয়।

এক ইহুদী নির্দিষ্ট সময়ে মূল্য আদায়ের শর্তে রাসূল ﷺ-এর নিকট একটি জিনিস বিক্রি করেছিল। সময় আসার পূর্বেই ইহুদী মূল্যের দাবি করলে রাসূল ﷺ বলেন, এখন তো মূল্য আদায়ের সময় হয়নি। ইহুদী বলল, বনী আব্দুল মুত্তালিব তোমরা আসলে ঋণ আদায়ে বিলম্বকারী। সাহাবাগণ এতে কিছুটা চিন্তিত হলেন এবং লোকটিকে এ ধরনের আচরণ থেকে নিষেধ করলেন। কিন্তু এতে রাসূল ﷺ-এর সহিষ্ণুতা আরো বেড়ে গেল। ইহুদী লোকটি বলল, আমি তার থেকে নবুওতের সকল নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছি শুধু বাকি ছিল একটি আর সেটি হলো মূর্খতার আধিক্যতা তার সহিষ্ণুতায় কোন পরিবর্তন করতে পারকী না। আর আমি এটাই জানতে চেয়েছিলাম। এরপর ইহুদী লোকটি ইসলাম গ্রহণ করল।

রাসূল ﷺ-এর একাকী এবং সাহাবাদের সঙ্গে পথ চলার বিবরণ

তিনি যখন হাঁটতেন তখন মাথা নিচু করে হাঁটতেন। তিনি হাঁটতেন সবচেয়ে দ্রুতগতিতে। তাঁর হাঁটা ছিল চমৎকার এর ধীরস্থির। আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ থেকে সুদর্শন আর কাউকে দেখিনি সূর্যরশ্মি যেন তাঁর চেহারায় দীপ্তমান। আর পথ চলার ক্ষেত্রেও আমি রাসূলের চেয়ে দ্রুতগতিতে আর কাউকে দেখিনি। পথের দূরত্ব যেন তার জন্য সঙ্কুচিত করে দেয়া হত। আমরা খুব কষ্ট করে পথ চলতাম। অথচ তিনি অনায়াসেই পথ চলতেন।

আলী (রা) বলেন, রাসূল ﷺ যখন পথ চলতেন তখন মনে হত যেন উঁচু স্থান থেকে নিচের দিকে অবতরণ করছেন। তিনি অপর এক বর্ণনায় বলেন, তিনি ﷺ যখন হাঁটতেন তখন পা তুলে হাঁটতেন। পা তুলে হাঁটা হলো বীর এবং সৈনিকদের হাঁটা। এ ধরনের হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য আরামদায়ক এবং দেহের

www.waytojannah.com

Contents

অন্যান্য অঙ্গের জন্য উপকারী এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কারণ পথচারী যদি বীরের ভাব নিয়ে বীরদের মত হাঁটে তবে তার এ হাঁটা হবে প্রশংসনীয়। আর যদি একগুঁয়ে উটের ন্যায় বিরক্তির ভাব নিয়ে হাঁটে তবে এটা নিন্দনীয়। কারণ এ জাতীয় হাঁটা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বিশেষ করে হাঁটা অবস্থায় যখন এদিক সেদিক তাকানোর বিষয়টি তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অথবা হাঁটা হবে নম্রতার, স্থিরতা এবং গাম্ভীর্যের সঙ্গে। আর এ ধরনের হাঁটাই হলো ইবাদুর রহমান তথা রহমানের বান্দাদের হাঁটা। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا.

"রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করা।" (আল-ফুরকান: ৬৩)

একাধিক সালেহীন থেকে বর্ণিত হয়েছে, স্থিরতা, নম্রতা এবং গাম্ভীর্যের সঙ্গে হাঁটাই ছিল রাসূল ﷺ-এর হাঁটা। তিনি এভাবে হাঁটার পরও মনে হত যেন তিনি উঁচু স্থান থেকে নিচের দিকে অবতরণ করছেন। পথের দূরত্ব যেন তাঁর জন্য সঙ্কুচিত করে দেয়া হয়েছে। এমনকি তার সঙ্গে যারা চলত তারা খুব কষ্ট করে পথ চলত। অথচ তিনি অনায়াসেই পথ চলতেন। তাঁর চলনে ছিল স্বাভাবিক গতিতে তবে সাধারণের তুলনায় একটু দ্রুত। এমন না যে, ওভাবে হাঁটতে তাকে বিশেষ কোন কসরত করতে হত।

পথ চলা সর্বমোট দশ প্রকার: উপর্যুক্ত তিন প্রকার এ দশটির অন্তর্ভুক্ত।

৪. সা'য়ী (ছুটে যাওয়া);

৫. রামাল (দ্রুত চলন), একে 'খাবাবও বলা হয়। সহীতে ইবনু উমার থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ তিনবার দুলকি চালে চলেছেন এবং চারবার হেঁটেছেন।

৬. নাসালান এমন স্থিরতার সঙ্গে হাঁটা যাতে পথচারীদের কষ্ট না হয় এবং সে অনায়াসে পথ চলতে পারে। পথচারিরা রাসূলকে বিদায় হাজ্জের চলনভঙ্গি সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি তাদেরকে বলেন, "তোমরা নাসালান গতিতে পথ চলো"।

৭. খাওযালী (এদিক-ওদিক হেলেদুলে চলা);

৮. আলক্বাহক্বারী (অধোগামী হয়ে চলা);

৯. জামাযী (লাফিয়ে লাফিয়ে চলা);

১০. দম্ভের সঙ্গে চলা। এ ধরনের চলনের কারণেই আল্লাহ জনৈক ব্যক্তিকে ধসিয়ে দিয়েছেন, সে কেয়ামত পর্যন্ত মাটিতে দাবতে থাকবে। এসব চলনের মধ্যে স্থিরতা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে চলাই হলো সর্বোত্তম। আর রাসূল ﷺ যখন সাহাবাদের সঙ্গে হাঁটতেন তখন সাহাবারা তাঁর সম্মুখে এবং তিনি তাদের পেছনে পেছনে হাঁটতেন এবং বলতেন, "আমার পেছনে হাঁটাকে ফেরেশতাদের জন্য ছেড়ে দাও"।

তাই তো হাদীসে এসেছে তিনি সাহাবাদেরকে সামনে যেতে বলতেন, আর তিনি পেছনে পেছনে খালি পায়ে এবং জুতা পায়ে হাঁটতেন। আর সাহাবারা তাঁর সঙ্গে কখনো দলবদ্ধ হয়ে হাঁটতেন কখনো-বা একাকী। এক যুদ্ধে সাহাবাদেরকে নিয়ে চলছিলেন অতঃপর তাঁর আঙ্গুল মোবারক রক্তাক্ত হয়ে গেল এবং রক্ত পড়তে লাগল। তখন তিনি বললেন–

www.waytojannah.com

Contents

هَلْ أَنْتِ إِلاَّ أُصْبُعٌ دَمِيتِ ۞ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ

অর্থাৎ, তুমি সাধারণ একটি আঙ্গুল মাত্র, তুমিতো রক্তাক্ত হয়েছ আল্লাহর পথে।

তিনি সফরে তাঁর সাহাবীদের পেছনে পেছনে চলতেন এবং তাদেরকে এগিয়ে নিতেন। দুর্বলের সহযোগিতা করতেন এবং তাদের জন্য দু'আ করতেন। (আবূ দাউদ)

স্বভাবজাত এবং ততসম্পর্কিত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পথনির্দেশ

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, যে তিনি খৎনা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন নাকি খৎনাবিহীন এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। আবার তাকে তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব খৎনা করেছেন কি না এ বিষয়েও ইখতেলাফ আছে। তিনি জুতা পরিধান, মাথা আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা লাভে এবং দেয়া নেয়ায় ডানদিক থেকে শুরু করাকে পছন্দ করতেন। তিনি খাওয়া-দাওয়া, পানাহার এবং পবিত্রতার জন্য ডান হাত ব্যবহার করতেন। আর নাপাক ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাম হাত ব্যবহার করতেন।

তিনি মাথা মুণ্ডালে সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডাতেন আর না হয় সম্পূর্ণ চুলই রেখে দিতেন অর্ধেক মাথা মুণ্ডানো আর অর্ধেক রেখে দেয়া এমনটি কখনোই করতেন। হজ্জ ছাড়া অন্য কোন সময় তিনি মাথা মুণ্ডাননি।

তিনি মেসওয়াককে ভালোবাসতেন এবং রোযা ব্যতীত স্বাভাবিক অবস্থায়ও মেসওয়াক করতেন। ঘুম থেকে উঠার পর মেসওয়াক করতেন। নামাজের সময়, ওযুর সময় এবং গৃহে প্রবেশের সময়ও তিনি মেসওয়াক করতেন। তিনি আরাকের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করতেন।

তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। সুগন্ধিকে ভালোবাসতেন। বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি চুনা ব্যবহার করতেন। তিনি প্রথম প্রথম সিঁথি না কেটে চুল ছেড়ে দিতেন এরপর মাথায় সিঁথি কাটতেন। তিনি কখনো হাম্মাম তথা সুইমিংপুল বা গোসলখানায় প্রবেশ করেন নি এবং হাম্মাম সম্পর্কিত কোন হাদীসই সহীহ নয়। রাসূল ﷺ-এর একটি সুরমাদানি ছিল সেখান থেকে রাতে ঘুমানোর পূর্বে প্রত্যেক চোখে তিনবার করে লাগতেন।

তিনি খেযাব ব্যবহার করেছেন কি না তা নিয়ে সাহাবাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। আনাস (রা) বলেন, তিনি খেযাব ব্যবহার করেননি। আবূ হুরায়রা বলেন, তিনি খেযাব ব্যবহার করেছেন। হাম্মাদ বলেছেন, আমাকে মুহাম্মদ ইবনু উকাইল সংবাদ দিয়েছেন যে, আমি আনাস ইবনু মালিক (রা)-এর কাছে (সংরক্ষিত) রাসূলের ﷺ-এর খেযাব লাগানো চুল দেখেছি। একদল আলেমের মতে রাসূল ﷺ-এর অধিক সুগন্ধির ব্যবহার তার চুলকে লাল করে দিয়েছিল। ফলে অনেকে খেযাব দিয়েছেন বলে মনে করত। অথচ তিনি খেযাব ব্যবহার করেননি। আবূ রিমছা (রা) বলেন, আমি আমার এক ছেলেসহ রাসূলের ﷺ-এর কাছে আসলাম। রাসূল ﷺ বললেন, একি তোমার ছেলে ? আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনি সাক্ষী থাকুন। রাসূল বললেন, সে কোন অপরাধ করলে তার দায়ভার তার উপর বর্তাবে না। আবূ রিমছা বলেন, আমি তাঁর কিছু চুল লাল দেখতে পেলাম। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী বলেন, রাসূল ﷺ-এর খেযাব সম্পর্কিত যত রেওয়াত রয়েছে তার মধ্যে এ রেওয়াতটি তুলনামূলক সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও স্পষ্টতর। কেননা, সহীহ রেওয়ায়েতসমূহের বক্তব্য অনুযায়ী রাসূল ﷺ বার্ধক্যে পৌছেন নি। হাম্মাদ ইবনু সালামা ইবনু সিমাক ইবনু হারব বলেন, জাবির ইবনু সামুরাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, রাসূল ﷺ-এর চুল মোবারকে সাদা চুল

www.waytojannah.com

Contents

ছিল কি? তিনি উত্তর দিলেন, রাসূল ﷺ-এর মাথায় সাদা চুল ছিল না তবে সিঁথিতে কয়েকটি চুল ছিল যা তেল ব্যবহার করলে ঢেকে যেত। আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূল ﷺ প্রায়ই মাথায় তেল ব্যবহার করতেন এবং প্রায়ই দাড়ি আঁচড়াতেন। অনেক সময় মাথায় অতিরিক্ত একটি কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করতেন। (অত্যধিক তেল ব্যবহারের কারণে মনে হত) তা যেন তেল বিক্রেতার কাপড়। তিনি মাথার চুল পরিপাটি রাখতে ভালোবাসতেন। কখনো নিজে নিজে মাথার চুল আঁচড়াতেন আবার কখনো আয়িশা (রা) আঁচড়িয়ে দিতেন। তাঁর চুল মোবারক জুম্মা থেকে লুম্বা ও "ওয়াফরা" থেকে খাটো ছিল। তাঁর জুম্মার চুল কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছত। চুল লম্বা হয়ে গেলে তিনি চুলকে চারটি গুচ্ছে বিন্যস্ত করে নিতেন। উম্মু হানী বলেন, হিযরতের পর একবার আমাদের নিকট মক্কায় এসেছিলেন। আর তখন তাঁর মাথার চুল চারটি গুচ্ছে বিন্যস্ত ছিল। হাদীসটি সহীহ। তিনি কখনো সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না। সহীহ মুসলিমে এসেছে, যার নিকট রাইহান নামক সুগন্ধি পেশ করা হয়েছে সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয় কারণ এটি বহনে হালকা এবং খুবই সুগন্ধিময়। অনেকে রেওয়াত করেছেন যে, যার নিকট সুগন্ধি পেশ করা হয়েছে সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়।"

আনাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কখনো আতর ফিরিয়ে দিতেন না তবে এ বিষয়ে ইবনু ওমারের হাদীসটি, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন যে, "তিনটি জিনিস কখনো ফিরিয়ে দিতে নেই– (ক) বালিশ; (খ) তেল; ও দুধ" মা'লুল।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উল্লেখ করে তার ইল্লাত বর্ণনা করেছেন। তিনি এ হাদীসটির ব্যাপারে কী ইল্লাত উল্লেখ করেছেন তা আমার এখন স্মরণ নেই। তবে রিওয়ায়াতটি আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম ইবনু জুনদুব তার পিতা থেকে এবং তার পিতা ইবনু ওমার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ উসমান আন্-নাহদীর মুরসাল হাদীসের একটি হলো, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের কাউকে রায়হান (উন্নতমানের সুগন্ধি বিশেষ) দেয়া হলে সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা তা জান্নাত থেকে এসেছে। রাসূল ﷺ-এর একটি আতরদানি ছিল। তা থেকে তিনি আতর ব্যবহার করতেন। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সুগন্ধি ছিল মেশক এবং তিনি মেহেদী ফুলকে খুব পছন্দ করতেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বচনভঙ্গি নীরবতা এবং হাসি কান্নার বর্ণনা

রাসূল ﷺ ছিলেন আল্লাহ সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে অধিকতর শুদ্ধ সুমিষ্টভাষী। তাঁর কথা সকলের হৃদয়ে প্রভাব ফেলত। অন্তরসমূহকে বন্দী করে ফেলত। তাঁর যারা শত্রু তারাও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে। তিনি কথা বললে সুস্পষ্টভাবে এবং ধীরে ধীরে কথা বলতেন যাতে গণনাকারী গণনা করতে পারে। এত দ্রুত কথা বলতেন যে তা মুখস্ত করা সম্ভব নয়। কথা বলার সময় মাঝে মাঝে থেমে থেমে বলতেন। এ বিষয়ে তাঁর জীবন পদ্ধতি ছিল সবার চেয়ে পূর্ণাঙ্গ। আয়িশা (রা) বলেছেন, রাসূল ﷺ তোমাদের মতো তাড়াতাড়ি কথা বলতেন না, তিনি কথা বলতেন সুস্পষ্টভাবে। উপস্থিত যে কেউ তা হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারত। তিনি অধিকাংশ সময় একটি শব্দ বা কথাকে তিনবার বলতেন। যাতে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তিনি সালাম দিলে তিনবার সালাম দিতেন। অধিকাংশ সময় চুপচাপ নীরব থাকতেন। প্রয়োজন ছাড়া কোন কথা বলতেন না। যে কথা শুরু করতেন পূর্ণ মুখ খুলে এবং শেষও করতেন পূর্ণ মুখ খুলে। অর্থাৎ, আগাগোড়া স্পষ্টভাবে কথা বলতেন। যে কোন কথার শুরু শেষ তিনি স্পষ্টরূপে করতেন, কিছু জোরে

www.waytojannah.com

Contents

কিছু আস্তে, কিংবা শুরুতে জোরে পরে ঠোঁটের ইশারায় কথা বলতেন না; যা অহঙ্কারীরা করে। তিনি প্রাজ্ঞাপূর্ণ কথা বলতেন। তাঁর কথা ছিল স্পষ্ট, আলাদা আলাদা। অতিরিক্ত কিংবা (ত্রুটিপূর্ণ, অস্পষ্ট) সংক্ষিপ্ত ছিল না। তিনি অনর্থক কথা বলতেন না। তিনি শুধু ভালো বিষয়েই কথা বলতেন। তিনি কোন কিছুকে অপছন্দ করলে তা তাঁর চেহারায় ফুটে উঠত। তিনি অশ্লীল কথাবার্তা বলতেন না এবং কেউ বলুক সেটাও পছন্দ করতেন না। তিনি সাধারণত মুচকি হাসতেন। বরং তার অধিকাংশ হাসিই ছিল মুচকি হাসি। তিনি হাসলে বেশির থেকে বেশি তার দন্তমুবারক দেখা যেত।

তিনি হাসির জিনিসে হাসতেন অর্থাৎ বিষয়টি আশ্চর্যকর এবং দুর্লভ হলে হাসতেন।

হাসির কারণ আছে, এটি একটি, দ্বিতীয়ত, আনন্দের কারণে হাসি। তৃতীয়ত, রাগের কারণে হাসি ইত্যাদি।

তাঁর কান্নাও ছিল হাসির মতো। তিনি যেমনি উচ্চ স্বরে হাসতেন না ঠিক তেমনি বিলাপ এবং উচ্চ আওয়াজে কান্নাকাটিও করতেন না। তিনি কাঁদলে তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ত এবং তাঁর বক্ষ মোবারক থেকে শব্দ বের হত। তাঁর কান্না কখনো মৃতব্যক্তির জন্য রহমতের কারণে হত। আবার কখনো উম্মাতের জন্য ভয়ের কারণে হত। অনেক সময় তিনি আল্লাহর ভয় কাঁদতেন আবার কখনো কুরআন শুনে কাঁদতেন। এ কান্না হলো মুহাব্বাত এবং আযমাতের কান্না। সাথে আছে ভয় এবং আশা। রাসূল ﷺ-এর ছেলে ইবরাহীম যখন ইন্তেকাল করল। তখন তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হলো এবং তার জন্য রহমতস্বরূপ তিনি কাঁদলেন এবং বললেন, চক্ষু অশ্রু প্রবাহিত করে, হৃদয় ব্যথিত হয় এবং আমরা শুধু তাই বলি যাতে আমাদের আল্লাহ খুশি এবং হে ইবরাহীম, তোমার কারণে আমরা ব্যথিত। এমনি করে তিনি কেঁদেছেন তাঁর এক কন্যার জান বের হবার কষ্ট দেখে। কেঁদেছেন যখন ইবনু মাসউদ (রা) রাসূল ﷺ-এর সম্মুখে সূরা নিসা তেলাওয়াত করে–

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـٰؤُلَاءِ شَهِيدًا.

পর্যন্ত পৌছলেন। কেঁদেছেন যখন উসমান ইবনু মাযউন ইন্তেকাল করেন। কেঁদেছেন যখন সূর্যগ্রহণ হয়েছে এবং সূর্যগ্রহণের নামাজ পড়েছেন এবং নামাজে এত অধিক পরিমাণে কাঁদছিলেন যে মুখ দিয়ে ফুঁ বের হচ্ছিল। এবং বলছিলেন, হে আল্লাহ, আপনি কি আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেননি যে, আপনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। যতদিন আমি তাদের মধ্য জীবিত থাকব এবং তারা ইস্তেগফার করবে এবং আমরা আপনার ইস্তেগফার করব। তিনি যখন তাঁর এক কন্যার কবরে বসেছিলেন তখনও কেঁদেছেন। তাছাড়া তিনি মাঝে মাঝে তাহাজ্জুদের নামাজেও কান্নাকাটি করতেন।

কান্না কয়েক প্রকার:

১. রহমত ও দয়ার কান্না।
২. ভয়ের কারণে কান্না।
৩. ভালোবাসা ও মুহাব্বাতের কারণে কান্না।
৪. আনন্দ ও খুশির কারণে কান্না।
৫. বিপদ মুসীবতের কারণে কান্না।
৬. পেরেশানীর কারণে কান্না।
৭. দুর্বলতার কারণে কান্না।

www.waytojannah.com

Contents

৮. নেফাকীর কান্না অর্থাৎ উপরে উপরে কান্নার ভাব আর ভেতরে এর উল্টা পরিকল্পনা।

৯. অর্থ নিয়ে কান্নাকাটি করা যেমনটি করে বিলাপকারিণী মহিলারা। ওমার ইবনুল খাত্তাব বলেছেন, তুমি নিজের অশ্রু বিক্রি করবে আর অন্যের বিষণ্ণতায় কাঁদবে।

১০. কাউকে কাঁদতে দেখে কাঁদা এবং সে নিজেও জানে না যে, সে কেন কাঁদছে।

আওয়াজ ব্যতীত অশ্রু ঝরলে বলা হয় 'বুকা' আর আওয়াজের সঙ্গে হলে বলা হয় 'বুকাউন' শেষে হামযার সাথে।

কবি বলেছেন–

بكت عيني وحق لها بكاها ◉ وما يغني البكاء ولا العويل

আমার চক্ষু আওয়াজ ব্যতীত অশ্রু ঝড়িয়েছে। অথচ তার উচিত আওয়াজসহ অশ্রু ঝড়ানো। তবে এ উচ্চ আওয়াজের কান্নাকাটি এবং আর্তনাদ কোন কাজে আসবে না।

আর কান্না না আসলেও কান্নার ভান করে কাঁদাকে তাবাকী বলে এটা দু' প্রকার:

১. প্রশংসনীয়;

২. নিন্দনীয়।

প্রশংসনীয় হলো আল্লাহর ভয়ে এবং হৃদয়কে বিগলিত করার জন্য কাঁদা লোক দেখানো বা সুনামের জন্য নয়। নিন্দনীয় কান্না হলো মাখলুকের জন্য কাঁদা। ওমার ইবনুল খাত্তাব নাবী ﷺ এবং আবূ বাকরকে বদরের বন্দীদের ব্যাপারে কাঁদতে দেখে বললেন, রাসূল আমাকে বলুন, আপনি কাঁদলেন কেন? কাঁদার বিষয় হলে আমিও কাঁদব আর না হয় কাঁদার ভান করব। অতঃপর রাসূল ﷺ তার এ কথার কোনো প্রতিবাদ করেননি। অনেক সালাফে সালেহীনগণ বলেছেন তোমরা আল্লাহর ভয়ে কাঁদো। কান্না না আসলে কান্নার ভান করো।

রাসূলল্লাহ ﷺ-এর খুতবার বিবরণ

তিনি কখনো জমিনে দাঁড়িয়ে কখনো মিম্বারের উপর এবং কখনো উট বা সাওয়ারীতে আরোহন করে খুতবা (বক্তৃতা) দিতেন। তিনি খুতবা দিলে তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণের হয়ে যেত। আওয়াজ উঁচু হয়ে যেত এবং তাঁর ক্রোধ বেড়ে যেত কেমন যেন তিনি শত্রুদের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন। তিনি বলতেন, তারা তোমাদের উপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় আক্রমণ করবে এবং বলতেন, আমার এবং কেয়ামতের মাঝে সম্পর্ক হলো এ দু'আঙ্গুলের মতো। একথা বলে মধ্যমা এবং শাহাদাত আঙ্গুলীকে মিলিয়ে নিতেন এবং বলতেন, "দরূদ ও সালামের পর নিশ্চয় সর্বোত্তম কথা হলো কিতাবুল্লাহ। সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হলো মুহাম্মাদের ﷺ আদর্শ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বস্তু হলো নব আবিষ্কৃত বস্তু এবং সকল বেদআতই ভ্রষ্টতা।

তিনি খুতবাকে আলহামদুলিল্লাহ দ্বারা শুরু করতেন। অনেক ফেকাহবিদগণের বক্তব্য যে, তিনি বৃষ্টির নামাজের খুৎবা ইস্তেগফার দ্বারা এবং উভয় ঈদের খুৎবা তাকবীর দ্বারা শুরু করতেন" এটা সুন্নাত নয় বরং নাবী ﷺ-এর সুন্নাত বিরোধী। ইমাম আহমাদের অনুসারীদের মাযহাব এটাই যে প্রত্যেক খুতবার "আলহামদুলিল্লাহ" দ্বারা শুরু করতে হবে এবং এ মতটিই অবলম্বন করেছেন আমাদের শাইখ।

www.waytojannah.com

Contents

তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। তিনি মিম্বারে উঠলে লোকদের দিকে ফিরে বসতেন। এরপর বলতেন– السلام عليكم "আস্‌সালামু 'আলাইকুম"। শা'বী বলেন, আবূ বাকর এবং ওমারও এমনটিই করতেন।

তিনি তাঁর খুতবাকে ইস্তেগফারের মাধ্যমে শেষ করতেন। তিনি অধিকাংশ সময় কুরআনের মাধ্যমে খুতবা দিতেন। সহীহ মুসলিমে এসেছে, উম্মে হিসাম বিনতে হারেছা বলেছেন–

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ.

আয়াতটি আমি নাবী ﷺ-এর মুখ থেকে শুনেই আয়ত্ব করেছি। তিনি জুমু'আর দিন মিম্বারে খুতবার মধ্যে এ আয়াতটি পড়তেন। আবূ দাউদ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূল যখন আল্লাহ এক বলে সাক্ষ্য দিতেন তখন বলতেন–

الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله، فلا مضل له، ومن يضلله، فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدى الساعة، من يطع الله ورسوله، فقد رشد ومن يعصهما، فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا.

"সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমাদের আত্মার সর্বপ্রকার অনিষ্ট হতে তাঁর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তিনি যাকে পথ দেখান তাকে পথভ্রষ্ট করার কারো ক্ষমতা নেই। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তার পথ প্রদর্শনকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। নিশ্চয় মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি কেয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে তাঁকে সত্য দিয়ে সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছেন। যে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করবে সে নিশ্চিত হেদায়াতপ্রাপ্ত। আর যে তাদের অবাধ্য হবে সে শুধু নিজেরই ক্ষতি করবে এবং এতে আল্লাহর কোন ক্ষতি হবে না।"

আবূ দাউদ ইউনুস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইউনুস ইবনু শিহাবকে জুমার দিনে রাসূল ﷺ-এর খুতবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনিও এমনটিই উল্লেখ করেন। তবে তিনি আরো একটু যোগ করে বললেন, আর যে তাদের অবাধ্য হবে সে নিশ্চিত ভ্রষ্ট।

ইবনু শিহাব বলেন, আমাদের নিকট পৌঁছেছে, তিনি ﷺ যখন খুতবা দিতেন তখন বলতেন, যা আগমনের তা আসবে। যা আসবে তা অবশ্যই আসবে। কারো তাড়াহুড়ার কারণে আল্লাহ কোন জিনিসকে ত্বরান্বিত করেন না। মানুষের কারণে কোন কিছু হালকা হবে না। আল্লাহ যা চান তাই হবে মানুষ যা চায় তা হবে না। আল্লাহ এক জিনিস চান আর মানুষ চায় আরেক জিনিস। আল্লাহ যা চান তা-ই হবে যদিও মানুষ তা অপছন্দ করুক। আল্লাহ যা নিকটবর্তী করে দিবেন তা দূরকারী কেউ নেই। আর আল্লাহ যা দূরীভূত করবেন তা নিকটবর্তী করার কেউ নেই এবং সবকিছু তাঁর ইচ্ছাই হয়। তাঁর খুতবার বিষয়বস্তু ছিল আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর গুণগান, তাঁর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি, ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, জান্নাত-জাহান্নাম, ইহকাল-পরকাল, খোদাভীতি, তাঁর ক্রোধের কারণ তাঁর সন্তুষ্টির কারণ ইত্যাদি বর্ণনা করা।

তিনি খুতবায় বলতেন– "হে লোক সকল, তোমরা কখনো সক্ষম হবে না, এবং পারবে না (সে বিষয়) যে বিষয় সম্পর্কে তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে কিন্তু তোমরা পথ দেখাও এবং সুসংবাদ দাও।"

তিনি শ্রোতাদের অবস্থা এবং উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করে খুতবা দিতেন। প্রত্যেক খুতবাই তিনি "আলহামদুলিল্লাহ" বলে শুরু করতেন এবং তাতে "কালিমায়ে শাহাদাত" উল্লেখ করতেন এবং তাতে

www.waytojannah.com

Contents

সরাসরি নিজের নাম উল্লেখ করতেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক ঐ খুতবা যাতে আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয়া হয় না তা কর্তিত হাতের মতো। তিনি ঘর থেকে বের হলে তার সঙ্গে কোন গার্ড বা প্রহরী বের হত না। তিনি বর্তমানের বক্তাদের পোশাকের ন্যায় কখনো পোশাক পড়তেন না এবং তিনি প্রশস্ত কলার ব্যবহার করতেন না। তার মিম্বারের সিঁড়ি ছিল তিনটি। তিনি সেখানে উঠে বসলে লোকদের দিকে ফিরে বসতেন। আর মুআজ্জিন শুধু আযান দিত আযানের আগে এবং পরে কিছুই বলত না। তিনি খুতবা শুরু করলে কেউ তখন কোনো আওয়াজ করত না। এমনকি মুআজ্জিনও না। তিনি খুতবা দিতে যখন মিম্বারে দাঁড়াতেন তখন হাতে লাঠি নিয়ে তাতে ভর করে দাঁড়াতেন। এমনটি আবূ দাউদ ইবনু শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন।

তারপরে তার পরবর্তী তিন খলীফাও এমনটি করতেন। তিনি কখনো কখনো ধনুকের উপর ভরে করে দাঁড়াতেন। তরবারীর উপর ভরের বিষয়টি তাঁর থেকে প্রমাণিত নয়। অনেক মূর্খ মনে করে ইসলাম যেহেতু তরবারির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে তাই খুতবার সময় মিম্বারে হাতে তরবারি রাখতে হবে। এ ধরনের ধারণা দু'কারণে মূর্খতা।

১. তাঁর থেকে শুধু লাঠি এবং ধনুকের উপর ভর দেয়ার বিষয়টিই বর্ণিত।

২. দীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ওহীর মাধ্যমে। তরবারির কথা তারাই বলে যারা পথভ্রষ্ট এবং মুশরিক। মাদীনাতুন্নাবীতে তিনি খুতবা দিয়েছেন আর তা বিজীত হয়েছে কুরআনের মাধ্যমে। তরবারির মাধ্যমে নয়।

খুতবার মাঝে কোন কিছুর প্রয়োজন হলে তিনি তা পূর্ণ করে পুনরায় খুতবায় মনোনিবেশ করতেন। তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় হাসান হুসাইন দুটি লাল জামা পরিহিত অবস্থায় আছাড় খেলে তিনি মিম্বার থেকে নেমে তাদেরকে উঠালেন এরপর পুনরায় মিম্বারে ফিরে গেলেন এবং বললেন: মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন–

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ.

"নিশ্চয় তোমাদের ধনসম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু।" (আল-আনফাল: ২৮)

এরপরে (বললেন) আমি এদেরকে লাল কাপড় পরিহিত অবস্থায় হোঁচট খেতে দেখে আর সহ্য করতে পারিনি তাই কথা বন্ধ করে তাদের উঠিয়েছি।

তাঁর খুতবা অবস্থায় সুলাইক আল গাতাফানী এসে বসে পড়লে তিনি তাকে বললেন, সুলাইক দাঁড়াও এবং দু'রাকাত নামাজ পড়ো এবং এ দু'রাকাত সংক্ষেপে পড়ে নাও। এরপর মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা অবস্থায় তোমাদের কেউ আসলে সে যেন সংক্ষেপে দু'রাকাত নামাজ পড়ে নেয়। তিনি তাঁর খুতবাকে কখনো লম্বা করতেন কখনো আবার সংক্ষেপ। এসবই করতেন মানুষের প্রয়োজনানুসারে। সাধারণ খুতবার তুলনায় কোন বিষয়ের কারণে প্রদত্ত উপস্থিত খুতবা দীর্ঘ করতেন। তিনি ঈদের দিনসমূহে মহিলাদের উদ্দেশে পৃথক খুতবা দিতেন এবং এ খুতবায় তাদেরকে দান-সদকায় উৎসাহিত করতেন।

www.waytojannah.com

Contents

নামাজ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে নামাজে দাঁড়াতেন। এর পূর্বে তিনি কোন কিছু বলতেন না এমনকি কোন নিয়তও উচ্চারণ করতেন না এবং বলতেনও না, যে আমি চার রাকাত নামাজ আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য কেবলামুখী হয়ে ইমাম বা মুক্তাদি হয়ে আদায় করছি। এমনকি আদা না কাযা এবং কোন সময়ের কথাও বলতেন না। এসব বেদাআতের একটি অংশবিশেষ যা রাসূল থেকে কেউ সহীহ যইফ, মুসনাদ বা মুরসাল কোনোভাবেই বর্ণনা করেননি। কোনো সাহাবী থেকে এটি বর্ণিত হয়নি তাবেঈন এবং আইম্মায়ে আরবা'আ তথা চার ইমামের কেউও এটিকে করেননি। বরং "নামাজ-রোযার মতো নয় এবং যিকর ব্যতীত কেউ নামাজ শুরু করবে না" ইমাম শাফেয়ীর একথা থেকে পরবর্তী আলেমদের অনেকে প্রতারিত হয়েছেন। তারা মনে করেছেন যিকর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুখে নিয়ত করা। অথচ ইমাম শাফেয়ী দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তাকবীরে তাহরীমা, অন্য কিছু নয়। রাসূল যে জিনিসটি কোনো নামাজে করেননি ইমাম শাফেয়ী সেটাকে মুস্তাহাব কিভাবে বলবেন। তাছাড়া ওলামায়ে কেরাম এবং তাঁর সাহাবাদের কেউও এমনটি করেননি। তাদের সীরাত আর জীবনী আমাদের সামনে তাদের কেউ এমনটি বলে থাকলে তা গ্রহণ করব। তাদের চরিত্রের চেয়ে উন্নত চরিত্র আর কারো হতে পারে না। তাকবীরে তাহরীমার সময় তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলতেন এবং কেবলামুখী হয়ে আঙ্গুলগুলো ছড়ানো অবস্থায় পর্যন্ত উভয় হাত উঠাতেন। কাঁধ পর্যন্ত উঠানোর কথাও বর্ণিত হয়েছে আবু হুমাইদ আস্-সায়িদী এবং তার সমমনারা বলেন, তিনি কাঁধ বরাবর হাত উত্তোলন করতেন। এমনটিই বলেছেন ইবনু উমার। ওয়েল ইবনু হুজর বলেন, কানের লতি পর্যন্ত। বারা বলেন, উভয় কান পর্যন্ত। কেউ কেউ বলেন, উভয়টারই অবকাশ আছে।

কেউ কেউ বলেছেন তাঁর হাতের আঙ্গুল ছিল কানের লতি পর্যন্ত আর তালু ছিল কাঁধ পর্যন্ত। সুতরাং কোন ইখতেলাফ নেই। এরপর তিনি ডান হাতকে বাম হাতের পিঠের উপর রাখতেন।

রাসূল ﷺ কখনো কখনো নিম্নোক্ত দু'আ দ্বারা নামাজ শুরু করেন–

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, তুমি আমার ও আমার গুনাহসমূহের মধ্যে এরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করো যেরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিরে মাঝে। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে আমার গুনাহ থেকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে পাপমুক্ত করে এমন পরিষ্কার কর, যেমন পরিষ্কার হয় সাদা কাপড় নাপাক থেকে।"

কখনো কখনো বলতেন–

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي

www.waytojannah.com

لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِى لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّى سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّى سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ

وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

অর্থাৎ, "আমি একনিষ্ঠভাবে সেই মহান সত্তার দিকে আমার মুখ ফিরাচ্ছি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ একমাত্র বিশ্বজগতের প্রভু প্রতিপালক আল্লাহর জন্য তার কোন শরীক নেই, আর এজন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি। এবং আমি মুসলমানদের একজন।

হে আল্লাহ, তুমি সেই বাদশাহ যিনি ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই। তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার বান্দা, আমি তোমার নিজের উপর জুলুম করেছি, এবং আমি আমার পাপসমূহের সম্বন্ধে স্বীকৃতি দিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমার যাবতীয় গুনাহসমূহ মাফ করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি ব্যতীত আর কেউই গুনাহসমূহ মাফ করতে পারে না। তুমি আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে ধাবিত করো, তুমি ব্যতীত আর কেউই উত্তম চরিত্রের দিকে ধাবিত করতে পারে না, আমার ত্রুটিগুলো তুমি আমার দূরীভূত করো, তুমি ব্যতীত অন্য কেউই চারিত্রিক দোষ দূর করতে পারে না।

হে প্রভু, আমি তোমার হুকুম মানার জন্য উপস্থিত ও প্রস্তুত। যাবতীয় কল্যাণময় তোমার হাতে। অকল্যাণ তোমার দিকে সম্পৃক্ত নয় অর্থাৎ তোমার কাম্য নয়। আমি তোমারই এবং তোমারই দিকে আমার সকল প্রবণতা, তুমি কল্যাণময় ও মহিমান্বিত, আমি তোমার নিকট মার্জনা চাচ্ছি এবং তোমারই দিকে ফিরে আসছি।"

কখনো আবার বলতেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, তুমি জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু। আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্য সমস্ত বিষয়েরই তুমি সুবিদিত। তোমার বান্দাগণ যেসব বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদে জড়িত, তুমিই তার মীমাংসা করে দাও। যেসব বিষয়ে তারা মতভেদ করছে এর মধ্যে তুমি তোমার অনুমতিতে আমাকে যা সত্য সে দিকে ধাবিত কর। নিশ্চয়ই তুমি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাক।"

কখনো বলতেন–

اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ومن فيهن.....

"হে আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে তুমি ওদের সকলের নূর এবং প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য।"

কখনো বলতেন–

اللّٰهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْراً، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْراً، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْراً،

وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً، سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً، سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً،

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ، و نَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ،

www.waytojannah.com

অর্থ: "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ অতীব শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, অনেক অনেক প্রশংসা, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা সকাল সন্ধ্যায় এবং দিবসে নিশিতে তথা সর্বক্ষণ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি (৩ বার)। অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করছি। আশ্রয় কামনা করছি তার দম্ভ থেকে, তার কুমন্ত্রণা থেকে।"

আবার কখনো আল্লাহু আকবার ১০ বার, "সুবহানাল্লাহ" ১০ বার, "আলহামদুলিল্লাহ" ১০ বার, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ১০ বার এবং "ইস্তেগফার" ১০ বার এবং এরপর বলতেন–

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي

"হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে হেদায়াত দিন, আমাকে রিযিক দিন এবং আমাকে সুস্থ রাখুন।" (দশ বার)

এরপর বলতেন–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট কিয়ামতের দিন সংকীর্ণ অবস্থান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

এসবগুলো দু'আই তাঁর থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

অর্থ: "হে আল্লাহ, তুমি মহান, তোমার প্রশংসা অতি উচ্চ। তোমার নামই বরকতময়। তোমার গৌরব অতি উচ্চ, তুমি ছাড়া কোনই উপাস্য নেই।" এ দু'আ পড়ে নামাজ শুরু করতেন।

সুনানের লেখকগণ হাদীসটি আলী ইবনু আলী আর রিফায়ীয় সূত্রে আবূ সাঈদ (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছে। কখনো আবার মুরসাল সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন। এমনটি বর্ণিত হয়েছে আয়িশা থেকে এবং এর পূর্বে উল্লিখিত হাদীসগুলো অধিক সহীহ। তবে উমার ইবনুল খাত্তাব থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত তিনি এ দু'আটি দিয়ে রাসূলের জায়গায় নামাজ শুরু করতেন এবং দু'আটি লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন। ইমাম আহমাদ বলেন, উমারের রিওয়ায়াতটিই আমি গ্রহণ করব। যদিও কেউ যে কোন একটি দু'আ দিয়ে নামাজ শুরু করলেও হয়ে যাবে। ইমাম আহমাদ ওমারের মতটিকে ১০টি কারণে গ্রহণ করেছেন যা আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি।

১. ওমারের উচ্চস্বরে পাঠ করে সাহাবাদেরকে শিক্ষা দেয়।
২. দু'আটিতে কুরআনের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ বাণীর স্থান পাওয়ার কারণে।
৩. এ দু'আটিতে শুধু আল্লাহর প্রশংসা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর অন্যান্যগুলোতে শুধু দু'আ। আর প্রশংসা দু'আর তুলনায় শ্রেষ্ঠ। তাই তো সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার কুরআনের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ।
৪. এ দু'আটি দিয়ে শুরু করাতে প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর পবিত্র গুণাবলীর সংবাদ দেয়া হয়। আর وجهت وجهى ইত্যাদি দু'আ দিয়ে নামাজ শুরু করলে বান্দার দাসত্বের সংবাদ প্রদান করা হয় আর উভয়ে মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

www.waytojannah.com

Contents

৫. যারা وجهت وجهى এর মাধ্যমে নামাজ শুরু করেন তারা শুধু হাদীসের কিয়দংশের উপর আমল করেন।

রাসূল এরপর আউযুবিল্লাহ পড়তেন। এরপর ফাতেহা পড়তেন। তিনি بسم الله-বিসমিল্লাহ কখনো উচ্চ স্বরে আবার কখনো নিম্ন স্বরে পড়তেন তবে বেশিরভাগ নিম্ন স্বরেই পড়তেন। এটা সুস্পষ্ট যে তিনি দৈনিক পাঁচ বার বা সফরে ও সফরের বাইরে সর্বদাই বিসমিল্লাহ উচ্চ স্বরে পড়তেন না। এমন নয় যে তিনি সর্বদা উচ্চ স্বরে বিসমিল্লাহ পড়তেন। যদি এমনটিই হয় তবে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং জমহুর এটি করতেন এবং এ ব্যাপারে সকল সহীহ হাদীসসমূহ অস্পষ্ট আর সুস্পষ্টগুলো গায়রে সহীহ।

রাসূল ﷺ টেনে টেনে পড়তেন। প্রত্যেক আয়াতে ওয়াক্‌ফ করতেন। সূরা ফাতেহা পড়া শেষ হলে 'আমীন' পড়তেন। কেরাত উচ্চ স্বরে পড়লে আমীনও উচ্চ স্বরে আর কেরাত নিম্ন স্বরে হলে আমীনও নিম্ন স্বরে পড়তেন। এবং তার পেছনের লোকেরাও তা পড়ত। তিনি দুবার থামতেন। একটি তারযী ও কেরাতের মাঝে এবং এ বিষয়েই আবূ হুরাইরা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল। আর দ্বিতীয়টির ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। কেউ বলেছেন ফাতেহা পাঠের পর, কারো মতে কিরাতের পরে রুকুর পূর্বে। কেউ কেউ বলেছেন এটি ছিল ভিন্ন আরেকটি বিরতি। সুতরাং এ হিসেবে তিনি তিনবার থাকতেন। বলা হয়, তিনি এমনটি করতেন যাতে মুক্তাদিরা কেরাত পড়তে পারে। এ হিসেবে কেরাত ও সূরা ফাতেহার সমপরিমাণ দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। আর তৃতীয় বিরতি দিতেন সাময়িক বিশ্রামের জন্য। একে স্বল্প সময়ের কারণে কেউ তো একে গণনায় ধরেননি। আবার কেউ একে গণনায় ধরে তৃতীয় আরেকটি বিরতি বলে উল্লেখ করেছেন।

এরপর রাসূল ﷺ সূরা ফাতেহা শেষ করার পর ভিন্ন কিরাত পড়তেন। এ কিরাতকে কখনো দীর্ঘ করতেন। আবার সফর ইত্যাদি কারণে সংক্ষিপ্ত করতেন। তবে সাধারণত মধ্যম ধরনের কিরাতই পড়তেন। তিনি ফজরের নামাজে ৬০ থেকে ১০০ আয়াত পাঠ করতেন। ফজরের নামাজে উভয় রাকাতে কখনো সূরা ক্বাফ, কখনা রূম, কখন সূরা ইয়াশ শামসু কুভভিরাত এবং কখনো إذا زلزلت পাঠ করতেন। সফরে সূরা নাস ও ফালাক পড়তেন এবং একবার প্রথম রাকাতে সূরা মু'মিন পড়লেন এবং যখন মূসা ও হারুনের আলোচনায় পৌছলেন তখন কাশি আসলে রুকূ করে ফেলেন। আর শুক্রবারে ফজরের নামাজে পূর্ণ 'আলিফ লাম মীম আস-সিজদা' ও হাল আতা আলাল ইনসান পাঠ করতেন। বর্তমানে অনেকে এখান থেকে এবং ওখান থেকে নিয়ে যে তেলাওয়াত করে তিনি এমনটি করতেন না এবং উভয় রাকাতে এক সেজদা পাঠ করা সুন্নাত পরিপন্থী। অনেক মূর্খ লোক মনে করে জুমু'আর দিনকে সূরায়ে সেজদা পাঠের কারণে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। আর এ কারণেই অনেক ইমামগণ সূরায়ে সেজদা তেলাওয়াতকে মাকরুহ বলেছেন। রাসূল ﷺ উক্ত সূরা দুটি পড়তেন সূরা দুটিতে পৃথিবীর শুরু শেষ আদম সৃষ্টি, জাহান্নামে প্রবেশ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা থাকার কারণে তাছাড়া উক্ত সূরাদ্বয়ে জুমু'আর দিনে কী হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কী হবে সে ব্যাপারে আলোচনা আছে তাই। রাসূল তার উম্মাতকে এদিন কি কি সংঘটিত হবে সে বিষয়ে অবগতির জন্য এমনটি করতেন যেমনিভাবে তিনি সকল বড় বড় সমাবেশ যেমন ঈদের দিনগুলোতে এবং জুমু'আয় সূরা ক্বাফ, 'ইকতারাবাতিস্ সা'আহ' এবং সূরা গাশীয়া পাঠ করতেন।

www.waytojannah.com

Contents

রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে ওযূ করতেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশিরভাগই নতুন ওযূ করে নামাজ পড়তেন। অবশ্য কখনো কখনো এক ওযূতে একাধিক ওয়াক্তের নামাজ পড়েছেন।

একবার ওযূ করতে তাঁর এক 'মুদ্দ' (প্রায় এক কিলোগ্রাম) বা তার একটু বেশি পরিমাণ পানি ব্যয় হতো। ওযূ করার কালে তিনি ওযূর অঙ্গগুলোতে ভালোভাবে পানি ব্যবহার করতেন। তবে তিনি পানি অপচয় করতেন না, খুবই কম পানি ব্যবহার করতেন। উম্মাতকেও পানি অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন: "আমার উম্মাতের মধ্যে কিছু লোক ওযূ করতে গিয়ে পানি অপচয় করবে (অথচ এটা শয়তানের কুমন্ত্রণাপ্রসূত কাজ)।" তিনি আরো বলেন: "ওযূর সময় ওলহান নামের এক শয়তান এসে (অধিক পানি ব্যয় করার জন্যে) কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। তোমরা তার দ্বারা প্রতারিত হয়ো না।"

সা'আদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা) একবার ওযূ করছিলেন। এমন সময় রাসূল ﷺ তাঁর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন: সা'আদ! পানির অপচয় করো না।' সা'আদ জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! পানিতেও কি অপচয় হয়? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তুমি যদি কোনো প্রবহমান নদীর কূলে বসেও ওযূ করো, সেখানেও অপচয় আছে। তুমি সর্বাবস্থায় অপচয় থেকে দূরে থাকবে।' (মুসনাদে আহমাদ)

সহীহ সূত্রে প্রমাণ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযূর অঙ্গসমূহ কখনো একবার ধুয়েছেন, কখনো দু'বার, কখনো তিনবার। এমনও প্রমাণ পাওয়া যায়, একই ওযূতে তিনি কোনো অঙ্গ একবার, কোন অঙ্গ দু'বার এবং কোন অঙ্গ তিনবার ধুয়েছেন।

তিনি কখনো এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে কুলিও করেছেন এবং নাকেও দিয়েছেন। আবার কখনো দু'তিন আঁজলা দিয়ে এ দু'টো কাজ করেছেন। কখনো এক আঁজলা পানির অর্ধেক দিয়ে কুলি করতেন এবং বাকি অর্ধেক নাকে দিতেন। যখন দু'তিন আঁজলা ব্যবহার করতেন, তখন সম্ভবত এ দু'টো কাজ আলাদা আলাদা করতেন, কিংবা একত্রে করতেন। অবশ্য, বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনু যায়েদের বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়েই কুলি করেছেন, নাকেও দিয়েছেন এবং এমনটি তিনবার করেছেন। তবে অপর এক হাদিস থেকে জানা যায়, এ দুটো কাজ তিন আঁজলা পানি নিয়ে করেছেন।

কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে এ হাদিসটিই অধিকতর সহীহ। পৃথকভাবে আঁজলা নিয়ে কুলি করেছেন এবং নাকে পানি দিয়েছেন– এমন কোনো সহীহ হাদিস দেখা যায় না। এরূপ বর্ণনা সংবলিত একটি হাদিস পাওয়া যায় তালহার সূত্রে। তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, অথচ তাঁর দাদা সাহাবী ছিলেন না- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ডান হাতে দিয়ে পানি নিতেন। ডান হাতে পানি দিয়ে বাম হাতে নাকে পরিষ্কার করতেন।

তিনি পুরো মাথা মাসেহ করতেন। কপালের দিক থেকে শুরু করে পেছনের দিকে, এরপর পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে মাসেহ করতেন। এরকম করার কারণে অনেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি দু'বার মাসেহ করতেন। আসলে তিনি মাথা একবারই মাসেহ করতেন। একথাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত, এর ব্যতিক্রম কথা বিতদ্ধ নয়। ইবনুল ইয়ামানী তার পিতার সূত্রে উমার (রা) থেকে তিনবার মাসেহ করার যে

www.waytojannah.com

হাদিস বর্ণনা করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তারা বাপ-বেটা দু'জনই জয়ীফ বর্ণনাকারী, যদিও বাপের অবস্থা সামান্য ভালো।

আবু দাউদে উসমান (রা)-এর সূত্রে তিনবার মাসেহ করার যে বর্ণনা এসে, তা উসমান থেকে বর্ণিত অন্য সমস্ত সহীহ হাদিসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাঁর থেকে বর্ণিত বিভিন্ন সহীহ হাদিসে একবার মাসেহ করার কথাই উল্লেখ হয়েছে।

রাসূল ﷺ মাথা আংশিক মাসেহ করেছেন– এমন প্রমাণও কোনো সহীহ হাদিস থেকে পাওয়া যায় না। তবে ওযূর সময় যখন মাথায় পাগড়ি থাকত, তখন তিনি কপাল মুছে পাগড়ির উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে নিয়ে মাসেহ সেরে নিতেন।

আবু দাউদে আনাস (রা) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তাতে আনাস (রা) বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একবার কাতারে তৈরী পাগড়ি মাথায় থাকা অবস্থায় ওযূ করতে দেখেছি। তিনি পাগড়ির ভেতর হাত ঢুকিয়ে দেন এবং মাথার সম্মুখ ভাগ মাসেহ করেন। পাগড়িকে ভাঙ্গেননি আবার সঙ্কুচিতও করেননি।" অর্থাৎ তিনি পাগড়ি না ভেঙ্গে বা না খুলে পাগড়ির নিচ দিয়ে মাথা মুছে নিতেন। তবে এ হাদিস থেকে পাগড়ির উপর দিয়ে মাসেহ না করাটা প্রমাণ হয় না। এর প্রমাণ রয়েছে মুগীরা ইবনু শু'বা এবং অন্যান্য সাহাবীর বর্ণিত হাদিসে। আনাসের হাদিসে এ ব্যাপারে বক্তব্য না থাকাতে কিছু যায় আসে না।

রাসূল ﷺ কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ছাড়া কখন ওযূ করেছেন বলে প্রমাণ নেই। এরকম একটি উদাহরণও নেই।

তিনি সব সময় ওযূতে তরতীব (ধারাবাহিকতা) রক্ষা করতেন। একবারও তরতীবের খেলাফ করছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই।

মাথা মাসেহ করার ক্ষেত্রে তিনি কখনো সরাসরি পুরো মাথা মাসেহ করতেন। আবার কখনো পাগড়ির উপর মাসেহ্ করে নিতেন। কখনো কপাল এবং পাগড়ি মুছে নিতেন। আর একথা তো পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তিনি কেবল কপাল মুছে মাথা মাসেহর কাজ সম্পন্ন করেছেন- এমন কোনো প্রমাণ নেই।

মাথা মাসেহ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কানের ভেতর এবং বাইর দিয়ে মুছে নিতেন। এ কাজের জন্য নতুন করে পানি নিতেন না। -এর প্রমাণ হলো আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বর্ণিত হাদিস।

তিনি ঘাড় মুছেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই।

যখন চামড়া বা কাপড়ের মোজা পরা থাকত না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পা ধুয়ে নিতেন। তবে মোজা পরা থাকলে তিনি মোজার উপরই মাসেহ করে নিতেন।

তিনি بِسْمِ اللهِ-'বিস্‌মিল্লাহ' বলে ওযূ শুরু করতেন। 'বিস্‌মিল্লাহ' ব্যতীত অন্য কিছু বলে তিনি ওযূ শুরু করেছেন বলে যেসব হাদিসের কথা উল্লেখ করা হয়, তা সবই মিথ্যা-মনগড়া হাদিস। এমন কিছু তিনি নিজেও করেননি, উম্মতকেও শিখাননি। বিস্‌মিল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু বলার কোনো প্রমাণ নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযূ শেষ করে নিম্নরূপ দু'আ পড়তেন:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর দাস এবং রাসূল। হে আল্লাহ, আমাকে তওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো।

www.waytojannah.com

Contents

নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে, ওযূর পরে তিনি নিম্নরূপ দু'আও পড়তেন:

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

অর্থ: "সমস্ত ত্রুটি ও অক্ষমতা থেকে তুমি পবিত্র। তোমার প্রশংসা স্বীকার করে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তোমার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী আর তোমারই দিকে আমি প্রত্যাবর্তন করছি।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযূ করার শুরুতে "আমি নাপাকী দূর করার কিংবা নামাজ পড়ার নিয়্যত বা ইচ্ছা করছি"– এধরনের কোনো কথা বা নিয়্যত উচ্চারণ করতেন না। সহীহ কিংবা যয়ীফ কোনো হাদিসেই এমনটি করার কোনো প্রমাণ নেই। তাঁর সাহাবিরাও এমনটি করেননি। এ ব্যাপারে সহীহ যয়ীফ কোনো প্রমাণ নেই।

তিনি হাতের কনুই এবং পায়ের টাখনু গিরার উপরে ধুয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে আবু হুরাইরা (রা) এমনটি করতেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর ওযূ সম্পর্কে যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাতে কনুই ও টাখনুর গিরা ধোয়া ওযূর অঙ্গের মধ্যে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযূ করার পর ধৌত করা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মুছতেন না। কোন সহীহ হাদিসে এমনটি করার প্রমাণ নেই। আয়িশা (রা) এবং মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসে বস্ত্রখণ্ড ও বস্ত্রাংশ দিয়ে তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মোছার যে কথা আছে, তা সহীহ নয়। কারণ প্রথম হাদিসটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে সুলাইমান বিন আকরাম গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নয়, অপরদিকে দ্বিতীয় হাদিসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে আল-আফ্রিকী যয়ীফ রাবী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, ওযূর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাপড় দিয়ে মোছার ব্যাপারে রাসূল ﷺ থেকে কোনো বিশুদ্ধ হাদিস পাওয়া যায় না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো নিজেই পানি নিয়ে ওযূ করতেন, আবার কখনো প্রয়োজন দেখা দিলে কোন ব্যক্তি পানি ঢেলে দিতেন এবং তিনি ওযূ করতেন। বুখারী ও মুসলিমে মুগীরা ইবনু শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক সফরে তিনি রাসূল ﷺ-কে পানি ঢেলে দিয়ে ওযূ করিয়েছেন। তবে এটা কোন নিয়মিত ব্যাপার ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযূ করার পরে দাড়ি খিলাল করেছেন। অবশ্য, সব সময় নয়, মাঝে মধ্যে করেছেন। তবে এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম তিরমিযী প্রমুখের মতে দাড়ি খিলাল করার বিষয়টি সহীহ। কিন্তু ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল এবং আবুয্ যুরআর মতে কোনো সহীহ হাদিস থেকে দাড়ি খিলাল করার প্রমাণ মিলে না।

তিনি ওযূতে আঙ্গুলও খিলাল করেছেন, তবে নিয়মিত নয়। সুনান গ্রন্থাবলীতে মুস্তাওরাদ বিন শাদ্দাদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিস থেকে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে রাসূল ﷺ-এর ওযূ সম্পর্কে যাঁরা বিশেষজ্ঞ ছিলেন যেমন উসমান, আলী, আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ এবং রুবাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ, তাঁদের থেকে এ বিষয়ে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। কাজেই এ বিষয়টিও দাড়ি খিলাল করার মতই সুপ্রমাণিত নয়।

ওযূর সময় রাসূল ﷺ আংটি এদিক সেদিক ঘুরিয়ে নিতেন বলে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এ বর্ণনাটি জয়ীফ (দুর্বল)। ইমাম দারাকুতনী হাদিসটির সনদের (বর্ণনাসূত্রের) মুয়াম্মার ও তার বাবাকে জয়ীফ রাবী আখ্যায়িত করেছেন।

www.waytojannah.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ মোজার উপর মাসেহ করতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবাসে এবং প্রবাসে সবসময় মোজার উপর মাসেহ করতেন। একথা সহীহ হাদিস থেকে প্রমাণিত। আর এই নীতি তিনি মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত রাখেন।

তবে বিভিন্ন সহীহ ও হাসান হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, আবাসী (মুকীম) লোকদের ক্ষেত্রে একদিন একরাত, আর প্রবাসী (মুসাফির) লোকদের ক্ষেত্রে তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মাসেহ করার সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। (অর্থাৎ একবার ওযূ করে মোজা পরার পর মুকীম একদিন একরাত এবং মুসাফির তিন দিন তিনরাত পর্যন্ত মাসেহ করতে পারবে। এরপর পুনরায় পা ধুয়ে ওযূ করে নিতে হবে)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মোজার উপরিভাগ মাসেহ করতেন। পায়ের (পাতার) নিচের ভাগ মাসেহ করেছেন বলে সহীহ সূত্রে কোনো প্রমাণ নেই। অবশ্য একটি মাক্তু (সূত্রবিচ্ছিন্ন) হাদিসে মোজার নিচের ভাগ মোছার কথা দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু এ বক্তব্য যাবতীয় সহীহ হাদিসের বিপরীত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জুতা এবং মোজা দু'টোর উপরই মাসেহ করেছেন, যেমন কপালসহ পাগড়ি মাসেহ করেছেন। তাঁর বেশকিছু কর্মগত বা 'ফে'লী' ও বক্তব্যগত তথা 'কওলী' হাদিস থেকে জুতা ও মোজা উভয়টার উপরই মাসেহ্ করার প্রমাণ আছে যায়। কারো কারো মতে তিনি বিশেষ বিশেষ অবস্থায়ই শুধু এমনটি করেছেন। সম্ভবত চামড়ার জুতা খোলার অসুবিধার দরুণই তিনি জুতাসহ মাসেহ করতেন। তবে প্রকৃত বিষয় আল্লাহই ভালো জানেন।

প্রকৃতবিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো বিষয়কেই অহেতুক কষ্টকর করে তুলতেন না। সহজ পন্থা অবলম্বন করাটাই ছিলো তাঁর নীতি। মোজা পায়ে না থাকলে তিনি পা ধুয়ে নিতেন, আর মোজা পায়ে থাকলে মোজার উপর মাসেহ করে নিতেন, মোজা খোলা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। আবার মোজার উপরই মাসেহ করতে হবে– সেজন্য অহেতুক মোজা পরে নিয়ে মাসেহ করতেন না। বরং পা খোলা থাকলে ধুয়ে নিতেন এবং মোজা পরা থাকলে মাসেহ করে নিতেন– এটাই ছিলো তাঁর নীতি। আমাদের উস্তাদ (ইমাম ইবনু তাইমিয়া)-এর মতে পা ধোয়া এবং মোজার উপর মাসেহ করা এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা উত্তম, সে প্রশ্নের সঠিক জবাব এটিই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাইয়াম্মুম করার তরীকা

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাইয়াম্মুম করতেন, এভাবে করতেন: দুই হাতের তালু কেবলমাত্র একবার মাটিতে মেরে তা দিয়ে দুই হাত এবং মুখমণ্ডল মাসেহ করে নিতেন। এক্ষেত্রে তিনি দু'বার হাত মারতেন বলে সহীহ হাদিসে কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া তিনি হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতেন বলেও কোনো প্রমাণ নেই। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল বলেছেন, যারা এর বিপরীত বলেন, সেটা তাদের নিজস্ব মত, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সে মাটি দিয়ে তাইয়াম্মুম করতেন, ঐ মাটিতে নামাজ পড়া জায়েয। তাইয়াম্মুম করার জন্য তিনি শক্ত মাটি, বালু এবং লোনা মাটিতে হাত মারতেন। তিনি বলেছেন: "আমার উম্মতের কোনো ব্যক্তি যেখানেই নামাজ পড়বে, সেখানেই তার জন্য মাসজিদ এবং পবিত্রতা অর্জনের ব্যবস্থা রয়েছে।"

–এ হাদিস থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, কেউ যদি বালুময় স্থানে নামাজ পড়ে তবে তার তাইয়াম্মুমের জন্য বালুই যথেষ্ট।

www.waytojannah.com

Contents

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তবুকের যুদ্ধে গেলেন, সেখানে পানির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে বালু দিয়েই তাইয়াম্মুম করেছিলেন। তবুকে যাবার কালে তিনি মাটির চাকা বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিংবা তাঁর সাহাবীগণের কাউকে নিতে বলেছিলেন– এমন কোনো প্রমাণ নেই। আসলে বালুকণার অধিকাংশই তো মাটি। হিজাজের ভূমির অবস্থাও এমনই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তাইয়াম্মুমে হাত মোছার কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি জানা যায় না। একটি পদ্ধতির কথা বলা হয়ে থাকে যে, বাম হাতের তালু ডান হাতের পিঠের মাথা থেকে শুরু করে কনুই পর্যন্ত নিয়ে আবার ঘুরিয়ে হাতের নিচের অংশ মুছে নিতে হবে এবং একইভাবে বাম হাতও মুছতে হবে। –এ পদ্ধতির পক্ষে রাসূল ﷺ থেকে কোনো প্রমাণ নেই, সাহাবাগণ থেকেও এ বিষয়টি প্রমাণিত নয়। তিনি এমনটি করার নির্দেশও দেননি এবং পছন্দ করেছেন বলেও প্রমাণ নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাইয়াম্মুমকে ওযূর মর্যাদা প্রদান করেছেন। তিনি প্রত্যেক নামাজের জন্য আলাদা আলাদা তাইয়াম্মুম করেছেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনটি করার নির্দেশও তিনি দেননি। এটাই সঠিক কথা, যদি এর বিপরীত কোনো দলিল পাওয়া না যায়।

তাকবীরে তাহরীমাহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়েই 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। (এটাকে 'তাকবীরে তাহরীমা' বলা হয়)। তিনি এই তকবীর উচ্চারণের আগে অন্য কোনো কিছুই পড়তেন না, বলতেনও না, এমনকি নিয়্যতও উচ্চারণ করতেন না। [নিয়্যত তো হলো মূলতঃ মনস্থির করা বা এরাদা করা বা ইচ্ছা করার নাম।] এ ধরনের কিছুও তিনি বলতেন না যে, কিবলামুখী হয়ে অমুক ওয়াক্তের এত রাকাত ফরয নামাজ ইমাম হিসেবে বা এই ইমামের পেছনে মুক্তাদি হিসেবে পড়ছি, কিংবা আদায় পড়ছি, বা কাযা পড়ছি। এ ধরনের কথা তিনি ফরয নামাজের ক্ষেত্রেও বলতেন না, (সুন্নত এবং) নফল নামাজেও বলতেন না।

তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে এসব কিছু বলা বিদ'আত। কারণ এগুলোর পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো হাদিস নেই। এমনকি সাহাবায়ে কিরামের কোনো বক্তব্যও উল্লেখ নেই। তাবেয়ীগণের কোনো কথাও নেই। এমনকি চার ইমামের কেউই এ সম্পর্কে কিছু বলেননি। কেউই এমন কিছু বলা পছন্দ করেননি।

অবশ্য পরবর্তী কালের কিছু আলিম ইমাম শাফেয়ীর একটি কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। ইমাম শাফেয়ীর সে কথাটি হলোঃ "নামাজের অবস্থা রোযার মতো নয়, উল্লেখ না করে কেউ নামাজে প্রবেশ করতে পারে না।"

কতেক আলিমরা তাঁর 'উল্লেখ' অর্থ বুঝেছেন, নামাজের নিয়্যত উল্লেখ বা উচ্চারণ করা। অথচ, প্রকৃতপক্ষে ইমাম শাফেয়ী নিজে একথা দ্বারা বুঝিয়েছেন নামাজের উদ্দেশ্যে 'তাকবীরে তাহরীমা' উচ্চারণ করা।

ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য সম্পর্কে উল্লিখিত আলিমদের ধারণা ভুল। কারণ, স্বয়ং রাসূল ﷺ, তাঁর সাহাবায়ে কিরাম এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণ যে কাজটির উল্লেখ পর্যন্ত করেননি, ইমাম শাফেয়ী সেটাকে আবশ্যকীয় বলতে পারেন কী করে? আমরা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরাম থেকে যদি একটি শব্দও পাই, তবে অবশ্যই তা মেনে নিব। কারণ রাসূলুল্লাহর সুন্নত আর সাহাবায়ে কিরামের পন্থা অনুসরণই আমাদের কর্মনীতি। তাঁদের দেখানো সর্বোত্তম পথই আমাদের পথ। আমরা বিনীতভাবে কেবল তাঁদের থেকে প্রমাণিত কর্মনীতিই অনুসরণ করব।

www.waytojannah.com

Contents

তাকবীরে তাহরীমার বলার সময় 'রফে ইয়াদাইন' করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ শুরু করার জন্যে 'আল্লাহু আকবার' ব্যতীত আর কিছুই বলতেন না এবং আল্লাহু আকবার উচ্চারণের সময় 'রফে ইয়াদাইন' করতেন (দু'হাত উঠাতেন)। এজন্য তিনি হস্তদ্বয়কে কিবলামুখী করে কাঁধ কিংবা কান পর্যন্ত উঠাতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে থাকত। তিনি হাত কতটুকু উঠাতেন সে ব্যাপারে কয়েক রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। আবু হুমাইদ আস্ সা'য়েদী (রা) ও তাঁর সাথিরা কাঁধ বরাবর উঠানোর কথা বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা)-এর বক্তব্যও তা-ই। ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রা) বর্ণনা করেছেন: কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন। বারা ইবনু আযেব (রা) বলেছেন, হাত কানের কাছাকাছি নিতেন। কেউ কেউ বলেছেন, শেষোক্ত মতটিই উত্তম, তবে উপরে বর্ণিত যে কোনো পরিমাণ উঠাবার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কারো কারো মতে, কানের লতির উপর উঠাবার সুযোগ নেই। তবে কাঁধ পর্যন্ত উঠালেও চলবে। এ বিষয়ের এটাই মীমাংসামূলক বক্তব্য।

তকবীর (আল্লাহু আকবার) বলার সময় তিনি আরো যেসব স্থানে 'রফে ইয়াদাইন' করতেন, সেগুলো যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

তাকবীরে তাহরীমার পর কী পড়তেন

তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণের সময় হাত উঠাবার পর হাত নামিয়ে ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর স্থাপন করতেন। তারপর নামাজ (সূরা ফাতিহা) শুরু করার পূর্বে বিভিন্ন রকম দু'আ করতেন। কখনো এই দু'আ করতেন:

اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ.

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমার সমস্ত ভুলত্রুটি আমার থেকে দূরে সরিয়ে দাও, যেমন তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছ পূর্ব আর পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ, তুমি পানি, বরফ আর শীতল জিনিস দ্বারা আমাকে আমার ভুলত্রুটি থেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও। ওগো আল্লাহ, আমাকে আমার গুনাহ খাতা থেকে ঠিক সেরকম ঝকঝকে তকতকে পরিচ্ছন্ন করে দাও যেমন ময়লা ও দাগ থেকে সাদা কাপড় ধবধবে সাদা হয়ে উঠে।"

কখনো এই দু'আটি পড়তেন:

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ: "আমি একনিষ্ঠভাবে মহাবিশ্ব ও এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার দিকে আমার মুখ ফিরালাম। তাঁর সঙ্গে যারা শিরক করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার কুরবানী আমার জীবন ও আমার মৃত্যু মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক। কেউই তাঁর অংশীদার নয়। এ কথাগুলো মেনে নেয়ার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে এবং আমিই সবার আগে মেনে নিয়েছি।"

কখনো এই দু'আ করতেন:

www.waytojannah.com

Contents

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْ لِىْ ذُنُوبِىْ جَمِيْعًا لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِىْ لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِىْ لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّى سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, তুমিই বাদশাহ, তুমি ছাড়া কোন প্রতিপালক নেই। আমি তোমার দাস। আমি নিজের উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয় তুমি ছাড়া আর কেউ অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে না। আমাকে চালিত করো উত্তম চরিত্রের পথে তুমি ব্যতীত অপর কেউ চালিত করতে পারে না, উত্তম চরিত্রের পথে এবং দূরে রাখো আমার থেকে মন্দ আচরণকে, তুমি ব্যতীত আমা থেকে তা অন্য কেউ দূরে রাখতে পারে না। হে আল্লাহ, উপস্থিত আছি আমি। সকল কল্যাণ তোমারই হাতে, আর অকল্যাণ তোমার প্রতি বর্তায় না। আমি তোমার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। তুমি বরকতময়, তুমি সুমহান। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরছি।" (সহীহ। মুসলিম, তিরমিযী)

সাধারণত রাত্রের নামাজে (তাহাজ্জুদে) রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আ করতেন। আবার কখনো এসময় তিনি এই দু'আও পড়তেন:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اهْدِنِىْ لِمَا اخْتَلَفْتُ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমিই জিবরিল ও ইসরাফীলের প্রভু, আসমান জমিনের স্রষ্টা এবং দৃশ্য অদৃশ্যের জ্ঞানী। তোমার বান্দাদের মধ্যকার বিরোধের তুমিই মীমাংসা করে থাক। তোমার নির্দেশে আমি মহাসত্য নিয়ে যে বিরোধের সম্মুখীন হয়েছি, সে ব্যাপারে তুমি আমাকে সঠিক পথের নির্দেশনা দান করো। তুমি তো যাকে ইচ্ছে কর সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়ে থাক।"

কখনো আবার নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তেন:

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ.

অর্থ: হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসার মালিক তুমি। মহাবিশ্ব, এই পৃথিবী আর এগুলোর মাঝে যা কিছু আছে, সেগুলোর তুমিই আলোকবর্তিকা।"

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহরীমাহ উচ্চারণ করার পর উপর্যুক্ত দু'আটি পড়তেন।

আবার কখনো তিনি তিনবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا তিনবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا তিনবার سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلاً এবং সেই সাথে اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ বলতেন।

কখনো اَللّٰهُ اَكْبَرُ দশবার, سُبْحَانَ اللهِ দশবার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ দশবার, اَللّٰهُ إِلاَّ لاَ إِلَهَ দশবার, اَسْتَغْفِرُاللهَ দশবার এবং اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ দশবার বলতেন। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ দশবার, অতঃপর

www.waytojannah.com

Contents

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করার পর এ দু'আগুলোর কোন না কোনটি পড়তেন বলে সহীহ সূত্রে প্রমাণ পাওয়া রয়েছে।

বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নিম্নোক্ত সানা পড়ে নামাজ শুরু করতেন:

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার প্রশংসার সঙ্গে তোমার নাম বরকতময়, উচ্চ তোমার মহিমা এবং তুমি ব্যতীত কোন প্রভু নেই।" (সহীহ। ইবনু মাজাহ)

অর্থ: হে আল্লাহ, সমস্ত দোষত্রুটি, অক্ষমতা ও দুর্বলতা থেকে তুমি পবিত্র। আমি তোমারই প্রশংসা করি। বরকতময় তোমার নাম। সর্বোচ্চ তোমার মর্যাদা। আর তুমি ছাড়া নেই কোনো প্রভু।"

–এ সানাটির (আল্লাহর প্রশংসামূলক বাক্যের) কথা বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন সুনান গ্রন্থে আলী ইবনু আলী রিফায়ী থেকে। তিনি আবীল মুতাওয়াক্কিল এবং তিনি আবি সাঈদ (রা) থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আয়িশা (রা) থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। উমার (রা) ইমামতি করার সময় এটি শব্দ করে উচ্চারণ করতেন এবং সবাইকে শিক্ষা দিতেন।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন, আমি উমার (রা)-কে অনুসরণ করে এ দু'আটি পড়া পছন্দ করি। তবে উপরে বর্ণিত যে কোন একটি দু'আ পড়ে যদি কেউ নামাজ শুরু করে, তবে তা সহীহ।

ইমাম আহমাদ যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন, এ দু'আটি শ্রেষ্ঠ, পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম। উমার (রা) ইমামতির সময় যে এটি সবাইকে শুনিয়ে পড়েছেন, তার অর্থ হলো, সবাই যেন নামাজের শুরুতে এটি পড়ে। বিশেষ করে সবাই যেন ফরয নামাজে এটি পড়ে।

সূরা ফাতিহা পড়া

উপরে বর্ণিত সানা ও দু'আ পড়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পড়তেন। এরপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমসহ সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।

সূরা ফাতিহা তিনি কখনো শব্দ করে পড়তেন, আবার কখনো নিঃশব্দে পড়তেন। অবশ্য বেশির ভাগ সময় শব্দ করে পড়তেন। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজেই তিনি শব্দ করে পড়তেন না। আবাসেও নয়, প্রবাসেও নয়। যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজেই তিনি শব্দ করে পড়ে থাকতেন, তা হলে খুলাফায়ে রাশেদীন, অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম এবং বিশেষ করে মদীনাবাসীর নিকট তা কী করে অজ্ঞাত থাকত? তাই একথা নিশ্চিত যে, তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজেই সূরা ফাতিহা শব্দ করে পড়তেন না।

তিনি যখন সূরা ফাতিহা শব্দ করে পড়তেন, তখন শুরুতে বিসমিল্লাহও উচ্চ স্বরে পড়তেন।

আমীন উচ্চারণ

সূরা ফাতিহা শেষ করে তিনি 'আমীন' বলতেন। সূরা ফাতিহা শব্দ করে পড়লে 'আমীন'ও সশব্দে উচ্চারণ করতেন এবং তাঁর সঙ্গে মুক্তাদিরাও সশব্দে 'আমীন' বলতেন।

www.waytojannah.com

Contents

কিছুক্ষণ নীরব থাকা

তিনি নামাজে কিছুক্ষণের জন্য দু'বার নীরব থাকতেন। একবার তাকবীরে তাহরীমা এবং কিরাত (সূরা ফাতিহা) পাঠের মধ্যবর্তী সময়। এই নীরব থাকাটি সম্পর্কে আবু হুরাইরা (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিত হয়েছেন।

দ্বিতীয়বার কখন নীরব থাকতেন সে ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন সূরা ফাতিহা পাঠের পর, আবার কেউ বলেছেন কুরআন পাঠ শেষ করে রুকূতে যাবার আগে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, প্রথমটি ছাড়াই তিনি দু'বার নীরব থাকতেন। এ মতটি মেনে নিলে তিনবার নীরব থাকা হয়ে যায়। অথচ এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, তিনি মাত্র দু'বার নীরব থেকেছেন।

তৃতীয় যে নীরব থাকাটির কথা বলা হয় অর্থাৎ রুকূতে যাবার পূর্বে, সেটা মূলত তাঁর নীরব থাকা ছিল না। সেটা ছিলো নিঃশ্বাস ফেলে মনের প্রশান্তি অর্জনের লক্ষ্যে সামান্য বিশ্রাম নেয়া। কারণ তিনি কিরাত এবং রুকূকে একই নিঃশ্বাসে মিলিয়ে ফেলতেন না।

তাকবীরে তাহরীমা এবং সূরা ফাতিহা শুরু করার মধ্যবর্তী সময়ের নীরব থাকাটা যুক্তিসঙ্গত ছিল। কারণ, তা ছিল সূরা ফাতিহা আরম্ভ করার প্রস্তুতিমূলক নীরব থাকা।

দ্বিতীয় যে নীরব থাকাটা অর্থাৎ, সূরা ফাতিহা শেষ করার পর, সে ব্যাপারে বলা হয়েছে, তা ছিল মুক্তাদিদের সূরা ফাতিহা শেষ করার অবকাশ দেয়ার উদ্দেশ্যে।

আর তৃতীয় নীরব থাকাটা অর্থাৎ, কিরাত শেষ করার পর এবং রুকূতে যাবার আগে, সেটা ছিল দম নিয়ে সস্থির জন্যে ক্ষণকালের সামান্য বিরতি মাত্র।

যারা তৃতীয়টির কথা উল্লেখ করেননি, তা এ কারণে যে, ঐ নীরব থাকাটি খুবই সামান্য সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আর যারা সংক্ষিপ্ত হলেও সেটিকে গণ্য করেছেন, তাদের দৃষ্টিতে রাসূল ﷺ তিনবার নীরব থেকেছেন। সুতরাং দুটি বর্ণনার মধ্যে মূলত কোনো বিরোধ নেই। এ সংক্রান্ত হাদিসের এটাই মীমাংসা।

দু'টি নীরব থাকা সংক্রান্ত হাদিস সামুরা বিন জুনদুব (রা), উব্বাই ইবনু কা'ব (রা) এবং ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আবূ হাতীম তাঁর সহীহ হাদিস সংকলনে এসব হাদিস উল্লেখ করেছেন।

যাঁরা দু'বার নীরব থাকার হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের একজন সামুরা বিন জুনদুব। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজ থেকে আমি তাঁর দু'বার নীরব থাকার বিষয়টি স্মরণ রেখেছি। তিনি একবার নীরব থাকতেন তাকবীরে তাহরীমার পর, আর দ্বিতীয়বার 'গইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দল্লীন'-পড়ার পর।

কোন কোন সূত্রের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'রাসূল ﷺ কিরাতের পর কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন।' কিন্তু এটা একেবারে এজমালী কথা। প্রথমোক্ত হাদিসের অর্থাৎ, সামুরার হাদিসের বক্তব্য সুস্পষ্ট। সেখানে পরিষ্কারভাবে সূরা ফাতিহা পাঠের পর নীরব থাকার কথা বলা হয়েছে।.... কাজেই সামুরা বিন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসই এক্ষেত্রে দলিল।

www.waytojannah.com

Contents

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিরাত পড়ার পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিরাত (নামাজে কুরআন পাঠ) ছিল টানা টানা। প্রতিটি আয়াত তিলাওয়াত করার পর তিনি থামতেন। আয়াত শেষ করার সময় একটু টানা আওয়াযে শেষ করতেন।

সূরা ফাতিহা শেষ করার পর তিনি অন্য সূরায় যেতেন। অন্য সূরায় গিয়ে কিরাত কখনো দীর্ঘ করতেন, আবার কখনো সফর অথবা অন্য কোনো কারণে সংক্ষিপ্ত করতেন। অবশ্য তাঁর কিরাত সাধারণত সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ না হয়ে মধ্যম রকম হতো।

বিভিন্ন নামাজে তাঁর কিরাত

ফজর নামাজে সাধারণত ষাট থেকে এক শ' আয়াত পড়তেন। ফজর নামাজে প্রায়ই তিনি সূরা ক্বাফ, সূরা আর রূম, সূরা তাকবীর, কখনো উভয় রাকাতে সূরা যিলযাল এবং কখনো ফালাক ও নাস পড়তেন। তবে সফরের সময়ই ফালাক ও নাস দিয়ে পড়তেন। কখনো সূরা মু'মিনূন দিয়ে উভয় রাকাত পড়তেন। এই সূরার যেখানে মূসা ও হারূনের কথা উল্লেখ হয়েছে সেখান পর্যন্ত পয়লা রাকাতে আর অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় রাকাতে পড়তেন। জুমু'আর দিন ফজরে সূরা আস-সাজদা এবং সূরা আদ দাহার পুরো পড়তেন। এই সূরার এক অংশ ঐ সূরার একাংশ এমনটি পাঠ করতেন না। আবার সূরা আস-সাজদাকে ভেঙ্গে উভয় রাকাতে পড়তেন না, পুরোটা এক রাকাতে পড়তেন। এমনটি তাঁর নিয়মের খেলাফ। যারা জুমু'আর দিন ফজর নামাজ কেবল সূরা আস-সাজদা দিয়ে পড়াকে উত্তম মনে করে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত সম্পর্কে অজ্ঞ। লোকদের এই অজ্ঞতাপূর্ণ ধারণার ফলে কোনো কোনো ইমাম জুমু'আর দিন ফজরে সূরা আস-সাজদা পড়া অপছন্দ করতেন।

মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ উপর্যুক্ত দুটো সূরা দিয়েই জুমু'আর দিন ফজর নামাজ পড়াতেন। কারণ এদুটো সূরাতে মানব সৃষ্টির সূচনা, মানুষের শেষ পরিণতি, আদমের সৃষ্টি, জান্নাত ও জাহান্নামে যাবার কারণ উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ মানবজীবনে যা ঘটেছিল এবং যা সংঘটিত হবে, এগুলোতে তা-ই বর্ণিত হয়েছে বলে জুমু'আর দিন সকালে তিনি সবাইকে এ সূরাগুলো শুনাতেন। এই একই কারণে তিনি জুমু'আ এবং ঈদের নামাজে সূরা ক্বাফ, সূরা আল ক্বামার, সূরা আল-আ'লা এবং সূরা আল গাশিয়া তিলাওয়াত করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর নামাজেও প্রায়ই কিরাত দীর্ঘ করতেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেন: যুহর-এর ইকামত হবার পর কোনো ব্যক্তি যদি তার প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেবার জন্য জান্নাতুল বাকিতে যেত এবং সেখান থেকে কাজ সম্পন্ন করে নিজের বাসা থেকে ওযূ করে ফিরে আসত, তবে নাবী ﷺ-কে প্রথম রাকাতেই ধরতে পারত। যুহর নামাজে তিনি কখনো কখনো এ ধরনেরই লম্বা কিরাত পড়তেন। যুহরে কখনো তিনি সূরা আস-সাজদার সমপরিমাণ কিরাত পড়তেন। কখনো পড়তেন সূরা আল আ'লা এবং লাইল, কখনো বা সূরা বুরূজ এবং আত্ তারিক।

আসর নামাজে তিনি যুহরের অর্ধেক পরিমাণ কিরাত পড়তেন। কখনো এর চেয়ে একটু দীর্ঘ, আবার কখনো একটু সংক্ষিপ্ত।

www.waytojannah.com

Contents

মাগরিবের কিরাত-এর ক্ষেত্রে তাঁর নিয়ম ছিল বর্তমান কালের লোকেরা যা করছে, তার চেয়ে ভিন্নতর। তিনি কখনো সূরা আ'রাফ, কখনো সূরা আত তূর এবং কখনো সূরা আল-মুরসালাত দিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়তেন। আবার একটি সূরাকে দু' রাকাতে ভাগ করেও পড়তেন।

আবু আমার ইবনু আবদুল বার এক্ষেত্রে নাবী করীম ﷺ-এর আমল সম্পর্কে বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি মাগরিবের নামাজ কখনো সূরা আরাফ, কখনো সূরা আস্-সাফ্ফাত, কখনো সূরা দুখান, কখনো সূরা আল আ'লা, কখনো সূরা তীন, কখনো মুয়াব্বিযাতাইন (নাস ও ফালাক) এবং কখনো সূরা আল মুরসালাত দিয়ে পড়েছেন। এছাড়া তিনি মাগরিবের নামাজ ছোট ছোট সূরা দিয়েও পড়তেন। এসবগুলো বর্ণনাই সহীহ সূত্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। তবে সবসময় ছোট সূরা দিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়াটা ছিল মারওয়ান[১] ইবনু হাকামের কাজ। এ কারণে যায়িদ বিন সাবিত তার সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন, তোমার কি হল শুধু ছোট ছোট সূরা দিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়ছ! অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দুটি দীর্ঘ সূরার একটি অর্থাৎ সূরা আ'রাফ পড়তে দেখেছি।' এটি সহীহ হাদিস। সুনান সংকলকগণ এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের নামাজে সূরা আ'রাফ পড়েছেন। সূরাটিকে দু'ভাগ করে দু' রাকাতে পড়েছেন।' তাই সব সময় কেবল ছোট ছোট আয়াত এবং ছোট ছোট সূরা দিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়াটা সুন্নতের খেলাফ। এটা হলো মারওয়ান ইবনু হাকামের কাজ।

পাঁচ ওয়াক্তের শেষ ওয়াক্ত হলো ইশার নামাজ। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি ইশার নামাজে সূরা 'আত-তীন' পড়েছেন। আরেকটি বর্ণনা অনুযায়ী তিনি মু'আয বিন জাবালকে ইশার নামাজে সূরা 'আশ শাম্স', সূরা 'আল-আ'লা' এবং সূরা 'আল-লাইল' জাতীয় সূরা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি মু'আযকে অধিক রাতে আমর বিন আউফ গোত্রে গিয়ে ইশার নামাজ পড়াবার সময় সূরা বাকারা দিয়ে ইমামতি করতে নিষেধ করেছেন।

ঘটনাটা হলো, মু'আয (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ইশার নামাজ পড়তেন। তারপর আমর বিন আউফ গোত্রে গিয়ে সেখানকার অপেক্ষমাণ লোকদের ইশার নামাজ পড়াতেন। তিনি নবীর মসজিদ থেকে ইশা পড়ে ঐ গোত্রে যেতে যেতে অনেক রাত হয়ে যেত। তিনি নবীর পেছনে মুক্তাদি হিসেবে নামাজ পড়ে গিয়ে পুনরায় ইমাম হিসেবে এই লোকদের ইশার নামাজ পড়াতেন। কিন্তু এত অধিক রাতেও তিনি সূরা বাকারা দিয়ে নামাজ পড়াতেন। এতে দিনের শ্রমজীবি লোকদের খুব কষ্ট হতো। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোচরীভূত হলে তিনি মুয়ায (রা)-কে উপর্যুক্ত নির্দেশ দেন এবং বেশি রাতে লম্বা কিরাত পড়ে মানুষকে সমস্যায় ফেলতে নিষেধ করেন।

জুমার নামাজে তিনি সূরা আল জুমা এবং আল মুনাফিকুন পড়তেন। আবার কখনো সূরা আল-আ'লা এবং আল গাশিয়াও পড়তেন। কিন্তু প্রথমোক্ত সূরা দু'টির কেবল শেষাংশ[২] দিয়ে তিনি কখনো নামাজ পড়াতেন না। এটা তাঁর নিয়মেরও বিপরীত বিষয় ছিল।

---

১ মারওয়ান ইবনু হাকাম চতুর্থ উমাইয়া খলিফা অর্থাৎ মুয়াবিয়া (রা) ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মুয়াবিয়া ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মারওয়ান ইবনু হাকাম। তার রাজত্বকাল ছিল ৬৪-৬৫ হিজরি। এই মারওয়ানের কারণেই উসমানের শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হয়।

2 সূরা জুমু'আ এবং সূরা মুনাফিকুন এই দুটি সূরারই শেষাংশ 'ইয়া আইউহাল্লাযীনা আ-মানু' দিয়ে শুরু।

www.waytojannah.com

Contents

ঈদের নামাজে তিনি সূরা ক্বাফ এবং সূরা ক্বামার পুরো পড়তেন। কখনো বা সূরা আল আ'লা এবং সূরা আল গাশিয়া পড়তেন। উভয় ঈদেই তিনি এমনটি করতেন।

মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কোন্ নামাজে কী ধরনের কিরাত পড়েছেন, এই হলো তার সঠিক নির্দেশিকা। খুলাফায়ে রাশেদীন তাঁর এই নির্দেশিকার অনুসারী ছিলেন।

আবু বকর (রা) ফজর নামাজে সূরা বাকারা শেষ করতেন। ফলে সালাম ফেরাতে সূর্যোদয়ের কাছাকাছি সময় হয়ে যেত। একদিন লোকেরা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললঃ হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, সূর্যোদয়ের তো সময় হয়ে গেছে? তিনি জবাব দেনঃ সূর্যোদয়ের ব্যাপারে তোমরা আমাকে অসতর্ক মনে করবে না। উমার (রা) ফজর নামাজে সূরা ইউসুফ, সূরা আন নহল, সূরা হুদ, সূরা বনি ইসরাঈল এবং অনুরূপ অন্যান্য সূরা পড়তেন।

ফজর নামাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে লম্বা কিরাত পড়তেন তা যদি রহিতই হতো, তবে সেটা খুলাফায়ে রাশেদীন এবং লম্বা কিরাতের সমালোচনাকারীদের নিকট গোপন থাকত না। সহীহ মুসলিমে জাবির বিন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর নামাজে সূরা ক্বাফ পড়তেন এবং এরপর তাঁর নামাজ সংক্ষেপ হতো।' এখানে 'এরপর' মানে ফজরের পরে। অর্থাৎ তাঁর ফজরের কিরাত লম্বা হতো এবং ফজরের পরের নামাজগুলোতে কিরাত সংক্ষেপ হতো। একথার প্রমাণ আব্বাস-এর স্ত্রী উম্মুল ফযলের বক্তব্য। তিনি (তাঁর স্বামীর পুত্র) আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে আরাফাতে সূরা 'আল মুরসালাত' পড়তে শুনে জিজ্ঞাসা করলেনঃ বাবা, তুমি না আমাকে বলেছিলে, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জীবনের শেষ মাগরিব নামাজে এ সূরাটি পড়তে শুনেছিলে?'

আর জাবির ও সামুরার হাদিসে 'এরপর' শব্দটিতে 'এর' সর্বনাম রয়েছে। 'এর' সর্বনামটির অন্তরালে এখানে নির্দেশিত নামটি উহ্য তথা গোপন রয়েছে।

একথা সকলেরই জানা, সর্বনাম সবসময় পূর্বোল্লেখিত নামের পরিবর্তেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই এখানে 'এরপর' বলতে ফজরের পরে বুঝতে হবে, এছাড়া অন্য কিছু বুঝার অবকাশ নেই।

সুতরাং উক্ত হাদিসে 'এরপর' অর্থ হবে, রাসূল ﷺ ফজরের পরের নামাজগুলোর কিরাত সংক্ষেপে করতেন। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সেদিনের পর থেকে সব নামাজের কিরাত সংক্ষেপ করেছেন। এই অর্থ হয়ে থাকলে সেটা খুলাফায়ে রাশেদীনের নিকট গোপন থাকত না। তাঁরা রাসূল ﷺ-এর 'রহিতকারী' আমলের কথা জেনেও 'রহিত' আমলের অনুসরণ করে সন্তুষ্টি থাকতেন না।

কিরাত সংক্ষেপ করা সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্যঃ তোমাদের কেউ ইমামতি করলে সে যেন কিরাত সংক্ষেপ করে।' আর আনাসের বর্ণনাঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ সব নামাজের ক্ষেত্রেই কিরাত সংক্ষেপ করার নীতি অবলম্বন করতেন।' এ দুটো বক্তব্যেরই মানদণ্ড হবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল। অর্থাৎ এ দুটো হাদিসে যে সংক্ষেপনের কথা বলা হয়েছে, তার বাস্তব রূপ ছিল কিরাত পড়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাস্তব আমল- যা এতক্ষণ আমরা উল্লেখ করে এসেছি।

এ দুটো বক্তব্য থেকে রাসূল ﷺ-এর বাস্তব আমল-এর বিপরীত কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণ করার অবকাশ নেই। কারণ তিনি এক রকম করবেন আর অন্যরকম বলবেন– তা কিছুতেই হতে পারে না। নিঃসন্দেহে তিনি সেরকম সংক্ষেপ করার কথাই বলেছেন, যেরকমটি তিনি নিজে পড়তেন। একথাও সকলেরই জানা যে, তাঁর পেছনে বৃদ্ধ, দুর্বল এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যস্ত লোকেরাও নামাজ পড়ত।

www.waytojannah.com

Contents

এই লম্বা ও সংক্ষেপ কিরাত সংক্রান্ত ইখতিলাফের মীমাংসা এটা হতে পারে যে, তিনি প্রথম প্রথম খুব দীর্ঘ কিরাত পড়তেন এবং পরবর্তীকালে তা কিছুটা সংক্ষেপ করে কম লম্বা কিরাত পড়তেন। এই সমাধানটির পক্ষে দলিলও রয়েছে। ইমাম নাসায়ী এবং অন্যান্য হাদিসের ইমামগণ আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কিরাত সংক্ষেপ করার জন্য বলতেন এবং তিনি আমাদের ইমামতি করতেন সূরা আস-সাফফাত দিয়ে।" সুতরাং সংক্ষেপের উদাহরণ হলো সূরা আস-সাফফাত। (আল্লাহই অধিক জানেন)

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো নামাজের জন্য কোনো সূরা নির্দিষ্ট করে ঐ নামাজে কেবল ঐ সূরাই পড়তেন– এমনটি করতেন না। তবে জুমু'আ এবং দুই ঈদের নামাজ এর ব্যতিক্রম।

আমর ইবনু শুয়াইব তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর দাদা বলেছেন: ছোট বা বড় এমন কোন সূরা নেই, যেটি রাসূল ﷺ ফরয নামাজে ইমামতি করার সময় পড়েননি।' হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে আবু দাউদে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক নামাজে একটি পূর্ণ সূরা পড়তেন। কখনো এক রাকাতে একটি পূর্ণ সূরা পড়তেন, আবার কখনো একটি সূরাকে ভেঙ্গে দু'রাকাতে পড়তেন। কখনো কখনো সূরার প্রথম অংশ পড়তেন। কিন্তু কোনো সূরার মাঝের বা শেষের অংশ পড়েছেন বলে প্রমাণ নেই।

তিনি নফল নামাজে একই রাকাতে দু'টি সূরা পড়েছেন। কিন্তু ফরয নামাজে এক রাকাতে দুটি সূরা পড়েছেন বলে প্রমাণ নেই।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি রাকাতে দুটি করে সূরা পড়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন, সেটা একটা এজমালী কথা। এমনটি তিনি ফরয নামাজে করেছেন, নাকি নফল নামাজে, সেকথা এখানে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই।

আবু দাউদে জুহাইনা গোত্রের জনৈক ব্যক্তির যে বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে ঐ ব্যক্তি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফজরের উভয় রাকাতে সূরা যিলযাল পড়তে শুনেছি।' কিন্তু ঐ ব্যক্তিই একথা বলার পর বলেন: 'তবে তিনি উভয় রাকাতে সূরা যিলযাল কি ভুলবশত পড়েছেন, নাকি ইচ্ছাকৃত, তা আমি জানি না।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় রাকাতের তুলনায় প্রথম রাকাতের কিরাত লম্বা করতেন। ফজরসহ প্রত্যেক নামাজেই এমনটি করতেন। কখনো কখনো প্রথম রাকাত ততক্ষণ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করতেন, যতক্ষণে মুসল্লিদের (মাসজিদে আসার) পদক্ষেপের শব্দ বন্ধ না হতো। অর্থাৎ সব মুসল্লি এসে প্রথম রাকাত ধরা পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করতেন।

তিনি অন্যান্য নামাজের তুলনায় ফজর নামাজের কিরাত দীর্ঘ করতেন। ফজর নামাজ দীর্ঘ করার কয়েকটি কারণ থাকতে পারে:

ক. যেহেতু ফজরের কুরআন পাঠে ফেরেশতারা উপস্থিত থাকেন। এসময় রাত ও দিনের ফেরেশতাদের সমাগম ঘটে। কারণ এটা তাদের দায়িত্ব পরিবর্তনের সময়।

খ. যেহেতু ফজর নামাজে রাকাত সংখ্যা কম।

গ. যেহেতু মুসলমানদেরকে ঘুম ও বিশ্রাম থেকে উঠে এসে ফজর নামাজ ধরতে হয়।

www.waytojannah.com

ঘ. যেহেতু এ নামাজের পরেই মুসলমানরা একটা দীর্ঘ সময়ের জন্য উপার্জনের কাজে বেরিয়ে পড়ে। কাজেই দীর্ঘ সময় ধরে যেন তাদের মধ্যে কুরআনের প্রভাব বিরাজ করে।

ঙ. যেহেতু এসময় মানুষের মন প্রশান্ত থাকে এবং মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনার, বুঝার ও চিন্তা করার সুযোগ থাকে।

চ. যেহেতু এটাই দিনের প্রথম আমল, তাই এর প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং এর মাধ্যমে দিনের সূচনাতেই বেশি বেশি নেকি ও কল্যাণ অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন।

জ্ঞানী লোকদের পক্ষে শরীয়তের এই হিকমত, তাৎপর্য ও নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ বুঝে নিতে কোনোই অসুবিধা হয় না।

তাঁর রুকূ করার পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ কিরাত শেষ করে নিঃশ্বাস নিয়ে প্রশান্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে খানিকটা সময় নীরব থাকতেন। তারপর তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় 'রফে ইয়াদাইন' করতেন এবং 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূতে চলে যেতেন।

রুকূতে গিয়ে জড়িয়ে ধরার নায় দু'হাত হাঁটুতে রাখতেন। দু'বাহু পাঁজর থেকে আলগা করে ফাঁকা করে রাখতেন। পিঠ সোজাসুজি লম্বা করে বিছিয়ে রাখতেন। মাথা পিঠের বরাবর রাখতেন, উঁচু কিংবা নিচু করে রাখতেন না।

তিনি রুকূতে গিয়ে এই ভাষায় তাসবীহ্ উচ্চারণ করতেন:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ.

উচ্চারণ: সুবহা-না রাব্বিইয়াল 'আযীম।

অর্থ: আমার রব পবিত্র, মহান। (মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, নাসায়ী)

কখনো-বা এর সঙ্গে নিম্নোক্ত তাসবীহও যোগ করে উচ্চারণ করতেন:

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণ: সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা- ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরলী।

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি পবিত্র, সকল প্রশংসা তোমারই। হে আল্লাহ, তুমি আমাদের ক্ষমা করো। (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি রুকূতে গিয়ে এতটা সময় থাকতেন যে, উপর্যুক্ত তাসবীহ প্রায় দশবার পড়া যেত। সাজদাতেও তিনি এতটা সময়ই থাকতেন। এ ক্ষেত্রে বারা ইবনু আযিব (রা)-এর বক্তব্য কিছুটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করেছে। তিনি বর্ণনা করেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁর পেছনে নামাজ পড়েছি। তাঁর কিয়াম এবং রুকূর সময় (দৈর্ঘ্য) সমান হতো। সাজদা ও দুই সাজদার মাঝের বৈঠকও প্রায় সমপরিমাণ সময় নিয়ে হতো।

এ বক্তব্য থেকে একদল লোক বুঝে নিয়েছেন যে, রাসূল ﷺ-এর কিয়াম ও রুকূ সমপরিমাণ লম্বা হতো এবং সাজদাও ঐ পরিমাণ লম্বা হতো। আসলে এখানে এ ধরনের বুঝার কোনো অবকাশ নেই।

www.waytojannah.com

Contents

কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিরাতের দৈর্ঘ্য তো সুপ্রমাণিত। ফজর নামাজে তিনি এক শ' আয়াত বা তার কিছু কমবেশি পরিমাণ পড়তেন। তাঁর মাগরিবের কিরাত সংক্রান্ত হাদিসও আগেই উল্লেখ করে এসেছি যে, তিনি মাগরিব নামাজে সূরা আরাফ, সূরা তূর এবং সূরা মুরসালাতও পড়তেন। কিন্তু একথা তো সবারই জানা যে, তিনি রুকূ ও সাজদাতে গিয়ে এতটা দীর্ঘ সময় থাকতেন না।

একথার প্রমাণ সুনানসমূহে[৩] বর্ণিত আনাসের হাদিস। এতে আনাস (রা) বলেন: 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে আমি তাঁর অনুরূপ নামাজ আর কারো পিছে পড়িনি এই যুবকটি (অর্থাৎ উমার ইবনু আবদুল আযীয) ছাড়া।' বর্ণনাকারী বলেন: 'আমি উমার ইবনু আবদুল আযীযের রুকূ ও সাজদায় দশবার করে তসবীহ পড়েছি।'

এছাড়া আনাস (রা) থেকে বর্ণিত এ হাদিসটিও এর প্রমাণ, যাতে তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ইমামতি করার সময় সূরা আস্-সাফফাত পড়তেন।'

এখন বারা ইবনু আযিব (রা)-এর বক্তব্যের অর্থ যে কী- তা আল্লাহই ভালো জানেন।[৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে স্বাভাবিকতা ও সামঞ্জস্য বজায় থাকত। তিনি যখন কিয়াম (কিরাত) লম্বা করতেন তখন স্বাভাবিকভাবে রুকূ-সাজদাও লম্বা করতেন। আবার যখন কিয়াম সংক্ষিপ্ত করতেন, তখন রুকূ, সাজদাও সংক্ষিপ্ত করতেন।

তিনি রাতের নামাজে (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ ও নফল নামাজে) কখনো কখনো রুকূ-সাজদা কিয়ামের সমান লম্বা করেছেন। সূর্যগ্রহণের নামাজেও প্রায় এমনটিই করতেন।

নামাজের বিভিন্ন অঙ্গ ও অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য ও স্বাভাবিকতা বজায় রাখার প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর থেকে প্রাপ্ত নির্দেশিকা তা-ই, যা উপরে বর্ণনা করা হলো।

রাতের (তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফল) নামাজে তিনি রুকূতে গিয়ে নিম্নোক্ত দু'আ এবং তাসবীহগুলোও পড়তেন:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

উচ্চারণ: সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররূহ।

অর্থ: পাক ও অতি পবিত্র ফেরেশতাগণ ও জিবরাঈলের রব। (বুখারী ও মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ)

তিনি আরো পড়তেন– "হে আমার প্রভু, আমি তোমার জন্য মাথা নত করেছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেছি এবং তোমারই উপর ভরসা করেছি। তুমিই আমার মনিব। আমার কান, চোখ, মগয, হাড়, শিরা-উপশিরা সবই তোমার প্রতি বিনয়াবনত হয়েছে। আমার পা যতবার উপরে উঠে আর যতবার নিচে নামে, তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির জন্যই উঠেও নামে।"

---

৩ সিহাহ সিত্তার ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থের মধ্যে বুখারী ও মুসলিম ছাড়া বাকি চারটিকে 'সুনান' বা সুনানে আরবা'আ বলা হয়।

৪ আমাদের মতে "তাঁর কিয়াম ও রুকূর সময় (দৈর্ঘ্য) সমান হতো" বারা ইবনু আযিবের এই বক্তব্যে কিয়াম অর্থ রুকূর পরবর্তী এবং সাজদায় যাবার পূর্ববর্তী কিয়াম।

www.waytojannah.com

Contents

তিনি যেভাবে রুকূতে দাঁড়াতেন

অতঃপর তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। রুকূ থেকে মাথা উঠাবার সময় তিনি:

১. 'রফে ইয়াদাইন' করতেন (দু' হাত উঠাতেন)।

২. এবং নিম্নোক্ত তাসবীহ পড়তেন:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

উচ্চারণ: সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ।

অর্থ: আল্লাহ শুনেছেন তাঁর বান্দা যার প্রশংসা করেছে।

এ সময় এবং উপরে বর্ণিত দু'বারসহ তিনি মোট তিন সময় রফে ইয়াদাইন করতেন।[৫]

এই তিন সময় তিনি যে 'রফে ইয়াদাইন' করতেন, সে সম্পর্কে প্রায় ত্রিশজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এর বিপরীত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। মৃত্যু পর্যন্ত সারাজীবন তিনি এ নিয়মেই নামাজ আদায় করতেন।

বারা ইবনু আযিব থেকে বর্ণিত এ সংক্রান্ত হাদিসটি সহীহ নয়। মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো এ নিয়ম পরিত্যাগ করেননি এবং এ থেকে প্রত্যাবর্তনও করেননি।

ইবনু মাসউদ (রা)-এর 'রফে ইয়াদাইন' ত্যাগ করাটা এজন্য ছিল না যে, তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে জানতে পেরেছেন। তিনি আসলে 'রফে ইয়াদাইনের' সাথে বিরোধও করেননি এবং তার পরিপন্থী কাজও করেননি। ব্যাপারটা হলো, সেকালে আমীর-উমারারা দেরি করে নামাজে আসতেন। ফলে তিনি আযান-ইকামত ছাড়া ঘরেই নামাজ পড়তেন। এসময় তাঁর দুপাশে দু'জন মুক্তাদি দাঁড়াত। তিনি ইমাম হিসেবে সামনে না দাঁড়িয়ে তাদের সমান্তরালে তাদের মাঝখানে দাঁড়াতেন। এতে করে রফে ইয়াদাইন করতে অসুবিধা হতো বলে তিনি তা করতেন না।

অথচ তাঁর এই নিয়মের বিপরীতে রয়েছে বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদিস। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে 'রফে ইয়াদাইন' সম্পর্কে এতোগুলো সহীহ, অকাট্য ও সুপ্রমাণিত আমলী হাদিস বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কী করে তা বর্জন করা যেতে পারে? এমনটি অকল্পনীয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্মনীতি অনুসরণ করার তওফীক দান করুন- আমীন। তিনি রুকূ থেকে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতেন। তিনি বলেছেন:

لاَتَجْزِىْ صَلاَةٌ لاَيُقِيْمُ فِيْهَا الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِىْ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

অর্থ: ঐ নামাজের কোনো জাযা নেই, যাতে (নামাজী) ব্যক্তি রুকূ ও সাজদা থেকে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ায় না এবং বসে না।" (সহীহ ইবনু খুযাইমা)

---

৫ অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকূতে যাবার সময় এবং রুকূ থেকে মাথা উঠাবার সময়। অবশ্য সামনে আরেকটি 'রফে ইয়াদাইনের' কথা আলোচনা করা হবে।

www.waytojannah.com

Contents

রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে কী বলতেন

তিনি যখন রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, তখন বলতেন: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ; কখনো বলতেন: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ আবার কখনো বলতেন:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ।

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক, তোমারই জন্য প্রশংসা। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

এই তিনটি বাক্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এ রকম বলাটা সহীহ নয়: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ কারণ, তিনি একই বাক্যে 'আল্লাহুম্মা'-এর সাথে 'ওয়াও' যুক্ত করতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে যে কিয়াম করতেন, তা সময়ের দিক থেকে তাঁর রুকূ ও সাজদার সমান দীর্ঘ হতো। সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে কখনো এই দু'আ পড়তেন:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

উচ্চারণ: সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা- ওয়া লাকাল হাম্‌দ, মিল আস্ সামা-ওয়াতি ওয়া মিল আল আরযি ওয়া মিল আ মা- শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু। আহ্‌লুস সানা-য়ি ওয়াল মাজদি আহাক্কু মা- কা-লাল 'আবদু ওয়া কুল্লুনা- লাকা 'আবদুন, আল্লা-হুম্মা লা- মা- নি'আ লিমা- আ'তাইতা ওয়ালা- মু'তিয়া লিমা- মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু ।

অর্থ: হে আমাদের রব, সমস্ত প্রশংসা তোমার। আমরা অধিকহারে তোমার প্রশংসা, পবিত্রতা এবং বারাকাতময় হবার কথা বর্ণনা করছি আসমান ও যমীন পূর্ণ করে এবং তারপরও তুমি যত চাও ততকিছু পূর্ণ করে তোমার প্রশংসা। বান্দা যা বলে তা পাবার সবচেয়ে উপযুক্ত হল– সমস্ত প্রশংসা ও সম্মানের যিনি অধিকারী সে আল্লাহ। হে আল্লাহ, তুমি যা দান কর তা কেউ ঠেকাবার নেই, আর তুমি যা দিতে না চাও তা কেউ দিতে পারে না এবং কারও ধন-সম্পদ কিংবা মর্যাদা তাকে তোমার কাছ থেকে বাঁচাতে পারে না। (বুখারী ও মুসলিম)

সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রুকূর পরে কিয়ামে তিনি এই দু'আও করতেন: "হে আল্লাহ, আমার ভুলত্রুটি থেকে আমাকে পানি, বরফ এবং ঠাণ্ডা বস্তু দিয়ে ধু'য়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করে দাও। গুনাহখাতা থেকে আমাকে সেরকম মুক্ত করো, যেমনিভাবে সাদা কাপড় থেকে ময়লা পরিষ্কার করে ধবধবে করা হয়। উদয়াচল এবং অস্তাচলের মাঝে তুমি যেরকম দূরত্ব সৃষ্টি করেছ, আমার ও আমার গুনাহখাতার মাঝে তুমি সেরকম দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও।"

তাছাড়া রুকূর পরে কিয়ামে তিনি নিম্নের কথাগুলোও অনেকবার উচ্চারণ করতেন:

لِرَبِّي الْحَمْدُ لِرَبِّي الْحَمْدُ.

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আমার রবের, সমস্ত প্রশংসা আমার প্রভুর।

www.waytojannah.com

Contents

এভাবে তাঁর এই কিয়াম (দাঁড়ানো) রুকূর সমপরিমাণ দীর্ঘ হয়ে যেত।

তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে এতটা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন (কিয়াম করতেন) যে, লোকেরা বলাবলি করতঃ হয়ত তিনি ভুলে গেছেন।

সহীহ মুসলিমে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে: রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে রুকূ থেকে দাঁড়াতেন, তখন এতটা সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা বলতাম: 'হয়ত তিনি সন্দেহে পড়েছেন।' এরপর সাজদায় যেতেন। তারপর দুই সাজদার মাঝখানে এতটা দীর্ঘসময় বসে থাকতেন যে, আমরা বলতাম: 'হয়তো তিনি ভুলে গেছেন।'

সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি ﷺ সূর্যগ্রহণের নামাজে রুকূর পরে এই কিয়ামটি এতই দীর্ঘ করতেন যে, তা প্রায় রুকূর সমান দীর্ঘ হতো। আর তাঁর সে রুকূ হতো রুকূর পূর্বেকার কিয়ামের সমান দীর্ঘ।

রুকূ এবং রুকূর পরবর্তী কিয়াম (দাঁড়ানো) সম্পর্কে এগুলোই হল রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সুপ্রমাণিত কথা। এগুলোর সাথে কোনো বিরোধ নেই এবং এগুলোর বিপরীত কোনো কথা নেই। কোনো সূত্রেই কোনো কথা নেই।

বাকি রইল বারা ইবনু আযিব (রা) বর্ণিত হাদিসটি। সহীহ বুখারীতে বারা ইবনু আযিব (রা) থেকে এ সম্পর্কে যে হাদিস উল্লেখ হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রুকূ ও সাজদা, এবং জলসা ও কিয়ামের (বসা ও দাঁড়ানোর) সময় প্রায় সমপরিমাণ হতো।

তবে কিরাত পড়ার কিয়াম এবং তাশাহ্হুদ পড়ার জলসা এগুলোর থেকে ব্যতিক্রম। কারণ নামাজে দুই ধরনের কিয়াম (দাঁড়ানো) এবং দুই ধরনের জলসা (বসা) হয়ে থাকে। বারা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রুকূ, সাজদা এবং কিয়াম ও জলসা সমান হতো বলে রুকূর পরবর্তী কিয়াম এবং দুই সাজদার মধ্যবর্তী জলসাই বুঝিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের এ অর্থ গ্রহণ করলেই অন্যসবগুলো সহীহ হাদিসের সঙ্গে এ বক্তব্যের কোনো বিরোধ থাকে না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিয়াম এবং তাশাহ্হুদের জলসা যে নামাজের অন্যান্য আরকান থেকে দীর্ঘ হতো, সে কথাতো সুস্পষ্ট এবং সুপ্রমাণিত।

আমাদের উস্তাদ (ইমাম ইবনু তাইমিয়া) বলেছেন, বানী উমাইয়ার শাসকরা নামাজের এই দুটি রুকন সংক্ষেপ করে ফেলেছে। এভাবে তারা নামাজের আরো বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে বিভিন্ন রকম বিদআত সৃষ্টি করেছে। যেমন তকবীর পূর্ণ না করা, অনেক দেরি করে নামাজ পড়া ইত্যাদি। এমনকি তাদের সৃষ্টি করা এসব বিদআতকে তারা সুন্নত মনে করত।

তাঁর সাজদায় যাবার পদ্ধতি

এভাবে প্রশান্তির সঙ্গে (রুকূর পরবর্তী) কিয়াম শেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদায় লুটিয়ে পড়তেন। এসময় তিনি 'রফে ইয়াদাইন' করতেন না।

তবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি এ সময়ও 'রফে ইয়াদাইন' করতেন। ইবনু হাযম (র) প্রমুখ এ বর্ণনাকে সহীহ্ বলেছেন। আসলে এটা একটা অনুমানভিত্তিক বক্তব্য। মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ সাজদায় যাবার কালে 'রফে ইয়াদাইন' করতেন না। রাবীর (হাদিস বর্ণনাকারীর) ভুলের কারণে তিনি এসময় 'রফে ইয়াদাইন' করতেন বলে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

সাজদায় যাবার কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতের পূর্বে হাঁটু জমিনে স্থাপন করতেন। তারপর দুই হাত, এরপর কপাল এবং সবশেষে নাক স্থাপন করতেন।

www.waytojannah.com

Contents

হাত আগে না হাঁটু আগে

তিনি যে হাতের আগেই হাঁটু স্থাপন করতেন, একথা সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন শরীক আসেম ইবনু কুলাইব থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে তিনি ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রা) থেকে। ওয়ায়েল (রা) বলেন: "আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাজদা করতেন, তিনি দুই হাতের পূর্বে দুই হাঁটু স্থাপন করতেন। যখন সাজদা থেকে উঠতেন, তখন দুই হাঁটুর পূর্বে দুই হাত উঠাতেন।" **(তিরমিযী নামাজ অধ্যায়)**

এর বিপরীত করতে তাঁকে দেখা যায়নি।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত একটি মরফূ হাদিস এক্ষেত্রে বিরোধ সৃষ্টি করেছে। হাদিসটি হলো: 'তোমাদের কেউ যখন সাজদায় যাবে, সে যেনো উটের ন্যায় না বসে, বরং সে যেন দুই হাঁটুর আগে দুই হাত রাখে।' **(আবু দাউদ)**

এ হাদিসটির বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন। তবে সম্ভবত, হাদিসটির মধ্যে কোনো না কোনো রাবি থেকে কিছু কল্পনা প্রসূত কথা ঢুকে পড়েছে। আবার এর প্রথমাংশ দ্বিতীয়াংশের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। হাঁটুর আগে যদি হাত রাখা হয়, তবে তা উটের মতোই বসা হয়। কারণ উট তার দুই হাতই আগে রাখে, হাঁটু নয়।

হাঁটুর পূর্বে হাত রাখার পক্ষের লোকেরা যখন জানতে পারলেন, উট হাঁটুর আগে হাত বিছিয়ে দেয়, তখন তাঁরা ব্যাখ্যা দিলেন, উটের হাঁটু তার হাতের মধ্যেই থাকে, পায়ে নয়। আসলে এই ব্যক্তিগণের কথা কয়েক কারণে গ্রহণযোগ্য নয়:

১. উট বসার সময় প্রথমে তার হাত দুটিই বিছিয়ে দেয়, তখন তার দুই পা দাঁড়ানো থাকে। অপর দিকে যখন বসা থেকে দাঁড়ায় তখন তার পা দুটি আগে উঠে এবং হাত দুটি তখনো মাটিতেই থাকে।

   হাদিসে এ পদ্ধতিটি অনুসরণ করতেই তো রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন এবং তিনি এর বিপরীত করেছেন।

   রাসূলুল্লাহ ﷺ জমিনে প্রথমে সে অঙ্গই স্থাপন করতেন, যেটি জমিনের খুব বেশি কাছাকাছি, যেটি স্বাভাবিকভাবে আগে মাটিতে স্থাপিত হতো। আবার উঠার সময় একটির পর একটি করে সেসব অঙ্গই আগে উঠাতেন, যেগুলো পর্যায়ক্রমে মাটি থেকে বেশি উপরে থাকতো। তিনি সাজদায় যাবার কালে প্রথমে দুই হাঁটু রাখতেন, তারপর দুই হাত, তারপর কপাল। আবার সাজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে মাথা উঠাতেন তারপর দুই হাত, অতঃপর দুই হাঁটু।

   –এটাই উটের পদ্ধতির বিপরীত। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্তু-জানোয়ারদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন, হিংস্র পশুদের মতো জমিনে হাত বিছিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন, কুকুরের মতো হাত ছড়িয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন এবং কাকের মতো ঠোকর মারতে নিষেধ করেছেন। আবার তিনি সালামের সময় ঘোড়ার লেজের মতো হাত উঠাতেও নিষেধ করেছেন।

২. তারা যে বলেছেন, 'উটের হাঁটু উটের হাতে থাকে'-এ এক আজব কথা। কোনো ভাষাবিদের পক্ষে এর অর্থ বুঝা এবং একথা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ হাঁটু হাতে নয়, পায়ে থাকে– এটাই সর্বজনবিদিত।

৩. সত্যিই যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ হাঁটুর পূর্বে হাত রাখার কথা বলে থাকেন, তবে তিনি বলতেন: তোমরা উটের মতো বসবে এবং হাঁটুর আগে হাত রাখবে। তাহলেই বক্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো।

www.waytojannah.com

Contents

আমার ধারণা, আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত এ হাদিসটির বক্তব্য প্রথমত সঠিক ছিল। প্রথমে হাদিসটি সম্ভবত "....সে যেন দুই হাতের আগে দুই হাঁটু রাখে" –ছিল। পরবর্তী বর্ণনাকারীদের দ্বারা বক্তব্যের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি হয়েছে। যেমনটি হয়েছে আরো বিভিন্ন হাদিসের ক্ষেত্রে। যেমন সাহারী খাওয়া সংক্রান্ত ইবনু উমার (রা)-এর হাদিস। এতে তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন: বিলাল অধিক রাতে আযান দেয়। সুতরাং তার আযানের পরও তোমরা পানাহার করতে থাকো যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম আযান দেয়।" এখানে পরবর্তী কোনো কোনো রাবি বিলালের জায়গায় ইবনু উম্মে মাকতুম এবং ইবনু উম্মে মাকতুমের জায়গায় বিলালের নাম উল্লেখ করেছেন। অন্য একটি হাদিসে পরবর্তী কোনো রাবী জান্নাতের স্থলে জাহান্নাম এবং জাহান্নামের স্থলে জান্নাত উল্লেখ করে গোলমাল করে ফেলেছেন।

-এভাবে এই হাদিসটিতে পরবর্তী কোনো রাবী হাতের স্থলে হাঁটু এবং হাঁটুর স্থলে হাত বলে ফেলেছেন বলে মনে হয়। আর সমস্যার সমাধান রয়েছে উটের বিশ্রাম গ্রহণের পদ্ধতির মধ্যে। এক্ষেত্রে ওয়ায়েল ইবনু হুজরের হাদিসই সঠিক।

আগে হাঁটু স্থাপনের পক্ষে আবু হুরাইরা (রা) থেকেই আরো বর্ণনা রয়েছে।

আবু বকর ইবনু আবী শাইবা মুহাম্মাদ ইবনু ফুযাইল থেকে তিনি আবদুল্লাহ ইবনু সাঈদ থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে তিনি আবু হুরাইরা (রা) থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন সাজদায় যাবে সে যেন হাতের আগেই হাঁটু রাখে। সে যেন উটের মতো না বসে।

আল-আহ্‌রাম তাঁর সুনান গ্রন্থে সহীহ সূত্রে আবু হুরাইরা (রা) থেকে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন।

এ হাদিসটি ওয়ায়েল ইবনু হুজর বর্ণিত হাদিসটির সাথে হুবহু মিলে যায়। আরেকটি অনুরূপ হাদিস দেখুন:

ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহ হাদিস সংকলনে মুসআব ইবনু সা'আদ থেকে হাদিস উল্লেখ করেছেন। মুসআব তাঁর পিতা সা'আদ (রা) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমরা হাঁটুর আগে হাত রাখতাম। এমনটি দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হাতের আগে হাঁটু রাখার নির্দেশ দেন।"

এমতাবস্থায় আবু হুরাইরা (রা)-এর প্রথম হাদিসটির বর্ণনার মধ্যে যদি গোলমাল নাও সৃষ্টি হয়ে থাকে, তথাপি তা মানসুখ (রহিত) হয়ে যায়। আল মুগনী প্রণেতা ইমাম ইবনু কুদামা সহ অন্যান্য হাদিসবিশারদগণের এটাই অভিমত।

এছাড়াও হাদিসটি অগ্রহণযোগ্য হবার আরো দুটি কারণ রয়েছে। সেগুলো হলো:

১. হাদিসটির সনদে (বর্ণনাসূত্রে) একজন রাবী (বর্ণনাকারী) রয়েছেন ইয়াহ্‌ইয়া বিন সালামা বিন কুহাইল। তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, এই ব্যক্তি রাবী হিসেবে পরিত্যাজ্য (মাতরূক)। ইবনু হিব্বান বলেছেন, এ ব্যক্তি রাবী হিসেবে খুবই দুর্বল-অযোগ্য (মুনকার), তাকে কিছুতেই নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। ইবনু মাঈন তো তার রাবী হবার বিষয়টি উড়িয়েই দিয়েছেন।

২. মুসআব ইবনু সা'আদ তার পিতা সা'আদ থেকে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, সেটিকে এ বিষয়ের সমন্বয়কারী হাদিস হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। হাদিসটি নির্ভরযোগ্যও বটে। এ হাদিসে সা'আদ (রা) বলেন: আমরা ও-রকম করতাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ

www.waytojannah.com

Contents

আমাদেরকে হাঁটুতে হাত রাখতে নির্দেশ দেন।" আল-মুগনী প্রণেতা (ইমাম ইবনু কুদামা) হাদিসটি এভাবে উল্লেখ করেছেন: আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা হাঁটুর আগে হাত রাখতাম। এমনটি দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের হাতের আগে হাঁটু রাখার নির্দেশ দেন।"

এ বর্ণনাটিতেও কোনো বর্ণনাকারী সা'আদ এবং আবু সায়ীদ- এই দুই নামের মধ্যে গোলমাল বেঁধে ফেলেছেন। এ হাদিসটির সনদে সাহাবির নামের ক্ষেত্রে গোলমাল থাকলেও হাদিসটির মূল বক্তব্য (মতন) ঠিকই আছে। তাই এ হাদিসটিকে হাত আগে না হাঁটু আগে- এই সমস্যার সমন্বয়কারী হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ

- সাহাবীগণ প্রথমদিকে হাতই আগে রাখতেন।

- পরে রাসূল ﷺ হাঁটু আগে রাখার নির্দেশ দেন।

তাছাড়া আবু হুরাইরার প্রথম হাদিসটির সনদকে ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযী, দারাকুতনী এবং আবু হাতিমও বিশুদ্ধ বলেননি।

এবার দেখা যাক, এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের 'আছার' (আচরণ) কী ছিল? প্রখ্যাত হাদিসবিশারদ আবদুর রাজ্জাক এবং ইবনুল মুনযির তাঁদের হাদিস সংকলনে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন: উমার (রা) সব সময় হাতের আগে হাঁটু জমিনে রাখতেন।

ইমাম ত্বহাবী ফাহাদ থেকে তিনি উমার ইবনু হাফস্ থেকে তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের ছাত্র আলকামা ও আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দু'জনই বলেছেন: আমরা আমাদের ইলমের মধ্যে একথা খোদাই করে রেখেছি যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রুকূর পরে উটের মতো তার হাঁটুর উপর ভর করে নুইয়ে পড়তেন এবং হাতের আগেই হাঁটু স্থাপন করতেন।

ইমাম ত্বহাবী হাজ্জাজ ইবনু আরতাতের সূত্রে ইবরাহীম নাখয়ীর এ বক্তব্যও উল্লেখ করছেন: আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ যখন সাজদায় যেতেন, তখন হাতের পূর্বেই তিনি হাঁটু জমিনে স্থাপন করতেন।

ইমাম ত্বহাবী আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন আবু মারযুক থেকে তিনি ওহাব থেকে তিনি শু'বা থেকে তিনি মুগীরা থেকে। মুগীরা বলেন, আমি ইবরাহীম নাখয়ীকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে সাজদায় যাবারকালে হাঁটুর আগে জমিনে হাত রাখে। জবাবে তিনি বললেন: আহমক কিংবা পাগল ছাড়া কেউ কি এমনটি করে?

ইবনুল মুনযির বলেছেন, হাত আগে না হাঁটু আগে এ বিষয়টি নিয়ে জ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। যাদের মত হলো, হাতের আগে হাঁটু রাখতে হবে, তাদের মধ্যে রয়েছেন- উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ইবরাহীম নাখয়ী, মুসলিম ইবনু ইয়াসার, সুফিয়ান সাওরী, শাফেয়ী, আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইসহাক ইবনু রাহওয়াই, আবু হানীফা এবং তাঁর শিষ্যগণ ও কুফাবাসী।

পক্ষান্তরে যাদের মতে হাঁটুর আগে হাত রাখতে হবে, তাদের মধ্যে রয়েছেন, মালিক ও আওযায়ী। তাঁরা বলেছেন, আমরা দেখতে পেয়েছি লোকেরা হাঁটুর আগে হাত রাখেন। আহলে হাদিসের মতও এটাই।

বায়হাকীতে আবু হুরাইরা (রা)-এর হাদিসটি কিছুটা ভিন্ন ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে: তোমাদের কেউ যখন সাজদা করে, তখন সে যেন উটের মতো লুটিয়ে না পড়ে। বরং সে যেন হাঁটুর উপর হাত রাখে।

www.waytojannah.com

Contents

বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটি যদি সুরক্ষিত ও অবিকৃত (মাহফুয) থেকে থাকে, তবে এটি সাজদায় যাবারকালে হাঁটুর আগে হাত রাখার পক্ষে একটি দলিল। তবে কয়েকটি কারণে ওয়ায়েল ইবনু হুজর বর্ণিত হাদিসটি (অর্থাৎ হাতের আগে হাঁটু রাখার হাদিসটি) গ্রহণ করা উত্তম। কারণগুলো হলো:

১. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত (অন্যান্য) হাদিস থেকে হাতের আগে হাঁটু রাখার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। একথা বলেছেন খাত্তাবী প্রমুখ হাদিসবিশারদগণ।

২. আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদিসের মূল বক্তব্য (মতন) অনেকটা গোলমেলে। বিভিন্ন সূত্রের বর্ণনায় বক্তব্যের গোলমাল দেখা যায়। কখনো বলা হয়েছে: হাঁটুর আগে যেন হাত রাখে। আবার কখনো বলা হয়েছে: হাতের আগে যেন হাঁটু রাখে। কখনো বা মূল বক্তব্যের কিছু অংশ বাদ দিয়ে বলা হয়েছে।

৩. ইমাম বুখারী ও দারু কতনি প্রমুখ বড় বড় হাদিস বিশারদগণ আবু হুরাইরা (রা)-এর হাঁটুর আগে হাত রাখার, হাদিসটির সনদকে ত্রুটিপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৪. একদল আহলে ইল্‌ম হাঁটুর আগে হাত রাখার বর্ণনাকে মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে বলে মনে করেন। ইবনুল মুনযির বলেছেন, অনেকেই এ বর্ণনাটি বাতিল হয়ে গেছে বলে মনে করেন।

৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু উটের ন্যায় সাজদায় লুটিয়ে পড়তে নিষেধ করেছেন, তাই উটের পদ্ধতি পরিহার করার জন্যও ওয়ায়েল ইবনু হিজরের বর্ণনাটি উত্তম।

৬. বড় বড় সাহাবীগণের 'আসার' তথা আমল সম্পর্কে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাও হাতের পূর্বে হাঁটু রাখার পক্ষে। উমার, আবদুল্লাহ ইবনু উমার, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম হাতের আগে হাঁটু রাখতেন। তাঁদের কেউই আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনার অনুরূপ আমল করেছেন বলে প্রমাণ নেই। শুধু উমার (রা) কখনো এমনটি করেছেন বলে একটি ভিন্নমত পাওয়া যায়।

৭. ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রা) বর্ণিত হাদিসের সমর্থনে আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) এবং আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসও রয়েছে। তবে আবু হুরাইরা (রা) এর সমর্থনে অন্য কোনো সাহাবি বর্ণিত হাদিস নেই।

৮. অধিকাংশ লোকই ওয় য়েল ইবনু হুজর (রা) বর্ণিত হাদিসের অনুসারী। আর আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত এ হাদিসটির অনুসরণ করেছেন শুধু ইমাম আওযায়ী এবং ইমাম মালিক। আবু দাউদ যে বলেছেন, আহলে হাদিস আবু হুরাইরার হাদিসটি অনুসরণ করে, এর অর্থ- আহলে হাদিসের কিছু লোক। কারণ, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম ইস্‌হাক এ হাদিসের অনুসরণ করেননি।

৯. আবু হুরাইরা (রা)-এর হাদিসটি কওলী (বাণীগত) হাদিস। অপরদিকে ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রা)-এর হাদিসটি ফে'লী (রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কর্মের বর্ণনাগত) হাদিস। ফে'লী হাদিস কওলী হাদিসের তুলনায় অধিক মাহফুয (সংরক্ষিত ও অবিকৃত) থাকে। তাই এদিক থেকেও ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রা)-এর বর্ণনাটি উত্তম।

১০. ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাজদায় যাবার যে বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন, তা অন্যান্য সহীহ বর্ণনা থেকেও প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজের প্রক্রিয়া ও

www.waytojannah.com

Contents

পদ্ধতিগত সমস্ত বর্ণনাই প্রমাণিত ও সহীহ। আর এটিও সেরকমই একটি বর্ণনা। কাজেই এ বর্ণনাটি এ সংক্রান্ত বিধান হিসেবে গ্রহণীয়। এর বিপরীত বর্ণনাটিকে এর চাইতে অগ্রাধিকার দেবার মতো মজবুত যুক্তি নেই। এ হলো আমাদের বুঝ-জ্ঞানের কথা। অবশ্য প্রকৃত জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছে।

তিনি কিসের উপর সাজদা করতেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশিরভাগ সময়ই জমিনের উপর সাজদা করতেন। কখনো কখনো পানি, কাদামাটি খেজুর পাতার মাদুর, খেজুর আঁশের গদি এবং শুকনো চামড়ায় সাজদা করেছেন।

তিনি কিভাবে সাজদা করতেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ কপাল ও নাক জমিনে রেখে সাজদা করতেন। তিনি পাগড়িতে ঢাকা কপালে নয়, খালি কপালে সাজদা করতেন। পাগড়িতে ঢাকা কপালে সাজদা করতেন বলে কোনো সহীহ হাদিসে প্রমাণ নেই। এমনকি কোনো হাসান হাদিসেও এর প্রমাণ মিলে না।

তবে আবদুর রাজ্জাক তাঁর 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থে আবু হুরাইরা (রা)-এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ পাগড়ির প্যাচের উপর সাজদা করতেন।"

এ হাদিসটি যাদের মুখে বর্ণিত হয়ে এসেছে, তাদের একজন হলো আবদুল্লাহ ইবনু মুহাররায। এ ব্যক্তি হাদিস বর্ণনাকারী হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য নয়, পরিত্যাজ্য (মাতরূক)।

আবূ আহমাদও জাবির (রা)-এর সূত্রে অনুরূপ একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসটির বর্ণনাসূত্রে আমর ইবনু শাহর এবং জাবির আল জু'ফী নামক দু'ব্যক্তি রয়েছেন। এরা দু'জনই অবিশ্বস্ত ও পরিত্যাজ্য (মাতরূক)। একজন পরিত্যাজ্য ব্যক্তি থেকে অন্য জন পরিত্যাজ্য ব্যক্তি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কাজেই এটিও গ্রহণযোগ্য নয়।

মারাসীলে আবু দাউদে বর্ণিত একটি হাদিসের বক্তব্য এমন আছে: একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাসজিদে এক এক ব্যক্তিকে নামাজ পড়তে দেখেন। কপাল জুড়ে পাগড়ি বাঁধা অবস্থায় লোকটি সাজদা করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কপাল থেকে পাগড়ি সরিয়ে ফেলেন।

তিনি যখন সাজদা করতেন, কপাল ও নাক জমিনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতেন। দুই বাহু দূরে সরিয়ে রেখে বগল ফাঁকা করে রাখতেন। বগল এতটা ফাঁকা করতেন যে, বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। ইচ্ছে করলে দুই বাহুর এই ফাঁক দিয়ে ছোট ছাগল ছানা দৌড়ে যেতে পারত। (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি সাজদায় দুই হাতের তালু কখনো ঘাড় আবার কখনো কান বরাবর রাখতেন।

সহীহ মুসলিমে বারা (রা)-এর সূত্রে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তুমি যখন সাজদা করবে, হাতের তালু দুটি জমিনে রাখবে এবং দুই কনুই উপরে উঠিয়ে রাখবে।

তিনি সাজদায় গিয়ে পিঠ সোজা রাখতেন। দুই পায়ের আঙ্গুলের মাথাগুলো (বাঁকিয়ে) কিবলামুখী করে রাখতেন। হাতের তালু ও আঙ্গুল বিছিয়ে রাখতেন, অবশ্য একেবারে মিলিয়ে রাখতেন না, আবার বেশি ফাঁকাও রাখতেন না।

www.waytojannah.com

Contents

ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহ হাদিস সংকলনে বর্ণনা করেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকু করতেন, তখন হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা রাখতেন, আর যখন সাজদা করতেন, তখন মিলিয়ে রাখতেন।

এভাবে তিনি হাঁটু, হাতের তালু, পায়ের পাতার সম্মুখভাগ, এবং কপাল ও নাক এতমীনানের (প্রশান্তির) সাথে জমিনে স্থাপন করে পিঠ সোজা করে সাজদায় অবস্থান করতেন।

তিনি সাজদায় কী বলতেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাজদায় গিয়ে বিভিন্ন তাসবীহ্ উচ্চারণ করতেন এবং দু'আও করতেন। সহীহ সূত্রে জানা যায়, তিনি বিভিন্নরূপ তাসবীহ ও দু'আ করতেন। তিনি কখনো এই তাসবীহ পাঠ করতেন:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى.

উচ্চরণ: সুবহানা রাব্বিইয়াল 'আলা।

অর্থ: আমি আমার উচ্চ সম্মানিত রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি। (তিরমিযী, সহীহ)

-সহীহাইনে বর্ণিত হয়েছে যে, এই তাসবীহ তিনি নিজেও পড়তেন এবং সাহাবীদেরও পড়তে নির্দেশ দিতেন। কখনো নিম্নোক্ত তাসবীহও পাঠ করতেন:

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণ: সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা- ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী।

অর্থ: হে আল্লাহ, হে আমাদের রব, আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি প্রশংসার মাধ্যমে। হে আল্লাহ, দয়া করে আমাকে ক্ষমা কর।

কখনো এই তাসবীহ করতেন:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

উচ্চারণ: সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুনা ওয়া রব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররূহ।

অর্থ: পাক ও অতিপবিত্র আমাদের, ফেরেশতাগণ ও জিবরাঈলের রব। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও আহমাদ)

কখনো উচ্চারণ করতেন এই তাসবীহ্:

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

উচ্চারণ: সুবহা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা-'ইলা-হা ইল্লা- আন্তা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার প্রশংসার সাথে সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। (মুসলিম)

কখনো পড়তেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবি রিযাকা মিন সাখতিক, ওয়া বিমু'আফাতিকা মিন 'উকূবাতিক, ওয়া আ'উযুবিকা মিনকা, লা উহ্সী সানাআন 'আলাইকা আনতা কামা আসনাইতা 'আলা নাফসিক।

www.waytojannah.com

Contents

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার রাগ হতে ক্ষমা চাই, বরং যেন তুমি আমার উপর খুশী হও। আর তোমার কাছে ক্ষমা চাই, তোমার শাস্তি হতে বাঁচতে চাই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই তোমার আযাব থেকে। আমি তোমার পরিপূর্ণ প্রশংসা করার মত যোগ্যতাও রাখি না, তুমি তেমনই, যেমন প্রশংসা তুমি নিজের সম্বন্ধে করেছ। (মুসলিম)

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, কখনো এই দু'আ করতেন: "হে আমার আল্লাহ! তোমারই উদ্দেশ্যে আমি সাজদা করেছি। তোমারই প্রতি আমি ঈমান এনেছি। আর তোমারই প্রতি আমি আত্মসমর্পণ করেছি। তুমিই আমার মালিক ও মনিব। আমার মুখমণ্ডল তাঁরই প্রতি সাজদায় অবনত, যিনি এ মুখমণ্ডলকে সৃষ্টি করেছেন, সর্বোত্তম আকৃতি দান করেছেন এবং তাতে চোখ কান দিয়ে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা তুমি হে আল্লাহ, বড় বারাকাতময় তোমার নাম।"

কখনো সাজদায় গিয়ে এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

"হে আল্লাহ! ক্ষমা করে দাও আমার যাবতীয় গুনাহ, সামনের ও পেছনের, প্রথমের ও শেষের, প্রকাশ্যের ও গোপনের।" (মুসলিম)

কখনো এই দু'আ করতেন: "হে আল্লাহ, ক্ষমা করে দাও আমার যাবতীয় ভ্রান্তি, অজ্ঞতা, বাড়াবাড়ি- যা তুমি আমার চেয়ে অধিক জানো। হে আমার আল্লাহ, মাফ করে দাও আমার সব সীমালঙ্ঘন, অক্ষমতা, অনিচ্ছাকৃত ভুল, ইচ্ছাকৃত ভুল এবং এরকম আরো যা কিছু আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। হে আল্লাহ, মাফ করে দাও আমার আগে ও পরের এবং গোপন ও প্রকাশ্যের সকল গুনাহ। তুমিই তো আমার ত্রাণকর্তা। তুমি ব্যতীত তো আর কোনো ত্রাণকর্তা নেই।"

সাজদায় তিনি কখনো বা এই দু'আ করতেন: "হে আল্লাহ, আমার অন্তরে নূর (আলো) সৃষ্টি করে দাও, আমার যবানে নূর দাও, আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দাও, আমার দৃষ্টিশক্তিতে নূর দাও, আমার ডানে নূর দাও, আমার বামে নূর দাও, আমার সামনে নূর দাও। আমার পেছনে নূর দাও, আমার উপরে নূর দাও, আমার নিচে নূর দাও, আমার মধ্যে নূর সৃষ্টি করে দাও আর আমার নূরকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করে দাও।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাজদার দু'আর সময় ইজতিহাদ (খুব মনোযোগ সহকারে দু'আ) করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন: সাজদায় বান্দা আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী হয়। তোমরা সাজদায় অধিক হারে দু'আ করো। সাজদা দু'আ কবুলের উপযুক্ত সময়। এখানে তিনটি কথা সুস্পষ্ট:

১. সাজদার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্‌র অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়।

২. আল্লাহ সাজদায় দু'আ বেশি বেশি কবুল করেন।

৩. তাই সাজদায় গিয়ে বেশি বেশি দু'আ করো।

সাজদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ধরনের দু'আ বেশি বেশি করতেন। সেগুলো হলো:

১. আল্লাহর প্রশংসামূলক দু'আ।

২. প্রার্থনামূলক দু'আ।

www.waytojannah.com

Contents

সাজদার বিরাট মর্যাদা

আল্লাহর বাণী (আল-কুরআনের) তিলাওয়াত এবং দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহর সামনে অনুগত ও বিনীত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে নামাজের 'কিয়াম' যেমন মর্যাদাবান, ঠিক তেমনি সাজদাও আল্লাহর নিকট বিরাট মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহকে সাজদা করার মর্যাদা অনেক অনেক বেশি। কারণ–

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে বান্দা তার মা'বুদের সবচেয়ে নিকটতর হয়, সে হলো সাজদাকারী।

২. মা'দান ইবনু আবু তালহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুক্ত দাস সাওবান (রা)-কে বলেছিলাম: আমাকে এমন একটি কথা শিখিয়ে দিন, যেন আমি উপকৃত হতে থাকব। জবাবে তিনি বললেন: বেশি বেশি সাজদা করো। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যখনই কোনো বান্দা আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি সাজদা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা এক ধাপ বৃদ্ধি করে দেন এবং তার গুনাহসমূহ থেকে একটি গুনাহ মুছে দেন।

মা'দান বলেন, অতপর আমি গিয়ে আবূদ দারদা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং একই বিষয়ে জানতে চাই। তিনিও আমাকে সাওবানের মতো একই হাদিস শুনান।

৩. রবীয়া ইবনু কা'ব আল আসলামী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জান্নাতে তাঁর সাথী হবার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি তাকে বলেন: তবে তুমি বেশি বেশি সাজদা করে আমাকে সাহায্য করো।

৪. সূরা আলাকের শেষ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ "সাজদা করো আর (আমার) নৈকট্য অর্জন করো।"

৫. ছোট বড় সমস্ত মাখলুকাত আল্লাহর প্রতি সাজদায় অবনত হয়।

৬. সাজদার মাধ্যমেই বান্দা তার প্রভুর প্রতি সর্বাধিক অবনত হবার সুযোগ পায় এবং সর্বাধিক ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করে। তাই এটাই প্রভুর নিকটে দাসের সর্বোত্তম সম্মানজনক অবস্থা।

৭. সাজদাই তো হলো ইবাদত ও দাসত্বের চূড়ান্ত প্রকাশ। কারণ, বিনয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও দাসোচিত আনুগত্য প্রকাশের জন্য সাজদাই মনিবের নিকট সর্বাধিক প্রিয় হয়ে থাকে।

তিনি সাজদায় কতক্ষণ থাকতেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের সকল অঙ্গের (আরকানের) মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখতেন। তিনি যখন দীর্ঘ কিয়াম (কিরাত পাঠ) করতেন, তখন সেই অনুপাতে রুকূ এবং সাজদাও দীর্ঘ করতেন। যেমন সূর্যগ্রহণের নামাজ এবং রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাজে তিনি কিয়ামও সুদীর্ঘ করতেন এবং রুকূ সাজাদাও দীর্ঘ করতেন।

আবার যখন কিয়াম (কিরাত পাঠ) তুলনামূলক সংক্ষেপ করতেন, তখন রুকূ-সাজদাও সেই অনুপাতে সংক্ষিপ্ত করতেন। সাধারণত তিনি ফরয নামাজেই এমনটি করতেন।

এই ভারসাম্য রক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায় বারা ইবনু আযিব (রা)-এর হাদিস থেকে। তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিয়াম, রুকূ ও সাজদা ছিলো ভারসাম্যপূর্ণ। এগুলোর দৈর্ঘ্য প্রায় কাছাকাছি ছিল।

এখানকার আলোচনা থেকে আমরা তিনটি কথা পেলাম:

www.waytojannah.com

Contents

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের অঙ্গগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতেন। কিরাত দীর্ঘ করলে রুকূ-সিজদাও দীর্ঘ করতেন। কিরাত সংক্ষিপ্ত করলে রুকূ-সাজদাও সংক্ষিপ্ত করতেন।
২. সূর্য গ্রহণ ও রাতের নামাজে কিয়াম ও রুকূ সাজদা খুব বেশি দীর্ঘ করতেন।
৩. তুলনামূলকভাবে ফরয নামাজে কিয়াম ও রুকূ সাজদা সংক্ষিপ্ত করতেন।

তাঁর সাজদা থেকে উঠে বসা

অতঃপর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদা থেকে মাথা উঠাতেন। তখন 'রফে ইয়াদাইন' করতেন না। সাজদা থেকে উঠার সময় তিনি হাতের আগে মাথা উঠাতেন।

তারপর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর প্রশান্তির সঙ্গে বসতেন। ডান পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে রাখতেন। ইমাম নাসায়ী এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে সহীহ সূত্রে হাদিস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: 'সুন্নত হলো, বাম পা পেতে দিয়ে তার উপর বসতে হবে এবং ডান পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখতে হবে।'

এ সময়কার বসার ধরন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এছাড়া আর কোনো প্রকার পদ্ধতির কথা জানা যায় না।

এ সময় তিনি দু' হাত দু' উরুর উপর রাখতেন। হাতের কনুই উরুর উপর এবং হাতের মাথা হাঁটুর উপর রাখতেন। বাম হাতের তালু বাম হাতের হাঁটুর উপর বিছিয়ে দিতেন। ডান হাতের ডান পাশের আঙ্গুল দুটি মুষ্টিবদ্ধ রাখতেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি মধ্যমার উপর রেখে একটা গোলাকার বৃত্তের মতো বানাতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল (তর্জনি) উপরের দিকে উঠিয়ে দু'আ পড়তে থাকতেন এবং সেটিকে নাড়াতেন। এ হাদিস বর্ণনা করেছেন ওয়ায়েল ইবনু হিজর (রা)।

আবু দাউদে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে এ সম্পর্কে যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, তাতে আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ পড়ার কালে শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতে থাকতেন, নাড়াতেন না।

এই 'নাড়াতেন না' একথাটি পরবর্তীতে কেউ (কোনো রাবী) বাড়িয়ে বলেছেন বলে মনে হয়। কারণ, এ কথাটুকুর বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ মুসলিমেও আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা)-এর সূত্রে হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন। যেখানে তিনি এই বর্ধিতাংশ অর্থাৎ 'নাড়াতেন না' একথাটি উল্লেখ করেননি। বরং তাতে তিনি এভাবে বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজে বসতেন, তখন বাম পায়ের পাতা দুই উরু ও জঙ্ঘার মাঝখানে রাখতেন এবং ডান পায়ের উপর বসতেন। বাম হাতের তালু বাম হাঁটুর উপর রাখতেন। ডান হাতের তালু ডান উরুর উপর রাখতেন এবং তর্জনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন।

আবু দাউদের হাদিসে যে 'নাড়াতেন না' কথাটি আছে, তা এখানে নেই। তাছাড়া আবু দাউদের হাদিসের এই 'নাড়াতেন না' কথাটি যে নামাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সে কথা বলা হয়নি।

এক্ষেত্রে ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রা) এর হাদিস মজবুত ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। আবার আবু হাতিম তাঁর সহীহ সংকলনে বলেছেন, এটি সহীহ হাদিস।

www.waytojannah.com

Contents

দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে যে দু'আ পড়তেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম সাজদা থেকে মাথা উঠিয়ে প্রশান্তির সাথে বসতেন। দু' সাজদার মধ্যবর্তী এ বৈঠকে তিনি নিম্নরূপ দু'আ পড়তেন:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগফিরলী, ওয়ার হামনী ওয়াহ্দিনী, ওয়া 'আ-ফিনী, ওয়ার যুক্নী ওয়াজ বুর্নী, ওয়ার ফা'নী।

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি রহম করো, হিদায়াত দান করো, আমার জীবনে নিরাপত্তা দান করো, দীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে যে ক্ষতি হয়েছে তা তুমি পূরণ করে দাও, বুলন্দ নসীব করো। (আবূ দাউদ, তিরমিযী সহীহ, ইবনু মাজাহ)

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণ: রাব্বিগফিরলী, রাব্বিগফিরলী।

অর্থ: হে প্রতিপালক, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, হে প্রতিপালক, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।
(আবূ দাউদ ১/২৩১, ইবনু মাজাহ ১/১৪৮ সহীহ)

দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠক লম্বা করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠক সাজদার সমান লম্বা করতেন।

তামাম হাদিসেই এর প্রমাণ রয়েছে। সহীহ সংকলনসমূহে আনাস (রা) থেকে হাদিস বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই সাজদার মাঝখানে এতটা দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন যে, আমরা বলতাম, হয়তো তিনি ভুলে গেছেন কিংবা সংশয়ে পড়েছেন।

এটাই সুন্নাত। সাহাবীদের যুগের পরে অধিকাংশ লোকই এ সুন্নত ত্যাগ করেছে।

দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে দাঁড়ানো

প্রথম সাজদা থেকে উঠে প্রশান্তির সঙ্গে বসা ও দু'আ করার পর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে দ্বিতীয় সাজদায় যেতেন। দ্বিতীয় সাজদায়ও প্রথম সাজদার অনুরূপ করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় সাজদা শেষ করে 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠে দাঁড়াতেন।

দাঁড়াবার মুহূর্তে তিনি দু' হাতে দু' পা ও হাঁটু ধরে উরুর উপর ভর করে দাঁড়াতেন। তাঁর এ আমল বর্ণিত হয়েছে ওয়ায়েল ইবনু হুজর এবং আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে।

তিনি হাত জমিনে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন না।

দ্বিতীয় রাকাত কিভাবে আদায় করতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম রাকাতের সাজদা থেকে উঠে দাঁড়িয়েই সূরা ফাতিহা পাঠ করা শুরু করতেন। দাঁড়ানোর পর প্রথম রাকাতের মতো একটু থামতেন না, বা কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন না।

তবে দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পূর্বে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পড়তেন কি না- সে বিষয়ে ফকীহগণের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

www.waytojannah.com

Contents

অবশ্য, তাঁরা সবাই এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এটা নামাজের শুরু নয়, মধ্যবর্তী একটি জায়গা।

এখানে 'তায়াউয' পড়া না পড়ার ব্যাপারে দুটি মত সৃষ্টি হয়েছে ইমাম আহমাদের দুটি কথা থেকে। তাঁর একদল ছাত্র তাঁর একটি মতের ভিত্তিতে বলেছেন, নামাজের গোটা কিরাতকে যদি একটি কিরাতের সমষ্টি ধরা হয়, তা হলে একবার 'তায়াউয' পড়াই যথেষ্ট। আর যদি প্রত্যেক রাকাতের কিরাতকে স্বতন্ত্র কিরাত ধরা হয়, তবে প্রত্যেক ফাতিহাতেই তায়াউয পড়তে হবে।

আসলে এক তাকবীরে তাহরীমার অধীন নামাজ সমষ্টির সূচনা তো একটিই। কাজেই একথা পরিষ্কার, সূচনাতে একবার 'তায়াউয' পড়াই যথেষ্ট। সহীহ হাদিস থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন: রাসূল ﷺ যখন দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়াতেন, তখন না থেমেই কিরাত শুরু করতেন।

আসলে রাকাতসমূহের সূচনা প্রথম রাকাতেই হয়। দুই রাকাতের মাঝখানে যে বিঘ্ন ঘটে, তা বিরতির কারণে ঘটেনা, ঘটে যিকর-এর কারণে। আর যিকর কিরাতের ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটায় না। কারণ তাতে তো হামদ, তাসবীহ, তাহলীল, সালাত আলান্নাবী এবং অনুরূপ অন্যান্য কথাই উচ্চারণ করা হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ চারটি বিষয় ছাড়া দ্বিতীয় রাকাত প্রথম রাকাতের মতোই পড়তেন। সে চারটি বিষয় হলো:

১. তাকবীরে তাহরীমা।
২. তাকবীরে তাহরীমার পরে কিছুক্ষণ নীরব থাকা।
৩. ঐ নীরব থাকার সময় প্রারম্ভিক হামদ ও দু'আ পাঠ।
৪. এবং দ্বিতীয় রাকাতের তুলনায় কিছুটা দীর্ঘ করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করতেন না, কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন না, নীরব থাকার সময় প্রারম্ভিক যিকর ও দু'আ পাঠ করতেন না। তাছাড়া প্রথম রাকাতের তুলনায় কিছুটা সংক্ষেপ করতেন। তাঁর প্রত্যেক নামাজেই দ্বিতীয় রাকাতের তুলনায় প্রথম রাকাত দীর্ঘ হতো।

প্রথম তাশাহ্হুদের বৈঠক ও প্রাসঙ্গিক কর্মপদ্ধতি

দ্বিতীয় রাকাতের উভয় সাজদা শেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাশাহ্হুদের জন্যে বসতেন, তখন বাম উরুর উপর বাম হাত এবং ডান উরুর উপর ডান হাত রাখতেন। ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কিবলার দিকে ইঙ্গিত করতে থাকতেন। এসময় আঙ্গুলটি পুরোপুরি দাঁড় করাতেন না, আবার নিচু করেও রাখতন না, বরং উপরের দিকে ঈষৎ উঠিয়ে রাখতেন এবং নাড়াতে থাকতেন। বুড়ো আঙ্গুল মধ্যমার উপর রেখে তাকে বৃত্তের মতো বানাতেন আর শাহাদাত আঙ্গুল (তর্জনি) উঁচিয়ে তাশাহ্হুদ পড়তে থাকতেন এবং সেটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখতেন। এসময় বাম উরুর উপর বাম হাত বিছিয়ে রাখতেন।

দুই সাজাদার মাঝখানে তিনি যেভাবে বসতেন, তাশাহ্হুদের বৈঠকেও (প্রথম বৈঠকে) সেভাবে বসতেন। বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার উপর বসতেন। ডান পায়ের পাতা খাড়া করে রাখতেন এবং আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে দিতেন। এ বৈঠকে এর ব্যতিক্রম বসতে কেউ তাঁকে দেখেনি।

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা)-এর যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে আছে: রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজে বসতেন, তখন তাঁর বাম পায়ের পাতা তাঁর উরু ও জঙ্ঘার মাঝে রাখতেন এবং ডান পায়ের পাতা বিছিয়ে দিতেন।

www.waytojannah.com

Contents

- আসলে এ বর্ণনাটি শেষ বৈঠক সংক্রান্ত। এ প্রসঙ্গ নিয়ে সামনে আলোচনা করা হবে। তাঁর দুইটি বৈঠকের একটির বৈশিষ্ট্য হলো এ রকম।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুমাইদ (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজের যে পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে: রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (চার রাকাতের) নামাজে দ্বিতীয় রাকাতের পর প্রথম তাশাহ্হুদের জন্য বসতেন, তখন তিনি বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন এবং অন্য পায়ের (ডান পায়ের) পাতা খাড়া করে রাখতেন। আর যখন শেষ বৈঠকে বসতেন, তখন বাম পায়ের পাতা একটু সামনে এগিয়ে নিয়ে ডান পায়ের জঙ্ঘার (নলার) নিচে রাখতেন। ডান পায়ের পাতা খাড়া করে রাখতেন এবং নিতম্ব জমিনে স্থাপন করে নিতম্বের উপর বসতেন।

এখানে আবু হুমাইদ এবং আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর এই দুইজন থেকে ডান পা সম্পর্কে দুটি বিবরণ পাওয়া যায়। আবু হুমাইদ বলেছেন, ডান পা খাড়া করে রাখতেন আর ইবনুয যুবাইর বলেছেন, বিছিয়ে দিতেন।

কোনো বর্ণনাকারীই একথা বলেননি যে, তিনি প্রথম তাশাহ্হুদের বৈঠকে এরকম করতেন। এরকম কেউ বলেছেন বলে আমরা জানি না।

তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বসা সম্পর্কে বর্ণনার তারতম্যের কারণে লোকদের মাঝে কয়েক প্রকার মতামত সৃষ্টি হয়েছে। যেমন: কেউ কেউ উভয় তাশাহ্হুদেই নিতম্বের উপর বসার কথা বলেছেন। এ হল মালিক (র)-এর মযহাব।

- অনেকে বলেছেন, উভয় বৈঠকেই বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা খাড়া করে রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। এটি আবূ হানীফা (র)-এর মত।

- আবার অনেকে বলেছেন, সালামওয়ালা তাশাহ্হুদের বৈঠকে নিতম্বের উপর বসবে, অন্য তাশাহ্হুদে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে। এ হচ্ছে শাফেয়ী (র)-এর মত।

- আবার অনেকে বলেছেন, দুই তাশাহ্হুদওয়ালা নামাজের শেষ তাশাহ্হুদের বৈঠকে নিতম্বের উপর বসতে হবে- উভয় বৈঠকের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য। এ হচ্ছে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (র)-এর মত।

আর আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) যে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ডান পা বিছিয়ে দিতেন, তার অর্থ হলো, তিনি শেষ বৈঠকে তাঁর নিতম্ব জমিনে স্থাপন করে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসতেন। ফলে ডান পা বিছিয়ে দিতেন। বাম পা দুই উরু ও জঙ্ঘার মাঝখানে রাখতেন এবং জমিনে নিতম্ব রাখতেন।

এ ক্ষেত্রে মতভেদ করা হয়েছে এই নিয়ে যে, এ সময় ডান পায়ের পাতা কোথায় কিভাবে রাখতেন? তা কি বিছিয়ে দিতেন, নাকি খাড়া করে রাখতেন?

প্রকৃত ব্যাপারটি আল্লাহই ভালো জানেন। তবে, আমাদের মতে এখানে পার্থক্যের কিছু দেখা যায় না। কারণ তিনি কখনো ডান পায়ে বসতেন না। বরং তা ডানদিকে বিছিয়ে দিতেন। ফলে তা না খাড়া থাকত, আর না পুরোপুরি বিছানো থাকত। এমতাবস্থায় বিছিয়ে দেয়ার অর্থ ডান পায়ের পাতার উল্টা পিঠ বিছিয়ে দিতেন, ফলে তা পুরোপুরি দাঁড়ানো থাকত না। দাঁড় করানোর অর্থ পায়ের পাতার নিচের দিক দাঁড় করানো, কারণ এমতাবস্থায় তা বিছানো থাকত না এবং তিনি তাতে বসতেন না।

তাই আবু হুমাইদ ও আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) উভয়ের বক্তব্যই সঠিক।

অথবা বলা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো এ-রকম করতেন, আবার কখনো ও-রকম করতেন। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

www.waytojannah.com

Contents

প্রথম তাশাহ্হুদে কী পড়তেন

চার বা তিন রাকাতের নামাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাকাত পড়ে বসতেন। এটাকেই আমরা প্রথম তাশাহ্হুদের বৈঠক বলেছি। এ বৈঠকে তিনি সবসময় তাশাহ্হুদ পড়তেন।

নাসায়ীতে আবূয্ যুবাইরের সূত্রে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি জাবির (রা) থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। জাবির (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের মতোই আমাদের তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নরূপ তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন:

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

উচ্চারণ: আত্তাহীইয়্যাতু লিল্লা-হি ওয়াস্ সালাওয়া-তু ওয়াত্তাইয়িবা-তু, আস্ সালা-মু 'আলান নাবিইয়ী, ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ। আস্ সালা-মু 'আলাইনা- ওয়া 'আলা- 'ইবা-দিল্লা-হিস সা-লিহীন, আশ্হাদু আল লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ: মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় দাসত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য খাসভাবে নির্ধারিত। নাবীর প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রাহমাত ও বারাকাত বর্ষিত হোক এবং আমাদের প্রতি ও আল্লাহর সমস্ত নেক বান্দার প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই এবং এ কথারও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহরই বান্দা ও তাঁর রাসূল। (বুখারী ও মুসলিম)

নাসায়ীতে জাবির (রা)-এর হাদিসে নিম্নরূপ তাশাহ্হুদের কথা বর্ণিত হয়েছে:

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ.

অর্থ: বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি, সকল সম্মানজনক সম্বোধন আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ্ই সমস্ত শান্তি, কল্যাণ, প্রাচুর্য ও সর্বপ্রকার পবিত্রতার মালিক। হে নাবী, আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহ্র রাহমাত ও বারকাত নাযিল হোক। আমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্র সব নেক বান্দাহর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র দাস ও রাসূল। আমি আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এই হাদিসটি ছাড়া আর কোনো হাদিসে তাশাহ্হুদের পূর্বে 'বিসমিল্লাহ্'-র উল্লেখ হয়নি। অবশ্য এ হাদিসটির সনদে (বর্ণনা সূত্রে) কিছুটা ত্রুটি রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই তাশাহ্হুদটি (প্রথম তাশাহ্হুদ) খুবই সংক্ষেপে করতেন।

তিনি এই তাশাহ্হুদে কবর আযাব, জাহান্নামের আযাব, জীবদ্দশা ও মৃত্যুকালীন ফিতনা এবং মসীহে দাজ্জালের ফিতনা থেকেও আশ্রয় চাইতেন না। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক সাধারণভাবে সব সময় এই চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলার কারণে কেউ কেউ প্রথম তাশাহ্হুদেও এগুলো থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পছন্দ করেন। তবে এই আশ্রয় প্রার্থনা শেষ তাশাহ্হুদের সঙ্গেই অধিকতর সহীহ্।

www.waytojannah.com

Contents

প্রথম তাশাহ্হুদের বৈঠক থেকে দাঁড়ানো

তাশাহ্হুদ শেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠে দাঁড়াতেন। তিনি পায়ের পাতার বুক এবং হাঁটু জমিনে ঠেকিয়ে দুই উরুতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসময় 'রফে ইয়াদাইন' করতেন।

বুখারীতেও কোনো কোনো সূত্রে একথাটি বর্ণিত হয়েছে। তবে আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা)-এর সব সূত্রের বর্ণনায় সর্বসম্মতভাবে এখানে রফে ইয়াদাইনের কথা উল্লেখ নেই।

অবশ্য আবু হুমায়েদ আস্ সায়িদীর বর্ণনা থেকে অকাট্যভাবে এখানে রফে ইয়াদাইনের কথা প্রমাণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজের জন্য দাঁড়াতেন, আল্লাহু আকবার (অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা) বলতেন এবং 'রফে ইয়াদাইন' করতেন। এ সময় দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। তিনি নামাজে এমনভাবে দাঁড়াতেন যে, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ স্ব স্ব স্থানে প্রশান্তির সাথে প্রতিষ্ঠিত হতো। তারপর কিরাত পাঠ করতেন। কিরাত শেষে দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে 'রফে ইয়াদাইন' করতেন। তারপর রুকূ করতেন। হাতের আঙ্গুলগুলো হাঁটুতে রাখতেন স্বাভাবিকভাবে। মাথা পিঠ বরাবর রাখতেন। মাথা বরাবরের চেয়ে ঝুঁকিয়েও রাখতেন না, উঠিয়েও রাখতেন না। অতঃপর 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে মাথা উঠাতেন। এসময় 'রফে ইয়াদাইন' করতেন। হাতগুলো কাঁধ বরাবর উঠাতেন। রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে প্রশান্তির সঙ্গে দাঁড়াতেন, এমনকি শরীরের প্রতিটি অঙ্গ স্ব স্ব স্থানে বহাল হতো। এরপর সাজদার জন্য জমিনের দিকে ঝুঁকে পড়তেন। সাজদার সময় দুই বাহু পাঁজর থেকে দূরে রাখতেন। পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে মুড়িয়ে (কিবলামুখী) রাখতেন। তারপর দুই পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন।[৬] অতঃপর দ্বিতীয় সাজদায় যেতেন। এরপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ-'আল্লাহু আকবার' বলে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন। প্রশান্তির সঙ্গে বসতেন, এমনকি শরীরের প্রতিটি অঙ্গ স্ব স্ব স্থানে বহাল থাকত। তারপর (দ্বিতীয় রাকাতের জন্য) দাঁড়াতেন। দ্বিতীয় রাকাতের রুকনগুলোও প্রথম রাকাতের মতোই করতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতের তাশাহ্হুদ শেষ করে যখন দাঁড়াতেন, দাঁড়াবার সময় 'রফে ইয়াদাইন' করতেন। 'রফে ইয়াদাইনে' হাতগুলো কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন, যেমনটি করতেন নামাজের শুরুতে। অতঃপর বাকি নামাজ এই একই পদ্ধতিতে পড়তেন। অতঃপর শেষ সাজদায়, যে সাজদার পর সালাম ফিরাতে হয়, দুই পা (ডান দিকে) বের করে দিতেন এবং বাম নিতম্ব জমিনে ঠেকিয়ে তার উপর ভর করে বসতেন।

- এ বর্ণনাটি গ্রহণ করা হয়েছে সহীহ্ আবু হাতিম থেকে।

- সহীহ্ মুসলিমও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তিরমিযীতেও সহীহ্ সূত্রে আলী ইবনু আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব স্থানে 'রফে ইয়াদাইন' করতেন।

---

৬ আবু হুমাইদ (রা)-এর অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, এ সময় বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন।

www.waytojannah.com

Contents

তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে কী পড়তেন?

প্রথম তাশাহ্হুদ থেকে দাঁড়িয়ে তিনি শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন। তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছু পড়েছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই।

অবশ্য ইমাম শাফেয়ী শেষ দু'রাকাতেও সূরা ফাতিহার সাথে কিরাত মিলানোকে মুস্তাহাব মনে করেন। এজন্য তিনি আবু সায়ীদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে সহীহ মুসলিমে। তাতে আবু সায়ীদ (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুহরের কিয়াম থেকে আমরা অনুমান করতাম তিনি প্রথম দুই রাকাতে সূরা 'আস-সাজদার' সমপরিমাণ কিরাত পড়তেন এবং শেষ দুই রাকাতে প্রথম দুই রাকাতের অর্ধেক পরিমাণ পড়তেন।[7] তাছাড়া আমরা তাঁর আসরের নামাজের কিয়াম থেকে অনুমান করতাম, তিনি আসরের প্রথম দুই রাকাতে তার অর্ধেক পরিমাণ পড়তেন। (মুসলিম)

অন্যদিকে একটি সুস্পষ্ট ও সর্বজন স্বীকৃত হাদিস হচ্ছে আবু কাতাদা (রা) বর্ণিত হাদিস। এ হাদিসে পরিষ্কারভাবে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষ দু'রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন, সাথে অন্য কিরাত মিলাতেন না। আবূ কাতাদা (রা) বলেন:

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে নামাজ পড়তেন। তিনি যুহর এবং আসরের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে আরো দু'টি সূরা মিলিয়ে পড়তেন। কখনো কখনো আমাদের শুনিয়ে পড়তেন।"

- বুখারী ও মুসলিম উভয়ের বর্ণনায়ই একথাগুলো আছে। মুসলিমে এই আবু কাতাদার হাদিসে অতিরিক্ত একথাগুলোও আছে: "এবং শেষ দুই রাকাতে তিনি শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন।"

বুখারী ও মুসলিমে আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত এই হাদিস দু'টি থেকে এ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে স্পষ্ট ও অকাট্য নির্দেশনা পাওয়া যায়।

অপরদিকে এক্ষেত্রে আবু সাঈদ (রা)-এর বক্তব্য অনুমানভিত্তিক।

এক্ষেত্রে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, রাসূল ﷺ-এর সাধারণ রীতি ছিল তিনি শেষ দুই রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন, সেই সঙ্গে আর কোনো সূরা কিরাত মিলাতেন না। -এর দলিল আবূ কাতাদার হাদিস।

তবে কখনো কখনো শেষ দুই রাকাতেও সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা-কিরাত মিলাতেন, এর দলিল আবু সাঈদ (রা)-এর হাদিস। তবে এমনটি করা তাঁর সাধারণ নিয়ম ছিল না। এটা ছিলো তাঁর সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম কাজ।

নামাজে তাঁর রীতি এবং কোন সময়ে এর ব্যতিক্রম

বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি কখনো কখনো সাধারণ রীতির ব্যতিক্রমও করতেন। যেমন ফজর নামাজে দীর্ঘ কিরাত পড়া ছিল তাঁর সাধারণ রীতি। কিন্তু কখনো কখনো হালকা কিরাতও পড়তেন। মাগরিব নামাজে তাঁর রীতি ছিল ছোট কিরাত পড়া, কিন্তু কখনো কখনো দীর্ঘ কিরাতও পড়তেন। তাঁর সাধারণ রীতি ছিল ফজর নামাজে দু'আ কুনূত না পড়া, কিন্তু কখনো কখনো পড়তেন। তাঁর সাধারণ রীতি ছিলো যুহর ও

---

7 উল্লেখ্য সূরা আস সাজদার আয়াত সংখ্যা ৩০ (ত্রিশটি)। সুতরাং এই হাদিসের বক্তব্য হলো, প্রথম দুই রাকাতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ এবং শেষ দুই রাকাতে পনের আয়াত পরিমাণ পড়তেন।

www.waytojannah.com

Contents

আসরের নামাজে নিঃশব্দে কিরাত পড়া, কিন্তু কখনো কখনো সাহাবায়ে কিরাম তাঁর কিরাত শুনতেন। সাধারণত তিনি 'বিস্‌মিল্লাহ' নিঃশব্দে পড়তেন কিন্তু কখনো কখনো শব্দ করে পড়তেন।

মোটকথা, রাসূল ﷺ তাঁর নামাজের কোনো কোনো পদ্ধতিতে মাঝে মধ্যে ব্যতিক্রম করতেন। সেটা হতো তাঁর সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম এবং সাময়িক। উদ্দেশ্য ছিলো মাঝে মধ্যে ব্যতিক্রম করার অবকাশ রাখা। কিন্তু এই অবকাশটা তাঁর রীতি ছিল না।

যেমন, একবার তিনি এক ব্যক্তিকে ঘোড়ায় করে একটি বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করে আনতে পাঠান। তাকে পাঠাবার পর তিনি নামাজে দাঁড়ান। নামাজের মধ্যে তিনি বারবার ঐ ব্যক্তির পথ পানে তাকাচ্ছিলেন।

অথচ সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রা) থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে নামাজের মধ্যে এদিক সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন: এটা শয়তানের প্রতারণা। সে এভাবে প্রতারণা করে বান্দাকে নামাজ থেকে অমনোযোগী করতে চায়।

কুরআন-হাদিস সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন, এমন ব্যক্তির পক্ষে এ দুটি হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা মোটেও কঠিন ব্যাপার নয়। তিনি নামাজের মধ্যে আল্লাহর ব্যাপারে কখনো অমনোযোগী হতেন না। ঘোড় সাওয়ার সংবাদ বাহকের হাদিসটি যুদ্ধাবস্থার সঙ্গে জড়িত। রনাঙ্গণে প্রায়ই তিনি 'সালাতুল খাউফ' পড়তেন। মুসলমানদের কল্যাণের জন্যই তিনি ঐ নামাজে প্রতীক্ষিত সংবাদবাহকের আগমন পথে তাকাচ্ছিলেন। এটা তাঁর সাধারণ রীতি ছিল না।

প্রথম দুই রাকাত এবং প্রথম রাকাত লম্বা করা প্রসঙ্গ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতি ছিল, তিনি চার রাকাতের নামাজে শেষ দুই রাকাতের চেয়ে প্রথম দুই রাকাত লম্বা করতেন। আবার প্রথম দুই রাকাতে দ্বিতীয় রাকাতের চেয়ে প্রথম রাকাত লম্বা করতেন। এ কারণেই সাআদ (রা) উমার (রা)-কে বলেছিলেন: আমি প্রথম দুই রাকাত লম্বা করব এবং শেষের দুই রাকাত হ্রস্ব করব। রাসূল ﷺ-এর সাথে আমি এভাবেই নামাজ পড়েছি।

রাসূল ﷺ-এর রীতি ছিল, তিনি অন্যসব নামাজের চেয়ে ফজর নামাজ দীর্ঘ করতেন। উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা) বর্ণনা করেছেন: প্রথমত আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নামাজই দুই দুই রাকাত করে ফরয করেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হিজরত করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা মুকীম অবস্থায় ফজর ছাড়া অন্যান্য নামাজ (দুই রাকাত) বৃদ্ধি করে দিলেন। দীর্ঘ কিরাতের কারণে ফজর নামাজকে পূর্বাবস্থায় (অর্থাৎ দুই রাকাত) রাখলেন। আর মাগরিবকে দিনের 'বিতর' হিসেবে তিন রাকাত রাখলেন।"

- এ হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু হাতিম এবং ইবনু হিব্বান তাঁদের সহীহ সংকলনে। হাদীসটির মূল বক্তব্য সহীহ বুখারীতেও বর্ণিত হয়েছে।

সকল নামাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই রীতি ছিল যে, তিনি শেষ অংশের তুলনায় প্রথমাংশ দীর্ঘ করতেন।

- সূর্য গ্রহণের নামাজও তিনি এভাবেই পড়তেন।

- রাতের নামাজও তিনি এভাবেই পড়তেন। তবে রাতের নামাজ যেহেতু তিনি দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়তেন, সে জন্য প্রথম দুই রাকাত অধিক লম্বা করতেন। পরের দুই রাকাত তার তুলনায় কম লম্বা করতেন। এভাবেই সামনের দিকে এগুতেন এবং শেষ করতেন। আর তিনি যে রাতের প্রথম

www.waytojannah.com

Contents

দুই রাকাত খাটো করে পড়তে বলেছেন, সেটা তাঁর এ রীতির খেলাফ নয়। কারণ ঐ দু'রাকাত রাতের নামাজসমূহের উদ্বোধনী নামাজ। উদ্বোধনী দুই রাকাত তিনি ছোটই করতেন, যেমন ফজরের সুন্নত দুই রাকাত ফরয দুই রাকাতের তুলনায় ছোট করতেন। কারণ এ দুই রাকাত ছিল ফজরের উদ্বোধনী নামাজ।

তাই এই ছোট দুই রাকাতের ফলে রাতের নামাজ দীর্ঘ করার রীতির ব্যত্যয় ঘটে না। যেমন, তিনি ﷺ বলেছেন: 'বিতরকে রাতের শেষ নামাজ বানাও।' অথচ তিনি প্রায়ই বিতরের পরপর বসে বা দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। এতে বিতর রাতের শেষ নামাজ হবার ক্ষেত্রে কোনো ব্যাঘাত ঘটে না।

আবার দেখুন, তিনি ﷺ মাগরিবকে দিনের বিতর বলেছেন, কিন্তু মাগরিবের পরপরই শাফায়াত লাভের উদ্দেশ্যে দুই রাকাত সুন্নত নামাজ পড়তে বলেছেন। এর ফলে মাগরিব দিনের বিতর হবার ক্ষেত্রে কোনো ব্যত্যয় ঘটে না।

আসলে তিনি ﷺ মাগরিবের ফরযের পর দুই রাকাত পড়তেন ফরযকে হিফাযত করার উদ্দেশ্যে। রাতের শেষ নামাজ বিতরের পরে দুই রাকাত পড়তেন ঐ বিতরকে হিফাযত করার জন্য। এটা সাধারণ কতা যে, সাহায্যকারী বা হিফাযতকারী নামাজ মূল নামাজের বৈশিষ্ট্যের ব্যত্যয় ঘটায় না। একথা সকল ব্যাপারেই প্রযোজ্য।

শেষ তাশাহ্হুদের বৈঠক

- রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শেষ তাশাহ্হুদের জন্য বসতেন, তখন (বাম) নিতম্ব জমিনে রেখে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসতেন এবং দুই পা একদিকে (ডান দিকে) বের করে দিতেন।

- নিতম্বের উপর ভর করে বসার ক্ষেত্রে যে তিন প্রকার পদ্ধতি তাঁর ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, এটা তন্মধ্যে একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিটি বর্ণিত হয়েছে সুনানে আবু দাউদে এবং আবু হাতিম-এর সহীহ সংকলনে আবু হুমাইদ আস-সায়িদী (রা) থেকে।

- দ্বিতীয় পদ্ধতিটি বর্ণিত হয়েছে সহীহ্ বুখারীতে সেই আবু হুমাইদ আস-সাঈদী (রা) থেকেই। তিনি বলেন: রাসূল ﷺ যখন শেষ রাকাতে বসতেন, তখন বাম পা একটু সামনে এগিয়ে নিতেন, ডান পা খাড়া করে রাখতেন এবং নিতম্বের উপর বসতেন।

- এ পদ্ধতিটি প্রায় প্রথম পদ্ধতির মতোই। উভয় ক্ষেত্রেই নিতম্বের উপর বসার কথা রয়েছে। তবে এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য শুধু পা রাখার ক্ষেত্রে।

- তৃতীয় পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইরের হাদিসে। ইবনুয যুবাইর (রা) বলেন: এসময় রাসূল ﷺ তাঁর বাম পা উরু ও ডান জঙ্ঘার মাঝখানে রাখতেন এবং ডান পায়ের পাতা বিছিয়ে দিতেন।'

- আবুল কাসেম হারবী তাঁর গ্রন্থে এ পদ্ধতিকে সমর্থন করেছেন। পা রাখার ক্ষেত্রে প্রথম দুই পদ্ধতি থেকে এ পদ্ধতির পার্থক্য রয়েছে। হয়তো-বা রাসূল ﷺ কখনো এ রকম করতেন। আবার কখনো ওরকম করতেন। স্পষ্টত এটিই মনে হয়। অথবা বর্ণনাগত কারণেও এ তারতম্য সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

- রাসূল ﷺ প্রথম তাশাহ্হুদের বৈঠক এবং শেষ তাশাহ্হুদের বৈঠকের মধ্যে পার্থক্য করতেন। শেষ বৈঠকে তিনি নিতম্বের উপর বসতেন। প্রথম বৈঠকে বাম পায়ের পাতার উপর বসতেন।

www.waytojannah.com

Contents

- ইমাম আহমাদ বলেছেন, প্রথম বৈঠক এবং শেষ বৈঠকের মধ্যে পার্থক্য করার উদ্দেশ্যেই তিনি এমনটি করতেন। প্রথম বৈঠকের পর আবার উঠে দাঁড়াতে হবে বলে তিনি পায়ের পাতার উপর বসে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। আর শেষ বৈঠকের পর দাঁড়াবার প্রস্তুতি থাকে না বলে, সে বৈঠকে এতমীনান ও প্রশান্তির সাথে বসতেন। শেষ তাশাহ্হুদের মাধ্যমে নামাজ শেষ হচ্ছে বলেই প্রশান্তির সাথে নিতম্বের উপর গোটা দেহ ভর করে বসতেন।

- আবু হুমাইদ (রা) রাসূল ﷺ-এর প্রথম বৈঠক এবং শেষ বৈঠকের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর শেষ বৈঠক বুঝাবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বর্ণনায় এভাবে শব্দ প্রয়োগ করেছেন:

- "যখন তিনি শেষ রাকাতে বসতেন।"

- "যখন তিনি চতুর্থ রাকাতে বসতেন।"

- "যখন তিনি সালামের বৈঠকে বসতেন, তখন দুই পা বের করে দিতেন এবং নিতম্বের উপর ভর করে বসতেন।"

- এই শেষ বাক্যটি থেকে ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ এই দলিলও গ্রহণ করেছেন যে, সালামের বৈঠক হলেই দুই পা বের করে নিতম্ব মাটিতে রেখে নিতম্বের উপর ভর করে বসতে হবে, চাই সেটা চার রাকাতী নামাজ হোক, কিংবা দুই রাকাতী, অথবা তিন রাকাতী।

- তবে হাদিসের প্রকাশ্য ভাষা থেকে এমনটি বুঝা যায় না, আবার হাদিসের বক্তব্য থেকে এভাবে প্রকাশ পায়।

- হাদিসে বাহ্য বক্তব্য তো প্রথম বৈঠকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর এটাকে দ্বিতীয় বৈঠক বা সালামের বৈঠক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং হাদিসের বাহ্য বক্তব্য থেকে এটা তিন রাকাতী বা চার রাকাতী নামাজের শেষ বা দ্বিতীয় বৈঠকের বৈশিষ্ট্য বলেই প্রমাণিত হয়।

এ তো গেলো এ বৈঠকের একদিক। অপরদিকে তিনি যখন তাশাহ্হুদের উদ্দেশ্যে বসতেন, তখন ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন এবং তিন আঙ্গুল মিলিয়ে রেখে শাহাদাত আঙ্গুল খাড়া করতেন। অপর বর্ণনায় এসেছে, তখন তিন আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে শাহাদাত আঙ্গুল খাড়া করতেন। আর বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন। [সহীহ মুসলিম: ইবনু উমার (রা)]

এদিকে ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রা) বর্ণনা করেছেন: আমি দেখেছি রাসূল ﷺ তাশাহ্হুদের বৈঠকে বসে বাম হাত বাম উরুর উপর বিছিয়ে রেখেছেন। ডান হাতের কনুই ডান উরুর উপর বিছিয়ে রেখেছেন এবং দুটি আঙ্গুলের একটি দিয়ে আরেকটিকে চেপে ধরে একটি কুণ্ডলীর ন্যায় পাকানো এবং শাহাদাত আঙ্গুল খাড়া করে সেটি নাড়াতে থাকেন ও দু'আ করতে থাকেন। [আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী: ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রা)]

সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা)-এর বর্ণনায় আছে: "তিনি বাম হাত বাম হাঁটুর উপর রাখতেন এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন। এ সময় তিনি তিপ্পান্ন বুঝানোর জন্য আঙ্গুল যেভাবে জুড়ে নেয়া হয়, সেভাবে জুড়ে নিতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।"

- আসলে এই সবগুলো বর্ণনাই এক। যেমন:

www.waytojannah.com

Contents

১. যে বর্ণনায় বলা হয়েছে: তিন আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ রাখতেন; তাতে বুঝানো হয়েছে, মধ্যমাও মিলানো থাকত, তর্জনির (শাহাদাত আঙ্গুলের) মতো সেটি উন্মুক্ত থাকত না।

২. যে বর্ণনায় বলা হয়েছে, দুই আঙ্গুলের একটি দিয়ে আরেকটি চেপে ধরতেন, তাতে বুঝানো হয়েছে, পাশের দুই আঙ্গুল যেভাবে মিলানো থাকত, মধ্যমা সেভাবে বা সেগুলোর বরাবরে মিলানো থাকত না।

৩. আর যে বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিপ্পান্ন বুঝানোর মতো আঙ্গুল জুড়ে নিতেন, সেখানে মধ্যমা জুড়ে নেয়ার কথাই বলা হয়েছে। তবে তা পাশের দুই আঙ্গুলের সঙ্গে নয়, বরং বৃদ্ধাঙ্গুলের সাথে।

- তিনি দুই হাত দুই উরুর উপর বিছিয়ে রাখতেন। উরু এবং হাতের মাঝে ফাঁক রাখতেন না। হাতের কনুই উরুর শেষ প্রান্তের সঙ্গে মিলে থাকতো।

- বাম হাতের আঙ্গুলগুলো বাম উরুর উপর বিছিয়ে রাখতেন।

আঙ্গুল কিবলামুখী রাখতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশাহ্হুদের সময় হাতের আঙ্গুল কিবলামুখী করে রাখতেন। এছাড়াও 'রফে ইয়াদাইন' এবং রুকু ও সাজদার সময় তিনি হাতের আঙ্গুল কিবলামুখী রাখতেন। তিনি সাজদার সময় দুই পায়ের আঙ্গুলও কিবলামুখী করে রাখতেন।

প্রত্যেক বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়তেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম বৈঠকের মতো শেষ বৈঠকেও তাশাহ্হুদ পড়তেন। তিনি দুই রাকাত পরপর তাশাহ্হুদ পড়তেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে কুরআনের সূরার মতো তাশাহ্হুদও শিক্ষা দিতেন। তিনি প্রথম বৈঠকে যেরকম তাশাহ্হুদ পড়তেন, শেষ বৈঠকেও একই রকম তাশাহ্হুদ পড়তেন। তাঁর তাশাহ্হুদের বর্ণনা আমরা আগেই উল্লেখ করে এসেছি।

রাসূলুল্লাহর প্রতি সালাত (দরূদ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন নামাজ পড়ে, সে যেন আল্লাহর হামদ ও ছানা (আল্লাহর প্রশংসা ও মহত্ত্ব) বর্ণনা করে এবং তাঁর নবীর উপর সালাত (দরূদ) পাঠ করে। এরপর যেন যে ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো দু'আ করে।

হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ফুযালা ইবনু উবাইদ। ইমাম তিরমিযি এটিকে সহীহ হাদিস বলেছেন।[৮]

---

৮ অনুরূপ হাদীস মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী এবং আবু দাউদেও বর্ণিত হয়েছে। রাসূল ﷺ তাঁর প্রতি সালাম শেষে দরূদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিস থেকে উভয় তাশাহ্হুদের পরেই দরূদ পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে কেউ কেউ প্রথম তাশাহ্হুদের পরে দরূদ পড়াকে মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু তাদের মতের পক্ষে হাদিসের প্রমাণ নেই।

www.waytojannah.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও নিজের উপর সালাত (দরূদ) পাঠ করতেন। সাহাবাগণকেও শিখিয়ে গেছেন তাঁরা কোন্ ভাষায় তাঁর প্রতি সালাত[9] পাঠ করবে।[10]

নবীর জন্য 'সালাত' পাঠ করা মানে নবীর জন্যে রহমত, সম্মান, মর্যাদা, প্রশংসা ও কল্যাণের দু'আ করা।

তিনি নামাজের ভিতর সাত জায়গায় দু'আ করতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের মধ্যে সাত জায়গায় দু'আ করতেন। সে সাতটি স্থান নিম্নরূপঃ

১. তাকবীরে তাহরীমার পর, নামাজ শুরুর প্রাক্কালে।
২. কিরাত শেষে রুকূতে যাবার পূর্বে বিতর নামাজে এবং সাময়িকভাবে ফজর নামাজে দু'আ কুনূত পড়া। অবশ্য এ স্থানে দু'আ করার বিষয়ে যে হাদিস আছে, তা সহীহ কি-না- সে সম্পর্কে প্রশ্ন আছে।
৩. রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রা) বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন বলতেনঃ

---

9 ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর 'জামউল ইফহাম' গ্রন্থে 'সালাত'-এর অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমাদের দেশে রাসূল ﷺ-এর প্রতি সালাত পাঠ করাকে 'দরূদ' বলা হয়। এটা ফার্সি শব্দ। রাসূল ﷺ উপর সালাত পাঠানোর জন্য দু'আ করা মানে- তার জন্যে রাহমাতের দু'আ করা। আবুল আলিয়াহ (র) বলেছেন, রাসূল ﷺ এর উপর সালাত পাঠানোর জন্য দু'আ করা মানে তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও প্রশংসা বাড়িয়ে দেবার জন্য দু'আ করা।

10 রাসূল ﷺ এর প্রতি কোন্ ভাষার সালাত (দরূদ) পাঠ করতে হবে, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম এখানে তা উল্লেখ করেননি। তাই আমরা হাদিস গ্রন্থাবলী থেকে কতিপয় সালাত (দরূদ) এখানে উল্লেখ করছি:

বুখারী, মুসলিম, তাহাবী, হুমাইদী, বায়হাকি ও নাসায়ীতে বর্ণিত দরূদ (সালাত):

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা সাল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিও ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা 'আলা- ইবরাহীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বারিক 'আলা- মুহাম্মাদিও ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা- বা-রাকতা 'আলা- ইবরাহীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করো, যেরূপ ইবরাহীম এবং তাঁর বংশধরগণের উপর করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ, মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর বারাকাত দান করো যেরূপ ইবরাহীম এবং তাঁর বংশধরগণের উপর করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (বুখারী)

সহীহ মুসলিমে এই দরূদের উল্লেখ রয়েছেঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. [মুসনাদে আহমাদ ও নাসায়ী।]

www.waytojannah.com

Contents

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءِ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءِالأَرْضِ، وَمِلْءِ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اللّٰهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللّٰهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الوَسَخِ،

অর্থ: আল্লাহ তার কথা শুনেন (কবুল করেন), যে তাঁর প্রশংসা করে। হে আমাদের প্রভু, সমস্ত প্রশংসা তোমার, আসমান ভরা প্রশংসা তোমার, যমীন ভরা প্রশংসা তোমার, এ ছাড়াও তুমি যা চাও, তা পূর্ণ করা প্রশংসা তোমার, হে আল্লাহ, আমাকে বরফ, ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধু'য়ে পবিত্র ও পরিষ্কার করে দাও, হে আল্লাহ, আমার গুনাহখাতা থেকে আমাকে পবিত্র করে দাও, যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে ধবধবে পরিষ্কার করা হয়।"

৪. তিনি রুকূর মধ্যেও দু'আ করতেন। বলতেন:

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণ: সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা- ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী।

অর্থ: হে আল্লাহ, হে আমাদের রব, আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি প্রশংসার মাধ্যমে। হে আল্লাহ, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করো। (বুখারী ও মুসলিম)

৫. সাজদায়। সাজদায়ই তিনি বেশি দু'আ করতেন।

৬. দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে।

৭. তাশাহ্হুদের পরে এবং সালামের পূর্বে।

তিনি নিজে এসব স্থানে দু'আ করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামকেও দু'আ করতে বলেছেন।[১১]

সালাম ফিরানোর পূর্বে রাসূলুল্লাহর বিভিন্ন দু'আ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূল ﷺ নামাজের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে দু'আ করতেন। কোন্ স্থানে কি কি দু'আ করতেন তাও কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। তাশাহ্হুদের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে বিভিন্ন দু'আ করেছেন এবং সাহাবাগণকেও বিভিন্ন দু'আ শিখিয়েছেন। এখানে তাঁর কতিপয় দু'আ উল্লেখ করা হলো, যেগুলো বিশেষভাবে তাশাহ্হুদের পরে এবং সালামের পূর্বে পড়তেন: "হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে কবর আযাব থেকে পানাহ্ চাই, মাসীহে দাজ্জালের ফিতনা থেকে পানাহ চাই এবং জীবন কালের ও মৃত্যুর পরের ফিতনা থেকে পানাহ চাই। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে পানাহ চাই পাপ কাজ এবং ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সব সময় এ কয়টি জিনিস থেকে পানাহ্ চাইতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।[১২]

---

[১১] তাশাহ্হুদের পরে এবং সালামের পূর্বে যে সব দু'আ, তন্মধ্যে রাসূল ﷺ উপর সালাত (দরূদ)ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কারণ সালাত (দরূদ)ও এক প্রকার দু'আ।

[12] সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদেরকে তাশাহ্হুদের পরে নিম্নোক্ত ভাষায় চারটি জিনিস থেকে পানাহ চাইতে আদেশ করেছেন–

www.waytojannah.com

Contents

- রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো এই দু'আ করতেন:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا رَزَقْتَنِيْ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার গুণাহ মাফ করে দাও। আমার ঘর আমার জন্য প্রশস্ত করে দাও, আর তুমি আমাকে যে জীবিকাই দান করবে, তাতে কল্যাণ ও প্রাচুর্য দাও।"

কখনো এই দু'আ করতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَ لِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস আলুকাস সাবাতা ফীল আমরি ওয়াল 'আযীমাতা 'আলার রুশদি, ওয়া আস আলুকা শুকরা নি'মাতিকা, ওয়া হুসনা 'ইবাদাতিকা। ওয়া আস আলুকা কালবান সালীমান, ওয়া লিসানান সাদিকান, ওয়া আস আলুকা মিন খাইরি মা- তা'লামু ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররি মা তা'লামু, ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা- তা'লামু।

অর্থ: হে আল্লাহ, তোমার নিকট দীনের কাজের জন্য আমি চাই অনড় অবিচলতা, সৎ পথের দৃঢ় নিষ্ঠা। আর তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এবং সুন্দর সুষ্ঠুভাবে তোমার 'ইবাদাত সম্পন্ন করার তাওফীক। আমি তোমার নিকট আরও চাই নির্ভেজাল প্রশান্ত হৃদয়, সত্যনিষ্ঠ বাকশক্তি, আর প্রার্থনা করি সে মঙ্গলের জন্য যা তুমি আমার জন্য ভাল জান, আর আশ্রয় প্রার্থনা করি সে সব অমঙ্গল থেকে যে সম্পর্কে তুমি সুবিদিত। আর আমি মাগফিরাত চাই সে অন্যায় অপকর্ম হতে যা তুমিই জান।[১৩]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বি জাহান্নামা ওয়া মিন 'আযাবিল কাবর। ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাতি, ওয়া মিন শার্‌রি ফিতনাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জাল।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট জাহান্নাম ও কবরের 'আযাব থেকে বাঁচতে চাই, আর পার্থিব জীবনের ও মৃত্যুর পরের ফিতনা থেকে বাঁচতে চাই এবং মাসীহ্ দাজ্জালের ফিতনা থেকেও বাঁচতে চাই। (বুখারী ও মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ إِلَي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শাররি মা- 'আমিলতু, ওয়া মিন শাররি মা- লাম আ'মাল।

অর্থ: হে আল্লাহ, যে সমস্ত খারাপ কাজ আমি করেছি তা হতে ক্ষমা চাই। আর যে সমস্ত খারাবী করিনি তা থেকেও বাঁচতে চাই। (মুসলিম)

হাদিসে তাশাহ্হুদের পরের আরো বিভিন্ন দু'আ উল্লেখ আছে। তিনি নিজেও বিভিন্ন রকম দু'আ করেছেন সাহাবাগণকেও শিখিয়েছেন, আবার কোনো সাহাবীর নিজস্ব দু'আও সমর্থন করেছেন। আমরা পাঠকের সুবিধা বিবেচনা করে টীকায় আরো কয়েকটি দু'আ উল্লেখ করছি:

নাসায়ী এবং মুসতাদরাকে হাকিমে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে এই দু'আ পড়তেন বলে উল্লেখ হয়েছে:

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَ قُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِيْ وَ تَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِيْ.

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ

www.waytojannah.com

Contents

নামাজের সাত স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব দু'আ, যিকর ও তাসবীহ করতেন, যথাস্থানে আমরা সহীহ হাদিসের আলোকে সেসব দু'আ যিকর ও তাসবীহ উল্লেখ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাজদায় যেসব দু'আ করতেন, সেগুলো যদিও আমরা আগেই উল্লেখ করে এসেছি, তবু সাজদায় পঠিত তাঁর আরেকটি দু'আ এখানে উল্লেখ করে দিচ্ছি:

رَبِّ اعْطِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا.

অর্থ: আমার প্রভু, আমাকে আমার নফসে তাকওয়া দান করো এবং আমার নফস্‌কে পরিশুদ্ধ করো, তুমিই নফসের সর্বোত্তম পবিত্রতাদানকারী আর তুমিই তো তার অভিভাবক।

وَالْغِنَى وَاَسْاَلُكَ نَعِيْمًا لاَ يَنْفَدُ وَاَسْاَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ وَاَسْاَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَاَسْاَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاَسْاَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَالشَّوْقَ اِلَى لِقَائِكَ من غَيْرِ ضَرَّاءِ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা বি'ইলমিকাল গায়বি, ওয়া কুদরাতিকা 'আলাল খালকি, আহ্‌য়িনী মা- 'আলিমতাল হায়া-তা ওয়া খাইরাল্ লী, ওয়া তাওয়াফফানী ইযা- 'আলিমতাল ওয়াফাতা খাইরাল্ লী। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস আলুকা খাশ্‌ইয়াতাকা ফিল গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাতি, ওয়া আস আলুকা কালিমাতাল হাককি ফিল গাযাবি ওয়ার রিযা, ওয়া আস আলুকাল কাসদা ফিল ফাক্‌রী ওয়াল গিনা, ওয়া আস আলুকা তা'ঈমাল্ লা- ইয়ান ফাযু ওয়া আস আলুকা কুর্‌রাতা 'আইনিল লা- তানকাতি'উ ওয়া আস আলুকার রিযা- বা'দাল কাযা-য়ি ওয়া আস আলুকা বারদাল 'আইশি বা'দাল মাওতি, ওয়া আস আলুকা লায্‌যাতান নায্‌রি ইলা ওয়াজহিকাল কারীম, ওয়াশ্ শাওকা ইলা লিকায়িকা মিন গাইরি যাররায়িন মুয্‌রিরাতি, ওয়ালা- ফিতনাতিম্ মুযিল্লাহ, আল্লা-হুম্মা যাইয়্যিনা- বিযীনাতিল ঈমান, ওয়াজ 'আলনা-হুদা-তাম মুহ্‌তাদীন।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার গাইব জানা এবং সৃষ্টির উপর ক্ষমতাবান হবার দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আমাকে ততদিন জীবিত রেখো যতদিন তা আমার জন্য মঙ্গলজনক হয় এবং আমাকে মৃত্যু দান করো যখন তা আমার জন্য কল্যাণকর বলে তুমি মনে কর। হে আল্লাহ, তোমার কাছে চাই তোমার প্রতি গোপন ও প্রকাশ্য ভয় এবং সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির উভয় সময়ে সৎ কথা বলার সৎ সাহস। হে আল্লাহ, অভাব ও প্রাচুর্যতার উভয় সময়ে মধ্য পন্থা অবলম্বন করার জন্য তোমার কাছে তাওফীক কামনা করছি। আর তোমার নিকট চাই এমন নি'আমাত যা কখনও নিঃশেষ হবে না। আরও চাই তোমার দেয়া তাকদীরের উপর সন্তুষ্টি। তোমার নিকট আরও চাই চোখ জুড়ানো জিনিস যা কখনও হাত ছাড়া হবে না। হে আল্লাহ, তোমার কাছে চাই, তোমার প্রতি রাযি খুশি থাকার মন মানসিকতা এবং মৃত্যুর পর উত্তম জীবন। আরও চাই (জান্নাতে) তোমাকে দেখতে পাওয়ার চোখ জুড়ানো স্বাদ আর তোমার সাক্ষাৎ লাভের কামনা (মৃত্যুর সময় মৃত্যু কামনা) করছি যেন ঐ সময় কোন ফিত্‌না ও গুমরাহীতে পতিত না হই। হে আল্লাহ, আমাদের অন্তরে ঈমানকে সুশোভিত কর এবং নিজে যেন হিদায়াতপ্রাপ্ত হই এবং অপরের জন্য হিদায়াতকারী হই। (নাসায়ী)

- বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা)-কে নামাজে নিম্নোক্ত দু'আ করতে বলেছেন:

اَللّٰهُمَّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; বুখারী হা. ৮৩৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৬৭৭]

- রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা)-কে নামাজে এই দু'আ করতে শিখিয়েছেন:

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার হিসাব নিয়ো সহজ করে। (মুসনাদে আহমাদ, হাকিম) –*অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

Contents

ইমাম একবচনে নাকি বহুবচনে দু'আ করবে

রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে যত দু'আ করেছেন বলে হাদিসে উল্লেখ ও সংরক্ষিত হয়েছে, তা সবই একবচনে, অর্থাৎ তিনি নিজের জন্যে দু'আ করেছেন। এমনকি সাহাবাগণকে নামাজে যেসব দু'আ করতে শিখিয়েছেন, সেগুলোও এক বচনে। যেমন, তিনি নামাজে এভাবে (নিজের জন্যে একবচনে) দু'আ করতেন:

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ.

অর্থ: হে আমার প্রভু, আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি রহম করো এবং আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো।

সব দু'আই তিনি এভাবে একবচনে করতেন। নামাজের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার পর প্রথম দু'আ করতেন। তাও একবচনেই এভাবেই করতেন:

اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَرَدِ. اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.....

অর্থ: হে আল্লাহ, বরফ, ঠাণ্ডাবস্তু এবং ঠাণ্ডা পানি দিয়ে আমার গুনাহ-খাতা ধুয়ে মুছে আমাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দাও। হে আল্লাহ, আমার ও আমার গুনাহ-খাতার মাঝে সেরকম দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছ উদয়াচল আর অস্তাচলের মাঝে।..... (পুরো হাদিসটিই এভাবে একবচন)।

এখন এ বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি করেছে একটি হাদিস। হাদিসটি মুসনাদে আহমাদ এবং সুনান গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে সাওবান (রা) থেকে। তিনি বলেন, নাবী করীম ﷺ বলেছেন:

"কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কওমের ইমাম (নেতা) হয়, আর দু'আ করার সময় যদি কেবল নিজের জন্যই দু'আ করে, তবে সে খিয়ানত করে।"

ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহ হাদিস সংকলনে এই হাদিসটিকে মওজু হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সহীহ সূত্রে বর্ণিত-

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ .....

- হাদিসটিকে নামাজে একবচনে নিজের জন্য দু'আ করার দলিল হিসেবে গ্রহণ করে সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসকে রদ (খণ্ডন) করে দেন।

আমি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াকে বলতে শুনেছি, সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসটির ভাষ্য কেবল দু'আ কুনূত ধরনের সামগ্রিক দু'আর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নামাজে তো কেবল সেইসব দু'আই করতে হবে, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে করেছেন, করতে শিখিয়েছেন এবং অনুমোদন করেছেন।

www.waytojannah.com

Contents

রাসূল ﷺ-এর সালাম ফিরানো পদ্ধতি

দু'আ শেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

অর্থ: 'আপনাদের প্রতি সালাম (শান্তি) ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক' বলে প্রথমে ডান দিকে ফিরতেন এবং একই বাক্য উচ্চারণ করতে করতে পরে বাম দিকে ঘাড় ফিরাতেন।

তিনি এভাবে সালাম বলে দু'দিকে ঘাড় ফিরাতেন বলে পনেরজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন:

১. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু।
২. সা'আদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহ আনহু।
৩. সহল ইবনু সা'আদ আস্-সায়েদী রাদিয়াল্লাহ আনহু।
৪. অয়িল ইবনু হুজর রাদিয়াল্লাহ আনহু।
৫. আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহ আনহু।
৬. হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহ আনহু।
৭. আম্মার ইবনু ইয়াসের রাদিয়াল্লাহ আনহু।
৮. আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহ আনহু।
৯. জাবির ইবনু সামুরা রাদিয়াল্লাহ আনহু।
১০. বারা ইবনু আযিব রাদিয়াল্লাহ আনহু।
১১. আবু মালিক আল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহ আনহু।
১২. তলক ইবনু আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু।
১৩. আউস ইবনু আউস রাদিয়াল্লাহ আনহু।
১৪. আবু রিমছা রাদিয়াল্লাহ আনহু।
১৫. আদী ইবনু উমাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু।

রাসূল ﷺ সামনের দিকে ফিরে থাকা অবস্থায়ই কেবল একটি সালাম বলে নামাজ শেষ করতেন বলেও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ বক্তব্য কোনো সহীহ সূত্র থেকে প্রমাণিত নয়। এ ক্ষেত্রে কেবল আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসটিই বিবেচনায় আনা যেতে পারে। সুনান[১৪] গ্রন্থাবলীতে তাঁর হাদিসটি সংকলিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনাটি হলো:

"নামাজ শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আস্সালামু আলাইকুম' উচ্চারণ করে কেবল একটি সালামই বলতেন এবং সেটা তিনি এতটা শব্দ করে উচ্চারণ করতেন যে, আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠতাম।"

কতিপয় সঙ্গত কারণে এই হাদিসটি ত্রুটিপূর্ণ এবং সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। সে কারণগুলো হলো:

---

১৪ 'সুনান গ্রন্থাবলী' বলতে বুঝায় তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহকে। এই চারটি গ্রন্থকে একত্রে 'সুনানে আরবাআ' (সুনান চতুষ্টয়)ও বলা হয়।

www.waytojannah.com

Contents

১. আয়িশা (রা)-এর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, তিনি রাসূল ﷺ-এর রাত্রের (নফল বা তাহাজ্জুদ) নামাজ সম্পর্কে একথা বলেছেন।
২. এছাড়া আয়িশা (রা) ঘুমে থাকার কারণে প্রথম সালামটি না শুনে হয়তো দ্বিতীয় সালামটি শুনে থাকবেন।
৩. যারা দুই সালামের কথা বর্ণনা করেছেন, তাঁরা জাগ্রতাবস্থায় এবং রাসূল ﷺ এর সাথে নামাজ পড়া অবস্থায় তাঁকে দুই সালাম করতে দেখেছেন।
৪. দুই সালাম সংক্রান্ত হাদিসগুলো অধিকাংশই সহীহ, বাকিগুলো হাসান আর সংখ্যায়ও অনেক।
৫. আয়িশা (রা) এখানে এক সালামের কথা উল্লেখ করলেও দুই সালামের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

এসব কারণে দুইদিকে দুই সালামের মাধ্যমে নামাজ শেষ করার বিষয়টিই সুপ্রতিষ্ঠিত।

পরবর্তী কালে উমাইয়া শাসকরা মাদীনাসহ বিভিন্ন শহরে এক সালামের প্রচলন করে। ফলে সেই সময়কার প্রজন্মের কিছু লোকের ধারণা হয়, এক সালামের মাধ্যমেই বুঝি নামাজ শেষ করতে হয়। মসজিদে এসে এক সালাম দেখে তাদের মধ্যে এ ধারণা জন্মে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে নামাজের যে রীতি প্রচলন করেছেন এবং খুলাফায়ে রাশেদীন যে রীতির অনুসরণ করেছেন আর সহীহ হাদিসের মাধ্যমে যেগুলো সুপ্রমাণিত হয়েছে, তার বিপরীত কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়।

এক সালাম সংক্রান্ত আরো যে দুয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলো সবই দুর্বল, ত্রুটিপূর্ণ ও বাতিল।

সালামের পরে মুক্তাদিদের নিয়ে মুনাজাত (দু'আ) করা প্রসঙ্গ

সালাম ফিরানোর পর কিবলার দিকে ফিরে, কিংবা মুক্তাদিদের দিকে ফিরে হাত উঠিয়ে দু'আ বা মুনাজাত করার যে প্রথা চালু হয়েছে, তার কোনো প্রমাণ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পাওয়া যায় না। সহীহ বা হাসান কোনো সূত্রেই পাওয়া যায় না। আবার অনেকেই খাস করে ফজর এবং আসর নামাজের পর মুক্তাদিদের দিকে ফিরে এরেপ মুনাজাত করার রীতি চালু করেছেন। কিন্তু এটাও রাসূলুল্লাহ ﷺ কিংবা খুলাফায়ে রাশেদীনের কোনো একজন থেকেও প্রমাণিত নয়। এমনটি করার কোনো নির্দেশ বা ইঙ্গিতও তিনি উম্মতকে প্রদান করেননি।[১৫]

---

15 আমাদের দেশের ইমাম সাহেবগণ নামাজের সালাম ফিরানোর পর মুসল্লিগণকে সাথে নিয়ে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করাকে অবশ্য জরুরী কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ নামাজের সালাম ফিরানোর পর মুসল্লিগণকে নিয়ে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করেছেন বলে প্রমাণ নেই।

ইমাম সাহেবগণের এ কাজের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, এখন মুসল্লিগণ এ কাজকে নামাজের অংশ মনে করতে শুরু করেছেন। শুধু তা-ই নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অবস্থা এতোটা চরম আকার ধারণ করেছে যে, কোনো ইমাম যদি সালাম ফিরানোর পর মুসল্লিদের সাথে নিয়ে হাত উঠিয়ে মুনাজাত না করেন তবে তার ইমামতি থকবে না। আমাদের জানা মতে এ কারণে কিছু ইমামের ইমামতিও ছুটে গেছে। আবার অনেকেই এই কাজটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত নয় জেনেও করে যাচ্ছেন কেবল ইমামতি টিকিয়ে রাখার জন্য।

ফলে ইমামগণ কি নিজেদের কৃতকর্মের কারণে এক বিরাট ফিতনার মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েননি?

www.waytojannah.com

Contents

আমাদের দেশের ইমাম সাহেবরা নামাজের সালাম ফিরানোর পর মুসল্লিগণকে সাথে নিয়ে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করাকে অবশ্য জরুরী কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ নামাজের সালাম ফিরানোর পর মুসল্লিগণকে নিয়ে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করেছেন বলে প্রমাণ নেই।

ইমাম সাহেবগণের এ কাজের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, এখন মুসল্লিগণ এ কাজকে নামাজের অংশ মনে করতে শুরু করেছে। শুধু তা-ই নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অবস্থা এতোটা চরম আকার ধারণ করেছে যে, কোনো ইমাম যদি সালাম ফিরানোর পর মুসল্লিদের সঙ্গে নিয়ে হাত উঠিয়ে মুনাজাত না করেন, তবে তার ইমামতি থাকবে না। আমাদের জানা মতে এ কারণে কিছু লোকের ইমামতি ছুটে গেছে। আবার অনেকেই এই কাজটা রাসূলুল্লাহর সুন্নত নয় জেনেও করে যাচ্ছেন কেবল ইমামতি টিকিয়ে রাখার জন্য।

ফলে ইমামরা কি নিজেদের কৃতকর্মের কারণে এক বিরাট ফিতনার মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েননি?

প্রত্যেক নামাজের সাথে অপরিহার্য ও অবধারিত করে নেয়া সুন্নাতে রাসূলের পরিপন্থী। অতঃপর মুসল্লিদের বিরাগ ভাজন হবার ভয়ে একাজ ঠিক নয় জেনেও ছাড়তে না পারা নিজেদের মনগড়া রীতিকে শরীয়তের বিধানে পরিণত করার নামান্তর নয় কি?

যারা সালামের পর কিবলার দিকে ফিরে কিংবা ফজর ও আসরের পরে মুক্তাদিদের দিকে ফিরে মুনাজাত করার প্রথা চালু করেছেন, এটা তারা সুন্নতের বিকল্প হিসেবে চালু করেছেন। এটাকে তারা উত্তম কাজ মনে করেন। সুন্নতের পরিবর্তে এমনটি করা উত্তম কাজ কি না তা আল্লাহই ভালো জানেন।

হাদিসে নামাজ সংক্রান্ত যত দু'আর কথা উল্লেখ হয়েছে, সবই রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের ভিতরে করেছেন এবং নামাজের ভিতরে করার জন্যেই নির্দেশ দিয়েছেন।

বান্দা যতক্ষণ নামাজে থাকে, ততক্ষণ তো প্রকৃতপক্ষে তার প্রভুর সঙ্গে তার মুনাজাত (গোপন কথাবার্তা) হয়। সেজন্য রাসূল ﷺ নামাজের ভিতরেই দু'আ করেছেন এবং করার নির্দেশ দিয়েছেন। তখনই তো বান্দা তার প্রভুর একান্ত নিকটে থাকে, সেটাই তো চাওয়ার (দু'আর) প্রকৃত সময়।

কিন্তু যখন সে নামাজের সালাম ফিরায়, তখন তো মুনাজাত (গোপন কথাবার্তা)-এর ধারা ছিন্ন হয়ে যায়। তাই মোক্ষম সময়ই প্রভুর কাছে চাওয়া উচিত, অর্থাৎ নামাজের ভিতর। এটাই সুন্নত। এটাই উত্তমপন্থা। সুন্নতের বিপরীত নিজেদের কোনো রীতি বানিয়ে নেয়া উত্তম নয়।

তবে হ্যাঁ, যে কোনো সময় যে কেউ আল্লাহর কাছে চাইতে পারে, দু'আ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে তার উচিত, প্রথমে তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ, তাকবীর প্রভৃতি রাসূল ﷺ-এর শিখানো পদ্ধতিতে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সালাত (দরূদ) পাঠ করা। অতঃপর যা ইচ্ছা দু'আ করা, চাওয়া।

যেকোনো সময় দু'আ করা যায়। এভাবে আল্লাহর স্মরণ এবং রাসূল ﷺ-এর প্রতি সালাত (দরূদ) পাঠের পর দু'আ করলে সে দু'আও কবুল হয়। ফুযালা ইবনু উবাইদ বর্ণিত হাদিস থেকে এটা বুঝা যায়। কিন্তু নামাজের বাইরের দু'আকে নামাজের সাথে যুক্ত করা ঠিক নয়।

প্রত্যেক নামাজের সাথে অপরিহার্য ও অবধারিত করে নেয়া সুন্নাতে রাসূলের পরিপন্থী। অতঃপর মুসল্লিদের বিরাগ ভাজন হবার ভয়ে এ কাজ ঠিক নয় জেনেও ছাড়তে না পারা নিজেদের মনগড়া রীতিকে শরীয়তের বিধানে পরিণত করার নামান্তর নয় কি?

আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিখানো পদ্ধতিতে আমল করার তাওফীক এনায়েত করুন– *অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

Contents

জুতা পরে এবং এক কাপড়ে নামাজ পড়া

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো খালি পায়ে নামাজ পড়তেন, আবার কখনো কখনো জুতা পরে নামাজ পড়তেন। (আবু দাউদ)

ইহুদীদের বিপরীত করার জন্য তিনি জুতা পরে নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: তোমরা ইহুদীদের বিপরীত করো, তারা জুতা ও চামড়ার মোজা পরে নামাজ পড়ে না। (আবু দাউদ)

তিনি বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন নামাজ পড়বে, সে যেনো জুতা পরে থাকে। তবে খুলতে চাইলে খুলে যেন তা দুই পায়ের মাঝখানে রাখে।[১৬] যেখানে সেখানে জুতা রেখে কাউকে কষ্ট না দেয়। (আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো এক কাপড়ে নামাজ পড়তেন। আবার কখনো কখনো দুটি কাপড় পরে নামাজ পড়তেন। তবে দুই কাপড় পরেই বেশিরভাগ পড়তেন।[১৭]

নামাজে তাঁর আনন্দ, প্রশান্তি, বিনয় ও কান্না

- ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজে দাঁড়াতেন, মাথা কিছুটা ঝুঁকিয়ে আনত করে রাখতেন।

- নামাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চোখ জুড়াত। নামাজের মধ্যেই তিনি আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ করতেন। তিনি বলতেন:

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلاَةِ.

অর্থ: নামাজে আমার চোখ জুড়ায়। নামাজের মধ্যে আমি আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ করি।

তিনি বিলালকে উদ্দেশ্য করে বলতেন:

يَابِلاَلُ أَرِحْنَا بِالصَّلاَةِ.

অর্থ: হে বিলাল, নামাজে ডেকে আমার হৃদয়কে প্রশান্তিতে ভরে দাও।

- তিনি বলছেন: নামাজে একটা মনোযোগ, ধ্যান, মগ্নতা ও তন্ময়তা আমাকে ঘিরে রাখে। (বুখারী, মুসলিম)

- রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই নামাজে কাঁদতেন। কান্নায় তাঁর বুকের ভেতর গুমগুম আওয়াজ হতো। সাহাবীগণ নামাজে তাঁর কান্না শুনতেন। (আহমাদ, নাসাঈ, আবু দাউদ)

---

[১৬] আবু দাউদ, ইবনু খুযাইমা এবং হাকিম সহীহ সূত্রে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে নামাজ পড়ছিলেন। নামাজের মধ্যেই তিনি নিজের জুতা খুলে বাম পাশে রাখেন। এটা দেখে মুক্তাদিরাও সবাই নিজ নিজ জুতা খুলে ফেলে। নামাজ শেষ করে তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কেন জুতা খুললে? আমরা বললাম: আপনাকে খুলতে দেখে আমরাও জুতা খুলে রেখেছি। তখন তিনি বললেন: জিবরীল এসে খবর দিয়েছেন: আমার জুতায় অপবিত্রতা আছে। সে কারণে আমি জুতা খুলে রেখেছি। তোমরা মসজিদে এলে নিজ নিজ জুতা দেখে নিয়ো। তাতে কোনো অপবিত্রতা আছে কি না? যদি ময়লা কিছু থাকে, তা মুছে ফেলবে এবং জুতা পরেই নামাজ পড়বে।

[১৭] মুসানাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেছেন, কাপড়ের অভাব থাকার কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কখনো কখনো এক কাপড়ে নামাজ পড়া হতো। সচ্ছলতার সময় দুই কাপড়ে নামাজ পড়াই উত্তম।

www.waytojannah.com

Contents

- গোটা নামাজের বিভিন্ন স্থানে বার বার তিনি পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় অকল্যাণ থেকে ত্রাণ প্রার্থনা করতেন। দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় মঙ্গল কামনা করতেন। এভাবে পুরো নামাজে আল্লাহর সঙ্গে মুনাজাত (একান্ত আবেদন নিবেদন) করতে থাকতেন।

- নিশি রাতে গোটা দুনিয়া যখন ঘুমন্ত, তখন তিনি প্রভুর সান্নিধ্যে হাযির হতেন নামাজের মাধ্যমে।

- প্রভুর শোকর আদায়ের জন্য তিনি নামাজ পড়তেন।

- বিপদের সময় তিনি নামাজ পড়তেন।

- যুদ্ধের ময়দানে তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন।

- প্রভুর সাহায্য প্রার্থনার জন্যে তিনি সাজদায় লুটিয়ে পড়তেন।

নামাজে রাসূল ﷺ-এর সতর্কতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে নিজের হৃদয়-মনকে পুরোপুরিভাবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি নিবিষ্ট করতেন, নিজেকে আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্যে উপস্থিত করতেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণাঙ্গ মনোসংযোগ স্থাপন করতেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি নামাজের মধ্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করতেন। মুসল্লিদের অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখতেন। এখানে সহীহ সূত্রে বর্ণিত এ ধরনের কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হলো:

১. তিনি নামাজকে দীর্ঘ করতেন। কিরাত দীর্ঘ করতেন। সে অনুযায়ী রুকূ সাজদাও দীর্ঘ করতেন। কিন্তু যখনই নামাজের মধ্যে কোনো শিশুর কান্না শুনতেন, তখন তাঁর সাথে নামাজরত শিশুর মায়ের মনের অবস্থা বিবেচনা করে নামাজ সংক্ষেপ করে দ্রুত শেষ করে দিতেন।

২. কোনো এক যুদ্ধে তিনি একজন অশ্বারোহীকে একটি তথ্য সংগ্রহ করে আনার জন্য পাঠান। তাকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি নামাজে দাঁড়ান। নামাজরত অবস্থায় তিনি তাঁর প্রেরিত সেই অশ্বারোহীর আগমন পথে তাকাচ্ছিলেন। নামাজরত অবস্থায়ও তিনি তাঁর প্রেরিত অশ্বারোহীর ব্যাপারে অসতর্ক হননি।

৩. একবার তিনি তাঁর নাতনী উমামা বিনতে আবিল আস্ (যয়নাবের মেয়ে)-কে ঘাড়ে নিয়ে ফরয নামাজ পড়ান। রুকূ ও সাজদায় গেলে ওকে নামিয়ে পাশে বসিয়ে রাখতেন। সাজদা থেকে দাঁড়াবার সময় আবার ঘাড়ে উঠিয়ে নিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৪. কখনো কখনো তিনি সাজদায় গেলে তাঁর নাতি হাসান বা হুসাইন এসে তাঁর পিঠে বসত। তাদের পড়ে যাবার আশঙ্কায় তখন তিনি সাজদা দীর্ঘ করতেন।

৫. কখনো এমন হতো যে, তিনি নামাজ পড়ছেন, ঘরের দরজা বন্ধ। উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা) এসে দরজার কড়া নাড়ছেন। তিনি নামাজরত অবস্থায় গিয়ে আয়িশাকে দরজা খুলে দেন এবং ফিরে এসে নামাজের বাকি অংশ শেষ করেন। (আহমাদ, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ী)

৬. তাঁর নামাজ পড়া অবস্থায় যদি কেউ তাঁকে সালাম দিত, তিনি হাতে ইশারা করে তার সালামের জবাব দিতেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, জাবির (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কোনো একটি কাজে পাঠান। আমি ফিরে এসে দেখি তিনি নামাজ পড়ছেন।

www.waytojannah.com

Contents

নামাজরত অবস্থায়ই আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি ইশারা করে আমার সালামের উত্তর দিলেন।

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজরত অবস্থায় ইশারা-ইঙ্গিত করতেন।(মুসনাদে আহমাদ)

সুনান গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে, সুহাইব (রা) বলেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়ছিলেন। এসময় আমি তাঁর নিকট দিয়ে যাবার সময় তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি ইশারায় আমার সালামের জবাব দেন।

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কুবায় এলেন। তিনি কুবার মাসজিদে নামাজ পড়ছিলেন তখন একদল আনসার সাহাবী এলেন। তারা নামাজরত অবস্থায়ই তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি ইশারা করে তাদের সালামের জবাব দেন।

ইমাম তিরমিযী আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা)-এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন এটি সহীহ হাদিস।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি হাবশা থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলাম। এসে দেখি তিনি নামাজ পড়ছেন। এ অবস্থায় আমি তাঁকে সালাম দিই। তিনি মাথায় ইশারা করে আমার সালামের জবাব দেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী।

নামাজে ইশারা করার ক্ষেত্রে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস বিরোধ সৃষ্টি করে। হাদিসটি আবু গাতফান আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নামাজে বোধগম্য ইশারা করবে, সে যেনো পুনরায় নামাজ পড়ে নেয়।

ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, এটি বাতিল হাদিস-এটি গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, ইমাম আবু দাউদ আমাকে বলেছেনঃ এই হাদিসের বর্ণনাকারী আবু গাতফান একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। তার বর্ণিত হাদিস গ্রহণ করা যায় না। অপরদিকে এ হাদিসটি এ সংক্রান্ত সহিহ হাদিসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আনাস এবং জাবির প্রমুখ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজরত অবস্থায় ইশারা ইঙ্গিত করতেন।

৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ (রাত্রে) যখন ঘরে নামাজ আদায় করতেন, আয়িশা (রা) তাঁর সাজদার জায়গায় আড়াআড়ি হয়ে শুয়ে থাকতেন। তিনি যখন সাজদায় যেতেন, আয়িশাকে সরে যাবার জন্য তার গায়ে টিপ দিতেন, বা চিমটি কাটতেন। তখন আয়িশা (রা) পা গুটিয়ে নিতেন। তিনি সাজদা সেরে দাঁড়িয়ে গেলে আয়িশা (রা) পুনরায় পা বিছিয়ে দিতেন। (বুখারী)

৮. একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়ছিলেন। এমন সময় শয়তান আসে তাঁর নামাজে ব্যাঘাত ঘটাবার জন্য। তিনি শয়তানের গলা চেপে ধরেন, এমনকি এতে শয়তানের লালা বা জিহ্বা বেরিয়ে তাঁর হাতে লাগে। (মুসনাদে আহমাদ, দারু কুতনি)

৯. তিনি কখনো কখনো মিম্বরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন। সেখানেই রুকু করতেন। সাজদার সময় মিম্বার থেকে নেমে পেছনে সরে এসে জমিনের উপর সাজদা করতেন। সাজদা শেষ হলে পুনরায় মিম্বরে গিয়ে দাঁড়াতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

www.waytojannah.com

Contents

১০. তিনি একবার একটি দেয়ালকে সামনে রেখে নামাজ পড়ছিলেন। এসময় একটি চতুষ্পদ জানোয়ার (কুকুর) তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে উদ্যত হয়। তিনি সামনে এগিয়ে জানোয়ারটির পেট দেয়ালের সাথে ঠেকিয়ে দেন। ফলে জানোয়ারটি তাঁর পেছন দিয়ে পথ অতিক্রম করতে বাধ্য হয়। (তাবরানী, হাকিম, ইবনু খুযাইমা)

১১. একবার তিনি নামাজ পড়ছিলেন। এসময় বানী আবদুল মুত্তালিবের দুটি বালিকা হাতাহাতি করতে করতে তাঁর সামনে এসে পড়ে। তিনি নামাজরত অবস্থায়ই ওদের ধরে একজনকে আরেকজন থেকে ছাড়িয়ে দেন। ইমাম আহমাদের বর্ণনায় একথাও আছে যে, মেয়ে দুটি নাবী করীম ﷺ-এর হাঁটু আঁকড়ে ধরল। অতঃপর তিনি তাদের ছাড়িয়ে দেন, কিংবা থামিয়ে দেন। কিন্তু নামাজ অব্যাহত রাখেন।

১২. একবার তিনি নামাজে দাঁড়ালে একটি বালক তাঁর সামনে দিয়ে যেতে শুরু করলে তিনি তাকে হাতে ইশারা করে ফিরে যেতে বললে সে ফিরে যায়। (মুসনাদে আহমাদ)

১৩. আরেকবার তিনি নামাজ পড়ছিলেন। এমন সময় একটি বালিকা তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল। তিনি তাকে হাতে ইশারা করলে সে ফিরে যায়। (সুনান গ্রন্থাবলী)

১৪. তিনি কখনো কখনো নামাজরত অবস্থায় সাজদার জায়গায় ফুঁক দিতেন। তবে ফুঁক দেয়ার হাদিসটি প্রশ্ন সাপেক্ষে। যদিও হাদিসটি মুসনাদে আহমাদ ও সুনান গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ হয়েছে। এটি মূলত রাসূল ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি।

১৫. তিনি নামাজে কাঁদতেন।

১৬. তিনি নামাজে গলা ঝেড়ে নিতেন। গলা ঝেড়ে ইশারাও করতেন। আলী (রা) বলেন: আমি প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় দু'বার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যেতাম। আমি গিয়ে ঘরে ঢোকার অনুমতি চাইতাম। আমার আগমনের সময় কখনো তিনি নামাজরত থাকতেন। এ সময় তিনি গলা ঝেড়ে আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। (সুনানে নাসায়ী, মুসনাদে আহমদ)

- ইমাম আহমাদও নামাজে গলা ঝাড়তেন এবং এটাকে তিনি নামাজ বিনষ্টকারী মনে করতেন না।

এভাবে নামাজে গভীর তন্ময়তা ও আল্লাহমুখিতা সত্ত্বেও তিনি অপরের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখতেন। পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করতেন এবং এগুলোকে নামাজ বিনষ্টকারী মনে করতেন না।

ফরয নামাজে দু'আ কুনূত (তথা কুনুতে নাযিলা)

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাস বিরামহীনভাবে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং ফজর নামাজে দু'আ কুনূত পড়েছেন। (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ)

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি ফজর নামাজে একমাস দু'আ কুনূত পড়েছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে তিনি মাগরিব নামাজে দু'আ কুনূত পড়েছেন। মূলত উপরের হাদীসটিই সঠিক। আসলে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজেই দু'আ কুনূত পড়েছেন।

- তিনি সব সময় দু'আ কুনূত পড়েননি।
- তিনি বিপদকালে দু'আ কুনূত পড়েছেন।

www.waytojannah.com

Contents

- দু'আ কুনূতে তিনি কারো জন্য দু'আ এবং কারো জন্য বদ-দু'আ করতেন।

তিনি যে নামাজে দু'আ কুনূত পড়তেন, সে নামাজের শেষ রাকাতে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে দু'আ কুনূত পড়তেন। দু'আ কুনূত পড়ার পর সরাসরি সাজদায় চলে যেতেন। তিনি দু'আ কুনূত এবং সাজদার মাঝখানে অন্যকিছু করতেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দু'আ কুনূত পড়তেন, তখন মুক্তাদিগণ 'আমীন' বলতেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কারো জন্যে দু'আ কিংবা কারো জন্যে বদ দু'আ করতে চাইতেন, তখন রুকূর পরে দু'আ কুনূত পড়তেন। রুকূর পরে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহু রাব্বানা লাকাল হামদ্' বলার পর কিছুদিন তিনি এই দু'আ করেছেন:

اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ.

অর্থ: হে আল্লাহ, অলীদ, সালামা ইবনু হিশাম এবং আইয়াশ বিন আবী রবিআ'কে রক্ষা করো। হে আল্লাহ, তুমি মুদার সম্প্রদায়কে শক্ত করে পাকড়াও করো এবং তাদের উপর ইউসুফ (আ:)-এর কওমের মতো বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষ দাও।

আবু দাউদ এবং মুসনাদে আহমাদে ইবনু আব্বাস (রা)-এর সূত্রে যে বর্ণনা উল্লেখ হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, তিনি কখনো কখনো দু'আ কুনূতে এই বলে বদ দু'আ করতেন:

اَللّٰهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرَعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

অর্থ: হে আল্লাহ, লিহইয়ান, রা'ল, যাকওয়ান এবং উসাইয়্যা সম্প্রদায়ের উপর অভিশাপ নাযিল করো। তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করেছে।

আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ-এর সাধারণ রীতি ছিলো, যখন বিপদাপদ দেখা দিতো, তখনই দু'আয়ে কুনূত (কুনূতে নাযিলা) পড়তেন। বিপদাপদ দূর হয়ে গেলে পড়া ছেড়ে দিতেন। তিনি শুধু ফজর নামাজেই দু'আ কুনূত পড়াটা নির্দিষ্ট করেননি, অন্যান্য নামাজেও পড়তেন। তবে ফজর নামাজেই বেশি পড়তেন।

মুহাদ্দিসগণ বিপদ-আপদে দু'আয়ে কুনূত পড়া মুস্তাহাব মনে করেন। অবশ্য হাদিস সম্পর্কে তাঁরাই বেশি ওয়াকিফহাল। তাঁদের মতে দু'আয়ে কুনূত পড়া এবং ছেড়ে দেয়া দুটোই সুন্নত। তাঁরা মনে করেন, পড়াটাও ভালো, না পড়াটাও ভালো। কারণ রাসূল ﷺ পড়েছেন বলেও হাদিসে আছে, আবার ত্যাগ করেছেন বলেও হাদিসে আছে।

ইমাম যদি মুক্তাদিদের জানিয়ে বা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য দু'আ কুনূত শব্দ করে পড়ে, তাহলে তাতে দোষ নেই। উমার (রা) মুক্তাদিদের স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে শুরুটা শব্দ করে পড়তেন। ইবনু আব্বাস (রা) জানাযায় সূরা ফাতিহা শব্দ করে পড়তেন, যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত।

ইমামের সশব্দে 'আমীন' বলাটাও এরকমই একটি ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে এগুলো সেইসব মতভেদ (ইখতিলাফ), যেগুলোর উভয়টা করাই মুবাহ্ (বৈধ), কিংবা করা বা না করা উভয়টাই মুবাহ। যেমন

www.waytojannah.com

Contents

নামাজে 'রফে ইয়াদাইন' করা এবং ত্যাগ করা উভয়টাই জায়েজ। যেমন, বিভিন্ন প্রকারের তাশাহ্হুদের যে কোনোটি পড়াই জায়েজ। যেমন বিভিন্ন আযান ও ইকামতের যে কোনোটি অবলম্বন করাই জায়েজ।

কিন্তু, এখানে বৈধ অবৈধ আলোচনা করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য তো শুধু রাসূল ﷺ কী করতেন, কিভাবে করতেন-তা উল্লেখ করা। কারণ তিনি আমাদের নমুনা ও মাপকাঠি। এ গ্রন্থে আমরা শুধু তাঁর রীতি ও নীতিই অনুসন্ধান করে প্রকাশ করতে চাই। তিনিই তো পূর্ণাঙ্গ পথপ্রদর্শক। তিনিই আমাদের অনুকরণীয়, অনুসরণীয়।

ফরয নামাজে দু'আ কুনূত পড়ার ব্যাপারে যেসকল হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলোর সারকথা প্রকাশ হয়েছে ইসলামের একজন বিজ্ঞ আলিমের বক্তব্যে। তিনি বলেছেন, এ ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুনূতে নাযিলা (দু'আ কুনূত) শুধু কোনো কওম বা ব্যক্তির জন্যে দু'আ করা কিংবা বদ দু'আ করার জন্যই পড়েছেন। তারপর যখন তাঁর দু'আর ফল দেখা গেছে, তখন তিনি তা ত্যাগ করেন। আবার তিনি দু'আ কুনূত শব্দ করেও পড়েছেন, আবার নিঃশব্দেও পড়েছেন। তিনি দু'আ কুনূত পড়েছেন আবার অনেক সময় তা পড়া ত্যাগও করেছেন। শব্দ করে পড়ার চেয়ে বেশি সময় নিঃশব্দের পড়েছেন। কুনূত যতো দিন পড়েছেন, তার চাইতে বেশি দিন পড়েননি। কুনূতের ব্যাপারে এই ছিলো তাঁর রীতি। আবার ফরয নামাজে তিনি রুকূ থেকে দাঁড়িয়েই দু'আ কুনূত পড়তেন। এটাই প্রমাণিত।

সাহু সাজদা (ভুলের সাজদা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমাদের যেমন ভুল হয়, আমারও ভুল হয়। আমি কোনো কিছু ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো। (বুখারী)

নামাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভুল হওয়াটা তাঁর উম্মতের জন্য আল্লাহর নি'আমতের পূর্ণতা। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য তাদের দীনকে পূর্ণ করেছেন। কারণ এ প্রক্রিয়াতেই তারা জানতে পেরেছে- নামাজে ভুল হলে তাদের করণীয় কী?

মুআত্তায়ে মালিকে একটি সূত্রবিচ্ছিন্ন হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণীটি উল্লেখ হয়েছে: আমি ভুলে যাই কিংবা আমাকে ভুলানো হয়, যেন আমি ঐ বিষয়ে (লোকদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে এবং ব্যাখ্যা দিয়ে) তাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে পারি।

আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে মধ্যে ভুলে যাবার দরুণই শরীয়তে ভুলের বিধান তৈরি হয়।

আবদুল্লাহ ইবনু বুহাইনা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যুহর নামাজ পড়েন। এ সময় তিনি প্রথম দুই রাকাতের পর না বসেই দাঁড়িয়ে যান। মুক্তাদিরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে যায়। এভাবে নামাজ শেষ প্রান্তে এসে পৌছলো, লোকেরা সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিল। ঠিক এমনি সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ (শেষ তাশাহ্হুদের এই বসা অবস্থাতেই) সালাম ফিরানোর পূর্বে 'আল্লাহু আকবার' বলে দুটি সাজদা করেন। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এ থেকে এই নিয়ম জানা গেলো যে, কেউ যদি নামাজের আরকান (ফরয) ব্যতীত অন্য কোনো অংশ ভুলবশত ছেড়ে দেয়, তবে তাকে সালামের পূর্বে ভুলের সাজদা করতে হবে।

এভাবে ভুলবশত নামাজের কোনো অংশ বাদ পড়লে তিনি আবার সেটা সম্পন্ন করার জন্যে প্রত্যাবর্তন করতেন না। যেমন একবার তিনি ভুলবশত প্রথম তাশাহ্হুদের বৈঠক ছেড়ে দাঁড়িয়ে যান। লোকেরা পেছন থেকে 'সুবহানাল্লাহ' বলা সত্ত্বেও তিনি না বসে তাদের দাঁড়িয়ে যেতে ইঙ্গিত করেন।

www.waytojannah.com

Contents

ইয়াযীদ ইবনু হারূন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার মুগীরা ইবনু শু'বা (রা) আমাদের ইমামতি করেন। দু'রাকাত পড়ার পর তিনি না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুক্তাদিরা 'সুবহানাল্লাহ্' বললো। কিন্তু তিনি তাদের ইশারায় দাঁড়াতে বললেন। অতঃপর নামাজ শেষ করে সালাম ফিরালেন। তারপর দুটি সাজদা করলেন। অতঃপর পুনরায় সালাম ফিরালেন। শেষে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনটিই করতেন। হাদিসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী বলেছেন, এটি সহীহ হাদিস।

ভুলের সাজদা সালাম ফিরানোর পূর্বে না পরে এ বিষয়ে হাদিসের মধ্যে কিছুটা বিরোধ দেখা যায়। আবদুল্লাহ ইবনু বুহাইনার হাদিসে থেকে জানা যায় সালাম ফিরানোর পূর্বে। মুগীরার হাদিস থেকে জানা যায় সালাম ফিরানোর পরে। আসলে বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত কারণে আবদুল্লাহ ইবনু বুহাইনা বর্ণিত হাদিসটিই অধিকতর সঠিক। অবশ্য উভয় পদ্ধতিই সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই যে কোনো একটি পদ্ধতিই অবলম্বন করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নামাজে কয়েক ধরনের ভুল সম্পর্কে জানা যায়। যেমন-

১. একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশা, যুহর, কিংবা আসর নামাজ দুই রাকাত পড়েই সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। সালাম ফিরাবার পর কিছু কথাবার্তাও বলেন। অতপর বাকি (দুই রাকাত) নামাজ পূর্ণ করেন। তারপর সালাম ও কালামের পর দুটি সাজদা করেন। প্রতিটি সাজদায় যাওয়া ও উঠার সময় আল্লাহু আকবার বলেন।

২. আবু দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, নাবী করীম ﷺ লোকদের নামাজ পড়ালেন, নামাজে ভুল করলেন, তারপর দুটি সাহু সাজদা করলেন। অতঃপর তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরান। ইমাম তিরমিযী বলেছেন এই হাদিসটি হাসান ও গরীব।

৩. একদিন তিনি চার রাকাতের তিন রাকাত নামাজ পড়িয়ে মুক্তাদিদের দিকে ফিরলেন। তখন তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা) তাঁকে জানান, আপনি নামাজ তিন রাকাত পড়েছেন, এক রাকাত পড়তে ভুলে গেছেন। তখন তিনি বিলালকে ইকামত দিতে নির্দেশ দেন। বিলাল ইকামত দেন। তিনি লোকদের পুনরায় নামাজ পড়ান। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ।

৪. একদিন তিনি যুহরের নামাজ পাঁচ রাকাত পড়ালেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো- যুহরের নামাজ কি এক রাকাত বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন, সেটা আবার কি? তখন তারা বললেন, আপনি আজ পাঁচ রাকাত পড়েছেন। একথা শুনে তিনি (সালাম ফিরাবার পর) দুটি সাজদা করেন। **(বুখারী ও মুসলিম)**

৫. একদিন তিনি আসর নামাজ তিন রাকাত পড়িয়ে ঘরে চলে যান। তখন খিরবাক নামক যুল ইয়াদাইন (লম্বা হাতওয়ালা) একজন লোক তাঁর পিছে পিছে গিয়ে তাঁকে বিষয়টি খুলে বলল। তার কথা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে চাদর টানতে টানতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন: এর কথা কি ঠিক? তারা বললেন: জী-হ্যাঁ। তখন তিনি অবশিষ্ট এক রাকাত পড়িয়ে সালাম ফিরালেন। তারপর দুটি (সাহু) সাজদা করলেন এবং পুনরায় সালাম ফিরালেন। **(সহীহ মুসলিম)**

নামাজে ভুল এবং ভুলের সাজদা সম্পর্কে রাসূল ﷺ থেকে সর্বমোট এই পাঁচ প্রকার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

www.waytojannah.com

Contents

তিনি ভুলের সাজদা সালামের আগেও করেছেন, পরেও করেছেন। এ ব্যাপারে ইমামগণের মতামত নিম্নরূপঃ

১. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে সর্বপ্রকার ভুলের সাজদা সালামের পূর্বে করতে হবে।

২. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সর্বপ্রকার ভুলের সাজদা সালামের পরে করতে হবে।

৩. ইমাম মালিক (র) বলেছেন, ভুলবশত নামাজে কোনো কিছু কম করার ক্ষেত্রে সাহু সাজদা সালাম ফিরাবার পূর্বে করতে হবে। ভুলবশত নামাজে কোনো কিছু বেশি পড়লে ভুলের সাজদা সালাম ফিরানোর পরে করতে হবে। আর একই নামাজে যদি উভয় প্রকার ভুল হয়ে যায়, তাহলে সাহু সাজদা সালাম ফিরানোর আগে করতে হবে। আবু উমার বলেছেন, এটাই ইমাম মালিকের মাযহাব। তবে কেউ যদি তাঁর মতের ব্যতিক্রম করত, তবে তাতেও তিনি নিষেধ করতেন না। কারণ, তাঁর মতে এ বিষয়ে মতভেদ করার অবকাশ রয়েছে।

৪. এ বিষয়ে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের মত কি? সে সম্পর্কে আছরম বলেনঃ আমি শুনেছি ইমাম আহমাদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল-ভুলের সাজদা সালাম ফিরানোর আগে, নাকি পরে? জবাবে তিনি বলেছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সালামের পূর্বে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সালামের পরে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনই করেছেন।

৫. ইমাম দাউদ (যাহেরী) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে পাঁচটি ক্ষেত্রে সাহু সাজদা করেছেন, কেউ যেন সে পাঁচটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কারণে সাহু সাজদা না করে।

সন্দেহের সাজদা

নামাজের ভিতরে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হলে রাসূল ﷺ ফিরে নামাজ পড়েননি। তিনি বলেছেন, সন্দেহের ক্ষেত্রে বিশ্বাস যেদিকে প্রবল হবে, সে মোতাবেক নামাজ শেষ করে সালাম ফিরানোর আগে সাজদা করে নেবে এবং সন্দেহ ত্যাগ করবে।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু সাঈদ খুদরি (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন নামাজের মধ্যে সংশয়ে পড়ে যায় এবং কত রাকাত পড়েছে, তিন রাকাত না চার রাকাত, তা স্থির করতে না পারে, তখন সে যেনো সন্দেহ পরিত্যাগ করে এবং বিশ্বাস যেদিকে প্রবল হয়, সেটাকেই যেনো ভিত্তি বানায় (গ্রহণ করে)। অতঃপর সে সালাম ফিরাবার পূর্বে দুটি সাজদা করে নেবে।

সহীহাইনে বর্ণিত হয়েছে, ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছেঃ তোমাদের কেউ যখন নামাজের মধ্যে সংশয়ে পড়ে যাবে, তখন সে যেনো, কোনো একটিকে সঠিক ধরে নিয়ে নামাজ পড়ে নেয় এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দুটি সাজদা করে নেয়।

একটি বর্ণনায় একথাও উল্লেখ রয়েছে, অতঃপর সে যেনো সালাম ফিরায় এবং তারপর দুটি সাজদা করে নেয়।

ইমাম আহমাদ (র) বলেছেনঃ সন্দেহ দুই প্রকার। একটি হলো "তাহাররী" বা প্রবল ধারণা, আর অপরটি হলো "একীন" বা নিশ্চিত বিশ্বাসের মধ্যে কিছুটা সন্দেহ। ইমাম আহমাদের মতে তাহাররীর ক্ষেত্র মুসল্লি সালামের পরে সাজদা করবে, আর একীনের ক্ষেত্রে সালামের আগে সাজদা করবে।

www.waytojannah.com

Contents

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালিক (র) বলেছেন: কেউ যদি নামাজের মধ্যে সন্দেহে পড়ে, তা হলে সে যেন সন্দেহে ডুবে না থাকে, বরং সে একটি ধারনার উপর একীন স্থাপন করবে। ইমাম আহমাদেরও একটি মত এটাই।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন: কেউ যদি নামাজের মধ্যে সংশয়ে পড়ে, আর এই সংশয় যদি প্রথমবারের মতো হয়, তাহলে সে যেনো দ্বিতীয়বার নামাজ পড়ে নিবে। কিন্তু সে যদি প্রায়ই সন্দেহে পড়ে, তবে সে 'প্রবল ধারনা' অথবা 'একীনের' ভিত্তিতে নামাজ অব্যাহত রাখবে।

নামাজে চোখ বন্ধ করা

চোখ বন্ধ করে নামাজ পড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রীতি ছিল না। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, তাশাহ্হুদের দু'আ পড়ার কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতের শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। সে দৃষ্টি আঙ্গুলের বাইরে যেত না।

- সহীহ বুখারীতে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আয়িশা (রা)-এর একটি বিশেষ ধরনের পর্দা ছিলো। তিনি সেটিকে ঘরের এক দিকে টানিয়ে রেখেছিলেন। রাসূল ﷺ আয়িশাকে তা সরিয়ে ফেলতে বলেন। আরো বলেন: পর্দাটিতে অঙ্কিত ছবি নামাজ থেকে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়।

- তিনি যদি আমাযে চোখ বন্ধ করে রাখতেন, তবে পর্দায় চিত্রিত ছবি কেমন করে তাঁর চোখে পড়ত?

- অবশ্য এ হাদিস দ্বারা নামাজে চোখ বন্ধ করা না জায়েয বলে প্রমাণিত হয় না।

ফকীহগণ নামাজে চোখ বন্ধ করার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। ইমাম আহমাদ প্রমুখ নামাজে চোখ বন্ধ করাকে মাকরূহ বলেছেন। তাঁদের মতে এটা ইহুদীদের কাজ।

তবে অন্যরা নামাজে চোখ বন্ধ করাকে বৈধ মনে করেন। তাঁদের মতে চোখ বন্ধ করার মাধ্যমে নামাজে খুশূ-খুযূ অর্জন এবং আল্লাহ্র নৈকট্য অনুভব করাটা সহজ হয়। আর এটাই হলো নামাজের প্রাণ ও মূল উদ্দেশ্য।

এ ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, নামাজে চোখ খোলা রেখে যদি খুশূ-খুযূ এবং মনোসংযোগ ঠিক রাখা যায়, তবে খোলা রাখাই উত্তম। আর যদি খোলা রাখলে বিভিন্ন দৃশ্যের কারণে মনস্থির ও খুশূ-খুযূ সৃষ্টি না হয়, তবে চোখ বন্ধ করাটা দোষণীয় নয়। বরং শরীয়তের মূলনীতি অনুযায়ী এ ধরনের অবস্থায় চোখ বন্ধ রাখাটাই উত্তম ও পছন্দনীয়।

সুতরা বা আড়াল দেয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজ দাঁড়াতেন, তখন কোনা কিছুর সামনে দাঁড়াতেন, কিংবা সামনে কিছু দাঁড় করিয়ে দিতেন, কিংবা অন্তত সামনে একটা রেখা এঁকে দিতেন। তিনি নামাজের সামনে আড়াল সৃষ্টিকারী (সুতরা) কিছু রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি কখনো দেয়াল সামনে রেখে নামাজ আদায় করেছেন। তখন তাঁর সাজদা ও দেয়ালের মাঝখান দিয়ে একটি বকরী বা ভেড়া পার হবার জায়গায় থাকতো মাত্র। তাঁর ও সুতরার মাঝে এর চেয়ে বেশি দূরত্ব থাকত না। বরং তিনি সুতরার নিকটবর্তী দাঁড়াবার নির্দেশ দিয়েছেন।

কখনো তিনি খাট, কাঠ, গাছ, কিংবা মসজিদের খুঁটিকে সামনে রেখে নামাজ পড়েছেন।

www.waytojannah.com

Contents

যখন যুদ্ধের সফরে থাকতেন, কিংবা কোনো খোলা মাঠে নামাজ পড়তেন, তখন সামনে হাতিয়ার গেড়ে সুতরা বানিয়ে নামাজ পড়তেন এবং লোকেরা তাঁর পেছনে নামাজ পড়ত।

কখনো বাহন সামনে রেখে নামাজ পড়েছেন, বাহনকেই সুতরা বানিয়েছেন। আবার কখনো সাওয়ারীর আসনকে সুতরা বানিয়েছেন।

তিনি মুসল্লিদের নির্দেশ দিয়েছেন, কোনো আড়াল পাওয়া না গেলে অন্তত তীর বা লাঠি সামনে পুঁতে নিয়ে তাকে সুতরা বানিয়ে যেন তারা নামাজ পড়ে। তীর বা লাঠিও পাওয়া না গেলে অন্তত সামনে মাটিতে যেন একটি রেখা এঁকে নেয়।[১৮]

আবু দাউদ বলেন, আমি আহমাদ ইবনু হাম্বলকে বলতে শুনেছি, মাটিতে রেখা আঁকলে সেটা নতুন চাঁদের ন্যায় আড়াআড়ি আঁকবে। আবদুল্লাহ বলেছেন, লম্বালম্বি আঁকবে। আর লাঠি গাড়লে সেটা খাড়া করে গাড়বে।

সুতরা না থাকলে কি নামাজ ভেঙে যাবে

যদি নামাজীর সামনে সুতরা না থাকে, তা হলে এমতাবস্থায় নামাজের সামনে দিয়ে বালেগা নারী, গাধা ও কালো কুকুর অতিক্রম করলে নামাজ ভেঙে যাবে বলে সহীহ সূত্রে জানা যায়। এ ব্যাপারে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু যর, আবু হুরাইরা, ইবনু আব্বাস এবং আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

তবে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনা উপরিউক্ত মতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তিনি বলেছেন, তিনি রাসূল ﷺ-এর সাজদার জায়গায় আড়াআড়ি হয়ে শুয়ে থাকতেন। রাসূল ﷺ সাজদা করার কালে তার পায়ে চিমটি কাটতেন, তখন তিনি পা গুটিয়ে নিতেন। তিনি সাজদা থেকে উঠে দাঁড়ালে আয়িশা (রা) পুনরায় পা ছড়িয়ে দিতেন।

এই উভয় ধরনের বর্ণনার মাঝে পার্থক্য হলো, অতিক্রম করা এবং অবস্থান করার। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

সালাম ফিরানোর পর রাসূল ﷺ কী করতেন কী পড়তেন

(ফরয) নামাজের সালাম ফিরানোর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কী করতেন, কীভাবে বসতেন? কী পড়তেন এবং কী কী যিক্‌র-আযকার করতেন-এখন সেসব কথাই নিম্নে আলোচনা করা হবে।

---

18 বুখারী, মুসলিম ও সহীহ ইবনু খুযাইমা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ সামনে সুতরা (আড়াল) রেখে নামাজ পড়া সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি তার নামাজের সামনে দিয়ে অর্থাৎ আড়ালের ভেতর দিক দিয়ে অতিক্রম করতে উদ্যত হয়, তবে নামাজী যেন বুক দিয়ে তাকে প্রতিরোধ করে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তাকে যেন সাধ্যমতো প্রতিহত করে। অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে: তাকে (ইশারায়) দুইবার নিষেধ করবে। এতেও যদি সে না মানে, তবে তার সাথে লড়তে হবে, কারণ সে শয়তান।

বুখারী, মুসলিম ও সহীহ্ ইবনু খুযাইমা গ্রন্থে আরো উল্লেখ হয়েছে: নামাজীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানত, এর পরিণতি কত বয়াবহ, তবে সে নামাজীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ পর্যন্ত অপেক্ষা করাকেও উত্তম মনে করতো।

এখানে 'চল্লিশ পর্যন্ত' মানে-চল্লিশ দিন, বা চল্লিশ বছর কিংবা চল্লিশ ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

www.waytojannah.com

Contents

সহীহ মুসলিমে আয়িশা ও সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতেন, তখন তিনবার– أَسْتَغْفِرُ اللهَ (আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) বলতেন।[১৯] এরপর বলতেন–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

অর্থ: হে আল্লাহ, শান্তির উৎস তুমি, তোমার থেকেই শান্তি আসে। হে প্রতাপশালী মহা মর্যাদার অধিকারী, তুমি বড়ই বরকতময়-প্রাচুর্যশালী।"

সালাম ফিরানোর পর এই কথাগুলো বলতে যতটুকু সময় ব্যয় হতো, শুধু ততটুকু সময়ই তিনি কিবলামুখী থাকতেন। এ বাক্যটি পাঠ করার পর তিনি উঠে যেতেন, কিংবা মুক্তাদিদের দিকে ফিরে বসতেন। কখনো ডানদিক থেকে, কখনো বামদিক থেকে মুক্তাদিদের দিকে ঘুরে বসতেন। বুখারী ও মুসলিম ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশিরভাগ সময়ই বামদিক থেকে ঘুরে বসতেন।"

সহীহ মুসলিমে আনাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ সময়ই ডানদিকে ঘুরে বসতেন।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ ডানদিক থেকেও এবং বামদিক থেকেও ঘুরে বসেছেন। তিনি সোজাসুজি মুক্তাদিদের দিকে মুখ করে বসতেন। একদিক বাদ দিয়ে বিশেষ করে আরেকদিকে ঘুরে বসতেন না। সোজাসুজি বসে সকলের প্রতি দৃষ্টি দিতেন। ফজর নামাজ পড়ার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি নামাজের স্থানে বসে থাকতেন।

নামাজ শেষে যেসব যিকর ও দু'আ পড়তেন

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে মুগীরা ইবনু শু'বা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক ফরয নামাজের পর এই কথাগুলো বলতেন:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

উচ্চারণ: লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লা-হুম্মা লা-মা- নি'আ লিমা আ'তাইতা, ওয়ালা- মু'তিয়া লিমা-মানা'তা ওয়ালা- ইয়্যানফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

---

19 সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত: আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামাজের সমাপ্তি বুঝতে পারতাম তাঁর তাকবীর উচ্চারণ করা থেকে।

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরানোর পর উচ্চস্বরে "আল্লাহু আকবার" বলতেন।

কাজেই হাদিস অনুযায়ী প্রথমে একবার "আল্লাহু আকবার" উচ্চারণ করে তারপর তিনবার "আস্তাগফিরুল্লাহ" পড়া সঠিক বলে মনে হয়। এ পরই 'আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম ওয়া মিনকাস্ সালাম ..... পড়া উচিত।

www.waytojannah.com

Contents

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শারীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁর। আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, তুমি যা দিয়েছ তা রোধ করার কেউ নেই। আর তুমি যা রোধ করেছ তা দান করার সাধ্য কারও নেই, আর ধনবানদের ধন তোমার আযাবের সামনে কোনো উপকার করতে পারে না। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হাতিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, নাবী করীম ﷺ নামাজ শেষ করার পর বলতেন: "হে আল্লাহ, আমার দীনকে পরিশুদ্ধ করে দাও, যা আমার যাবতীয় কাজের রক্ষক। তুমি আমার দুনিয়াকে ঠিক করে দাও, যেখানে দিয়েছ আমার জীবিকা। হে আল্লাহ, আমি তোমার সন্তোষ দ্বারা তোমার অসন্তোষ থেকে আশ্রয় চাই। তোমার ক্ষমা দ্বারা তোমার প্রতিশোধ থেকে আশ্রয় চাই। আর আমি তোমার (শাস্তি) থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তুমি দিতে চাইলে ফিরাবার সাধ্য কারো নেই, আর না দিতে চাইলে দিবার সাধ্যও কারো নেই। তোমার সামনে কোনো সম্পদশালীর সম্পদ আর কোনো মর্যাদাবানের মর্যাদাই কাজে আসে না।" (সহীহ আবু হাতিম)

হাকিম তাঁর মুসতাদরকে আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে হাদিস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি যখনই তোমাদের প্রিয় নবীর পেছনে নামাজ পড়েছি, তখন অবশ্যই নামাজ শেষে তাঁকে একথাগুলো বলতে শুনেছি: "হে আল্লাহ, আমার যাবতীয় ভুলত্রুটি এবং গুনাহখাতা মাফ করে দাও। হে আল্লাহ, আমাকে উত্থিত করো, আমাকে জীবন দাও, জীবিকা দাও আর জীবন যাপনের তাওফিক দাও শুদ্ধ আমল ও চরিত্রের ভিত্তিতে। কারণ তুমি তাওফিক না দিলে কেউ সেভাবে জীবন যাপন করতে পারে না। তুমি ছাড়া কেউ মানুষকে মন্দ ও অমঙ্গল থেকে দূরে রাখতে পারে না।"

সহীহ মুসলিমে ইবনু যুবায়ের (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজের সালাম ফিরাতেন, তখন উচ্চস্বরে এই কথাগুলো উচ্চারণ করতেন:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَـــدِيْرٌ. وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْـــبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّـــنَاءُ الْحَسَنُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

উচ্চারণ: লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন কাদীর, ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- কুউওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ্। লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা- ইয়্যাহু লাহুন্ নি'আমাহু, ওয়া লাহুল ফাযলু ওয়া লাহুস সানাউল হাসান। লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিসীনা লাহুদ্দীন, ওয়ালাও কারিহাল কা-ফিরূন।

অর্থ: আল্লাহ! তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তার অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের কিংবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ছাড়া, তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়েই কেউ ধারণা করতে পারে না। তাঁর আসন আসমান ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয় না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান।

www.waytojannah.com

Contents

নামাজ শেষে ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা

আবু দাউদে আলী (রা) থেকে একটি বর্ণনা উল্লেখ হয়েছে। তাতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরানোর সময় বলতেন:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ ، اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে মাফ করে দাও, মাফ করে দাও আমার আগে-পরের এবং গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় গুনাহ। মাফ করে দাও আমার সব সীমালঙ্ঘন। মাফ করে দাও আমার সেইসব গুনাহ যা সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে ভালো জানো। এগিয়ে দাও, তুমিই পিছিয়ে দাও। তুমি ছাড়া কোনো ত্রাণকর্তা নেই।

এ দু'আটি সম্পর্কে ইমাম মুসলিম দুটি মত ব্যক্ত করেছেন।

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ এটি তাশাহ্হুদ ও সালামের মাঝখানে পড়তেন। মূলত এ মতটিই সঠিক।

২. তাঁর দ্বিতীয় মত হলো রাসূল ﷺ এটি সালামের পরে পড়তেন।

– সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ সালামের আগে এবং পরে উভয় ক্ষেত্রেই এই দু'আটি পড়তেন। প্রকৃত বিষয়টি আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা) তাঁর সন্তানদের এই কথাগুলো শিখাতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের পরে এভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِن الْبُخْلِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْـــنَةِ الدُّنْيَا وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল জুবনী, ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল বুখলী, ওয়া আ'উযুবিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আর যালিল 'উমুরি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিতনাতিদ্ দুনিয়া ওয়া আউযুবিকা মিন 'আযা-বিল কাব্‌র।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি ভীরুতা ও কৃপণতা থেকে। তোমার নিকট আরও আশ্রয় চাচ্ছি শেষ জীবনের বার্ধক্যতা থেকে যাতে মানুষের উপর বোঝা না হয়ে যাই এবং আরও আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার ফিত্না[20] এবং কবরের 'আযাব থেকে। (বুখারী)

নামাজ শেষে সাক্ষ্য (শাহাদাত) প্রদান

মুসনাদে আহমাদে যায়েদ ইবনু আরকাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাজের পরে, একথাগুলো বলতেন: "হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু এবং সকল জিনিসের প্রভু ও মালিক, আমি সাক্ষী, তুমিই একমাত্র প্রভু, তুমি একক, তোমার কোনো শরীক নেই। হে আল্লাহ্, আমাদের ও প্রতিটি জিনিসের প্রভু, আমি সাক্ষী আছি, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ তোমার দাস ও রাসূল। হে আল্লাহ্, আমাদের এবং প্রত্যেকটি জিনিসের প্রভু, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি বান্দাহরা সবাই ভাই ভাই। হে আল্লাহ্, আমাদের প্রভু

20 'ফিতনা' অর্থ: কঠিন বিপদে ফেলে ঈমানের পরীক্ষা নেয়া।

www.waytojannah.com

Contents

এবং প্রতিটি জিনিসের প্রভু, দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিটি মুহূর্তে আমাকে ও আমার পরিবারকে তোমার জন্যে একমুখী ও একনিষ্ঠ বানিয়ে দাও। হে মহামর্যাদাবান মহাসম্মানিত, তুমি আমার আবেদন শুনো এবং কবুল করো। আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ই মহাবিশ্ব আর এই পৃথিবীর আলো। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতম তিনি। আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। সর্বোত্তম ভরসাস্থল তিনি। আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার।"

হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ এবং ইমাম আবু দাউদ।

নামাজ শেষে তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর বলা

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতের জন্যে এ রীতিটা পছন্দ করে গেছেন যে, নামাজ শেষ করার পর তারা– سُبْحَانَ اللهِ তেত্রিশবার পড়বে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ তেত্রিশবার পড়বে, اَللهُ اَكْبَرُ তেত্রিশবার পড়বে এবং তারপর–

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيْرٌ.

–একবার পড়ে মোট এক শ' বার পূর্ণ করবে।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের শেষে তেত্রিশবার "সুবহানাল্লাহ", তেত্রিশবার "আলহামদুলিল্লাহ", তেত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' সর্বমোট নিরানব্বই বার এই কথাগুলো উচ্চারণ করবে, অতঃপর "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু..... আলা কুলি শাইয়ীন কাদীর" উচ্চারণ করে এক শ' পূর্ণ করবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে, এমনকি তা যদি সমুদ্রের ফেনার মতো ব্যাপকও হয়ে থাকে।

অবশ্য সহীহ মুসলিমে কা'আব ইবনু উজরা (রা) থেকে এ সম্পর্কে যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ঐ ব্যক্তি কখনো নিরাশ হবে না যে প্রত্যেক নামাজ শেষে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। (সহীহ মুসলিম)

নামাজের পরে পড়ার জন্য সাহাবাগণকে যা শিখিয়েছেন

আবু যর, আবু আইউব আনসারী ও আবদুর রহমান ইবনু গানাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী করীম ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের সালাম ফিরাবার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোক্ত কথাগুলো দশবার উচ্চারণ করবে, সেজন্য তার দশটি নেকী প্রাপ্য হবে, দশটি গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং তার মর্যাদার দশটি ধাপ বৃদ্ধি করা হবে। তাছাড়া এই কথাগুলো তার জন্য চারটি ক্রীতদাস আজাদ করে দেয়ার সমতুল্য হবে এবং এই কথাগুলো তার জন্যে শাইতান থেকে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। এগুলো পড়তে থাকলে শিরক ব্যতীত অন্যান্য পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আর এই কথাগুলো তার আমলকে সুন্দর করবে। কথাগুলো হলো:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيْرٌ.

উচ্চারণ: লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

www.waytojannah.com

Contents

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর।

(ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বাক্যগুলো সম্পর্কে একথাও বলেছেন: কোনো ব্যক্তি যদি ফজরের সময় এ বাক্যগুলো পড়ে, তবে মাগরিব পর্যন্ত সে শাইতানের খপ্পর থেকে রক্ষা পাবে। আর সে যদি মাগরিবেও একথাগুলো পড়ে, তবে ফজর পর্যন্ত সে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি পাবে।

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদিসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহ সংকলনে হারিস ইবনু মুসলিম আত-তাইমীর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, নাবী করীম ﷺ আমাকে বলেছেন: তুমি যখন ফজর নামাজ শেষ করবে, তখন অন্য কোনো কথা বলার আগে এই কথাটি সাতবার বলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চেয়ো। মাগরিবের (ফরয) নামাজের পরেও এই কথাগুলো সাতবার বলবে। তুমি যদি ঐদিন বা ঐ রাত্রে মারা যাও, তবে আল্লাহ্ তোমার জন্য জাহান্নাম থেকে নাজাত লিখে দেবেন। সাতবার মুক্তি চাওয়ার সেই বাক্যটি হলো:

اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আজিরনী মিনান্না-র।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নামের 'আযার থেকে রক্ষা করো'। (আবূ দাউদ, হাসান)

ইমাম নাসায়ী তাঁর 'আল কবীর' গ্রন্থে আবী উমার (রা) থেকে এবং ইমাম বায়হাকি তাঁর 'শু'আবুল ঈমানে' আলী (রা) থেকে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নাবী করীম ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাজের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে[21] মৃত্যু ব্যতীত তার জান্নাতে প্রবেশের পথে আর কোনো বাধা থাকবে না।

---

21 আয়াতুল কুরসী আল্লাহ্ পাকের অসীম ক্ষমতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত কুরআনের একটি বিখ্যাত আয়াত। এটি সূরা 'আল বাকারার' ২৫৫ নম্বর আয়াত। প্রত্যেক মুমিনেরই আয়াতটি মুখস্ত করা এবং এর অর্থ জানা উচিত। তা হলো–

اللهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

উচ্চারণ: আল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ূম লা- তা'খুজুহু সিনাতুঁউ ওয়ালা নাওম। লাহু মা- ফিস সামা-ওয়াতি ওয়ামা- ফিল আরযি মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইন্দাহু ইল্লা- বিইয্নিহি। ইয়া'লামু মা- বাইনা আইদীহিম, ওয়ামা- খালফাহুম। ওয়ালা- ইউহীতূনা বিশাইয়্যিম মিন 'ইলমিহি ইল্লা বিমা- শা-আ, ওয়াসি'আ কুরসী ইউ হুস্সামাওয়া-তি ওয়াল আরযি, ওয়ালা- ইয়া উদুহু হিফযুহুমা- ওয়া হুয়াল 'আলীয়্যুল 'আযীম।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন্ত ও প্রতিষ্ঠিত। তাঁকে তন্দ্রা কিংবা নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর জন্য। কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তিনি অগ্র-পশ্চাতের যাবতীয় ব্যাপারে অবগত। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তাঁর 'ইল্মের কিঞ্চিতাংশও কেউ আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর সিংহাসন সমস্ত নভোমণ্ডল ও পৃথিবী ব্যাপী পরিব্যপ্ত। এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণে তাঁর মোটেই বেগ পেতে হয় না। তিনি বিরাট ও মহান।

www.waytojannah.com

Contents

হাদিসটি এছাড়াও আরো বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য হাদিসটি সহীহ্ ও য'ঈফ হবার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেকে বলেছেন, হাদিসটি সূত্রের দিক থেকে দুর্বল এবং গ্রহণযোগ্য নয়। আবার অনেকে বলেছেন, সূত্রের (সনদের) দিক থেকে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও যেহেতু হাদিসটি অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ফলে এর মধ্যে সত্যতার নির্যাস থাকতে পারে।

মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকি, আবু হাতিম, ইবনু হিব্বান, হাকিম ইত্যাদি গ্রন্থে উকবা ইবনু আমির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রত্যেক নামাজের পরে সূরা ফালাক ও সূরা নাস (কুরআনের শেষ দুইটি সূরা) পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।

তাবারানী তাঁর মু'জামে এবং আবু ইয়ালা তাঁর মুসনাদে উমার ইবনু নুবহানের সূত্রে জাবির (রা) থেকে মারফু হাদিস বর্ণনা করেছেন যে: এমন তিনটি কাজ রয়েছে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে কাজগুলো করবে, সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে, আর সঙ্গী হিসেবে লাভ করতে পারবে আয়তনয়না হুরের। সে তিনটি কাজ হলো:

১. নিজের হত্যাকারীদের ক্ষমা করে দেয়া,
২. গোপন ঋণ পরিশোধ করে দেয়া এবং
৩. প্রত্যেক ফরয নামাজের পর দশবার 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ... সূরা (সূরা ইখলাস) পাঠ করা।

আবু বাকার (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এই তিনটির একটি কাজ করলেও কি তা পাওয়া যাবে? তিনি বললেন হ্যাঁ, একটি কাজ করলেও।

আবু দাউদে সহীহ রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মু'আয (রা)-কে প্রত্যেক নামাজের পর আল্লাহ্র নিকট এভাবে সাহায্য চাইতে অসিয়ত করে গেছেন:

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আ'ইন্নী 'আলা- যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবা-দাতিক।

অর্থ: "হে আল্লাহ, তোমার যিক্র, শোকর ও সুন্দর 'ইবাদাতের জন্য তুমি আমায় সহায়তা করো।"

এখানে 'নামাজের পরে' বলতে সালাম ফিরাবার আগেও হতে পারে, পরেও হতে পারে। আমাদের উস্তাদ (ইমাম ইবনু তাইমিয়া) বলেছেন, নামাজের পরে মানে– শেষ প্রান্তে। অর্থাৎ সালামের পূর্বে।

www.waytojannah.com

Contents

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরজের আগে-পরে যেসব নামাজ পড়তেন[২২]

ফরজের আগে-পরে তিনি কয় রাকাত পড়তেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবাসে (অর্থাৎ, মুকীম অবস্থায়) ফরজের আগে-পরে নিয়মিত দশ রাকাত নামাজ পড়তেন।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) এই দশ রাকাতের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন:

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (ফরজের আগে পরের) দশ রাকাত নামাজ স্মরণ তথা হিফজ করে রেখেছি। তিনি:

– যুহরের আগে দুই রাকাত পড়তেন।

– যুহরের পরে দুই রাকাত পড়তেন।

– মাগরিবের পরে ঘরে গিয়ে দুই রাকাত পড়তেন।

– এশার পরে ঘরে গিয়ে দুই রাকাত পড়তেন।

– ফজরের আগে দুই রাকাত পড়তেন। (বুখারী ও মুসলিম)

সফর ব্যতীত তিনি এই দুই রাকাত নিয়মিত পড়তেন। যুহরে একবার দুই রাকাত বাদ পড়েছিল, তখন তিনি সেই দুই রাকাত আসরে পরে পড়েন। এই দুই দুই রাকাতের ব্যাপারে তাঁর নিয়ম স্থায়ী ছিলো। তিনি একবার কোন নিয়ম চালু করলে তা চালিয়ে যেতেন। অবশ্য দশের স্থলে কোন কোন বর্ণনায় রাকাতের উল্লেখও আছে।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ মুসলিমে উম্মুল মুমিনী উম্মু হাবীবার সূত্রে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। উম্মে হাবীবা (রা) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি দিন রাতে ফরজের অতিরিক্ত বার রাকাত নামাজ পড়বে, সেগুলোর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে।

ইমাম তিরমিযী এই বর্ণনায় এই কথাগুলো ও যোগ করেছেন:

– "যুহরের আগে চার রাকাত।

– যুহরের পরে দুই রাকাত।

– মাগরিবের পরে দুই রাকাত।

– এশার পরে দুই রাকাত।

– ফজরের আগে দুই রাকাত।"

ইবনু মাজাহয় উম্মু মুমিনীন আয়িশা (রা) থেকে মারফূ হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে উম্মে হাবীবা (রা)এর অনুরূপ বার রাকাতের কথা উল্লেখ হয়েছে।

---

22 এ অধ্যায়ের যেসব নামাজের কথা আলোচিত হয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল হিসেবে ফরজের সঙ্গে (অর্থাৎ, ফরজের আগে-পরে) পড়তেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের এসব নামাজ পড়েছেন এবং উম্মাতকে পড়তে বলেছেন, উৎসহিত করেছেন, কাজেই এই নামাজগুলো উম্মাতের জন্য সুন্নাত।

www.waytojannah.com

Contents

সহীহ মুসলিমেও আয়িশা (রা)-এর একটি বর্ণনা এরকম উল্লেখ হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু শাকীক বলেন, আমি মা আয়িশাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নফল নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের আগে আমার ঘরে চার রাকাত নামাজ পড়তেন। তারপর মাসজিদে গিয়ে লোকদের নামাজ পড়িয়ে আবার আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকাত নামাজ পড়তেন। তিনি লোকদের মাগরিবের নামাজ পড়িয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকাত নামাজ পড়তেন। লোকদের এশার নামাজ পড়িয়েও আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকাত নামাজ পড়তেন।.... আর ফজরেরর সূচনাতে দুই রাকাত নামাজ পড়তেন।

সব নফলের (সুন্নতের) মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের আগের দু'ই রাকাত এবং বিতর নামাজের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন।

যুহরের আগে চার রাকাত, না দুই রাকাত?

যুহরের আগের রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে দুই প্রকার বর্ণনা পাওয়া গেল। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের আগে দুই রাকাত পড়তেন। অপর দিকে আয়িশা এবং উম্মে হাবীবা (রা)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, চার রাকাত পড়তেন।

হয়তো তিনি কখনো দুই রাকাত এবং কখনো চার রাকাত পড়তেন। দুইটি বর্ণনাই সহীহ। বর্ণনাকারী ইবনু উমার (রা) এবং আয়িশা ও উম্মু হাবীবা (রা) যে যা দেখেছেন, তাই বর্ণনা করেছেন।

ব্যাপারটা এমন হতে পারে যে, এই চার রাকাত যুহরের আগের নামাজ ঘরে পড়লে চার রাকাত পড়তেন, আর মাসজিদে পড়লে দুই রাকাত পড়তেন।

– হাদীস থেকে একথা স্পষ্টই মনে হয়।

আবার এমনটিও হতে পারে যে, এই চার রাকাত যুহরের সুন্নত নয়, বরং তা আলাদা নামাজ এবং সূর্য হেলার পর এই চার রাকাত তিনি পড়তেন। বিভিন্ন হাদীস থেকে এ মতের পক্ষে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন; মুসনাদে আহমাদে আবদুল্লাহ ইবনু সায়িব থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য হেলার পর চার রাকাত নামাজ পড়তেন। তিনি বলেছেন: সূর্য হেলার পরের সময়টা এ রকম যে, তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, তাই আমার বড়ই পছন্দ যে, ঐ সময় আমার কিছু আমল উপরে উঠুক।

সুনান গ্রন্থসমূহে আয়িশা (রা) থেকে একথাও উল্লেখ হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি কখনো কোন কারণে যুহরের আগে চার রাকাত নামাজ আদায় করতে না পারতেন, তখন তিনি তা যুহরের পরে পড়ে নিতেন। ইবনু মাজাহতে উল্লেখ হয়েছে, যুহরের আগে চার রাকাত নামাজ কখনো পড়তে না পারলে আসরের পরে পড়ে নিতেন।

তিরমিযীতে আলী (রা) থেকেও যুহরের আগে চার রাকাত এবং পরে দুই রাকাতের উল্লেখ হয়েছে।

ইবনু মাজাহয় আয়িশা (রা) থেকে এক বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের আগে চার রাকাত নামাজ পড়তেন। তাতে লম্বা কিয়াম করতেন আর রুকু সাজদা উত্তমভাবে (দীর্ঘভাবে) করতেন।

এসব বর্ণনা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যুহরের আগের চার রাকাত আসলে আলাদা চার রাকাত, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য হেলার পরে পড়তেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

www.waytojannah.com

Contents

যুহরের পূর্বে সুন্নত মূলত দু' রাকাত, যা আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বর্ণনা করেছেন। এটা অন্যান্য নামাজের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, সব নামাজেরই সুন্নত দুই রাকাত দুই রাকাত। এমনকি ফজরের পূর্বে প্রচুর সময় থাকা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ ফজরের সাথে শুধু দুই রাকাতে পড়তেন।

তাই যুহরের পূর্বের চার রাকাত নামাজ মূলত স্বতন্ত্র নামাজ, সূর্য হেলার নামাজ।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) সূর্য হেলার পর আট রাকাত নামাজ পড়তেন। তিনি বলতেন এ নামাজ দুপুর রাতের আমরা যে নামাজ (তাহাজ্জুদ) পড়ি, তার সমমর্যাদা সম্পন্ন। আল্লাহই ভালো জানেন।

আসরের পূর্বে কি তিনি কোন নামাজ পড়তেন

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের আগে চার রাকাত নামাজ পড়তেন। যেমন–

১. আহমাদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা)-এর সূত্রে আসরের আগে চার রাকাত (সুন্নত) নামাজের কথা উল্লেখ করেছেন।

২. তিরমিযী আলী (রা)-এর সূত্রে আসরের পূর্বে চার রাকাত নামাজের কথা উল্লেখ করেছন।

৩. তিরমিযী আলী (রা)-এর সূত্রে আসরের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পড়ার কথাও উল্লেখ করেছেন।

প্রথম বর্ণনাটির বিশুদ্ধতা নিয়ে মতভেদ আছে। শুধু ইবনু হিব্বান তাকে সহীহ বলেছেন। বাকি সকল মুহাদ্দিস এটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। আসলেই এই বর্ণনাটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। তা ছাড়া আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে সহীহ সূত্রে যেসব বর্ণনা পাওয়া গেছে, তাতে তিনি বলেছেন, আমি রাসূল ﷺ থেকে দিনে রাতে দশ রাকাত নামাজের কথা মনে রেখেছি।

তাঁর দশ রাকাতের মধ্যে আসরের আগে চার রাকাত নামাজের কোনো উল্লেখ নেই। ফলে এখানে চার রাকাতের যে বর্ণনা তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় বর্ণনাটির ব্যাপারে আমি শুনেছি, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া এটিকে হাদীস হিসেবে গণ্য করতে অস্বীকার করতেন। তিনি এটির প্রতিবাদ করতেন। তিনি এটিকে মাওজু (মনগড়া) বলতেন। আবূ ইসহাক জুযাজানী ও এটিকে অস্বীকার করতেন।

ফলে আসরের আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন নফল নামাজ পড়ছেন বলে সহীহ শুদ্ধভাবে জানা যায় না।

মাগরিবের আগে কি কোনো নামাজ আছে

সহীহ মুসলিমে এসেছে, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মদীনায় যখন মুয়ায্যিন মাগরিবের আজান দিত, লোকেরা তাড়াতাড়ি করে মাসজিদের খুঁটিসমূহের দিকে যেত এবং দু' রাকাত নামাজ পড়ত। এত বেশি লোক তখন দুই রাকাত নামাজ পড়তে থাকত, যে হঠাৎ কোন লোক এলে মনে করত, জামাত বুঝি শেষ হয়ে গেছে।

সহীহ বুখারী বর্ণিত হয়েছে, মারসাদ ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একবার উকবা ইবনু আমের আল জুহানী (রা)-এর নিকট এলাম। আমি তাকে বললাম, আমি আপনাকে আবূ তামীম সম্পর্কে একটি আজব কথা শুনাব কি? সেটা হলো: তিনি মাগরিবের আগে দুই রাকাত নামাজ পড়েন। আমার কথা শুনে উকবা বললেন: আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় এই দুই রাকাত পড়তাম। আমি বললাম: এখন পড়েন না কেন? তিনি বললেন: ব্যস্ততার কারণে।

www.waytojannah.com

Contents

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, মুখতার ইবনু ফুলফুল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একবার আসরের পরে দুই রাকাত নাফল নামাজ পড়া সম্পর্কে আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন: আসরের পরে যারা নামাজ পড়ার জন্য হাত বাঁধত, উমার (রা) তাদের হাতে আঘাত করতেন। পূর্বে আমরা দুই রাকাত নফল সূর্যাস্তের পর এবং মাগরিবের নামাজের পূর্বে আমরা দুই রাকাত নফল নামাজ পড়তাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও কি এই দুই রাকাত পড়তেন? জবাবে তিনি বলেন: তিনি আমাদের পড়তে দেখতেন। তবে পড়তে নির্দেশও দেননি, নিষেধও করেননি।

– এসব বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, মাগরিবের আগে দুই রাকাত নামাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক অনুমোদিত।

সুন্নত নামাজ ঘরে পড়া সুন্নত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: হে লোকেরা তোমরা ঘরে নামাজ পড়ো। জেনে রাখো, ফরজ ছাড়া অন্যান্য নামাজ ঘরে পড়া উত্তম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতি ছিল যে, কোন অসুবিধা না থাকলে তিনি সুন্নত ও নফল নামাজ ঘরেই পড়তেন। ঠিক তেমনি সফর, অসুস্থতা ইত্যাদি কোনো কারণ না ঘটলে তিনি ফরজ নামাজ মাসজিদেই পড়তেন।

আমরা ইতঃপূর্বে সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত আয়িশার বর্ণনা উল্লেখ করেছি। তাতে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর নামাজের আগে আমার ঘরে চার রাকাত পড়তেন। তারপর মাসজিদে গিয়ে লোকদের নামাজ পড়াতেন। তারপর ঘরে ফিরে এসে দুই রাকাত নামাজ পড়তেন। তিনি লোকদের মাগরিবের নামা পড়িয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকাত নামাজ পড়তেন। লোকদের এশার নামাজ পড়িয়ে তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকাত নামাজ পড়তেন।

তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে কা'ব ইবনু উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বানী আবদুল আশহালের মাসজিদে আসেন এবং সেখানে মাগিরবের নামাজ পড়েন। (ফরজ) নামাজ শেষ হবার পর তিনি দেখতে পেলেন, লোকেরা নফল (সুন্নত) পড়ায় মগ্ন হয়েছে। তিনি তিনি বললেন:

"এই নামাজ তো ঘরের নামাজ।"

তিরমিযী ও নাসায়ীতে বর্ণিত হাদীসটির ভাষা হলো: ফরজ শেষে লোকেরা নফল পড়তে শুরু করে। তখন নাবী করীম ﷺ তাদের বললেন: তোমাদের উচিত এই নামাজ ঘরে পড়া।

বিভিন্ন বর্ণনায় ফজরের সুন্নত সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ-এ নামাজ ঘরেই পড়তেন।

বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, কেউ যদি সুন্নত ও নফল নামাজ মাসজিদে পড়ে, তবে তা জায়েয। যেমন কারণবশত ফরজ নামাজ ঘরে পড়া জায়েয। অবশ্য সুন্নত পন্থা হলো তাই, যা উপরে আলোচিত হয়েছে।

www.waytojannah.com

Contents

সফরের নামাজ

সফরে রাসূল (ফরজ) নামাজ দু'রাকাত করে পড়তেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রিসালাতকালে মোটামুটি চার প্রকার সফর করেছেন। সেগুলো হলো:

১. হিজরতের সফর।
২. আল্লাহর পথে জিহাদের সফর। এ সফরই সবচেয়ে বেশি করেছেন।
৩. উমরার সফর।
৪. হাজ্জের সফর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরে রওয়ানা হতেন, তখন সফর শেষে মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজসমূহে কসর (হ্রাস) করে দুই রাকাত পড়তেন।

সফরে তিনি চার রাকাত পুরো পড়েছেন বলে প্রমাণ নেই। অবশ্য এ সম্পর্কে আয়িশা (রা) থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, রাসূল ﷺ সফরে কখনো কসর করতেন, আবার কখনো পুরো পড়তেন। কিন্তু এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র)-ও বলেছেন, এটি লোকদের মনগড়া হাদীস। আয়িশা (রা) কী করে রাসূল ﷺ এবং সকল সাহাবায়ে কিরামের কার্যধারার বিপরীত কোনো কথা বর্ণনা করতে পারেন।[২৩]

প্রমাণিত হাদিস থেকে জানা যায়, আল্লাহ তা'আলা প্রথমত, প্রতি ওয়াক্ত নামাজই দুই রাকাত করে ফরয করেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন আবাসে নামাজের রাকাত সংখ্যা করা হয়। আর প্রবাসের (সফরের) নামাজ পূর্ববৎ বহাল রাখা হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সকল সফরেই সব নামাজ দুই রাকাত করে পড়েছেন, তিনি কোনো ওয়াক্তে চার রাকাত পড়েছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। তাঁর ব্যাপারে কী করে এ সন্দেহ করা যেতে পারে যে, তিনি রীতি বহির্ভূত কাজ করেছেন? মুসলমানরা তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। তাঁরা কেউই তাঁকে সফরে চার রাকাত

---

23 রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ সফরে কিভাবে নামাজ পড়তেন, সে সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস এখানে উল্লেখ করা হলো:
ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নাবীর মাধ্যমে আবাসে চার রাকাত এবং প্রবাসে (সফরে) দুইরাকাত নামাজ ফরয করেছেন। তা ছাড়া আল্লাহ তায়ালা ভীত-সন্ত্রস্তকালে এক রাকাত নামাজ ফরজ করেছেন। (সহীহ মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনু উমার এবং আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) উভয় থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে দুই রাকাত নামাজ পড়ার নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। এই দুই রাকাত মূলত পূর্ণ নামাজ, হ্রাসকৃত নয় (বরং আবাসের নামাজ দুই রাকাত বৃদ্ধি করা হয়েছে। তা ছাড়া নবী করীম ﷺ সফরে বিতির নামাজও পড়তেন। (ইবনু মাজাহ)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মক্কা রওয়ানা করি। আমরা মক্কা থেকে মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি (চার রাকাতের) নামাজ দুই রাকাত পড়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে অনেক যুদ্ধে শরীক হয়েছি। মক্কা বিজয়কালেও আমি তাঁর সাথে ছিলাম। এ সময় তিনি মক্কায় আঠার রাত অবস্থান করেন, এ সময় তিনি নামাজ দুই রাকাত করে পড়েছেন। (সুনানে আবূ দাউদ)

www.waytojannah.com

Contents

নামাজ পড়তে দেখেননি। আয়িশার বক্তব্যের ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন, "আয়িশার নিজস্ব একটি ব্যাখ্যা ছিল, যেমন নিজস্ব একটি ব্যাখ্যা ছিল উসমানের।"[২৪]

বলা হয়ে থাকে, আয়িশার ধারণা ছিল, নামাজ কসর করার জন্য সফর শর্ত এবং সফরের সাথে ভয় ও আক্রমণের আশঙ্কা থাকাও শর্ত। তাই তাঁর মতে যে সফরে ভয়ের কারণ থাকে না এবং আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না, সেই সফরে নামাজ কসর করারও কারণ থাকে না।

এই ব্যাখ্যা একেবারেই ভুল। তা ছাড়া এ ব্যাখ্যা রাসূল ﷺ-এর রীতির খেলাফ। কারণ সাহাবায়ে কিরাম থেকে একথা সুপ্রমাণিত যে, রাসূল ﷺ নিরাপদ সফরেও সর্বদা নামাজ কসর করতেন।

এ সম্পর্কে উমারের বর্ণনা খুবই চমৎকার। তিনি বলেন: নিরাপদ সফরে রাসূল ﷺ-কে নামাজ কসর করতে দেখে আমি বিস্ময়বোধ করি এবং তাকে কসরের আয়াতটি উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করি: আল্লাহ্ তাআলা তো বলেছেন: তোমরা যদি আশঙ্কা কর, কাফিররা তোমাদেরকে বিপদে ফেলবে, তবে তোমরা নামাজ কসর করতে পার। আমরা তো এখন নিরাপদ সফর করছি, তবু আপনি নামাজ কসর করলেন, এর কারণ কি? জবাবে রাসূল ﷺ বলেন: এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি একটি দান (অবকাশ, অনুগ্রহ)। সুতরাং তোমরা তাঁর দেয়া এই দান (অবকাশ ও অনুগ্রহ) গ্রহণ করো।[২৫] (সহীহ মুসলিম)

এ থেকে বুঝা গেল, কোনো আয়াতের নিজস্বভাবে তাৎপর্য বুঝা উম্মাতের দায়িত্ব নয়, বরং রাসূল (শরীয়ত প্রণেতা) ﷺ কোনো আয়াত দ্বারা যে বিধান নির্ণয় করেন, তা মান্য করাই উম্মেতের কর্তব্য।

একবার উমাইয়া ইবনু খালিদ আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা)-কে বললেন: কুরআনে তো আমরা কেবল মুকীম অবস্থার এবং ভয়কালীন নামাজের কথা দেখতে পাই, সফরের নমাজের কোনো কথা তো কুরআনে নেই। তাহলে সফরের নামাজ এলো কোত্থেকে? জবাবে আবদুল্লাহ ইবনু উমার বলেন: হে আমার ভাই, আমরা তো কিছুই জানতাম না। আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ ﷺ-কে আমাদের জন্য নাবী বানিয়ে পাঠালেন। অতএব আমরা তা-ই করি, যা তাঁকে করতে দেখেছি।

আয়িশার বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেছেন, ঐ হাদিসটি মনগড়া। কেউ সেটি রচনা করে আয়িশার নামে চালিয়ে দিয়ে থাকবে। কারণ সাহাবাগণের যাবতীয় বর্ণনা থেকে এটা সুপ্রমাণিত যে, সফরে রাসূল ﷺ দুই রাকাতই পড়তেন, চার রাকাত পড়েতেন না। উসমান মিনায় চার রাকাত পড়েছেন বিয়ের কথা বলে।

---

24 এ সংক্রান্ত হাদীস নিম্নরূপ: উরওয়া ইবনু যুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আমার খালা) আয়িশা (রা) বলেছেন: নামাজ দুই রাকাত দুই রাকাত করেই ফরয হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত করার পর চার রকাত ফরজ করা হয়, তবে সফরের নামাজ আগের মতোই। তবে আপনার খালা আয়িশা (রা) কেন সফরে চার রাকাত পড়তেন? জবাবে উরওয়া বলেন: এ ব্যাপারে তাঁর একটি ব্যাখ্যা ছিল, যেমন উসমানের একটি ব্যাখ্যা ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)
ব্যাখ্যা: আয়িশার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, তিনি মনে করতনে, সফরে ভয়-ভীতির সম্মুখীন হলেই নামাজ কসর করতে হবে, নতুবা নয়।
উসমান একবার হজ্জের সময় মিনায় চার রাকাত নামাজ পড়েন। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন: আমি এখানে এসে বিয়ে করেছি। আর রাসূল ﷺ বলেছেন: কেউ সফরে গিয়ে কোথাও বিয়ে করলে, সে সেখানে মুকীম হয়ে যাবে এবং পূর্ণ নামাজ পড়বে।

25 এ সংক্রান্ত আরেকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো: হারিসা বিন ওহাব খুযায়ী (রঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে মিনয় চার রাকাতের স্থলে দুই রাতাক নামাজ পড়েছেন, অথচ এ সময় আমরা ছিলাম সকল ভয়-ভীতি থেকে সম্পর্ণ নিরাপদ। (বখারী ও মুসলিম) –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

Contents

রসূল ﷺ সফরে সুন্নত পড়তেন না

রাসূল ﷺ সফরে চার রাকাতের ফরজ নামাজ হ্রাস করে দুই রাকাত পড়তেন। সফরে তিনি বিতির এবং ফজরের সুন্নত ছাড়া ফরজ নামাজের আগে-পরে আর কোনো সুন্নত নামাজ পড়েছেন বলে প্রমাণ নেই। হ্যাঁ, বিতির এবং ফজরের সুন্নত তিনি আবাসে-প্রবাসে সব সময়ই পড়তেন।

সফরে সুন্নত পড়া সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনু উমারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: আমি সব সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সফরসঙ্গী থেকেছি। কিন্তু কখনো তাঁকে তাসবীহ (সুন্নত নামাজ) পড়তে দেখিনি। তিনিই আমাদের আদর্শ এবং অনুসরণীয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ।

বুখারী ও মুসলিমে ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত: রাসূল ﷺ সফরে বিতির এবং রাত্রের নফল নামাজ সোয়ারীর পিঠে ইশারা করে পড়তেন। তবে ফরজ নামাজ সাওয়ারীর পিঠে পড়তেন না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল থেকে একথা প্রমাণিত যে, তিনি সফরে ফরজ নামাজ কসর করতেন, রাত্রের নফল নামাজও পড়তেন।

বুখারী ও মুসলিমে আমির ইবনু রবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সফরকালে রাত্রিবেলায় সাওয়ারীর পিঠে বসে নফল নামাজ পড়তে দেখেছি। আসলে এটা ছিল কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদ নামাজ।

ইমাম আহমদকে সফরে নফল নামাজ পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: আমি আশা করি সফরে নফল পড়লে কোনো দোষ হবে না।

হাসান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহর সাহাবীগণ সফরে ফরজ নামাজের আগে-পরে নফল নামাজ পড়তেন। উমার, আলী, ইবনু মাসউদ, জাবির, আনাস, ইবনু আব্বাস, অবু যর (রা) অনুরূপ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

তবে আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) সফরে ফরজ নামাজের আগে-পরে কোনো সুন্নত নামাজ পড়তেন না। কেবল শেষ রাত্রে বিতির ও তাহাজ্জুদ পড়তেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতি এই ছিল যে, তিনি সফরে ফরজ নামাজ কসর করতেন এবং ফরজের আগে-পরে আর কোনো নামাজ পড়তেন না। তবে ফরজের আগে-পরে নফল পড়তে নিষেধও করতেন না। অবশ্য এগুলো ছিল সাধারণ নফল-ফরজ নামাজের সাথে সম্পর্কিত নয়। কারণ মুসাফিরের সুবিধার জন্য যে ফরজ নামাজই হ্রাস করে দুই রাকাত করা হয়েছে, সেখানে ফরজের আগে-পরে সুন্নত নামাজের রীতি চালু রাখার তো কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। এমনটি হলে তো ফরজ নামাজ পূর্ণ করাই উত্তম ছিল। এজন্যই আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেছেন: সফরে ফরজের আগে-পরে সুন্নত নামাজ পড়ার দরকার হলে তার চেয়ে ফরজ নামাজই (কসর না করে) পূর্ণ করতাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের আগে চার রাকাত আর যুহরের পরে দুই রাকাত নামাজ কখনো ছাড়তেন না বলে আয়িশার যে বর্ণনাটি রয়েছে, তা আবাসের নামাজের জন্য প্রযোজ্য, প্রবাসের নামাজের জন্য নয়।

www.waytojannah.com

Contents

তিনি যানবাহনে নামাজ পড়েছেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতি ছিল যে, তিনি যখন সাওয়ারী অথবা যানবাহনে ভ্রমণরত থাকতেন, তখন বাহনের উপরই নফল নামাজ পড়তেন।[২৬] বাহন যেদিকেই চলত, ঘুরত, স্বাভাবিকভাবে তিনি সেদিকে ফিরেই নামাজ পড়তেন। এ সময় তিনি ইশারায় মাথা নুইয়ে রুকূ সাজদা করতেন। তবে রুকূর চেয়ে সাজদায় মাথা বেশি নোয়াতেন।

মুসনাদে আহমাদ এবং আবূ দাউদে আনাস (রা) থেকে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, তাকবীরে তাহরীমার সময় তিনি বাহনকে কিবলামুখী করে নিতেন। তারপর বাকি নামাজ বাহন যেদিকে যেত সেদিকে ফিরেই পড়তেন।

–এ হাদীসটি বিতর্কিত। কারণ, অনেকগুলো সহীহ হাদীসের বক্তব্যের সাথে এ হাদীসের বক্তব্যর মিল নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহনে নামাজ পড়ার বিষয়ে অন্য যারা বর্ণনা করেছেন, তাদের সকলের বর্ণনার মধ্যে মিল রয়েছে। তাঁরা সকলেই বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহনে নামাজ পড়েছেন এবং বাহন যে মুখী হতো, তিনিও সে মুখী হয়েই নামাজ পড়তেন। এসব বর্ণনায় তারা এমন কোন কথা উল্লেখ করেননি যে, তাকবীরের তাহরীমার সময় রাসূল ﷺ বাহনকে কিবলামুখী করে নিতেন। এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন আমির ইবনু রবীয়া, আবদুল্লাহ ইবনু উমার, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা)। এই হাদীসগুলো আনাস (রা) বর্ণিত উক্ত হাদীস থেকে অধিকতর সহীহ-শুদ্ধ। (আল্লাহই অধিক জানেন)

বৃষ্টির সময় এবং কাদামাটির স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ফরজ নামাজও যানবাহনে পড়েছেন। অবশ্য এ বিষয়ে একাধিক সূত্রের বর্ণনা নেই। কেবল একজন সাহাবীই এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী ও নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি হলো: একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে নিয়ে একটি প্রশস্ত জায়গায় উপনীত হন। সেখানে তাঁদের উপর থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল আর নিচে ছিল কাদামাটি। এমন সময় নামাজের ওয়াক্ত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে মুয়াযযিন আজান এবং ইকামত দিলো। রাসূল ﷺ নিজের বাহনে করে সবার সামনে চলে গেলেন এবং ইমাম হিসেবে সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে নামাজ পড়েন। তাঁরা সবাই নিজ নিজ বাহন থেকে নামাজ পড়েন। রাসূল ﷺ ইশারায় রুকূ-সাজদা করেন। তবে রুকূর চেয়ে সাজদায় মাথা অধিকতর নিচু করেন।

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। অর্থাৎ, এক পর্যায়ে হাদিসটির বর্ণনাকারী মাত্র একজন ছিলেন। এক পর্যায়ে উমার ইবনু রিমাহ একাই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অবশ্য আনাস (রা) বাহনে ফরজ নামাজ পড়েছেন বলে প্রমাণ আছে।[২৭]

---

26 এ সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য গ্রন্থে ইবনু উমার, জাবির, আমির প্রমুখ (রা) থেকে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ফরজ নামাজের জন্য যেহেতু রাসূল ﷺ জামাত কায়িম করতেন আর তখনকার বাহন পশুর পিঠে জামাত কায়িম করা সম্ভব ছিল না, তাই ফরজ নামাজের সময় বাহন থেকে নেমে জামাত কায়েম করতেন।

27 হাদীসটি একক সূত্রে বর্ণিত হলেও যুক্তিসংগত। কারণ, বাহন থেকে নেমে যমীনে জামাত কায়িম করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিলে বাহনে নামাজ পড়াটাই যুক্তিসংগত। আধুনিককালের যানবাহনের ক্ষেত্রে হাদীসটি খুবই প্রযোজ্য– যেমন লঞ্চ। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

Contents

তিনি দুই ওয়াক্ত একত্রে পড়েছেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতি ছিল, তিনি যদি সূর্য হেলার আগে সফরে বেরুতেন, তাহলে যুহর নামাজকে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন। অতঃপর আসরের সময় যুহর ও আসর একত্রে পড়তেন। যদি সূর্য হেলার পর সফরে রওয়ানা করতেন, তাহলে যুহরের সময় যুহর ও আসর একত্রে পড়ে রওয়ানা করতেন।

যদি মাগরিবের সময় তাড়াহুড়া করে যাত্রা শুরু করতেন, তাহলে মাগরিবের নামাজকে বিলম্বিত করে ইশার সময় মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়তেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাবুক সফর সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে: তাবুক সফরে কোনো মনযিলে থেকে রওয়ানা করার প্রাক্কালে রাসূল ﷺ যদি সূর্য হেলার পর রওয়ানা করতেন, তবে যুহরের সময় যুহর ও আসর একত্রে পড়ে রওয়ানা করতেন। যদি সূর্য হেলার পূর্বে যাত্রা করতেন, তবে যুহরকে বিলম্বিত করে আসরের সময় যুহর ও আসর একত্রে পড়তেন। মাগরিব ও ইশার ক্ষেত্রেও অনুরূপ করতেন। এই হাদীসটির ব্যাপার মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে:

কেউ কেউ বলেছেন, হাদীসটি সহীহ্ বা বিশুদ্ধ।

কেউ কেউ বলেছেন, হাদীসটি হাসান বা উত্তম।

কেউ কেউ বলেছেন, হাদীসটি ত্রুটিপূর্ণ।

কিন্তু আমরা সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছি, এই বক্তব্যের ব্যাপারে হাদীসে কোনো ত্রুটি নেই। যেমন, একই বক্তব্য নিয়ে যে হাদীস হাকিম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সেটির সূত্র বা সানাদ সহীহ্ হবার সকল শর্ত পূর্ণ করেছে।

হাকিম বলেছেন, আমার কাছে আবূ বকর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ বালুয়াহ্ বর্ণনা করেছেন, তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন মূসা ইবনু হারূন, তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন কুতাইবাতুল সাঈদ, তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন লাইছ ইবনু সা'দ, তিনি শুনেছেন ইয়াযীদ ইবনু আবি হাবীব থেকে, তিন শুনেছেন আবূ তুফাইল থেকে, তিনি মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) থেকে। মুয়ায (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন: তাবুক যুদ্ধের সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই (কোনো মনযিল থেকে) সূর্য হেলার পূর্বে রওয়ানা করতেন, তখন যুহর নামাজকে আসর পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন এবং আসরের সময় যুহর ও আসর একত্রে পড়তেন। যদি সূর্য হেলার পরে রওয়ানা করতেন, তবে (যুহরের সময়) যুহর ও আসর একত্রে পড়ে রওযানা করতেন। যদি সূর্যাস্তের পূর্বে রওয়ানা রকতেন, তবে মাগরিব নামাজকে ইশা পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন এবং ইশার সময় মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়তেন। যদি সূর্যাস্তের পরে রওয়ানা করতেন তবে ইশাকে এগিয়ে এনে মাগরিবের সময় মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়ে রওয়ানা করতেন।

– হাকিম বলেছেন, এই হাদিসটি একদল বিশ্বস্ত (হাদিসের) ইমাম বর্ণনা করেছেন। হাদিসটিতে কোনো প্রকার ত্রুটি কিংবা দুর্বলতা নেই।[28] যারা হাদিসটিতে ত্রুটি আছে বলে উল্লেখ করেছেন, তারা মূলত এই হাদীসের একজন রাবির ব্যাপারে কথা তুলেছেন। সেই রাবী সম্পর্কে তাঁরা ভুলবশতই সমালোচনা করেছেন। ইমাম মুসলিমসহ হাদিসের ইমামগণ তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

এ ছাড়া হাদিসটির বক্তব্য যে সঠিক তার প্রমাণ আরো অনেকগুলো হাদিস থেকে পাওয়া যায়।[29] ইবনু আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ বক্তব্য সংবলিত হাদিস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

---

28 হাদিসটি আবূ দাউদ এবং তিরমিযীতেও বর্ণিত হয়েছে।

29 সহীহ বুখারীতে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে থাকাকালে যুহর ও আসর নামাজ একত্রে পড়তেন এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়তেন।

www.waytojannah.com

Contents

ইমাম ইবনু তাইমিয়া দুই নামাজ একত্রে পড়ার হাদীসসমূহ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, সফরে কোনো স্থানে অবস্থানের সময়, যখন কষ্ট থাকে না তখনো দুই নামাজ একত্রে পড়া বৈধ। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফায় অবস্থানকালে যুহর ও আসর একত্রে পড়েছেন। তা ছাড়া সফরে যদি এবং প্রয়োজনের দেখা দেয়, সে অবস্থায় দুই নামাজ একত্র পড়া তো উত্তম কাজ। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ, ইমাম শাফেয়ী রহ ও ইমাম মালিক (র) বলেছেন, দুই নামাজ একত্রে করার বিষয়টি সাধারণভাবে সফরের সাথে জড়িত। কোনো বিশেষ ধরনের সফরের সাথে দুই নামাজ একত্র করার বিষয়টি খাস (নির্দিষ্ট) নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ:) একত্র করার বিষয়টি শুধু আরাফার জন্য খাস বলে মনে করেন।

উম্মাতের অধিকাংশ পূর্বসূরীগণ (সালাফে সালেহীন) সব ধরনের ছোট বড় সফরেই নামাজ কসর ও একত্র করতেন।

নামাজ কসর ও একত্র করার জন্যে সফরের দূরত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরের দূরত্বের কোনো সীমারেখা নির্ধারণ করে দেননি। সাহাবীগণও কোনো সীমারেখার কথা বলেননি। কতটা দূরের সফর হলে নামাজ সকর করা যাবে, একত্র করা যাবে, (ফরজ) রোজা স্থগিত করা যাবে এসবের কিছুই রাসূল ﷺ উল্লেখ করেননি। রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ সাধারণভাবে সফর শব্দ ব্যবহার করেছেন।

অনেকে মক্কা ও জিদ্দার ব্যবধান এবং মক্কা ও তায়িফের ব্যবধানকে (অর্থাৎ, ৪৮ মাইলকে) সফরের ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড ধরেছেন। কিন্তু রাসূল ﷺ এবং সাহাবীগণ এমন কিছু নির্ধারণ করে দেননি। তাঁরা সফর কথাটি বলেছেন। সুতরাং যে দূরত্বকে সাধারণভাবে সফর বলা হয়, সেটাই সফর। মাইল নির্ধারণ করা আমাদের দায়িত্ব নয়।

তাই সফর বলা হয় এমন ছোট বড় সব সফরেই কসর, একত্র, রোজা স্থগিত করণ, তাইয়াম্মুম ইত্যাদি বৈধ।

শত্রুভীতিকালীন নামাজ

একই সঙ্গে সফর ও শত্রু আক্রমণ-ভীতি যোগ হল সেই অবস্থায় আল্লাহ তাআলা নামাজের আরকান এবং রাকাত সংখ্যা উভয়টাই সংক্ষেপ করার অনুমতি দিয়েছেন।

নির্বিঘ্নে (শত্রু আক্রমণের ভয়হীন) সফরকালে শুধু রাকাত সংখ্যা সংক্ষেপ করার অনুমতি দিয়েছেন।

আর সফরবিহীন ভীতিকর পরিস্থিতিতে শুধু নামাজের আরকান সংক্ষেপ করার অনুমতি দিয়েছেন।

– এটাই ছিল রাসূল ﷺ কর্তৃক প্রবর্তিত নামাজ কসর (সংক্ষেপ) করার নিয়ম। কুরআনের কসর সংক্রান্ত আয়াতের ভিত্তিতেই তিনি এই কৌশল অবলম্বন করেন।[৩০]

বুখারীতে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে: রাসূল ﷺ সফরে মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়তেন।

বুখারীতে আনাস রা: থেকে বর্ণিত হয়েছে: রাসূল ﷺ সূর্য হেলিয়ে পূর্বে যাত্রা করলে যুহরকে আসর পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন এবং আসরের সময় যুহর ও আসর একত্রে পড়তেন। বুখারীতে সালিম থেকে বর্ণিত, সফরের কষ্টের কারণে রাসূল ﷺ মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে পড়তেন।

30 কুরআন মজীদে দুইটি সূরায় এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। একটি হলো সূরা আল বাকারা: ২৩৮ ও ২৩৯ আয়াত এবং আরেকটি হলো সূরা আন-নিসা: ১০১ ও ১০২ আয়াত। এখানে উভয় সূরার আয়াতগুলি উল্লেখ হলো:

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ {٢٣٨} فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ {٢٣٩}

www.waytojannah.com

শত্রুভীতিকালীন পরিস্থিতিতে রাসূল ﷺ-এর নামাজের পদ্ধতি ছিল এই যে, শত্রু যদি তাঁর ও বিকলার মাঝে অবস্থান করত, তাহলে তাঁর সঙ্গি সাথী সকল মুসলমানকে তাঁর পিছে নামাজে দাঁড় করাতেন। তিনি তাকবীর বলতেন, তাঁরাও সবাই তাকবীর বলত। তিনি রুকূতে যেতেন, তারাও সবাই রুকূতে যেত। তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে দাঁড়াতেন, তারাও সবাই মাথা তুলে দাঁড়াত। তারপর তিনি যখন সাজদায় যেতেন তখন তাঁর নিকটবর্তী (অর্থাৎ সমানের) কাতার তাঁর সাথে সাজদায় যেত আর পেছনের কাতার শত্রুমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। এভাবে যখন তিনি প্রথম রাকাতে শেষ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকাতের জন্য সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, তখন পিছের কাতারের লোকেরা সামনে চলে যেত আর সামনের লোকের পিছনের কাতারে চলে আসত। পিছের কাতারের লোকেরা যাতে ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকাতে দুইটি সাজদা করতে পারে, সে জন্যই তারা সামনে আসত, যেমনটি প্রথম রাকাতে সামনের কাতারের লোকেরা করেছিল। এভাবে ইমামের সঙ্গে উভয়ের নামাজ সমান হতো।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দ্বিতীয় রাকাতের রুকূতে যেতেন, তখন প্রথম রাকাতের মতো সামনে পিছের সকলেই তাঁর সাথে রুকূতে যেত। কিন্তু তিনি যখন দ্বিতীয় রাকাতের সাজদায় যেতেন, তখন সামনের কাতারের লোকেরা তাঁর সাথে সাজদায় যেত, আর পিছের কাতারের লোকেরা শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে থাকত। অতঃপর তিনি যখন তাশাহহুদের জন্য বসতেন, তখন পিছের কাতারের লোকেরা দুই সাজদা সেরে নিত এবং তাঁর সাথে তাশাহহুদে শরীক হতো। অতঃপর সবাই একত্রে তাঁর সাথে সালাম ফিরাত।

অর্থ: সমস্ত নামাজকে হিফাযত করো, বিশেষ করে মধ্যম নামাজকে। আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয় সহকারে দাঁড়াও। তবে অশান্তি ও গোলযোগের আশঙ্কা থাকলে পায়ে হেঁটে অথবা বাহনে চড়ে যেভাবেই সম্ভব নামাজ পড়ো। আর নিপারদ পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেলে আল্লাহকে সেই পদ্ধতিতে স্মরণ করো (নামাজ পড়ো) যা তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন ইতঃপূর্বে যা তোমাদের অজ্ঞাত ছিল। (সূরা আল বাকারা: ২৩৮-২৩৯)

সূরা নিসায় বলা হয়েছে:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيناً {١٠١} وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً {١٠٢}

অর্থ: আর যখন তোমরা সফরে বের হও তখন নামাজ সংক্ষেপ করে নিলে কোনো ক্ষতি নেই। (বিশেষ করে) যখন তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিররা তোমাদের কষ্ট দেবে। কারণ তারা প্রকাশ্যে তোমাদের শত্রুতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। হে নাবী, যখন তুমি মুসলমানদের মধ্যে থাকো এবং (যুদ্ধাবস্থায়) তাদেরকে নামাজ পড়াবার জন্য দাঁড়াও, তখন তাদের মধ্যে থেকে একটি দলের তোমার সাথে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত এবং তারা অস্ত্রশস্ত্র সংগে নেবে। তারপর তারা সাজদা করে নিলে পেছনে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দলটি , যারা এখনো নামাজ পড়েনি, তারা এসে তোমার সাথে নামাজ পড়বে। আর তারাও সতর্ক থাকবে এবং নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র বহন করবে। কারণ কাফিররা সুযোগের অপেক্ষায় আছে। তোমরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্রের দিকে থেকে সামান্য গাফিল হলেই তারা তোমাদের উপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবে যদি তোমরা বৃষ্টির কারণে কষ্ট অনুভব করো, অথবা অসুস্থ থাকো, তাহলে অস্ত্র রেখে দিলে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু তবুও সর্তক থাকো। (সূরা: আন্-নিসা- ১০১-১০২)

www.waytojannah.com

Contents

শত্রু যদি কিবলার দিকে না হয়ে অন্য কোনো দিকে হতো, তাহলে তিনি সাথীদের দুই গ্রুপে ভাগ করে নিতেন। একটি গ্রুপ শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকত। অপর গ্রুপটি তাঁর সাথে এক রাকাত নামাজ পড়ে শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে থাকা গ্রুপের স্থলে গিয়ে দাঁড়াত এবং দাঁড়িয়ে থাকা গ্রুপটি এসে তাঁর সাথে দ্বিতীয় রাকাতে শামিল হয়ে এক রাকাত নামাজ পড়ত। অতঃপর তিনি সালাম ফিরাতেন। আর তারা উভয় গ্রুপ পালাক্রমে নিজস্বভাবে এক রাকাত করে পড়ে নিত।

শত্রু কিবলার দিকে না হয়ে অন্য দিকে হলে আবার কখনো তিনি সাথীদের দুই গ্রুপ করে নিয়ে প্রথম গ্রুপের নিয়ে প্রথম রাকাত পড়ে দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়াতেন। তাঁর এই দাঁড়ানো থাকা অবস্থাতেই এই প্রথম গ্রুপ নিজের আরেক রাকাত পড়ে নিত এবং সালাম ফিরিয়ে চলে যেত। এ সময় দ্বিতীয় গ্রুপ এসে তাঁর সাথে দ্বিতীয় রাকাতে শরীক হত। এদের নিয়ে দ্বিতীয় রাকাত পড়ে যখন তিনি তাশাহহুদের জন্য বসতেন। তখন তারা উঠে দাঁড়াত এবং রয়ে যাওয়া এক রাকাত নিজেরা পূরা করে নিত। এ সময় তিনি তাদের এক রাকাত শেষ করার জন্য তাশাহহুদের বৈঠকে অপেক্ষা করতে থাকতেন। অতঃপর তাদেরও তাশাহহুদ শেষ হলে তিনি তাদের নিয়ে একত্রে সালাম ফিরাতেন।

আবার কখনো এমনটি করতেন যে, একটি গ্রুপকে নিয়ে দুই রাকাত পড়ে তাশাহহুদের জন্য বসতেন। এ সময় ঐ গ্রুপটি নিজেরা সালাম ফিরিয়ে চলে যেত এবং তাদের স্থলে অপর গ্রুপটি আসত। তখন তিনি তাশাহহুদের বৈঠক থেকে দাঁড়িয়ে এদেরকে সাথে নিয়েও দুইরাকাত পড়াতেন অতঃপর সালাম ফিরাতেন।

– এ পদ্ধতিতে তাঁর হতো চার রাকাত আর সাহাবাগণের হতো দুই রাকাত করে।

আবার কখনো তিনি একটি গ্রুপকে সাথে নিয়ে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেলতেন। পুনরায় আরেকটি গ্রুপকে সাথে নিয়ে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাতেন।

– এ পদ্ধতিতে তাঁর নামাজ হতো দু বার।

কখনো তিনি একটি গ্রুপটি নিয়ে এক রাকাত পড়তেন। এ গ্রুপটি এক রাকাত পড়েই চলে যেত। দ্বিতীয় রাকাত এরা পড়ত না।

অতঃপর আরেকটি গ্রুপ এসে তাঁর সাথে দ্বিতীয় রাকাত পড়ত।

– এ পদ্ধতিতে তাঁর হতো দুই রাকাত এবং সাহাবাগণ মাত্র এক রাকাত এক রাকাত পড়তেন।

শত্রু কর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কা কালে এসবগুলো পদ্ধতিতেই নামাজ পড়া বৈধ।

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল বলেছেন, এই সবগুলো পদ্ধতিই রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত, তাই অনুরূপ পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হলে এই সব পদ্ধতিতেই নামাজ পড়া জায়েয।

এ ছাড়াও আরো কিছু পদ্ধতির কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোই সঠিক।

ইবনু আব্বাস, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ, তাউস, মুজাহিদ, হাসান বসরী, কাতাদা, হাকাম ও ইসহাক ইবনু রাহওইহী (রা)-এর মাযহাব হলো, প্রত্যেক গ্রুপ এক রাকাত এক রাকাত করে পড়বে।

www.waytojannah.com

Contents

জুমু'আর নামাজ

জুমার নামাজ কিভাবে শুরু হলো

ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক সূত্র উল্লেখ করে আবদুর রহমান ইবনু কা'ব ইবনু মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান বলেন, আমার আব্বা কা'ব ইবনু মালিক বৃদ্ধ অবস্থায় পৌঁছুলে যখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল, তখন আমি তাঁকে হাতে ধরে পথ দেখিয়ে এদিক সেদিক নিতাম। আমি যখন তাঁকে জুমার নামাজ পড়তে নিয়ে চললাম, তখন পথিমধ্যে তিনি জুমার আজান শুনতে পেলেন। আজান শুনেই তিনি আবূ উমামা আসআদ ইবনু যুরারাহর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে আমার কৌতূহল হলো। কিন্তু তাঁর প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবোধের কারণে সেদিন আর আমি কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না।

এরপর থেকে প্রত্যেক জুমাবারেই আমি তাঁকে জুমার নামাজে নিয়ে যেতাম। জুমার আজান শুনলেই তিনি আবূ উমামা আসআদ ইবনু যুরারাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। কৌতূহলের আধিক্যে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেই বসলাম: আব্বা, আপনি জুমার আজান শুনলেই আসআদ ইবনু যুরারাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে কেন?

জবাবে আব্বা বললেন: বৎস, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরত করে মদীনায় আসার পূর্বে তিনিই আমাদের নিয়ে নাকীর বিরান ভূ-খণ্ডে জুমার নামাজ পড়ার সূচনা করেছিলেন। এ জায়গাকে বলা হতো নাকীউল খাছামাত।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তখন আপনারা কতজন জুমার নামাজ পড়তেন? তিনি বললেন: চল্লিশ জন।

এ হাদীসটি একটি উত্তম ও বিশুদ্ধ সূত্রের হাদিস। এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত।

– আমার মতে এটাই জুমার নামাজের সূচনা।

অতঃপর রাসূলাল্লাহ ﷺ হিজরত করে মদীনায় এলেন। প্রথমে তিনি মদীনায় উপকণ্ঠে বনী আমর ইবনু আউফের কুবা নামক স্থানে অবস্থান করেন। ইবনু ইসহাকের মতে, তিনি এখানে সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবারে কুবার মাসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। অতঃপর শুক্রবারে এখান থেকে সম্মুখে যাত্রা করেন। তিনি যখন সালিম ইবনু আউফ গোত্রে পৌঁছেন, তখন জুমার নামাজের সময় হয়। তিনি সেই প্রান্তরে অবস্থিত মাসজিদে জুমার নামাজ পড়েন।

মদীনায় হিজরত করে আসার পর এটাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রথম জুমার নামাজ। এখানেই তিনি জুমার প্রথম খুতবা প্রদান করেন। ইবনু ইসহাক বলেছেন, আমি আবূ সালামা ইবনু আব্দুর রহমান থেকে তাঁর প্রথম খুতবাটি শুনতে পেয়েছি। রাসূলাল্লাহর নামে কোনো ভুল কথা বলা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

তিনি তাঁর এই প্রথম খুতবায় প্রথমে আল্লাহ তাআলার যথোপযুক্ত হামদ ও সানা পাঠ করেন। অতঃপর বলেন:

أَمَّابعد أَيُّهَا النَّاسُ فَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ تَعْلَمُنَّ وَاللهِ لَيَصْعَقَنَّ اَحَدُكُمْ ثُمَّ لَيَدَعَنَّ غَنَمَهُ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ لَهُ رَبُّهُ لَيْسَ لَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَاحَاجِبٌ يَحْجُبُهُ دُوْنَهُ اَلَمْ يَأْتِكَ رَسُوْلِى فَبَلَغَكَ وَآتَيْتُكَ مَالاً وَأَفْضَلْتُ عَلَيْكَ فَمَا

www.waytojannah.com

Contents

قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ؟ فَلَيَنْظُرَنَّ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَلاَ يَرَى شَيْئًا ثُمَّ لَيَنْظُرَنَّ قُدَّامَهُ فَلاَ يَرَى غَيْرَ جَهَنَّمَ فَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّقِيَ بِوَجْهِهِ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَاِنَّهَا تُجْزِىْ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

অর্থাৎ, হে মানুষ, নিজের জন্য পুণ্য আগেই পাঠাও। মনে রাখবে, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, হঠাৎ তোমাদের মৃত্যু হবে, তখন তোমাদের বকরীগুলো রাখাল শূন্য হয়ে পড়বে। মৃত ব্যক্তি আল্লাহর কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার কাছে কি আমার রাসূল যায়নি? তোমাকে কি সে আমার বাণী পৌঁছায়নি? আমি তোমাকে কি ধন সম্পদ দিইনি? তোমাকে কি বিভিন্ন মর্যাদায় ভূষিত করিনি? তা হলে তুমি তোমার জন্য আগাম কি পাঠিয়েছ? তখন সে ডানে ও বামে তাকাতে থাকবে? কিন্তু সে কিছুই দেখেতে পাবে না। তারপর সম্মুখে তাকাবে এবং সে নিজের সামনে জাহান্নাম দেখবে। সুতরাং একটি খেজুর দান করে হলেও যতটুকু পারো, সেই ভীষণ আগুন থেকে নিজেকে বাঁচানো চেষ্টা করো। তাও যে পারবো না, সে যেন সুন্দর কথা বলে বিদায় দেয়, কারণ তা পূণ্য কাজের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। তার পুণ্য দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত হবে। তোমাদের প্রতি শান্তি, রহমত ও বরকত নেমে আসুক।

ইবনু ইসহাক বলেন: অতঃপর তিনি এখানে আরেকটি নিম্নরূপ খুতবা দিয়েছিলেন: "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তাঁরই প্রশংসা করছি এবং তাঁরই সাহায্য কামনা করছি। আমরা নিজের আত্মার ক্ষতি সাধন ও পাপ কার্য থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান কেউ তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না এবং তিনি যাকে বিভ্রান্ত করে দেন, কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই। তিনি একক ও অংশীদারহীন। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কালাম। আল্লাহ যার অন্তরকে তা দিয়ে অলংকৃত করেছেন এবং কুফরী থেকে যাকে ইসলামে এনেছেন, সে অবশ্য সফল হয়েছে। অন্যান্য কথা থেকে এ কালামকে বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে। কারণ এ হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকারিক বাক্য। আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাসবে। নিজ অন্তরের সব ভালোবাসা আল্লাহর জন্য উৎসর্গ কর। আল্লাহর কালাম পাঠ ও তাঁর স্মরণ থেকে বিরত হয়ো না। তোমাদের অন্তর যেন পবিত্র কালামের ব্যাপারে কঠিন হয়ে না যায়। কারণ আল্লাহ তাআলা সেটাকে উত্তম কাজ ও সর্বোত্তম বাণী আখ্যা দিয়েছেন। তাতে মানুষের জন্য যা কিছু হালাল বা হারাম করা হয়েছে, তা মওজুদ আছে। তাই আল্লাহর দাসত্ব কর। তাঁর সাথে কিছুমাত্র শরীক করো না। তাঁকে ভয় করার মতো ভয় কর। আল্লাহর দয়ায় পরস্পরকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদাভঙ্গকারীর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তোমাদের প্রতি আল্লাহ তরফ থেকে শান্তি, বরকত ও রহমত নাজিল হোক।"

খুতবার অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত আরো তথ্য আলোচিত হবে।

জুমার দিনের মর্যাদা

বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: দুনিয়াতে আমরা শেষ উম্মাত, কিন্তু আখিরাতে আমরাই সবার আগে থাকব। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, এই পৃথিবীতে তারা আমাদের আগে কিতাব লাভ করেছে, আর আমরা লাভ করেছি তাদের পরে। জুমার দিনটি তাদেরই

www.waytojannah.com

Contents

দিন ছিল। কিন্তু তারা এ দিনটি নিয়ে মতভেদ করল। ফলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই দিনটির সন্ধান দিলেন। অন্যরা এ বিষয়ে আমাদের পিছে পড়ল। ইহুদীরা শনিবারকে বেছে নিল আর খ্রিস্টানরা বেছে নিল রবিবারকে।

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেনঃ সূর্যোদয়ের মাধ্যমে যেসব দিনের সূচনা হয়, তন্মধ্যে (অর্থাৎ সকল দিনের মধ্যে) জুমার দিন সর্বোত্তম।

কারণ এই দিনেই–

– আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

– এ দিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে।

– এ দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠনো হয়েছে।

– আর জুমার দিনই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।

ইবনু মাজাহর একটি বর্ণনায় এসেছে, "এই দিনেই আদমের মৃত্যু হয়েছে।"

দুআ কবুলের এক পরম মুহূর্ত

বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরা (রঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ জুমার দিনে এমন একটি বিশেষ সময় রয়েছে, কোনো মুসলিম বান্দা যদি সে সময়টি পায় এবং আল্লাহর নিকট কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে তা দান করেন।

– এই বিশেষ সময়টির ব্যাপারে বিশুদ্ধ সূত্রে আরো অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেই বিশেষ সময়টি কোন সময়? তা সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা কঠিন। কারণ বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন সময়ের কথা উল্লেখ হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এই বিশেষ সময়টি নির্দিষ্ট নয়, বরং আবির্তত হয়। একেক সপ্তাহে একেক সময়ে সেই বিশেষ মুহূর্তটি আসে। যারা নির্দিষ্ট সময়ের কথা বর্ণনা করেছেন, তাদের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

ক. ইবনুল মুনজির আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ সেই বিশেষ সময়টি হলো ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়া থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের নামাজের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

খ. ইবনুল মুনজির, হাসান বসরি এবং আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেছেনঃ সে সময়টি সূর্য হেলার সময়।

গ. ইবনুল মুনজির আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ সে সময়টি হলো, মুয়াযযিন কর্তৃক জুমার আজান দেয়ায় সময়।

ঘ. ইবনুল মুনজির হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেছেন সে সময়টি হলো, ইমাম যখন খুতবা প্রদানের জন্য মিম্বরে বসে, তখন থেকে খুতবা শেষ করা পর্যন্ত।

ঙ. আবূ বুরদা বলেছেন সে সময়টি হলো জুমার নামাজের সময়।

চ. আবুস সাওয়ার আদাভি বলেছেন, পূর্ববর্তী লোকেরা মনে করতেন, সে সময়টি হলো সূর্য হেলার পর থেকে নামাজের সময় পর্যন্ত।

ছ. আবূ যর বলেছেন, সময়টি হলো সূর্যোদয় থেকে সূর্য গজ খানেক উপরে উঠা পর্যন্ত।

www.waytojannah.com

Contents

জ. আবূ হুরাইরা, আতা, আবদুল্লাহ ইবনু সালাম এবং তাউস বলেছেন, সে সময়টি হলো, আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

ঝ. অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী এবং আহমদ ইবনু হাম্বলের মতে, সে সময়টি হলো, আসরের পরে দিনের শেষ সময়টি।

ঞ. ইমাম নাববী প্রমুখ বলেছেন, সে সময়টি হলো, ইমাম মাসজিদের উদ্দেশে বের হওয়া থেকে নিয়ে নামাজ শেষ করা পর্যন্ত।

ট. আল মুগনী প্রণেতা বলেছেন, সময়টি হলো, দিনের তৃতীয় ভাগ।

এই এগারটি মতের মধ্যে কেবল দুইটি মতই প্রাধান্য পেতে পারে। ঐ দুইটি মতের পক্ষেই আমরা সহীহ ও প্রমাণিত হাদিস পাই। সে দু'টি মত হলো:

১. ইমামের মিম্বারে বসার পর থেকে নামাজ শেষ করা পর্যন্ত। এই মতের দলিল হলো সহীহ মুসলিম বর্ণিত আবূ বুরদার হাদিস। আবূ মূসার পুত্র আবূ বুরদা (রা) বলেন, আমি আমার পিতার নিকট থেকে শুনেছি, তিনি জুমার দিনের দু'আ কবুলের সেই বিশেষ সময়টি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন: সেই সময়টি হলো ইমাম মিম্বারে বসা থেকে নিয়ে নামাজ শেষ করা পর্যন্ত

এ প্রসঙ্গে আরেকটি সহীহ হাদিস হলো ইবনু মাজাহ এবং তিরমিযীতে বর্ণিত আমর ইবনু আউফ আল মুযানীর হাদিস। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, জুমার দিনে এমন একটি সময় আছে, যখন বান্দা আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহর অবশ্য তাকে তা দান করেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেই মুহূর্তটি কখন? তিনি বললেন: নামাজ (জুমার নামাজ) কায়েম হবার সূচনা থেকে নিয়ে শেষ হওয়া পর্যন্ত।

২. দ্বিতীয় বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সে সময়টি হলো, আসরের নামাজ পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই মতের পক্ষে বিশুদ্ধ হাদিস রয়েছে। মুসনাদে আহমাদে আবূ সাঈদ আল-খুদরি (রা) ও আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: দু'আ কবুলের সেই বিশেষ সময়টি হলো, আসরের পরে।

আবূ দাউদ এবং নাসায়ীতে জাবির (রা:) থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আসরের পরে দিনের শেষ প্রান্তে সে সময়টিকে তালাশ করো।"

ইবনু মাজাহতে আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা) থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

জুমার দিনের উত্তম বৈশিষ্টসমূহ

জুমার দিনের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সুস্পষ্ট। শুধু আলেমদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, আরাফা ও জুমার দিনের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? আমরা এখানে জুমার দিনের উত্তম বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরছি, যাতে করে জুমার দিনের মর্যাদার সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার দিন ফজরের নামাজে সূরা আস্-সাজদা এবং সূরা আদদাহর (সূরা নং ৩২ ও ৭৬) পাঠ করতেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ: বলছেন, রাসূল ﷺ জুমার দিন

www.waytojannah.com

Contents

ফজরের নামাজে এ সূরা দুইটি পড়ার কারণ হলো এ দুটো সূরাতে সেই সব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, যা জুমার দিন সংঘটিত হয়েছে বা হবে। যেমন আদম সৃষ্টি , পুনরুত্থান, হাশর, কিয়ামত ইত্যাদি। জুমু'আবারে এসব বিষয়ে লোকদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই রাসূল ﷺ সেদিন সকালে এ সূরা দুইটি পড়তেন।

২. এদিন রাসূল ﷺ-এর উপর অধিক অধিক সালাত (দরূদ) পাঠ করা মুস্তাহাব। তিনি বলেছেন: তোমরা জুমার দিন আমার প্রতি বেশি বেশি সালাত পাঠ কর।

৩. ইসলামের যৌথভাবে পালনীয় ফরজসমূহের মধ্যে জুমার নামাজ সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। ইসলামের ফরজ সমাবেশসমূহের মধ্যে আরাফার সমাবেশ ছাড়া সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ জুমার নামাজের সমাবেশ।

৪. জুমার দিন গোসল করা ওয়াজিব। শুধু হাম্বলী মাযহাবের এদিনে গোসল ওয়াজিব হবার ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ আছে।

৫. এ দিন সুগন্ধি ব্যবহার করতে বলা হয়েছে এবং সপ্তাহের অন্যান্য দিনের সুগন্ধির তুলনায় উত্তম হওয়া চাই।

৬. এদিন মিসওয়াক করতে হবে এবং তা অন্যান্য দিনের তুলনায় অধিকতর উত্তমভাবে করতে হবে।

৭. খুতবার আজানের পর নামাজের জন্য আরেকটি আজান দেয়া এই দিনের বৈশিষ্ট্য।

৮. ইমামের মাসজিদে অসা পর্যন্ত নামাজ, যিকর আযকার এবং কুরআন পাঠে মশগুল থাকা এদিনের বৈশিষ্ট্য।

৯. নীরবে চুপ থেকে ইমামের খুতবা (ভাষণ) শোনা ওয়াজিব। কেউ চুপ না থাকলে তার জুমু'আ ব্যর্থ হতে পারে।

১০. সাঈদ ইবনু মানসুর আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার দিন সূরা কাহাফ পড়তে বলেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার পা থেকে আকাশ পর্যন্ত নূর বিছিয়ে দেয়া হবে। কিয়ামতের দিন তা থেকে সে আলো পাবে এবং এর বদৌলতে তার এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্তকার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।

১১. ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম ইবনু তাইমিয়ার মতে জুমার দিন সূর্য মাথার উপর এসে হেলার সময় নামাজ পড়া মাকরূহ নয়। তাঁরা হাদীসের ভিত্তিতে এমত গ্রহণ করেছেন।

১২. রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার নামাজ সূরা জুমু'আ ও সূরা মুনাফিকূন দিয়ে পড়তেন। কিংবা সাব্বাহা ও সূরা গাশিয়া দিয়ে পড়তেন। অথবা সূরা জুমু'আ ও সূরা গাশিয়া দিয়ে পড়তেন। তিনি পুরো সূরা পাঠ করতেন, আংশিক নয়।

১৩. জুমার দিন হলো সাপ্তাহিক ঈদ। সুনানে ইবনু মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জুমার দিন সকল দিনের সর্দার এবং আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম দিন?। এ দিনটি আল্লাহর কাছে ঈদুল আজহা এবং ঈদুল ফিতর থেকেও উত্তম।

১৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার দিন সাধ্যানুযায়ী উত্তম কাপড় চোপড় পরিধান করতে বলেছেন: মুসনাদে আহমাদ, সুনানে অবু দাউদ এবং ইবনু মাজাহতে একথা বর্ণিত হয়েছে।

www.waytojannah.com

Contents

১৫. জুমার দিন মাসজিদকে সুগন্ধিযুক্ত করা মুস্তাহাব। সাঈদ ইবনু মানসুর নুআইম ইবনু আবদুল্লাহ মুজমির থেকে বর্ণনা করেছেন: খলিফা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) প্রত্যেক জুমার দিন দুপুর হলে মাসজিদ সুগন্ধিযুক্ত করতেন।

১৬. যে ব্যক্তির উপর জুমার নামাজ ফরজ, তার জন্য জুমার ওয়াক্ত আরম্ভ হলে সফরে রওয়ানা করা জায়েয নয়।

তবে কেউ কেউ বলেছেন, জিহাদ বা অন্য কোনো ইবাদতের কাজে হলে জায়েয।

১৭. যে ব্যক্তি জুমার নামাজের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের নফল রোজা এবং এক বছরের নফল নামাজের সওয়াব লাভ করে। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন।

১৮. জুমার দিন হলো পাপ মোচনের দিন। মুসনাদে আহমাদে সালমান ফারসী রা: থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমার দিন যে ব্যক্তি ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে, তারপর মাসজিদে এসে নীরবতা অবলম্বন করবে এবং ইমামের খুতবা ও নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত সে নীরবে তা অনুসরণ করবে, তার একাজ পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত তার গুনাহের কাফফারা বলে গণ্য হবে।

১৯. জুমার দিন ছাড়া বাকি সব দিনই জাহান্নামের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। রাসূল ﷺ বলেছেন, যেহেতু জুমার দিন সর্বোত্তম, সে জন্য এদিন জাহান্নাম উত্তপ্ত করা হয় না।

২০. জুমার দিন দুআ কুবল হবার একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে, সে সময়টিতে আল্লাহর তাআলা বান্দাদের দু'আ কবুল করে থাকেন। এ সময়টি সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

২১. এ দিন জুমার নামাজ পড়া হয়। মুসলিমদের বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ নামাজে উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করা হয়।

২২. এই দিন জুমার নামাজের পূর্বে ইমাম (নেতা) মুসলিমদের উদ্দেশে ভাষণ (খুতবা) প্রদান করেন। এই ভাষণে আল্লাহর একত্ব ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাতের স্বীকৃতি ঘোষণা প্রদান করা হয়। মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করে দেয় হয় এবং তাদের উপদেশ প্রদান করা হয়।

২৩. জুমার দিন ইবাদতের জন্য অবসর (ছুটি) গ্রহণ করা মুসলিমদের জন্য মুস্তাহাব।

২৪. বার্ষিক দুই ঈদের মতোই জুমার দিন মুসলিমদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন।

২৫. জুমার দিন দান খয়রাত করা অন্যান্য দিনের চেয়ে অধিক সওয়াবের কাজ। অন্যান্য মাসের তুলনায় রমযানের দানে যেমন অধিক সওয়াব পাওয়া যায়, তেমনি অন্যান্য দিনের তুলনায় জুমার দিনের দানে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়।

২৬. জুমার দিন আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে তাঁর নূরের দ্যুতি। দেখাবেন। যারা ইমামের কাছাকাছি বসবে এবং জুমার নামাজের জন্য তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নিয়ে বের হবে তারা আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভ করবে এবং সবার আগে আল্লাহকে দেখতে পাবে। একথাগুলো বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

www.waytojannah.com

Contents

২৭.বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, কিয়ামতের দিন হলো– ইয়াওমুল মাওউদ। আরাফার দিন হলো– ইয়াওমুল মাশহুদ। আর জুমার দিন হলো– ইয়াওমুশ্ শাহিদ।

২৮.জুমার দিনে হলো, মুসলিম উম্মাহর সাপ্তাহিক সভার দিন। এটা আল্লাহ তাআলাই উম্মঠতের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন।

২৯.কাব (রা) বর্ণনা করেছেন, জুমার দিন মানুষ আর শয়তান ছাড়া আসমান, যমীন, পাহাড়, সাগর এমনকি আল্লাহর সকল সৃষ্টিই ভয়ে কাঁপে।

৩০.জুমার দিনটি আল্লাহর মনোনীত দিন।

৩১.জুমার দিন মানুষের আত্মাগুলো কবরের কাছে আসে বলে বর্ণিত হয়েছে।

৩২.ইমাম আহমাদ বলেছেন: শুধু জুমার দিন রোজা মাকরূহ। অর্থাৎ, বেছে বেছে কেবল জুমার দিন রোজা রাখা মাকরূহ। অবশ্য অন্যান্য ইমাম জুমার দিন রোজা রাখাকে মুবাহ বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুমার নামাজ

রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার নামাজ দুই রাকাত পড়েছেন এবং তাতে সশব্দে কিরাত পড়েছেন। জুমার নামাজ ফরজসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

এই কয় ধরনের লোক ছাড়া বাকি সকল মুসলমানের জন্যে জুমার নামাজ ফরজ। সেই কয় ধরনের লোক হলো: (ক) ক্রীতদাস; (খ) নারী; ﷺ শিশু; (ঘ) রোগী; (ঙ) মুসাফির (ভ্রমণরত ব্যক্তি) এবং (চ) পাগল।

– হাদীসটি দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন জাবির (রা)-এর সূত্রে এবং আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন তারিক ইবনু শিহাব-এর সূত্রে।

– রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার নামাজে প্রায়ই সূরা আস্-সাজদা, সূরা দাহর, সূরা জুমু'আ, সূরা গাশিয়াও সূরা মুনাফিকূন পড়তেন।

– তিনি সূর্য হেলার পরে জুমার নামাজ পড়তেন। (বুখারী)

– তিনি প্রচণ্ড শীতের সময় জুমার নামাজ আগেভাগে পড়তেন আর প্রচণ্ড গরমের সময় বিলম্বে পড়তেন। (বুখারী)

– তিনি আগে খুতবা প্রদান করতেন, তারপর নামাজ পড়তেন। (বুখারী)

– তিনি নামাজ দীর্ঘ এবং খুতবা সংক্ষেপ করতে বলেছেন। (মুসলিম)

– তাঁর খুতবা এবং নামাজ দুটোই মধ্যম রকম ছিল– না দীর্ঘ ছিলো, না হ্রস্ব। (সহীহ মুসলিম)

– তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে এক রাকাত পেল, সে পুরো নামাজ পেল। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺকর্তৃক জুমায় খুতবার (ভাষণের) অনুষ্ঠান

– রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের আগে খুতবা প্রদান করতেন।

– তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন।

– তিনি দুইটি খুতবা প্রদান করতেন এবং প্রথম খুতবার পর কিছুক্ষণ নীরবে বসতেন, তারপর উঠে দ্বিতীয় খুতবা দিতেন।

www.waytojannah.com

Contents

– তিনি মিম্বারে উঠে বসার পর মুয়াযযিন আজান দিত। মুয়াযযিনের আজান শেষ হবার পর তিনি দাঁড়াতেন এবং খুতবা দিতে শুরু করতেন।

– মিম্বার তৈরী হবার আগে তিনি খেজুরের ডালে ভর করে দাঁড়াতেন। তীর এবং তীরের ধনুকে ঠেস দিয়েও কখনো কখনো দাঁড়াতেন।

– তারপর মিম্বার তৈরী হলো। তখন থেকে তিনি মিম্বরে দাঁড়াতেন। মিম্বরটি মাসজিদের মাঝখানে নয়, বরং দেয়াল ঘেঁষে বসানো ছিল। মিম্বার ও দেয়ালের মাঝখানে একটি বকরী যাতায়াতের ফাঁক ছিল।

– মিম্বার তৈরী হবার পর তিনি কখনো তীর, তলোয়ার বা খেজুরে ডালে ভর দিয়ে দাঁড়াননি। তলোয়ারে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছেন বলেও প্রমাণ নেই।

– তিনি যখন মিম্বারে উঠতেন, তখন সাহাবায়ে কিরামের দিকে মুখ করে বসতেন। তাদের মুখোমুখি বসতেন এবং দাঁড়াতেন।

– কোনো কাজের নির্দেশ দেবার বা কোনো কাজ নিষেধ করবার প্রয়োজন হলে তিনি খুতবার ভিতরেই তা করতেন। একবার খুতবা প্রদানরত অবস্থাতেই একজন সাহাবীকে বললেন: দুরাকাত নামাজ পড়ে নাও।

– একবার এক সাহাবী গর্দান উঁচু করলে তিনি খুতবার মধ্যেই তাকে বসে পড়তে বলেন।

– কখনো কখনো খুতবার মাঝখানে সাহাবীগণের প্রশ্নের জবাব দিতেন। তারপর খুতবার বাকি অংশ শেষ করতেন।

– কখনো খুতবা প্রদান কালে তিনি মিম্বার থেকে নেমে আসতেন। তারপর প্রয়োজন সেরে আবার মিম্বারে গিয়ে অসমাপ্ত খুতবা সম্পন্ন করতেন। একবার খুতবা চলাকালে হাসান-হুসাইন মাসজিদে আসে। তিনি মিম্বারে থেকে নেমে গিয়ে তাদের কোলে নেন। তারপর মিম্বারে এসে তাদের কোলে রেখেই খুতবা বাকি অংশ শেষ করেন।

– কখনো খুতবা চলাকালে কাউকেও বলতেন: হে অমুক, বসে পড়ো। অথবা কাউকে রোদ থেকে ছায়ায় আসতে বলতেন।

– সব লোক এলে তিনি খুতবা প্রদান করতেন।

– খুতবার পূর্বক্ষণে তিনি একাই অনাড়ম্বরভাবে নিজ কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতেন। তাঁর আগে পিছে কোন ঘোষক থাকত না।

– মাসজিদে ঢুকে নিজেই আগে সাহাবীদের সালাম দিতেন।

– মিম্বারে বসার সময় সবার দিকে দৃষ্টি ফিরাতেন, সালাম দিতেন।

– তিনি বসা মাত্র বিলাল আজান দিতেন। আজান শেষ হওয়া মাত্র তিনি খুতবা শুরু করতেন।

– তিনি জুমার দিন মাসজিদে এসে লোকদের নীরব থাকতে বলতেন। তিনি বলেছেন: জুমায় তিন ধরনের লোক উপস্থিত হয়:

১. বাজে কথার লোক। সে বাজে ও বেহুদা কথা বলে।

২. আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার লোক। তার প্রার্থনা আল্লাহ তাআলা কবুল করতেও পারেন, নাও করতে পারেন।

www.waytojannah.com

Contents

৩. এমন ব্যক্তি, যে নীরব থাকে, কাউকে ডিঙিয়ে যায় না, কাউকে বিরক্ত করে না, কষ্ট দেয় না এবং কায়মনোবাক্যে ইবাদতে মশগুল থাকে। তার এ সকল আমল পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত পাপের কাফফারা হয়ে যায়। তাছাড়া সে অতিরিক্ত তিন দিনের সওয়াবও পায়।

– কখনো খুতবা দেয়ার সময় তাঁর দুচোখ লাল হয়ে যেত। আওয়াজ উঁচু হয়ে পড়তো। মনে হতো তিনি যেন কোন আক্রমণকারী শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে নিজ বাহিনীকে সতর্ক করেছেন।

– তাঁর খুতবা ছিল, সংক্ষিপ্ত, নামাজ ছিল লম্বা।

তিনি খুতবায় কী বলতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জুমার ভাষণে (খুতবায়) ঈমানের মূলনীতি বর্ণনা করতেন। তাওহীদ রিসালাতের তাৎপর্য বর্ণনা করতেন। জান্নাত-জাহান্নামসহ পরকালের বিস্তারিত অবস্থা তুলে ধরতেন। আল্লাহর কিতাব অনুসরণের কথা বলতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধু ও অনুগতদের জন্য যেসব নিয়ামাত তৈরি করে রেখেছেন, সেগুলোর চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিতেন। আল্লাহর দুশমন ও নাফরমানদের জন্য তিনি যেসব শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন, সেগুলোর ভয়ানক চিত্র তুলে ধরতেন।

ফলে তাঁর বক্তব্য শুনে শ্রোতাদের হৃদয় প্রভাবিত ও বিগলিত হতো। তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেত। আল্লাহর সান্নিধ্য ও পুরস্কার লাভের জন্য সকলের মন ব্যাকুল হয়ে উঠত। এতে তারা আল্লাহর আনুগত্যে জীবন-যাপন করত। আল্লাহর প্রতি মহব্বতকে সর্বোর্ধ্ব স্থান দিত।

তিনি তাঁর খুতবায় বেশি বেশি কুরআনের আয়াত পাঠ করতেন। আখিরাতের চিত্র সংবলিত সূরা ক্বাফ খুব বেশি পাঠ করতেন। উম্মু হিশাম বিনতে হারিস বিন নুমান বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খতুবা শুনে শুনে আমি সূরা কাফ মুখস্ত করেছি।

খুতবার শুরুতে তিনি আল্লাহ তাআলার যথোপযুক্ত হামদ-ছানা পাঠ করতেন। কখনো তাওহীদ রিসালাতের ঘোষণাও দিতেন। তারপর বলতেন: আম্মা বাদ (অতঃপর শুনো)।

তারপর কখনো বলতেন:

فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدى هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

অর্থ: সর্বোত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। সর্বোত্তম রীতিনীতি হচ্ছে মুহাম্মদের রীতিনীতি। সব কাজের মধ্যে নিকৃষ্ট কাজ হলো বিদআত সকল বিদআত পথভ্রষ্টতা (দীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত জিনিস)।

– এই ধারায় তিনি আরো কিছু কথা বলতেন।

অপর বর্ণনায় আছে, হামদ ও সানার পর তিনি বলতেন:

مَنْ يَّهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَخَيْرُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ. (صحيح مسلم) وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ. (نسائى)

অর্থ: আল্লাহ যাকে সঠিক পথ দেখান, তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, তাকে কেউ সঠিক পথে আনতে পারে না। সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব (সহীহ মুসলিম)। প্রত্যেকটি বিদআতই বিপথগামীতা। আর প্রত্যেক বিপথগামীতাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (নাসায়ী)

www.waytojannah.com

Contents

আবূ দাউদে তাঁর একটি খুতবা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَسْتَعِيْنُهُ وَاَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادى له اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدى الساعد من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا.

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমি তাঁর কাছে সাহায্য এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে সঠিক পথ দেখান, কেউ তাকে বিপথগামী করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, কেউ তাকে হিদায়েত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি– মুহাম্মাদ তাঁর দাস ও রাসূল। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তাকে মহাসত্য দিয়ে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করল, সে সঠিক পথ পেল। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হল, সে নিজের ছাড়া আর কারো ক্ষতি করে না। আল্লাহর কোনো ক্ষতি সে করতে পারে না। (আবূ দাউদ)

তাঁর আরেকটি খুতবা এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে: "মৃত্যুর পূর্বেই তোমরা মহান আল্লাহ দিকে ফিরে আসো। ভাল ও পুণ্যের কাজে দৌড়ে চলো। বেশি বেশি আল্লাহর যিকর এবং গোপন ও প্রকাশ্যে দানের মাধ্যমে তোমাদের ও তোমাদের প্রভুর মধ্যে সম্পর্ক জুড়ে নাও। এমনটি করলে তোমরা পুরস্কৃত হবে, প্রশংসিত হবে এবং জীবিকাপ্রাপ্ত হবে। জেনে রাখ, মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য জুমু'আ ফরজ করে দিয়েছেন। এ স্থানে, এ শহরে এবং এ বছর জুমু'আ ফরজ হলেও তা কিয়ামত পর্যন্ত ফরজ থাকবে এমন সব ব্যক্তির জন্য যারা মাসজিদে পৌছতে পারবে। কোন ব্যক্তি যদি তার ন্যায়পরায়ণ কিংবা যালিম নেতা থাকা সত্ত্বেও আমার জীবদ্দশায়, কিংবা আমার মৃত্যুর পর হালকা ভেবে জুমু'আ ত্যাগ করে, কিংবা অস্বীকার করে, তার জীবন আল্লাহ তা'আলা ব্যর্থ করে দেবেন। তার কাজে বরকত হবে না। তার নামাজ হবে না, আর অজু হবে না, তার রোজা হবে না, তার যাকাত হবে না, তার হাজ্জ হবে না, তার কোন কিছুতে বরকত হবে না– যতক্ষণ না সে তাওবা করেন। সে যদি তাওবা করে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।"

এটি বর্ণনা করেছেন, আলী ইবনু যাইদ ইবনু জুদআন। বর্ণনাটিতে দুর্বলতা আছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খুতবা ছিল প্রাণবন্ত। তাঁর খুতবায় আল্লাহর প্রতি লোকের ভালবাসা উদ্বেলিত হতো। তাঁর মর্মস্পর্শী ভাষণ মানুষকে আল্লাহকে সান্নিধ্য লাভের প্রেরণায় ব্যাকুল করে তুলত। তাতে তাদের তরবিয়ত লাভ হতো, তাদের আখলাক উন্নত হতো এবং দীন ও শরীয়তের জ্ঞান অর্জিত হতো।

আজকাল লোকেরা যেসব খুতবা প্রদান করে, তাতে খুতবার সেই প্রাণ নেই। আজকালকার লোকদের খুতবা প্রাণহীন ব্যাহ্য চাকচিক্যে ভরা।

জুমার সুন্নত নামাজ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় জুমার নামাজে একটি আজান ও একটি ইকামত হতো। অবশ্য এ দুইটিকে প্রথম আযান ও দ্বিতীয় আজান বলা হতো।

www.waytojannah.com

Contents

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে সরাসরি মিম্বারে বসতেন। তাঁর মিম্বারে বসার সাথে সাথে বিলাল জুমার আজান দিতেন। বিলালের আজান শেষ হবার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা শুরু করতেন। সুতরাং জুমার নামাজের পূর্বে কোনো সুন্নাত নামাজ থাকার প্রমাণ হয় না।

জুমার নামাজের পূর্বে সুন্নাত নামাজ থাকা না থাকার ব্যাপারে আলিমগণের দুই মত পাওয়া যায়। এ দুইটি মতের মধ্যে উপরিউক্ত মতটিই হলো বিশুদ্ধ এবং সুন্নতে রাসূল থেকে প্রমাণিত। অর্থাৎ, জুমার নামাজের পূর্বে কোনো সুন্নত নামাজ নেই।

একদল লোক মনে করেন, বিলালের আজান শেষ হলে সবাই উঠে দুই রাকাত নামাজ পড়ত। আসলে এ ধারণটি সুন্নাতে রাসূল সম্পর্ক অজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, জুমার নামাজের আগে কোনো সুন্নত নামাজ নেই। ইমাম মালিকের এটাই মত। ইমাম আহমাদেরও মাশহুর কওল এটাই। ইমাম শাফেয়ীর শাগরিদগণেরও একদলের মত এটাই।

যারা মনে করেন জুমার নামাজের পূর্বে সুন্নত নামাজ আছে, তারা জুমার নামাজকে যুহর নামাজের সংক্ষিপ্ত রূপ মনে করেন। তাই তারা জুমার জন্য যুহরের নিয়ম প্রযোজ্য বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁদের এই যুক্তি একান্তই দুর্বল। এর কোনো ভিত্তি নেই।

মূলত জুমার নামাজ সম্পূর্ণ আলাদা একটি নামাজ। যুহর নামাজ থেকে এর স্বাতন্ত্র্য পরিষ্কার। এ নামাজ সশব্দে পড়া হয়, এ নামাজ দুই রাকাত, এ নামাজে খুতবা আছে এবং কতিপয় শর্ত আছে। এসবই যুহর নামাজে অনুপস্থিত। সুতরাং এ নামাজকে যুহর নামাজের সংক্ষিপ্তরূপ ধারণা করার কোনো সুযোগ নেই। তাই যারা যুহর নামাজের উপর কিয়াস করে জুমার পূর্বেও সুন্নত আছে বলে ধরে নেন, তাদের কিয়াস বাতিল। কারণ সুন্নত তো প্রমাণিত হতে হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কাজ ও সমর্থন থেকে, কিংবা খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে। কিন্তু এখানে সে রকম কোনো প্রমাণ নেই।

বরং জুমার নামাজের পূর্বে সুন্নত নামাজ না পড়ার সুন্নতই রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত। যেমন, ঈদের নামাজের আগে পরে আর কোন নামাজ না পড়াই তাঁর থেকে প্রমাণিত। সুতরাং জুমার নামাজের পূর্বে সুন্নত নামাজ না পড়াটাই সুন্নত।

যারা জুমার পূর্বে সুন্নত নামাজ আছে বলে ধারণা করেন, তাঁরা বুখারী 'জুমার আগে-পরে নামাজ' অনুচ্ছেদের একটি হাদিসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। এই অনুচ্ছেদে ইমাম বুখারী সনদসহ ইবনু উমার (রা) থেকে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ–

যুহরের পূর্বে দুইরাকাত নামাজ পড়তেন,

যুহরের পরে দুউ রাকাত নামাজ পড়তেন,

মাগরিবের পরে তাঁর ঘরে দুই রাকাত নামাজ পড়তেন,

এশার পরে দুই রাকাত নামাজ পড়তেন এবং জুমার পরে ঘরে বসে দুই রাকাত নামাজ পড়তেন।

– এই হাদীসটি জুমার নামাজের পূর্বে সুন্নত নামাজ থাকার প্রমাণ করে না। হাদীসটি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, ইমাম বুখারীকর্তৃক হাদীসটির শিরোনাম 'জুমার আগে পরের নামাজ' দেয়ার অর্থই হলো, যারা মনে করে জুমার আগে নামাজ আছে, তাদের ধারণা সঠিক নয়।

– বুখারীর এই হাদিসটি থেকে একথাও সুপ্রমাণিত হয় যে, জুমার নামাজ যুহরের সংক্ষিপ্ত রূপ নয়, বরং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নামাজ। হাদিসে জুমার নামাজকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নামাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.waytojannah.com

Contents

– আবূ দাউদে নাফি' (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, ইবনু উমার (রা) জুমার আগে লম্বা নামাজ পড়তেন এবং জুমার পরে ঘরে গিয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়তেন।

– এই হাদিস জুমার আগে সুন্নত নামাজ থাকা প্রমাণ করে না। ইবনু উমার (রঃ) জুমার আগে যে লম্বা নামাজ পড়েছেন, তা ছিল সাধারণ নফল নামাজ। আজান দেয়া বা ইমাম আসার আগে যে ব্যক্তিই মাসজিদে হাজির হবে, তার নফল নামাজ পড়তে থাকা উত্তম।

– এখন একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, রাসূল ﷺ-এর আমল সম্পর্কে ইবনু উমারের বর্ণনা এবং ইবনু উমারের আমল সম্পর্কে তাঁর আযাদকৃত গোলাম নাফির বর্ণনার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। ইবনু উমার রাসূল ﷺ-এর সুন্নত বর্ণনা করেছেন, তিনি জুমার পর দুই রাকাত নামাজ ঘরে গিয়ে পড়তেন। আর নাফি ইবনু উমারের সাধারণ নফলের কথা বর্ননা করেছেন। যা তিনি আগেভাগে মাসজিদে এসে পড়তেন।

– একথাও বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত, রাসূল ﷺ-এর খুতবা প্রদানকালে একজন সাহাবী মাসজিদে এসে বসে পড়লে তিনি তাকে জিজ্ঞসা করেন, মাসজিদে প্রবেশ করে তুমি কি দুরাকাত নামাজ পড়েছ? সাহাবী বললেনঃ জী না। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ উঠে দুই রাকাত নামাজ পড়ো। তিনি বলেছেনঃ তোমাদের কেউ খুতবা প্রদানকালেও মাসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দুই রাকাত নামাজ পড়ে নেয়।

– এই দুই রাকাত নামাজ যে জুমার সুন্নত নয়, বরং এ যে মাসজিদে প্রবেশের (তাহিয়্যাতুল মাসজিদের) নামাজ, তা হাদীসের ভাষা ও বক্তব্য থেকে পরিষ্কার।

জুমার দিন আগে ভাগে মাসজিদে এসে নফল নামাজ পড়ার জন্য রাসূল ﷺ উৎসাহিত করেছেন। এর ফজীলতও তিনি বর্ণনা করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের অনেনেই আগে ভাগে মাসজিদে এসে নফল নামাজ পড়তেন। ইবনুল মুনজির বলেন, আমার কাছে বর্ণনা পৌছেছে, জুমার আগে ইবনু উমার (রা) বার রাকাত নামাজ পড়তেন এবং ইবনু মাসউদ (রা) আট রাকাত নামাজ পড়তেন।

– ইবনু মাজাহতে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার আগে এক সালামে চার রাকাত নামাজ পড়তেন। এ হাদীসটির সনদ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

– রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার নামাজ পড়ে ঘরে গিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়তেন। মূলত এ দু রাকাতই জুমু'আর সুন্নত।

– অবশ্য রাসূল ﷺ জুমু'আর পরে চার রাকাত নামাজ পড়ার কথা বলেছেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। (সহীহ মুসলিম)

– ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেছেন, জুমু'আর পরে কেউ যদি সুন্নত নামাজ মাসজিদে পড়ে, তবে চার রাকাত পড়বে। আর যে সুন্নত নামাজ ঘরে গিয়ে পড়ে, সেই দুই রাকাত পড়বে। মূলত হাদিস থেকে এ কথারই প্রমাণ মিলে। আবূ দাউদে ইবনু উমার (রঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি ঘরে পড়লে দুই রাকাত পড়তেন আর মাসজিদে পড়লে চার রাকাত পড়তেন।

www.waytojannah.com

Contents

কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ নামাজ

তাহাজ্জুদ কি রাসূল ﷺ-এর জন্য ফরয ছিল

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তাহাজ্জুদ নামাজ ফরজ ছিল কি না? এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামা ও মুজতাহিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। তাঁদের কারো মতে, রাসূল ﷺ-এর জন্য তাহাজ্জুদ ফরজ ছিল। কারো মতে ছিল নফল। উভয় পক্ষেই এই আয়াতটিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا.

অর্থ: রাতের কিছু অংশ জেগে (তাহাজ্জুদ) নামাজ পড়ুন। এটা আপনার জন্য নফল (অতিরিক্ত)।

(সূরা ইসরা: ৭৯)

এক পক্ষ মনে করেন, রাত জেগে (তাহাজ্জুদ) নামাজ পড়া ফরজ নয়, বরং নফল তা এ আয়াত থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

অপর পক্ষ মনে করেন, এ আয়াতে তাঁকে রাত জেগে (তাহাজ্জুদ) নামাজ পড়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তাই এটা তাঁর জন্য ফরজ। সূরা মুয্যাম্মিলের প্রথম দুই আয়াতেও তাঁকে একই নির্দেশ দেয়া হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا.

অর্থ: হে আচ্ছাদিত, কিছু অংশ বাদে বাকি রাত কিয়ামুল লাইল করুন।

এই দুই জায়গায় তাঁকে রাত জেগে নামাজ পড়তে বলা হয়েছে এবং এই হুকুম তাঁর জন্য রহিত করা হয়নি। তাই তাঁর জন্য তাহাজ্জুদ ফরজ ছিল।

প্রথম আয়াতে যে বলা হয়েছে, এটা আপনার জন্য নফল (অতিরিক্ত) এখানে নফল মানে নফল নামাজ নয়, বরং এখানে নফল শব্দটি অতিরিক্ত অর্থে এসেছে। অর্থাৎ, রাত জেগে নামাজ পড়ার এই নির্দেশটা আপনার জন্য অতিরিক্ত। এই নামাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা ও পুরস্কারের জন্য একটি অতিরিক্ত নামাজ।

অন্যদের জন্য রাত জেগে (তাহাজ্জুদ) নামাজ পড়াটা মুবাহ (বৈধ) এবং তাদের গুনাহের কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) স্বরূপ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগে-পরের সকল গুনাহই আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। তাই তাঁকে এ নামাজ পড়তে বলা হয়েছে তাঁর মার্যাদা বৃদ্ধি ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য। আর তাঁর উম্মতের জন্য এ নামাজ গুনাহ থেকে মুক্তির উপায়।

আমাদের মতে, এখানে নফল (অতিরিক্ত) শব্দ দ্বারা এমন নামাজ বুঝানো হয়নি– যা জায়েয, যা পড়লেও চলে না পড়লেও চলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবাসে কিংবা প্রবাসে কখনো তাহাজ্জুদ ত্যাগ করতেন না। যদি কখনো নিদ্রা অথবা অসুস্থতার কারণে রাত্রে বাদ পড়ত, দিনের বেলায় পড়ে নিতেন।

www.waytojannah.com

Contents

তিনি তাহাজ্জুদ কত রাকাত পড়তেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে কত রাকাত নামাজ পড়তেন, তা বুঝার জন্য প্রথমে একথা মনে রাখতে হবে যে, রসুলুল্লাহ ﷺ রাত্রের শেষার্ধে তিন প্রকার নামাজ পড়তেন। যেমন–

ক. তাহাজ্জুদ নামাজ।

খ. বিতির নামাজ এবং

গ. ফজরের সুন্নত দুই রাকাত।

এই তিনটি নামাজ তিনি কখনো একই সময়, আবার কখনো কিছুটা পৃথক সময়ে পড়তেন বলে তাহাজ্জুদ এবং বিতিরের রাকাত সংখ্যা নির্ণয়ে কিছুটা মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। যিনি যে কয় রাকাত পড়তে দেখেছেন, তিনি সে কয় রাকাতের কথাই বর্ণনা করেছেন। তবে এক্ষেত্রে আয়িশা (রা) এবং ইবনু আব্বাস (রা) এর বর্ণনাই বিশুদ্ধ।

বুখারী ও মুসলিমে আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে: রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার নামাজ থেকে ফারিগ হবার পর ফজর পর্যন্ত এগার রাকাত নামাজ পড়তেন। দুই রাকাত পর পর সালাম ফিরাতেন এবং এক রাকাত দ্বারা বিতির করতেন। এই নামাজে তাঁর একেকটি সাজদা হতো তোমাদের পঞ্চাশ আয়াত কুরআন পড়ার সমান দীর্ঘ। অতঃপর মুয়াজ্জিন ফজরের আজান শেষ করলে দুই রাকাত হালকা নামাজ পড়ে ডান পাশে কাত হয়ে ফজরের ইকামত পর্যন্ত বিশ্রাম নিতেন।

সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রা) থেকে আরেকটি হাদিস উল্লেখ হয়েছে, তাতে আয়িশা (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে তের রাকাত নামাজ পড়তেন। এর মধ্যে বিতিরও থাকত এবং ফজরের দুই রাকাতও থাকত।

বুখারী ও মুসলিমে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এক রাত্রে তাঁর খালা উম্মুল মুমিনীন মাইমুনা (রা)-এর ঘরে রাত্রি যাপন করেন। রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাজ পড়তে দেখে তিনিও উঠে তাঁর সাথে নামাজ পড়েন। তিনি বলেন: এ সময় রাসূল ﷺ মোট তের রাকাত নামাজ পড়ে বিশ্রাম নেন। অতঃপর বিলাল ইকামত দিলে উঠে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়ান।

বুখারী ও মুসলিমে আয়িশা (রা) থেকে আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাতে আয়িশা (রা) বলেন: রমজান কিংবা গাইরে রমজান, কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের নামাজ এগার রাকাতের বেশি পড়েননি।

আয়িশার এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। তবে উপরে তের রাকাতের যে বর্ণনা উল্লেখ হয়েছে, তা ফজরের দুই রাকাত সহ।

কোন কোন বর্ণনায় তের রাকাতের পর দুই রাকাত পড়েছেন বলে উল্লেখ হয়েছে। এ বর্ণনাটি এসেছে বুখারীতে। তবে মুসলিমের বর্ণনায় ফজরের দুই রাকাতসহ তের রাকাত পড়তেন বলে উল্লেখ হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিমে কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আমি আয়িশা (রা)-কে বলতে শুনেছি: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ) ছিল মূলত দশ রাকাত। সেই সাথে এক সাজদায় বিতির পড়তেন, অতঃপর ফজরের দুই রাকাত পড়তেন। সর্বমোট পড়তেন তের রাকাত।

– এই বর্ণনাটি সুস্পষ্ট।

ইমাম শা'বী বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস এবং আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা দু' জনই আমাকে বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

www.waytojannah.com

Contents

রাতের নামাজ ছিল তের রাকাত। এর মধ্যে আট রাকাত তাহাজ্জুদ, তিন রাকাত বিতির আর দুই রাকাত ফজরের সুন্নত।

বর্ণনাগত কিছু তারতম্য থাকলেও এ সংক্রান্ত সবগুলো হাদিস ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়, মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ (ফজরের সুন্নত দুই রাকাত বাদে) রাতের নামাজ (বিতিরসহ) এগার রাকাত পড়তেন।

রাসূল ﷺ রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ) কখন পড়তেন

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের নামাজ পড়ার জন্য–

– কখনো অর্ধরাত্রে উঠতেন।

– কখনো অর্ধরাতের কিছু আগে উঠতেন।

– কখনো অর্ধরাতের কিছু পরে উঠতেন।

– কখনো মোরগের প্রথম ডাক শুনে উঠতেন। অর্থাৎ, রাতের দুই তৃতীয়াংশের মাথায়।

রাতের নামাজ তিনি কখনো ধারাবাহিকভাবে পড়ে শেষ করতেন। আবার কখনো বিচ্ছিন্নভাবে পড়তেন। বিচ্ছিন্নভাবে মানে-দুই রাকাত পড়ে ঘুমাতেন, আবার উঠে অজু মিসওয়াক করে দুই রাকাত পড়তেন। আবার ঘুমাতেন, আবার উঠতেন– এভাবে শেষ করতেন।

তিনি রাতের নামাজের জন্য উঠলে প্রথমে হালকা দুই রাকাত পড়তেন। সাহাবীগণকেও এই হালকা দুই রাকাত পড়তে বলতেন। তারপরের রাকাতগুলো দীর্ঘ করতেন।

আয়িশা এবং ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার নামাজ পড়ে ঘরে এসে কিছু (দুই বা চার রাকাত) নামাজ পড়তেন। কিছু নামাজ পড়েই তিনি ঘুমাতেন।

তিনি রাতের নামাজের জন্য ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করতেন, অজু করতেন, আল্লাহকে স্মরণ করতেন, কিছু দু'আ কালাম পড়তেন, তারপর নামাজ পড়তেন।

তাহাজ্জুদের সময় এবং তাহাজ্জুদ নামাজে কী পড়তেন

বুখারী ও মুসলিমে একাধিক সূত্রে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ) পড়তে উঠে অজু করার আগেই আকাশ পানে তাকিয়ে সূরা আলে-ইমরানের শেষ (রুকূর) আয়াতগুলো পাঠ করতেন। আয়াতগুলো হলো:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ {١٩٠} الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ {١٩١} رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ {١٩٢} رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ {١٩٣} رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ {١٩٤} فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن

www.waytojannah.com

Contents

دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ {١٩٥} لاَ يَغُرُّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلاَدِ {١٩٦} مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ {١٩٧} لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ اللّهِ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ {١٩٨} وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ {١٩٩} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {٢٠٠}

অর্থ: পৃথিবী ও মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পালাক্রমে যাওয়া আসার মধ্যে সেই সব বুদ্ধি-বিবেকওয়ালা লোকদের জন্য রয়েছে অনেক অনেক নিদর্শন, যারা উঠতে, বসতে, শয়নে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। (তারা স্বতঃস্ফূর্তই বলে উঠে) হে আমাদের প্রভু, এসব কিছু তুমি অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করোনি। অবশ্য তুমি নিরর্থক কাজ করার ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত-পবিত্র। তাই হে প্রভু, জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করো। প্রভু, তুমি যাকে জাহান্নামে ফেলবে, তাকে অবশ্য চরম অপদস্থ করে ছাড়বে, আর এসব জালিমদের তো কোন সাহার্য্যকারী হবে না। আমাদের মনিব, আমরা একজন আহ্বানকারীকে তোমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আনো বলে আহ্বান করতে শুনেছি। আমরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছি। তাই হে প্রভু, আমাদের পাপসমূহ মাফ করে দাও, আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে দাও আর আমাদের ওফাত দান করো উত্তম লোকদের সাথে। আমাদের মালিক, তোমার রাসূলদের মাধ্যমে তুমি আমাদের সাথে যেসব ওয়াদা করেছ, সেগুলো আমাদের প্রদান করো এবং কিয়ামতের দিন আমাদের অপদস্থ করো না। নিশ্চয়ই তুমি ভঙ্গ করো না অঙ্গীকার। (প্রার্থনা কবুল করে) তাদের প্রভু বলেন: আমি বিনষ্ট করব না তোমাদের আমলকারীর আমল, চাই সে নর হোক কিংবা নারী, তোমাদের একজন তো আরেকজন থেকে, তাই যারাই হিজরত করেছে, যাদেরকেই নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে আর আমার পথে কাজ করার কারণে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তারপরও তারা লড়াই করছে এবং নিহত হয়েছে– আমি অবশ্য অবশ্য তাদের ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ মুছে দেব আর তাদের মালিক বানিয়ে দেব বহমান ঝরনাওয়ালা জান্নাতসমূহের। আল্লাহর পক্ষ থেকে এগুলো তাদের জন্য পুরস্কার। আর সর্বোত্তম পুরস্কার তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে। হে নাবী, বিভিন্ন দেশও নগরের শান শওকতের চলাফেরা যেন তোমায় প্রতারিত না করে। এতো সামান্য কদিনের উপভোগ মাত্র। তারপর এদের আবাস হবে জাহান্নাম, যা নিদারুণ নিকৃষ্ট জায়গা। তবে যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে চলবে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী উপঢৌকন হিসেবে রয়েছে বহমান ঝরনা এবং জান্নাতহসমূহ। আর যা কিছু আল্লাহর কাছে থেকে পাওয়া যাবে, ভালো লোকদের জন্য তা-ই কল্যাণকর। আহলে কিতাবের মধ্যেও এমন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, তোমাদের কাছে পাঠানো কিতাব আর তাদের কাছে পাঠানো কিতাবের প্রতিও ঈমান রাখে; আল্লাহর প্রতি বিনীত থাকে এবং আল্লাহর আয়াতকে অল্প দামে বিক্রি করে না। এদের জন্য এদের প্রভুর কাছে রয়েছে প্রতিদান, আর আল্লাহ তো (পাওনাদারদের) হিসাবে জলদি জলদি চুকিয় ফেলেন। হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা সবর অবলম্বন কর, অটল-অবিচল থাক, নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক মজবুতভাবে জুড়ে রাখো, আর আল্লাহকে ভয়

www.waytojannah.com

Contents

করো। এভাবেই অর্জন করবে তোমরা সাফল্য। ইবনু আব্বাসের বর্ণনায় একথাও আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের নামাজ শেষ এই দু'আ করেছেন:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا اللَّهُمَّ اعْظِمْ لِي نُورًا.

অর্থ: আমার আল্লাহ, আমার অন্তরে নূর দাও (জ্যোতির্ময় করে দাও), আমার যবানে নূর দাও, আমার দৃষ্টিতে নূর দাও, আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দাও, আমার ডানে নূর দাও, আমার বামে নূর দাও, আমার উপর নূর দাও, আমার নিচে নূর দাও, আমার সামনে নূর দাও, আমার পিছনে নূর দাও। হে আল্লাহ, আমাকে নূর দান করো আর আমার নূরকে ব্যাপক-বিশাল করে দাও।

বুখারী ও মুসলিমে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে উঠলে এই কথাগুলো পাঠ করতেন:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ حَقٌّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

অর্থ: হে আমার আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা তোমার। এই মহাবিশ্ব, এই পৃথিবী এবং এসবের মাঝে যা কিছু আছে, সবকিছুর তুমি তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালক। সমস্ত প্রশংসা তোমারই, এই মহাবিশ্ব, এই পৃথিবী আর এসবের মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছুর নূর তুমি। তোমারই সমস্ত প্রশংসা, এই মহাবিশ্ব, এই পৃথিবী আর এসবের মাঝে যা কিছু আছে, তুমিই সবকিছুর সার্বভৌম সম্রাট। সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমি মহাসত্য। তোমার অঙ্গীকার মহাসত্য। তোমার সাক্ষাৎ সত্য। তোমার বাণী সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। নবীগণ সত্য। মুহাম্মদ সত্য (নাবী)। কিয়ামাত সত্য। হে আল্লাহ, তোমার কাছে আমি আত্মসমপর্ণ করেছি। তোমার প্রতি ঈমান এনেছি। তোমার উপর ভরসা করেছি। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। তোমারই জন্য সবার সাথে বিবাদ বাঁধিয়েছি। তোমরাই কাছে বিচার দিয়েছি। তাই হে প্রভু, তুমি আমার আগের-পরের আর গোপন-প্রকাশ্যে সব ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। আর সেইসব ত্রুটিও ক্ষমতা করে দাও, যেগুলো সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে অধিক জানো। তুমিই তো সবাইকে এবং সবকিছুকে আগে বাড়িয়ে দাও এবং পিছে ঠেলে দাও। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তুমি ব্যতিরেকে কোন ত্রাণকর্তা নেই।

সহীহ মুসলিমে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে উঠে যখন নামাজ শুরু করতেন, তখন বলতেন:

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

www.waytojannah.com

Contents

অর্থ: ওগো আল্লাহ! জিব্রাইল, মিকাইল ও ইসরাফীলের প্রভু, মহাবিশ্ব ও এই পৃথিবীর স্রষ্টা। অদৃশ্য ও দৃশ্যের সর্বজ্ঞানী। তোমার বান্দাদের মতবিরোধসমূহের ফায়সালা তুমিই করবে। আমাকে অনুগ্রহ করে সেই সত্য দেখাও যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে। কারণ, তুমি তো যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখিয়ে থাক।

আবূ দাউদে আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাত্রে ঘুম থেকে জাগতেন, তখন বলতেন:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيْرٌ. وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ. وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ.

অর্থ: তুমি ছাড়া কোন হুকুমকর্তা ও মুক্তিদাতা প্রভু নেই। সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি দুর্বলতা থেকে মুক্ত-পবিত্র তুমি। আমি তোমারই প্রশংসা করি হে আল্লাহ, আমার অপারাধের জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আমি তোমার অনুগ্রহ চাই। হে আল্লাহ, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি করে দাও। সঠিক পথ দেখবার পর আমার অন্তরকে আর বিপথগামী করো না। তোমার অনুগ্রহ আমাকে দান করো। অবশ্য অবশ্য তুমি অতিশয় মহান দাতা।

আবূ দাউদে (তাবেঈ) শারীক হাওয়ানি থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে নামাজ পড়তে উঠলে প্রথমে কী পড়তেন? জবাবে তিনি বলেন, এমন একটি বিষয়ে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছ, যা তোমার পূর্বে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাত্রে ঘুম থেকে উঠতেন, তখন: দশবার اَللهُ اَكْبَر (আল্লাহ সবচেয়ে বড়), দশবার اَلْحَمْدُ لِلّهِ বলতেন سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ বলতেন, দশবার اَسْتَغْفِرُاللهَ (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই) বলতেন, দশবার لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ এবং দশবার اَللّهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (হে আল্লাহ! দুনিয়া এবং কিয়ামতের দিনের সংকীর্ণতা থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই) বলতেন।[৩১] অতঃপর নামাজ আরম্ভ করতেন।

সহীহ বুখারীতে উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুম থেকে উঠে এই কথাগুলো পাঠ করে দু'আ করবে, তার দু'আ কবুল করা হবে। অতঃপর অজু করে নামাজ পড়লে তার নামাজ কবুল করা হবে। সেই কথাগুলো হলো:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيْرٌ. وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ. وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ.

আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি দেখেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের নামাজ শুরু করার আগে এই কথাগুলো পাঠ করতেন:

اَللهُ اَكْبَر اَللهُ اَكْبَر اَللهُ اَكْبَر ذُوالْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ.

অর্থ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ সবার উপরে, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, ক্ষমতা ও প্রতাপের অধিকারী তিনি, শ্রেষ্ঠ ও মহান তিনি।

---

31 এই কথাগুলোকে মুআশ্শারাতে সাবআ' বলা হয়। এর অর্থ এমন সাতটি বাক্য যার প্রতিটি দশবার করে উচ্চারণ করতে বলা হয়েছে। *–অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

একই বর্ণনায় হুযাইফা (রা) বলেন: রাতের নামাজে রাসূল ﷺ দুই সাজদার মাঝখানে এই দু'আ করেছেন দীর্ঘ সময় ধরে:

رَبِّ اغْفِرْلِيْ رَبِّ اغْفِرْلِيْ .....

উচ্চারণ: রব্বিগফিরলী রব্বিগফিরলী .....

অর্থ: আমার প্রভু, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার মালিক, আমাকে মাফ করে দাও।

নাসায়ী এবং ইবনু মাজাহ আবূ যর (রা) থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, তাতে আবূ যর (রা) বলেন: একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের নামাজ পড়তে দাঁড়ান, ফজরের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত গোটা নামাজে তিনি কেবল একটি আয়াতই বার বার পড়ছেন। আয়াতটি হলো:

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থ: প্রভু, তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও, তবে দিতে পার, কারণ তারা তোমারই দাস। আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও, তবে তুমি তা অবশ্য করতে পার, কারণ তুমিই তো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহা প্রজ্ঞাবান। (সূরা মায়িদা: ১১৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের নামাজে কোনো কোনো দিন সূরা আল-বাকারা, আলে-ইমরান, আন-নিসা, আল-মায়িদা কিংবা আনআম পড়তেন।

কখনো মুফাস্সাল সূরা (হুজুরাত থেকে শেষ পর্যন্ত) সমূহের প্রথম দিকেরগুলো দুটো দুটো মিলিয়ে পড়তেন।

তিনি সাহাবীদেরকে রাতের নামাজে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দশটি, একশটি এবং হাজারটি করে আয়াত পড়তে উৎসাহিত করতেন।

www.waytojannah.com

Contents

বিতির নামাজ

তিনি বিতির তাহাজ্জুদের সাথে পড়তেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিতির নামাজ তাঁর কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ নামাজের সাথে শামিল ছিল। তিনি তাহাজ্জুদের সাথেই বিতির নামাজ পড়তেন। ফলে তাঁর বিতির নামাজকে তাঁর তাহাজ্জুদ নামাজের সাথে মিলিয়েই আলোচনা করতে হবে।

তিনি তাহাজ্জুদের সাথে বিতির কিভাবে পড়তেন এবং কত রাকাত পড়তেন? সহীহ হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে তার কয়েকটি ধরন জানা যায়। সেগুলো নিম্নরূপঃ

১. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিতঃ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, একবার আমি আমার খালার বাসায় রাত্রি যাপন করলাম। দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের শেষতৃতীয়াংশে উঠলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে 'ইন্না ফী খালকিস সামাওয়াতি...' পড়লেন। তারপর অজু করলেন এবং নামাজে দাঁড়ালেন। আমার কান ধরে ঘুরিয়ে আমাকে তাঁর ডানপাশে নিয়ে গেলেন। আমি তাঁর সাথে নামাজ পড়লাম, দেখলাম, তিনি (বিতিরসহ) মোট তের রাকাত নামাজ পড়লেন।

   ইবনু আব্বাস (রা) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি রাসূল ﷺ-কে দেখেছেন, তিনি দুই রাকাত দুই রাকাত করে আট রাকাত তাহাজ্জুদ পড়েছেন, তিন রাকাত বিতির পড়েছেন আর দুই রাকাত ফজরের সুন্নাত পড়েছেন। এসব বর্ণনা বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে।

২. আয়িশা (রা) বর্ণিতঃ আয়িশা (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের নামাজের জন্যে উঠে প্রথমে হালকা (সংক্ষিপ্ত) দুই রাকাত দিয়ে শুরু করতেন এবং এগার রাকাত পড়ে শেষ করতেন। প্রত্যেক দুই রাকাতে সালাম ফিরাতেন এবং শেষবারের এক রাকাত যোগ করে বিতির (বেজোড়) করতেন।

৩. দ্বিতীয় প্রকারের মতো তের রাকাত পড়তেন।

৪. দুই রাকাত দুই রাকাত করে আট রাকাত পড়তেন। অতঃপর মাঝখানে না বসে এক সালামে পাঁচ রাকাত পড়তেন। [বুখারী ও মুসলিম] আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত]

৫. একত্রে নয় রাকাত পড়তেন। ক্রমাগত আট রাকাত পড়ে অষ্টম রাকাতে বসতেন এবং সেই বসায় আল্লাহর যিকর ও হামদ করতেন এবং দু'আ করতেন। তারপর দাঁড়িয়ে নবম রাকাত (বিতির) পড়ে সালাম ফিরাতেন। তারপর বসে বসে দুই রাকাত পড়তেন। [সহীহ মুসলিমঃ আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত]

৬. উপরে উল্লিখিত নয় রাকাতের অনুরূপ সাত রাকাত পড়তেন। তারপর বসে বসে দুই রাকাত পড়তেন।

৭. দু' রাকাত দু' রাকাত করে তাহাজ্জুদ পড়ে শেষ করতেন। তারপর মাঝখানে না বসে একাধারে তিন রাকাত বিতির পড়তেন। ইমাম আহমাদ আয়িশা (রা) থেকে একথা বর্ণনা করেছেন। আয়িশা (রা) বলেনঃ তিনি তিন রাকাত বিতির অবিচ্ছিন্নভাবে পড়েছেন।

   ইমাম নাসায়ীও আয়িশা (রা) থেকে এ ধরনের একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাতে আয়িশা (রা) বলেনঃ দ্বিতীয় রাকাতে সালাম না ফিরিয়ে রাসূল ﷺ অবিচ্ছিন্নভাবে তিন রাকাত বিতির

www.waytojannah.com

Contents

পড়েছেন। অবশ্য বিতির নামাজের এই প্রকারটি সম্পর্কে ভেবে দেখার দরকার আছে। কারণ এই প্রকারটি অধিকাংশ বর্ণনার সাথে মিলে না।

আবূ হাতিম ও ইবনু হিব্বান তাদের সহীহ হাদিস সংকলনে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে হাদিস বর্ণনা করছেন। তাতে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা বিতির নামাজকে মাগরিবের অনুরূপ করো না, তিন রাকাত পড়ো না। বরং পাঁচ অথবা সাত রাকাত পড়ো।

ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, বিতিরি নামাজ পাঁচ এবং সাত রাকাত পড়া সংক্রান্ত যে বর্ণনা এসেছে, এ বর্ণনার সকল রাবীই নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেন, আমি আবূ আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি বিতির নামাজে দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরান কি না? জবাবে তিনি বললেন: হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরান? জবাবে তিনি বলেন: দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরানো সংক্রান্ত হাদিসের সংখ্যা অনেক এবং হাদিসগুলো মজবুত। কারণ এ সংক্রান্ত হাদিস ইমাম যুহরী উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে এবং তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনার এই সূত্রটি অত্যন্ত মজবুত ও সোনালি সূত্র।

হারিস (র) বলেছেন, ইমাম আহমাদকে বিতির নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেন: দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতে হবে। অবশ্য সালাম না ফিরালেও আমি আশা করি নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে সালাম ফিরানোর ব্যাপারটি নাবী করীম ﷺ থেকে প্রমাণিত।

আবূ তালিব বলেন: আমি আবূ আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বিতিরের ব্যাপারে আপনি কোনো হাদিসকে অগ্রাধিকার দেন? জবাবে তিনি বলেন, মাঝখানে না বসে একাধারে পাঁচ রাকাত পড়ে শেষ রাকাতে সালাম ফিরানোর হাদিসও ঠিক, একাধারে সাত রাকাত পড়ে শেষ রাকাতে সালাম ফিরানোর হাদিসও ঠিক। আবার যুরারা আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ নয় রাকাত পড়তেন এবং একাধারে আট রাকাত পড়ে বসতেন– এ হাদীসও সঠিক। তবে এক রাকাত দিয়ে বিতির পড়ার হাদিসগুলোই বেশি শক্তিশালী, তাই আমি সেটাই করি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইবনু মাসউদ (রা) যে তিন রাকাতের কথা বলেছেন? জবাবে তিনি বলেন, হ্যাঁ, ইবনু মাসউদ (রা) যে তিন রাকাতের কথা বলেছেন এবং সাআদও জবাবে তাঁকে কিছু কথা বলেছেন এবং তাঁর তিন রাকাতের বিষয়টি খণ্ডন করছেন।

৮. নাসায়ী ও আবূ দাউদে বর্ণিত হুযাইফার বক্তব্য: এতে হুযাইফা (রা) দীর্ঘ তাসবীহ ও দু'আ সংবলিত মাত্র চার রাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

এই হলো বিতির নামাজের বিভিন্ন প্রকার, যা রাসূলুলল্লাহ ﷺ পড়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

www.waytojannah.com

Contents

কখন কিভবে পড়তেন

বিভিন্ন হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতির নামাজ–

– রাতের প্রথম ভাগেও পড়েছেন এবং সাহাবীগণকেও পড়তে বলেছেন।

– রাতের মধ্য ভাগেও পড়েছেন।

– রাতের শেষ ভাগেও পড়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের নামাজ সাধারণত তিনভাবে পড়েছেন:

ক. আধিকাংশ সময় দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

খ. কখনো কখনো (বিশেষ করে শেষ বয়েসে) বসে বসে পড়েছেন এবং রুকূও বসে বসে করেছেন।

গ. কখানো কখনো বসেই সূরা কিরাত পড়েছেন। তবে রুকূ করার সময় দাঁড়িয়ে রুকূ করেছেন। তারপর সাজদায় গিয়েছেন।

এই তিন প্রকারই সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

বিতিরে দু'আয়ে কুনুত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতির নামাজে কুনূত পড়েছেন বলে সুনানে ইবনু মাজাহতে বর্ণিত একটি হাদিস ছাড়া অন্য কোথাও জানা যায়নি। হাদিসটির সূত্র নিম্নরূপ: ইবনু মাজাহ, আলী ইবনু মাইমুন আররাক্কী, মখলাদ ইবনু ইয়াযীদ, সুফিয়ান, যুবাই ইয়ামী, সায়ীদ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আবযা, আবদুর রহমান ইবনু আবযা, উবাই ইবনু কা'আব (রা:)। উবাই ইবনু কা'আব বর্ণিত এই হাদিসটি হলো: রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতির পড়তেন এবং রুকুর পূর্বে কুনূত পড়তেন।

ইমাম আহমাদ এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মূলত রুকূর পরে কুনূত পড়তেন, রুকূর আগে নয়।

প্রকৃতপক্ষে কুনূতের ব্যাপারে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর নামাজে রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কুনূত পড়ছেন। সুনানে ইবনু মাজাহ্‌র এই হাদিসের সূত্র ধরে জানা যায়, বিতিরে রুকুর পূর্বে কুনূত পড়ছেন।

মুসনাদে আহমাদ ও সুনানের গ্রন্থাবলীতে হাসান ইবনু আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিতিরে পড়ার জন্য যে কথাগুলো শিক্ষা দিয়েছেন, তা হলো:

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَي عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ. وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نَتُوْبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাহ্ দিনী ফীমান হাদাইতা। ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা, ওয়া বা-রিক লী ফীমা- আ'তাইতা, ওয়াকিনী শাররা মা- কাযাইতা, ফা ইন্নাকা তাকযী ওয়ালা ইউকযা 'আলাইকা ইন্নাহু লা- ইয়া যিল্লু মাও ওয়া লাইতা, ওয়ালা ইয়া 'ইযযু মান 'আ-দাইতা, তাবা-রাকতা রাব্বানা- ওয়া তা'আ-লাইতা,ওয়া নাস্তাগফিরুকা ওয়া নাতূবু ইলাইকা, ওয়া সাল্লাল্লা-হু 'আলান নাবীয়ি।

www.waytojannah.com

Contents

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি যাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছ আমাদেরকেও ঐ পথে পরিচালিত করো এবং যাদেরকে ক্ষমা করেছ আমাদেরকেও ঠিক একইভাবে ক্ষমা করো। আমাদেরকে তুমি যা কিছু দান করেছ তাতে বারকাত দাও। যে অনিষ্টের ফায়সালা তুমি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছ তা আমাদের থেকে সরিয়ে দাও। কেননা তুমিই একমাত্র ফায়সালাকারী, তোমার বিরুদ্ধে কোন ফায়সালা নেই। নিশ্চয়ই তুমি যাকে ভালোবাস সে কখনও অপমানিত হয় না, আর যার সঙ্গে তুমি বিরোধ কর সে কখনও সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের প্রভু! তুমি মহীয়ান, গরীয়ান, তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাওবাহ্ করছি। **(তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, হাকিম)**

নাসায়ীর বর্ণনায় একথাও আছে যে, হাসান (রা) এই দু'আ পড়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠ করতেন।

হাকীম তার মুস্তাদরাক গ্রন্থে হাসান (রা) থেকে একথাও উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতির নামাজে রুকূ থেকে দাঁড়ানোর পর যখন সাজদা ব্যতীত আর কিছুই বাকি থাকবে না, তখন এই কথাগুলো (উপরোক্ত দুআটি) পড়ার জন্য আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাসানের এই হাদিসটি হাসান (উত্তম) হাদিস। বিতিরের কুনূতের ব্যাপারে এর চেয়ে উত্তম কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

বিতিরের পরে দু' রাকাত

সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে আয়িশা (রা) উম্মু সালমা (রা) এবং আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো বিতিরের পরে বসে বসে দুই রাকাত নামাজ পড়তেন।

এই দুই রাকাতের শুদ্ধতা নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে এই দুই রাকাত 'বিতিরকে রাতের শেষ নামাজ বানাও' রাসূল ﷺ-এর এই বাণীর খেলাফ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বিতিরের পরে নামাজ পড়ার বৈধতা দেখবার জন্যই রাসূল ﷺ এই দুই রাকাত পড়ছেন। আবার অনেকে বলেছেন, এই দুই রাকাত বিতিরের পরিপূরক নামাজ।

www.waytojannah.com

Contents

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনিয়মিত নফল নামাজসমূহ

সালাতুদ্দোহা (চাশ্‌তের নামাজ)

সকালে সূর্য উঠার পর পৃথিবী আলোকময় হলে সূর্য মাথার উপর আসা পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী সময়টাকে দোহা বা চাশ্‌ত বলা হয়। এ সময় কখনো কখনো রাসূলুল্লহ ﷺ কিছু নফল নামাজ পড়েছেন এবং সাহাবীগণকে পড়তে উৎসাহিত করেছেন। তিনি এই নামাজ কখনো দুই রাকাত, কখনো চার রাকাত, কখনো ছয় রাকাত আবার কখনো আট রাকাত পড়েছেন।

অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ সময় পড়েছেন এবং পড়তে উৎসাহিত করেছেন বলে যেমন হাদিসে আছে, তেমনি এ সময় তিনি নামাজ পড়েননি বলেও হাদিসে আছে।

সহীহ বুখারীতে আয়িশাহ (রা) থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চাশতের নামাজ পড়তে দেখিনি, অবশ্য আমি এ (সময়) নামাজ পড়ি।

সহীহ বুখারীতে মুওয়াররিক আল-ইজলী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আমি ইবনু উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কি চাশতে নামাজ পড়েন? তিনি বললেন: না। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করি নবী করীম ﷺ কি পড়তেন? তিনি বললেন: না, তিনিও পড়তেন না।

ইমাম বুখারী ইবনু আবি লায়লা থেকে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। উক্ত হাদিসে ইবনু আবি লায়লা বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ চাশতের নামাজ পড়েছেন বলে কেউ আমাদের কাছে বর্ণনা করেননি। তবে শুধু উম্মু হানী বলেছেন: মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে এসে গোসল করেন, তারপর আট রাকাত নামাজ পড়েন। আমি তাকে এত সংক্ষেপ নামাজ পড়তে আর কখনো দেখিনি। তবে রুকু সাজদা পূর্ণভাবেই আদায় করেন। তখন ছিল দোহা (অর্থাৎ, চাশত)-এর সময়।

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনু শাকীক থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়িশাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: রাসূলুল্লাহ ﷺ কি চাশতে নামাজ পড়তেন? তিনি বললেন, না । তবে ঐ সময় সফর থেকে এলে কিছু নামাজ পড়তেন।

একইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ চাশতের নামাজ পড়েছেন বলেও বর্ণনা আছে। যেমন–

সহীহ মুসলিমে আয়িশাহ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চাশতের নামাজ পড়তেন এবং চার রাকাত পড়তেন। আবার আল্লাহ চাইলে এর চেয়েও বেশি পড়তেন।

বুখারী-মুসলিমে উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে চাশতের সময় আট রাকাত নামাজ পড়েছেন।

মুসতাদরাক হাকিমে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সফরেও চাশতের আট রাকাত নামাজ পড়তে দেখেছি।

হাকিম তার চাশতের ফযীলত অধ্যায় আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ চাশতের নামাজ পড়েন। তারপর একশত বার এ দু'আটি পাঠ করেন:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ.

www.waytojannah.com

Contents

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে রহম (অনুগ্রহ) করো এবং আমার তাওবা কবুল করো। নিশ্চিই তুমি দয়াময়, ক্ষমাশীল, তাওবা কবুলকারী।

মুজাহিদ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চাশতের সময় দুই রাকাত, চার রাকাত, ছয় রাকাত এবং আট রাকাত নামাজ পড়েছেন।

হাকিম আয়িশা এবং উম্মু সালমা (রা)-এর সূত্রে বার রাকাতের কথাও উল্লেখ করেছেন।

চাশতের সময় নামাজ পড়া না পড়া উভয় ব্যাপারেই যেহেতু হাদিস রয়েছে, সে কারণে এ নামাজ পড়া না পড়া উভয় ব্যাপারেই মুহাদ্দিসগণের মতামত রয়েছে।

এ নামাজ পড়া এবং না পড়ার ফযীলত সম্পর্কে বেশ কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। অতীত বুযুর্গগের অনেকেই হাদিস অনুসারে এ নামাজ পড়েছেন।

আরেকদল মুহাদ্দিস এ নামাজ বর্জনের পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁরা এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তাছাড়া এ বিষয়ে সাহাবাগণের না জানার বিষয়টিও সামনে এনেছেন।

বুখারীতে উদ্ধৃত হাদিসে ইবনু উমার (রঃ) বলেছেন: রসূল ﷺ আবূ বাকার (রা) উমার (রা) এবং তিনি নিজেও এ নামাজ পড়তেন না।

আমি ওয়াকীর সূত্রে শুনেছি, আবূ হুরাইরা (রা) বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাত্র একদিন চাশতের সময় নামাজ পড়তে দেখেছি।

আলী ইবনুল মাদানী আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাকারের সূত্রে বর্ণনা করেন: একদিন আবূ বাকার (রা) একদল লোককে চাশতের সময় নামাজ পড়তে দেখে বলেন: তোমরা এমন নামাজ পড়ছ, যা না রাসূল পড়েছেন, না তাঁর কোন সাহাবী পড়ছেন।

অবশ্য তৃতীয় একদল ব্যক্তি চাশতের সময় নামাজ পড়াকে মুস্তাহাব বলেন। তাই তাঁরা কোনো কোনো দিন এ নামাজ পড়তে বলেন।

অবশ্য চাশতের সময় নামাজ পড়া সংক্রান্ত হাদিসগুলো সুপ্রমাণিত নয়।

রাসূল ﷺ কখনো কখনো এ সময় নামাজ পড়েছেন একথা প্রমাণিত, তবে তাঁর এ নামাজগুলো ঐ (চাশতের) সময়ের সঙ্গে জড়িত নয়। যেমন, মক্কা বিজয়ের দিন তিনি উম্মু হানীর ঘরে গিয়ে গোসল করে আট রাকাত নামাজ পড়েছেন। এ নামাজ ঐ সময়ের সঙ্গে জড়িত নয়, বরং মক্কা বিজয়ের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি এ নামাজ পড়েছেন। আবার আয়িশা (রা) বলেছেন, এ (চাশতের) সময় সফর থেকে ফিরে এলে তিনি নামাজ পড়তেন। এটাও ঐ সময়ের সঙ্গে জড়িত নামাজ নয়, বরং সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করার নামাজ।

– এভাবে এ সময় তাঁকে যারা কখনো কখনো নামাজ পড়তে দেখেছেন, সেটা এ সময়ের সঙ্গে জড়িত (অর্থাৎ, চাশতের) নামাজ নয়, বরং বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তিনি কখনো কখনো এ সময় নামাজ পড়েছেন। এটাই প্রমাণিত।

শোকরানার সাজদা

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণের নিয়ম ছিল, যখন তাঁরা আল্লাহর কোন নিয়ামত লাভ, কিংবা বিপদ দূর হবার কারণে আনন্দিত হতেন, তখন তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহকে সাজদা করতেন।

মুসনাদে আহমদে আবূ বাকার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে; রাসূল ﷺ-এর জীবনে যখন আনন্দের কিছু ঘটত, তখন তিনি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সাজদায় লুটিয়ে পড়তেন।

www.waytojannah.com

Contents

ইবনু মাজাহ আনাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন: একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি বিষয়ে সুসংবাদ প্রদান করা হয়। সংবাদটি শুনে তিনি আল্লাহর সমীপে সাজদায় লুটিয়ে পড়েন।

ইমাম বায়হাকী ইমাম বুখারী কর্তৃক সহীহ সূত্রে একটি বিশুদ্ধ হাদিস উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে: আলী (রা) কর্তৃক প্রেরিত হামদান গোত্রের ইসলাম গ্রহণ করার লিখিত খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজাদায় লুটিয়ে পড়েন। এরপর মাথা উঠিয়ে বলেন: "আস্‌সালামু আলা হামদান, আস্‌সালামু হামদান"।

মুসনাদে আহমাদে আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যখন এই সুসংবাদ এল যে, কোন ব্যক্তি যদি তোমার প্রতি সালাত (দরূদ) পাঠ করে, তবে আমিও তার প্রতি সালাত (অনুগ্রহ) করি। আর কোনো ব্যক্তি যদি তোমাকে সালাম করে, তা হলে আমিও তাকে সালাম (তার প্রতি শান্তি বর্ষণ) করি। এই সুসংবাদটি আসার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সাজদায় লুটিয়ে পড়েন।

সুনান আবূ দাউদে সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ উপরে হাত উঠিয়ে আল্লাহর নিকট কিছুক্ষণ প্রার্থনা করেন। এরপর সাজদায় লুটিয়ে পড়েন। এভাবে তিনবার সাজদা করেন। শেষে তিনি আমাদের বলেন, আমি আমার প্রভুর প্রার্থনা করেছি এবং আমার উম্মতের (অনুসারীদের) জন্যে সুপারিশ করেছি। তিনি একতৃতীয়াংশ উম্মেতের জন্য আমার প্রার্থনা কবুল করেন। তাই আমি তাঁর শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে সাজদায় লুটিয়ে পড়ি। আবার মাথা উঠিয়ে আমার প্রভুর নিকট আমার উম্মঠতের জন্য প্রার্থনা করি। এবার তিনি আরেক তৃতীয়াংশের জন্য আমার প্রার্থনা কবুল করেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রভুর দরবারে কৃতজ্ঞতার সাজদায় লুটিয়ে পড়ি। এরপর আবার মাথা উঠিয়ে আমি আমার উম্মঠতের জন্য প্রার্থনা করি। এবার তিনি আমার উম্মাতের[32] অবশিষ্ট তৃতীয়াংশের জন্য আমার প্রার্থনা কবুল করেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার প্রভুর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতার সাজদায় লুটিয়ে পড়ি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মতো সাহাবায়ে কিরামও কৃতজ্ঞতার সাজদা করেছেন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, কা'আব ইবনু মালিক (রা) যখন ক্ষমা লাভের সুসংবাদ পেলেন, তখন আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আনত হয়ে সাজদায় লুটিয়ে পড়েন।[33]

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে, আলী (রঃ) যখন যুস্‌সুদাইয়্যাহকে খারিজিদের নিহত লোকদের মধ্যে দেখতে পেলেন, তখন আল্লাহর দরবারে সাজদায় লুটিয়ে পড়েন।

সাঈদ ইবনু মানসূর বর্ণনা করেছেন: আবূ বকর (রা) যখন (নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিদার) মুসাইলামা কাযযাবের নিহত হবার সংবাদ জানতে পারেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দরবারে সাজদায় লুটিয়ে পড়েন।[34]

---

32 এই হাদিসে উম্মাত শব্দটি এসেছে। 'উম্মাত' মানে একই রীতি ও আদর্শের অনুসারী দল। উম্মাতে মুহাম্মাদী মানে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নীতি ও আদর্শের অনুসারী দল। এই হাদিসে রাসূল ﷺ-এর বাণী: 'আমার উম্মাতের জন্য সুপারিশ করেছি' মানে আমার নীতি ও আদর্শের অনুসারী লোকদের ক্ষমা করে দেয়ার জন্য সুপারিশ করেছি।

33 সাহাবী কা'আব ইবনু মালিক (রা) অলসতাবশত তাবুক যুদ্ধে যেতে না পারা তিনজন সাহাবীর একজন। তাবুক থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নির্দেশ এই তিন সাহাবীকে বয়কট করেন। ফলে তাঁদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। দুনিয়া তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়। তাঁরা কান্নাকাটি ও তাওবা করে থাকেন। পঞ্চাম দিনের চরম তাওবার পর আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করে কুরআনের আয়াত নাযিল করেন। এ সময় কা'আব (রা) শোকরানার সাজদা করেন।

www.waytojannah.com

Contents

তিলাওয়াতের সাজদাহ

কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে যখন কোন স্থানে সাজদার হুকুম আসত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গে সঙ্গে 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদায় লুটিয়ে পড়তেন। তিলাওয়াতের সাজদায় তিনি প্রায় সময়ই এ কথাগুলো পাঠ করতেন।

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

অর্থ: আমার মুখমণ্ডল সেই মহান সত্তার সামনে সাজদায় অবনত হলো, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং উত্তম আকৃতি দান করেছেন। তাছাড়া নিজ ক্ষমতা ও কুদরতে তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন।

কখনো কখনো তিনি তিলাওয়াতের সাজদায় নিম্নোক্ত দুআটি পাঠ করতেন:

اَللّٰهُمَّ احْطُطْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا وَاكْتُبْ لِيْ بِهَا اَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ.

অর্থ: হে আল্লাহ, এ সাজদার বিনিময়ে আমার পাপের বোঝা সরিয়ে দাও। এর বিনিময়ে আমার জন্য সওয়াব ও প্রতিদান লিখে রাখ। এ সাজদাকে আমার পরকালের পুঁজি বানিয়ে দাও। আর আমার এই সাজদা তেমনিভাবে তুমি কবুল কর, যেভাবে তুমি তোমার দাস দাউদের সাজদা কবুল করেছ।

বর্ণনা দু'টি সুনান সংকলকগণ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এ দুটি বর্ণনার কোনটিতে একথা বলা হয়নি যে, তিনি এই তিলাওয়াতের সাজদা থেকে মাথা উঠাবার কালেও আল্লাহু আকবার বলেছেন।

এ সাজদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশাহ্হুদ পড়েছেন বলেও জানা যায় না এবং সালাম ফিরিয়েছেন বলেও জানা যায় না।

---

34 এ অনুচ্ছেদে শোকরানার সাজদার কথা উল্লেখ হয়েছে, নামাজের কথা উল্লেখ হয়নি। তা ছাড়া হাদিসে এ সাজদার জন্য অজু করার প্রয়োজন আছে বলেও উল্লেখ নেই।

www.waytojannah.com

Contents

ইসতিসকা ও সূর্যগ্রহণের নামাজ

সালাতুল ইসতিসকা[35]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েক পদ্ধতিতে পানির জন্য মুনাজাত করেছেন বলে প্রমাণ আছে। সেই পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

- জুমার দিন খুতবা প্রদানকালে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করে তিনি পানির জন্য মুনাজাত করেছেন:

  اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا.

  অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদের পানি দাও! হে আল্লাহ আমাদের বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ আমাদের পানি পান করাও। হে আল্লাহ, আমাদের পানি পান করাও।

- লোকেরা একবার পানির অভাব ও অনাবৃষ্টির কথা জানালে তিনি তাদের কথা দিলেন, ইসতিসকার নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে তিনি বেরুবেন। কথা মতো সূর্যোদয় হলে তিনি বেরুলেন। অত্যন্ত নত, বিনীত ও জড়সড় প্রার্থীর ন্যায় তিনি লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। মিম্বারে উঠলেন (মিম্বারে উঠার কথাটি সহীহ কি না তাতে সন্দেহ আছে) এবং এভাবে দু'আ করলেন:

  الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا اله الا الله يفعل ما يريد، اللهم انت الله لا اله الا انت تفعل ما تريد، اللهم لا اله الا انت، انت الغنى ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلته علينا قوة وبلاغا الى حين.

  অর্থ: যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মহাবিশ্বের মালিক, যিনি দয়ার সাগর পরম করুণাময়, যিনি প্রতিফল দিবসের একচ্ছত্র অধিপতি। কোন উপাস্য নেই আল্লাহ ছাড়া, তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন। হে আল্লাহ, তুমিই আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোন প্রভু নেই। তুমি যা ইচ্ছা তা-ই কর। হে আল্লাহ, কোন ইলাহ নেই তুমি ছাড়া। তুমি মহাধনী, মহাপ্রাচুর্যের অধিকারী আর আমরা তো ফকির, নিঃস্ব, তোমার মুখাপেক্ষী। তুমি দয়া করে আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করো। আর যতটুকুই আমাদের প্রতি বর্ষণ করবে, সেটাকে আমাদের জন্য শক্তি লাভের উৎস বানাও এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমাদের জীবিকার উপকরণ বানাও।

  এরপর তিনি হাত তুললেন এবং বিনয়, কান্নাকাটি ও রোনাজারির মাধ্যমে দু'আ করতে শুরু করলেন। হাত এতটা উপরের দিকে উঠালেন যে, তার বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হলো। তারপর জনমণ্ডলীকে পিছে রেখে কিবালামুখী হলেন। এ সময় তিনি তাঁর চাদরেরও দিক পরিবর্তন করে নিলেন। ডানদিকের অংশ বাম দিকে এবং বাম দিকের অংশ পিঠে নিলেন। এ সময় তাঁর গায়ে ছিল কালো চাদর। এভাবে কিবলামুখী হয়ে তিনি দুআ করতে থাকলেন। তাঁর সাথে সাথে জনমণ্ডলীও রোনাজারির মাধ্যমে দু'আ করতে থাকল।

---

35 ইসতিসকা আরবি শব্দ। অর্থ পানি প্রার্থনা করা। অনাবৃষ্টি হলে কিংবা পানির প্রয়োজন দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মহান প্রতিপালকের নিকট পানির প্রার্থনা করতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কখনো দু' রাকাত নামাজও পড়তেন। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

Contents

এরপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে উপস্থিত জনতাকে নিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়লেন। এই দুই রাকাত ছিল ঈদের নামাজের মত আজান ও ইকামত বিহীন। এ নামাজের তিনি উচ্চস্বরে কিরাত পড়েন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আলা আলা এবং দ্বিতীয় রাকাতে আল গাশিয়া পড়েন।

- তৃতীয় পদ্ধতি ছিল এরকম যে, তিনি জুমু'আর দিন ছাড়া অন্য কোনো দিন মাসজিদে নাববীর মিম্বারে উঠে একাকী পানি প্রার্থনা করেছেন। এ সময় তিনি নামাজ পড়েছেন বলে বর্ণিত হয়নি।
- চতুর্থ পদ্ধতি এই ছিল যে, তিনি মাসজিদে বসে হাত উঠিয়ে পানি প্রার্থনা করেছেন এবং এই ভাষায় দু'আ করেছেন:

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مُرِيْعًا طَبَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ.

অর্থ: হে আল্লাহ! মিষ্টি পানির বৃষ্টি দিয়ে আমাদের পানি পান করাও। পর্যাপ্ত বৃষ্টি দাও, মন্থর নয়, ক্ষিপ্ত বৃষ্টি দাও। ক্ষতিকর নয়, কল্যাণকর বৃষ্টি দাও।

- পঞ্চম পদ্ধতি ছিল, তিনি মাসজিদের বাইরে যাওয়ারা-এর নিকট গিয়ে পানি প্রার্থনা করেছেন। বর্তমানে সেই জায়গাটাকেই বাবুস্ সালাম বলা হয়। একটি পাথর ছুঁড়তে যতদূর যায়, এই জায়গা মাসজিদ থেকে ততটা দূরে ছিল।
- অনেক সময় তিনি যুদ্ধের অবস্থায় পানি প্রার্থনা করেছেন। প্রতিপক্ষ মুশরিকরা পানির কুয়া, চৌবাচ্চা ও ঝরনা দখল করে নিলে মুসলিমরা পিপাসার্ত হয়ে পড়ে। তাঁরা অস্থির হয়ে তাঁর নিকট পানির অভাবের কথা জানায়। তখন তিনি পানি চেয়ে আল্লাহর দরবারের প্রার্থনা করেন।

মুনাফিকরা মুসলমানদের বলছিল, ইনি যদি নবী হতেন, তবে তিনি নিশ্চয় পানি প্রার্থনা করলে পানি পাওয়া যেত, যেভাবে মূসা (আ) পানি প্রার্থনা করে পানি পেয়েছিলেন। একথা নাবী করীম ﷺ-এর কানে এলে বললেন: তারা কি সত্য এমনটি বলেছে? তবে অচিরেই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পিপাসা মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন। একথা বলে তিনি হাত উঠালেন। প্রভুর নিকট পানি প্রার্থনা করলেন। দু'আ থেকে তাঁর হাত নামাবার আগেই আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল। প্রচুর বৃষ্টিপাত হলো। খাল বিল ও নালায় পানির স্রোত বয়ে চলল। সবাই পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলো। এ সময় তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় পানি প্রার্থনা করছিলেন:

اَللّٰهُمَّ اَسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ ، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مُرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ.

অর্থ: হে আল্লাহ, তোমার বান্দা ও পশু-পাখিগুলোকে পানি পান করাও। তোমার রহমত ছড়িয়ে দাও। তোমার মৃত শহরকে জীবিত করে দাও। আমাদের মিষ্টি পানির বৃষ্টি বর্ষিয়ে পান করাও এবং পরিতৃপ্ত করে দাও। এ বৃষ্টিকে আমাদের জন্য কল্যাণকর করো, ক্ষতিকর করো না। তা শীঘ্রই বর্ষণ করো, বিলম্ব করো না।

– রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন, বৃষ্টি হয়েছে।

– কখনো প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো এবং তা ক্ষতির কারণ হতো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টি বন্ধ হবার জন্য প্রার্থনা করতেন।

www.waytojannah.com

Contents

– মেঘ দেখলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে উদ্বেগ দেখা যেত। কারণ তিনি মেঘ থেকে আল্লাহর আজাবের আশঙ্কা করতেন। যখন বর্ষণ হতো, তখন তাঁর চেহারায় খুশি ও আনন্দের আভা ফুটে উঠতো।

সালিম ইবনু আবদুল্লাহ তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বৃষ্টি প্রার্থনার দু'আ ছিল নিম্নরূপ: "হে আল্লাহ, আমাদের এমন বৃষ্টিপাত দ্বারা পান করাও, যাতে পরিতৃপ্ত হই। এমন বৃষ্টিপাত যা প্রচুর, পরিপূর্ণ, ঘন ও স্থায়ী। হে আল্লাহ, বৃষ্টিপাত করে আমাদের পান করাও। আমাদের নিরাশ ও বঞ্চিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করো না। হে আল্লাহ, তোমার বান্দারা, তোমার শহরগুলো, তোমার পশুপাখি এবং সৃষ্টিকুল ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আপতিত হয়েছে। এর ফরিয়াদ আমরা তুমি ছাড়া আর কারো কাছে করছি না। হে আল্লাহ, আমাদের জন্য ফসল উৎপন্ন করে দাও। আমাদের পশুগুলোর ওলান দুধে ভরে দাও। আমাদের আসমান ও জমিনের বরকত (প্রাচুর্য) উৎপন্ন করে দাও। আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দুঃখ, কষ্ট ও বস্ত্রহীনতা দূর করে দাও। আমাদের সমূহ বিপদ ও মুসীবত দূর করে দাও যা তুমি ছাড়া কেউই দূর করতে পারে না। হে আল্লাহ, আমরা তোমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অবশ্যই অবশ্যই তুমি পরম ক্ষমাশীল দয়াময়। আমাদের জন্য আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাও।"

– ইমাম শাফেয়ী বলেছেন: ইমামগণ ইসতিসকা করার সময় এই দু'আটি করুক তা আমার খুবই পছন্দ।

– ইমাম শাফেয়ী আরো বলেছেন: আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পেয়েছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই হাত তুলে পানি প্রার্থনা (ইসতিসকা) করতেন।

– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: বৃষ্টির সময় দু'আ করলে তা ব্যর্থ হয় না।

কসূফ তথা সূর্যগ্রহণের নামাজ

একবার সূর্য উদিত হয়ে কিছুটা উপরে উঠলে সূর্যগ্রহণ শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ পেরেশান ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে চাদর টানতে টানতে দ্রুত ঘর থেকে মাসজিদের দিকে বেরিয়ে পড়েন। এ সময় তিনি সামনে গিয়ে জনতাকে নিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়েন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একটি লম্বা সূরা পড়েন। উচ্চঃস্বরে কিরাত পড়েন। তারপর লম্বা রুকু করলেন। রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে দীর্ঘ কিয়াম করলেন। এটা সূরা কিরাতের কিয়াম নয়, রুকূর পরের কিয়াম। রুকূ থেকে মাথা উঠাবার সময় বলেন: সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহু রাব্বানা লাকাল হামদ। তারপর আবার কিরাত শুরু করলেন। আবার দীর্ঘ রুকূ করেন। তবে এবার প্রথম বারের তুলনায়, কিছুটা কম সময় থাকলেন। অতঃপর সাজদায় চলে গেলেন এবং লম্বা সাজদা করলেন।

– দ্বিতীয় রাকাত একই ভাবে পড়লেন।

– এভাবে প্রতি রাকাতে তিনি দুইটি রুকূ ও দুটি সাজদা করলেন।

– এভাবে নামাজ মোট চার রাকাত হলো এবং চার রাকাতে চারটি রুকূ এবং চারটি সাজদা হলো।

এ নামাজ পড়াকালে তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছিলেন নামাজ শেষ করে তিনি জনতার উদ্দেশে এক মর্মস্পর্শী খুতবা (ভাষণ) দেন। তাঁর ঐ ভাষণের যতটুকু লোকেরা মুখস্ত রেখেছে, তা বিভিন্ন রাবী বর্ণনা করেছেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি সে ভাষণে বলেছেন: সূর্য-চাঁদ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দুটি নিদর্শন। কারো জীবন বা মৃত্যুর সাথে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কোনো সম্পর্ক নেই। যখন চন্দ্র-সূর্যে গ্রহণ

www.waytojannah.com

Contents

লাগতে দেখবে, তখন তোমরা আল্লাহকে ডাকবে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করবে, নামাজ পড়বে এবং দান-সদকা করবে। হে মুহাম্মাদের অনুসারী দল, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কোন বান্দা বা বন্দি ব্যভিচার করবে– এর চেয়ে অধিক ক্ষোভের বিষয় আল্লাহর কাছে আর কিছু নেই। হে মুহাম্মাদের অনুসারীগণ, আল্লাহর কসম, আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তবে অবশ্যই কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে।

"আমি তোমাদের যেসব জিনিসের ওয়াদা দিয়েছি, তা সবই এ সময় এখান থেকে দেখতে পেয়েছি। এমনকি আমি জান্নাত দেখার পর সেখান থেকে একগুচ্ছ আঙুর ছিঁড়ে আনবার ইচ্ছা করি, তখন তোমরা আমাকে একটু সামনে এগুতে দেখেছ। কিন্তু একটু সামনে এগুতেই আমি জাহান্নাম দেখতে পেলাম। তার একটি অংশ আরেক অংশ থেকে ভয়ংকর-বীভৎস! তার একটি অংশ আরেক অংশকে চিবিয়ে গ্রাস করছে! এ সময় তোমরা আমাকে পিছিয়ে আসতে দেখেছ। আমি জাহান্নাম থেকে ভয়াবহ কোনো দৃশ্য দেখিনি। আমি দেখতে পেলাম জাহান্নামে যারা শাস্তি ভোগ করছে তাদের বেশিরভাগই নারী।"

– লোকেরা জিজ্ঞাসা করল: হে আল্লাহর রাসূল! এর কারণ কী?

– তিনি বললেন: এর কারণ হলো, তাদের অকৃতজ্ঞতা।

– জিজ্ঞাসা করা হলো: তারা কি আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ?

– তিনি বললেন: তারা স্বামী ও প্রতিবেশীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কেউ যতই তাদের উপকার করুক, তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। তুমি যদি সারাজীবনও একজন নারীর উপকার ও কল্যাণ করতে থাকো, এরপর তোমার দ্বারা যদি সামান্য কোনো ত্রুটি হয়ে যায়, তবে সে বলে উঠবে: আমি কখনো তোমার থেকে ভাল কিছু পাইনি।

আমার কাছে ওহী নাযিল করা হয়েছে, তোমাদেরকে কবরে পরীক্ষায় ফেলা হবে। সে পরীক্ষা (ফিতনা) হবে দাজ্জালের পরীক্ষার মতো বা সে পরীক্ষার কাছাকাছি। সেখানে তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কেউ এসে প্রশ্ন করবে: এই ব্যক্তি (মুহাম্মাদ) সম্পর্কে তুমি কী জানো?

মুমিন জবাব দিবে: ইনি মুহাম্মাদ, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি।

তখন তাকে বলা হবে: নিরাপদে ঘুমাও। তুমি পুণ্যবান। আমরা জানতাম, তুমি অবশ্যই মু'মিন।

কিন্তু, জবাবে মুনাফিক বলবে: আমি তো তার সম্পর্কে কিছুই জানি না। লোকজনকে তার সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলতে শুনেছি, আমিও তা-ই বলেছি।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল তাঁর মুসনাদে অপর একটি সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইসতিসকা নামাজের পরে ভাষণ উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে: রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের সালাম ফিরালেন এবং হামদ, সানা ও কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ভাষণ (খুতবা) প্রদান করলেন। ভাষণে তিনি বলেন: হে জনতা, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আমি কি আমার প্রভুর বার্তা পৌছে দিতে কোনো ধরনের ত্রুটি করেছি?

তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। আপনি আপনার প্রভুর বার্তা পৌছে দিয়েছেন, আপনার অনুসারীদের কল্যাণ কামনা করেছেন এবং আপনার দায়িত্ব পূর্ণরূপে সম্পাদন করেছেন। আপনি কোনো কিছুই ত্রুটি করেননি।

www.waytojannah.com

Contents

এরপর তিনি বললেন: একদল লোক মনে করে, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ এবং নক্ষত্রের কক্ষচ্যুতি পৃথিবীর কোনো বড় ব্যক্তিত্বের মৃত্যুর কারণে ঘটে থাকে। এসবই মিথ্যা। বরং এগুলো সবই আল্লাহর নিদর্শন। তিনি চান, এগুলো থেকে তাঁর বান্দারা শিক্ষা গ্রহণ করুক আর তাওবা করে নিজেদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুক।

আল্লাহর কসম, আমি যখন নামাজে দাঁড়িয়েছি, তখন তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় অবস্থা অবলোকন করেছি। আল্লাহই অধিক জানেন। ত্রিশজন বড় মিথ্যাবাদীর আগমন ছাড়া কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। শেষজন কানা দাজ্জাল। তার বাম চোখ অন্ধ থাকবে। যখন সে বের হবে, সে নিজেকে প্রভু বলে দাবি করবে। যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সত্য বলে স্বীকার করবে, তার অনুসরণ করবে, তার অতীতের কোনো নেক আমলই তার কোন কাজে আসবে না। অপর দিকে যে ব্যক্তি তাকে অমান্য ও অস্বীকার করবে, তারা অতীতের কোন পাপের জন্যই তাকে শাস্তি দেয় হবে না। সে কা'বা ও বায়তুল মাকদিস ব্যতীত গোটা পৃথিবী দখল করে নেবে। সে মুমিনদের বায়তুল মাকদিসে অবরুদ্ধ করে ফেলবে। তখন মুনিনদের এক সাংঘাতিক অভ্যুত্থান ঘটবে। এর ফলে সে এবং তার বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন দেয়ালের ভিত আর গাছের শিকড় পর্যন্ত ডেকে বলবে: "হে মুসলিম, হে মুমিন, এই যে এখানে একটা ইহুদী বা কাফির। এসো তাকে হত্যা করো .....।"

সূর্যগ্রহণের নামাজ ও খুতবা সংক্রান্ত এ বর্ণনাগুলো নবী করীম ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সূর্য গ্রহণের নামাজ সম্পর্কে অন্যরকম পদ্ধতির বর্ণনাও রয়েছে। সেসব বর্ণনা মোতাবেক তিনি কখনো প্রতি রাকাতে তিন রুকূ, কখনো চার রুকূ এবং কখনো সাধারণ নামাজের মত এক রুকূ দিয়ে নামাজ পড়েছেন।

তবে শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এসব বর্ণনাকে সঠিক মনে করে না যেমন, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, ইমাম বুখারী এবং ইমাম শাফেয়ী। তাঁরা এসব বর্ণনাকে ভ্রান্ত মনে করেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী ইমাম বুখারীর বক্তব্য উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি বলেন: আমার দৃষ্টিতে সূর্যগ্রহণের নামাজ সংক্রান্ত হাদিসসমূহের মধ্যে সবচেয়ে সহীহ বর্ণনা হলো: রাসূল ﷺ চার রুকূ এবং চার সাজদাহ দিয়ে এই নামাজ পড়েছেন। প্রতি রাকাতে দুই রুকূ এবং দুই সাজদা করেছেন।

www.waytojannah.com

দুই ঈদের নামাজ

ঈদের নামাজ মাঠে আদায় করতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ঈদের নামাজই মাঠে আদায় করতেন। মদীনার পূর্ব প্রবেশ পথে একটি মাঠ ছিল। ঐ মাঠেই তিনি ঈদের নামাজ পড়তেন। আজকাল সেখানে হাজীদের যানবাহন রাখা হয়।

তিনি একবার ছাড়া আর কখনো ঈদের নামাজ মাসজিদে পড়েননি। সেই একবারও মাসজিদে পড়েছিলেন বৃষ্টির কারণে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে সুনানে আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ্‌তে।

ঈদের দিন কী করতেন

সব সময় ঈদগাহে নামাজ পড়াই ছিল তাঁর রীতি।

ঈদগাহের উদ্দেশে বেরুবার কালে তিনি সাধ্যনুযায়ী সুন্দরতম পোশাক পরিধান করতেন। দুই ঈদ ও জুমু'আর সময় পরার জন্য তাঁর একটি হোল্লা (ঢিলা লম্বা গাউন বা আলখেল্লা) ছিল।

একবার তিনি দুইটি সবুজ চাদর পরে ঈদগাহে গিয়েছিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন, একবার তিনি লাল চাদর পরে ঈদগাহে গিয়েছিলেন। মূলত তা লাল চাদর ছিল না। পাড়ে লালচে কাজ করা ছিল। এটা হতে পারে না যে, তিনি লাল চাদর পরেছেন। কারণ, তিনি লাল ও গেরুয়া রঙের পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। একবার তিনি আবদুল্লাহ ইবনু উমারের পরনে দুইটি লাল পোশাক দেখে তাকে সেগুলো জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। এমন অপছন্দ করা সত্ত্বেও তিনি নিজে তা পরেছেন, তা কী করে হতে পারে? তাঁরা নিষেধাজ্ঞা থেকে বুঝা যায়, লাল পোশাক (পুরুষের জন্য) হয় হারাম, নয় তো কমপক্ষে মাকরূহ তাহরীমী। ঈদুল ফিতরের দিন তিনি ঈদগাহের উদ্দেশে বেরুবার পূর্বে কয়েকটি খেজুর খেয়ে নিতেন। সেগুলোর সংখ্যা হতো বিজোড়।

ঈদুল আজহার দিন নামাজ থেকে ফিরে আসার আগে কিছু খেতেন না। নামাজ থেকে ফিরে এসে কুরবানীর গোশত খেতেন।

তিনি দুই ঈদের দিন (ঈদগাহে যাবার পূর্বে) গোসল করতেন। এটাই সহীহ হাদিস। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ভিন্ন রকম দুটি য'ঈফ হাদিস আছে।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) কাড়াকড়ি ভাবে সুন্নতের অনুসরণ করতেন। তাই দুই ঈদেই তিনি গোসল করে বের হতেন।

ঈদগাহে যাবার সময় তাঁর সামনে তীর বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। ঈদগাহে পৌছার পর তীর খাড়া করে গেড়ে রাখা হতো, যাতে করে তিনি সেটাকে সামনে রেখে নামাজে দাঁড়াতে পারেন। কারণ, ঈদগাহে ছিল খালি মাঠ। সম্মুখে কোন প্রাচীর বা খুঁটি ছিল না। ফলে এ অস্ত্রটিকে সুতরা হিসেবে ব্যবহার করতেন।

তিনি ঈদুল ফিতরের নামাজ দেরি করে পড়তেন।

তিনি ঈদুল আজহার নামাজ সকাল সকাল পড়তেন। এই সুন্নতটি কড়াকড়িভাবে পালন করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) ঈদুল আজহার দিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই ঈদগাহের উদ্দেশে রওয়ানা হতেন।

তিনি ﷺ ঘর থেকে বের হয়ে ঈদগাহে পৌছা পর্যন্ত তাকবীর উচ্চারণ করতে থাকতেন।

www.waytojannah.com

Contents

ঈদের নামাজ কিভাবে পড়তেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে পৌছেই নামাজ শুরু করে দিতেন। নামাজের আগে আজানও দেয়া হতো না, ইকামতও দেয়া হতো না এবং নামাজ শুরু হচ্ছে বলে ঘোষণাও দেয় হতো না। এর কিছুই তিনি করতেন না। এটাই সুন্নত। তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ ঈদগাহে পৌছে এই দুই রাকাত নামাজের আগে বা পরে আর কোনো নামাজ পড়তেন না।

তিনি খুতবার পূর্বেই নামাজ পড়তেন।

তিনি দুই রাকাত নামাজ পড়তেন।

প্রথম রাকাতে সাতবার তাকবীর বলতেন। তাকবীরে তাহরীমার সঙ্গে সঙ্গে সাতবার তাকবীর বলতেন। প্রতি দুই তাকবীরে মাঝে সামান্য থামতেন। দুই তাকবীরের মাঝে কোনো যিকর বা তাসবীহ পড়তেন বলে প্রমাণ নেই। অবশ্য আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেছেন: তিনি হাম্‌দ সানা ও দরূদ পড়তেন।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করে প্রতি তাকবীরে রফে ইয়াদাইন করতেন।

তাকবীর শেষ করে তিনি কিরাত আরম্ভ করতেন। সূরা ফাতিহার পর এক রাকাতে "নূন ওয়াল কুরআনিল মাজীদ" সূরা পড়তেন এবং অপর রাকাতে "ইকতারাবাতিস্ সাআতু ওয়ান শাককাল কামার" সূরা পড়তেন। কখনো কখনো "সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা" এবং "হাল আতাকা হাদিসুল গাশীয়া" সূরা পড়তেন। এগুলোই সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য বর্ণনা সহীহ নয়।

কিরাত শেষ করার পর তাকবীর বলে রুকূ ও সাজদাহ করতেন।

প্রথম রাকাত শেষে সাজাদহ থেকে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকাতের শুরুতে পরপর পাঁচবার তাকবীর বলতেন। তাকবীর শেষ করে কিরাত আরম্ভ করতেন।

এভাবে প্রত্যেক রাকাত তিনি তাকবীরসমূহ দ্বারা শুরু করতেন এবং কিরাত শেষ করেই রুকূতে যেতেন। **(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারেমীতে)**

অনেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ প্রথম রাকাতে সূরা কিরাতের আগে তাকবীর বলেছেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কিরাতের পরে তাকবীর বলেছেন। কিন্তু এসব বর্ণনা প্রমাণিত নয়। এই বর্ণনাটির সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু মুয়াবিয়া আনমাইসাবুরী নামে এক ব্যক্তি আছে। বায়হাকী বলেছেন, সে যে মিথ্যুক তা একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

ইমাম তিরমিযী কাসীর ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আউফ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। কাসীর ইবনু আবদুল্লাহ তার পিতার ও দাদার সূত্রে শুনেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ঈদের নামাজেই প্রথম রাকাতে কিরাতের আগে সাতবার তাকবীর বলেছেন এবং দ্বিতীয় রাকাত কিরাতে পূর্বে পাঁচবার তাকবীর বলেছেন।

তিরমিযী বলেন, আমি এই হাদিসটি সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল অর্থাৎ, ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞাসা করেছি। ইমাম বুখারী বলেছেন ঈদের নামাজের তাকবীর সম্পর্কে এ অপেক্ষা বিশুদ্ধ কোনো হাদিস নেই। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদিসটি সম্পর্কে আমার এবং ইমাম বুখারী একই মত।

www.waytojannah.com

Contents

তিনি নামাজের পরে খুতবা দিতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ শেষ করে জনতার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতেন। জনতা তাদের নিজ নিজ সারিতেই বসা থাকত। দাঁড়িয়ে তিনি জনতার উদ্দেশে ভাষণ (খুতবা) দিতেন। ভাষণে তিনি তাদেরকে উপদেশ, পরামর্শ এবং আদেশ নিষেধ প্রদান করতেন।

কোথাও সৈন্যবাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন হলে এখান থেকেই পাঠাতেন।

কোনো নির্দেশ জারি করার থাকলে এখান থেকেই জারি করতেন।

ভাষণ দেবার জন্য সেখানে (ঈদগাহে) কোনো মিম্বার ছিল না। তা ছাড়া মাদিনার মাসজিদ থেকেও মিম্বার বের করে আনা হয়নি। তিনি ভূমিতে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতেন।

সহীহাইনে এসেছে যে, জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ঈদের নামাজে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার পূর্বেই আজান ও ইকামত ছাড়া নামাজ পড়েছেন। নামাজ শেষ করে বিলালের কাঁধে ভয় দিয়ে খুতবা দিয়েছেন। খুতবায় তিনি আল্লাহকে ভয় করার ও আল্লাহর আনুগত্য করার আদেশ দেন, লোকদের বিভিন্ন উপদেশ দেন ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করেন। এরপর তিনি মহিলাদের সমাবেশে আসেন, তাদেরকেও উপদেশ দেন এবং নসীহত করেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে একটি বর্ণনায় জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহনে চড়ে ভাষণ দিয়েছেন।

জাবির (রা) থেকে ও একটি বর্ণনা রয়েছে, তাতে তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদগাহে এসে প্রথমে নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে খুতবা দিলেন। খুতবা শেষ করে নেমে গেলেন এবং মহিলাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন।

তিনি আল্লাহর প্রশংসা করার মাধ্যমে খুতবা শুরু করতেন। তিনি তাকবীর বলে খুতবা শুরু করতেন বলে প্রমাণ নেই।

নবী করীম ﷺ-এর মুয়াযযিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ খুতবায় অধিক বারে তাকবীর বলতেন এবং দুই ঈদের খুতবায়ে আরো অধিক তাকবীর বলতেন। অবশ্য এ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, তাকবীর বলে খুতবা শুরু করতেন।

যারা ঈদের নামাজে উপস্থিত হতো রাসূল ﷺ তাদেরকে খুতবা শোনার জন্য বসার এবং চলে যেতে চাইলে চলে যাবার অনুমতি দিতেন। একবার জুমু'আর দিন ঈদ হলে তিনি তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন।

ঈদগাহে যাওয়া-আসার পথ পরিবর্তন করতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে যাওয়া আসার পথ পরিবর্তন করতেন। তিনি ঈদগাহে যাওয়ার কালে এক পথে যেতেন এবং ফিরে আসার সময় ভিন্ন পথে ফিরে আসতেন। পথ পরিবর্তনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন জন্য বিভিন্ন কথা বলেছেন।

অনেকে বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হলো, দুই পথে অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দেয়া।

অনেকে বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হলো, উভয় অঞ্চলের লোককে ঈদের বরকত পৌঁছে দেয়া।

অনেকে বলেছেন এর উদ্দেশ্যে হলো, উভয় পথের অভাবী ব্যক্তিদের সাহায্য করা।

আবার অনেক বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হলো, সকল অলিগলি ও পথপ্রান্তরে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটানো।

অনেকে বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হলো মুনাফিকদের ইসলামের শান শওকত ও দাপট প্রদর্শন করা।

আবার অনেক বলেছেন, বেশি বেশি ভূমিকে মুসল্লিদের জন্য সাক্ষ্য বানানো।

www.waytojannah.com

Contents

জানাজার নামাজ

মাইয়্যেতের সঙ্গে সর্বোত্তম আচরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন রোগীর জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়তেন তখন বলতেন:

اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

অর্থ: নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য আর অবশ্যই আমরা তাঁর নিকট ফিরে যাব।

তিনি এ ধরনের রোগীকে আখিরাতের কথা স্মরণ করে দিতেন, অসিয়ত করতে, তাওবা করতে এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা সংবলিত এই সর্বোত্তম বাক্যটি অধিক হারে উচ্চারণ করতে বলতেন, যেন ঈমানের এই ঘোষণাই হয় তার জীবনের সর্বশেষ উচ্চারণ।

কোনো ব্যক্তি মৃত্যু হলে তিনি তার ব্যাপারে সর্বোত্তম কর্মপদ্ধতির অবলম্বন করতেন। মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে তাঁর আচরণ ছিল সর্বাধিক কল্যাণধর্মী। মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে তাঁর প্রবর্তিত কর্মনীতি ছিল মৃত ব্যক্তির দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর, তার আত্মীয় স্বজনদের ক্ষেত্রে সান্ত্বনা দায়ক এবং জীবিত লোকদের জন্য উপদেশ ও শিক্ষামূলক।

তিনি মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনও মহান আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে সম্পাদন করতেন।

তিনি মৃত ব্যক্তির জন্য নামাজে জানাযার[36] পদ্ধতি চালু করেন।

তিনি মৃত ব্যক্তিকে সামনে নিয়ে দাঁড়াতেন। সাহাবায়ে কিরাম তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতেন। তারা তাঁর সঙ্গে আল্লাহর প্রশংসা করতেন। মৃতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তার জন্য আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করতেন এবং তার পরকালীন মুক্তির জন্য দু'আ করতেন। কফিনের সঙ্গে কবর পর্যন্ত যেতেন। উত্তম পদ্ধতিতে তাকে কবরস্থ করতেন। তারপর তিনি এবং তাঁর সাথিগণ কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তার জন্য পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে মুক্তির প্রার্থনা করতেন। কারণ মৃত্যুর পর পরবর্তী অধ্যায়গুলোর মুক্তিই তার জন্য বেশি প্রয়োজন।

অতঃপর তিনি মাঝে মধ্যে গিয়ে তার কবর যিয়ারতের রীতি চালু করেন এবং যিয়ারতকালে তাকে সালাম দেয়া এবং তার জন্য দু'আ করার রীতি চালু করেন। এ যেন জীবিতকালে প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া, তাকে সালাম দেয়া, এবং তার কুশল ও মঙ্গল কামনা করা।

– মৃতের জন্য তিনি চিৎকার করে কান্না, বুক চাপড়ানো, কাপড় ছেঁড়া, মাথা কামানো এবং উচ্চ স্বরে বিলাপ করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছেন।

– অপর দিকে তিনি মৃত্যুর জন্য শোক সন্তপ্ত হওয়া, নীরবে কান্নাকাটি করা এবং হৃদয় ভারাক্রান্ত করার রীতি চালু করেছেন।

– মৃত ব্যক্তির জন্য তিনি এসবই করতেন। তিনি বলতেন মৃত ব্যক্তির জন্য চক্ষু অশ্রুপাত করবে, হৃদয় ভারাক্রান্ত হবে এবং যবানে তা-ই উচ্চারিত হবে যাতে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন।

---

36 সালাত তথা নামাজ মানে দু'আ। নামাজে জানাজা মানে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা। নামাজে জানাজাকে আমরা জানাজার নামাজ বলে থাকি। এটা মূলত মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আর অনুষ্ঠান। –*অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

Contents

মাইয়্যেতের গোসল ও কাফন

রসূল ﷺ এর সুন্নত ছিল যে, কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তিনি তাকে গোসল করিয়ে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করতেন। তার গায়ে আতর ও সুগন্ধি লাগাতেন। সাদা কাপড় দিয়ে কফন পরাতেন। তাঁর নির্দেশে সাহাবায়ে কিরাম এভাবেই মৃত ব্যক্তিকে সাজাতেন। তারপর তিনি তার জন্য নামাজে জানাজা পড়তেন।

তিনি সাধারণত জানাজা মাসজিদে পড়তেন না। অবশ্য দু একবার মাসজিদে পড়ারও প্রমাণও রয়েছে। দুভাবে পড়াই বৈধ। তবে মাসজিদের বাইরে পড়াই উত্তম।

মৃতব্যক্তিকে চুমু দেয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত হলো, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মাইয়্যেতের লাশকে সোজা করে দেয়া। তার চোখ বন্ধ করে দেয়া এবং তার মুখ ও শরীর ঢেকে দেয়া।

তিনি কখনো কখনো মাইয়্যেতকে চুমু খেতেন। তিনি উসমান ইবনু মাযউন (রা)-এর মৃত্যুর পর তাকে চুমু দিয়েছিলেন এবং তাঁর জন্য ক্রন্দন করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পর আবূ বাকার সিদ্দিক (রা) তাঁর কফিনের উপর উপুড় হয়ে তাঁকে চুমু খেয়েছিলেন।

শহীদদের গোসল ও জানাজা দিতে হবেনা

যারা আল্লাহর পথে শহীদ হতো তিনি তাদের গোসল করাতেন না। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ শহীদদের গোসল দিতে নিষেধ করেছেন।

শহীদদের হাতিয়ার ও চামড়ার পরিধেয় বস্ত্র খুলে নিয়ে তাদের অবশিষ্ট সব পোশাকসহই তাদের দাফন করতেন।

তিনি শহীদদের জানাজাও পড়তেন না। কেননা শাহাদাতের মাধ্যমেই শহীদদের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

জানাজার পূর্বে ঋণ আদায়

তাঁর কাছে যখন জানাজার জন্য কোন মাইয়্যেতকে আনা হতো, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন এই ব্যক্তির কোন ঋণ আছে কি? যদি মৃত ব্যক্তি দেনাদার না হতো তবে তিনি তার জানাজা পড়াতেন। তবে মৃত ব্যক্তি যদি দেনাদার হতো তবে তিনি নিজে জানাজা পড়াতেন না। সাহাবায়ে কিরামকে বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাজা পড়ে নাও। আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাজা ছিল মৃত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ। তার সুপারিশ অবশ্যই কবুল হতো। অথচ ঋণী ব্যক্তির ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত যে জান্নাতে যাবে না। তা এ কারণে আল্লাহ তাআলা যখন তাকে স্বচ্ছলতা দান করেন, তখন তিনি নিজেই মৃত ব্যক্তির ঋণ আদায় করে তার জানাজার পড়াতেন এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার ওয়ারিশদের দিয়ে দিতেন।

www.waytojannah.com

Contents

তিনি কিভাবে নামাজে জানাজা পড়াতেন

– রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত ছিল, তিনি মাইয়্যেত পুরুষ হলে তার মাথা বরাবর আর মহিলা হলে তার শরীরের মাঝখানে বরাবর দাঁড়াতেন।

– তিনি আল্লাহ্ আকবর বলে জানাজার নামাজ শুরু করতেন। তারপর আল্লাহর হামদ ও সানা পড়তেন।

– আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) একবার জানাজা পড়াতে গিয়ে তাকবীরের পর উচ্চ স্বরে ফাতিহা পাঠ করেন। তিনি বলেন, আমি এজন্য এরকম করেছি যেন তোমরা জানতে পার জানাজার নামাজে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নত।

– একইভাবে আবূ উমামা ইবনু সাহল (রা) বলেছেন, জানাজার প্রথম তাকবীরের পরে সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নত। তার সূত্রে নবী করীম ﷺ-কে সূরা ফাতিহা পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে এই হাদীসটির সনদ (সূত্র) বিশুদ্ধ নয়।

– আমাদের শাইখ ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা বলেছেন, জানাজার নামাজে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব নয়, তবে সুন্নত।

– আবূ উমামা ইবনু সাহল (রা) একদল সাহাবীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন জানাজার নামাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সালাত (দরূদ) পাঠ করতে হবে।

– উবাদাহ ইবনুস সামিতকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাজার নামাজ কিভাবে পড়তেন, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন:

আল্লাহর শপথ আমি অবশ্যই বলব তিনি কিভাবে জানাজার নামাজ পড়তেন। তুমি আল্লাহ্ আকবার বলে নামাজ শুরু করবে, এরপর নাবী করীম ﷺ-এর প্রতি সালাত (দরূদ) পাঠ করবে। এরপর মৃত ব্যক্তির জন্য এভাবে দু'আ করবে:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هَذَا عَبْدُكَ كَانَ لَايُشْرِكُ بِكَ وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْلَهُ فِيْ إِحْسَانِهِ وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْعَنْهُ، اَللّٰهُمَّ لَاتَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَاتُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

অর্থ: হে আল্লাহ, তোমার এই দাস তোমার সঙ্গে কাউকে শরীক করত না। আর তুমিই তো তার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানো। এই ব্যক্তি যদি পুণ্যবান হয়ে থাকে, তবে তুমি তার পুণ্য আরো বৃদ্ধি করে দাও। আর সে যদি পাপী হয়ে থাকে তবে তার পাপগুলো ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ, তার পুরস্কার থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না। তার পরে আমরা যারা বেঁচে আমি তুমি তাদের বিপথগামী করো না।

দু'আর কথা লোকেরা যেভাবে মুখস্থ রেখেছে, সূরা ফাতিহা ও দরূদ এর কথা সে রকম বেশি মুখস্থ রখেনি।

– সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাইয়্যেতের জন্য নিম্নরূপ দু'আ করতেন বলেও বর্ণিত আছে:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ.

www.waytojannah.com

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগ ফিরলাহু, ওয়ার হামহু[৩৭], ওয়া 'আ-ফিহী ওয়া'ফু 'আনহু, ওয়া আকরিম নুযুলাহু, ওয়া ওয়াস্সি' মাদ খালাহু, ওয়াগ সিলহু বিল মা-য়ি, ওয়াস্ সালজি ওয়াল বারাদি, ওয়া নাককিহি মিনাল খাতা-ইয়া- কামা- ইউনাককাস্ সাউবুল আবইয়াযু মিনাদ দানাসি। ওয়াবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহি, ওয়া আহ্লান খাইরাম মিন আহ্লিহী, ওয়া যাওজান খাইরাম মিন যাওজিহী, ওয়া আদ খিলহুল জান্নাতা, ওয়াআ 'ইযহু মিন 'আযা-বিল কাবরি, ওয়া মিন 'আযা-বিন্ না-র।

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি এ ব্যক্তির ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা কর, তার প্রতি অনুগ্রহ করো। তাকে শান্তি দাও এবং যাবতীয় পাপ হতে পবিত্র করো এবং যাবতীয় ত্রুটি মুছে দাও। তাকে সম্মানিত মেহমান হিসেবে সম্মানে ভূষিত করো, তার কবর প্রশস্ত কর। বৃষ্টি, বরফ এবং ঠাণ্ডা পানিতে তাকে এমনভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করো যেমন সাদা কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা হয়। দুনিয়ার ঘরবাড়ি হতে উত্তম ঘরবাড়ী এবং পরিবার পরিজন হতে উত্তম পরিবার-পরিজন দান করো। দুনিয়ার জীবনসঙ্গিনী অপেক্ষা উত্তম জীবনসঙ্গিনী দান কর। তাকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দাও এবং জাহান্নাম ও কবরের 'আযাব হতে মুক্তি দাও।

– তিনি নিম্নরূপ দু'আ করেছেন বলেও বর্ণিত আছে:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ. اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগ ফিরলি হাইয়িনা-, ওয়া মাইয়িতিনা-, ওয়া শা-হিদিনা-, ওয়া গা-য়িবিনা-, ওয়া সাগীরিনা-, ওয়া কাবীরিনা-, ওয়া যাকারিনা-, ওয়া উনসা-না-। আল্লা-হুম্মা মান আহ্ ইয়াইতাহু মিন্না-ফা আহ্য়িহি 'আলাল ইসলা-ম, ওয়ামান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না- ফাতা ওয়াফ্ফাহু 'আলাল ঈমান। আল্লা-হুম্মা লা- তাহরিমনা- আজরাহু, ওয়ালা- তাফতিন্না বা'দাহু।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে, যারা মারা গেছে, যারা ছোট, যারা বড়, যারা পুরুষ, যারা মহিলা, যারা উপস্থিত এবং যার অনুপস্থিত, তাদের সবার গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যাদের বাঁচিয়ে রাখবে তাদের ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রেখো। আর আমাদের মধ্যে থেকে তুমি যাদের মৃত্যু দান করো, তাদের ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ, আমাদেরকে এর প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করো না এবং এর মৃত্যুর পর আমাদেরকে ফিত্নার মধ্যে ফেলো না।

(আবূ দাউদ, হাকিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী, মিশকাত সহীহ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাজার নামাজে মহিলাদের জন্য নিম্নরূপ দু'আ করেছেন বলেও বর্ণিত হয়েছে–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا الْاِسْلَامَ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَتَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا جِئْنَاشُفَعَاءَ فَاغْفِرْلَهَا.

অর্থ: "হে আল্লাহ, তুমি এই মহিলাটির প্রভু। তুমিই তাকে সৃষ্টি করেছ। তুমি তাকে ইসলামের হিদায়াত দান করছ। আর এখন তুমিই তার রূহ কবজ করছ। আমরা তার জন্য তোমার নিকট সুপারিশ করতে এসেছি। তুমি দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দাও।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃতদের জন্য নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দু'আ করতে আদেশ করেছেন।

---

[37] মৃত ব্যক্তি স্ত্রী লোক হলে "হু" উচ্চারণের পরিবর্তে "হা" উচ্চারণ করতে হবে।

Bangladesh Jamiyatul Ulama

Contents

জানাজা নামাজে তাকবীর কয়টি

রাসূলুল্লাহ ﷺ চার তাকবীরের জানাজা পড়তেন। তিনি পাঁচবার তাকবীর বলেছেন বলেও সহীহ সূত্র মারফত জানা যায়।

তাঁর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কিরাম কেউ চার, পাঁচ এবং কেউ ছয় তাকবীরে জানাজা পড়েছেন।

যাইদ ইবনু আরকাম পাঁচ তাকবীরে জানাজা পড়েছেন। তিনি বলেছেন, নাবী করীম ﷺ পাঁচ তাকবীরে জানাজা পড়তেন। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে সহীহ মুসলিমে।

আলী (রা) সাহল ইবনু হুনাইফের নামাজে জানাজা ছয় তাকবীরে পড়েছেন। তিনি বদরী সাহাবীদের জানাজা ছয় তাকবীরে পড়াতেন। অন্যান্য সাহাবীদের জানাজা পাঁচ তাকবীরে পড়াতেন। আবার অন্যান্য লোকদের জানাজা চার তাকবীরে পড়াতেন। এ কথা বর্ণনা করেছেন ইমাম দারাকুতনী।

সাঈদ ইবনু মানসুর হাকাম থেকে এবং তিনি ইবনু উয়াইনা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবায়ে কিরাম বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীগণের নামাজে জানাজা পাঁচ, ছয় ও সাত তাকবীরে পড়াতেন।

এসবই সহাবায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত বিশুদ্ধ আসার। তন্মধ্যে যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করাই বৈধ। এর কোনটিকেই অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এবং তাঁর সাহাবীগণ চারের অধিক তাকবীর বলেছেন।

যারা চার তাকবীরের অধিক তাকবীর বলতে নিষেধ করেন, তারা ইবনু আব্বাস (রা)-এর হাদিসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন। তাতে ইবনু আব্বাস (রা)বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবনের শেষ জানাজা চার তাকবীরে পড়েছেন। তাদের মতে কোনো বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের শেষ কাজই সে বিষয়ের চূড়ান্ত ফায়াসালা।

যে সূত্রে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে তা খুবই দুর্বল এবং একেবারে ত্রুটিপূর্ণ। ইমাম আহমাদ বলেছেন, এই বক্তব্য মিথ্যা এবং এর কোন ভিত্তি নেই। এ হাদিসের সূত্রে (সনদে) মিথ্যা হাদিস রচনাকারী আছে।

জানাজার নামাজে কয়টি সালাম

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাজার নামাজে একটি সালাম বলতেন বলে বর্ণিত রয়েছে। অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনায় তাঁর দুটি সালামের কথাও আছে।

– ইমাম বায়হাকী প্রমুখ মাকবুরীর সূত্রে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার চার তাকবীর ও এক সালামে জানাজা পড়েছেন।

– ইমাম আহমদ বলেছেন, এই হাদিসটি মাওজূ তথা জাল।

তবে ইমাম আহমাদ সহীহ সূত্রে এক সালামের কথাও বর্ণনা করেছেন এবং দুই সালামের কথাও বর্ণনা করেছেন।

– সাহাবায়ে কিরাম এক সালামেও জানাজা শেষ করেছেন, দুই সালামেও জানাজা শেষ করেছেন।

www.waytojannah.com

Contents

জানাজার নামাজে রফে ইয়াদাইন

রাসূলুল্লাহ ﷺ কি জানাজায় রফে ইয়াদাইন করতেন? এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন: আসারে সাহাবাহ এবং নামাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নতের উপর কিয়াস করে জানাজায় 'রফে ইয়াদাইন' করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে দাঁড়ানো অবস্থা প্রত্যেক তাকবীরের সঙ্গে 'রফে ইয়াদাইন' করতেন।

ইবনু উমার ও আনাস (রা) জানাজায় প্রত্যেক তাকবীরের সঙ্গে 'রফে ইয়াদানই' করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

বায়হাকী বর্ণনা করেছে: রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম তাকবীরে 'রফে ইয়াদাইন' করতেন এবং ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখতেন।

তিনি কবরে জানাজা পড়েছেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতি ছিল, তিনি যদি কারো কবর দু'আর পূর্বে জানাজার নামাজ পড়তে না পারতেন, তবে কবর দু'আর পর করবে গিয়ে তার জানাজার নামাজ পড়তেন।

একবার এক ব্যক্তিকে কবর দেয়ার এক রাত্রি পরে তিনি তার কবরে গিয়ে জানাজার নামাজ পড়েছেন। একবার একটি কবরে দাফন করার তিনদিন পর জানাজার নামাজ পড়েছেন। অন্য একটি কবরে একমাস পর পড়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করেননি।

ইমাম আহমাদ বলেছেন, কবরে জানাজার নামাজ পড়ার ব্যাপারে কার সন্দেহ আছে? যেখানে নাবী করীম ﷺ কারো জানাজার নামাজ বাদ পড়লে তার কবরে গিয়ে জানাজার নামাজ পড়তেন বলে বর্ণিত আছে, সেক্ষেত্রে সন্দেহ থাকার কোনো সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে ছয়টি সূত্রে হাদিস বর্ণিত রয়েছে। সবগুলো সূত্রই হাসান।

– ইমাম আহমদ কবরে জানাজা পড়ার সময়সীমা এক মাস নির্ধারণ করেছেন।

– ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, লাশ পঁচে-গলে বিকৃত হবার পূর্ব পর্যন্ত কবরে জানাজার নামাজ পড়া যাবে।

– ইমাম অবু হানীফা ও ইমাম মালিক মৃত ব্যক্তির অভিভাবক ব্যতীত আর কারো জন্য কবরে জানাজার নামাজ পড়া সঠিক মনে করেননি। তাঁরা বলেছেন, কবরস্থ করার পূর্বে অলি (অভিভাবক) অনুপস্থিত থাকলে তিনি ফিরে এসে কবরে জানাজা পড়তে পারবেন।

শিশুর জানাজা

বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা শিশুর জানাজার নামাজ পড়বে।

সুনানে ইবনু মাজাহ্‌তে মরফূ হাদিস বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা শিশুদের জানাজার নামাজ পড়বে। কেননা তারা তোমাদের পূর্বে পাঠানো নেক আমল। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব বর্ণিত হাদিস থেকে জানা যায়, গর্ভচ্যুত শিশুর বয়স চার মাস হলে তার জানাজা পড়তে হবে।

আত্মহত্যাকারী, প্রতারক ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির জানাজা

– রাসূলুল্লাহ ﷺ আত্মহত্যাকারীর জানাজা নামাজ পড়তেন না।

– তিনি গণীমতের মাল আত্মসাৎকারীর জানাজার নামাজও পড়তে না।

– তিনি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়েছেন কি না সে ব্যাপারে মতভেদ আছে।

www.waytojannah.com

Contents

কফিনের সহগামী হওয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতি ছিল তিনি কোন মাইয়্যেতের জানাজার নামাজ পড়ার পর কফিনের সঙ্গে কবর পর্যন্ত যেতেন। এ সময় তিনি পায়ে হেঁটে কফিনের আগে আগে চলতেন।

– তাঁর ইন্তেকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতও এটাই ছিল।

– তিনি এই রীতিও চালু করেন, যারা যানবাহনের করে কফিনের সঙ্গে যাবে, তারা কফিনের পিছে থাকবে। আর যারা পায়ে হেঁটে যাবে, তারা কফিনের নিকটবর্তী চারপাশে থাকবে– সামনে পিছে ও ডানে বামে।

– তিনি কফিন নিয়ে দ্রুত চলতে বলতেন। তাই সাহাবায়ে কিরাম কফিন নিয়ে দ্রুত কবরের দিকে এগিয়ে যেতেন।

আজকাল কফিন নিয়ে কবরে যেতে যে ধীরগতি অবলম্বন করা হয় তা বিদআত, মাকরূহ, সুন্নতের বিপরীত এবং ইহুদী খ্রিস্টানদের অনুসৃত নীতি। কফিনের সঙ্গে কাউকে ধীরে চলতে দেখলে আবূ বাকর (রা) তার প্রতি ছড়ি উত্তোলন করে বলতেন: তুমি, কি দেখনি আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কফিন নিয়ে কত দ্রুত চলতাম।

– রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কফিন নিয়ে কবরের দিকে যেতেন, তখন পদব্রজে চলতেন। তিনি বলতেন ফেরেশতারা পদব্রজে চলছে, আমি কি করে বাহনে করে যেতে পারি।

– মাইয়্যেতকে দাফন করে ফেরার কালে তিনি কখনো পদব্রজে ফিরতেন আবার কখনো বাহনে করে ফিরতেন।

– কফিনের সঙ্গে গিয়ে মাইয়্যেতকে জমিনে রাখার আগ পর্যন্ত তিনি বসতেন না।

গায়েবানা জানাজা

বহু মুসলিম দূরে বিভিন্নস্থানে মৃত্যুবরণ করায় তাদের জানাজার নামাজ পড়া হয়নি। সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, বাদশাহ নাজ্জাশীর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার গায়েবানা জানাজা পড়েছেন। এ বিষয়ে তিনটি মত সৃষ্টি হয়েছে:

১. একটি মত হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ গায়েবানা জানাজার বিধান চালু করেছেন। তাই দূরে মাইয়্যেতের জন্য গায়েবানা জানাজা পড়া উম্মাতের জন্য সুন্নাত। এমত হল ইমাম শাফেয়ী (র)-এর। এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদেরও এটাই মত।

২. ইমাম অবু হানীফা (র) ও ইমাম মালিক (র) বলেছেন, রাসূল ﷺ যে নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাজা পড়েছেন, তা শুধু নাজ্জাশীর জন্যেই খাস ছিল। এটা অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজ্জাশী ছাড়া আর কারো গায়েবানা জানাজা পড়েছেন বলে প্রমাণ নেই। তাঁর গায়েবানা জানাজা পড়ার প্রমাণ মাত্র একটি, আর না পড়ার প্রমাণ অনেক। তাই গায়েবানা জানাজা পড়া যেমন সুন্নাত, তেমনি না পড়াও সুন্নাত।

www.waytojannah.com

Contents

৩. ইমাম ইবনু তাইমিয়ার মতে এ ব্যাপারে উত্তম পন্থা হলো, কেউ যদি এমন কোথাও মারা যায়, এবং সেখানে তাঁর জানাজা নামাজ পড়া না হয়ে থাকে, তবে তার গায়েবানা জানাজা পড়তে হবে। যেমন নাবী করীম ﷺ নাজ্জাশীর জানাজা পড়েছিলেন। কারণ তিনি অমুসলিম দেশে মারা গিয়েছিলেন এবং তাঁর নামাজে জানাজা পড়া হয়নি। অপর দিকে কেউ যদি এমন কোথাও মারা যায়, যেখানে তার নামাজে জানাজা পড়া হয়েছে, তবে তার জন্য গায়বানা জানাজা পড়া যাবে না। কারণ, তার জানাজা পড়ার যে ফরজ মুসলমানদের উপর বর্তিয়েছিল, তা আদায় হয়ে গেছে। নাবী করীম ﷺ গায়েবানা জানাজা পড়েছেন, আবার বর্জনও করেছেন। কাজেই পড়া এবং না পড়া দুটোই সুন্নত। তাঁর গায়েবানা জানাজা পড়ার ক্ষেত্র ছিল আলাদা, আর না পড়ার ক্ষেত্রেও ছিল আলাদা।

দাফন ও কবর সংক্রান্ত অন্যান্য প্রসঙ্গ

– মাইয়্যেতকে যখন কবরে রাখা হতো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কথাগুলো উচ্চারণ করতেন:

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.

অর্থ: আল্লাহর নামে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের সঙ্গে এবং আল্লাহর রাসূলের আদর্শের উপর তাকে কবরস্থ করছি।

অপর বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে, এ সময় রাসূল ﷺ নিম্নোক্ত বাক্য উচ্চারণ করতেন:

بِسْمِ اللهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.

অর্থ: আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে এবং আল্লাহর রাসূলের আদর্শের উপর তাকে দাফন করছি।

– একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, মাইয়্যেতকে কবরে রাখার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে মাটি তুলে কবরে দিয়েছেন। তিনি তিন মুষ্টি মাটি দিয়েছেন। মাথার দিক থেকে মাটি দেয়া আরম্ভ হতো।

– দাফন শেষ হলে তিনি এবং তাঁর সাথীরা কবরের উপর দাঁড়িয়ে মাইয়্যেতের জন্য তাসবীতের প্রার্থনা করতেন।[৩৮] তিনি তাঁর সাথীদেরকে মাইয়্যেতের জন্য তাসবীতে প্রার্থনা করতে বলতেন।

– কবর বাঁধানো, উঁচু করা, এবং কবরের উপর সৌধ বা গম্বুজ নির্মাণ করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীকে পাঠিয়ে এ ধরনের কবর গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন।

– রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরকে সাজদার স্থল বানাতে নিষেধ করেছেন। তিনি কবরকে সামনে রেখে নামাজ পড়তেও নিষেধ করেছেন।

– তিনি কবরে বাতি দিতে নিষেধ করেছেন।

– তিনি কবরকে উরস, আস্তানা, মেলা ও আখড়াস্থল বানাতে নিষেধ করেছেন। এসব কাজ যারা করবে তিনি তাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করেছেন।

---

38 অর্থাৎ, কবরের সওয়াল জওয়াবের কালে যেন অবিচলিত থেকে জওয়াব দিতে পারে, সে জন্য প্রার্থনা করতেন। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

Contents

– তাঁর সুন্নত এটাই ছিল যে, কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যাবে না এবং কবরকে অবমাননাও করা যাবে না।

– তিনি মহিলাদেরকে কবরস্থানে গিয়ে কবর যিয়ারাত করতে নিষেধ করেছেন। এমনটি যারা করবে তাদের তিনি অভিসম্পাত করেছেন।

– রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কবর যিয়ারাত করতেন, তা করতেন তাদের জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে, তাদের প্রতি রহমত প্রার্থনার জন্য তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ করার উদ্দেশ্যে।

কবর যিয়ারাতের কালে তিনি সাহাবীগণকে একথাগুলো বলতে বলেছেন:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ نَسْاَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.

অর্থ: হে মুমিন ও মুসলিম ঘরবাসী, তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমরা আমাদের ও তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

– তাঁর এ রীতি ছিল যে, তিনি মৃতের পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করতেন। তাদের আল্লাহর ফায়সালা মেনে নিয়ে সবর করতে বলতেন।

www.waytojannah.com

Contents

সাদাকাহ্ এবং যাকাত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

যাকাতের সময়, পরিমাণ এবং নিসাব সম্পর্কে তার দিকনির্দেশনা ছিল পূর্ণাঙ্গ। কার উপর যাকাত ওয়াজিব এবং এর খাত সবকিছুতেই ছিল পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। তিনি যাকাতের ক্ষেত্রে যাকাতদাতার কল্যাণের দিকটি বিবেচনা করেছেন। বিবেচনা করেছেন দরিদ্রদের কল্যাণের দিকটিও। যাকাতকে আল্লাহ সম্পদ এবং তার মালিকের জন্য পবিত্রকারী বানিয়েছেন। ধনীদের জন্য সম্পদের যাকাত দেওয়াকে আবশ্যক করেছেন। যাকাত দিলে সম্পদ নামক নি'আমত শেষ হয় না। বরং যাকাত দিলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। যাকাতদাতা সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হতে নিরাপদে থাকে। এ যাকাত প্রদান তার জন্য রক্ষক হয়ে যায়।

চার ধরনের সম্পদের যাকাত দিতে হয় এবং সম্পদগুলোও এমন যার প্রয়োজন মানুষের মাঝে ব্যাপক।

১. ফল-ফলাদি ও শস্য;

২. চতুষ্পদ জন্তু– গরু, উট, ছাগল ইত্যাদি;

৩. সোনা ও চাঁদি;

৪. সর্বপ্রকার ব্যবসার মাল।

এরপর বছরে একবার যাকাত দেয়াকে তিনি ওয়াজিব করেছেন। আর ফল ও শস্যাদির ক্ষেত্রে পাকার পর যাকাত দেয়াকে ওয়াজিব করেছেন। কারণ প্রতিমাসে বা প্রতি জুমু'আয় যাকাত দেয়া মানুষের জন্য কষ্টদায়ক এবং জীবনে একবার আদায় করাকে ওয়াজিব করা গরীবের জন্য কষ্টদায়ক। এরপর তিনি ওয়াজিবের পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। গুপ্তধনের ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব করেছেন এবং এতে বৎসরের কোন শর্ত করেননি। হস্তগত হবার পরে এ পরিমাণ দেয়া ওয়াজিব। আর কষ্টের পরিমাণ বেশি হলে তখন দশ ভাগের এক ভাগ দেয়া ওয়াজিব করেছেন। আর ফল ও শস্যাদির ক্ষেত্রে দশ ভাগের অর্ধেক দেয়াকে ওয়াজিব করেছেন তখন যখন শস্য ও ফল উৎপন্নে কষ্ট করে বালতি ইত্যাদির মাধ্যমে সেঁচ করতে হয়।

এরপর সম্পদ পরিমাণে কম হলেও যেহেতু সর্বপ্রকার সম্পদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয় তাই যেসব সম্পদের মধ্যে সমতা সম্ভব সেগুলোর মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। রূপার জন্য দু'শত দেরহাম, স্বর্ণের জন্য বিশ মিছকাল ও ফল শস্যদানা এবং বীজের ক্ষেত্রে পাঁচ আওসাক। ছাগলের ক্ষেত্রে চল্লিশটি ছাগল, গরুর ক্ষেত্রে ত্রিশটি গরু ও উটের ক্ষেত্রে ৫টি উট। কিন্তু উটের নিসাব যেহেতু উটের মাধ্যমে আদায় করলে সমতা রক্ষা করা অসম্ভব সেহেতু প্রতি ৫টি উটে একটি ছাগল প্রদান করা ওয়াজিব। তবে পাঁচটি যখন ২৫ এ পৌঁছবে তখন যেহেতু একটি উট যাকাত হিসেবে দেয়া সম্ভব তাই এক্ষেত্রে একটি উট দেয়া ওয়াজিব।

আর বয়সের কম বেশির তারতম্যের কারণে কোন বয়সের উট প্রদান করতে হবে তাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন যেমন, ইবনু মাখাজ (দ্বিতীয় বছরে পড়েছে এমন নর উট) বিনতু মাখাজ (দ্বিতীয় বছরে পড়েছে এমন মাদী উট) বিনতে লাবুন (তৃতীয় বছরে পড়েছে এমন মাদী উট) হিক্কা (চতুর্থ বছরে পড়ছে এমন মাদী উট) পঞ্চম বছরে পড়েছে এমন মাদী উট) ইত্যাদি।

আর আল্লাহ তা'আলা নিজেই সদকার খাত বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং সদকাকে আট ভাগে ভাগ করেছেন। দুই প্রকার মানুষের মধ্যে এ আট ভাগ পাওয়া যায়।

www.waytojannah.com

Contents

১. এক প্রকার লোক যে প্রয়োজনের কারণে যাকাত (সদকা) গ্রহণ করে কখনো বেশি প্রয়োজনের কারণে আবার কখনো কম প্রয়োজনের কারণে। এ ধরনের লোক চার প্রকার: ফকীর, মিসকীন, মুসাফির, ক্রীতদাস।

২. যেসব লোকেরা নিজের উপকারের জন্য যাকাত গ্রহণ করে তারা হলো: মুআল্লাফাতুল কুলুব, যাকাত উসূলকারী কর্মচারী দায়গ্রস্ত ব্যক্তি এবং আল্লাহর রাস্তায় সাময়িকভাবে অভাবে পতিত ব্যক্তি।

যাকাতের খাতসমূহ

রাসূল ﷺ-এর অভ্যাস ছিল। তিনি যখন কারো সম্পর্কে জানতে পারতেন যে, লোকটি যাকাত খাওয়ার যোগ্য তবে তিনি তাকে যাকাত দিতেন। কেউ তাঁর নিকট যাকাত চাইলে তিনি পূর্ব থেকে তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হলে তাকে একথা বলার পর যাকাত দিতেন যে, এ যাকাতের ক্ষেত্রে ধনী এবং উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তিদের কোন অংশ নেই। তার নিয়ম ছিল সে শহরের যারা যাকাত খেতে পারবে তাদেরকে যাকাত দেয়া। সেখান থেকে কিছু অবশিষ্ট থাকলে তাঁর নিকট নিয়ে আসা হত এরপর তিনি তা বণ্টন করে দিতেন।

আর এ কারণেই তিনি যাকাত উসূলকারীদেরকে মরুভূমি ও যাযাবরদের নিকট থেকে যাকাত উসূলের জন্য পাঠাতেন। তাদেরকে গ্রাম-গঞ্জে পাঠাতেন না বরং তিনি মুআযকে ইয়ামানবাসীদের যারা ধনী তাদের থেকে যাকাত গ্রহণ করে তাদের দরিদ্রদের প্রতি ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তাকে যাকাত নিয়ে নাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হবার কথা বলেননি।

তিনি যাকাত উসূলকারীদেরকে চতুষ্পদ জন্তু, ফল-ফলাদি এবং শস্য ইত্যাদি প্রকাশ্য সম্পদের ক্ষেত্রে কখনো এগুলোর মালিকের নিকট যাকাত উসূলের জন্য পাঠাতেন না। তিনি অনুমানকারীকে খেজুর ইত্যাদির মালিকের নিকট পাঠাতেন। সে গিয়ে খেজুর বৃক্ষে কী পরিমাণ খেজুর আছে তা পরিমাপ করে এতে কত ওসাক পরিমাণ খেজুর ওয়াজিব হতে পারে তার একটু আনুমানিক ধারণা দিত এবং সে পরিমাণ খেজুর যাকাতস্বরূপ মালিক থেকে গ্রহণ করত। তিনি অনুমানকারীকে মালিকের জন্য এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ খেজুর রেখে দিতে বলতেন তিনি এমনটি করতেন এজন্য যে, যাতে ফল খেয়ে ফেলা এবং কাটার পূর্বেই যাকাতের পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

তিনি একদা আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাকে খায়বার বাসীদের নিকট প্রেরণ করলেন। খায়বারবাসী আব্দুল্লাহকে ঘুষ দিতে চাইল। আব্দুল্লাহ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আমাকে ঘুষ খাওয়াতে চাও? আল্লাহর শপথ আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তির নিকট হতে তোমাদের কাছে এসেছি। আর তোমরা তো হলে বানর ও শুকরের চেয়ে আমার নিকট অনেক ঘৃণিত। তোমাদের প্রতি আমার ঘৃণা এবং তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা আমাকে কখনো তোমাদের উপর অনুগ্রহ করতে এবং ইনসাফ করতে অনুপ্রাণিত করবে না। অতঃপর তারা বলল, এ কারণেই আসমান যমীন প্রতিষ্ঠিত আছে।

গাধা, খচ্চর, দাস, শাক-সবজি এবং যেসব ফল-ফলাদি গুদামজাত করে রাখা যায় না সেগুলো থেকে তিনি কখনো যাকাত গ্রহণ করতেন না। তবে আঙ্গুর এবং খেজুর চাই শুকনো হোক বা ভিজা সর্বাবস্থায় তিনি এর যাকাত গ্রহণ করতেন।

www.waytojannah.com

Contents

নফল দানের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি দাতা। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনকিছু দিলে তাতে কম করতেন না এবং তার বেশি কামনাও করতেন না। কেউ তার নিকট কিছু চাইলে তিনি তাকে তা দিয়ে দিতেন। দান করা ছিল তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। গ্রহিতা দান গ্রহণ করে যতটুকু আনন্দ পেত তিনি দান করে তার চেয়ে বেশি খুশি ও আনন্দ হতেন। তিনি কল্যাণকর বিষয়ে ছিলেন সর্বোত্তম দানবীর।

তাঁর নিকট কোন অভাবী ব্যক্তি আসলে তিনি তাকে নিজের উপর প্রাধান্য দিতেন। কখনো খাবারের মাধ্যমে। আবার কখনোবা পোশাকের মাধ্যমে। তাঁর দানের ধরনও ছিল বিভিন্ন প্রকারের। কখনো হিবার (দানের) মাধ্যমে কখনো সদকার মাধ্যমে কখনো হাদীয়ার মাধ্যমে, আবার কখনোবা কোন জিনিস ক্রয়ের মাধ্যমে। এরপর বিক্রেতা থেকে পণ্য ক্রয় করে বিক্রেতাকেই আবার সে পণ্যের মূল্যসহ পণ্য ফিরিয়ে দিতেন। যেমনটি করেছেন জাবিরের (রা) উটের ব্যাপারে। আবার কখনো তিনি আর্থিক ঋণ নিয়ে আদায়ের সময় বেশি পরিমাণে আদায় করতেন। পণ্য ক্রয় করলে পণ্যের মূল্যের চেয়েও বেশি অর্থ প্রদান করতেন। তিনি হাদিয়া কবুল করতেন এবং এর বিনিময়ে হাদিয়াদাতাকে হাদিয়ার জিনিসের চেয়েও মূল্যবান জিনিস প্রদান করতেন। তাঁর দান এবং অনুগ্রহ কখনো হত তাঁর মালিকানাধীন জিনিস দেয়ার মাধ্যমে কখনো কথা এবং কখনো অবস্থার মাধ্যমে। অতঃপর তিনি তাঁর নিকট যা থাকত তা দিয়ে দিতেন লোকদেরকে দানের আদেশ করতেন এবং অনুপ্রাণিত করতেন। তার অবস্থাও মানুষকে দানে উৎসাহিত করত। কৃপণ কেউ তাকে দেখলে সেও দানে আগ্রহী হত। এমনিভাবে যে তাঁর সঙ্গ দিত, তাঁর চালচলন দেখত সে দান, দয়া এবং অনুগ্রহ করা ছাড়া থাকতেই পারত না।

তাঁর চরিত্রই মানুষকে দান, ইহসান, অনুকম্পা, এবং সৎ কাজে অনুপ্রাণিত করত। তাই তো তার হৃদয় ছিল সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে অধিক উন্মোচিত ও উদ্ভাসিত। ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিল সবচেয়ে পূত-পবিত্র কারণ দান-খায়রাত এবং অনুগ্রহ আর অনুকম্পার, বিস্ময়কর প্রভাব ছিল তাঁর বক্ষ ও হৃদয় উন্মোচনে আর উদ্ভাসে। আর নবুওয়াত এবং রেসালাতের মর্যাদা একে আরো মজবুত করেছে।

রমযান সম্পর্কে তাঁর দিকনির্দেশনা

রোযার উদ্দেশ্য যেহেতু নিজের কুপ্রবৃত্তি দমন ও সংযম এবং স্বাভাবিক অবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে কুপ্রবৃত্তির সংস্কার ও সংশোধন করণ। যাতে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য ও মর্যাদা অর্জনের উপযুক্ত হওয়ায় এবং চিরস্থায়ী জীবন যাতে আনন্দদায়ক হয়। ক্ষুধা এবং পিপাসার উত্তাপ এবং তীব্রতা যাতে কমে যায়। এ অবস্থা যেন গরীব-মিসকিনদের ক্ষুধার্ত ও অনাহারী জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং শক্তি সংরক্ষণ করে। এ রোযা মুত্তাকীদের জন্য লাগাম, যোদ্ধাদের ঢাল এবং নেককারদের জন্য উদ্যানস্বরূপ। সকল আমলের মধ্যে কেবল রোযাই একমাত্র আল্লাহর জন্য। কারণ, রোযাদার তার প্রভুর জন্য আহার পানাহার সবকিছুই বর্জন করে। এ রোযা হলো আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে রহস্যস্বরূপ যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না এবং বান্দা এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ না আর এটাই হলো রোযার বাস্তবতা। বাতেনী শক্তি এবং বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। তাছাড়া এ রোযা দেহ ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সকল উপাদানকে দূর করে দেয়। রোযা তাকওয়ার উপর চলার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক।

আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

www.waytojannah.com

Contents

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

"হে মু'মিনগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।" (সূরা: বাকারা- ১৮৩)

অর্থাৎ রোযার উপকারিতা যেহেতু সুস্থ বিবেক এবং উন্নত প্রকৃতি সম্মত তাই আল্লাহ রোযাকে তাঁর বান্দাদের জন্য রহমতস্বরূপ একে ফরজ করেছেন।

রাসূলল্লাহ ﷺ-এর দিকনির্দেশনা এক্ষেত্রে ছিল সর্বাধিক উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বাধিক উপযোগী। কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকা এবং নফসের চাহিদাকে বিসর্জন দেয়া যেহেতু অত্যন্ত কঠিন তাই ইসলামের মধ্যবর্তী সময় হিযরতের পরে একে ফরজ করা হয়। মানুষের মন ও হৃদয় যখন একত্ববাদ এবং নামায রোযা পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। কুরআনের বিধান পালনে সঠিক আত্মোনিয়োগ করতে শুরু করল। তখন ধীরে ধীরে দ্বিতীয় হিজরীতে রোযা ফরজ করা হয় এবং ৯টি রোযা রেখে রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেন।

প্রথমত রোযা রাখা এবং মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর যে কোন একটিকে বেছে নেয়ার অবকাশ থাকলেও পরবর্তীতে রোযা রাখাকে ফরয করে দেয়া হয় এবং বৃদ্ধ পুরুষ এবং মহিলা যখন রোযা রাখতে অক্ষম হবে তখন তাদের জন্য ফকীর-মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর অনুমতিকে পূর্বাবস্থায় বহাল রাখা হয়। আর মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য রোযা না রাখার এবং পরবর্তীতে কাযা আদায়ের সুযোগ দেয়া হয়। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী যদি নিজের এবং সন্তানের ব্যাপারে রোযা রাখলে ক্ষতি হতে পারে বলে মনে করে তবে সেও রোযা ভাঙ্গতে পারবে। তবে তারা যদি নিজের সন্তানের ব্যাপারে কোন আশঙ্কা না করে তবে তারা রোযার কাযা পালনের সাথে সাথে মিসকীনদেরকে খাবার খাওয়াবে। রোযার তিনটি ধাপ:

১. রোযা রাখা না রাখার অবকাশের সঙ্গে সঙ্গে রোযা রাখার আবশ্যকতা;
২. রোযা রাখা ফরয, তবে রোযাদার খাবার খাওয়ার পূর্বে ঘুমিয়ে গেলে আগামী দিনের রাত পর্যন্ত আহার-পানাহার তার জন্য নিষিদ্ধ। তবে পরে এ বিধান রহিত হয়ে গেছে;
৩. রোযার বর্তমান অবস্থা যা কেয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে।

রমজান মাসে রাসূল ﷺ-এর ইবাদত প্রসঙ্গ

রমজান মাসে রাসূল ﷺ-এর নিয়ম ছিল বিভিন্ন প্রকারের ইবাদত বেশি বেশি করে করা। রমজান মাসে জিবরাঈল (আ) রাসূলকে কুরআন পড়াতেন। ফেরেশতা জিবরাঈল যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করত তখন রাসূল ﷺ ছিলেন প্রেরিত বায়ুর চেয়েও অধিকতর দানশীল। তিনি রমজানে অধিক দান করতেন। এ মাসে বেশি বেশি দান-ছদকা, কুরআন তেলাওয়াত, নামাজ, যিকর এবং ইতিকাফ করতেন। তিনি রমযানে যতটুক ইবাদত করতে উৎসাহিত করতেন অন্য মাসে ততটা করতেন না। এমনকি কখনো কখনো লাগাতার দিবা-রাত্রি ইবাদত করতেন এবং সাহাবাদেরকে লাগাতার ধারাবাহিক ইবাদত করতে নিষেধ করতেন, আর বলতেন, আমার অবস্থা তোমার মত নয়। আমি রাত্রি জাগরণ করি। এবং আমার প্রতিপালক আমাকে খাওয়ান ও পান করান। এ খাবার ও পানাহার সম্পর্কে দুটি উক্তি পাওয়া যায়:

www.waytojannah.com

Contents

আল্লাহ তাঁকে যে মারিফাতের খাবার খাওয়ান এবং তাঁর ক্বলবে আল্লাহর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার স্বাদ, এবং নৈকট্যতার মাধ্যমে চক্ষু শীতলতা ইত্যাদির মতো অন্তরের গেজা প্রদান করেন তা এখানে উদ্দেশ্য। আর এর কারণে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর শারীরিক খাবারের প্রয়োজন হতো না।

কবি বলেন–

لها أحاديث من ذكراك تشغلها ۞ عن الشراب وتلهيها عن الزاد

(রূহ) আত্মা তোমাকে স্মরণ করে কথোপকথন করে। আর এ কথোপকথন আত্মাকে পানাহার থেকে নিরুৎসাহী এবং পাথেয় থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়।

لها بوجهك نور تستضيء به ۞ ومن حديثك في أعقابها حادى

আত্মা তোমার চেহারা দ্বারা আলোকিত। আর তোমার সঙ্গে কথোপকথনের কারণে তার পেছনে উট চালক থাকে।

إذا شكت من كلال السير أوعدها ۞ روح القدوم فتحيا عند ميعاد

সে যখন সফরের ক্লান্তির অভিযোগ করে তখন আগমনের প্রাণশক্তি তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় অবশেষে সময়মতো সে জীবিত হয়ে উঠে।

যার সামান্যতম অভিজ্ঞতা আছে সে জানে যে, ক্বলব ও রূহের খাবারের কারণে শরীর অনেক জৈবিক আহার না খেয়েও থাকতে পারে।

বিশেষ করে যে তার প্রিয়জনকে দেখে চক্ষু শীতল করে সুখী হয়েছে। তার নৈকট্য ধন্য হয়েছে। তার প্রিয়জনের উপহার উপভোগ করেছে। এটাকি এ প্রেমিকের জন্য সর্বোত্তম নয়? তাহলে ঐ মহান প্রিয়জনের কথা আর কী বলব যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। নেই তার চেয়ে সুন্দর আর গুণে পরিপূর্ণ আর কেউ। তাঁর প্রেমিকের হৃদয় জুড়ে প্রেমাস্পদের ভালোবাসা হবে এর চেয়ে বড় অনুগ্রহ আর কী হতে পারে। আর এ কারণে রাসূল বলেছেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট থাকি তিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান। সুতরাং তিনি যদি মুখেই খেতেন এবং পান করতেন তবে তিনি রোযা লাগাতার রাখার কথা তো দূরের কথা রোযাদারই হতেন না। আর এটি যদি রাতেই হতো তবে তিনি লাগাতার রোযাদার হবেন কিভাবে? এবং সাহাবারা যখন তাকে বলল, যে আপনি লাগাতার রোযা রাখেন তখন তিনি তাদেরকে না আমি লাগাতার রোযা রাখি না বলতেন। আমি তোমাদের মতো নয় এমনটি বলতেন না। বরং সাহাবারা তাঁর প্রতি লাগাতার রোযা রাখার যে বিষয়টি সম্বন্ধ করেছেন তিনি তা মেনে নিয়ে তাদেরকে তাঁর মত করতে নিষেধ করেছেন।

ইবনু ওমার থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ রমজান মাসে লাগাতার রোযা রাখলেন। (তার দেখাদেখি) অন্যান্যরাও লাগাতার (না খেয়ে) রোযা রাখতে লাগলেন, রাসূল ﷺ তাদেরকে নিষেধ করলেন, তারা বললেন, আপনি যে না খেয়ে লাগাতার রোযা রাখছেন? রাসূল ﷺ বললেন, "আমি তোমাদের মতো নই, আমাকে খাওয়ানো হয় এবং পান করানো হয়।" ইমাম বুখারী এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া সহীহাইনে আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ (না খেয়ে) লাগাতার রোযা রাখতে নিষেধ করলেন। মুসলমানদের একজন বলল, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি যে লাগাতার রোযা রাখেন?"

www.waytojannah.com

Contents

অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন– "আমি তোমাদের মতো নই, আমি রাত্রিযাপন করি, আমাকে আমার প্রভু খাওয়ায় এবং পান করায়।"

তা ছাড়া রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে লাগাতার রোযা রাখতে নিষেধ করলে তারা তা অস্বীকার করে। তিনি তাদের সঙ্গে একদিন রাতে না খেয়ে রোযা রাখলেন এরপরই তারা নতুন মাসের চাঁদ দেখতে পায়। তখন রাসূল ﷺ বললেন, নতুন মাসের চাঁদ উদিত হতে বিলম্ব হলে আমি তোমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দিতাম।

রাসূল উম্মাতের উপর দয়াস্বরূপ লাগাতার রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন এবং শুধু ভোর পর্যন্ত রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন। সহীহ বুখারীতে আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তোমরা বিরামহীন রোযা রেখো না, তোমাদের কেউ বিরামহীন রোযা রাখতে চাইলে সে যেন ভোর পর্যন্ত রোযা রাখে।

বিরামহীন রোযা রাখা জায়েয, মাকরূহ না হারাম এ নিয়ে তিন ধরনের উক্তি পাওয়া যায়।

১. রাখতে সক্ষম হলে রাখা জায়েয। এটি আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর এবং অন্যান্য সালাফে সালেহীনদের থেকে বর্ণিত। ইবনুয যুবাইর বিরামহীন রোযা রাখতেন। এদের দলিল হলো, রাসূল নিষেধ করার পরও সাহাবাদের সঙ্গে নিজে এ রোযা পালন করেছেন। যেমনটি সহীহাইনে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটি যদি হারাম হতো তবে সাহাবাগণ তা থেকে বিরত থাকাকে অস্বীকার করতেন না। এর থেকে বুঝা গেল তিনি উম্মাতের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের কারণে এমনটি করেছেন। আয়িশা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ উম্মাতের উপর অনুগ্রহের কারণে উম্মতকে বিরামহীন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

২. একদলের মতে বিরামহীন রোযা না জায়েয। এ মতটি গ্রহণ করেছেন ইমাম মালেক, আবু হানীফা, শাফেয়ী এবং ছাওরী (রহ)। ইবনু আব্দুল বার বলেন, তাদের কেউ এটিকে জায়েজ বলেন না। আমি বলব, ইমাম শাফেয়ী এটিকে মাকরূহ বলেছেন। তার শীষ্যরা এটি মাকরূহের কোন প্রকার তা নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। যারা মাকরূহে তাহরীমী বলেছেন, তারা হুজুরের নিষেধাজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করে এমনটি বলেছেন। আর আয়িশার উক্তি رحمة لهم তাহরীমীর প্রতিবন্ধক নয় বরং এটি বিষয়টিকে আরো তাকীদ করে। কেননা তাঁর হারাম করাটাও এ উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ। বরং এ হুকুম সকল নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তাদেরকে নিষেধ করার পর তাদের সাথে আমল করাটা বৈধ হবার প্রমাণ নয়। আর এটা সম্ভবই বা কিভাবে কারণ তিনি তো তাদেরকে এ থেকে নিষেধ করেছেন। বরং তিনি তাদের সঙ্গে এমনটি করেছেন একটি কল্যাণকে সামনে রেখে আর তা হলো তাদেরকে তিরস্কার করা। যাতে তারা বিরামহীন রোযা রাখাকে বর্জন করে।

তারা আরো বলেন, এ কল্যাণের স্বার্থে তাদের বিরামহীন রোযার কোন প্রতিবাদ না করা আন্তরিকতার লক্ষ্যে জনৈক বেদুঈনকে মসজিদে পেশাব করতে দেখেও কিছু না বলার চেয়ে বড় নয়। এমনিভাবে শিক্ষার স্বার্থে জনৈক ব্যক্তিকে নামাযে ভুল করতে দেখেও কিছু না বলার চেয়ে বড় নয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ করব তখন তা যথাসম্ভব তোমরা মেনে চলবে। আর যখন তোমাদেরকে কোন জিনিস থেকে নিষেধ করব তখন তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে।

www.waytojannah.com

Contents

তারা বলেন, উল্লিখিত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, লাগাতার রোযা রাখা ছিল রাসূল ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য। তাই তো তিনি ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের মতো নই। আর এটি যদি তাদের জন্য মুবাহ হতো তবে হুজুরের বৈশিষ্ট্য থাকবে কোথায়? সহীহাইনে ওমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, এখান থেকে যখন রাত শুরু হবে এবং এখান থেকে যখন রাত শেষ হবে এবং সূর্য অস্ত যাবে তখন রোযাদার রোযা ভাঙ্গবে।

তারা আরো বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মত প্রকৃতির উপর অবিচল থাকবে অথবা তারা যতদিন ইফতারে তাড়াহুড়া করবে ততদিন তারা কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

সুনানের কিতাবসমূহে এ ধরনের রেওয়ায়েত এসেছে।

তৃতীয় আরেকটি উক্তি যা সর্বাধিক সঠিক। আর তা হলো, বিরামহীন রোযা এক ভোর থেকে অপর দিনের ভোর পর্যন্ত রাখা জায়েয। এটি ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের মত। তাদের দলিল হলো, আবু সাঈদ খুদরীর (রা) হাদীস, "তোমাদের কেউ যেন বিরামহীন রোযা না রাখে আর কেউ বিরামহীন রোযা রাখতে চাইলে সে যেন ভোর পর্যন্ত রাখে।" (বুখারী)

রোযা ভাঙ্গার কারণসমূহ

রাসূল ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত। খাবার, পানাহার, শিঙ্গা লাগানো এবং বমি ইত্যাদির কারণে রোযাদারের রোযা ভেঙ্গে যায়। আর কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী সহবাস ও খাবার এবং পানাহারের মতো রোযা ভঙ্গকারী। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। তবে সুরমা সম্পর্কে তাঁর থেকে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। তাঁর থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত যে তিনি রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করতেন। ইমাম আহমাদ উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল ﷺ রোযা অবস্থায় তাঁর মাথায় পানি ঢালতেন, কুলি করতেন এবং নাকে পানি দিতেন। তবে রোযাদারকে নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে বলতেন। রোযাবস্থায় শিঙ্গা লাগাবার বিষয়টি তাঁর থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি। ইমাম বুখারী তার "সহীহ" এ ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন যে, রমযানে শিঙ্গা লাগানোর ব্যাপারে মিকসাম থেকে হাকাম কোন হাদীস শোনেনি।

মুহান্না বলেন, আমি আহমাদ (রহ)-কে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত হাবীব ইবনুশ শাহীদের হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, হাদীসটি হলো, রাসূল ﷺ রোযার মাসে মুহরিম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। উত্তরে আহমাদ বললেন, হাদীসটি সহীহ নয়। হাদীসটিকে ইয়াহইয়া আল-আনসারী অস্বীকার করেছেন। আরছাম বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহকে হাদীসটিকে দুর্বল বলতে শুনেছি, মুহান্না বলেন, হাদীসে 'কাবীছার' ভুল করেছেন। আমি ইয়াহইয়াকে কাবীছা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, লোকটি সত্যবাদী। তবে সে সুফীয়ান আন সাঈদ ইবনু সুবাইর থেকে যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন সেটা তার নিজের ভুল ছিল। আহমাদ বলেন, হাদীসটি আল-আশজা'য়ী এর কিতাবে সাঈদ থেকে মুরসাল সূত্রে রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, নাবী ﷺ মুহরিম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। এবং সেখানে রোযার কথা নেই।

মুহান্না বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে ইবনু আব্বাসের হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হাদীসে صائم শব্দ নেই সেখানে শব্দ হলো محرم যা সুফীয়ান তার সূত্রে ইবনু আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসটি আব্দুর রাযযাক মা'মার এর সূত্রে ইবনু আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। তা ছাড়া

www.waytojannah.com

Contents

রাওহ যাকারিয়্যাহর সূত্রে ইবনু আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। ইবনু আব্বাসের এ সকল শিষ্যদের কেউই صائم-এর কথা উল্লেখ করেননি।

হাম্বল বলেন, আমাদের নিকট আবু আব্দুল্লাহ ওয়াকী থেকে এবং তিনি ইয়াসীন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, "শিঙ্গা যে লাগায় এবং যাকে লাগায় উভয়ই ইফতার করল।" এ রেওয়ায়েতটি বলার পর রাসূল ﷺ রমযানে শিঙ্গা লাগিয়েছেন। আবু আব্দুল্লাহ বলেন, সনদের জনৈক ব্যক্তি সম্ভবত আবান ইবনু আবী আইয়্যাশ। আর তার মাধ্যমে দলিল দেয়া যায় না।

আরসাম বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহকে বললাম যে, মুহাম্মাদ ইবনু মুআবিয়া আন্ নাইসাবুরী আবী আওয়ানা থেকে আর তিনি সুদ্দী থেকে আর সুদ্দী আনাস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী ﷺ রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। আমার কথা শুনার পর আবু আব্দুল্লাহ বিষয়টি অস্বীকার করলেন এবং বললেন, সুদ্দী ইবনু আব্বাস থেকে এটি কিভাবে বর্ণনা করলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ ঠিকই তো।

আহমাদ বললেন, افطر الحاجم والمحجوم বিষয়ে একাধিক হাদীস রয়েছে। দিনের শুরু ও শেষে তিনি রোযাদারকে মিসওয়াক করতে নিষেধ করেছেন এমন বর্ণনা তাঁর থেকে ছাবিত নেই। বরং এর বিপরীতটি তাঁর থেকে ছাবিত। রাসূল থেকে মুজালিদ এর সূত্রে ইবনু মাজাহ "রোযাদারের সর্বোত্তম অভ্যাস হলো মিসওয়াক করা" হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন অথচ এটি দূর্বল।

শনি এবং রবিবারের রোযা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি শনি ও রবিবার বেশি বেশি রোযা রাখতেন। তিনি এমনটি করতেন ইহুদী ও নাসারাদের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে।

"মুসনাদ" এবং সুনানে নাসাঈতে ইবনু আব্বাসের ক্রীতদাস কুরাইব বলেন, ইবনু আব্বাস এবং একদল সাহাবা আমাকে উম্মু সালামার নিকট এ কথা জিজ্ঞেস করতে পাঠাল যে, রাসূল কোন কোন দিন বেশি বেশি রোযা রাখতেন? উত্তরে উম্মু সালামা বলেন, শনি ও রবিবার এবং রাসূল বলতেন, এ দিন দু'টি মুশরিকদের ঈদের দিন। সুতরাং আমি রোযা রেখে তাদের বিরোধিতা করতে চাই। এ হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে ভাবার বিষয় আছে। কারণ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু ওমার ইবনু আলী ইবনু আবী তালিবের সূত্রে বর্ণিত। আর তার অনেক হাদীসের মধ্যে নাকাতার রয়েছে। তবে হাদীসটি আমার মতে হাসান।

ইমাম আহমাদ এবং আবু দাউদ হাদীসটি আব্দুল্লাহ আস-সুলামী থেকে এবং তিনি তার বোন ছাম্মা থেকে এবং তিনি রাসূল থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা ফরজ রোযা ব্যতীত শনিবারের দিন অন্য কোন নফল রোযা রেখ না। যদি তোমাদের কেউ আঙ্গুর লতার ছাল অথবা গাছের কাঠ ছাড়া অন্য কিছু না পায়, তা হলে সে যেন তা চিবিয়ে (ঐ তারিখে) রোযা ভঙ্গ করে।

হাদীস দুটির ব্যাপারে ইখতেলাফ রয়েছে। মালিক (রহ) বলেন, হাদীস মিথ্যা। আব্দুল্লাহ আস সুলামীর হাদীসটি মিথ্যা। আবু দাউদ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আবু দাউদ বলেন, হাদীসটি মানসুখ হয়ে গেছে। নাসায়ী বলেন, হাদীসটি মুযতারিব। একদল আহলে ইলমের মতে, এ হাদীস এবং উম্মু সালামার হাদীসের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কারণ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র শনিবারে রোযা রাখার কারণে। এবং ইমাম আবু দাউদ এ শিরোনামে একটি অধ্যায়ে এনেছেন।

www.waytojannah.com

সারা বছর রোযা রাখা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা

সারা বছর রোযা রাখা রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা নয়। বরং তিনি বলতেন, যে সারা বছর রোযা রাখল সে না রোযা রাখল আর না ইফতার করল। কথাটি নিষিদ্ধ দিনে রোযা রাখা সম্পর্কে বলেন নি। বরং ঐ ব্যক্তির কথার উত্তরে বলেছেন যে, সারা বছর রোযা রাখা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। কথাটি যে হারাম রোযা রেখেছে তার ক্ষেত্রেও বলা যাবে না। কারণ এর অর্থ হলো যে, এমনটি করবে সে সাওয়াবও পাবে না এবং তাকে শাস্তিও দেয়া হবে না অথচ হারামে লিপ্ত ব্যক্তির বিষয়টি এমন হতে পারে না।

হুজুরের নিয়ম ছিল একদিন রোযা রাখা এবং একদিন রোযা ভাঙ্গা এবং এভাবে রোযা রাখা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়। এবং সারা বছর রোযা রাখা মাকরূহ। কারণ সারা বছর রোযা রাখা যদি হারাম না হয় তবে হয়তো একদিন রোযা রাখা এবং অপরদিন রোযা ভাঙ্গার চেয়ে উত্তম হবে। কিন্তু এমনটি হওয়া অসম্ভব হাদীসে একে নিষেধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, "আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় রোযা হলো দাউদের রোযা।" অথবা এর বরাবর হবে। কিন্তু এটা হওয়াও অসম্ভব। অথচ একদিন রোযা রাখা এবং অপরদিন ভাঙ্গা মুবাহ হবে এবং সারা বছর রোযা রাখা আর একদিন রোযা রেখে অপর দিন রোযা ভাঙ্গা উভয়টাই করা না করা বরাবর হবে। কিন্তু এটা হওয়াও অসম্ভব।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, রাসূল ﷺ বলেছেন যে, রমযানের রোযা রেখেছে এবং পরে শাওয়ালের ছয়দিন রোযা রেখেছে এটা তার পূর্ণ বছরের রোযার সমান হবে।" এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, সারা বছর রোযা রাখা অনেক মর্যাদাপূর্ণ বিষয় এবং কাম্য এবং এর সওয়াব অনেক। আর এ কারণেই তো হাদীসে সারা বছর যে রোযা রেখেছে তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

উত্তরে শুধু এ তুলনা করা সারা বছর রোযা রাখা মুস্তাহাব বুঝানোর কথা তো অনেক দূরের কথা বৈধতারও কোন দাবি রাখে না। বরং হাদীসে শুধু সারা বছর রোযা রাখাকে মুস্তাহাব মেনে নিয়ে তুলনা করা হয়েছে।

স্বয়ং হাদীসের দলিল কেননা প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য। কারণ এক একটি নেক কাজের সাওয়াবকে দশ গুণ করা হয়। সুতরাং এর দাবি হলো সে ৩৬০ দিনের যে রোযা রেখেছে সে তার সওয়াব প্রাপ্ত হবে। কিন্তু এটি হারাম।

এমনিভাবে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, রমযান মাসসহ শাওয়ালের ৬ দিন রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমান।

www.waytojannah.com

Contents

হজ্জ ও ওমরাহ পর্ব

হজ্জ ও ওমরাহ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

হিযরতের পর রাসূল ﷺ মোট চারবার ওমরা করেছেন। সবগুলোই করেছেন যিলকদ মাসে। প্রথমটি হলো, হুদাইবিয়ার ওমরা। এটি হয়েছে ষষ্ঠ হিজরীতে। মুশরিকরা বাইতুল্লায় গমনে বাধা দিলে তিনি এবং তার সাহাবীরা মাথা মুণ্ডান এবং নহর করেন এবং ইহরাম ভেঙ্গে হালাল হয়ে যান এবং মদীনায় ফিরে আসেন।

দ্বিতীয়টি, পরবর্তী বছরে সংঘটিত হয়ে এটা উমরাতুল কাযিয়্যাহ বলা হয়। এ সময় রাসূল মক্কায় তিন দিন অবস্থান করেন এবং উমরার যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে ফিরে আসেন। হুজুরের এ ওমরা গত বছরের ওমরার কাযা ছিল কি না এ নিয়ে ইখতেলাফ আছে।

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মাযহাব হলো, এটি গত বছরের উমরার কাযা ছিল।

২. ইমাম মালেকের মতে, এটি কাযা ওমরা নয় বরং এটি হলো স্বতন্ত্র ওমরা। যারা বলেন, এটি কাযা ওমরা তারা এর পক্ষে দলিল হিসেবে বলেন, "এ ওমরাকে ওমরাতুল কাযা" নাম রাখাই এ কথার প্রমাণ যে এটি কাযা ওমরা।

   অন্যান্যদের মতে, আল কাযা শব্দটি القاضاة এর থেকে নির্গত। কারণ মক্কাবাসীদেরকে তিনি এ বিষয়ে বিচারের সম্মুখীন করেছেন। কাযা কাযায়ান থেকে নয় যার অর্থ হলো বিচার করা এবং এ কারণেই এ ওমরাকে ওমরাতুল কাযা নামে নামকরণ করা হয়। যাদেরকে বাইতুল্লায় গমনে বাধা দেয়া হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার চারশ জন। তাদের সকলে হুজুরের সঙ্গে ওমরাতুল কাযায় ছিলেন না। যদি এটি কাযা হতো তবে তাদের কেউ বাদ থাকত না এবং এ মতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

৩. তিনি হজ্জের সঙ্গে যে ওমরা করেছেন সেটি ছিল হজ্জে কেরান। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দালিলিক আলোচনা আমরা সামনে করব।

৪. জিইর্‌রানাহ নামক স্থান থেকে ওমরার ইহরাম করা। তিনি যখন হুনাইনে গমন করেন এবং এরপর সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন জিইর্‌রানা নামক স্থানে সন্ধ্যায় গমনের উদ্দেশে ওমরার ইহরাম করেন।

সহীহাইনে আনাস থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ চার বার ওমরা করেছেন। সবগুলোই ছিল যিলকাদ মাসে। তবে তিনি হজ্জের সঙ্গে যে ওমরা করেছিলেন তা ছিল অন্য মাসে। হুদাইবিয়ার ওমরা, পরবর্তী বছরের যিলকদ মাসের ওমরা এবং জিইর্‌রানার ওমরা। হজ্জের সঙ্গে ওমরার কথা বারা ইবনু আযিব থেকেও সহীহাইনে বর্ণিত হয়েছে। আব্বাস (রা) এর উক্ত হাদীস এবং আয়িশা ও ইবনু আব্বাসের উক্তি যে, রাসূল সকল ওমরা যিলকাদ মাসেই আদায় করেছে এতে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ হুজুরের একসঙ্গে হজ্জ ও ওমরা তথা ওমরাতুল কিরানের সূচনা হয়েছে যিলকাদ মাসে এবং শেষ হয়েছে হজ্জের সঙ্গে জিলহাজ মাসে।

www.waytojannah.com

Contents

তিনি তার পুরো জীবনে কখনো মক্কার বাইরে ওমরা করেননি, যেমনটি বর্তমানে অনেকেই করে থাকে। তিনি ওহী আগমনের পর ১৩ বছর মক্কায় অবস্থান করেছেন। এত দীর্ঘ সময়ে কখনো তিনি মক্কার বাইরে ওমরা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অতএব, তিনি যে ওমরা করেছিলেন তা ছিল মক্কার ভেতরে। তার যুগে কেউ কখনো এমন করেননি যে, মক্কার বাইরে এসে ওমরার ইহরাম করেছেন। তার সফর সঙ্গীদের মধ্যে শুধু আয়িশা (রা) এমনটি করেছিলেন। তাও করেছিলেন হায়েজের কারণে। তিনি ওমরার কাজ শুরু করেছিলেন পরে হায়েজ আসার কারণে কেরানের নিয়ত করেন।

হিযরতের পরে প্রথমবার ব্যতীত নবী ﷺ মোট পাঁচবার সেখানে প্রবেশ করেছেন। কারণ প্রথমটিতে তিনি শুধু হুদাইবিয়া নামক স্থান পর্যন্ত পৌছেছিলেন। এবং তাকে সেখানে মক্কায় প্রবেশে বাধা দেয়া হয় এবং চারবার মীকাত থেকে এহরাম বেঁধেছেন। হুদাইবিয়ার বছর যিলহুলাইফাহ নামক স্থান থেকে ইহরাম বাঁধেন। এরপর দ্বিতীয়বার মক্কায় প্রবেশ করে তিনদিন অবস্থান করেন এবং গত বছরের ওমরার কাযা আদায় করেন। এরপর ইহরাম ছাড়া মক্কা বিজয়ের বছর রমযান মাসে তৃতীয়বার মক্কায় প্রবেশ করেন এরপর সেখান থেকে হুনাইন নামক স্থানে এসে পরে জিইররানা নামক স্থান থেকে ওমরার নিয়ত করে রাতে মক্কায় পৌছেন এবং রাতে মক্কা থেকে বেরিয়ে আসেন এবং মক্কা থেকে ওমরার উদ্দেশে জিইররানা নামক স্থানে ফিরে আসেননি। মক্কার অনেক লোকেই যেমনটি বর্তমানে করে থাকে। রাতে ওমরা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জিইররানা নামক স্থানে ফিরে আসেন এবং এখানে এসে রাত্রিযাপন করেন। সকাল হয়ে সূর্য যখন ঢলে পড়ল তখন 'সারিফ' নামক উপগোত্র থেকে রওনা করেন এ কারণে এ ওমরাটি অনেকের নিকটই অজানা। অর্থাৎ তার সকল ওমরাই ছিল হজ্জের মাসে মুশরিকদের বিরোধিতা করণার্থে। কারণ তারা হাজ্জের মাসগুলোতে ওমরা করাকে অপছন্দ করত এবং তারা বলত, এটি সর্বনিকৃষ্ট অন্যায় এবং এটাই দলিল হাজ্জের মাসগুলোতে ওমরা পালন করা রজব মাসে পালন করার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবার।

রমজান মাসের ওমরার সঙ্গে হাজ্জের মাসগুলোর ওমরার তুলনা করা ঠিক নয়। কেননা সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মু মা'কিল হুজুরের সঙ্গে হাজ্জ করতে না পারায় রাসূল ﷺ তাকে রমজানে ওমরা করার নির্দেশ দেন। এবং বলেন, রমযান মাসের রোযা হাজ্জের সমান।

কেনই-বা নয়। কারণ রমযান মাসের ওমরাতে সর্বোত্তম সময় এবং সর্বোত্তম স্থানের মিলন ঘটেছে।

অনেকে বলে যে, রাসূল ﷺ রমযান মাসে অন্যান্য ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন। যে ইবাদতগুলো ওমরার চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান।

আর এ কারণে তিনি হাজ্জের মাসে ওমরা পালন করেছেন। তিনি যদি রমযানে ওমরা করতেন তবে তার উম্মাতরাও রমযানে ওমরা পালন করত আর এতে তাদেরকে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হত। তাই তিনি এমনটি না করে হাজ্জের মাসগুলোতে ওমরা আদায় করেন। তিনি অনেক আ'মালকে তার নিকট প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তার উম্মতের কষ্ট হবে ভেবে বর্জন করেছেন।

www.waytojannah.com

Contents

তাঁর থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত নয় যে, তিনি বছরে একবার ওমরা করেছেন এবং দু'বার করেননি। অনেকে মনে করেন তিনি বছরে দুইবার ওমরা করতেন। এবং এক্ষেত্রে আবু দাউদ এর হাদীস যা আয়িশা থেকে বর্ণিত এর দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। আয়িশা থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ দুটি ওমরা করেছেন যিলক্বদে একটি শাওয়ালে একটি। এ হাদীসটিতে তাদের ওহাম হয়েছে। এবং এমনটি হতেও পারে না কারণ হুজুরের থেকে চারটি ওমরার কথা প্রমাণিত। তিনি এক বছরে কখনো দুটি ওমরা করেন নি। হুজুরের জীবনী এবং সীরাত এর সঙ্গে যার সামান্যতম সম্পর্ক আছে সে কখনো এ বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহ করতে পারে না।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, যদি রাসূল থেকে বছরে একবারের চেয়ে বেশি ওমরার বিষয়টি প্রমাণিত নয় তা হলে তারা এটিকে মুস্তাহাব বলে কোন হিসেবে?

উত্তর: এ বিষয়ে মতবিরোধ আছে। মালেক (রহ) এর নিকট বছরে একের অধিক ওমরা করা মাকরূহ। তবে তার বিরোধিতা করে মুতাররিফ এবং ইবনুল মাউয়ায বলেন, বছরে একের অধিক ওমরা করাতে কোন সমস্যা নেই। আয়িশা (রা) এক মাসে দু'বার ওমরা করেছেন। জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে বেশি বেশি সাওয়াবের কাজ করাতে কোন ক্ষতি নেই। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহ) বছরের পাঁচ দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন: আরাফার দিন, কোরবানীর দিন এবং তাকবীরে তাশরীকের তিনদিন। আর আবু ইউসুফ বছরের দিনগুলোর মধ্যে শুধু কুরবানী ও তাকবীরে তাশরীকের দিনগুলোতে ওমরা করাকে নিষেধ করেছে। শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীরা ঐ ব্যক্তিকে ওমরা করতে নিষেধ করেছে যে তাকবীরে তাশরীকের দিনে কঙ্কর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে মীনায় রাত্রিযাপন করেছে। আয়িশা (রা) বছরে দুবার ওমরা করতেন। আনাস (রা) মাথায় গরম বা ব্যাথা অনুভব করলেই মক্কায় গিয়ে ওমরা করতেন। আলী থেকে বর্ণিত তিনি বছরে একাধিকবার ওমরা করতেন। তা ছাড়া রাসূল ﷺ বলেছেন, এক ওমরা অপর ওমরা পর্যন্ত সময়ের জন্য কাফফারাস্বরূপ।

রাসূল ﷺ থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, এক ওমরা অপর পর্যন্ত সময়ের জন্য কাফফারাস্বরূপ এবং মকবুল হাজ্জের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন কিছুই নয়। এ হাদীসে পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে হজ্জ ও ওমরা যে এক সমান নয় তা সুস্পষ্ট বুঝে আসছে। ইমাম শাফেয়ী আলী (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তুমি প্রতি মাসে একবার ওমরা করো। তকী তার সনদে আবু জাফর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আলী (রা) বলেছেন, তুমি সক্ষম হলে প্রতিমাসে একাধিকবার হজ্জ করো। সাঈদ ইবনু মানছুর তার সানাদে আনাসের কতিপয় সন্তান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আনাস মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে মাথায় ব্যাথা হলে তানঈমে চলে যেতেন এবং ওমরা পালন করতেন।

উপর্যুক্ত উক্তিসমূহের আপত্তি উত্থাপন এবং তাদের ভুল ধ্যান-ধারণার উৎস বর্ণনা প্রসঙ্গ

যারা বলেন, রাসূল ﷺ রজব মাসে ওমরা করেছেন এবং ইবনু ওমার এর হাদীস যে, রাসূল ﷺ রজব মাসে ওমরা করেছেন (মুত্তাফাকুন আলাইহি) এটি সঠিক নয়। আয়িশা ও অন্যান্যরা একে ভুল বলেছেন। সহীহাইনে মুজাহিদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ও ওরওয়া ইবনুয যুবাইর মসজিদে গেলাম। তখন ইবনু ওমারকে আয়িশার হুজরার পাশে বসা অবস্থায় পেলাম। তখন একদল লোক চাশতের নামায

www.waytojannah.com

পড়ছিল। তিনি বলেন, আমরা ইবনু ওমারকে তাদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটা বিদআত। এরপর আমরা তাকে বললাম রাসূল ﷺ কতবার ওমরা করেছেন? তিনি বললেন, ৪ বার, একবার রজবে। আমরা তার কথার প্রতিবাদ করাকে অপছন্দ মনে করলাম। তিনি বলেন, আমরা হুজরার ভেতরে আয়িশার মিসওয়াকের আওয়াজ শুনতে পেলাম। অতঃপর ওরওয়া বললেন, হে আমার মা, অথবা হে উম্মুল মু'মিনীন, আপনি কি আবু আব্দুর রহমানের কথা শুনতে পাচ্ছেন না? আয়িশা বললেন, সে কী বলে, ওরওয়া বলেন, সে বলে যে, রাসূল ﷺ চারবার ওমরা করেছেন এর মধ্যে একবার রজব মাসে। আয়িশা (রা) বলেন, আল্লাহ আবু আব্দুর রহমানের প্রতি রহম করুন। সে হুজুরের সঙ্গে সকল ওমরাতেই শরীক ছিল এবং রাসূল ﷺ রজবে কখনো ওমরা করেননি। আর এমনটি বলেছেন, আনাস (রা)। ইবনু আব্বাস বলেন, হুজুরের সবকটি ওমরা ছিল যিলক্বাদ মাসে এবং এটাই সঠিক।

আর যারা বলেন যে, তিনি শাওয়ালে ওমরা করেছেন তারা বলেন, ইমাম মালিক তার 'মুয়াত্তা'-তে হিশাম ইবনু ওরওয়া থেকে আর তিনি তার পিতা বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ শুধু তিনবার ওমরা করেছেন: একবার শাওয়ালে, আর বাকি দু'বার যিলক্বাদ মাসে। কিন্তু হাদীসটি মুরসাল এবং এ বর্ণনাটি ভুল। তাছাড়া হাদীসটি আয়িশা থেকে আবু দাউদ মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। এটিও ভুল এবং মারফূ সূত্রে বর্ণনা করা সহীহ না। ইবনু আব্দুল বার বলেন, রেওয়াতটি মুসনাদ নয়।

আমি বলব, এর বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য আয়িশা (রা) থেকে একটি রেওয়াত পাওয়ায়। আয়িশা, ইবনু আব্বাস এবং আনাস ইবনু মালেক বলেন, রাসূল ﷺ কেবল যিলক্বাদ মাসেই ওমরা করেছেন। কোরানের ওমরা হয়েছে যিলক্বাদ মাসে এবং জিইররানার ওমরাও হয়েছে যিলক্বাদের শুরুর দিকে। এবং এটাই সঠিক।

আইয়ামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিনে তাঁর ভাষণ

তিনি মিনাতে দু'টি খুতবা প্রদান করেন। একটি কুরবানীর দিন, দ্বিতীয়টি আইয়ামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিন। বলা হয় এ দ্বিতীয় দিনটিই হলো আইয়ামে তাশরীকের মধ্যম দিন। যারা একথা বলেন, তারা দলিল হিসেবে সাররা বিনতে নুবহানা এর হাদীস পেশ করেন। তার হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলতেন–

أتدرون أى يوم هذا؟ قالت: وهو اليوم الذى تدعون يوم الرؤوس. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا أوسط أيام التشريق. هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: هذا المشعر الحرام. ثم قال: إنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا، ألا وإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، فى شهركم هذا، فى بلدكم، وأموالكم هذا، حتى تلقوا ربكم، فيسألكم عن أعمالكم، ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم، ألا هل بلغت.

"তোমরা কি জানো এটি কোন দিন?"

সাররা বিনতু নুবহান বলেন, এ দিনটি যে দিন যাকে তোমরা ইয়াওমুর রুউস বল। সাহাবারা বললেন, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলই ভালো জানেন। রাসূল ﷺ বললেন, এ দিনটি হলো আইয়ামে

www.waytojannah.com

Contents

তাশরীকের মাঝখানের দিন। তোমরা কি জানো এটি কোন শহর? সাহাবারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূল ﷺ বললেন, এ শহরটি হলো পবিত্র মক্কা নগরী। এরপর বললেন, আমি জানি না সম্ভবত এ বছরের পর তোমাদের সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হবে না। সাবধান ভালো করে শোন! নিশ্চয় তোমাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান তোমাদের জন্য পবিত্র যেমন, তোমাদের এই মাসে এ শহরে এই দিন পবিত্র। শীঘ্র তোমরা আল্লাহর নিকট পৌছবে। আর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কার্যালাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। খবরদার! তোমরা যারা আমার এ কথা শুনেছ যারা শুনেনি তাদের নিকট তা পৌঁছে দিবে।" অতঃপর আমরা যখন মদীনায় ফিরে এলাম তখন এর কিছুদিন পরই রাসূল ﷺ ইন্তিকাল করেন। আবু দাউদ।

আর ইয়াওমুর রউস সর্বসম্মতিক্রমে কোরবানীর দ্বিতীয় দিনকে বলে।

বাইহাকী উল্লেখ করেছেন, ইবনু ওমার বলেছেন, সূরা নাছর আইয়ামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিন মিনায় উপর অবতীর্ণ হয় এবং এর থেকেই লোকেরা বুঝে নেয় যে তিনি আর বেশি দিন থাকবেন না।

আকীকা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা

মুআত্তায় এসেছে যে রাসূল ﷺ-কে আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, لا أحب العقوق "আমি উকুককে (নাফরমানীকে) পছন্দ করি না" মনে হলো তিনি এ নামকে অপছন্দ করেন। রিওয়ায়াতটি তিনি যায়িদ ইবনু আসলাম থেকে এবং তিনি বাণী যামরা এর এক ব্যক্তি থেকে এবং তিনি তার পিতা থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। ইবনু আব্দুল বার বলেন, সবচেয়ে ভালো সনদ হলো সেটি যা আব্দুর রাজ্জাক উল্লেখ করেছেন। তিনি আমর ইবনু শোআইব থেকে এবং তিনি তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন রাসূল ﷺ-কে আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন: আল্লাহ তাআলা উকুক নাফরমানীকে পছন্দ করেন না। যেন আকীকা শব্দটি ব্যবহার করাকে তিনি পছন্দ করেননি। অতঃপর তিনি বললেন–

من أحب منكم أن ينسك عن ولده، فليفعل: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.

"যার কোন সন্তান জন্মায়, আর সে তার পক্ষ থেকে কোন পশু যবেহ করতে চায়, তবে সে যেন অবশ্যই ছেলের পক্ষ হতে দুটি এবং মেয়ের পক্ষ হতে একটি বকরী যবেহ করে।"

সহীহাইনে আয়িশা থেকে বর্ণিত হয়েছে–

عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.

"ছেলের পক্ষ থেকে দুটি বকরী এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরী দিতে হয়।"

তিনি ﷺ বলেছেন–

كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى.

"শিশু আকীকার সঙ্গে আবদ্ধ থাকে। জন্মের সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করবে এবং তার নাম রাখবে এবং তার মাথা মুড়াবে।"

ইমাম আহমদ বলেন, অর্থাৎ শিশুর আকীকা করা হলে সে তার পিতামাতার জন্য সুপারিশ করবে অন্যথায় করবে না। আর বাহন শব্দের অর্থ আটকে রাখা। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

www.waytojannah.com

Contents

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ.

তবে এ কারণে তাকে পরকালে শাস্তি দেয়া হবে না। অনেক সময় পিতামাতার বাড়াবাড়ির কারণে সন্তান মারা যায়। যেমনিভাবে সহবাসকালে সন্তানের নাম রাখলে শয়তান সন্তানের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না। এর থেকে বুঝা যায় নাম রাখার গুরুত্ব অনেক।

প্রশ্ন: হাম্মাম (রহ) কাতাদা থেকে ويدمى শব্দ রিওয়ায়াত করেছেন। আর হাম্মাম কাতাদাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে কাতাদা বলেন, আকীকার পশু যবেহ করার পর তার শরীরের কিছু পশম পশুর গলার রগের সামনে রেখে রক্তে রঞ্জিত করে শিশুর মাথার উপরিভাগে রেখে দিবে যাতে রক্ত তার মাথার উপর সুতার ন্যায় প্রবাহিত হয়। এরপর তার মাথা ধুয়ে মাথার সমস্ত চুল ধুয়ে ফেলতে হবে। এ রেওয়াতটি নিয়ে এখতেলাফ আছে।

এরপর তাসমীয়া (যবেহকৃত পশুর রক্ত শিশুর মাথায় রাখা) সহীহ কি না এ নিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ধরনের উক্তি উল্লেখ করেছেন। আবু দাউদ তার সুনানে বলেন, এটি হাম্মামের ওহাম এর অন্তর্ভুক্ত এবং ইউদাম্মা শব্দটি মূলত ছিল ইউসাম্মা। অন্যান্যদের মতে, হাম্মামের মুখে কিছুটা তোতলামি ছিল। শব্দটি আসলে ছিল ইউসাম্মা। তাদের এ উক্তিটি সহীহ না। কেননা হাম্মামের শব্দে ওহাম হলেও এবং মুখে কিছুটা তোতলামি থাকলেও বিষয়টি তো কাতাদা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইউদাম্মার ধরনও উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝা যায় হাম্মামের মুখে তোতলামি ছিল না। তাসমিয়ার বর্ণনাটি কাতাদা এবং হাসান থেকে বর্ণিত এবং তাদের নিকট এমনটি করা সুন্নত। তবে মালেক, ইসহাক, শাফেয়ী এবং আহমাদ (রহ) এর নিকট (ইউদাম্মা) শব্দটি ভুল। মূল ছিল (ইউসাম্মা) এবং এমনটি ছিল জাহিলিয়াত যুগের আমল। ইসলাম এসবকে রহিত করেছে তাদের দলিল, আবু দাউদের বুরাইদ ইবনুল হুছাইব এর হাদীস। বুরাইদ বলেন, আমরা জাহিলিয়াতের যুগে আমাদের কারো সন্তান হলে বকরী যবেহ করে সে পশুর রক্ত শিশুর মাথায় মালিশ করতাম। অতঃপর আল্লাহ ইসলাম প্রদানের পর আমরা বকরী যবেহ করতাম এবং শিশুর মাথা মুণ্ডাতাম এবং তার মাথাকে জাফরান দ্বারা মালিশ করতাম। হাদীসটির সনদে হুসাইন ইবনুল ওয়াকিদ থাকার কারণে গ্রহণযোগ্য না হলেও হুজুরের উক্তি, "তোমরা শিশু থেকে কষ্ট দূর করো" কে এর সঙ্গে যোগ করলে এর দ্বারা দলিল পেশ করা সম্ভব।

প্রশ্ন: রাসূল ﷺ হাসান ও হুসাইনের পক্ষ হতে এক একটি দুম্বা আকীকা করেছেন। এর থেকে বুঝা যায় একজন শিশু ছেলের আকীকায় একটি দুম্বা আকীকা দেয়া উচিত। তাছাড়া আব্দুল হক ইশ্বীলী ইবনু আব্বাস এবং আনাস (রা) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ হাসানের পক্ষ থেকে একটি দুম্বা এবং হুসাইনের পক্ষ থেকে একটি দুম্বা আকীকা দিয়েছেন। হাসান জন্মগ্রহণ করেছে ওহুদের বছর আর এর পরের বছর হুসাইন জন্মগ্রহণ করেছে। তিরমিযী (রহ) আলী (রা) থেকে একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল ﷺ হাসান এর পক্ষ থেকে একটি বকরী আকীকা দেন এবং বলেন, হে ফাতেমা, তার মাথা মুণ্ডিয়ে দাও এবং তার মাথার চুলের সমপরিমাণ রূপা সদকা করে দাও। আমরা তা ওজন করলাম। তখন তার ওজন এক দেরহাম বা তার চেয়ে কিছু কম হলো। এ প্রশ্নের উত্তর হলো, ছেলের পক্ষ থেকে দুটি এবং মেয়ের পক্ষ হতে একটি বকরী আকীকা করার হাদীসসমূহ একাধিক কারণে শ্রেষ্ঠ।

www.waytojannah.com

Contents

১. এর বাবীর সংখ্যা পরিমাণে বেশি হওয়ার কারণে। কেননা এর বাবী হলেন, আয়িশা (রা), ইবনু ওমার, উম্মু কুরয আল কা'বিইয়া এবং আসমা। সুতরাং আবু দাউদ উম্মু কুরয থেকে বর্ণনা করেন, যে উম্মু কুরয বলেছেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ছেলের পক্ষ থেকে পূর্ণ দুটি ছাগল এবং মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আকীকা করতে তিনি বলতেন। আয়িশা থেকে বর্ণিত রাসূল তাদেরকে পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে পূর্ণ দুটি এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী আকীকার নির্দেশ দিতেন।

২. একটি ছাগল আকীকা করা ছিল তার ফেয়েল বা কর্ম আর যে হাদীসে দুটির কথা এসেছে সেটি ছিল তার বক্তব্য আর এটি ব্যাপক। এবং ফেয়েলটি তাঁর সাথে খাস হবার সম্ভাবনা আছে।

৩. হাদীসটি অতিরিক্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সুতরাং এটা গ্রহণ করাই হবে উত্তম।

৪. ফেয়েল বৈধতার দাবিদার। আর কাওল মুস্তাহাব হওয়ার, আর উভয়টার উপর আমল করা সম্ভব তখন যখন দুটি ছাগলের বর্ণনা যে হাদীসে এসেছে তা গ্রহণ করা হবে।

৫. হাসান ও হুসাইনের পক্ষ থেকে যবেহ করার ঘটনা ঘটেছে উহুদ এবং এর পরের বছর। উম্মু কুরয আমি রাসূল থেকে শুনেছি বলে যে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন তা ছিল ষষ্ঠ হিজরীর পরে হুদাইবিয়ার বছরের ঘটনা।

৬. সম্ভবত হাসান ও হুসাইনের ঘটনাটি ছিল যবেহকৃত পশুর প্রজাতি বর্ণনার্থে।

৭. আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে মহিলাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। ইরশাদ হয়েছে পুত্রসন্তান কন্যা সন্তানের মতো নয়।" সুতরাং এর মর্যাদার দাবি হলো আহকামের ক্ষেত্রেও পুত্রসন্তান কন্যা সন্তানের চেয়ে অধিক প্রাধান্য পাবে। আর এ কারণেই শরীয়ত মীরাছ এবং মুক্তিপণের ক্ষেত্রে দু'জন নারীকে একজন পুরুষের সমতুল্য ঘোষণা করেছেন।

৮. আকীকা এক হিসেবে সন্তানের পক্ষ থেকে আকদ করার মতো তাই উত্তম হলো পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দুটি ছাগল যবেহ করা এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ হতে একটি। আর এ কারণে একজন পুরুষকে আযাদ করা দু'জন নারীকে আযাদ করার সমান।

তিরমিযীতে আবু উমামা থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন–

أيما امرىء مسلم أعتق امرءا مسلما، كان فكاكه من النار، يجزى كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزى كل عضو منهما عضوا منه، وأيما امراة مسلمة أعتقت امراة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزى كل عضو منها عضوا منها.

"যে মুসলিম ব্যক্তি কোন মুসলিম পুরুষকে আযাদ করবে তার এ আযাদ জাহান্নাম থেকে তার জন্য মুক্তিপণ হয়ে যাবে এবং আযাদকৃত ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তাকে প্রতিদান দেয়া হবে। আর যে মুসলিম ব্যক্তি কোন দু'জন মুসলিম নারীকে আযাদ করবে তার দু'জন নারীকে আযাদ করা জাহান্নাম থেকে তার জন্য মুক্তিপণ হয়ে যাবে এবং তাদের উভয়ের প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে তাকে প্রতিদান দেয়া হবে এবং যে মুসলিম নারী কোন মুসলিম নারীকে আযাদ করবে তার এ আযাদ করা তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের কারণ হয়ে যাবে এবং তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তাকে প্রতিদান দেয়া হবে।" হাদীসটি সহীহ।

www.waytojannah.com

Contents

ইমাম আবু দাউদ তার "মারাসীল" এ জা'ফর ইবনু মুহাম্মদ থেকে এবং তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ফাতেমা (রা) হাসান ও হুসাইনের তরফ থেকে যে আকীকা করেছিলেন তার একটি পা ধাত্রির ঘরে পাঠাবার নির্দেশ রাসূল ﷺ দেন এবং বলেন, তোমরা এর গোশত নিজে খাও এবং অন্যকে খাওয়াও এবং তার কোন হাড্ডি ভেঙ্গো না।

ইবনু আয়মান উল্লেখ করেছেন যে নবুওয়তের পর রাসূল ﷺ নিজে নিজের আকীকা করেন। ইমাম আহমাদ বলেন হাদীসটি মুনকার এবং একে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুহাররার যঈফ বলেছেন।

আবু দাউদ (রহ) আবূ রাফি থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন, হুসাইন ইবনু আলীকে ফাতিমা যখন প্রসব করেন তখন রাসূলকে আমি তার কানে নামাযের আযান দিতে দেখেছি।

সন্তানের নাম রাখা এবং খৎনা করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

পূর্ব আলোচনা করা হয়েছে যে কাতাদা (রহ) হাসান (রহ)-কে এবং তিনি সামুরা থেকে আকীকা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে "সপ্তম দিনে পশু যবেহ করা হবে এবং সন্তানের নাম রাখা হবে।" মাইমুনী বলেন, শিশুর নাম কখন রাখা হবে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করলে আবূ আব্দুল্লাহ আমাদেরকে বললেন, আনাস থেকে তৃতীয় দিনে নাম রাখার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর সামুরা বলেছেন, সপ্তম দিনে শিশুর নাম রাখতে। মাইমুনী বলেন, আমি ইমাম আহমাদ থেকে শুনেছি যে হাসান বসীর সপ্তম দিনে শিশুকে খৎনা করাকে অপছন্দ করতেন। আর হাম্বল বলেন, আবূ আব্দুল্লাহ বলেছেন যে সপ্তম দিনে খৎনা করাতে কোন ক্ষতি নেই। হাসান (রহ) নিষেধ করেছেন যাতে ইহুদীদের সঙ্গে সাদৃশ্য না হয় এবং এতে কোন ক্ষতি নেই। মাকহুল বলেন, ইবরাহীম তাঁর পুত্র ইসহাককে সপ্তম দিনে খৎনা করেছেন। আর ইসমাঈলকে ১৩ বছর বয়সে।

ইবনু তাইমিয়া বলেন, এরপর থেকে ইসহাকের পুত্রদের মধ্যে ইসহাকের খৎনা এবং ইসমাইলের পুত্রদের মধ্যে ইসমাঈলের খৎনার সুন্নত প্রচলিত হয়।

নাম ও উপনাম সম্পর্কে তাঁর দিকনির্দেশনা

বিশুদ্ধ সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সবচেয়ে খারাপ নাম ঐ ব্যক্তির নাম যে রাজা-বাদশাহর নামে নিজের নাম রাখে। আর আল্লাহ ব্যতীত কোন রাজা-বাদশাহ নেই।

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন যে, "আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় নাম হচ্ছে, 'আব্দুল্লাহ' ও 'আব্দুর রহমান' এবং সবচেয়ে সত্য নাম হলো 'হারিছ' ও 'হাম্মাম' এবং সবচেয়ে খারাপ নাম হলো 'হরব' এবং 'মুররা'।"

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন যে, তুমি তোমার ক্রীতদাসের নাম– ইয়াসার, রাবাহ, নাজীহ এবং আফলাহ রেখো না। কারণ তুমি বলবে, সে কি সেখানে আছে? অতঃপর সে সেখানে হবেনা এবং তোমাকে বলা হবে, যে না, সে সেখানে নেই।

www.waytojannah.com

Contents

তিনি আছিয়ার নাম পরিবর্তন করে তার নাম রেখেছেন "জামীলা" জুওইরিয়ার নাম ছিল বাররা পরবর্তী কলে রাসূলল্লাহ ﷺ তার নাম পরিবর্তন করে জুওইরিয়া রাখেন। যয়নাব বিনতু উম্মু সালামা বলেন, রাসূল ﷺ এ নামে নাম রাখতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, তোমরা নিজেরা নিজেদের পবিত্রতা ঘোষণা করো না তোমাদের কে নেককার ও পবিত্র সে সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। আসরাম এর নাম যুর'আ রেখেছেন। আবিল হাকামের নাম আবূ শুরাইহ রেখেছেন।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের দাদার নাম ছিল হুযন, রাসূল তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন সাহ্ল। সে এ নাম গ্রহণে অস্বীকার করলে রাসূল ﷺ বললেন, তাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করা হবে।

আবূ দাউদ বলেন, রাসূল ﷺ আছ, আযীয, আতলাহ, শাইতান, হাকাম, শুরার, হুবাব এবং শিহাব ইত্যাদি নামসমূহ পরিবর্তন করে ভিন্ন নাম রেখেছেন।

শিহাবের নাম হিশাম হারব এর নাম সিলম এবং মুদতাজি এর নাম মুনবাইছ রেখেছেন। আফরাহ ভূমির নাম খাদিরাহ এবং শি'বুদ দালালাহর নাম শি'বুল হুদা রেখেছেন। তাছাড়া বনীয যীনিয়্যাহ এর নাম বনীর রিশদাহ এবং বনী মুগবিয়ার নাম বনী রিশদাহ রেখেছেন।

যুগকে গালি দেয়া নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে

দ্বিতীয় প্রকার, হলো নিন্দনীয় কোন বাক্য এমন জিনিসের ক্ষেত্রে বলা যে তার যোগ্য নয়। যেমন, যুগ বা কালকে গালি দেয়া। রাসূল ﷺ যুগকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন–

يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر، وأنا الدهر، بيدى الأمر أقلب الليل والنهار.

'আল্লাহ তাআলাই হলেন যুগ' অন্য হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "বনী আদম আমাকে কষ্ট দেয় এবং সে যুগকে গালি দেয়। অথচ আমিই হলাম যুগ, সবকিছু আমার হাতে। আমি দিবারাত্রিকে পরিবর্তন করি।"

لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر.

অপর আরেক হাদীসে এসেছে, "তোমাদের কেউ যেন হে 'যুগের পরাজয়' না বলে।"

এতে বড় বড় তিনটি ক্ষতি আছে–

১. যে গালির যোগ্য নয় তাকে গালি দেয়া হয়। কারণ যুগ তো আল্লাহর হুকুমে নিয়োজিত একটি সৃষ্টি। সুতরাং গালিদাতা নিজেই এ গালির সর্বাধিক উপযুক্ত।

২. এ ধরনের গালিতে শিরক থাকে। কারণ গালিদাতা যুগকে উপকার ও অপকার করার ক্ষমতা আছে মনে করে গালি দিয়েছে। তা ছাড়া গালিদাতা এক হিসেবে জালেমও বটে কেননা সে যে ক্ষতি করতে পারে না তার ক্ষতি করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করছে এবং উপকারের ক্ষেত্রেও তার এ একাই বিশ্বাস।

৩. তাদের এ গালি মূলত যে এ কাজটি করেছে তার উপর পতিত হয়েছে। আর কাজটিও এমন যে সত্য যদি এক্ষেত্রে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তবে আসমান জমিনে বিপর্যয় নেমে আসবে। আর যখন তাদের মন ও চাহিদা অনুযায়ী কাজটি হয় তখন তারা যুগের প্রশংসা করে। প্রকৃতপক্ষে যুগের প্রতিপালক হলেন মহান রাব্বুল আলামীন। তিনি মানুষকে দেন এবং তিনিই আটকে রাখেন। তিনি কাউকে সম্মানিত আবার কাউকে অসম্মানিত করেন। যুগের কোন ক্ষমতা নেই। সুতরাং যুগকে গালি দেয়া মানি আল্লাহকে গালি দেয়া এবং আল্লাহকে কষ্ট দেয়া।

www.waytojannah.com

Contents

সহীহাইনে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বলেন, বনী আদম আমাকে কষ্ট দেয় সে যুগকে গালি দেয়। অথচ আমি হলাম যুগ।" সুতরাং যুগকে গালি দেয়া দুটির একটি হতে খালি নয়। হয়তো সে আল্লাহকে গালি দিল। অথবা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করল। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে যে, তোমাদের কেউ যেন একথা না বলে যে, শয়তান হোঁচট খেয়েছে, কেননা সে এতে অহংকার করে ঘরের মতো হয়ে যাবে, এবং বলবে, আমার শক্তি বলেই তাকে ধরাশায়ী করেছি। বরং সে যেন বলে, আল্লাহর নামে (আমি তাকে ধরাশায়ী করেছি) কেননা এতে সে অবনত হবে এমনকি মাছির মতো হয়ে যাবে।"

অন্য হাদীসে এসেছে যে, "বান্দা যখন শয়তানকে অভিশাপ দেয় তখন শয়তান তাকে বলে, আরে তুমি তো একজন অভিশপ্তকে অভিশাপ দিচ্ছ।"

এমনিভাবে কেউ যখন বলে যে, "আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে অপমানিত করেছেন।" তখন শয়তান এতে খুশি হয় এবং বলে, বনী আদম বুঝতে পেরেছে যে, এটি আমি আমার শক্তির বলে অর্জন করেছি। একথা মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে শয়তানকে সাহায্য করে। এ কারণে রাসূল ﷺ বলেছেন যে, যাকে শয়তানের কোনা কিছু স্পর্শ করেছে সে যেন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং শয়তান থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। কেননা তাঁর জন্য এটাই উপকারী এবং শয়তানের জন্য পীড়াদায়ক।

নতুন চাঁদ দেখার দু'আ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

রাসূল ﷺ নতুন চাঁদ দেখে বলতেন–

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللّٰهُ

অর্থ: "হে আল্লাহ, এই নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে উদিত করুন। আল্লাহ আমার এবং তোমার প্রভু।" হাদীসটি হাসান।

বর্ণিত আছে, তিনি ﷺ নতুন চাঁদ দেখে বলতেন–

اللّٰهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ

অর্থ: "আল্লাহ সবচেয়ে বড়। হে আল্লাহ, এই নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে উদিত করুন। আর যাকে আমাদের প্রভু ভালোবাসেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন সেটাই আমাদের তাওফীক দিন। আল্লাহ আমাদের এবং তোমার প্রভু। (দারেমী)

ইমাম আবূ দাউদ কাতাদা থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তার নিকট পৌঁছেছে যে, রাসূল ﷺ নতুন চাঁদ দেখলে বলতেন–

هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذى خلقك ثلاث مرات ثم يقول: الحمد لله الذى ذهب بشهر كذا، وجاء بشهر كذا.

"কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ, কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ। তোমাকে যে, সৃষ্টি করেছে আমি তার উপর ঈমান এনেছি।" (তিনবার) এরপর বলতেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি অমুক মাসকে নিয়ে গেছেন এবং অমুক মাসকে নিয়ে এসেছেন।"

হাদীসটির সনদে কিছুটা দুর্বলতা আছে এবং সুনানে আবূ দাউদের কতিপয় নুসখায় ইমাম আবূ দাউদ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, এ ব্যাপারে নাবী ﷺ থেকে কেন সহীহ মুসনাদ হাদীস নেই।

www.waytojannah.com

Contents

আহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

রাসূল ﷺ তাঁর পরিবারের কাছে গেলে কখনো তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, "তোমাদের কাছে খাবার আছে কি?" তিনি কখনো খাবারের দোষ-ত্রুটি ধরেননি। বরং মনে চাইলে খেতেন আর না হয় খেতেন না। এবং চুপ থাকতেন। আবার কখনো বলতেন, "আমার খেতে ইচ্ছে করছে না" তিনি কখনো কখনো খাবারের প্রশংসা করতেন। যেমন, একদা তার পরিবারকে তরকারি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, সিরকা ছাড়া আমাদের নিকট আর কিছু নেই। অতঃপর তিনি তা আনতে বললেন এবং খেলেন এবং বললেন সিরকা কতই না ভালো খাবার। তিনি রোযা অবস্থায় তাঁর সম্মুখে খাবার দেয়া হলে তিনি বলতেন, "আমি রোযাদার।"

রোযাদারের নিকট কেউ কোন খাবার দিলে তিনি রোযাদারকে যে খাবার দিয়েছে তার জন্য দু'আ করতে বলতেন। আর রোযাদার না হলে যে খাবার দিয়েছে তার সঙ্গে খেতে বলতেন। তাঁকে কেউ দাওয়াত দিলে তাঁর সঙ্গে কেউ আসলে তিনি দাওয়াতকারীকে বলতেন, আমার সঙ্গে একজন লোক এসেছে আপনি চাইলে তাকে অনুমতি দিতে পারেন আর চাইলে ফিরিয়েও দিতে পারেন।

তিনি খাবারের মাঝে কথা বলতেন যেমন সিরকার হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনি তার পালক পুত্র ওমার ইবনু আবী সালামাকে যখন সে তাঁর সঙ্গে খানা খাচ্ছিল বলেছিলেন, "বিসমিল্লাহ পড় এবং তোমার সামনে থেকে খাও।"

তিনি কারো বাসায় দাওয়াত খেলে তাদের জন্য দু'আ করার আগ পর্যন্ত সেখান থেকে ফিরতেন না। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর এর জন্য দু'আ করেছেন এবং বলেছেন, হে আল্লাহ, আপনি তাদের যে রিযিক দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন। তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের প্রতি দয়া করুন। (মুসলিম)

সা'দ ইবনু ওবাদার গৃহে তার জন্য দু'আ করে বলেছেন, তোমাদের গৃহে রোযাদাররা ইফতার করেছে, তোমাদের খাবার নেককার খেয়েছে এবং ফেরেশতারা তোমাদের জন্য দু'আ করেছে।

আবূ দাউদ সহীহ সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, আবুল হাইছাম ইবনুত তাইহান যখন রাসূল ﷺ এবং তার সাহাবাদেরকে দাওয়াত করল। তারা তার দাওয়াত খান। খাবার শেষ হলে রাসূল তার সাহাবাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য সাওয়াব পৌঁছাও। সাহাবারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল, তার সাওয়াব কী? রাসূল ﷺ বললেন, কোন ব্যক্তির ঘরে যখন প্রবেশ করা হয় খাবার খাওয়া হয় পানি পান করা হয় তবে তোমরা তার জন্য দু'আ কর আর এটিই হলো তার জন্য সাওয়াব পৌঁছানো।

সহীহ সূত্রে বর্ণিত যে, একদা এক রাত্রিতে রাসূল ﷺ তার গৃহে প্রবেশ করলেন, অতঃপর খাবার তালাশ করলেন, কিন্তু কোন খাবার পেলেন না। তখন বললেন, হে আল্লাহ আমাকে যে আহার করিয়েছে আপনি তাকে আহার করান এবং আমাকে যে পান করিয়েছে আপনি তাকে পান করান। বর্ণিত আছে যে, আমর ইবনুল হামিক রাসূলকে ﷺ দুধ পান করান। অতঃপর রাসূল তার জন্য দু'আ করেন, "হে আল্লাহ, আপনি তাকে তার যৌবনের দ্বারা উপকৃত করুন।" এরপর আশি বছর পর্যন্ত তার একটি চুলও পাকেনি।

যে গরীবদেরকে দাওয়াত দিত তিনি তার জন্য দু'আ করতেন এবং তার প্রশংসা করতেন। একবার বললেন, "জেনে রাখো! এমন ব্যক্তিকে যে খাবার খাওয়াবে আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।" জনৈক আনসারী সাহাবী এবং তার স্ত্রী যারা উভয়ে নিজেদের এবং সন্তানদের খাবারের উপর তাদের

www.waytojannah.com

Contents

মেহমানদেরকে প্রাধান্য দিয়েছিল তাদের সম্পর্কে রাসূল বলেছেন, রাত্রিতে তোমাদের মেহমানদের সাথে তোমরা যে ব্যবহার করেছ আল্লাহ তাতে বিস্মিত হয়েছেন। তিনি ছোট বড় স্বাধীন, ক্রীতদাস, বেদুইন এবং মুহাজির কারো সঙ্গে আহার করতে দ্বিধা করতেন না। সুনানের কিতাবগুলোতে এসেছে যে তিনি একদা এক কুষ্ঠ রোগীকে নিজে যে পাত্রে খাচ্ছিলেন তাতে বসিয়ে বললেন, আল্লাহর নামে খাও। আল্লাহর উপর ভরসা ও আস্থার সঙ্গে খাও।

তিনি ডান হাতে খাওয়ার নির্দেশ দিতেন এবং বাম হাতে খেতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন শয়তান বাম হাতে খায় এবং বাম হাতে পান করে।

সহীহ সূত্রে বর্ণিত তাঁর সঙ্গে একদা একজন খানা খেল। সে খানা বাম হাত দিয়ে খেল। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি তোমার ডান হাত দিয়ে খাও, সে বলল, আমি ডান হাত দিয়ে খেতে পারি না। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি পারবে না। এরপর হতে সে আর কখনো হাত দিয়ে খেতে পারেনি।

একদল লোক তাঁর নিকট পরিতৃপ্ত না হওয়ার অভিযোগ করলে তিনি তাদেরকে একসঙ্গে খাবার খেতে বললেন। আর বললেন বিসমিল্লাহ পড়ে খাবার খেতে। কারণ এতে বরকত হয়।

সহীহ সূত্রে তাঁর থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বান্দার উপর সন্তুষ্ট যে এক একটি লোকমা খাবার খায় আর এ কারণে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং এক চুমুক পানি পান করে আর এ কারণে আল্লাহর প্রশংসা করে।

রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের খাবারকে আল্লাহর যিকির এবং নামাযের মাধ্যমে বিগলিত করো। আহারের পরেই ঘুমিয়ে যেয়ো না কারণ এর কারণে তোমাদের অন্তরসমূহ কঠোর হয়ে যাবে। বাস্তবতাও হাদীসটি সহীহ হবার সাক্ষ্য দেয়।

সালাম দেয়া, অনুমতি প্রার্থনা করা এবং হাঁচিদাতার হাঁচির উত্তর দেয়া সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

সহীহাইনে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন যে, সর্বোত্তম ইসলাম হলো অন্যকে খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া।

সহীহাইনে আরো এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করার পর তাকে বললেন, যাও ফেরেশতাদের ঐ দলের নিকট যাও, এবং তাদেরকে সালাম ক'রো এবং খুব লক্ষ্য করে শোন যে তারা তোমাকে উত্তরে কি অভিবাদন করে। কারণ সেটি তোমার এবং তোমার সন্তানের জন্য শুভেচ্ছাস্বরূপ। আদম তাদেরকে সালাম করলেন, আসসালামু আলাইকুম। ফেরেশতারা উত্তরে বললেন, আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ফেরেশতারা ওয়া রাহমাতুল্লাহ শব্দটি বৃদ্ধি করলেন।

সহীহাইনে আরো এসেছে যে, রাসূল ﷺ বেশি সালাম দেবার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, তোমরা একে অপরকে বেশি বেশি সালাম দাও এতে পরস্পরে ভালোবাসা জন্মাবে এবং তারা ঈমান আনা ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবে না। এবং পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা ব্যতীত মুমিনও হতে পারবে না।

www.waytojannah.com

Contents

ইমাম বুখারী (রহ) তাঁর সহীহতে বলেন, আম্মার বলেছেন, তিনটি জিনিস যার মধ্যে আছে সে প্রকৃত মু'মিন: নিজের ব্যাপারে ইনসাফ করা, মানুষকে সালাম দেয়া এবং কৃপণতা পরিহার করে বেশি বেশি খরচ করা। হাদীসের এ বাক্যটিতে মৌলিক ও শাখাগত সকল কল্যাণকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কেননা ইনসাফের দাবি হলো আল্লাহর হককে পূর্ণরূপে আদায় করা। এমনিভাবে বান্দার হককেও যথাযথভাবে আদায় করা। নিজের অধিকারের বহির্ভূত কোন কিছুর দাবি তাদের থেকে করবে না। তাদের সাথে ঠিক সেই ব্যবহার করবে যে ব্যবহার নিজে তাদের থেকে প্রত্যাশী। তাদের ব্যাপারে সে ফায়সালাই করবে যে ফায়সালা নিজের জন্য পছন্দ করে। তাদের ব্যাপারে সর্বদা ইনসাফ করবে। তাদের কাছে যে জিনিসের পাওনা নেই তার দাবি কখনো করবে না। এ ইনসাফের ব্যাপারে সে নিজেও শামিল। সুতরাং নিজের নফসকে কখনো আল্লাহর নিষিদ্ধ পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে হীন না করা। বরং নিজের নফসকে সর্বদা একত্ববাদ ও আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে সতেজ রাখবে। আল্লাহর মুহাব্বাত, ভালোবাসা, ভয়ভীতি তার প্রতি তাওয়াক্কুল এবং তাঁর একত্ববাদকে সকল সৃষ্টির ভালোবাসা এবং মুহাব্বতের উপর প্রাধান্য দিবে।

বান্দার স্বতন্ত্র কোন অবস্থান নেই সে তো তার মনিবের আওতাধীন সে কর্ম করবে তার মনিবের জন্য।

অর্থাৎ নিজের প্রতি ইনসাফ ও সদ্ব্যবহার তাকে আল্লাহর পরিচয় লাভ এবং তাঁর অধিকার সম্পর্কে অবগত হওয়ার আবশ্যক করে। নিজের প্রতি ইনসাফের দাবি হলো মনিবের জন্য মালিকানা ও সর্বোপরি যোগ্যতার দাবি করা। নিজের ইচ্ছাকে শ্রেষ্ঠ মনে না করা এমনটি মনে করলে সেটা হবে অসম বন্টন ও অন্যায় এবং ঠিক তাদের বন্টনের মতো যারা বলেছে–

هَـٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَـٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

"এটা আল্লাহর এবং এটা আমাদের অংশীদারদের। অতঃপর যে অংশ তাদের অংশীদারদের, তা তো আল্লাহর দিকে পৌছে না এবং যা আল্লাহর তা তাদের উপাস্যদের দিকে পৌছে যায়। তাদের বিচার কতইনা মন্দ।" (আল-আনআম ১৩৬)

বান্দা তার অজ্ঞতার কারণে কখনো নিজের ও তার আল্লাহর মাঝে সুষম বন্টন করতে পারে না বরং সে নিজের অজান্তে সংশয়ে পতিত হয়। কারণ মানুষকে অত্যাচারী এবং মূর্খ বানিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং যার অভ্যাস অত্যাচার করা আর যে মূর্খ তার থেকে কি করে ইনসাফের আশা করা যায় এবং যে আল্লাহর প্রতি ইনসাফ করে না সে সৃষ্টির প্রতি কিভাবে ইনসাফ করবে?

হাদীসে কুদসীতে এসেছে আল্লাহ বলেন–

ابن آدم ما أنصفتني، خيري إليك نازل، وشرك إلى صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم، وأنا غني عنك، وكم تبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح.

"হে আদম সন্তান, তুমি আমার উপর ইনসাফ করনি। তোমার নিকট আমার কল্যাণ অবতীর্ণ হয়। আর তোমার অমঙ্গল আমার নিকট উঠে আসে। আমি কত নেয়ামত দ্বারা তোমাকে ভালোবাসা দেখিয়েছি। অথচ আমি তোমার থেকে অমুখাপেক্ষী।"

আর কত গুনাহের মাধ্যমে তুমি আমাকে অবজ্ঞা করেছ। অথচ তুমি আমার নিকট মুখাপেক্ষী। আর সম্মানিত ফেরেশতা সর্বদা তোমার অপকর্ম আর বদ আমল নিয়ে তোমার থেকে আমার নিকট উঠে আসে।

www.waytojannah.com

Contents

অন্য আছারে এসেছে যে, হে আদম সন্তান, তুমি আমার প্রতি ইনসাফ করনি। আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি অথচ তুমি অন্যের উপাসনা কর। আমি তোমাকে রিযিক দেই আর তুমি অন্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর অর্থাৎ আম্মারের কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি কথা। মানুষকে বেশি বেশি সালাম দেয়া বিনয়ের পরিচয়। আর যে বেশি বেশি সালাম দেয় সে কখনো অহঙ্কার করে না বরং ছোট বড় ভদ্র অভদ্র সকলকেই সালাম দেয়, সালাম দেয় পরিচিত অপরিচিত সকলকে। আর যে অহঙ্কারী হয় তার অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। কারণ যে তাকে সালাম দেয় সে অহঙ্কারের কারণে তাকেও সালাম দেয় না। অন্যকে সে সালাম কিভাবে দিবে।

আর খরচ করা তখনই সম্ভব যখন আল্লাহর উপর পূর্ণ অবস্থা থাকবে এবং এ বিশ্বাস থাকবে যে তিনি তার জন্য এর চেয়ে ভালো জিনিসের ব্যবস্থা করে দিবেন।

বিবাহের দু'আ সম্পর্কে তাঁর দিকনির্দেশনা

রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে প্রয়োজনের খুতবা শিখিয়েছেন–

الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله، فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقرأ الآيات الثلاث.

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, আপনার সাহায্য চাই। আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমাদের নফসের সকল অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি। আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমাদের সকল অপকর্ম থেকে আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়াত দিতে পারে না এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ ﷺ তার বান্দা ও রাসূল।"

এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিনটি পাঠ করতেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ.

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাকো এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (আলে-ইমরান– ১০২)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً.

"হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয় স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।" (আন-নিসা: ১)

www.waytojannah.com

Contents

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً.

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" (আল-আহযাব: ৭০-৭১)

শু'বা বলেন, আমি আবূ ইসহাককে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কি শুধু বিবাহের খুতবায় পড়তে হয় নাকি অন্য জায়গায়ও পড়া যাবে? আবূ ইসহাক বললেন: সকল প্রয়োজনে খুৎবাটি পড়া যাবে।

রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন নারী খাদিম বা পশুর মালিক হবে সে তখন যেন তাঁর কেশগুচ্ছ ধরে আল্লাহর কাছে বরকতের দু'আ করে এবং বিসমিল্লাহ পড়ে এবং বলে–

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

"হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট এর মঙ্গল এবং একে যে নেক চরিত্রের সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে সে মঙ্গল চাই। আর আমি তোমার কাছে এর মন্দ ও একে যে মন্দ চরিত্রের সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ চাই।" তিনি বিবাহিতদের বলতেন–

بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

"আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন এবং তোমার উপর বরকত নাযিল করুন। আর তিনি তোমাদেরকে কল্যাণের সঙ্গে একত্রিত রাখুন।"

এবং তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ তার স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা করলে সে যেন বলে,

بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

"আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ, তুমি আমাদের নিকট থেকে শাইতানকে দূরে রাখো এবং যে সন্তান তুমি আমাদেরকে প্রদান করবে তার থেকেও শাইতানকে দূরে রাখো।"

কেউ তার পরিবার ও সম্পদে আশ্চর্যকর কিছু দেখলে কী বলবে

আনাস থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার পরিবার, ধনসম্পদ বা সন্তানের উপর যদি নেয়ামত দান করেন অতঃপর সে বলে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন তা-ই হয়েছে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন শক্তি নেই। তবে সে তাতে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন বিপদ মুসিবত দেখবে না।

বিপন্ন ব্যক্তিকে দেখে যে দু'আ পড়তে হয় কেউ যদি

সহীহ সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً إِلاَّ لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلاءِ كَائِنًا مَا كَانَ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে যে বিপদ দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছেন তা থেকে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তাঁর সৃষ্টির অনেকের চেয়ে আমাকে বেশি বেশি অনুগৃহীত করেছেন।" দু'আটি পাঠ করে তবে বিপদ তাকে স্পর্শ করবে না।

www.waytojannah.com

কারো সাথে অশুভ লক্ষণ দেখা দিলে সে কি পড়বে

রাসূল ﷺ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর সামনে একদা অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন, অশুভ লক্ষণ থেকে শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা উত্তম এবং তুমি কোন মুসলমানকে ফিরিয়ে দিবে না। তুমি যখন অপছন্দনীয় কোন লক্ষণ দেখবে তখন বলবে–

اللَّهُمَّ لا يَأتِى بالحَسَنَاتِ إلاَّ أنتَ ، وَلا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إلاَّ أنْتَ ، وَلا حوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ بك

"আল্লাহ ভালো করার মালিক কেবলই তুমি। অকল্যাণ প্রতিহত করার মালিকও তুমি। তুমি ব্যতীত কোন আশ্রয় নেই এবং কোন শক্তিও নেই।" কা'ব বলতেন–

اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا رب غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، والذى نفسى بيده، إنها لرأس التوكل، وكنز العبد فى الجنة، ويقولهن عبد عند ذلك، ثم يمضى إلا لم يضره شىء.

"হে আল্লাহ, আপনার অমঙ্গল ব্যতীত অন্য কোন অমঙ্গল নেই আর আপনার মঙ্গল ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গলও নেই। আপনি ব্যতীত আমাদের কোন প্রভু নেই এবং আপনি ব্যতীত কোন আশ্রয় এবং শক্তি নেই। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ এটাই হলো তাওয়াক্কুলের মূল। আর বান্দার ধনভাণ্ডার হলো জান্নাতে। বান্দা একথাগুলোকে সেখানে বলবে। এরপর সে বলতে থাকবে যতক্ষণ না কোনকিছু তার ক্ষতি করে।"

কেউ স্বপ্নে খারাপ কিছু দেখলে কী বলবে

রাসূল ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত,

الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى رؤيا يكره منها شيئا، فلينفث عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان، فإنها لا تضره، ولا يخبر بها أحدا، وإن رأى رؤيا حسنة، فليستبشر، ولا يخبر بها إلا من يحب.

উত্তম স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। কাজেই কেউ স্বপ্নে খারাপ কিছু দেখলে সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলে এবং আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে পানাহ চায়। কেননা সে তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং কাউকে এ ব্যাপারে কিছু বলবে না। আর যদি স্বপ্নে ভালো কিছু দেখে তবে সে যেন এর থেকে সুসংবাদ গ্রহণ করে এবং প্রিয় মানুষ ছাড়া কারো কাছে যেন এ খবর না বলে।

যে স্বপ্নে খারাপ কিছু দেখেছে রাসূল ﷺ তাকে স্বপ্ন দেখার সময় সে যে পার্শ্বে শায়িত ছিল সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে শোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আরো পাঁচটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন: বামপার্শ্বে থুতু ফেলার, শয়তান থেকে আল্লাহ আশ্রয় প্রার্থনা করার, কাউকে সে স্বপ্নের কথা না বলার, পার্শ্ব পরিবর্তন করে শোয়ার এবং নামাজ পড়ার। এ পাঁচটি করা হলে এ স্বপ্নে তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

রাসূল ﷺ বলেন, স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার আগ পর্যন্ত স্বপ্ন পাখির পায়ে থাকে। যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হয় তখন স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং স্বপ্নকে বন্ধু বা ভালো ব্যাখ্যা করতে পারে এমন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো নিকট ব্যক্ত করো না।

www.waytojannah.com

Contents

ওমার (রা) এর নিকট কোন স্বপ্ন বর্ণনা করা হলে তিনি বলতেন, "হে আল্লাহ, স্বপ্ন যদি ভালো হয় তবে তা আমাদের জন্য আর খারাপ হলে তা আমাদের শত্রুদের জন্য।"

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি বলেছেন কারো নিকট স্বপ্ন বর্ণনা করা হলে সে বর্ণনাকারীর ব্যাপারে যেন ভালো কিছু বলে। আব্দুর রাজ্জাক তার সনদে ইবনু সীরীন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বাকার (রা) যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার ইচ্ছে করতেন তখন বলতেন, যদি তোমার স্বপ্ন সত্যি হয় তবে এর ব্যাখ্যা এমন এমন হবে।

ওয়াসওয়াসাগ্রস্ত কী বলবে এবং কী করবে এবং কী দ্বারা ওয়াসওয়াসার উপর সাহায্য কামনা করবে

সালিহ ইবনু কাইসান তার সূত্রে ইবনু মাসউদ থেকে মারফূ সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন যে, বনী আদমের অন্তরে নিয়োজিত ফেরেশতার সংশ্রব এবং শয়তানের সংশ্রব আছে। ফেরেশতার সংশ্রব কল্যাণের নির্দেশ দেয় এবং সত্যকে সত্য বলতে উদ্বুদ্ধ করে এবং ভালো প্রতিদানের আশা দেয়। আর শয়তানের সংশ্রব অন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং সত্যকে মিথ্যা বলতে উৎসাহিত করে এবং কল্যাণ থেকে নিরাশ করে। সুতরাং তোমরা যখন ফেরেশতার সংশ্রব অনুভব করবে তখন আল্লাহর প্রশংসা করবে। তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। আর শয়তানের সংশ্রব অনুভব করলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

রাসূল ﷺ-কে উসমান ইবনু আবীল আছ বলেন– "হে আল্লাহর রাসূল, শাইতান আমার মাঝে এবং আমার নামায ও তিলাওয়াতের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে গেছে।"

রাসূল ﷺ বললেন, "এটা শয়তান ওর নাম হলো খিনযাব। তাকে অনুভব করলে আল্লাহর নিকট তার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তোমার বাম পার্শ্বে তিনবার থুতু ফেলবে।"

সাহাবায়ে কিরামদের কেউ হুজুরের নিকট এসে অভিযোগ করলেন যে, তাদের একজন তার অন্তরে এমন জিনিস অনুভব করে যা মুখে উচ্চারণের চেয়ে আগনে জ্বলে ছাই হয়ে যাওয়াকে সে অনেক প্রিয় মনে করে। রাসূল বললেন–

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তার ষড়যন্ত্রকে কুমন্ত্রণায় পরিণত করেছেন।"

এমনিভাবে ইবনু আব্বাস আবী যামীল সিমাক ইবনুল ওলীদ আল হানাফীকে তার অন্তরে কী অনুধাবন করে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আবী যামীল বললেন, "আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি তা মুখে উচ্চারণ করতে পারব না।" ইবনু আব্বাস আমাকে বললেন, "কোন সন্দেহের অনুভব করছ কি?" আমি বললাম, "জ্বী হ্যাঁ।" তিনি আমাকে বললেন, এর থেকে কেউ বাঁচতে পারেনি। এমনকি আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন–

সুতরাং তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাক যা তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে–

فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ.

www.waytojannah.com

Contents

ইউনুস (আ) আবী যামীল বলেন, এরপর ইবনু আব্বাস আমাকে বললেন, তুমি তোমার অন্তরে কোন কিছু অনুভব করলে এ আয়াত পাঠ করবে–

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

"তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (আল হাদীদ: ৩)

ইবনু আব্বাস (রা) এ আয়াতের মাধ্যমে অসার ও অবাস্তব পরম্পরার নিরসন করেছেন। এভাবে যে সকল সৃষ্টির সূচনার পরম্পরা এমন একটি প্রথম জিনিসের নিকট গিয়ে শেষ হয় যার পূর্বে কেউ ছিল না এমনিভাবে এমন একটি জিনিসের নিকট গিয়ে শেষ হয় যার পরে আর কিছু নেই। যদি এর পরে বা প্রথমে কোনো জিনিস হত তবে তিনিই হতেন সর্বস্রষ্টা এবং সমীচীন হলো সকল বিষয় এমন এক স্রষ্টার নিকট গিয়ে শেষ হবে যিনি মাখলুক নন। যিনি সকলের থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি অনাদি। আর তিনি ব্যতীত সকল কিছু অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে লাভ করেছে। তিনি সর্বপ্রথম তার পূর্বে কেউ নেই এবং তিনিই সর্বশেষ যার পরে কেউ নেই।

রাসূল বলেছেন, মানুষ একে অপরকে জিজ্ঞেস করতে থাকবে। এমনকি তাদের একজন বলবে, এই যে আল্লাহ ইনি মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন তবে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করল? তোমাদের কেউ যদি তার অন্তরে এমন কিছুর অনুভব করে তবে সে যেন আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তার থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

"তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।" (সূরা: হা-মীম আস-সাজদাহ: ৩৬)

"আমি", "আমার" এবং "আমার কাছে" বলা প্রসঙ্গে

'আমি', 'আমার' এবং 'আমার কাছে' এ জাতীয় শব্দের ব্যবহার থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা উচিত। কারণ এ তিনটি শব্দ দ্বারা শয়তান ফেরাউন এবং কারুনকে পরীক্ষা করা হয়েছে।

ইবলিস বলেছে–

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ.

"আমি তার চেয়ে ভালো"। ফিরআউন বলেছে–

لِي مُلْكُ مِصْرَ.

মিশরের "রাজত্ব আমার"। (সূরা: আয-যুখরুফ: ৫১)

আর কারুন বলেছে–

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي.

"এবং আমি আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি।" (সূরা: আল-কাসাস- ৭৮)

www.waytojannah.com

Contents

বান্দার কথার মধ্যে ﻋﺒﺪ শব্দের সবচেয়ে সুন্দর ব্যবহার হলো, বান্দা বলবে "আমি" ﻋﺒﺪ গোনাহগার পাপী ভুলকারী, ক্ষমাপ্রার্থী এবং নিজের অন্যায় স্বীকারকারী একজন বান্দা এবং ﻟﻲ "আমার" এর ভালো ব্যবহার হলো, আমার অন্যায়, অপরাধ, দারিদ্র্যতা, অপদস্থতা এবং গোনাহ আছে বলা। আর عندى "আমার নিকট" এর উত্তম ব্যবহার হলো যা রাসূল ﷺ বলেছেন যে, (আল্লাহ) আপনি আমার ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত এবং ভুলবশত সকল গুনাহ এবং আমার কাছে এ জাতীয় আরো যতো গোনাহ আছে সব আপনি ক্ষমা করুন।"

কুরাইশদের লেখা চুক্তি ও রাসূল ﷺ এবং মুসলিমদের শিয়াবে আবু তালিব উপত্যকায় বন্দি জীবনযাপন

এরপর রাসূল ﷺ-এর চাচা হামযা ও একদল লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম চারদিকে ছড়াতে লাগল। কোরাইশরা রাসূল ﷺ-এর অগ্রগতি দেখে দিশেহারা হয়ে উঠে এবং সকলে ঐক্যবদ্ধ হয় যে তারা বনী হাশেম বনী আবদে মানাফ এবং বনী আব্দুল মুত্তালিবের সঙ্গে কোন ধরনের সম্পর্ক রাখবে না। কেউ তাদের সঙ্গে লেনদেন করবে না, বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক গড়ে তুলবে না, কোন প্রকার কথা বলবে না এবং কোন ধরনের উঠাবসাও করবে না। যতক্ষণ তারা মুহাম্মাদকে তাদের হাতে সমর্পণ না করবে এবং এ সম্পর্কে তারা একটি চুক্তি সম্পাদন করে কা'বার ছাদে লটকিয়ে দেয়। বলা হয়, চুক্তিটির লেখক হলো, মানছুর ইবনু ইকরিমা, আবার অনেকের মতে নাযর ইবনুল হারিছ। তবে সঠিক হলো এর লেখক হলো বাগীয ইবনু আমের। রাসূল ﷺ তার জন্য বদ দু'আ করলেন ফলে তার হাত পঙ্গু হয়ে যায়। রাসূল ﷺ তার সঙ্গীদেরকে নবুওয়াতের সপ্তম বছরের মুহাররাম মাসের শুরুতে শিয়াবে আবু তালিব উপত্যকায় আটক করা হয়। চুক্তিটি কা'বার মাঝে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। আর তারা সে উপত্যকায় আটকাবস্থায় অত্যন্ত দুর্দশার সঙ্গে জীবন যাপন করতে থাকেন। এ আটকাবস্থার মেয়াদ প্রায় তিন বছর দীর্ঘ হয়। তারা সেখানে অত্যন্ত কষ্ট করতে থাকেন, ক্ষুধার যন্ত্রণায় নিষ্পাপ শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনা যেত এবং সেখানেই আবু তালিব তার প্রসিদ্ধ কবিতা–

جزى الله عناعبد الشمس ◉ ونوفلا عقوبة شرعاجلا غيرآجل

আবৃত করেন। কুরাইশরা তখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল কেউতো চুক্তির ব্যাপারে ছিল সন্তুষ্ট। আবার কেউ ছিল, অসন্তুষ্ট। অতঃপর সর্বপ্রথম হিশাম ইবনু আমর এই নিপীড়নমূলক চুক্তি বাতিলের প্রথম উদ্যোক্তায় পরিণত হলো। সে এ বিষয় নিয়ে মুতঈম ইবনু আদী এবং কুরাইশদের বিভিন্ন দলের নিকট যেতে লাগল এবং তারা তার ডাকে সাড়া দিতে লাগল। এদিকে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তাদের এ চুক্তিটি সম্পর্কে অবগত করে দিলেন এবং আল্লাহ সে চুক্তিকে খেয়ে ফেলার জন্য উঁইপোকা প্রেরণ করলেন। উঁইপোকা চুক্তিতে উল্লিখিত সকল অন্যায় ও অবিচারের লেখাগুলো খেয়ে ফেলল। কেবল আল্লাহর নামের অংশটুকু বাকি ছিল। রাসূল ﷺ-এর চাচা তাঁকে এ বিষয়ে অবগত করলেন। এরপর তিনি কোরাইশদের নিকট গিয়ে বললেন যে, তার ভাতিজা এমন এমন বলেছে। এরপর তারা চুক্তিটি নমিয়ে ফেলে। এরপর তারা যখন দেখল যে, রাসূল ﷺ যেটা বলেছেন, তাই ঠিক এতে তাদের ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পেল। অতঃপর রাসূল ﷺ তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে শিয়াবে আবু তালিব থেকে বের হয়ে আসেন।

ইবনু আব্দুল বার বলেন, তখন চলছিল নবুওতের দশম বছর। এর বছরই ছয় মাস পর আবু তালিব মারা গেলেন এবং তার মৃত্যুর তিন দিন পর খাদীজা (রা) ইন্তেকাল করেন।

www.waytojannah.com

Contents

রাসূল ﷺ-এর তায়িফ গমন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

চুক্তিভঙ্গের পর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আবু তালিব এবং খাদীজার মৃত্যু হয়। আর নির্বোধ ও অসভ্য সম্প্রদায় তাঁর সঙ্গে আরো কঠোর বিরোধিতা করতে শুরু করল। তারা নানারকম নির্যাতন নিপীড়ন শুরু করল অতঃপর রাসূল ﷺ অসহ্য হয়ে বুক ভরা আশা ও ভরসা নিয়ে তায়িফে গমন করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু তিনি সেখানে কোন আশ্রয়দাতা পেলেন না, পেলেন না কোন সাহায্যকারী। বরং তারা তাঁর সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশি তাকে কষ্ট দিতে শুরু করল। রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিল যায়িদ ইবনু হারিছা তিনি দশদিন তায়িফে অবস্থান করেন এ সময়ে তিনি সেখানের নেতাদের নিকট গিয়ে গিয়ে ইসলামের বিষয়ে আলাপ করলেন, কিন্তু তারা তাকে তাদের শহর থেকে বের হয়ে যেতে বলল, তারা তাদের শহরের সবচেয়ে নিকৃষ্ট বখাটে তরুণদেরকে চাকর, নকর ও গোলামদেরকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। তারা তাকে পাথরের আঘাতে আঘাতে তার পাদ্বয়কে রক্তে রঞ্জিত করে দিল। রাসূল ﷺ-এর শরীরে যেন পাথর না লাগে যায়েদ সে চেষ্টা করতেছিল। যার কারণে তার মাথায়ও ক্ষত হয়েছিল। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ব্যথিত হৃদয়ে রাসূল ﷺ মক্কার দিকে গমন করেন। তায়িফ থেকে আসার পরে তিনি প্রসিদ্ধ দু'আটি দ্বারা দু'আ করেন–

اللّٰهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِى، وَقِلَّةَ حِيلَتِى وهَوَانِى عَلَى النَّاس يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وأَنْتَ رَبِّى إِلَى مَنْ تَكِلُنِى إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِى؟ أَوْ إِلَى عَدوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِى، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَىَّ فَلاَ أُبَالِى، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ هِى أَوْسَعُ لِى، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِى أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنيا وَالآخِرَةِ أَنْ يَحِلَّ عَلَىَّ غَضَبُكَ أَوْ أَنْ يَنْزِلَ بِى سَخَطُكَ، لكَ الْعُتبى حَتَّى تَرْضَى وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِكَ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমি আমার দুর্বলতা, সম্বলহীনতা ও জনগণের সামনে অসহায়ত্ব সম্পর্কে কেবল তোমারই কাছে ফরিয়াদ করছি। হে প্রভু দয়াবান। দরিদ্র ও অক্ষমদের প্রতিপালক তুমিই। তুমিই আমার মালিক। তুমি আমাকে কার কাছে সঁপে দিতে চাইছ? আমার প্রতি বিদ্বেষপরায়ন প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে, নাকি এমন শত্রুর কাছে যাকে আপনি আমার বিষয়ে মালিক বানাবেন। তুমি যদি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না থাক, তা হলে আমি কোন কিছুর পরোয়া করি না। কিন্তু তোমার পক্ষ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা পেলে সেটাই আমার জন্য অধিকতর প্রশস্ত। আমি তোমার কোপানলে অথবা আযাবে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে তোমার সেই জ্যোতি ও সৌন্দর্যের আশ্রয় কামনা করি, যার কল্যাণে সকল অন্ধকার দূরীভূত ও আখেরাতের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তোমার সন্তোষ ছাড়া আমি আর কিছু কমনা করি না। তোমার কাছে থেকে ছাড়া আর কোথাও কোন শক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।"

ইতোমধ্যে আল্লাহ তার নিকট পাহাড়ের কর্মে নিয়োজিত ফেরেশতাকে প্রেরণ করলেন এবং বললেন, আপনি হুকুম করলে মক্কার পার্শ্ববর্তী দু'পাহাড়কে চাপা দিয়ে মক্কাবাসীদেরকে ধ্বংস করে দিব। রাসূল ﷺ বললেন:

لا، بل أستأن بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا.

"না, বরং আমারই দুর্বলতা, হয়ত তাদের বংশধর থেকে আল্লাহ এমন লোক সৃষ্টি করবেন যারা এক আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না।"

www.waytojannah.com

এরপর নাখলা নামক জায়গায় অবস্থান করে রাত্রের নামাজ আদায় করলেন, তখন একদল জ্বিন তাঁর তেলাওয়াত শ্রবণ করে। রাসূল ﷺ এটি বুঝতে পারেননি। অবশেষে তার উপর অবতীর্ণ হয়–

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ {٢٩} قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ {٣٠} يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ {٣١} وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَولِيَاء أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

অর্থাৎ, "আমি যখন একদল জ্বিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিল। তারা যখন কোরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হলো, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাকো। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হলো, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল। তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য করো এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তোমাদের গোনাহ মার্জনা করবেন আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য করবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।" (সূরা: আল-আহকাফ– ২৯-৩০)

এরপর তিনি নাখলা নামক স্থানে কয়েকদিন অবস্থান করলেন। যায়িদ ইবনু হারেছ রাসূল ﷺকে বললেন, রাসূল ﷺ আপনি সেখানে কিভাবে ফিরে যাবেন অথচ কোরায়ীশরা আপনাকে সেখান থেকে বের করে দিয়েছে। রাসূল ﷺ বললেন, হে যায়িদ, আল্লাহ দ্রুত কোন পথ খুলে দিবেন। এবং নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর নাবী ও দীনের সহায়তা করবেন এবং এরপর রাসূল ﷺ মক্কায় ফিরে এলেন এবং খুযা'আ গোত্রের একজনকে মুতঈমের নিকট পাঠালেন এ মর্মে যে, "আপনি কি আমাকে নিরাপত্তামূলক আশ্রয় দিতে পারবেন? মুতঈম ইবনু আদী বলল, হ্যাঁ। অতঃপর মুতঈম তার ছেলেদের ডেকে নির্দেশ দিল সশস্ত্র অবস্থায় কা'বার চত্বরে ঘোরাফিরা করবে, এবং মুহাম্মাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। কারণ আমি মুহাম্মদকে আশ্রয় দিয়েছি। অতঃপর রাসূল ﷺ ও যায়িদ (রা) মক্কায় প্রবেশ করেন এবং ধীরে ধীরে হারাম শরীফে পৌঁছে যান।

অতঃপর মুতঈম ইবনু আদী উটের উপর বসে ঘোষণা করল, হে কোরাইশরা শোনো! আমি মুহাম্মদকে আশ্রয় দিয়েছি। সুতরাং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এরপর রাসূল ﷺ ইয়ামানীর নিকট গিয়ে পৌঁছলেন এবং সেখানে দু'রাকাত নামায পড়ে বাড়িতে ফিরে যান এবং মুতঈম ও তার ছেলেরা খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে রাসূল ﷺ-কে বাড়িতে পৌঁছে দেন।

রাসূল ﷺ-এর ইসরা প্রসঙ্গ

এরপর সহীহ মতানুসারে স্বশরীরে তিনি মসজিদে হারাম থেকে বোরাকে আরোহণ করে বাইতুল মাকদিসে গমন করেন। সঙ্গে ছিলেন জিবরাঈল (আ)। অতঃপর বাইতুল মাকদিসে অবতরণ করেন এবং বোরাক মসজিদের দরজার সঙ্গে বেঁধে সকল নবীদের নামাযের ইমামতি করেন।

www.waytojannah.com

Contents

কারো মতে, তিনি বাইতুল লাহাম নামক স্থানে অবতরণ করেন এবং সেখানেই নামায পড়েন। তবে এটি সহীহ মত নয়। এরপর তিনি ঐ রাত্রিতেই বাইতুল মাকদিস থেকে প্রথম আসমানের দিকে যাত্রা করেন। জিবরাঈল রাসূল ﷺ-এর জন্য দরজা খোলার আবেদন করেন অতঃপর তাঁর জন্য দরজা খোলা হয়। এরপর আবুল বাশার আদমের সঙ্গে তাঁর সেখানে সাক্ষাৎ হয়, রাসূল ﷺ তাকে সালাম দেন। আদম (আ) রাসূল ﷺ-এর সালামের উত্তর দেন, তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং রাসূল ﷺ-এর নবুওতের স্বীকার করেন। আল্লাহ তাকে তাঁর ডানপার্শ্বে নেককারদের রূহসমূহ এবং বামপার্শ্বে বদকারদের রূহসমূহ দেখান। এরপর তাকে সেখান থেকে দ্বিতীয় আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। জিবরাঈল তাঁর জন্য দরজা খুলতে বললেন এবং সেখানে ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়্যাহ এবং ঈসা ইবনু মরিয়মের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাদেরকে সালাম দেন। তারা তার সালামের উত্তর দেন ও স্বাগতম জানান। এবং তার নবুওতের স্বীকার করেন। এরপর তৃতীয় আকাশে তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়। সেখানে ইউসুফের (আ) সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সালাম দেন। তিনি তাঁর সালামের উত্তর নিয়ে তাকে স্বাগতম জানান এবং রাসূল ﷺ-এর নবুওতের স্বীকার করেন। এরপর চতুর্থ আকাশে রাসূল ﷺকে উঠিয়ে নেয়া হয়। সেখানে ইদ্রিস (আ) এর সঙ্গে রাসূল ﷺ-এর সাক্ষাৎ হয়। রাসূল ﷺ তাকে সালাম দেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর সালামের উত্তর দেন ও তাঁকে স্বাগতম জানান এবং রাসূল ﷺ-এর নবুওতের স্বীকার করেন। অতঃপর পঞ্চম আকাশে তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়। সেখানে হারুন ইবনু ইমরানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় তিনি তাকে সালাম দেন। হারুন তার সালামের উত্তর দিয়ে তাকে স্বাগতম জানান এবং তার নবুওতকে স্বীকার করেন। এরপর তাকে ষষ্ঠ আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। সেখানে মূসা ইবনু ইমরানের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় তিনি তাকে সালাম দেন। মূসা তার সালামের উত্তর দেন, তাকে স্বাগতম জানান এবং তাঁর নবুওতকে স্বীকার করেন। রাসূল ﷺ মূসার নিকট থেকে ফিরার সময় মূসা কেঁদে দেন। কেন কাঁদছেন? বললে, তিনি উত্তরে বলেন, আমার পরে এমন একজনকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে যাঁর উম্মাতগণ আমার উম্মতের চেয়ে বেশি জান্নাতী হবে। এরপর তাঁকে সপ্তম আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। সেখানে ইবরাহীমের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় ইবরাহীম তাকে সালাম দেন, তাকে স্বাগতম জানান এবং তার নবুওতের কথা স্বীকার করেন। এরপর তাকে 'সিদরাতুল মুনতাহা'য় এবং সেখান থেকে বাইতুল মা'মুরে এবং এরপর আল্লাহর নিকট উঠিয়ে নেয়া হয়। আল্লাহর নিকটবর্তী হলেন। তখন তাদের মাঝে দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম। আর আল্লাহ তখন তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা প্রত্যাদেশ করলেন। তার উপর ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেন এবং এরপর তিনি সেখান থেকে ফিরে এলেন। ফিরার পথে মূসার (আ) সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, আপনাকে কোন বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে? রাসূল ﷺ বললেন ৫০ ওয়াক্ত নামাযের, মূসা বললেন, আপনার উম্মত এটা পারবে না যান আপনার প্রভুর নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো সহজ করে দিতে বলেন। রাসূল ﷺ জিবরাঈলের দিকে তাকালেন জিবরাঈলও কেমন যেন ঈশারায় একথাই বলতে চাইলেন। এরপর জিবরাঈল রাসূল ﷺ-কে নিয়ে আবার আল্লাহর নিকট ফিরে আসলেন।

আর আল্লাহ তখন তাঁর স্থানেই ছিলেন। এগুলো হলো বুখারীর শব্দ। অন্যত্র ভিন্ন তুরুকে এসেছে যে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা ১০ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দেন এবং সেখান থেকে ফিরার পথে পুনরায় মূসার সঙ্গে রাসূল ﷺ-এর সাক্ষাৎ হয়। রাসূল ﷺ মূসা (আ)-কে সব খুলে বললেন। মূসা (আ) বললেন, যান, আবার যান এবং আরো সহজ করে দিতে বলেন। এভাবে কয়েকবার হবার পর আল্লাহ তাআলা নামাযকে

www.waytojannah.com

Contents

৫ ওয়াক্ত করে দেন। এরপর আবার যখন মূসা আরো কমিয়ে আনার জন্য রাসূল ﷺ-কে (আ) আল্লাহর নিকট যেতে বললেন, তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমার লজ্জা করছে। তবে আমি এতে সন্তুষ্ট এবং মেনে নিয়েছি। এরপর রাসূল ﷺ যখন ফিরে আসতে লাগলেন তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করল, আমি আমার বিধান প্রয়োগ করেছি, এবং আমার বান্দাদের থেকে হ্রাস করে দিয়েছি। রাসূল ﷺ সে রাতে আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন কি না এ নিয়ে সাহাবাদের মাঝে মতবিরোধ আছে। ইবনু আব্বাস (রা) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন এবং তিনি তাকে অন্তর্চক্ষু দ্বারা দেখেছেন।

আয়িশা ও ইবনু মাসউদ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত যে, উভয়ে একে অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, কুরআনের বর্ণনা–

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى.

"নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে।" (সূরা: আন-নাজমঃ ১৩-১৪)

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জিবরাঈল (আ)। তাছাড়া আবু যার থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত; তিনি রাসূল ﷺকে ﷺ তিনি তাঁর প্রভুকে দেখেছেন কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমি একটি নূর দেখেছি।

উসমান ইবনু সাঈদ আদ্-দারিমী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যে দীদার লাভ করেননি এ ব্যাপারে সকল সাহাবায়ে কেরাম একমত।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া বলেন, ইবনু আব্বাসের বক্তব্য, 'তিনি তাকে দেখেছেন' অন্যান্যদের বক্তব্য বিরোধী নয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আমি আমার সুহবান প্রতিপালককে দেখেছি'। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর এ দর্শন মিরাজ হয়নি। বরং এটি হয়েছে মদীনাতে এবং রাসূল ﷺ স্বপ্নে আল্লাহর দীদার লাভ করেন। ইমাম আহমাদের মতও এটি। যারা ইমাম আহমাদ থেকে এ রেওয়ায়েত করেছেন যে, ইমাম আহমাদের মতে রাসূল ﷺ জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন তারা নিঃসন্দেহে ভুল করেছেন।

বাইতুল মাকদিস সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর বর্ণনা

মিরাজ থেকে আগমনের পর প্রত্যুষে এ সফরের সকল বিবরণ তিনি তার সম্প্রদায়ের নিকট বর্ণনা করেন। এবং আল্লাহ তাকে যেসব নিদর্শনাবলী এ সফরে দেখিয়েছেন তা তিনি তাদের নিকট খুলে বলেন। কিন্তু এতে তার সম্প্রদায় আরো রেগে যায়। বৃদ্ধি পায় তাদের নির্যাতন ও নিপীড়ন এবং তারা তাঁর নিকট বাইতুল মুকাদ্দিসের বর্ণনা তলব করে। অতঃপর আল্লাহ রাসূল ﷺ-এর ﷺ সম্মুখে বাইতুল মুকাদ্দিসের আকৃতি তুলে ধরলেন। ফলে তিনি বাইতুল মুকাদ্দিসের সকল আকৃতির বিস্তারিত বিবরণ তাদের সম্মুখে বলে দিলেন এবং তাদেরকে তাদের কাফেলার অবস্থান ও আগমন সম্পর্কে অগ্রিম সংবাদ প্রদান করেন। কিন্তু এতে তাদের বিরোধিতা আরো বৃদ্ধি পেল।

রাসূল ﷺ-এর মিরাজ দৈহিক না আত্মিক

ইবনু ইসহাক আয়িশা এবং মু'আবিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা উভয়ে বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ-এর মিরাজ ছিল আত্মিক। হাসান বসরী থেকেও এমনটি বর্ণিত। তবে এখানে স্বপ্নযোগের মিরাজ এবং আত্মিক মিরাজের মধ্যকার ব্যবধান সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক। আয়িশা ও মু'আবিয়ার বক্তব্য

www.waytojannah.com

Contents

হলো, রাসূল ﷺ-এর মিরাজ হয়েছে আত্মিক, এবং এতে রাসূল ﷺ-এর দেহ অদৃশ্য হয়নি। তাদের মতে স্বপ্নযোগে রাসূল ﷺ-এর মিরাজ হয়নি। অথচ এ দু'টোর মধ্যে অনেক ব্যবধান। কেননা ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমে যা কিছু দর্শন করে যা কখনো কখনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অনুরূপ হয়ে থাকে। অতঃপর সে কখনো দেখতে পায় যে তাকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হচ্ছে অথবা মক্কা বা পৃথিবীর অন্য কোন শহরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এত কিছু সত্ত্বেও তার রূহ কিন্তু আপন জায়গায় বাকি থাকে। স্বপ্নের কাজে নিয়োজিত ফেরেশতা তাকে এ ধরনের স্বপ্ন দেখায়।

আর সাহাবাদের যারা রাসূল ﷺকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে বলে বিশ্বাস করেন তারা দু'দলে বিভক্ত

১. তাঁকে তাঁর রূহ ও সশরীরে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

২. অপর দলের মতাদর্শ হলো, তাঁর মিরাজ শুধু আত্মিক হয়েছে দৈহিক নয়। তাদের মতে মেরাজ স্বপ্নযোগে হয়নি। বরং মেরাজ হয়েছে রূহের মাধ্যমে এবং এটি স্বপ্নের অনেক ঊর্ধ্বের বিষয়।

কিন্তু রাসূল ﷺ যেহেতু নাবী আর তাঁর বিষয়টি অলীক। যেমন, তাঁর বক্ষ-বিদীর্ণ করা হয়েছে কিন্তু তিনি এতে কোন কষ্ট অনুভব করেননি। ঠিক তেমনি তাঁকে মৃত্যু দেয়া ব্যতীতই সরাসরি তাঁর রূহ ও আত্মাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। যা অন্যান্যদের পক্ষে মৃত্যু ব্যতীত অসম্ভব। সকল নাবীর উপস্থিতিও সেখানে আত্মিক হয়েছে। আর রাসূল ﷺ এর জীবিত অবস্থায় তাঁর আত্মাকে সেখান থেকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং পরে আবার ফিরিয়ে দেয়া হয়। আর রাসূল ﷺ মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা মোবারক অন্যান্য নাবীদের আত্মার সঙ্গে গিয়ে সম্পৃক্ত হয়েছে।

ইসরার সংখ্যা

মুসা ইবনু উকবা যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, মদীনায় হিযরতের এক বছর পূর্বে রাসূল ﷺ-এর রূহ মুবারককে বাইতুল মাকদিস এবং সেখান থেকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়। ইবনু আব্দুল বার ও অন্যান্যদের বক্তব্য হলো, হিজরত ও মিরাজের মধ্যে এক বছর দু'মাসের ব্যবধান ছিল।

ইসরা হয়েছে একবার। কারো মতে দু'বার: একবার জাগ্রত অবস্থায়, আরেকবার ঘুমে। যারা এ মতটি গ্রহণ করেছেন তারা যেন শারীকের হাদীসে তার বক্তব্য ثم استيقظت এবং অন্য সকল রেওয়ায়েতকে একত্রিত করতে চান। তাদের অনেকের মতে এটি দু'বার হয়েছে একবার ওহীর পূর্বে। শারীকের হাদীস যে "এটা হয়েছে আমার নিকট ওহী আগমনের পূর্বে" এর থেকে একথা বুঝে আসে। আরেকবার হয়েছে ওহী অবতীর্ণ হবার পরে। অন্যান্য সকল হাদীস থেকে তা বুঝা যায়।

তাদের অনেকের মতে, ইসরা হয়েছে মোট তিনবার–

একবার ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে, আর দু'বার ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পরে। এসবগুলোই অনুমাননির্ভর। আর এটি হলো যাহীরিয়্যাদের অভ্যাস। তারা কোন ঘটনায় রেওয়ায়েত বিরোধী কোন শব্দ পেলে ঘটনাটিকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে মনে করে। পরস্পর বিরোধী কোন রেওয়ায়েত দেখা দিলে তারা রেওয়ায়েতগুলোকে একাধিক ঘটনার উপর আরোপিত করতে চায়। সঠিক তাই যা রিওয়ায়েত বিশেষজ্ঞ ইমামগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসরা কেবল একবার হয়েছে। আর তাও মক্কায় নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে।

www.waytojannah.com

Contents

আফসোস তাদের উপর যারা একাধিক মে'রাজ হয়েছে বলে বিশ্বাসী। এ ধরনের ধারণা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হলো কিভাবে? কিভাবে সম্ভব যে প্রত্যেকবার তার উপর ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হবে এবং এরপর আসার পথে মূসার সঙ্গে দেখা হবে এবং আস্তে আস্তে ৫০ ওয়াক্তকে কমিয়ে কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত করা হবে এবং প্রত্যেকবার আল্লাহ বললেন, আমি আমার বিধান তাদের উপর প্রয়োগ করেছি এবং আমার বান্দাদের থেকে হ্রাস করেছি। হুফফাজগণ ইসরার হাদীসের শব্দের ব্যাপারে শরীকের ভুল হয়েছে বলে অভিহিত করেছেন। মুসলিম (রহ) তার থেকে রেওয়ায়েত করে বলেন, শারীক ভুল করেছে, এবং কমবেশ করেছে এবং যথার্থরূপে হাদীস বর্ণনা করেনি।

হিযরত প্রসঙ্গ

হিযরতের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বন্ধু ও শত্রুদের মধ্যে দু'দলে বিভক্ত করে দেন এবং এ হিযরতকে দীনের সম্মান এবং তাঁর বান্দা ও রাসূলের সাহায্যে-সহযোগিতার সূচনা বানান।

ওকেদী বলেন, ইয়াযীদ ইবনু রুমান, আসিম ইবনু উমার ইবনু কাতাদা এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত তারা বলেছেন, রাসূল ﷺ তার নবুওয়াতের শুরু সময়ে মক্কায় তিন বছর লুকিয়ে লুকিয়ে বসবাস করেন এবং চতুর্থ বছর প্রকাশ্যভাবে বসবাস করেন এবং মক্কায় ১০ বছর পর্যন্ত লোকদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকতে থাকেন। হাজ্জের মাওসুমগুলোতে তিনি হাজীদের বসবাসের জায়গায় গিয়ে গিয়ে কখনো-বা উকাজ নামক স্থানে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকতেন। কখনো মাজান্নাহ নামক স্থানে গিয়ে আবার কখনোবা যীলমাজায নামক স্থানে গিয়ে লোকদেরকে ইসলামের বাণী শুনাতেন। কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দেয়নি। সঙ্গী হিসেবেও তিনি কাউকে সঙ্গে পাননি। এরপরও তিনি বসে থাকেননি দাওয়াত নিয়ে গিয়েছেন সকলের দ্বারে দ্বারে। তাদেরকে বলতেন, হে লোক সকল, তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, তোমরা সফলকাম হবে। সকল আরবের আধিপত্য তোমাদের করতলগত হবে। সকল অনারব তোমাদের সম্মুখে নত স্বীকার করবে আর যখন তোমরা ঈমান আনবে তখন তোমরা জান্নাতের অধিপতি হবে। পেছন থেকে তার চাচা আবু লাহাব বলত, তোমরা ওর অনুসরণ করো না সে, মিথ্যাবাদী। ফলে তারা রাসূল ﷺ-এর কথাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে যেত। নির্যাতন আর নিপীড়ন করত। আর বলত, তোমার পরিবার আর বংশের লোকেরা তোমার সম্পর্কে অধিক অবগত অথচ তারা তো তোমার অনুসরণ করে না। কিন্তু রাসূল ﷺ তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকতেন আর বলতেন, হে আল্লাহ, আপনি চাইলে তারা এমনটি হতো না। আর তিনি যে সকল সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন সেসব সম্প্রদায় হলো: বনু আমের ইবনু ছা'ছাআহ, মাহারিব ইবনু হাছাফাহ, ফাযারাহ, গাসসান, মুররা, হানীফা, আবস, বানুন নযর, বানুল বুকা, কিনদা, কালব, হারিস ইবনু কা'ব, উযরাহ এবং আল হাযারিমাহ ইত্যাদি সম্প্রদায়। কিন্তু তাদের কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি।

এদিক দিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসূলের জন্য যে পথটি সুগম করলেন তা হলো, আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা পূর্ব হতে তাদের মিত্র মাদীনার ইহুদীদের থেকে একথা শুনেছিল যে, শেষ যামানায় একজন নবীর আগমন ঘটবে। আর আমরা তার অনুসরণ করব এবং আ'দ ও ইরাম সম্প্রদায়ের মতো তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হব। আর আনসারীরা আরবদের ন্যায় হাজ্জ করত। আনসাররা যখন রাসূল ﷺ-কে

www.waytojannah.com

Contents

আল্লাহর দিকে ডাকতে দেখল তখন তারা এ জিনিসটিকে খুব ভালোভাবে লক্ষ করল এবং তাদের একজন আরেকজনকে লক্ষ করে বলল, আল্লাহর শপথ, হে সম্প্রদায় ইনিই তিনি যার ব্যাপারে ইহুদীরা তোমাদেরকে পূর্বে ভয় দেখিয়েছে। সুতরাং তারা এ ব্যাপারে তোমাদের অগ্রগামী হতে পারবে না। আউস গোত্রের সুয়াইদ ইবনুস সামিত মক্কায় আসলে রাসূল ﷺ তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। সে এ দাওয়াত কবুলও করল না আবার সরাসরি তা প্রত্যাখ্যানও করল না। এরপর আনাস ইবনু রাফে বনী আব্দুল আশহালের সঙ্গে তার গোত্রের মৈত্রী চুক্তির উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করলে। রাসূল ﷺ তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। ইয়াস ইবনু মু'আয তখনও বয়সে কিশোর মাত্র। সে বলল, 'হে আমার সাথীরা, তোমরা যে জন্য এসেছ তার চেয়ে এটাই ভালো।" তখন আনাস ইবনু রাফে আবুল হুসাইর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ওপর মাটি ছুঁড়ে মারল। অতঃপর সে চুপ হয়ে গেল। অবশেষে কোরাইশদের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সংঘটিত হওয়া ব্যতীতই তারা মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করল।

এরপর হাজ্জের মাওসুমে খাযরায গোত্রের ছয় জন আনসারী ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তারা হলো, আসাদ ইবনু যুরারা; আওফ ইবনুল হারিস, রাফে ইবনু মালিক, কুতবা ইবনু আমের এবং জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ। রাসূল ﷺ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা মদীনা গিয়ে সেখানের লোকদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। সেখানে ইসলামের দাওয়াত জনপ্রিয়তা এবং ব্যাপক বিস্তার লাভ করতে থাকে। সেখানের পরিবারগুলোর মধ্যে কোন পরিবারই এমন ছিল না, যেখানে ইসলাম প্রবেশ করেনি। পরবর্তী বছর বারো জন ব্যক্তি মদিনা থেকে এসে বায়আত গ্রহণ করেন। ছয় জনের মধ্যে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ ব্যতীত পূর্বের পাঁচ জন; আওফের ভাই মুআজ ইবনুল হারিস যাকওয়ান ইবনু আব্দুল কাইস যাকওয়ান, তিনি কয়েকদিন মক্কায় অবস্থান করে মাদীনায় ফিরে যান। তাই তাকে মুহাজির ও আনসারী সাহাবী বলা হয়। উবাদাতুবনুস সামেত, ইয়াযীদ ইবনু সালাবা, আবুল হায়সাই এবং উয়াইমীর ইবনু মালেকসহ সর্বমোট বারোজন মক্কায় আগমন করেন।

আবুয যুবাইর বলেন, জাবির (রা) রাসূল ﷺ থেকে এ ধরনেরই বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর এ দলটি মাদীনায় রওনা হলো, রাসূল ﷺ তাদের সঙ্গে আমর ইবনু উম্মু মাকতুম এবং মুস'আব ইবনু উমাইরকে সেখানের মুসলমানদেরকে কুরআনের জ্ঞান শিক্ষা দান এবং ইসলামী দাওয়াতী কাজ সম্পাদনের জন্য প্রেরণ করেন। অতঃপর তারা উভয়ে এছে ইবনু যুরারার বাড়িতে অবস্থান নেন। মুসআব তাদের নামাযের ইমামতি করতেন এবং ইসলামি আদর্শ ও ইসলামি চারিত্রিক নীতিমালাও শিক্ষা দিতেন এবং তাদের হাতে সেখানে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে উসাঈদ ইবনুল হুযাইর এবং সা'দ ইবনু মু'আয অন্যতম এবং তাদের ইসলামের সঙ্গে সঙ্গে বনী আব্দুল আশহাল গোত্রের সকল নারী-পুরষও ইসলাম গ্রহণ করে। তবে উসাইরাম আমর ইবনু ছাবিত ব্যতীত, যে উহুদের যুদ্ধে ইসলাম গ্রহণ করে এবং শহীদ হয়ে যান এবং তার পক্ষে একটি সেজদাও করা সম্ভব হয়নি। তার সম্পর্কে রাসূল ﷺকে জানানো হলে রাসূল ﷺ বলেন, কম কাজ করেও সে অধিক সাওয়াবপ্রাপ্ত হয়েছে। মদীনায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। মু'আয মক্কায় ফিরে এলেন। ইতোমধ্যে হাজ্জের মওসুম এসে গেল। এবার বিপুল সংখ্যক আনসারী মুসলমান এবং মুসলিমরা মক্কায় গেল। তাদের নেতা ছিল বারা ইবনু মা'রুর। অতঃপর আকাবার রজনীর প্রথম ভাগের তৃতীয়াংশে ৭৩ জন পুরুষ ও দু'জন নারী রাসূল ﷺ-এর নিকট আগমন করে এবং তাদের সম্প্রদায় এবং মক্কার কাফেরদের অজান্তে তারা রাসূল ﷺ-এর হাতে

www.waytojannah.com

Contents

বায়আত গ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বারা ইবনু মা'রুর ইসলাম গ্রহণ করে। তারা অঙ্গীকারকে আরো দৃঢ় করে। তার বাইআতকে আরো মজবুত করণার্থে রাসূল ﷺ-এর চাচা আব্বাস উপস্থিত হয়। আব্বাস তখন তার সম্প্রদায়ের ধর্মেই ছিলেন। সেই রাত্রিতে রাসূল ﷺ তাদের মধ্য হতে বারো জন আঞ্চলিক দায়িত্বশীল (নকীব) নিয়োগ করেন। তারা হলেন: আসাদ ইবনু যুররাহ, সা'দ ইবনুর রাবী, আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা, রাফে ইবনু মালিক, বারা ইবনুল মা'রুর, এবং জাবের পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু হারাম, সা'দ ইবনু উবাদা মুনযির ইবনু আমর এবং উবাদাহ ইবনুস সামিত এ ৯ জনকে খাযরাজ থেকে এবং আওস থেকে তিনজনকে নিযুক্ত করেন। উসাইদ ইবনুল হুযাইর সা'দ ইবনু খাইসামাহ এবং রি'ফাআ ইবনু আব্দুল মুনযিরকে কেউ কেউ রিফাআ ইবনু আব্দুল মুনযিরের স্থানে আবুল হাইসাম ইবনুল তাইহানকে উল্লেখ করেছেন।

আর নারী দুজন হলেন, উম্মু উমারা নুসাইবা বিনতু কা'ব ইবনু আমর। তার সন্তান হাবীব ইবনু যায়িদকেই মুসাইলামা ইবনু কাযযাব হত্যা করে এবং আসমা বিনতি আমর ইবনু আদী। এ বাইআত সম্পন্ন হওয়ার পর তারা আকাবা অধিবাসীদের উপর আক্রমণের অনুমতি চাইলে রাসূল ﷺ তাদেরকে অনুমতি দেননি। এদিকে শয়তান আকাশবাসীদের মধ্যে এ ঘোষণা দিয়েছিল যে, হে উপত্যকা অধিবাসী এর চেয়ে লজ্জার আর কিছু হতে পারে যে লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, "সে আকাবার কেশবহুল ব্যক্তি, সে কেশবহুল ব্যক্তির সন্তান, আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর শত্রু, আমি তোমার জন্য অবশ্যই অবশ্যই অবসর হব।" এরপর রাসূল ﷺ তাদেরকে বাড়ি ফিরে যেতে বললেন। সকাল হলো। ইতোমধ্যেই কোরাইশদের প্রতিনিধি দল আনসারদের উপত্যকায় এসে উপস্থিত। কোরাইশরা বলল, হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা, শুনেছি তোমরা গতকাল মুহাম্মাদের নিকট গিয়েছ এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। খোদার কসম আরবের যত অঞ্চল আছে তার মধ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তোমরাই আমাদের নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত। একথা শুনে নাজরানের মুশরীকরা উৎক্ষিপ্ত হয়ে বলল, আল্লাহর শপথ এটা হতে পারে না, এবং এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূল বলল, এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। এটা হতে পারে না। আমার সম্প্রদায় এ ধরনের বিষয়ে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন। আমি মাদীনায় থাকলে আমার অনুমতি ছাড়া তারা কখনো এমনটি করত না। এরপর কোরাইশরা তাদের সেখান থেকে ফিরে চলে এল। বারা ইবনু মা'রুরও রওয়ানা করল এবং ইয়াজাজ অঞ্চলে পৌছে তার সঙ্গী মুসলমানদের সঙ্গে মিলে যায়। কোরাইশরা তাদের তল্লাশি করে এবং সা'দ ইবনু উবাদাহকে ধরে তার উভয় হাতকে জিনের রশি দিয়ে গ্রীবার সঙ্গে বেঁধে ফেলে এবং তাকে প্রহার করতে থাকে তারা তাকে উলঙ্গ করে ফেলে এবং তারা তার মাথার সামনের কেশগুচ্ছ ধরে টানতে টানতে মক্কায় নিয়ে আসে। ও পরে মুতইম ইবনু আদী ও হারিস ইবনুল হারব এসে তাকে তাদের থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। এদিকে আনসাররা সা'দকে হারিয়ে তাদের উপর হানা দেয়ার পরামর্শ করছিল। ইতোমধ্যে সা'দ আগমন করলে তারা সকলে মদীনায় ফিরে যান। এরপর রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দেন। অতঃপর সকলে হিজরতের প্রস্তুতি নেয়। সর্বপ্রথম যিনি মদীনায় হিজরত করেন তিনি হলেন আবু সালাম ইবনু আবদুল আসাদ এবং তার স্ত্রী। তবে তার সন্তান সালামার কারণে তিনি এক বছর পর সন্তানকে নিয়ে মাদীনায় হিজরত করেন এবং উসমান ইবনু আবু তালহা তাকে হিজরতে উদ্বুদ্ধ করেন।

www.waytojannah.com

Contents

এরপর ধীরে ধীরে সকলে মাদীনায় হিজরত করতে থাকে। অবশেষে মক্কায় রাসূল ﷺ আবু বকর ও আলী ব্যতীত আর কেউই থাকল না। তারা রাসূল ﷺ-এর নির্দেশেই মক্কায় অবস্থান করেন। সেসব মুসলমানরাও মক্কায় রয়ে গেল যাদেরকে মক্কার মুসলিমরা আটকে রেখেছিল। রাসূল ﷺ ও আবু বাকর হিজরতের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। রাসূল ﷺ শুধু হিজরতের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন।

সঙ্গীকে নিয়ে মদিনায় হিজরতের পূর্বে রাসূল ﷺ-কে হত্যার ব্যাপারে মক্কার মুশরিকদের সলাপরামর্শ

মুশরিকরা যখন দেখল যে, রাসূলের ﷺ সঙ্গী সাথীরা হিজরতের প্রস্তুতি নিচ্ছে। নিজেদের ছেলে সন্তানদেরকে সঙ্গে নিয়ে আউস ও খাযরাজদের নিকট গমন করছে। এরূপ পরিস্থিতি দেখে যখন কোরাইশরা বুঝতে পারল যে, মুসলমানরা যখন একটা ঠিকানা পেয়ে গেছে এবং এক এক করে সবাই চলে গেছে, তখন মুহাম্মাদ ﷺ অচিরেই আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই তারা সবাই মক্কার গণমিলনস্থল 'দারুননাদওয়া' তে সমবেত হলো এবং সলাপরামর্শ করতে লাগল, মুহাম্মদের বিরুদ্ধে এখন কী পদক্ষেপ নেয়া যায়। তখন তাদের মাঝে তাদের সকলের শাইখ শাইতান নজদের এক বৃদ্ধ লোকের আকৃতিতে চাদর পরিহিত অবস্থায় এ বৈঠকে অংশগ্রহণ করে। সকলেই নিজ নিজ মতামত পেশ করল কিন্তু এ বৃদ্ধ শাইখ সকলের মতামতকে প্রত্যাখ্যান করল। এবার ধূর্ত আবু জাহল এক সুচতুর কৌশল উদ্ভাবন করল। সে বলল, মক্কার প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে শক্তিশালী ও প্রতাপশালী যুবককে বেছে নিয়ে তাদের সবাইকে তলোয়ার দিতে হবে এবং তারা সবাই একযোগে আক্রমণ চালিয়ে মুহাম্মাদকে ﷺ হত্যা করবে। এভাবেই আমরা তার খপ্পর থেকে মুক্তি পেতে পারি। এতে মুহাম্মাদের খুনের দায়-দায়িত্ব ও রক্তপণ সকল গোত্রের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। বনু আবদে মানাফ গোত্র একাকী এতসব গোত্রের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারবে না। তারা সাহসও করবে না। ব্যাস, এই কৌশলটাকেই বৃদ্ধ শাইখের মনঃপূত হলো এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে এই ষড়যন্ত্রমূলক বৈঠক সমাপ্ত হলো। এরপর জিবরাঈল (আ) আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট আগমন করলেন এবং তাকে তাদের এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত করেন এবং ঐ রাত্রিতে তার বিছানায় ঘুমাতে নিষেধ করেন। দুপুরবেলা রাসূল ﷺ এমন সময় মুখ ঢেকে আবূ বাকরের নিকট আগমন করেন যখন সাধারণত তিনি এভাবে আগমন করেন না। তিনি আবূ বাকরকে বললেন, তোমার নিকট যে আছে তাকে বাইরে নিয়ে আস। আবূ বাকর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সে আপনার পরিবারের লোকজন। রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ আমাকে হিজরতের নির্দেশ দিয়েছেন। আবূ বাকর বললেন, রাসূল ﷺ! সাহাবাদেরও কি হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আবূ বাকর বললেন, আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কোরবান হোক। এই উট দুটোর যেটাকে আপনার ভালো লাগে হাদিয়া হিসেবে গ্রহণ করুন। অতঃপর রাসূল ﷺ মূল্য দিয়ে একটি উট ক্রয় করলেন। আলীকে আপন বিছানায় নির্ভয়ে ঘুমানোর নির্দেশ দিলেন। এদিকে কোরাইশরা সারা রাত্র রাসূলের বাড়ি ঘেরাও করে রাখল। তাছাড়া পুরো শহরের চতুর্সীমানাও বন্ধ করে রাখল। আর রাসূল ﷺ এদিকে এক মুষ্ঠি মাটি নিয়ে–

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.

"এবং আমি তাদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি। অতঃপর তাদের আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না।" (সূরা: ইয়াসীন: ৯)

www.waytojannah.com

Contents

এ আয়াতটি পড়ে তাদের চোখে মুখে নিক্ষেপ করেন। রাসূল ﷺ আবু বাকরের ঘরে এসে সেখান থেকে উভয়ে রাত্রেই আবু বাকরের ঘরের ছোট দরজা দিয়ে হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। জনৈক ব্যক্তি কুরাইশদেরকে রাসূল ﷺ-এর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বলল, তোমরা কার জন্য অপেক্ষা করছ? তারা বলল, মুহাম্মদের। লোকটি বলল, আরে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছ, সে তো তোমাদের উপর মাটি নিক্ষেপ করে চলে গেছে। তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আমরা তো তা দেখতে পাইনি এবং তারা তাদের মাথা থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলে দিতে লাগল। এরা ছিলঃ আবু জাহল, হাকাম ইবনুল আস, তুআইমাহ ইবনু আদী, আবু লাহাব, উবাই ইবনু খালফ এবং তাদের সংবাদদাতা হাজ্জাজ পুত্রদ্বয়।

যখন সকাল হলো আলী ঘুম থেকে জাগ্রত হলে তারা আলীকে রাসূল ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আলী বলেন, আমার জানা নেই। রাসূল ﷺ ও আবু বাকর ছাওর গুহায় এসে আশ্রয় নিলেন। গুহার মুখে মাকড়সা জাল বুনে দিল। তারা উভয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু আবিরকিতকে নির্দিষ্ট মজুরির ভিত্তিতে পথ প্রদর্শক নিয়োগ করছিলেন। সে ছিল কুরাইশদের ধর্মাবলম্বী তাঁরা তার নিকট উট দুটোকে অর্পণ করেন। কোরাইশরা তাঁদেরকে তালাশ করলও চারদিকে লোক পাঠালো। এমনকি একটা দল অনেক দৌড়ঝাঁপ করে সাওর পর্বত গুহার ঠিক মুখের ওপর এসে পড়ল এবং সেখানে অবস্থান করতে লাগল। সহীহাইনে এসেছে যে, আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, তাদের কেউ যদি তাদের পায়ের নিচের দিক দিয়ে তাকায় তবে তারা তো আমাদেরকে দেখে ফেলবে। রাসূল ﷺ বললেন, আবু বাকর, যে দুজনের সঙ্গে তৃতীয়জন হিসেবে আল্লাহ আছেন তাদের ব্যাপারে তুমি কি চিন্তা করছ! ভয় করো না আমাদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন। নবী ﷺ ও আবু বকর (রা) তাদের কথপোকথন শুনছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ বিষয়ে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমির ইবনু ফুহাইরা মেষপাল নিয়ে সারাদিন গুহার আশপাশ দিয়ে চড়িয়ে বেড়াত এবং মক্কার লোকদের কথাবার্তা শুনত এবং রাসূল ﷺ ও আবু বকরকে সব বলে দিল। আবার ভোরে মেষপাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। তারা সে গুহায় তিন রাত্র অবস্থান করেন। কুরাইশদের তালাশের গতি যখন থেমে গেল। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উরাবকীত উটনী দুটো নিয়ে আসে। রাসূল ﷺ ও আবু বকর উটনীতে চড়ে রওয়ানা করেন। আমির ইবনু ফুহাইরাকে আবু বকর তার উটনীর পেছনে বসালেন। এদিকে কুরাইশরা পুনরায় তালাশে বের হলো। অতঃপর তারা যখন কুদাইদ এর বনী মুদলিজ গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। তখন তাদের একজন বলল যে, এই তো কিছুক্ষণ পূর্বে মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীকে সমুদ্রোপকূল দিয়ে যেতে দেখেছি। এ সংবাদ পাওয়ায় মাত্র সুরাকা ইবনু মালিক একটা বর্শা হাতে ঘোড়া হাঁকিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। সে যখন রাসূল ﷺ ও আবু বাকরের কাছাকাছি এসে পৌছল। তখন সে নবীজীর ﷺ তেলাওয়াত শুনতে পেল আবু বাকর এদিক সেদিক তাকাতে লাগলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ এদিক সেদিক তাকাচ্ছিলেন না। আবু বাকর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, সুরাকা আমাদের পিছু নিয়েছে। রাসূল ﷺ তাঁর জন্য বদ দু'আ করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তার ঘোড়ার সামনের দু'পা মাটিতে দেবে গেল। সুরাকা বলল, আমি জানি আমার এ দুরবস্থা তোমাদের বদ দু'আর করণেই হয়েছে। তোমরা আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ কর। রাসূল ﷺ তার জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর তার ঘোড়া তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে এলো। সে রাসূল ﷺ-এর নিকট একটি লিখিত নিরাপত্তানামাও চাইল। অতঃপর আবু বকর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে চামড়ায় একটি নিরাপত্তানামা লিখেন যা মক্কা বিজয়ের দিন পর্যন্ত সুরাকার সঙ্গে ছিল এবং তারা উভয়ে সুরাকাকে সুসংবাদ দিলেন। সুরাকা রাসূল ﷺ ও আবু বাকরকে তার পাথেয় হাদিয়া হিসেবে প্রদান করে। তারা উভয়ে বলেন, আমাদের এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তুমি আমাদের বিষয়টি গোপন রেখো। এরপর সুরাকা ফিরে আসে।

www.waytojannah.com

Contents

রাসূল ﷺ-এর মাদিনার উদ্দেশে গমন

এরপর রাসূল ﷺ মাদিনার উদ্দেশ্যে চলতে লাগলেন। পথিমধ্যে উম্মু মা'বাদ আল খুযাইয়্যাহ এর তাঁবুর নিকট দিয়ে অতিবাহিত হলেন এবং তার নিকট খাবারের কিছু আছে কি না জানতে চাইলে সে বলল আমার অভাবগ্রস্ত ছাগলটি একা, আর বছরটিও দুর্ভিক্ষের। এরপর রাসূল ﷺ তাঁবুর ছিদ্র দিয়ে ছাগলটিকে দেখলেন। রাসূল ﷺ বললেন, উম্মু মা'বাদ ছাগলটির কী সমস্যা? উম্মু মা'বাদ বলল, দুর্ভিক্ষের কারণে এর জন্য কোন খাবারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। এরপর রাসূল ﷺ বললেন ছাগলটি কি দুধ দেয়? উম্মু মা'বাদ বলল, এটা আরো অসম্ভব। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কি আমাকে ছাগলটির দুধ দোহনের অনুমতি দিবে? সে বলল, আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কোরবান হোক অবশ্যই দিব। দুধ থাকলে দোহন করে নিন। অতঃপর রাসূল ﷺ তার হাত দিয়ে ছাগলের ওলানে স্পর্শ করে 'বিসমিল্লাহ' পড়ে দু'আ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছাগলের ওলান দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর রাসূল ﷺ লোকদেরকে পান করানোর জন্য উম্মু মা'বাদের পাত্রটি আনতে বলেন। এরপর রাসূল ﷺ দুধ দোহন শুরু করলেন। এমনকি দুধ থেকে ফেনা বের হতে লাগল। তা সকলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান করল। এরপর রাসূল ﷺ পান করলেন। পাত্র ভরে গেল, এরপর তারা চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরই উম্মু মা'বাদের স্বামী আবু মা'বাদ কয়েকটি জীর্ণশীর্ণ মেষপাল হাঁকাতে হাঁকাতে বাড়িতে ফিরল। সে ছাগলের দুধ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। তার স্ত্রীকে বলল বাড়িতে দুধ দেয়ার কোন ছাগল নেই তুমি এ দুধ পেলে কোথায়? উম্মু মা'বাদ বলল, আল্লাহর কসম আমাদের নিকট দিয়ে একজন বরকতময় লোক অতিক্রম করেছে যার কথাবার্তা এমন। আবু মা'বাদ বলল, আল্লাহর শপথ আমার মনে হয় সে ঐ ব্যক্তি যাকে কুরাইশরা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা করেছি। সম্ভব হলে আমি অবশ্যই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। তখন মক্কার আকাশে একটি কবিতা শুনা যাচ্ছিল কিন্তু কবিকে দেখা যাচ্ছিল না–

جزى الله رب العرس خير جزائه ◉ رفيقين حلا خيمتى أم معبد

আরশের প্রভু আল্লাহ দুই বন্ধুকে উত্তম প্রতিদান করুক তারা উম্মু ম'বাদের তাঁবুতে অবস্থান করেছে।

هما نزلا بالبر وارتحلا به ◉ وأفلح من أمسى رفيق محمد

তারা উভয় কল্যাণ নিয়ে সেখানে অবতরণ করেছেন, এবং কল্যাণ নিয়েই ফিরে গেছেন। যে মুহাম্মদের সঙ্গী হয়ে সন্ধ্যা করে সে সফলকাম হয়ে গেছে।

فيا لقصى ما زوى الله عنكم ◉ به من فعال لا يجازى وسودد

হে কুসাই গোত্রের লোকেরা, তার কারণে তিনি তোমাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তার প্রতিদান প্রদান অসম্ভব।

ليهن بنى كعب مكان فتاتهم ◉ ومقعدها للمؤمنين بمرصد

বনু কা'বদেরকে তাদের মেয়ের বাসস্থান অপমানিত করুক। আর এ মেয়ের বসবাসের জায়গা হলো মু'মিনদের ঘাঁটি।

سلوا أختكم عن شاتها وإنائها ◉ فإنكم إن تسألوا الشاء تشهد

তোমরা তোমাদের মেয়েকে তার ছাগল ও পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো কেননা তোমরা যদি ছাগলদের জিজ্ঞেস করে তবে তারাও সাক্ষ্য দেবে।

www.waytojannah.com

Contents

রাসূল ﷺ ও তাঁর সঙ্গীর মাদীনায় গমন

মক্কা থেকে রাসূল ﷺ-এর হিজরতের খবর আনসারদের নিকট পৌঁছেছিল। তাই তারা প্রতিদিন দিনের প্রথমাংশে 'হাররা'-তে গিয়ে রাসূল ﷺ-এর জন্য অপেক্ষা করত। আর সূর্যের তাপ প্রখর হলে তাদের পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী ঘরে ফিরে আসত। অতঃপর নবুওতের ত্রয়োদশ বছরের ১২ রবীউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন তারা পূর্বের ন্যায় 'হাররা'য় গমন করে এবং ফিরে আসে। জনৈক ইহুদী কোন প্রয়োজনে মদিনার এক দুর্গে উঠলে রাসূল ﷺ এবং তার সঙ্গীকে আগমন করতে দেখে সে চিৎকার দিয়ে বলল, হে বানী কাইলা, তোমাদের নবী এসে গেছে। এই তো তিনি যার অপেক্ষায় তোমরা ছিল। আর যায় কোথায়! সমগ্রস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে ফেটে পড়ল। লোকেরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটল। অধিকাংশ আনসার সশস্ত্র হয়ে বেরুল। আর তখন তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হলো–

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ.

"তবে নিশ্চয়ই জেনে রাখো আল্লাহ, জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তার সহায়। উপরন্তু ফেরেশতাগণও তার সাহায্যকারী।" (সূরা: আত্তাহরীম: ৪)

এরপর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তিনি কুবাতে বনী আমর ইবনু আউফের বাড়িতে গিয়ে অবস্থান করেন। কারও মতে কুলছুম ইবনুল হিদাম এর বাড়িতে আবার কারও মতে সা'দ ইবনু খাইসামার বাড়িতে অবস্থান করেন। তবে প্রথমটিই সহীহ। এখানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। নিজ হাতে মাসজিদে কু'বার ভিত্তি স্থাপন করেন। নবুওতের পর এ মসজিদই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর শুক্রবারে উটে উঠে আবার যাত্রা করেন। বনী সালেম ইবনু আউফের নিকট পৌঁছলে জুমু'আর নামাযের সময় হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সকলকে নিয়ে উপত্যকার নিকটবর্তী মসজিদে জুমু'আ আদায় করেন। নামাযান্তে উটে আরোহন করে চলতে থাকেন। সকলে উটের লাগাম ধরতে চাইলে তিনি বলেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দাও সে আল্লাহর নির্দেশ প্রাপ্ত। সকলেই চাচ্ছিল রাসূল ﷺ তাঁর গৃহে অবস্থান করুক। আবু আইয়ুব আল-আনসারী রাসূল ﷺ-এর মালপত্র তার ঘরে নিয়ে গেল। সাময়িক অবস্থান হিসেবে রাসূল ﷺ তাঁর বাড়িকে বেছে নিলেন। আসআদ ইবনু যুরারাহ এসে রাসূল ﷺ-এর উটকে নিয়ে গেল। আনাস আবু কাইস ছিরমা আল-আনসারী থেকে একটি কবিতা বর্ণনা করেছেন। কবিতা–

ثوى فى قريش بضع عشرة حجة ۞ يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا

তিনি কুরাইশদের মাঝে ১৩ বছর অবস্থান করেছেন। একজন সমমনা বন্ধুর খোঁজে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

ويعرض فى أهل المواسم نفسه ۞ فلم ير من يؤوى ولم ير داعيا

বিভিন্ন মওসুমে নিজেকে তাদের সম্মুখে পেশ করেছেন। কিন্তু কোন আশ্রয়দাতা পাননি এবং তার ডাকে কেউ সাড়াও দেয়নি।

فلما أتانا واستقرت به النوى ۞ وأصبح مسرورا بطيبة راضيا

অতঃপর তিনি যখন আমাদের এখানে আসলেন এবং অবস্থান শুরু করলেন এবং তখন তিনি আনন্দে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাতে থাকেন।

www.waytojannah.com

Contents

وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم ۞ بعيد ولا يخشى من الناس باغيا

এখানে অত্যাচারীর অত্যাচারের থেকে নিরাপদ ও শত্রু থেকে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত পরিবেশে বসবাস করতে থাকেন।

بذلنا له الأموال من حل مالنا ۞ وأنفسنا عند الوغى والتآسيا

তার জন্য আমরা আমাদের হালাল সম্পদ ব্যয় করেছি উৎসর্গ করেছি যুদ্ধের সময় নিজেদেরকে।

نعادى الذى عادى من الناس كلهم ۞ جميعا وإن كان الحبيب المصافيا

তিনি যার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করেছেন আমরাও তাদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করি। যদিও তারা আমাদের নিকটাত্মীয় হোক না কেন।

ونعلم أن الله لا رب غيره ۞ وأن كتاب الله اصبح هاديا

এবং আমরা মনে করি আল্লাহ ছাড়া আমাদের আর কোনো রব নেই এবং নিশ্চয়ই তার কিতাব পথ প্রদর্শনকারী।

মাসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গ

যুহরী বলেন, রাসূল ﷺ-এর উটনি মসজিদে নববীর স্থানে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। এ স্থানটি ছিল আনসারী দু'জন এতীম শিশু সাহল ও সুহাইলের উট বাঁধার স্থান। রাসূল ﷺ সঙ্গে মসজিদে নববী নির্মাণের উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে স্থানটির দামাদামি করলেন। তারা স্থানটি বিনামূল্যে দিতে চাইলে রাসূল ﷺ তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এবং পরে তাদের থেকে মূল্য দিয়ে স্থানটি ক্রয় করলেন। স্থানটির চারদিকে ছিল দেয়াল, উপরে কোন ছাদ ছিল না। এর কিবলা ছিল বাইতুল মাকদিসের দিকে। রাসূল ﷺ-এর ﷺ আগমনের পূর্বে আসাদ ইবনু যুরারা সেখানে নামায ও জুমার ইমামতি করত। সেখানে ছিল খেজুরের গাছ, গারকাদ বৃক্ষ এবং মুশরিকদের কবর। রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে কবর খুঁড়ে তাদের লাশ বের করা হয়। উঁচু নিচু স্থানগুলোকে সমান করা হয়। খেজুর গাছ ও গারকাদ বৃক্ষকে কেটে মাসজিদের কেবলায় সারিবদ্ধ করে রাখা হয়। মসজিদের দৈর্ঘ্য কেবলার দিক থেকে শেষ পর্যন্ত ১০০ গজ এবং উভয় পার্শ্ব এর সমপরিমাণ বা এর চেয়ে কম প্রশস্ত করা হয়। এর ভিত্তি প্রায় তিন গজ পরিমাণ করা হয়। এরপর কাঁচা ইট দিয়ে তা নির্মাণ করা হয়। রাসূল ﷺ ও তাদের সঙ্গে নির্মাণে অংশ নেন এবং তিনি নিজে ইট ও পাথর স্থানান্তর করতেন। এ সময় আওয়াজ তুলে বলতেন–

اللهم لا عيش إلا عيش الآخره ۞ فاغفر للأنصار والمهاجره

"আখেরাতের সুখই প্রকৃত সুখ। তা না হলে জীবন নিরর্থক। হে আল্লাহ, আপনি আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।"

আরো বলতেন–

هذا الحمال لا حمال خيبر ۞ هذا أبر ربنا وأطهر

এ বোঝা খাইবারের বোঝার মতো নয়। হে আমাদের প্রতিপালক, এটা অধিক পবিত্র। কাজের ব্যস্ত তার ফাঁকে কোন বাজে কথাবার্তার বালাই ছিল না। বরং রাসূল ﷺসহ সকলেই একযোগে এ কবিতা আবৃতি করছিল। এ দৃশ্য দেখে জনৈক সাহাবী আবেগাপ্লুত হয়ে বলে উঠলেন–

www.waytojannah.com

Contents

لئن قعدنا والرسول يعمل ﴿ لذاك منا العمل المضلل

"আল্লাহর নবী যদি এ কাজে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেন, আর আমরা বসে বসে দেখতে থাকি, তাহলে আমাদের সমস্ত সৎ কাজ বাতিল হয়ে যাবে।" রাসূল ﷺ মসজিদের কেবলা বানালেন বাইতুল মাকদিসকে এবং তিনটি দরজা নির্মাণ করেন। একটি পেছনের দিকে দ্বিতীয়টি বাবে রাহমাতের দিকে। আরেকটি দরজা নির্মাণ করেন রাসূল ﷺ-এর মসজিদে প্রবেশের জন্য। মাসজিদের খুঁটি বানানো হয় খেজুর ডালপালা এবং শাখা দিয়ে। ছাদ বানানো হয় খেজুরের গাছের ডাল দিয়ে। রাসূল ﷺকে বলা হলো, ছাদ নির্মাণ করবেন না? উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, মূসার চালাঘরের ন্যায় আমি চালাঘর নির্মাণ করব না। মসজিদের পাশে বিবিদের জন্য কাঁচা ইট দিয়ে একটি হুজরা নির্মাণ করেন। আর এসবের ছাদ বানান লতাপাতা ও খেজুরের ডাল দিয়ে। এরপর মসজিদের সামনের দিক থেকে পূর্ব দিকে আয়িশার জন্য যে হুজরা নির্মাণ করেন তাতে আয়িশাকে নতুন বধু হিসেবে ঘরে তুলেন। বর্তমানে সেটি রাসূল ﷺ-এর হুজরার অন্তর্ভুক্ত এবং সাওদা বিনতে যাম'আর জন্যও তিনি আরেকটি ঘর নির্মাণ করেন।

আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন

এরপর রাসূল ﷺ আনাস ইবনু মালিকের ঘরে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। তাদের সংখ্যা ছিল ৯০ জন। এর অর্ধেক ছিল মুহাজির এবং বাকি অর্ধেক ছিল আনসার। তিনি সমবেদনা ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। তারা পরস্পরে একে অন্যের মৃত্যুর পর সম্পদের উত্তরাধিকার হত। অতঃপর যখন وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ আয়াটি অবতীর্ণ হয় তখন উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদের মালিক হওয়া শুধু নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে খাস করে দেয়া হয়। বলা হয়, তিনি মুহাজিরীনদের পরস্পরকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন।

তিনি আলীকে নিজের ভাই হিসেবে গ্রহণ করেন। এ মতটি সঠিক নয় কারণ মুহাজিরীনদের পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের কোন প্রয়োজন ছিল না। আর যদি হতই তবে রাসূল ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হিজরতও গুহার সঙ্গী, সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী আবু বাকরকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করতেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন– "পৃথিবীর কাউকে আমি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলে আবু বাকরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামের ভ্রাতৃত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ।"

অন্যত্র "আমার ভাই ও সঙ্গী" শব্দ এসেছে।

তাছাড়া রাসূল ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন– "আমি আমার ভাইদেরকে যদি দেখতে পেতাম! সাহাবীগণ বললেন, "আমরা কি আপনার ভাই নই?"

রাসূল ﷺ বললেন, "তোমরা আমার সাহাবী। আর আমার ভাই হলো তারা যারা এখনও আগমন করেনি এবং তারা আমাকে না দেখে আমার উপর ঈমান আনবে।" সুতরাং বুঝা গেল এ ভ্রাতৃত্বের দিকে লক্ষ করলে সিদ্দিক (রা) সর্বশ্রেষ্ঠ।

আব্দুল্লাহ ইবনুস সালামের ইসলাম গ্রহণ

মাদীনার ইহুদীদের সঙ্গে রাসূল ﷺ সন্ধি করেন এবং তাঁর ও ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর ইহুদীদের আলিম ও পণ্ডিত আব্দুল্লাহ ইবনুস সালাম ইসলাম গ্রহণ করেন। আর বাকিরা রাসূল

www.waytojannah.com

ﷺকে অস্বীকার করল। ইহুদীরা তিনটি দলে বিভক্ত ছিল: বনু কাইনুকা, বনু নাযির এবং বনু কুরাইযা। এ তিন দলই রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অতঃপর তিনি বনু কাইনুকা গোত্রের উপর অনুগ্রহ করে তাদেরকে ছেড়ে দেন, বনু নাযীর গোত্রকে উচ্ছেদ করেন, আর বনু কুরাইযা গোত্রের লোকদেরকে হত্যা করেন এবং তাদের সন্তানদেরকে বন্দী করেন। বনী নাযীর সম্পর্কে সূরা হাশর এবং বনী কুরাইযা সম্পর্কে সূরা আহযাব অবতীর্ণ হয়।

জিহাদের প্রকারভেদ

জিহাদ সর্বমোট ৪ (চার) প্রকার: নফসের সঙ্গে জিহাদ, শয়তানের সঙ্গে জিহাদ, কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ এবং মুনাফিকদের সঙ্গে জিহাদ।

নামের সঙ্গে জিহাদ চার প্রকার:

১. হেদায়াত ও দীনে হক শিক্ষায় নফসের সঙ্গে জিহাদ করা।

২. জানার পর সে অনুযায়ী আমল করার জন্য নফসের সঙ্গে জিহাদ করা। কেননা আমলবিহীন এলম মূল্যহীন।

৩. সে আমলের দিকে মানুষকে আহ্বানের ব্যাপারে নফসের সঙ্গে জিহাদ করা। যে জানেনা তাকে শিক্ষা দেয়া। অন্যথায় তাদের দলভুক্ত হতে হবে যারা জ্ঞান গোপন রাখত। আর এমনটি করলে জ্ঞান জ্ঞানীর কোন উপকারে আসবে না এবং আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষাও করবে না।

৪. আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে গিয়ে যে কষ্টের সম্মুখীন হবে তাতেও ধৈর্য ধরে নফসের সঙ্গে জিহাদ করা। এসব কিছুই করবে আল্লাহর জন্য।

শয়তানের সঙ্গে জিহাদ প্রসঙ্গ

শয়তানের সঙ্গে জিহাদ দু' প্রকার:

১. শয়তান মানুষের মাঝে ঈমান বিধ্বংসী যে সন্দেহ সৃষ্টি করে তা প্রতিহত করতে জিহাদ করা।

২. শয়তান মানুষের মাঝে যেসব কুকর্ম ও প্রবৃত্তির প্রেরণা জোগায় তা প্রতিহত করতে জিহাদ করা।

প্রথম প্রকারের জিহাদের পর ইয়াকীন সৃষ্টি হয়। এবং দ্বিতীয় প্রকারের জিহাদের পর সবর তাওফীক হয়।

মুনাফিক ও কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ প্রসঙ্গে

এ প্রকারের জিহাদ সর্বমোট ৪ (চার) প্রকার:

১. অন্তরের মাধ্যমে;

২. মুখের মাধ্যমে

৩. অর্থের মাধ্যমে এবং

৪. জানের মাধ্যমে।

কাফেরদের সঙ্গে জিহাদের বিষয়টি হাতের সঙ্গে খাস আর মুনাফিকদের সঙ্গে জিহাদের বিষয়টি মুখের সঙ্গে।

www.waytojannah.com

Contents

অত্যাচারী ও বিদ'আতীদের সঙ্গে জিহাদ প্রসঙ্গ

এ ধরনের জিহাদ তিন প্রকার: সক্ষম হলে হাতের দ্বারা প্রতিহত করা। আর এটা সম্ভব না হলে মুখের মাধ্যমে প্রতিহত করা আর এটাও সম্ভব না হলে অন্তর দ্বারা প্রতিহত করা (ঘৃণা করা)।

এ হলো সর্বমোট তের প্রকার জিহাদ। আর হাদীসে এসেছে, যে যুদ্ধ না করে মারা গেল; আর সে মনে মনে কখনো জিহাদের ইচ্ছাও করল না তবে সে মুনাফিক অবস্থায় মারা গেল।

শহীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে

রাসূল ﷺ বলেছেন–

والذى نفسى بيده لا يكلم أحد فى سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم فى سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك.

ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহর রাস্তায় যে রক্তাক্ত হবে আল্লাহ ভালো করেই জানেন যে, কে তার রাস্তায় রক্তাক্ত হবে সে কিয়ামতের দিনে লাল রঙের এবং মেশকের সুগন্ধি নিয়ে উপস্থিত হবে।"

তিরমিযীতে এসেছে রাসূল ﷺ বলেছেন–

ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين، قطرة دمعة من خشية الله، وقطرة دم تهراق فى سبيل الله، وأما الأثران، فأثر فى سبيل الله، وأثر فى فريضة من فرائض الله.

"আল্লাহর নিকট দু'ফোঁটার চেয়ে সর্বাধিক প্রিয় অন্য কিছু নেই। একটি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীর চোখের পানির ফোঁটা এবং অন্যটি আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত রক্তের ফোঁটা। একটি আল্লাহর রাস্তার আছর আর অপরটি আল্লাহর ফরজ বিধানসমূহের একটি।"

রাসূল ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন–

ما من عبد يموت، له عند الله خير لا يسره أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها، إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا، فيقتل مرة أخرى. وفى لفظ: فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة.

"যে বান্দাই মৃত্যুবরণ করে আল্লাহর নিকট সে এমন উত্তম প্রতিদান পায় যে তার কারণে সে আর দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করতে চায় না। তাকে দুনিয়া এবং এর মধ্যকার সকল বস্তু প্রদান করা হয়। তবে শহীদ ব্যতীত শহীদের মর্যাদার কারণে। কেননা সে দুনিয়াতে পুনরায় ফিরে আসতে পছন্দ করবে এবং পুনরায় শহীদ হতে চাইবে।"

রাসূল ﷺ উম্মু হারিসা বিনতু নুমান যার সন্তান বদরে শহীদ হয়েছিল, (তার সন্তান) সে এখন কোথায় আছে? এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে, সে এখন জান্নাতুল ফিরদাউসে আছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন–

www.waytojannah.com

إن أرواح الشهداء فى جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوى إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا فقالوا، أى شيء نشتهى، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل بهم ذلك ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى، فلما رأى ليس لهم حاجة تركوا.

"শহীদের রূহসমূহ সবুজ বর্ণের পাখির প্রতিকৃতির মধ্যে রক্ষিত। তাদের জন্য আল্লাহর আরশের নিচে ফানুস ঝুলিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে বিচরণ করে এবং জান্নাতের নেয়ামত উপভোগ করে এবং পরে আবার ঐ সমস্ত ফানুসের দিকে ফিরে আসে। অতঃপর তাদের রব তাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি করে তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কোন জিনিসের আকাঙ্ক্ষা আছে কি? উত্তরে তারা বলে, আমরা আর কি জিনিসেরই-বা আকাঙ্ক্ষা করব? অথচ আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে বিচরণ করছি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করবেন। যখন তারা দেখে যে, বারবার তাদেরকে একই কথা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তখন তারা বলে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা চাচ্ছি যে, আমাদের রূহসমূহকে পুনরায় আমাদের দেহের ভেতরে ফিরিয়ে দেওয়া হোক, যেন আমরা পুনরায় আপনার রাস্তায় জিহাদ করে আবার শাহাদাত লাভ করতে পারি। অতঃপর আল্লাহ যখন দেখেন যে, তাদের কোন জিনিসের আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন নেই, তখন তাদের সাথে এই প্রসঙ্গ ত্যাগ করেন।"

রাসূল ﷺ বলেছেন–

إن للشهيد عند الله خصالا أن يغفر له من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع فى سبعين إنسانا من أقاربه.

"আল্লাহর নিকট শহীদের অনেক মর্যাদা রয়েছে তার রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়ার পূর্বে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, জান্নাতে তার স্থান দেখানো হয়, তাকে ঈমানের অলঙ্কারে শোভিত করা হয়। তাকে আয়তনয়না হুরের সঙ্গে বিবাহ দেয়া হয়, কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়া হয়। কেয়ামতের কঠিন অবস্থা থেকে নিরাপদে রাখা হয় এবং তাকে মর্যাদার মুকুট পরানো হয়। সেই মুকুটে একটি নীলকান্তমণি হবে যা দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবকিছুর চেয়ে মূল্যবান। অধিক ৭২ জন ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট আয়তনয়না হুরের সঙ্গে তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়া হয় এবং সে তার নিকটাত্মীয় মধ্য হতে ৭০ জনকে সুপারিশ করতে পারবে।"

রাসূল ﷺ জাবিরকে বললেন–

ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى، قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدى تمن على أعطك، قال: يا رب تحيينى فأقتل فيك ثانية، قال: إنه سبق منى أنهم إليها لا يرجعون قال: يا رب فأبلغ من ورائى، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

www.waytojannah.com

Contents

"আল্লাহ তোমার পিতাকে কী বলেছেন আমি কি সে সম্পর্কে তোমাকে অবগত করব না? জাবির বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই। আল্লাহ পর্দার আড়াল বতীত করো সঙ্গে কথা বলেন নি তবে তোমার বাবার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন। আল্লাহ (তোমার পিতাকে) বলেছেন, হে আমার বান্দা! তুমি আমার নিকট কোন নিয়ামত চাও আমি তোমাকে তা দেব। (তোমার পিতা) বলল, হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে নতুন জীবন দান করুন আমি দ্বিতীয়বার পুনরায় আপনার রাস্তায় শহীদ হব। আল্লাহ বললেন, আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত যে তারা আর সেখানে ফিরে যাবে না। (তোমার পিতা) বলল, হে আমার প্রভু, আপনি এ সংবাদ আমার পরবর্তীদেরকে শুনিয়ে দিন।

অতঃপর আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন–

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً.

"এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে তোমরা তাদের মৃত ধারণা করো না।" (আলে-ইমরান: ১৬৯)

রাসূল ﷺ বলেছেন–

لما أصيب إخوانكم، بأحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم، قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا فى الجهاد، ولا ينكلوا عن الحرب، فقال الله: أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله على رسوله هذه الآيات.

"তোমাদের ভাইয়েরা যখন উহুদের যুদ্ধে শহীদ হলো আল্লাহ তখন তাদের আত্মাসমূহকে সবুজ বর্ণের পাখির প্রতিকৃতির মধ্যে সংরক্ষণ করেন। ঐ আত্মাগুলো জান্নাতের ঝরনাসমূহে বিচরণ করে জান্নাতের ফল খায় এবং আরশের নিচে স্বর্ণের ফানুসের নিচে আশ্রয় নেয়। তারা যখন তাদের খাবার এবং পানীয়ের ঘ্রাণ পায় তখন বলে উঠে, হায়! আমাদের ভাইয়েরা যদি জানত যে আল্লাহ আমাদের জন্য কী প্রস্তুত করে করেছেন তবে তারা জিহাদের ক্ষেত্রে পিছু হটত না এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকত না। অতঃপর আল্লাহ বলেন, তোমাদের পক্ষ থেকে আমি তাদেরকে পৌছে দিব।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-এর উপর এ আয়াতটি অবতীর্ণ করে–

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً.

"যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত ধারণা কর না।"

الشهداء على بارق نهر بباب الجنة، فى قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية.

মুসনাদে মারফূ সূত্রে বর্ণিত, শহীদরা জান্নাতের দরজার নিকটস্থ ঝরনার দীপ্তির উপর সবুজ মিনারে অবস্থান করবে। সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাত হতে তোমাদের নিকট খাবার আসবে।

রাসূল ﷺ বলেন–

لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه، كأنهما طيران أضلتا فصيليهما ببراح من الأرض يبلـ كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها.

www.waytojannah.com

"শহীদের রক্ত মাটিতে শুকানোর পূর্বেই তার নিকট দু'জন স্ত্রী আগমন করে এমন দুটি পাখির ন্যায় যারা তাদের দুধের শিশুকে পৃথিবীর শূন্য প্রান্তরে হারিয়ে ফেলেছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে এক সেট পোশাক থাকবে যা দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"

মুস্তাদরাকে এবং নাসাঈতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত–

لأن أقتل فى سبيل الله أحب إلى من أن يكون لى أهل المدر والوبر.

"আল্লাহর রাস্তায় আমি শাহাদাতবরণ করি, এটা আমার নিকট এর চেয়ে অধিক প্রিয় যে, সমস্ত গ্রাম ও নগরবাসী আমার অধীন হয়ে যাক।"

উক্ত কিতাব দু'টিতে আরো বর্ণিত হয়েছে–

ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة.

"শহীদ ব্যক্তি তার নিহত হওয়ার সময় পিপীলিকার কামড়ের ন্যায় ব্যথা ব্যতীত অন্য কোন যন্ত্রণা অনুভব করে না।"

সুনানে এসেছে যে–

يشفع الشهيد فى سبعين من أهل بيته.

"একজন শহীদ তার পরিবারের ৭০ জন ব্যক্তির সুপারিশ করতে পারবে।"

মুসনাদে এসেছে–

أفضل الشهداء الذين إن يلقوا فى الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون فى الغرف العلى من الجنة، ويضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى عبد فى الدنيا، فلا حساب عليه.

সর্বোত্তম শহীদ হলো ঐ ব্যক্তি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের কাতারে যার সাক্ষাৎ হলে সে এদিক সেদিক না তাকিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়। তারাই জান্নাতের সুউচ্চ রুমে অবস্থান করবে আল্লাহ তাদের দেখে হাসবেন। আর আল্লাহ যখন দুনিয়াতে কোন বান্দাকে দেখে হাসেন তবে তার কোন হিসাব হবে না।

সেখানে আরো এসেছে–

الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدو، فصدق الله حتى قتل، فذلك الذى يرفع إليه الناس أعناقهم. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وقعت قلنسوته، ورجل مؤمن جيد الإيمان، لقى العمدو فكأنما يضرب جلده بشوك الطلح أتاه سهم غرب، فقتله، هو فى الدرجة الثانية، ورجل مؤمن جيد الإيمان، خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقى العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك فى الدرجة الثالثة، ورجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقى العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك فى الدرجة الرابعة.

অর্থ: শহীদ চার প্রকারের (লোক) হয়।

ক. এমন ব্যক্তি যে পরিপূর্ণ ঈমানদার, সে শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধে রত হয়ে আল্লাহর প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছে, শেষ নাগাদ নিজে শহীদ হয়ে গেছে। এই ব্যক্তি এমন এক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে, যার দিকে কিয়ামাতের দিন লোকেরা এভাবে চক্ষু তুলে তাকাবে এবং (একথা বলে) রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা খুব উপরের দিকে উঠালেন যে, মাথা হতে টুপিটি নিচে পড়ে গেল।

www.waytojannah.com

খ. ঐ ব্যক্তি, যে পাক্কা ঈমানদার বটে; কিন্তু শত্রুর সম্মুখীন হয় এমন অবস্থায় যে, ভীরুতার দরুন সে ধারণা করতে থাকে, যেন তার শরীরে কণ্টক বৃক্ষের কাঁটা বিঁধছে। এমন সময় হঠাৎ একটি তীর এসে তাকে ঘায়েল করে দিল, আর অমনিই সে শহীদ হয়ে গেল। এই ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণীর শহীদ।

গ. এমন মু'মিন, যে ভাল-মন্দ উভয় প্রকারের কাজে লিপ্ত ছিল, পরে জিহাদে অংশগ্রহণ করে আল্লাহর প্রতিজ্ঞাকে সত্যে পরিণত করল অর্থাৎ মনে-প্রাণে লড়াই করল। অবশেষে নিজেই শহীদ হয়ে গেল। এই ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণীর শহীদ।

ঘ. এমন ব্যক্তি যে, মু'মিন বটে তবে সে নিজের উপর সীমাহীন অনাচার করেছে। অতঃপর জিহাদে শরীক হয়ে আল্লাহর ওয়াদাকে সত্যে প্রমাণিত করেছে। শেষ নাগাদে সে নিজে শহীদ হয়ে গেছে। এই লোক চতুর্থ শ্রেণীর শহীদ।

মুসনাদ এবং সহীহ ইবনু হিব্বানে এসেছে–

القتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بماله ونفسه فى سبيل الله حتى إذا لقى العدو قاتلهم حتى يقتل، فذاك الشهيد الممتحن فى خيمة الله تحت عرشه، لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة، ورجل مؤمن فرق على نفسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله حتى إذا لقى العدو، قاتل حتى يقتل، فتلك ممصمصة محت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء الخطايا، وأدل من أى أبواب الجنة شاء، فإن لها ثمانية أبواب، ولجهنم سبعة أبواب، وبعضها أفضل من بعض، ورجل منافق جاهد بنفسه وماله، حتى إذا لقى العدو، قاتل فى سبيل الله حتى يقتل، فإن ذلك فى النار، إن السف لا يمحو النفاق.

শহীদ তিন প্রকার–

১. এমন মু'মিন ব্যক্তি যে, তার জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে শহীদ হয়ে গেছে। আর এ প্রকারের শহীদ আল্লাহর আরশের নিচে তাঁর তাঁবুতে অবস্থান করবে। তার এবং নবীদের মাঝে শুধু একটি মর্যাদার ব্যবধান হবে।

২. এমন মুমিন ব্যক্তি যে গোনাহ করেছে এবং তার জান এবং মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে অবশেষে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছে। এ জিহাদ তার সকল গোনাহসমূহকে মোচন করে দিবে। নিশ্চয়ই তরবারি গোনাহ মোচনকারী এবং সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। জান্নাতের ৮টি দরজা। আর জাহান্নামের ৭টি। একটি দরজা অপরটির তুলনায় ভালো।

৩. এমন মুনাফিক ব্যক্তি যে তার জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে। সে জাহান্নামী। কারণ তরবারি কপটতাকে মোচন করে না।

রাসূল ﷺ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, "কাফের এবং তার হত্যাকারী কখনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না।"

www.waytojannah.com

Contents

রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "সর্বোত্তম জিহাদ কোনটি?"

তিনি বললেন, "যে মুশরিকদের সঙ্গে নিজের জানমাল দিয়ে যুদ্ধ করে।"

প্রশ্ন করা হলো, "সর্বোত্তম শহীদ কী?"

উত্তরে তিনি বলেন, "আল্লাহর রাস্তায় যার রক্ত প্রবাহিত করা হয় এবং গর্দান কাটা হয়।"

সুনানে ইবনু মাজায় এসেছে যে, "অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে সত্য কথা বলা হলো, সর্বোত্তম জিহাদ।"

রাসূল ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত, "আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর থেকে জিহাদ করবে। কিয়ামত পর্যন্ত অপমানকারীদের অপমান এবং বিরোধীদের বিরোধিতা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অন্য শব্দে বর্ণিত হয়েছে যে, যতক্ষণ তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি দাজ্জালকে হত্যা না করবে।"

জিহাদের অবশ্য কর্তব্যতা

জিহাদে নফস্ এবং জিহাদে শায়তান ফরযে আইন অর্থাৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ এবং শায়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রত্যেকের উপর ব্যক্তিগতভাবে ফরয- অবশ্য পালনীয়। কোন ব্যক্তিই এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়- প্রত্যেককেই এ দ্বিবিধ জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে হবে, আর কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ- কোন সময় ফরযে আইন আর কোন সময় ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ প্রয়োজন মত লোক যদি এ জিহাদে সংগৃহীত হয়ে যায়- তাহলে অবশিষ্ট মুসলিমগণ অব্যাহতি লাভ করবে, তখন তাদের জন্য এ জিহাদ অবশ্য কর্তব্যরূপে বিবেচিত হবে না। কিন্তু এ অবস্থা যদি দেখা না যায়, সকলেই যদি অব্যাহতি লাভ করতে চায় তবে সে অবস্থায় সকলের উপরেই উক্ত জিহাদ অবশ্য কর্তব্য হয়ে উঠবে আর কর্তব্যে অবহেলার জন্য প্রত্যেককে দায়ী হতে হবে।

পূর্ণতম মানব

আল্লাহর নিকট পূর্ণ মানব হচ্ছে সে ব্যক্তি- যিনি জিহাদের উপর্যুক্ত সব প্রকরণ এবং সকল পর্যায় উত্তরণে সক্ষম। আবার পূর্ণতার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। কেউ হচ্ছেন সাধারণভাবে পূর্ণ মানব, কেউ পূর্ণতর আর কেউ পূর্ণতম। রাসূলে আকরাম ﷺ জিহাদের সব স্তর সব পর্যায় এবং সব প্রকরণে উচ্চতম মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

সেজন্যই তিনি আল্লাহর দৃষ্টিতে জগতের সব যুগের ও সব দেশের সকল মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং মহোত্তম। তিনি নবুওয়াত লাভের পর মুহূর্ত থেকে মহা-প্রস্থানের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে গেছেন সকল ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় পরিপূর্ণভাবে। আর সেজন্যই তিনি মানব সমাজের মহোত্তম আদর্শ।

জিহাদের বাস্তব রূপ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন জিহাদের সব প্রকরণের মূর্তিমান সত্তা। তাই আমরা দেখতে পাই যখনই আল্লাহর তরফ থেকে ডাক এল-

www.waytojannah.com

Contents

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ – قُمْ فَأَنْذِرْ – وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ.

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত উঠ এবং (মানব সমাজকে) সতর্ক কর এবং স্বীয় প্রভুর মহত্ব ঘোষণা কর..... ।" (সূরা মুদ্দাস্সির- ১-৩)

তখনই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং লোক সমাজে সত্যের বাণী প্রচার শুরু করে দিলেন। তিনি প্রথমে সত্যের প্রতি আহ্বান জানালেন। কিন্তু যেই মাত্র হুকুম হল,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ.

"তোমার প্রতি যে আদেশ দেয়া হয় তুমি তা প্রকাশ্যে ঘোষণা কর এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর।" (সূরা হিজর- ৯৪)

তখন তখনই তিনি প্রকাশ্যে সত্যের দা'ওয়াত জানাতে শুরু করলেন; দিবসের আলোকে এবং রাত্রির অন্ধকারে সত্য প্রচারে ব্রতী হলেন- এক দিনের তরেও থামলেন না, কোন বাধাতেই দমলেন না।

কাফিররা যখন দেখতে পেল যে, তাদের বাপ-দাদার দীন-ধর্ম নিন্দার বিষয়ে পরিণত হচ্ছে, তখন তাদের অন্তরে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল, তারা রাগে ও গোস্বায় উত্তেজিত হয়ে উঠল। যুক্তি দ্বারা মুকাবেলার পরিবর্তে তারা শক্তি প্রয়োগে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি কঠিন থেকে কঠিনতর কষ্ট দিয়ে চলল। এ অবস্থায় আল্লাহ তাঁর নাবী ﷺ-কে এ বলে সান্ত্বনা দিলেন যে, এ ব্যাপারে ভীত এবং নিরাশ হবার কিছুই নেই। অতীতে সব পয়গম্বরদের সঙ্গে এ একই রূপ ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের পরিবাহিত সত্যকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ মহানাবী ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললেন:

مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ.

"আপনাকে ঠিক তাই বলা হচ্ছে যা আপনার পূর্বের নাবীদেরকে বলা হয়েছে।" (সূরা: ফুসসিলাত- ৪৩)

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলে দেয়া হল, "তবে নিশ্চিতরূপে জেনে রাখুন যে, আপনার প্রভু পরোয়ারদিগার যেমন ক্ষমাশীল, তেমনি কঠিন দণ্ডদাতা।"

আবার বলা হল, "এরূপে, এদের পূর্ববর্তী কাফিরদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তখনই বলেছে এরা হয় যাদুকর, নয়তো পাগল!

তারা কি একে অপরকে (এরূপ বলতে) ওসীয়াত করে গেছে? না, বরং প্রকৃত কথা এই যে, তারা হচ্ছে সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।"

অতঃপর অত্যাচারিত মুসলিমদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ.

"(হে মু'মিনগণ!) তোমরা কি ধারণা করে বসে আছ যে, (বিনা পরীক্ষায়) তোমরা জান্নাতে দাখিল হয়ে যাবে? অথচ তোমাদের পূর্বে যেসব (ঈমানদার) সমাজ অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাদের উপর যেমন পরীক্ষা হয়ে গেছে তেমন পরীক্ষা এখনও তোমাদের নিকট আসেনি। তাদের উপর নিপতিত হয়েছিল এমন সব আপদ-বিপদ এবং ভয়-বিভীষিকা যে তারা এমন প্রচণ্ডভাবে প্রকম্পিত হয়ে উঠে যে, আল্লাহর রাসূল ও তার সঙ্গী-সাথীগণ বলে উঠে "আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? (আমরা তো আর পেরে উঠছি না)।" জেনে রাখো- আল্লাহর সাহায্য অতি সন্নিকটে।" (সূরা: বাকারাহ: ২১৪)

www.waytojannah.com

Contents

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

الم – أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ – وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

"আলিফ লাম মীম। 'কী! লোক সকল কি এ কথাই বুঝে নিয়েছে যে, বিনা পরীক্ষায় কেবলমাত্র ঈমানের দাবী করলেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ অবস্থা এই যে, তাদের পূর্ববর্তীদের আমি পরীক্ষায় নিপতিত করেছি– নিশ্চয় আল্লাহ মিথ্যাবাদীদের থেকে সত্যাশ্রয়ীদের পরীক্ষার মাধ্যমে বেছে নিবেন– কারা খাঁটি তা জেনে নেবেন।" (সূরা: 'আনকাবূত: ১-৩)

কুরআন দ্বারা জিহাদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মু'মিন-মুসলিমগণ বরাবর সত্য পথে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে বহু কষ্ট সহ্য করেছেন, পরম ধৈর্যের সঙ্গে আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় থেকেছেন। অবশেষে সাফল্যের সে চরম মুহূর্তটি তাদের দ্বারের কাছে এসে গেছে। আল্লাহ ইসলামের বিজয় ও সাফল্যের এমন সুব্যবস্থা করে রেখেছিলেন যা কেউ ধারণাও করতে পারেনি।

মাদীনায় ইয়াহূদীদের সঙ্গে আরবের আরও দু'টি প্রসিদ্ধ গোত্র একত্রে বাস করত। এক গোত্রের নাম ছিল আউস, অন্যটির নাম খাযরায। ইয়াহূদী এবং উক্ত পৌত্তলিক আরববাসীদের মধ্যে পরস্পরিক ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত। ইয়াহূদীরা বলত, "অপেক্ষা কর– শীঘ্রই একজন নাবীর আবির্ভাব ঘটবে, আমরা তাঁর অনুসরণ করব, তাঁকে মেনে চলব আর তাঁর পতাকার নিচে সমবেত হয়ে তোমাদেরকে প্রাচীন 'আদ এবং সামূদ বংশের লোকদের ন্যায় ধ্বংস করে ছাড়ব।"

আউস এবং খাযরায গোত্রের লোকেরা আরবের অন্যান্য কবীলার ন্যায়ই প্রতি বৎসর হাজ্জের উদ্দেশে মাক্কার কা'বা গৃহে সমবেত হত। এক বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সঙ্গে দেখা করে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানান। তারা এ আহ্বান শুনে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকে– এমনও তো হতে পারে যে, ইনিই হচ্ছেন ইয়াহূদীদের সেই প্রতিশ্রুত নাবী যার সম্বন্ধে তারা আমাদের ভয় দেখিয়ে চলেছে। এমন যেন না হয় যে, তারা খবর পেয়ে প্রথমেই তাঁর প্রতি ঈমান এনে ফেলে, তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করে নেয় আর আমরা পশ্চাতে পড়ে থাকি!

এভাবেই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এ মাদীনাবাসীদের হৃদয় ইসলামের প্রতি ঝুঁকিয়ে দেন, মনে অনুরাগ সৃষ্টি করেন।

ফলে তারা ইসলাম কবূল করেন এবং এ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহায্য এবং সহযোগিতা করতে সদা প্রস্তুত থাকবেন। তারা তাদের অঙ্গীকার পূরণ করেন এবং আনসার বা সাহায্যকারী নামে চির পরিচিতি লাভ করেন।

দীর্ঘ তের বছর মাক্কায় কুরআনের মাধ্যমে জিহাদ চালিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুকূল পরিবেশ লাভের উদ্দেশে মাদীনায় হিজরত করে চলে আসেন।

www.waytojannah.com

Contents

তলোয়ারের মাধ্যমে জিহাদ

মাদীনায় পৌঁছে নাবী ﷺ মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেন। ইয়াহূদীদের ছিল তিন গোত্র– বানু কাইনুকা, বানু নাযীর, বানু কুরাইযা। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ শান্তি ও সন্ধির এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। উভয়পক্ষ কতিপয় অঙ্গীকারে– প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। কিন্তু ইয়াহূদীরা সে ওয়া'দা- অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং ইসলামের মুকাবেলায় আরবের কাফির মুশরিকদের সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে যায়। ফলে তারা লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং বিধ্বস্ত হয়ে যায়। বানু কাইনুকাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুগ্রহ করে ছেড়ে দেন, বানু নাযীরকে মাদীনা থেকে নির্বাসিত করেন আর বানু কুরাইযাকে তাদের গভীর ষড়যন্ত্রের জন্য সম্পূর্ণ খতম করে দেন।

গাযওয়ায়ে বাদ্‌র

আবূ সূফ্‌ইয়ান ও আবূ জাহ্‌ল কুরাইশদের প্রধান দলপতি, ইসলামের প্রধান বৈরী এবং মুসলিম নির্যাতনের প্রধান নায়ক। তারা এবং তাদের সহচরবর্গ উত্তমরূপে বুঝতে পেরেছিল যে, মাদীনায় গমন করার পর হতে মুসলিমগণ ক্রমশঃ অধিকতর শক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠছে। আর কিছুকাল অপেক্ষা করলে তারা অজেয় হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং তাদের হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার কোন সুযোগই তখন আর তাদের পক্ষে সহজলভ্য হয়ে উঠবে না। পক্ষান্তরে নিজেদের অনুষ্ঠিত অত্যাচার এবং নিজেদের অবলম্বিত নীচ ষড়যন্ত্রাদির কথাও সদাসর্বদা তাদের স্মরণ পথে উদিত হত। তারা নিজেদের মানসিকতার হিসেবে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করছিল যে, সুযোগ পেলেই মুহাম্মাদ এ সকল অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। এতদ্ব্যতীত মুসলিম শক্তি মাদীনায় প্রবল হয়ে উঠলে, তাদের পক্ষে শামের বাণিজ্য পথ যে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে এবং তার ফলে তাদেরকে যে প্রমাদ গুণতে হবে, এ কথাও তারা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিল। এ সকল কারণে মুসলিমদের সাথে যথাসম্ভব সত্বর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য কুরাইশ দলপতিগণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

.....এ সময় আবূ জাহ্‌ল ও আবূ সুইফ্‌য়ান প্রমুখ দলপতিগণ গোপনে পরামর্শ এঁটে মাদীনা আক্রমণের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হলো এবং এ আক্রমণের একমাত্র উদ্দেশে আবূ সুফ্‌ইয়ান আলোচ্য কাফেলা নিয়ে শামদেশে গমন করল।

... আবূ সূফ্‌ইয়ানের বাণিজ্য সম্ভার বহন করার জন্য এক সহস্র উট তার সঙ্গে চলল। মাক্কাবাসীগণ ৫০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা আবূ সূফ্‌ইয়ানের সঙ্গে প্রেরণ করে। এমনকি মাক্কার কুরাইশ নর-নারীদের মধ্যে এক রতি মাসা সোনা চাঁদিও যার নিকট ছিল, সেও তার এ কাফেলার সঙ্গে প্রেরণ করেছিল।

মাক্কাবাসীগণ যে কী উদ্দেশে তাদের শেষ রৌপ্যখণ্ড পর্যন্ত সংগ্রহ করে শামদেশে প্রেরণ করেছিল এবং পরিণামে যে কী কাজে তা ব্যয়িত হয়েছিল, সূরা আনফালের একটি আয়াতে তার স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে:

অর্থাৎ 'কাফিরগণ মুসলিমদেরকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করার জন্য নিজেদের ধন-সম্পদসমূহ ব্যয় করতে যাচ্ছে, অতি শীঘ্রই তারা তা (ইসলাম ধর্মে বিঘ্নদানের উদ্দেশে) ব্যয় করে ফেলবে- তদন্তর তা তাদের পক্ষে অনুতাপেরই কারণ হবে, তদন্তর তারা পরাজিত হয়ে যাবে।

www.waytojannah.com

Contents

....এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বাদ্‌র সমর সংঘটিত হবার পূর্বেই মাক্কাবাসীগণ নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করে মুসলিমদেরকে ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এরূপ নিজেদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে কুরাইশগণ মুসলিমদেরকে ধ্বংস করার আয়োজন করছিল বলে পূর্বোক্ত আয়াতে মুসলিমদেরকে আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণের অনুমতি দেয়া হয়েছিল....আবূ সুফ্‌ইয়ান এ উদ্দেশে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদাদি রণসম্ভার খরিদ করার ও বেতনভোগী সৈন্যদল সংগ্রহের জন্যই মাক্কার সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে সিরিয়ায় গমন করেছিল। তার এ যাত্রা প্রকৃতপক্ষে সমর অভিযান, বাণিজ্যের কথা একটা বাহ্যিক আবরণ মাত্র।"

বাদ্‌র যুদ্ধের বিবরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যখন সংবাদ পৌছল যে, আবূ সুফ্‌ইয়ানের নেতৃত্বে শাম দেশ (সিরিয়া) থেকে একটি বাণিজ্য-কাফেলা মাক্কা প্রত্যাবর্তন করছে আর সেই কাফেলায় প্রচুর ধন-দৌলত রয়েছে তখন তিনি মুসলিমদের মাদীনা থেকে বহির্গত হওয়ার আদেশ প্রদান করলেন। আনসার এবং মুহাজির মিলে তিন শতের কিছু অধিক (৩১৩ জন) লোক পাওয়া গেল যারা যুদ্ধে দুশমনের মুকাবেলা করতে সক্ষম হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় হিজরীর ২রা রমাযান এই ক্ষুদ্র কাফেলা নিয়ে মাদীনা থেকে বের হলেন। সকলেই পদাতিক; বাহন বলতে ছিল দু'টি মাত্র ঘোড়া আর ৭০টি উট যার উপর তারা অদল বদল করে আরোহণ করতেন।

কাফেলা যখন 'সাফরা' নামক স্থানে পৌছল, তখন দু'জন গুপ্তচরকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠান হল। ওদিকে আবূ সুফ্‌ইয়ানের নিকটেও নাবীর বের হওয়ার সংবাদ পৌছে গিয়েছিল। সংবাদ পেয়েই সে যমযম ইবনু গাফারীর মাধ্যমে মাক্কাবাসীদেরকে উক্ত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত করল। খবর পেয়ে যুদ্ধের জন্য সকলেই প্রস্তুত হয়ে গেল। কুরাইশ সর্দারের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও বাকি রইল না যে, সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত না হল। বিশেষ কারণে আবূ লাহাব এ সমর বাহিনীতে যোগদান করতে না পারলেও তার প্রতিনিধিরূপে অপর এক ব্যক্তিকে মনোনীত করল। শুধু মাক্কার কুরাইশরাই নয়, আশ-পাশের আরব গোত্রসমূহকেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের আহ্বান জানান হল। বানী 'আদী ছাড়া অপর সমস্ত গোত্র এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে খুব জাঁক-জমকের সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশে মাক্কা থেকে বের হল।

যথাসময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কুরাইশদের প্রচুর অস্ত্রসম্ভার নিয়ে রওয়ানা হওয়ার কথা যখন পৌছল, তখন তিনি আনসার ও মুহাজির সহচরদের ডেকে অবস্থা সম্পর্কে তাদের অবহিত করলেন। মুহাজিররা সন্তোষজনক জওয়াব প্রদান করলেন কিন্তু আনসাররা চুপ রইলেন। তাদের নীরবতায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার পরামর্শ আহ্বান করলেন, এবারও মুহাজিররাই উত্তর দিলেন, আনসাররা নীরবতা অবলম্বন করে থাকলেন। নাবী ﷺ তৃতীয়বার যখন পরামর্শ চাইলেন তখন আনসাররা বুঝতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরই মুখের কথা শুনতে চান। তখন আনসার নেতা সা'দ ইবনু মা'আয দণ্ডায়মান হলেন। তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! মনে হচ্ছে আপনার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হচ্ছি আমরাই– আমাদের বক্তব্যই আপনি শুনতে চান। আপনি হয়ত মনে করছেন যে, আনসারগণ মাদীনার বাইরে আপনার আনুগত্য বরণ, হুকুম প্রতিপালন এবং আপনার সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করার দরকার মনে করে না (কারণ তারা মাদীনার অভ্যন্তরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিফাযাতের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ ছিল) কিন্তু আমি আনসারদের তরফ থেকে আপনাকে এ কথা দিচ্ছি যে, আপনি যেখানে ভালো মনে করেন, গমন করুন;

www.waytojannah.com

Contents

যাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে চান, মিলুন; যাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে চান, হোন; যতটা ইচ্ছা আমাদের প্রদান করুন, যা ইচ্ছা আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করুন এবং যা উচিত মনে করেন, আমাদের হুকুম প্রদান করুন; সকল অবস্থাতেই আমরা আপনার অনুসরণ করব, যে কোন পরিস্থিতিতে আমরা আপনার সঙ্গে আছি, আপনার রশির সঙ্গে আমাদের রশির গিটবন্দী হয়ে গেছে, আমরা কোন অবস্থাতেই আপনার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যেতে পারি না।

আল্লাহর কসম! আপনি যদি আমাদের সমুদ্রে ঝাপ দিতে বলেন, ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঝাপ দেব, বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না, এক মুহূর্তও বিলম্ব করব না, যতদূর এবং যত দুর্গমতম স্থানে আমাদের আপনি নিয়ে যান আমরা যেতে প্রস্তুত! এ সময়ে মিকদাদ (রা) উঠে কী চমৎকার কথাই না বললেন:

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! মূসা (আ)-কে তার কওম যে কথা বলেছিল, আমরা কখনো তা বলব না। তার কওম মূসা (আ)-কে বলেছিল:

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ.

"আপনি যান, আর আপনার রব, আপনারা দুশমনের সঙ্গে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই আসন গেড়ে বসলাম।" (সূরা আল-মায়িদাহ- ২৪)

বরং আমরা আপনার ডানে ও বামে, সামনে ও পিছনে অবস্থান করে বীরের মত যুদ্ধ করে যাব এবং নির্ভয়ে মাথা দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকব।

আনসারদের এ সন্তোষজনক ও আনন্দায়ক জওয়াব শোনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্তুষ্ট হলেন, খুশীতে তাঁর চেহারা মুবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি আনন্দের আবেগে বলে উঠলেন: "চলো তোমাদের জন্য রয়েছে শুভ সংবাদ, আমি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দুশমনদের লাশ- মৃত দেহ দেখতে পাচ্ছি!"

নাবীর নির্দেশে মুসলিম বাহিনী বাদ্‌রের দিকে এগিয়ে চললেন।

আবূ জাহ্‌লের সিদ্ধান্ত

একদিক দিয়ে মুসলিম বাহিনী এগিয়ে চলল, অপরদিক দিয়ে আবূ সুফ্‌ইয়ান সমুদ্র তীরের রাস্তা দিয়ে তার বাণিজ্য বহরসহ বিপদ পেরিয়ে বের হয়ে গেল। ওদিকে আবূ জাহ্‌লের নেতৃত্বে কুরাইশ যোদ্ধাদল বাদ্‌রের দিকে অগ্রসর হয়ে চলল। আবূ সুফ্‌ইয়ান বিপদ-মুক্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর কুরাইশদের বাহিনীকে লিখে জানিয়ে দিল, "আমরা নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গেছি, এবার তোমরা ফিরে এসো।"

'জাহফা' নামক স্থানে কুরাইশদের নিকট এ চিঠি পৌঁছাবার পর তাদের অধিকাংশই ফিরে যাওয়ার মনস্থ করল। কিন্তু আবূ জাহ্‌ল প্রত্যাবর্তনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। সে জোর দিয়ে সকলকে জানিয়ে দিল, বাদ্‌র পর্যন্ত আমরা যাবই আর সেখানে গিয়ে আমরা থামব, আরাম করব। আরববাসীদের তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করাব, আমাদের শক্তির প্রাবল্য এবং ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখিয়ে চারদিকে প্রভাব বিস্তার করব।

আবূ জাহ্‌লের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করল আখনাস ইবনু শারীক। সে ফিরে যাওয়ার স্বপক্ষে জোরের সঙ্গে তার যুক্তি প্রদর্শন করল। কিন্তু কোনই কাজ হল না। আবূ জাহ্‌ল তার কথার কোনই দাম দিল না। কাজেই সে বিরক্ত হয়ে তার কাবীলা নিয়ে সেখান থেকেই ফিরে গেল।

www.waytojannah.com

Contents

হাশিম গোত্রের লোকেরাও ফিরে যাবার জন্য খুবই আগ্রহ দেখাল এবং পীড়াপীড়িও করল। কিন্তু আবূ জাহ্ল কোন কথাই শুনতে এবং কোন যুক্তিই মানতে রাজী হল না, তাদের ছেড়ে দিতে সে অস্বীকার করল। বলল, তা হবে না। আল্লাহর কসম! আমাদের ছেড়ে তোমরা কিছুতেই যেতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অগ্রযাত্রা: বাদ্‌র প্রান্তরে উপস্থিতি

অন্যদিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাদ্‌রের দিকেই দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছিলেন। বিকালের দিকে তিনি মুসলিম বাহিনীসহ বাদ্‌রের নিকটে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র ঝর্ণা ধারার নিকট পৌঁছে গেলেন। আর অগ্রসর না হয়ে কোথায় অবতরণ এবং স্থান গ্রহণ করলে উত্তম হবে এ বিষয়ে তিনি সেখানেই সাহাবীদের ডেকে পরামর্শ চাইলেন। খাব্বাব ইবনু মুনযির (রা) আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ এলাকার হাল চাল অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি ভালরূপেই ওয়াকিফহাল রয়েছি। যদি ভিতরে ঢুকে মধ্যবর্তী স্থলে অবতরণ করা আপনার মনযুর হয়, তা হলে সেখানে মিঠা পানির প্রাচুর্য রয়েছে। আমরা এখনই রওয়ানা হলে দুশমনদের পূর্বেই সে স্থলে পৌঁছে যেতে পারি। তাহলে পানির উৎস আমাদের আয়ত্বে থাকবে।"

প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ

.....কুরাইশরাও পানির উৎস মুখ স্বীয় অধিকারে রাখার জন্য খুব ত্বরিৎ গতিতে বাদ্‌রের দিকে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু মুসলিমদের আগে তারা পৌঁছতে পারল না। তাদের পৌঁছার পূর্বেই মুসলিমগণ সুবিধামত জায়গা করে নিলেন।

মনযিলে মকসুদে পৌঁছেই নাবী ﷺ 'আলী, সা'দ এবং যুবাইর (রা)-কে প্রতিপক্ষের গোপন তথ্য জানার উদ্দেশে প্রেরণ করলেন। তাঁরা কুরাইশদের দু'জন গোলামকে ধরে নিয়ে আসলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সালাতে দণ্ডায়মান। তখন সাহাবীগণ গোলাম দু'জনকে তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, আমরা কুরাইশদের পানি বহন করে আনি। আরও দু'একটি জিজ্ঞাসাবাদের পর- রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বল দেখি, কুরাইশরা কোথায়? তারা বলল, ঐ টিলাটার পশ্চাতে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তাদের সংখ্যা কত? তারা বলল, আমরা জানি না। তিনি বললেন, ঠিক আছে, বল দেখি তারা প্রতিদিন (আহারের জন্য) কয়টা করে উট যবহ করে থাকে? তারা জানাল কোন দিন নয়টি, কোন দিন দশটি। এর থেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ একশত জনের জন্য একটি করে উট ধরে নিয়ে তাদের সংখ্যা কত তা বুঝে নিলেন। তিনি বললেন, তাদের সংখ্যা নয়শত এবং এক হাজারের মাঝামাঝি।

সময় মত বৃষ্টি: আল্লাহর গায়িবী সাহায্য

দ্বিতীয় হিজরী, ১৭ই রমাযান, বৃহস্পতিবার। রাতে আল্লাহর রহমাতের বারিধারা বর্ষিত হল। কিন্তু দু'দিকের বৃষ্টি ধারা দু'রকম হল। মুশরিকদের দিকে প্রবল বর্ষণ হল। মুষলধারায় বৃষ্টির দরুণ তাদের অগ্রগমন বাধাগ্রস্ত হল। তারা না সুবিধা মত স্থানে ঘাঁটি গাড়তে পারল, না পানির কোন ঝর্ণাধারা তাদের আয়ত্বে নিতে পারল।

www.waytojannah.com

Contents

মুসলিমদের দিকে বৃষ্টির জোর ছিল কম। যতটুকু তাদের জন্য প্রয়োজন এবং কল্যাণপ্রদ ততটুকুই বৃষ্টি হল। বৃষ্টির পর একটা শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি হল: সফরের ক্লান্তি ও শ্রান্তি দূর হয়ে গেল, দেহ ও মনে এক চমৎকার স্বাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা দেখা দিল। ধূলা ও বালুকণা মাটির সঙ্গে এমনভাবে বসে গেল যে চলাফেরার পক্ষে কোনই অসুবিধা রইল না। মধ্য রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের নিয়ে পানির মূল ঝর্ণাধারার নিকটে গিয়ে পৌছলেন। সেখানেই তাঁর নির্দেশে শক্ত মাটি দ্বারা বাঁধ গড়ে নিয়ে হাউয বানানো হল। সেই হাউযে পানি সঞ্চয় করে রাখা হল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছাউনী

সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সম্মুখের পাহাড়টিলায় একটা আরিশ বা ছাউনী তৈরী করলেন। ছাউনীতে প্রবেশের পূর্বে কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে প্রান্তরে একটা চক্কর দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করে আসলেন। তিনি স্থানে স্থানে স্বীয় আঙ্গুল নির্দেশ করে বললেন, এটি অমুকের কতলগাহ! এখানে অমুক, ঐখানে অমুক ইনশাআল্লাহ নিহত হবে। যুদ্ধের পরে অনুসন্ধান নিয়ে দেখা গেছে, নাবী ﷺ-এর নির্দেশিত জায়গায় নির্দিষ্ট ব্যক্তি রক্ত রঞ্জিত ও ধূলিধূসরিত অবস্থায় পড়ে আছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রার্থনা

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ প্রভুর সান্নিধ্যে মুসলিমদের কামিয়াবীর জন্য আকুল প্রার্থনা জানালেন। সে প্রার্থনার এক স্থলে তিনি নিবেদন করলেন–

اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ قُرَيْشٌ جَاءَتْ بِخَيْلِهَا وَفَخْرِهَا جَاءَتْ تُحَارِبُكَ وَتُكَذِّبُ رَسُوْلَكَ.

আল্লাহুম্মা হাযিহী কুরাইশুন জাআত বি-খায়লিহা ও ফাখরিহা, জাআত তুহারিবুকা ওয়া তুকাযযিবু রাসূলিকা।

"হে আল্লাহ! আমার প্রভু পরোয়ারদিগার! এ কুরাইশদের নিজেদের যুদ্ধ উপকরণ নিয়ে অহঙ্কার এবং আত্মম্ভরিতায় স্ফীত হয়ে এখানে সমবেত হয়েছে যুদ্ধ করার উদ্দেশে; এ যুদ্ধ তোমারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ, এ যুদ্ধ তোমার নাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার যুদ্ধ।"

অতঃপর আবেগ ভরে তিনি তাঁর হস্তদ্বয় ঊর্ধ্বে তুলে ধরলেন, ধরে তাঁর প্রভু প্রতিপালককে আকুলভাবে ডেকে বললেন:

اَللّٰهُمَّ أَنْجِزْلِيْ مَا وَعَدْتَنِيْ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ

আল্লাহুম্মা আনজিযলী মা ওয়া'আদতানী, আল্লাহুম্মা ইন্নী উনশিদুকা আহদাকা ওয়া ওয়া'দাকা– "হে আল্লাহ! তুমি আমার সঙ্গে যা ওয়াদা করেছ তা পূরণ কর, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা স্মরণ করছি।"

আবূ বাক্র (রা) কাছেই অবস্থান করছিলেন। তিনি নাবী ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! যথেষ্ট হয়েছে। আপনি নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হোন! আমার প্রাণ যে মহাপ্রভুর হস্তে– তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিয়েছেন তা তিনি অবশ্যই পূরণ করবেন।

সমস্ত মুসলিমও এ সময় আল্লাহর সাহায্য ও মদদ আকুলভাবে প্রার্থনা করে চলেছিলেন, তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়ে একমাত্র তাঁরই নিকট শক্তি ও সাহস ভিক্ষা করছিলেন।

www.waytojannah.com

Contents

আল্লাহ এ আহ্বানে সাড়া দিলেন, ফেরেশতাদের ডেকে বললেন:

أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ.

"আমি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি, তোমরা, হে ফেরেশতার দল! মুসলিমদের সাবেত-কদম করে দাও, তাদের দলগুলোকে অটল অবিচল করে রাখো, আমি কাফিরদের অন্তরে শীঘ্রই ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে দেব।" (সূরা: আনফাল- ১২)

পুনঃ আশ্বাস দেয়া হল:

أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ.

"আমি পর পর একাদিক্রমে হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সহায়তা করে চলব।" (সূরা: আনফাল- ৯)

কিন্তু মর্দে মুসলিম-সাহাবীগণ ফেরেশতাদের সাহায্যের আশায় কর্মহীন হয়ে বসে থাকেন নি। তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছেন, যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত, শত্রু সেনা যত বেশি হোক তার জন্য তাদের কোন পরওয়া নেই, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা দানের জন্য তাদের আগমন, অন্যায়ের প্রতিরোধে সংগ্রামে তারা অবতীর্ণ। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস শাহাদত বরণ করলে নিশ্চিত জান্নাত লাভ। তাদের বিজয় হবে ন্যায়ের বিজয়, মানবতার বিজয়।

যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৭ই রমাযানের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ইবাদাত ও মুনাজাতে কাটালেন। ভোর হল। উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং মুসলিম মুজাহিদদের কাতারবন্দী করলেন। বিভিন্ন দলে ও বিভিন্ন ছত্রে বিভক্ত করে- তাদেরকে সীসার নিঃছিদ্র প্রাচীরের ন্যায় অটলভাবে অবস্থান করতে বললেন। নির্দেশ ছাড়া তিনি কাউকেই আক্রমণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন। এ নির্দেশ দিয়ে নাবী ﷺ শিবিরে প্রবেশ করে তাঁর মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট পুনঃ মুনাজাতে বসে গেলেন।

ওদিকে কুরাইশ শিবিরে এ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সার্থকতা সম্বন্ধে অনেকের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, বিবেকে দংশন শুরু হয়েছে। যুদ্ধের ফলাফলের অনিশ্চয়তা ও ক্ষয়-ক্ষতির ভয়াবহতার কথা স্মরণ করে তারা কুরাইশ নেতা আবূ জাহ্লকে পরামর্শ দিল যুদ্ধ না করে ফিরে যেতে। এ দলে ছিলেন কুরাইশ নেতা হাকীম ইবনু হিযাম এবং 'উত্বা ইবনু রাবী'আ। আবূ জাহ্ল সে পরামর্শে কান তো দিলই না বরং পরামর্শদাতাদের ভীরু ও কাপুরুষ বলে গালাগালি দিল। বিশেষ করে 'উত্বাকে যুদ্ধের নামে ভীত, কুরাইশ কুলের কলঙ্ক, প্রভৃতি নামে ধিক্কার দিতে লাগল। 'উত্বার এক ছেলে ছিল মুসলিম, সে যুদ্ধক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আগত। তাঁর নিহত হওয়ার আশঙ্কায় 'উত্বা শঙ্কিত! ধিক, তার বীর ধর্মে ধিক!

'উত্বার আত্মাভিমানে আঘাত লাগল। সে বলল, কী! আমি ভীরু, আমি কাপুরুষ? আমি পুত্রের মায়ায় স্নেহের টানে যুদ্ধ করতে ভীত, দ্বিধাগ্রস্ত! মিথ্যা এ অভিযোগ! 'উত্বা ভীরু নয়, ভীত নয়, স্নেহের বাঁধনে আটকা নয়। এই বলে সে প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে এলো। সঙ্গে নিয়ে এলো তার আপন ভাই শায়বা ইবনু রাবী'আ এবং পুত্র ওয়ালীদ ইবনু 'উত্বাকে। এসেই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য মুসলিম পক্ষের যোগ্য যোদ্ধাদের আহ্বান জানাল।

আহ্বান শুনে আনসার পক্ষ থেকে তিন যুবক-বীর লাফিয়ে তাদের সামনে গিয়ে হাজির হলেন। এরা ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওহা, 'আউফ এবং মুআব্বিয।

www.waytojannah.com

Contents

তারা এদের পরিচয় জেনে নিয়ে জানিয়ে দিল, না তোমরা নও, তোমরা আমাদের সঙ্গে কী যুদ্ধ করবে? যুদ্ধ বিদ্যার তোমরা কী জান? পাঠিয়ে দাও আমাদের গোত্রের বীর যোদ্ধাদের! তাই হল। আনসাররা ফিরে এলেন। নাবীর আদেশে বীর দর্পে এগিয়ে গেলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা বীর-প্রবর আমীর হামজা, চাচাতো ভাই বীর সিংহ 'আলী ইবনু আবি তালিব এবং মহামতি 'উবায়দা।

দ্বন্দ্ব যুদ্ধ শুরু হল। সেয়ানে সেয়ানে মুকাবেলা। 'উত্‌বার সঙ্গে হামজা, ওয়ালীদের সঙ্গে 'আলী আর শায়বার সঙ্গে 'উবাইদাহ।

অল্পক্ষণেই 'আলী ওয়ালীদকে এবং হামজা 'উত্‌বাকে কতল করলেন। শাইবাহ এবং 'উবায়দার মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলল, উভয়ে উভয়কে আহত করল, 'আলী এবং হামযা এগিয়ে গিয়ে শাইবাহকে নিহত করলেন। আহত 'উবায়দাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছাউনীতে নিয়ে আসা হল। তার আঘাত গুরুতর হওয়ায় তিনি মাদীনায় ফেরার পথে সাফরায় শাহাদাত বরণ করেন।

উক্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরে কুরাইশ পক্ষে তিন বীর যোদ্ধা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত হওয়ায় সমস্ত কুরাইশ শক্তি ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার যুদ্ধস্থলে মুজাহিদদের পাশে গিয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন, তাদের মনে সাহস যোগাচ্ছেন, আবার শিবিরে এসে আল্লাহর সান্নিধ্যে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

প্রার্থনায় তিনি নিবেদন করছেন হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা বেদনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা। আকুতি ও কাকুতির সঙ্গে বলছেন, "মুসলিম এসেছে, হে আল্লাহ! তোমার নামকে জয়যুক্ত করতে, তাওহীদের প্রতিষ্ঠা দান করতে। আজ এ মুষ্টিমেয় তাওহীদের ধারক যদি ধ্বংস হয়ে যায় দুনিয়ার বুকে তোমার নাম নেবার কেউ থাকবে না। কেউ তোমার ইবাদাত করবে না।"

প্রার্থনায় তিনি তার পরম জনের নিকট নিজের হৃদয় খুলে ধরছেন, চিরঞ্জীব মহাশক্তিধরের নিকট অনুগ্রহ চাচ্ছেন, শক্তি ভিক্ষা করছেন এভাবে:

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْثُ

"হে চিরঞ্জীব! হে স্ব-প্রতিষ্ঠ! তোমার রহমাতের আমরা আকাঙ্ক্ষী, তোমার শক্তির আমরা ভিখারী!"

তিনি বলে চলেছেন:

اَللّٰهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعُصْبَةَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ لاَ تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ

"হে আল্লাহ! মুসলিমদের এ ক্ষুদ্র দলটিকে যদি তুমি আজ ধ্বংস করে দাও, এ পৃথিবীতে তোমার ইবাদাত আর হবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ আকুল প্রার্থনা আর মুসলিম সেনাবাহিনীর জান-বাজ যুদ্ধ চালনা ব্যর্থ হতে পারে না। যুদ্ধের তেজ যেমন বেড়ে চলছে, প্রার্থনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কণ্ঠস্বরও তেমনি উচ্চতর গভীরতর নিবিড়তর হয়ে উঠছে। ব্যাকুল হৃদয়ের অন্তর নিংড়ানো সে আকুল প্রার্থনা শুনে আবূ বাক্‌র (রা) এক পর্যায়ে দৌড়ে এসে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর নাবী ﷺ! আপনার এ প্রার্থনা আল্লাহর কাছে মঞ্জুর না হয়েই পারে না। আল্লাহ অবশ্যই তাঁর ওয়া'দা পূরা করবেন।

ঠিক সে অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্য প্রিয় রাসূল ﷺ ধ্যানে তন্ময় হয়ে গেলেন। তাঁর উপর তন্দ্রা যেন কিছুটা আবেষ্টন ছড়িয়ে দিল। এক মুহূর্তে রাসূল ﷺ-এর চেহারায় স্বর্গীয় আভা ফুটে উঠল। তখন সূরা

www.waytojannah.com

Contents

আনফালের কতিপয় আয়াত তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। সেসব আয়াতে আশার বাণী উচ্চারিত হয়েছে। উৎফুল্ল মনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌রকে ডেকে বললেন, শুভ সংবাদ গ্রহণ করো, জিবরাঈল (আ.) এসে গেছেন, আল্লাহ তা'আলা তার নিজস্ব বাহিনী প্রেরণ করেছেন। তাঁর নাবীকে আর তাঁর সত্যাগ্রহী মু'মিন বান্দাদেরকে তিনি সাহায্য প্রেরণ করেছেন। তাদের সাহস সঞ্চারিত করেছেন আর কাফিরদেরকে তাদের কব্জায় এনে দিয়েছেন। এখন মুসলিম জিতবে, কাফিররা হারবে, নিহত হবে, পালাবে, ধরা পড়বে এবং বন্দী হবে।

অবস্থা তাই হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হল।[৩৯]

যুদ্ধের সূচনাতেই 'উত্‌বা, শায়বা, ওয়ালীদ প্রভৃতি কুরাইশ নেতাদের মৃত্যু এবং পরবর্তী পর্যায়ে কাফির-কুল-শিরোমণি আবূ জাহ্‌লের আকস্মিক এবং অভাবিত হত্যা কুরাইশ বাহিনীর মনোবল অনেকখানি নিস্তেজ করে ফেলল। অপরদিকে ঈমানী জোশে দীপ্ত মুসলিম মুজাহিদগণ তাদের প্রাথমিক সাফল্যে উদ্দীপ্ত হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে নবোদ্যমে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ছাউনী থেকে বের হয়ে এসে বীর মুজাহিদদের দৃঢ় মনোবলকে দৃঢ়তর করার জন্য নব-প্রত্যাদিষ্ট কুরআনের উৎসাহব্যঞ্জক বাণী শুনালেন। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন জানিয়ে দিয়েছেন যুদ্ধে জয়লাভ অস্ত্রের বাহুল্য আর যোদ্ধার সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভরশীল নয়– আল্লাহর উপর দৃঢ় এবং অটল

---

[৩৯] এ সময়ে যুদ্ধের মোড় পরিবর্তনকারী একটি ঘটনা ঘটল।

"ময়দানে তুমুল সংগ্রাম চলছে। সত্যর সেবক মুসলিম বীরগণ এক একবার আল্লাহর নামে জয় ধ্বনি করছেন এবং এক একজন যেন শত সৈনিকের শক্তি নিয়ে শত্রু দলনে প্রবৃত্ত হচ্ছেন। 'আবদুর রহমান বিন 'আওফ বলছেন– আমি অন্যান্য মুজাহিদগণের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত আছি। এমন সময় দেখি, দু'টি তরুণ যুবক সমর ক্ষেত্রের এদিক ওদিক যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। অল্পক্ষণ পর তাদের একজন আমার নিকট এসে বলল, তাতঃ! আবূ জাহ্‌ল লোকটা কে? সে কোথায় আছে? তাকে একবার দেখিয়ে দিতে পারেন? কিছুক্ষণ পরে অন্য যুবকটি এসেও ঐরূপে আবূ জাহ্‌লের সন্ধান নিতে লাগল। আমি তখন বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞেস করলাম– তোমরা আবূ জাহ্‌লকে খুঁজছ কেন? যুবকদ্বয় উত্তর করল– আমরা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করেছি– আবূ জাহ্‌লের সাক্ষাৎ পেলে তাকে হত্যা করব। তাই আজ সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি। 'আবদুর রহমান বলছেন, এ তরুণ যুবকদ্বয়ের মুখে তাদের সংকল্পের কথা শ্রবণ করে আমি যার পর নাই আনন্দিত হলাম এবং আবূ জাহলকে দেখিয়ে দিলাম।

আবূ জাহ্‌ল তখন কুরাইশ সৈন্যদলের কেন্দ্রস্থলে ব্যূহ বেষ্টিত হয়ে অবস্থান করছিল।.....সতর্কতার একটু ত্রুটি নেই। এমন সময় মা'আয ও মু'আব্বিয নামক বর্ণিত ভ্রাতৃযুগল উলঙ্গ তরবারি হস্তে আবূ জাহলের ব্যূহের দিকে ধাবিত হয়ে নিমেষের মধ্যে তারা ব্যূহের উপর আপতিত হল। অতর্কিত আক্রমণের ফলে কুরাইশ সৈন্যগণ যেন একটু হতভম্ব হয়ে পড়ল এবং ব্যাপার কী তার সঠিক সংবাদ নিতে নিতে ভ্রাতৃযুগল একেবারে আবূ জাহলের মাথার উপর উপস্থিত। এ সময় আবূ জাহলের পুত্র ইকরিমা মু'আযের বাম বাহুতে তরবারির আঘাত করে তাঁর গতিরোধ করতে যায়। কিন্তু মু'আয সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না: অথবা ইকরিমার আক্রমণের প্রতিশোধ নেবার জন্যও ব্যস্ত হলেন না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য সঙ্কল্প সিদ্ধি। সুতরাং আঘাত জর্জরিত হয়েও ইসলামের এ তরুণ মুজাহিদ যুগল একমাত্র আবূ জাহ্‌লকে লক্ষ্য করে দ্রুত বেগে ধাবিত হলেন।.....ইকরামার তরবারির আঘাতে মু'আযের বাম বাহুটির অধিকাংশ কেটে গিয়ে ঝুলতে থাকে। মু'আয দেখলেন তাঁরই বাহু এখন তার সাধন পথের প্রধান বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তখন আর বিলম্ব সহ্য হল না। মু'আয দোদুল্যমান বাহুটি পদতলে চেপে ধরে এমন জোরে ঝটকা দিলেন যে, বাহুটি তার দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে 'সবল' বাহুর 'প্রবল' আঘাতে আবূ জাহলের রক্ত রঞ্জিত দেহ ধূলায় গড়াগড়ি যেতে লাগল। বলা বাহুল্য যে, বাহ্যিক হিসেবে এ ভ্রাতৃ যুগলই বাদ্‌র বিজয়ের প্রধান উপকরণ।" *–অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

Contents

ভরসাই জয়ের প্রধান অবলম্বন। আল্লাহ সর্বশক্তিধর, তিনি বাহ্যতঃ দুর্বল দলকেও দৃশ্যতঃ সবল দলের বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য প্রদান করে জয় যুক্ত করেন। তিনি সাহায্য করেন তাদের যারা তাঁর সাহায্য লাভের হকদার। আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁর অসীম ক্ষমতায় আস্থাবান এবং তাঁর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল মু'মিন বান্দারাই উক্ত সাহায্য লাভের প্রকৃত হকদার। রাসূলুলাহ ﷺ মুসলিম বাহিনীর কাছে গিয়ে- তাদের উপদেশ দিলেন, হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করলেন। বললেন, ধৈর্য ও দৃঢ়তাই আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্তি ও বিজয়কে তরান্বিত করে। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ধর্ম সমরে, ন্যায়ের যুদ্ধে আল্লাহর রাস্তায় যারা মৃত্যুবরণ করে- তারা শহীদ আর শহীদদের জন্য জান্নাত লাভ আল্লাহ ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

রাসূলুলাহ ﷺ-এর এ উৎসাহ বাণীতে মুসলিম মুজাহিদদের রক্তে নবতেজ সঞ্চারিত হল। তারা শত্রু ব্যূহে ঝাপিয়ে পড়লেন। তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধের এক পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল এক মুঠ ধূলো (বা কঙ্কর) নিয়ে "তাদের মুখ হোক কালো" বলে কাফিরদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। এ ধূলো বালি প্রত্যেক কাফিরের চক্ষুদ্বয়ে বিদ্ধ হয়ে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। এ সুযোগে মুসলিম মুজাহিদরা তাদের হত্যা করে চলল।

এ ধূলো নিক্ষেপ সম্পর্কে পরে কুরআনের আয়াতে বলা হয়-

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى.

"আপনি যে, ধূলোবালি ছুঁড়ে মেরেছিলেন, (প্রকৃত প্রস্তাবে) আপনি তা ছুঁড়ে মারেননি, আল্লাহই ছুঁড়ে মেরেছিলেন।" (সূরা: আনফাল- ১৭)

এ যুদ্ধে মুসলিমদের সাহায্য করতে আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুলাহ ﷺ-এর চাচা 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব (তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে) কাফিরদের সঙ্গে এসে তাদের হয়ে যুদ্ধ করছিলেন। 'আব্বাস (রা)-এর পুত্র 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস বলেন, বাদ্‌র যুদ্ধের দিনে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে এক মুসলিম বীর একজন কাফিরের পশ্চাতে ধাবিত হয়েছেন এমন সময় কাফিরের দেহে চাবুকের আঘাতের শব্দ তিনি শুনতে পেলেন। আঘাতটি পড়ছে উপর থেকে। উপরে এক অশ্বারোহী। তিনি চিৎকার করে বলছেন:

উকদুম ইয়া হাইযূম- এগিয়ে চল, হে হাইযূম! (ঘোড়ার নাম)। পরক্ষণে তিনি দেখতে পান কাফিরটি নিহত অবস্থায় পড়ে আছে। চাবুকের আঘাতে তার নাক বিদীর্ণ, মুখ ক্ষতবিক্ষত। এক আনসার রাসূলুলাহ ﷺ-কে এ খবর জানালে তিনি বললেন, তৃতীয় আসমান থেকে আগত সাহায্যে এ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আবূ দাঊদ মাযানী এরূপ আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তাকে বলা হয়েছে, আমি এক মুশরিকের পিছনে তলোয়ার নিয়ে ধাবিত হয়েছি, আমার তলোয়ার তাকে স্পর্শ করার পূর্বেই তাকে আমি ভূতলশায়ী হতে দেখলাম। আমি তখন বুঝতে পারলাম, আমি নই, অন্য কেউ (কোন ফেরেশতা) তাকে হত্যা করেছেন!

আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি 'আব্বাস (রা)-কে গ্রেফতার করে রাসূলুলাহ ﷺ-এর সামনে হাজির করেন। তিনি এসে বলেন, আমি এঁকে বন্দী করে এনেছি। 'আব্বাস (রা) বলেন, না আল্লাহর কসম! এ ব্যক্তি আমাকে বন্দী করেনি। এর চাইতে সুন্দরতর এক লোক- ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসে আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে। আমি তাকে এ লোকদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। আনসারটি তখন বলল, না,

www.waytojannah.com

Contents

হে আল্লাহর রাসূল। আমিই একে ধরেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি চুপ কর। আল্লাহ তোমাকে এক মহান ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন।

এ যুদ্ধে বানী 'আবদুল মুত্তালিবের আরও দু' ব্যক্তি বন্দী হয়েছিলেন তাদের একজন হচ্ছে আকিল ইবনু আবি তালিব ('আলীর আপন ভাই) এবং নওফিল ইবনু হারিস।

কুরাইশ দলের বহু সৈন্য হতাহত এবং তাদের প্রধানদের অধিকাংশ নিহত হওয়ায় কাফির সৈন্যবাহিনী সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হয়ে উঠল। ফলে তারা পলায়ন করতে শুরু করল। মুসলিম বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে কতককে হত্যা করল আর অনেককে বন্দী করল।[৪০]

এ যুদ্ধে কুরাইশ দলের মোট ৭০ জন নিহত এবং ৭০ জন বন্দী হয়। আহতদের সংখ্যা ছিল নিহতদের প্রায় সমান। যে ১৪ জন কুরাইশ প্রধান রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব প্রদান করেছিল, আল্লাহর কী শান! তাদের ১১ জনই এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। মুসলিমদের মধ্যে মাত্র ১৪ জন শহীন হন।[৪১]

---

[৪০] মুসলিমরা অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করে পলায়নপর শত্রু সেনাদেরকে বন্দী করতে আরম্ভ করলেন। ইতিহাসে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয়েছে যে, মুসলিমগণ যদি তখন অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ না করতেন, তাহলে বহু কুরাইশ সৈন্য তাঁদের দ্বারা শমন সদনে প্রেরিত হত। যুদ্ধের পূর্বে রাসূল ﷺ সকলকে বিশেষ তাগিদ সহকারে বলে দিয়েছিলেন, "কুরাইশদের মধ্যে কতকগুলো লোক অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছে। সাবধান! তাদেরকে কেউ আঘাত করো না।" *–অনুবাদক।*

[৪১] নিম্নে শহীদদের নাম প্রদত্ত হল:

ক. মাজমা' ইবনু সালিহ, 'উমার (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম সর্বপ্রথম শাহাদতের সৌভাগ্য অর্জন করেন, তিনি ছিলেন মুহাজির।

খ. 'উবাইদাহ ইবনু হারিস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব, (রাসূলের চাচাতো ভাই) শাহাদতের সময় বয়স ছিল ৬৩ বৎসর।

গ. 'উমার ইবনু আবি ওয়াক্কাস, কুরাইশী মুহাজির, প্রখ্যাত সাহাবী ও সেনাপতি সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের ভাই। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে ইনি শাহাদত লাভ করেন। তাঁর কচি বয়সের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যুদ্ধে যেতে মানা করেন তখন তিনি কেঁদে আকুল হন। অগত্যা তিনি তাকে যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি প্রদান করেন।

ঘ. আকিল ইবনু বুকাইর, মুহাজির।

ঙ. হারিস ইবনু হারিসা ইবনু সুরাকা, তাঁর মাতা ছিলেন আনাস ইবনু মালিকের ফুফু, মুহাজির।

চ. 'উমাইর ইবনু আবদ 'উমাইর ইবনু নাযলাহ, আনসারী।

ছ. 'আউফ বা মু'আয ইবনু আ'ফরা।

জ. মু'আব্বিয ইবনু আ'ফরা, ৭ম ও ৮ম জন আবূ জাহ্লের কাতেল, আনসারী।

ঝ. ইয়াযীদ ইবনু হারিস অথবা হারিস ইবনু কায়স ইবনু মালিক আনসারী।

ঞ. 'উমাইর ইবনু হাশাম, আনসারী।

ট. রাফি' ইবনু মু'লা, আনসারী।

ঠ. আম্মার ইবনু যিয়াদ, আনসারী।

ড. সা'দ ইবনু হুসাইমা, আনসারী। পিতা হুসাইমা তাঁকে বলেছিলেন, তুমি থেকে যাও, আমিই যাচ্ছি জিহাদে। ছেলে বললেন, আব্বাজান! আমাকে জান্নাত গমনে বাধা দেবেন না। পিতা হুসাইমা উহুদ যুদ্ধে শরীক হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। সুতরাং সা'দ হচ্ছে সাহাবীর পুত্র সাহাবী, শহীদের পুত্র শহীদ।

ঢ. মুবাশশির ইবনু 'আবদুল মুনযির আনসারী। (যারকানী এবং আল ইসতি'আব) *–অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

Contents

যুদ্ধের উত্তেজনা শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সময় বললেন, আবূ জাহলের এখন কী অবস্থা– এ খবরটা আমাদের জন্য কে নিয়ে আসবে? ইবনু মাস'ঊদ বললেন, আমি যাচ্ছি। তিনি নিহত লাশগুলোর মধ্যে খুঁজে খুঁজে তাকে বের করলেন। দেখলেন কুরাইশ সর্দার সংজ্ঞাহীন পড়ে আছে, মু'আয এবং মু'আব্বিয– দুই ভাই আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দুশমনকে এমনভাবে আঘাত করেছে যে তার আর উঠে দাঁড়াবার বা বসার ক্ষমতা নেই। তবে সে তখনও মরেনি।

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদকে মাক্কায় এ আবূ জাহলের হাতে অনেক দুঃখ-কষ্ট সইতে হয়েছে। এখন তাকে চিনতে পেরেই তিনি এগিয়ে গেলেন এবং তার দাড়ি ধরে বলতে লাগলেন, হায়! তুমিই সেই আবূ জাহল (যার ছিল দৌর্দণ্ড প্রতাপ আর যার হাতে এবং যার কারণে মুসলিমদের এত দুর্ভোগ!)

মুমূর্ষু আবূ জাহ্ল তখন বন্ধ চোখ দু'টো খুলে তাকাল। সে উদ্বেগ জড়িত নম্র কণ্ঠে ইবনু মাস'ঊদকে জিজ্ঞেস করল, জয় হলো কার? উত্তর হল– "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর। হে আল্লাহর দুশমন! বল দেখি, আল্লাহ তোকে অপমান করে ছাড়লেন কিনা।"

অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ তার দেহ থেকে মস্তকটি কেটে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে রাখলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত মস্তক দেখেই বলে উঠলেন–

اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ.

উচ্চারণ: আল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হু।

তিনবার তিনি এ কালিমা আবৃত্তি করলেন।

তারপর তাঁর পবিত্র কণ্ঠে উচ্চারিত হল:

اَللهُ أَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী- সদাক্বাহ ওয়া'দাহূ ওয়া নাসারা 'আবদাহূ ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ্।

"আল্লাহ সর্বশক্তিমান! সেই প্রভুর প্রশস্তি গাইছি– যিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছেন, তাঁর দাসকে সাহায্য ও জয়যুক্ত করেছেন– যিনি (প্রকৃত প্রস্তাবে) এককভাবে কাফিরদের সেনাবাহিনীকে পরাভূত করেছেন।"

তিনি বললেন, আমাকে তার কতলগাহটা একবার দেখিয়ে দাও। তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। তার মস্তকহীন লাশ দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে উঠলেন,

সে ছিল এ উম্মাতের ফিরআউন! (আজ দেখ তার পরিণতি!)

রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত অন্যান্য কুরাইশ দুশমনদের মৃত দেহও দেখলেন। দেখে বললেন, 'প্রতিবেশীরূপে তোমরা ছিলে– তোমাদের নাবীর প্রতি নিকৃষ্টতম প্রতিবেশী। তোমরা আমাকে মিথ্যা বলে জেনেছিলে– আর অপর লোকেরা আমাকে সত্য বলে মেনেছিল; "তোমরা আমাকে অপমান করে বের করে দিয়েছিলে আমার জন্মভূমি থেকে। আর (মাদীনার) লোকেরা আমাকে সাহায্য করেছিল, আশ্রয় দিয়েছিল।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুকুম মতে বাদ্‌র ময়দানে একটি বিরাট গর্ত করে তাদের মৃত দেহগুলোকে প্রোথিত করা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরবার সময় নাম ধরে ডেকে বললেন: "হে 'উত্‌বা, হে

www.waytojannah.com

Contents

শাইবা, হে রাবী'আ, হে অমুক, হে অমুক, তোমরা কি ঠিক ঠিক মত পেয়ে গেছ সেই বস্তু যা– তোমাদের মহা প্রভু আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ওয়া'দা করেছিলেন? আমরা পেয়ে গেছি পুরোপুরিরূপে যা তিনি আমাদের সঙ্গে ওয়া'দা করেছিলেন।"

'উমার (রা) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনি– যা বলেছেন ওরা কি তা শুনতে পাচ্ছে? আল্লাহর রাসূল জওয়াব দিলেন, তারা যা শুনতে পাচ্ছে– তার চাইতে তোমরা অধিক শুনছ না, তবে উত্তর দেয়ার ক্ষমতা তাদের নেই।

শহীদদের লাশগুলো তা'যীমের (সম্মানের) সঙ্গে কবরস্থ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধলব্ধ অস্ত্রশস্ত্র এবং গণিমতের মালসহ বিজয়ী বেশে মাদীনার পথে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে 'সাফরায়' এসে গণীমতের মাল মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ বন্টন করে দিলেন। মাদীনায় অত্যন্ত শান-শওকতের সঙ্গে বিজয় অভিনন্দনে তিনি সম্বর্ধিত হলেন, মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনির গগণবিদারী আওয়াজের মাঝে মাদীনার উৎফুল্ল আবালবৃদ্ধ মুসলিমগণ বিজয়ী রাসূল এবং তাঁর মুজাহিদ বাহিনীকে বরণ করে নিলেন।[৪২]

---

[৪২] পথিমধ্যে এবং মাদীনায় বন্দীদের প্রতি মুসলিমগণ যে সুন্দর ব্যবহার করেছিলেন আবু আযীয নামক জনৈক বন্দীর বিবরণ থেকে– তার পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠে। তার বর্ণনা হচ্ছে: "মুহাম্মাদ ﷺ-এর আদেশক্রমে মুসলিমগণ দুই বেলা আমাদের জন্য রুটি তৈরী করে দিত, আর নিজেরা খেজুর খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করত। আহারের কোন উত্তম জিনিস হস্তগত হলে, নিজেরা না খেয়ে তা আমাদেরকে খাইয়ে যেত।

স্যার উইলিয়াম মূরের ন্যায় বিদ্বেষপুষ্ট খৃস্টান লেখকও এ সত্যকে অস্বীকার করতে না পেরে বলতে বাধ্য হয়েছেন:

"In pursuance of Muhammad's command,:he citizens and such of:he refugees as had houses of:heir own, received:he prisoners with kindness and consideration. 'Blessings on:he men of Medina!' Said one of:hese in later days::hey made us ride, while:hey:hemselves walked afoot,:hey gave us wheaten bread:o eat when:here was little of it contenting:hemselves with dates."

অর্থাৎ "মুহাম্মাদের আদেশে মাদীনাবাসীগণ এবং সমর্থ মুহাজিরবর্গ বন্দীদের সাথে বিশেষ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। একজন বন্দী পরে নিজেই বলেছে, আল্লাহ মাদীনাবাসীদের মঙ্গল করুন! তারা আমাদেরকে উটে ও ঘোড়ায় সওয়ার করে দিত আর নিজেরা হেঁটে যেত। তারা আমাদেরকে ময়দার রুটি তৈরী করে খাওয়াত, আর নিজেরা খেজুর খেয়ে কাটিয়ে দিত।"

ইসলামের ইতিহাসে বাদ্‌র যুদ্ধের গুরুত্ব এবং তার ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে মরহুম কবি গোলাম মোস্তফার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: "ইসলামের জয়যাত্রার এখান হতেই মোড় ফিরেছে। এতদিন সে ছিল নিরীহ। এখন সে হল নির্ভীক। এতদিন সে ছিল শান্ত ও সংযত, এখন সেই হল মুক্ত, আজাদ– প্রাণ মাতাল। আল্লাহ তা'আলা এজন্য কুরআন মাজীদে বাদ্‌র বিজয়ের দিনকে 'মুক্তির দিন' বলে অভিহিত করেছেন। সত্যই এটা মুক্তির দিন। বিধর্মীরা তাকে কবলিত করার জন্য সমস্ত আয়োজন করেছিল, কিন্তু ইসলাম সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এ দিন বিজয়ী বেশে বের হয়ে এসেছে।

"(পরাজয় ঘটলে) কুরাইশগণ তো মাদীনা আক্রমণ করতই। অধিকন্তু নগরের পৌত্তলিক, ইয়াহূদী ও মুনাফিকগণও তাদের সাথে যোগ দিত। ফলে ইসলাম ও তার পয়গম্বরের ভাগ্যে কী ঘটত– কে বলবে?

পক্ষান্তরে বাদ্‌র বিজয়ে মুসলিমগণ এক নূতন জীবনের সন্ধান পেল। তাদের মধ্যে যে অসীম শক্তি লুকিয়ে আছে, অগণিত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেও তারা যে জয়ী হতে পারে– শত্রু সেনার সংখ্যা দেখে তারা যে মোটেই শঙ্কা করে না, তারা যে দুর্বার, দুর্দ্ধমনীয়, এ বিশ্বাস তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেল। ইসলাম যে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম, রাসূল যে সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল, আল্লাহ যে মুসলিমদের সহায়– এ কথা সকলের মনেই দাগ কেটে বসল। রাসূল এতদিন যে দাবি করে আসছিলেন এবং যে আশার বাণী শুনাচ্ছিলেন, বাদ্‌র যুদ্ধে তার সত্যতা প্রমাণিত হল। *–অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

Contents

বিজয়ী বেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাদীনায় প্রবেশ করলেন তখন ইসলাম বৈরী পৌত্তলিক ও ইয়াহূদ সম্প্রদায় অত্যন্ত নাখোশ হলো ও নিরাশ হয়ে পড়ল। এক প্রকার অস্ত্রহীন অবস্থায় স্বল্প সংখ্যক মুসলিম বিপুলভাবে অস্ত্রসজ্জিত তিন চারগুণ কুরাইশদের পরাজিত করতে সক্ষম হবে এ ছিল তাদের কল্পনার অতীত। সে অকল্পিত অসম্ভব ব্যাপারই যখন ঘটে গেল, তখন ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে অনেকের বিশ্বাস জন্মে গেল, আবার অনেকে ভয়ে মুসলিমদের সঙ্গে মিলে এক হয়ে থাকাই শ্রেয় মনে করল। ফলে বেশ কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম কবুল করল। তার মধ্যে ছিল পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা পরবর্তী কালের কুখ্যাত মুনাফিক 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই এবং তার সঙ্গী সাথীগণ।

ক্ষুদ্র অভিযান

মাদীনার বাইরের কাফির সম্প্রদায় ইসলামের শক্তি বৃদ্ধিকে মোটেই সুনজরে দেখতে পারেনি। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং উৎপাত সৃষ্টির চেষ্টার সংবাদ পেয়ে আল্লাহর নাবী ﷺ-কে তাদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে ছোট খাট অভিযান প্রেরণ করতে হয়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কোন অভিযানে নেতৃত্ব প্রদান করেন। সর্বপ্রথমটি ছিল বানী সালিমের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেখানে পৌছার পর শত্রুরা যুদ্ধের সম্মুখীন না হওয়ায় ৩ দিন অবস্থানের পর নাবী ﷺ মাদীনায় ফিরে আসেন।

কুরাইশদের নবতর ষড়যন্ত্র

বাদ্‌র যুদ্ধে পরাজিত, লাঞ্ছিত এবং পর্যুদস্ত– কুরাইশরা মুখ কালো করে যখন মাক্কায় ফিরে গেল তখন আবূ সুফ্‌ইয়ান যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ শুনে অপমানের জ্বালায় দগ্ধীভূত হতে লাগল। সে প্রতিজ্ঞা করল মুহাম্মাদ ﷺ -এর বিরুদ্ধে নতুন অভিযান পরিচালনা না করা পর্যন্ত সে গোসল করবে না, মাথায় পানি স্পর্শ করবে না। অতঃপর যিলহাজ্জ মাসে দু'শত বাছাই করা অশ্বারোহী নিয়ে সে মাদীনা অভিমুখে যাত্রা করল। মাদীনার নিকটে পৌছার পর তার বাহিনীকে কোন গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রেখে মাদীনার ইয়াহূদী পল্লীতে রাতের অন্ধকারে প্রবেশ করে সাল্লাম ইবনু মাশকামের সঙ্গে রাত অতিবাহিত করল। সাল্লাম তাকে খুবই আদর অভ্যর্থনা করল। তাকে খুব করে ভুরিভোজন এবং শরাব পরিবেশন করে মুসলিমদের খবরাখবর সম্বন্ধে অবহিত করল। অতি প্রত্যূষেই সেখান থেকে বিদায় নিয়ে কুরাইশ নেতা আপন লোকদের সঙ্গে মিলিত হলো। মাক্কায় ফেরার পথে মাদীনার উপকণ্ঠে কৃষিক্ষেত্রে কার্যরত দু'জন আনসারকে হত্যা এবং খেজুর শস্যাদি কেটে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিল।

এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি (ﷺ) কতিপয় মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে আবূ সুফ্‌ইয়ানের পশ্চাতে ধাবিত হন। সংবাদ শোনা মাত্রই শত্রুদল দ্রুত পলায়নের পথ অবলম্বন করে। সে অভিযানে তারা বস্তা বোঝাই করে ছাতু সঙ্গে এনেছিল। ফিরবার সময় দ্রুত পলায়নের জন্য এগুলো অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এগুলো সব ফেলে তারা নিজেদের জান বাঁচানোর ব্যবস্থা করে। ছাতুর বস্তাগুলো মুসলিমদের হস্তগত হয়। এর থেকে এ অভিযানের নাম হয় 'গাযওয়ায় সাবীক'। সাবীক অর্থ ছাতু। এ ঘটনাটি ঘটে বাদ্‌র যুদ্ধের দু' মাস পর।

www.waytojannah.com

Contents

আর একটি মারাত্মক ষড়যন্ত্র

জঙ্গে বাদ্‌রের কিছু দিন পরের কথা। সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া এবং 'উমাইর ইবনু ওয়াহ্‌বের মধ্যে গোপনে কথা হচ্ছিল। প্রথম জনের পিতা বাদ্‌র যুদ্ধে নিহত হয় আর দ্বিতীয়জনের পুত্র মুসলিমদের হাতে তখন পর্যন্ত বন্দী।

মাক্কার বাইরে সুনসান নামক পাহাড়ের এক নিভৃত নিরালা জায়গায় বসে তারা কথা বলছে।

'উমাইর বলছে- আমার ঘাড়ে যদি ঋণের বোঝা আর আমার পোষ্যদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব না থাকত, তাহলে যেমন করেই হোক আমি মাদীনা গিয়ে মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যা করে আসতাম।

সাফওয়ান- ঠিক আছে, আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করে দেব। আর তোমার পোষ্যদের ভরণ-পোষণের জিম্মা আজীবন আমার ঘাড়ে রইল।

'উমাইর- আমি রাযী। কিন্তু একটি কথা। কথাটি গোপন রাখবে, কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে না পারে।

'উমাইর তার তলোয়ার শানিত করল, তাতে তীব্র জহর মিশিয়ে নিল, তারপর মাদীনা অভিমুখে রওয়ানা হল (ক্ষুরধার তরবারিখানি আমূল তীব্র হলাহলে সিক্ত করার কারণ এই যে, মাদীনায় গিয়ে লোক-পরিবৃত মুহাম্মাদ ﷺ-এর গায়ে তাড়াতাড়িতে দু' এক বারের বেশী আঘাত করা হয়ত সম্ভব নাও হতে পারে এবং সেজন্য তিনি আহত হয়েও বেঁচে যেতে পারেন। কাজেই কোন গতিকে একবার উক্ত তলোয়ার দিয়ে তার অঙ্গে আঘাত হানতে পারলে তার মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠবে।)

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাদের নিয়ে মাসজিদে-নাবাবীতে বসে আছেন, এমন সময় 'উমাইর তার উটসহ মাসজিদের সামনে এসে পৌছল। 'উমার ফারূক (রা) তাকে প্রথম দেখতে পেলেন। তার গলায় ঝুলানো একটি তরবারি। সকলেই তাকে জানত (শাইতানুন মিন শাইতানিল কুরাইশ) কুরাইশদলের অন্যতম শাইতান রূপে। তার হাবভাব দেখেই সূক্ষ্মদর্শী ও কুশাগ্রবুদ্ধি 'উমার (রা) বুঝে নিলেন, নিশ্চয় এ শাইতান কোন অসৎ উদ্দেশে আগমন করেছে। এজন্য নাবীর খিদমাতে হাজির হয়ে তাঁকে সতর্ক রাখার উদ্দেশে বললেন, 'উমাইর অস্ত্রসজ্জিত হয়ে এসেছে! রাসূলুল্লাহ ﷺ অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, বেশ, ওকে আমার সামনে নিয়ে এসো।

'উমার (রা) 'উমায়রের কাছে গিয়ে খপ করে তার তরবারি ধরে তার গর্দান পাকড়াও করে রাসূলের নিকট নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'উমার, ওকে ছেড়ে দাও।

'উমাইর অগ্রসর হয়ে সালাম নিবেদন করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন,

'উমাইর! কী মনে করে তোমার আগমন?

'উমাইর: জী! আমার বন্দী ছেলেটার খোঁজ খবর নেবার জন্য- আর কী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ: বেশ ভালো কথা! কিন্তু এই তরবারি সঙ্গে কেন?

'উমাইর: এ একটা তলোয়ার! আমাদের তলোয়ার দ্বারা আমরা আপনাদের কী ক্ষতি করতে পেরেছি?

রাসূলুল্লাহ ﷺ: তুমি সত্যি কথা বল- কেন এসেছ?

'উমাইর একই কথার পুনরাবৃত্তি করে চলল।

www.waytojannah.com

Contents

রাসূলুল্লাহ ﷺ: দেখ! তুমি আর সাফ্ওয়ান ইবনু 'উমাইয়া মাক্কার নিকটবর্তী সুনসান পাহাড়ে নিরালায় বসে পরামর্শ আঁটছিলে। সাফ্ওয়ান তোমার ঋণের বোঝা আর পরিবার পরিজনের দায়িত্ব ভার ঘাড়ে নিয়েছিল– আর তুমি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলে যে, আমাকে হত্যা করবে। সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্যই তুমি এখানে এসেছ। নয় কি?

'উমাইর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে এসব গোপন কথা শুনে রীতিমত স্তম্ভিত। সে তখন মনে মনে ভাবল, এমন একান্ত গোপন কথা– যা সে এবং সাফ্ওয়ান ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ জানে না। ইনি এখানে মাদীনায় বসে কী করে জানতে পারলেন? ইনি সত্য সত্যই আল্লাহর নাবী। মনের এ অবস্থায় সে তখন বলে উঠল: আমার হৃদয় এখন মেনে নিচ্ছে– আপনি সত্য সত্যই আল্লাহর নাবী এবং রাসূল। নইলে যে কথা আমি এবং সাফওয়ান ছাড়া তৃতীয় আর কেউ জানে না সেই গোপন কথা কী করে আপনি জানতে পারলেন? আল্লাহর শুকর যিনি অনুগ্রহ করে আমার এ দুরভিসন্ধিকেই ইসলাম গ্রহণের এক উপলক্ষ্য বানিয়ে দিয়েছেন।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রাণ নিতে এসেছিল– সেই তাঁর অধম সেবকে পরিণত হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, এখন থেকে উমাইর তোমাদের দুশমন নয়– ভাই। স্বীয় ভ্রাতাকে এখন উত্তমরূপে দীন-ইসলামের কথা শিখিয়ে দাও, কুরআন মুখস্থ করাও আর তার ছেলেকে মুক্ত করে দাও।

'উমাইর মাদীনায় রওয়ানা হওয়ার পর ওদিকে সাফওয়ান কুরাইশ সর্দারদের ইঙ্গিত করে বলত, কিছু দিনের মধ্যেই তোমরা এক অবাক করা কথা শুনতে পাবে, এমন এক শুভ সংবাদ আমি তোমাদের দিতে পারব যা শুনে তোমরা বাদ্‌রের সমস্ত শোক ও দুঃখ ভুলে যাবে।

এদিকে 'উমাইর কিছু দিন পর ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিফহাল হয়ে একদা নাবীর খিদমাতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমাকে মাক্কায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি সেখানে গিয়ে লোকদের দীন ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে চাই। এভাবে আমি পূর্বে মুসলিমদের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার চালিয়েছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে অভিলাষী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি দিলেন। 'উমাইর মাক্কায় এসে তাঁর সাধ্যমত ইসলাম প্রচার শুরু করে দিলেন এবং এক এক করে বহু কাফিরকে ইসলামে দীক্ষা প্রদান করলেন। সাফওয়ান 'উমাইরকে পরিবর্তিত মানুষে রূপান্তরিত দেখে তাজ্জব হয়ে গেল। একি? যার সম্বন্ধে এত আশা, এত ভরসা তার এমন দশা! মুহাম্মাদ ﷺ-এর যাদু তার উপরেও এমন আশ্চর্যরূপে ফলে গেল?

তার বড় দুঃখ হল। তার ভীষণ অনুতাপ হল। সে বলল, একে মাদীনায় পাঠিয়ে কী ভুলটাই না করেছি। সে কসম খেয়ে প্রতিজ্ঞা করল, জীবনে যত দিন বেঁচে আছি 'উমাইরের সঙ্গে কথা বলব না, তার কোন উপকার করব না!

কিন্তু 'উমাইর এখন বেপরোয়া, সে সত্যের সন্ধান লাভ করেছে, এক মহা জ্যোতির আলোকে সে এখন প্রদীপ্ত। সেই আলোক ছড়ানোর কাজই এখন তার একমাত্র কর্তব্য। সে কর্তব্য পালন করে চলল, কারোর নিন্দার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে, কারো ভয়ে বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে।

www.waytojannah.com

Contents

দ্বিতীয় হিজরীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটি হচ্ছে কুরাইশ বন্দীদের মুক্তি দান। সাহাবাগণের পরামর্শ নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেন। তবে যেসব বন্দী লেখাপড়া জানত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রত্যেকের মুক্তিপণ নির্ধারণ করলেন মাদীনার দশজন বালককে লেখাপড়া শিক্ষাদান। কতিপয় নিঃস্ব ব্যক্তিকে তিনি মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেন।

নাবীর কনিষ্ঠতম কন্যা বিবি ফাতিমা (রা)-এর সঙ্গে বীর কেশরী 'আলী ﷺ-এর বিবাহ এ সনেই সম্পাদিত হয়। এ সনেই আল্লাহ মুসলিমদের জন্য রমাযানের সওম ফরযরূপে নির্ধারিত করেন। রমাযানের সওম আনুষঙ্গিকরূপে সদাকাতুল ফিত্‌র বা সওমের ফিত্‌র এবং ঈদুল ফিত্‌র এবং তারপর যিলহাজ্জ মাসে ঈদুল আযহাও এ সনেই প্রচলিত হয়।

বানী কাইনুকার নির্বাসন

এ সনের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের অন্যতম গোত্র বানী কায়নুকার নির্বাসন। মুসলিমদের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও শুধু সন্ধির শর্তই তারা ভঙ্গ করেনি- বাদ্‌র যুদ্ধের পর মুসলিমদের অনিষ্ট করার, কুরাইশদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার এবং মাদীনার আনসারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জঘন্য অপকৌশলেও তারা লিপ্ত হয়।[৪৩]

তারা একজন মুসলিম মহিলাকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে তাকে নির্লজ্জভাবে অপমানের একশেষ করেছিল। তাঁর সম্ভ্রম রক্ষার্থে অগ্রসর একজন মুসলিম তাদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়।

বানী কায়নুকার উপরোল্লিখিত ষড়যন্ত্র এবং এ অবমাননাকর, জঘন্য ও নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিকারের জন্য মুসলিমগণ উত্তেজিত হয়ে উঠেন। কিন্তু দয়ার নাবী ও শান্তির রাসূল মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ তাদেরকে শান্ত করে স্বয়ং বানী কায়নুকার বাজারে উপস্থিত হলেন। তিনি ইয়াহূদীদের ডেকে এনে বললেন, "হে ইয়াহূদ সমাজ! তোমরা আনুগত্য স্বীকার কর, নতুবা কুরাইশদের ন্যায় তোমাদেরও বিপন্ন হতে হবে।"[৪৪]

তাঁরা তা না করায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি নেন। তারা দুর্গে আশ্রয় নেয়। পনের দিন অবরুদ্ধ থাকার পর তারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নির্বাসিত করেন।

---

[৪৩] ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে বলছেন যে, এ কাইনুকা বংশের ইয়াহূদগণ সর্বপ্রথম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং তারাই সর্বাগ্রে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে উত্থান করেছিল। (তাবাকাত, তাবারী, মাওয়াহিব, হালবী, ইবনু হিশাম) *–অনুবাদক।*

[৪৪] কিন্তু বানী কায়নুকা নাবীর এ উপদেশে কোনই কর্ণপাত করল না। অধিকন্তু যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শাসানোর স্পর্ধা দেখাল। ফলে আল্লাহর নাবী ﷺ নিরাশ হয়ে ফিরে আসলেন এবং একান্ত বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য মুসলিমদের প্রতি হুকুম জারি করলেন।

বাইরে মৌখিক আস্ফালন দেখালেও মনের ভিতরে তাদের সাহস ছিল না। তাই মুসলিমদের অভিযানের কথা শুনে তারা তাদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করল। মুসলিমগণ নাবীর আদেশে দুর্গ অবরোধ করলেন। দীর্ঘ পনেরদিন অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকার পর তাদের রসদ ফুরিয়ে আসল। কুরাইশ, পৌত্তলিক, খাযরাজ প্রভৃতিদের নিকট থেকে সাহায্যের আশা তারা করেছিল। সে আশার গুড়েও যখন বালি দেখতে পেল, তখন আত্মসমর্পণ ছাড়া তাদের আর কোন উপায় রইল না।

তারা মাদীনা ছেড়ে যাবে বলে প্রস্তাব পাঠাল। 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই তাদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সুপারিশ করল। তারা ছিল 'আবদুল্লাহ ইবনু সালামের কওমের লোক। দয়ার নাবী মহামানব মুহাম্মাদ ﷺ তাদেরকে তিন দিনের মধ্যে মাদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা সিরিয়ায় চলে গেল। তারা ছিল ব্যবসায়ী এবং স্বর্ণকার। নগদ টাকা এবং স্বর্ণ তারা যথাসাধ্য সঙ্গে নিয়ে গেল। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য ধন-সম্পদ মুসলিমদের হস্তগত হল। এগুলো লাভ করে নিঃসন্দেহে মুসলিমদের সম্পদ ও শক্তি বর্ধিত হল। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

Contents

উহুদের যুদ্ধ

আবূ সুফ্ইয়ানের অভিযান

বাদ্‌র যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজয় বরণ করায় কুরাইশরা তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বদ্ধপরিকর হল। উক্ত যুদ্ধে অধিকাংশ কুরাইশ সরদারের মৃত্যু ঘটায় আবূ সুফ্ইয়ানের ঘাড়ে নেতৃত্বের দায়িত্ব এসে গেল। বাদ্‌র যুদ্ধের পর পরই সে কী উদ্দেশ্যে মাদীনায় আগমন করেছিল তা আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি। মাদীনায় ইয়াহূদদের মনোভাব বুঝে আসার পর সে মাক্কা এবং তার নিকটবর্তী প্রদেশসমূহের বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার কাজে মনোনিবেশ করল। তার চেষ্টায় কিছু দিনের মধ্যে ৩ (তিন) হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

তৃতীয় হিজরীর শাওওয়াল মাসে এ বাহিনী বিপুল অস্ত্র-শস্ত্রসহ আবূ সুফ্ইয়ানের নেতৃত্বে মাদীনা অভিমুখে রওয়ানা হল। কিছু সংখ্যক রণ উন্মাদিনী নারীকেও তারা সঙ্গে নিয়ে চলল। এরা পুরুষ যোদ্ধাদের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং প্রতিহিংসাবৃত্তিকে উত্তেজিত করার কাজে নিয়োজিত ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচা 'আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে তাদের সংবাদ এবং অন্যান্য তথ্যাদি পেয়ে যান। মাদীনার নিকটে এসে পাহাড়ের উত্তর পূর্ব কোণে তারা সৈন্য সন্নিবেশ করে। সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'জন গুপ্তচর প্রেরণ করে তাদের সম্বন্ধে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করলেন। অতঃপর তাঁর নির্দেশে আল-হব্‌র ইবনু মুনযির ছদ্মবেশে শত্রু শিবিরে প্রবেশ করে তাদের সৈন্য সংখ্যা, সমর সজ্জা প্রভৃতির সঠিক তথ্য নিয়ে আসেন।

সাহাবীদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরামর্শ

তারপর তাদের কোথায় এবং কিভাবে মুকাবেলা করা যায়– মাদীনার অভ্যন্তরে, না মাদীনার বাইরে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি সাহাবীদের এক পরামর্শ সভা আহ্বান করলেন।

তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অভিমত ছিল শহর থেকে বের না হওয়ার এবং দুশমনকে শহরের প্রবেশ মুখে প্রতিরোধ করার। যদি তারা শহরে ঢুকেই পড়ে তা হলে মাদীনার রাস্তা ও গলিসমূহের মোড়ে মোড়ে পুরুষেরা যুদ্ধ করবে। আর নারীরা গৃহের ছাদ থেকে পাথর বর্ষণ করবে।

'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই মুনাফিকের মতও ছিল এটাই।

কিন্তু কতিপয় সাহাবী শহরের ভিতর থেকে প্রতিরোধ করার কাজটিকে মোটেই সমীচীন মনে করলেন না। শহরের বাইরে গিয়ে শত্রুর মুকাবেলা করাই শ্রেয় মনে করলেন। এদের মধ্যে যেমন ছিলেন কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবী, তেমনি ছিল বেশ কিছু সংখ্যক উৎসাহী নওজোয়ানও। অবশেষে এ মতটিই প্রবল হয়ে উঠায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে প্রস্তুত হয়ে আসতে বলে নিজে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। এদিকে প্রবীণ সাহাবীরা ভেবে দেখলেন কাজটি ভালো হল না।

তারা মনে করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের সিদ্ধান্তের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্যই বাইরে গিয়ে শত্রুর মুকাবেলা করতে অগ্রসর হচ্ছেন। কাজেই তারা স্থির করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মত অনুসারে ভিতরে থেকে প্রতিরোধ করাই হবে উচিত কাজ। সেই মতে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুরোধ জানাবেন বলে স্থির করলেন।

www.waytojannah.com

Contents

অধিকাংশের রায় অনুসারে উহুদের দিকে যাত্রা শুরু

কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ ﷺ রণসাজে সজ্জিত হয়ে বাইরে আসলেন। সাহাবীগণ তাঁকে যুদ্ধের পূর্ণ সাজে সজ্জিত দেখতে পেয়ে কিছুটা হতচকিত হলেন। পরক্ষণে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করছি। নতুন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার আমরা আপনার উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। শহরে অবস্থান করে শত্রুদের মুকাবেলা করা যদি আপনি শ্রেয় মনে করেন তবে তাই আপনি করুন। সর্বাবস্থায় আমরা আপনার পিছনে রয়েছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, না, তা হয় না। সর্বজন গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে আল্লাহর নাবী বাইরে গিয়েই শত্রুর মুকাবেলা করবেন– এ নিয়্যাতে তিনি বের হয়ে পড়েছেন, এখন সে সিদ্ধান্ত পাল্টানো চলে না। এর ভিতরেই রয়েছে কল্যাণ– যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ এবং দৃঢ়তা অবলম্বন করে থাকতে পার। তবে আল্লাহ যদি এর বিপরীত কোন আদেশ প্রদান করেন- তা হলে স্বতন্ত্র কথা।

অধিকাংশের রায় তথা সাধারণ সিদ্ধান্তের উপর নাবীর এ দৃঢ়তা দর্শনে সাহাবীরা আর কিছু বলতে সাহস পেলেন না। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে যার ঘরে যে অস্ত্র ছিল তাই নিয়ে এসে হাজির হলেন। আনসার মুহাজির, ছোট বড় সকলকে নিয়ে মুজাহিদদের সংখ্যা হল এক সহস্র। দিনটি ছিল শুক্রবার। 'বিসমিল্লাহ' বলে সহস্র সেনা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর রাসূল আল্লাহর পথে যাত্রা শুরু করলেন।

'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই-এর পশ্চাদপসরণ

'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই পথিমধ্যে তার তিনশত সৈন্য নিয়ে কেটে পড়ল। সে এ অজুহাত দেখাল– "আমি বয়োবৃদ্ধ– মুহাম্মাদ ﷺ আমার কথা শুনলেন না, কতকগুলো তরলমতি অজ্ঞ বালকের রায়কে গুরুত্ব দিয়ে তিনি মাদীনার বাইরে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হলেন। সুতরাং এ যুদ্ধে আমি শরীক হতে পারি না।" এ বলে সে তার তিনশত সৈন্য নিয়ে মাদীনার দিকে ফিরে চলল। 'আবদুল্লাহ ইবনু হায্ম তাকে তার মত পরিবর্তনের জন্য বুঝাতে লাগলেন– বুঝাতে বুঝাতে অনেক দূর পর্যন্ত তার সঙ্গে চললেন। কিন্তু মুনাফিকের হৃদয়ে তাঁর কোন কথাই দাগ কাটতে পারলো না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে মোটেই বিচলিত হলেন না। তিনি অবশিষ্ট সাতশত সৈন্য নিয়েই উহুদের ঘাটির দিকে এগিয়ে চললেন।

যুদ্ধের ময়দানে

উহুদ পর্বতকে পশ্চাতে রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সুবিধাজনক স্থানে ঘাঁটি গাড়লেন। সম্মুখে উন্মুক্ত ময়দান, পশ্চাতে উহুদ পর্বতমালা, ময়দানের অপর প্রান্তে বহু অস্ত্রসজ্জিত বিপুল সংখ্যক কুরাইশ সৈন্য। শক্ত হুকুম জারি করে দিলেন, বিনা হুকুমে কেউ যেন যুদ্ধ শুরু করে না দেয়।

শনিবার। ফজরের সালাতের পর মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। দুশমনের সংখ্যা তিন সহস্র– যাদের মধ্যে রয়েছে (দুই সহস্রাধিক) পদাতিক, (দুইশত) অশ্বারোহী, (সাতশত) উষ্ট্রারোহী। আর এদিকে? সৈন্য সংখ্যা মাত্র সাতশত। তাতে মাত্র ৫০ জন অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহী আর ৫০ জন তীরন্দাজ!

www.waytojannah.com

Contents

সর্বপ্রথমেই দূরদর্শী রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত ৫০ জন তীরন্দাজকে 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর-এর নেতৃত্বে পশ্চাতে পর্বতমালার গিরিপথের মাথায় নিয়োজিত করলেন। উদ্দেশ্য– যাতে করে দুশমন দল পিছন দিক থেকে মুসলিমদের উপর অতর্কিত হামলা চালাতে না পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রতি এ শক্ত হুকুম দিয়ে রাখলেন, সাবধান! তোমরা কোন অবস্থাতেই এ স্থান ত্যাগ করবে না। যুদ্ধের গতি যে দিকেই মোড় নিক, জয় হোক, পরাজয় ঘটুক– কোন অবস্থাতেই আমার হুকুম ছাড়া এ স্থান থেকে কোন দিকে এক পাও নড়বে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে সেনাপতির সাজে সজ্জিত হলেন। তিনি দু'টি বর্ম পরিধান করলেন। মুস'আব ইবনু 'উমাইর-এর হাতে সমর্পণ করলেন ইসলামের হেলালী ঝাণ্ডা।

নওজোয়ানদের জিহাদী জোশ

মাদীনা থেকে বেশ কিছু সংখ্যক বালকও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অতি আগ্রহে মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে উহুদ পর্যন্ত চলে এসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ফেরত পাঠিয়ে দেয়াই সমীচীন মনে করলেন। তিনি তাদেরকে তাঁর সামনে হাজির হতে বললেন। যাদের বয়স খুব কম ছিল তাদের তিনি ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার, 'উসমান ইবনু যাইদ, যাইদ ইবনু সাবিত, 'উসাইদ ইবনু যুহাইর, বারা' ইবনু 'আযিব, যাইদ ইবনু আরকাম, আরাবা ইবনু আউস এবং আমর ইবনু হায্ম। এদের চাইতে যারা কিছুটা বড় ছিলেন তারাও বাদ পড়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু তারা যুদ্ধে যোগদানের খুব বেশি জিদ ধরায় এবং অটল সঙ্কল্প প্রকাশ করতে থাকায় শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের যোগদানের অনুমতি প্রদান করলেন। এদের মধ্যে ছিলেন সামুরা ইবনু জুনদুব এবং রাফি' ইবনু খাদীজ। এদের বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর।[৪৫]

দিনের প্রথমভাগে মুসলিমদের জয় সূচিত হচ্ছিল, তাঁরা দুশমনদের অবস্থা কাহিল করে তুলছিলেন। তাঁরা তাদের পরাজিত, পর্যুদস্ত ও পশ্চাদ্ধাবন করে নারীদের শিবির পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন।

---

[৪৫] "কিশোর বয়স্ক মুসলিমগণ যখন দেখলেন যে, ছোট বলে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে, তখন তাদের মনস্তাপের অবধি রইল না। রাফি' নামক একজন বালক এ ছোটত্বের কলঙ্ক ঘুচাবার জন্য পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠির উপর ভর দিয়ে জোর করে বড় হতে লাগলেন। তখন সকলে বললেন যে, বালকটি তীর নিক্ষেপে খুবই সিদ্ধহস্ত। সুতরাং এ সকল কারণে তাঁকে অনুমতি দেয়া হল। সামুরা ইবনু জুনদুবও তখন বালক ছিলেন এবং এজন্য তাঁকেও যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি দেয়া হয়নি। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, তাকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে, তখন তিনি অভিমানভরে স্বীয় পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, রাফি'কে আমি কুস্তিতে লড়ে হারিয়ে দিয়ে থাকি, সে অনুমতি পেল– আর আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে, এ কেমন বিচার! বালকগণের আত্মোৎসর্গের এ স্বর্গীয় স্পৃহা দর্শনে রাসূল যে কতদূর আনন্দিত হয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। শিশু ও বালকগণকে নিয়ে আনন্দ করতে রাসূল বড়ই ভালোবাসতেন। হুকুম হল– "বেশ কথা। তুমি রাফি'র সঙ্গে কুস্তি লড়, দেখা যাক।" আর যায় কোথায়, দেখতে দেখতে দুই বালক তাল ঠুকে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন এবং সৌভাগ্যবান সামুরা এতে জয়লাভ করলেন। তখন রাসূল হেসে বললেন– "আচ্ছা, তোমাকেও অনুমতি দেয়া গেল।" পাঠকগণ স্মরণ রাখবেন যে, এ বালকগণই দু'দিন পরে অর্ধ-পৃথিবীর উপর ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করে দিয়েছিলেন। ধন্য তাঁরা, ধন্য তাঁদের জনকজননী, আর শত ধন্য সেই মহাগুরু, যাঁর শিক্ষাপ্রভাবে এমন অসাধ্য সাধনও সম্ভবপর হয়েছিল। –*অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

Contents

বিপর্যয়ের সূচনা

'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা)-এর নেতৃত্বাধীন তীরন্দাজগণ যখন দেখলেন যে, কুরাইশরা যুদ্ধের মাঠ হতে পালিয়ে গেছে এবং অন্যান্য মুসলিম সৈন্যরা তাদের মাল-রসদ লুণ্ঠনে ব্যাপৃত, তখন তারা আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না, লোভের বশবর্তী হয়ে তারা জায়গা না ছাড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শক্ত নির্দেশটি ভুলে গেলেন। তারা মনে করলেন যে মুশরিকরা আর যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরে আসতে পারবে না। এই ভেবে তারা তাদের 'পজিশন' ছেড়ে গিয়ে লুণ্ঠন কাজে শরীক হয়ে পড়লেন। তাদের নেতা যুবাইর (রা) তাদের আটকে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন কিন্তু তাদের বেশির ভাগই তাঁর নিষেধ বাণীর প্রতি কোনই ভ্রুক্ষেপ করলেন না, মাত্র ১২/১৩ জন মর্দে মু'মিন স্ব স্ব স্থানে অটলভাবে দণ্ডায়মান রইলেন।

ওদিকে কুরাইশ বীর চূড়ামণি খালিদ ইবনু ওয়ালীদ যখন দেখতে পেলেন যে, মুসলিম তীরন্দাজগণের অধিকাংশ গিরিপথ ছেড়ে চলে গেছে তখন তিনি তার অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী নিয়ে পিছন দিক থেকে নক্ষত্র বেগে অবশিষ্ট তীরন্দাজদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রাণপণ যুদ্ধ করে অবিচল তীরন্দাজগণ একে একে সবাই শহীদ হয়ে গেলেন। পথ নিষ্কণ্টক হল। অন্যান্য মুসলিম যোদ্ধা অগণিত শত্রুর আকস্মিক আক্রমণে বেসামাল হয়ে পড়লেন। বিশৃঙ্খলায় অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, শত্রু-মিত্রের পার্থক্য পর্যন্ত উঠে গেল। একজন মুসলিম অপর মুসলিমের আঘাতে শাহাদত বরণ করলেন। দুশমনের প্রচণ্ড আক্রমণে অনেকে আহত হলেন, অনেকে সরে পড়লেন, বহু বীর মুজাহিদ শাহাদত বরণ করলেন। এ শহীদদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা বীর শ্রেষ্ঠ আমীর হামযা অন্যতম।[৪৬]

কাফিররা অগ্রসর হতে হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে পৌছে যায় এবং তাঁর উপর আক্রমণ শুরু করে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য জীবন বিসর্জনে প্রস্তুত কতিপয় সাহাবা নিজেদের দেহকে ঢালরূপে স্থাপন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রক্ষার চেষ্টা করতে থাকেন। বর্শা ও তলোয়ারের আঘাতে রক্তাক্ত এবং তীর বর্ষণে জর্জরিত হয়েও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁরা অক্ষত রাখতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারক ক্ষত বিক্ষত হল। তাঁর ডান চোয়ালের নীচের চারটি দাঁত শহীদ হল। মস্তকের উপর তরবারির আঘাতে শিরস্ত্রাণ কেটে তার দু'টো 'কড়া' কপালে ঢুকে পড়ল। তাঁর উপর মুষলধারে এত পাথর বর্ষিত হল যে, তিনি আঘাতের চোটে এক সময় এক গর্তে নিপতিত হলেন। 'আলী (রা) এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে তাকে তুলতে চেষ্টা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কপালে শিরস্ত্রাণের কড়া দু'টো এমন ভাবে ঢুকে পড়েছিল যে, 'উবাইদা (রা) সেই কড়া- দাঁতে কষে ধরে টেনে বের করতে সচেষ্ট হলে তার দু'টো দাঁত ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মস্তক এবং কপাল থেকে দর বিগলিত ধারায় রক্ত ঝরে পড়ছিল। আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর পিতা মালিক ইবনু সিনান আহত স্থানে মুখ লাগিয়ে রক্ত চুষে নেন।

---

৪৬ বাদ্‌র যুদ্ধে কাফির নিধনে তিনি ছিলেন অগ্রণী। এ যুদ্ধেও ৩১জন কুরাইশ বীরের দেহ দ্বিখণ্ডিত করার গৌরব তিনি অর্জন করেন। বাদ্‌র যুদ্ধে তাঁর হস্তে নিহত তুআইমা ইবনু আফীর ভ্রাতুষ্পুত্র যুবাইর ইবনু মুত'ঈমের নিগ্রো দাস ওয়াহশী মুক্তিলাভের প্রতিশ্রুতিতে এক অসতর্ক মুহূর্তে বীর হামযার তলপেট লক্ষ্য করে এক অব্যর্থ বর্শা নিক্ষেপ করে। নিক্ষিপ্ত বর্শা তাঁর উদর বিদ্ধ করে পৃষ্ঠ ভেদ করে চলে যায়। ফলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি আল্লাহর নাম করে ঢলে পড়েন এবং শাহাদত প্রাপ্ত হন।

আবূ সুফ্‌ইয়ানের স্ত্রী (হিন্দা– যার পিতা 'উত্‌বা হামযার হাতে বাদ্‌র যুদ্ধে নিহত হয়) প্রতিহিংসায় পিতৃ হন্তার মৃতদেহের বুকের উপর বসে তাঁর নাক কান কেটে মালা বানায় এবং পেট চিরে কলিজা বের করে কাঁচা কলিজা চিবিয়ে মনের ঝাল মিটাবার প্রয়াস পায়। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

Contents

নিশান বরদার মুস'আব ইবনু 'উমাইর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চোখের সম্মুখে শাহাদত লাভ করলেন। তাঁর হস্তচ্যুত ঝাণ্ডাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আলীকে তুলে নেবার নির্দেশ দিলেন। ক্রমে মুশরিকদের আক্রমণের বেগ আরও জোরদার হয়ে উঠল। প্রায় দশজন মুসলিম একের পর এক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করলেন। তবু দুশমন দলের আক্রমণের বেগ প্রশমিত হল না। অবশেষে তালহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহ সিংহ বিক্রমে শত্রুর উপর লাফিয়ে পড়লেন এবং তাদেরকে কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য করলেন। অতঃপর কিঞ্চিৎ দূর থেকে অবিরাম তীর বর্ষিত হয়ে চলল। আবূ দুজানা নামক এক সাহাবী নিজের দেহকে ঢাল বানিয়ে সমস্ত তীর নিজের পিঠ দিয়ে প্রতিহত করতে লাগলেন।

এমন সময় কাফির-শিবিরে এক গুজব উত্থিত হল যে, মুহাম্মাদ ﷺ নিহত হয়েছেন। ক্রমে তা মুসলিম মুজাহিদদেরও কানে এসে পৌঁছল। তখন সকলের পক্ষে এ জনরবের সত্যতা নিরূপণের মত অবস্থা ছিল না। ফলে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধার মনে নৈরাশ্যের ছায়া নেমে আসল এবং তারা পলায়নে উদ্যত হল।

আনাস ইবনু নাযারের বাহাদুরী

আনাস ইবনু নাযার (রা) যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে চলেছেন–এমন সময় দেখতে পেলেন মুসলিমদের একদল নিরাশ মনে অধঃবদনে যুদ্ধ ক্ষেত্রের এক প্রান্তে বসে আছে। তিনি তাদের লক্ষ্য করে হাঁক দিয়ে বললেন, "তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা এত উদ্বিগ্ন কেন?" তারা বলে উঠলেন, "আর কী করার রয়েছে আমাদের? স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই যে শহীদ হয়ে গেলেন?" আনাস তখন গর্জন করে বলে উঠলেন, 'তাঁর শাহাদতের পর তোমাদের বেঁচে থেকে কী লাভ? উত্থিত হও, যুদ্ধ কর এবং বীরের মত তোমরাও সেই আদর্শের জন্য আত্মদান কর যে জন্য তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন।" এ বলেই তিনি শত্রু সৈন্যের দিকে অগ্রসর হলেন, সামনে সা'দ ইবনু মু'আযের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁকে বললেন, "হে সা'দ! উহুদের দিক থেকে জান্নাতের খুশবু আমার নাকে আসছে।" পরক্ষণেই তিনি দুশমন দলের উপর ক্ষিপ্র বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বীর বিক্রমে তিনি যুদ্ধ করে অবশেষে শাহাদত বরণ করলেন। পরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাঁর দেহে তীর, তলোয়ার এবং বর্শার ৭০টি আঘাত চিহ্ন রয়েছে। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফও সে দিনের যুদ্ধে সাংঘাতিকভাবে জখম হয়েছিলেন। তাঁর দেহে প্রায় বিশটি জখম চিহ্ন ছিল।

মুসলিমদের স্বস্তিদায়ক সংবাদ

কাফিরদের অশুভ তৎপরতা যখন কিছুটা কমে আসল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম দলের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সমগ্র দেহ এবং চেহারা মুবারক লৌহবর্মে আবৃত ছিল, শুধু চক্ষুদ্বয় উন্মুক্ত ছিল এবং চমক দিচ্ছিল– ক্ষণে ক্ষণে দীপ্ত হয়ে উঠছিল।

সর্বপ্রথম কা'ব ইবনু মালিক তাঁকে চিনতে সমর্থ হন। তিনি উল্লাস ভরে চীৎকার দিয়ে উঠেন; মুসলিমগণ! শুভ সংবাদ গ্রহণ করো এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেঁচে আছেন, এখানে তিনি উপস্থিত রয়েছেন। তৎক্ষণাৎ ইশারায় নির্দেশ দিলেন চুপ থাকো। অতঃপর জীবিত মুসলিমদের নিয়ে তিনি পাহাড় চূড়ার ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বাক্‌র, 'উমার, 'আলী, হারিস আনসারী প্রমুখ সাহাবাবৃন্দ (রা)। যখন পাহাড়ের দিকে উঠতে যাচ্ছেন তখন ইসলামের অন্যতম বড় দুশমন উবাই

www.waytojannah.com

ইবনু খাল্‌ফকে তার ঘোড়া দৌড়িয়ে আসতে দেখতে পেলেন। মাক্কায় সে প্রতিজ্ঞা করে এসেছিল, "এই ঘোড়ায় চড়েই মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যা করব।" কিন্তু যেই মাত্র সে নিকটে পৌছে গেল তখনই রসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং হারিস আনসারী (রা)-এর হাত থেকে বর্শাটা নিয়ে তার প্রতি আঘাত হানলেন। সে ঘাড়ে সাংঘাতিকভাবে জখমী হয়ে আছাড় খেতে খেতে পালাতে প্রয়াস পেলো কিন্তু বেশি দূর যাওয়া সম্ভব হল না, পথে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কংকরময় পাহাড়ে উঠতে চেষ্টা করে তিনি ব্যর্থ হলেন। অবশেষে তালহা (রা) বসে পড়ে তার কাঁধ পেতে দিলেন। তিনি তাঁর কাঁধে চড়ে উপরে উঠলেন। এখানে সালাতের সময় হয়ে আসায় বসে বসেই তিনি জামা'আতের সালাত পরিচালনা করলেন।

উহূদ যুদ্ধে মহিলাদের বীরত্ব

এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের মহিলারা বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। মুশরিকদের নিশানবরদার নিহত হওয়ার পর 'উমার বিনতে 'আলক্বামাহ এগিয়ে এসে ঝাণ্ডা নিজ কাঁধে উঠিয়ে নেয়। অপর পক্ষে মুসলিম বাহিনীতে উম্মু আম্মারা দুর্দান্ত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে শৌর্যবীর্যের অতুল্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি মুশরিকদলের প্রখ্যাত পাহলোয়ান 'আম্‌র ইবনু কামআর উপর পর পর কয়েকবার তলোয়ার দিয়ে হামলা চালান। কিন্তু উক্ত মুশরিক দুই লৌহ-বর্মে আচ্ছাদিত থাকায় আঘাতে কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ না করে উম্মু আম্মারাকে আক্রমণ করে জখমী করে দেয়। কিন্তু এক মুসলিম মুজাহিদ একবার আবূ সুফ্‌ইয়ানের স্ত্রী হিন্দাকে তাঁর তলোয়ারের নিচে পেয়ে এবং আঘাত হানার পূর্ণ সুযোগ লাভ করেও অস্ত্র সংবরণ করেন।

যুদ্ধ শেষে আবূ সুফ্‌ইয়ানের চিৎকার

বেলা শেষে যখন যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে এল, তখন আবূ সুফ্‌ইয়ান পাহাড়ের উপর আরোহণ করে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, মুহাম্মাদ ﷺ কি জীবিত? কেউ কোন জওয়াব না দেয়ায় সে আবার গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল, আবূ কুহাফার ছেলে (আবূ বাক্‌র) কোথায়? সকলেই নীরব। তৃতীয়বার সে চিল্লিয়ে বলল, 'উমার ইবনু খাত্তাব এখানে আছে। কেউ কোন উত্তর দিল না। এদিক থেকে কোন উত্তর না পেয়ে সে মুশরিকদের ডেকে বললো, ওল্লাহি! তোমরা সবাইকে খতম করে দিয়েছো?

'উমারের জওয়াব

এবার 'উমার (রা) আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনিও তার গলার স্বর যথেষ্ট উচ্চ করে বলে উঠলেন, ওরে দুশমনে আল্লাহ! আমরা সবাই আল্লাহর ফযলে জীবিত! তখন আবূ সুফ্‌ইয়ান আওয়াজ দিল উলু হুবাল- হুবাল কী জয়!

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা জবাব দিচ্ছ না কেন? তারা নিবেদন করলেন, আমরা কী বলব? তিনি বললেন, বলো–

اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ.

আল্লাহ আ'লা ওয়া আজাল্লা– "আল্লাহ হচ্ছেন উচ্চতম শ্রেষ্ঠতম।"

সাহাবীগণের মুখে এ কালিমা শুনে আবূ সুফ্‌ইয়ান বললো–

www.waytojannah.com

Contents

لنا عزى ولا عزى لكم.

আমাদের উপাস্য দেবতা ও অভিভাবকরূপে রয়েছে উযযা (মূর্তি) কিন্তু তোমাদের জন্য নেই কোন উযযা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়ে দিলেন, তোমরা বলো-

الله مولنا ولا مولى لكم.

আমাদের প্রভু ও সাহায্যকারীরূপে আছেন আল্লাহ – কিন্তু তোমাদের নেই কোন প্রভু ও সাহায্যকারী।

আবূ সুফ্ইয়ান বললো, আজকের দিনে আমরা বাদ্‌রের বদলা নিয়ে নিলাম– আর এ যুদ্ধে (জয় লাভ করে) তোমাদের বরাবর হলাম। 'উমার (রা) জওয়াব দিলেন, কেমন করে বরাবর হলে? আমাদের শহীদরা জান্নাতে স্থান লাভ করলেন আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামের গহ্বরে ঢুকল!

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জখম

সহীহুল বুখারী এবং সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে– আবূ হাযিম (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জখম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, আমি এ পর্যন্ত বলতে পারি তাঁর জখমের স্থান কে ধুলেন, কে পানি বয়ে আনলেন এবং কী ঔষধ ব্যবহার করা হল। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) জখম ধুয়ে দিচ্ছিলেন, 'আলী (রা) পানি ঢালছিলেন। যখন এতে রক্ত পড়া বন্ধ হল না তখন ফাতিমাতুয যাহরা (রা) চাটাইয়ের একটি টুকরা জ্বালিয়ে তার ভস্ম জখমের স্থানগুলোতে লাগিয়ে দিলেন, ফলে রক্ত ঝরা বন্ধ হল।

সহীহুল বুখারীতে আছে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাঁত শহীদ হল এবং মাথা ফেটে রক্ত বের হতে লাগল, তখন তিনি হাত দিয়ে সেই রক্ত মুছতে লাগলেন, আর আফসোসের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'সেসব লোক কী করে মুক্তি পাবে যারা তাদের প্রতি প্রেরিত নাবী ﷺ-এর মাথা ফাটালো, আর দাঁত ভেঙ্গে দিল– অথচ তিনি তো তাদেরকে শুধু তাদের প্রভু আল্লাহর দিকেই আহ্বান জানিয়েছিলেন (অন্য কিছু করেননি)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ অভিযোগ আল্লাহর দরবারে নাপছন্দ হল আর অমনি কুরআনের আয়াত নাযিল হল:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ.

"তোমার– হে রাসূল! এ ব্যাপারে কোন অধিকার নেই (কিছু বলার) যে, আল্লাহ তাদের তওবাহ কবূল করবেন, না তাদের শাস্তি প্রদান করবেন, অবশ্য তারা যালিম।" (সূরা আলে-'ইমরান– ১২৮)

আনাস ও হুযাইফা (রা)-এর উদারতা

এ কিয়ামাত সদৃশ যুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থায় যখন সাধারণভাবে মুসলিমরা পলায়ন-উদ্যত, তখন আনাস ইবনু নাযার অটল ও অবিচলরূপে দণ্ডায়মান। তিনি পুনঃ পুনঃ হামলা চালাতে চালাতে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন, হে আল্লাহ! এসব মুসলিমদের পক্ষ থেকে তোমার নিকট ওজর পেশ করছি। আর ওদের (কাফিরদের) কাজ থেকে তোমার নিকট আমাদের দায়মুক্তি ঘোষণা করছি!

www.waytojannah.com

Contents

হুযাইফা (রা) যখন দেখতে পেলেন, মুসলিমরা যুদ্ধের ডামাডোলে অজ্ঞাতসারে এবং ভ্রান্তিবশতঃ তাঁর পিতার উপর আঘাত করে চলেছে, তখন তিনি চিৎকার করে ডেকে বললেন, ওগো– লোক সকল! তোমরা করছ কী? মুসলিমদেরই তরবারির আঘাতে তাঁর পিতা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে শাহাদত বরণ করলেন! কিন্তু তিনি মুখ দিয়ে উহ্ পর্যন্ত বললেন না, শুধু বললেন, ইয়াগফিরুল্লাহু লাকুম! আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিন! রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দুঃখজনক দুর্ঘটনার কথা শুনে যখন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ খুনের দণ্ড আদায় করে দিতে চাইলেন, তখন হুযাইফা নিবেদন করলেন, আমি খুনের দণ্ড মুসলিমদের প্রতি সদাকাহ স্বরূপ দান করে দিলাম। এমনিতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হুযাইফা (রা) ছিলেন প্রিয়। ক্ষমা, ত্যাগ ও উদারতার এ অনন্য দৃষ্টান্তের পর তাঁর নিকট প্রিয়তর হয়ে উঠলেন।

সা'দ ইবনু রাবী'র কথা

যাইদ ইবনু সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সা'দ ইবনু রাবী'র অনুসন্ধানে প্রেরণ করে বলে দিলেন, যদি তাকে খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার অবস্থা জানার জন্য উৎকণ্ঠিত।

যাইদ বলছেন, আমি এক এক করে লাশের পর লাশ পরীক্ষা করে এগিয়ে চললাম। অবশেষে আহতদের মধ্যে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত ও রক্ত-রঞ্জিত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তিনি ওষ্ঠের সাহায্যে তখন দম নিচ্ছেন। দেহে বর্শা, তীর এবং বল্লমের প্রায় ৭০টি জখম। আমি আওয়াজ দিয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম বলে পাঠিয়েছেন আর আপনার অবস্থা জানতে চেয়েছেন। তাঁর কানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা প্রবেশ করা মাত্র তিনি চক্ষু বিস্ফারিত করে আমার দিকে তাকালেন। অত্যন্ত ব্যাকুল হৃদয়ে কাতর কণ্ঠে অতি কষ্টে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার সালাম। যাইদ! তুমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর খিদমাতে জানাবে যে, সা'দ তার নাকে জান্নাতের খুশবু পাচ্ছে। আর আমার গোত্রের লোকদের বলে দিবে– তোমরা জীবিত থাকতে দুশমনের দল যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছতে সক্ষম হয় তাহলে কাল আল্লাহর নিকটে তাদের কোন ওযর আপত্তিই কাজে আসবে না। এ কথা বলার পর পরই তাঁর রুহ্ মুবারক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে উর্ধ্বমুখে উড়ে গেল! (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

উহুদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের কারণ

উহুদ যুদ্ধটি ইসলামের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলিমদের যে বিপর্যয় ঘটে তাকে কারণ-বিহীন বলা চলে না। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বড় বড় হিকমাত এ বিপর্যয়ের ভিতর নিহিত রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, মুসলিমদের (যাদের ইতিহাস সবে মাত্র শুরু হয়েছে) বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজন ছিল যে, যুদ্ধে সিপাহসালারের আনুগত্য সৈন্যদের উপর ফরয– অপরিহার্য কর্তব্য। আর যুদ্ধের যিনি পরিচালক ও সর্বাধিনায়ক তাঁর হুকুম অমান্য করার পরিণাম ধ্বংস বরণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআন মাজীদে বলে দেয়া হয়েছে:

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

www.waytojannah.com

Contents

"হে মু'মিন মুজাহিদগণ! আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা তাদেরকে (মাক্কার কাফিরদেরকে) আল্লাহর অনুমতিক্রমে বিনাশ করে চলেছিলে (এবং এ বিনাশ কার্য অব্যাহত ছিল) যে পর্যন্ত না– তোমরা সাহস হারিয়ে ফেললে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করে দিলে এবং যা তোমরা ভালোবাস তা তোমাদেরকে দেখিয়ে দেয়ার পরও তোমরা অবাধ্য হয়ে পড়লে। তোমাদের মধ্যে কতক লোক ইহকাল চাচ্ছিল আর কতক পরকাল চাচ্ছিল, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন, এতদসত্ত্বেও তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ হচ্ছেন বিশ্বাসপরায়ণ ব্যক্তিদের প্রতি অনুগ্রহশীল।" (সূরা আলে-'ইমরান, ১৫২)

বিপর্যয়ের ফল

উহুদের বিপর্যয়ের ফলে পরবর্তী সময়ে মুসলিমগণ খুব হুঁশিয়ার হয়ে যান! বিপর্যয় আনতে পারে অথবা পরাজয় ঘটাতে পারে– এমন যে কোন বিষয় থেকে তারা পূর্ব থেকে সাবধান থাকতেন। সব রকম সম্ভাব্য বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন।

এছাড়া এ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে মুসলিমরা আল্লাহর এ শাশ্বত নিয়ম সম্পর্কে অবহিত হন যে, সত্য এবং সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের চূড়ান্ত বিজয় অবধারিত কিন্তু মধ্যপথে জয় ও পরাজয় হকপন্থী এবং না-হকপন্থী উভয়ের ভাগ্যেই ঘটে থাকে। কেননা যদি সব সময় ও সর্বাবস্থায় হকের পক্ষেই সাফল্য ঘটতে থাকে তাহলে মু'মিন আর কাফির, সত্যের পূজারী ও মিথ্যার পূজারীদের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা উঠে যাবে। প্রতিটি লোক না বুঝে, চিন্তা-ভাবনা না করে এবং হৃদয়ে ঈমান দৃঢ়মূল না করেই মু'মিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর চিরাচরিত হিকমাত হচ্ছে এ যে, হকপন্থী এবং বাতিলপন্থীদের মধ্যে একটা পার্থক্যের সীমারেখা বজায় থাকবে।

মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গীর সংশোধন

এছাড়া আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের এ কথা হৃদয়ঙ্গম করাতে চেয়েছিলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ রাসূল হলেও একজন মানুষ আর মানুষ মাত্রই মরণশীল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেও একদিন মানব সুলভ মৃত্যুবরণ করতেই হবে– তিনি চিরদিন জীবিত থাকবেন না। কিন্তু সত্য চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব। হক অটল ও অবিচলরূপে বিদ্যমান থাকবে, কস্মিনকালে ধ্বংস হবে না। মুসলিমকে হতে হবে হকপন্থী– সত্যের পূজারী। কাজেই তাঁর দৃষ্টি ব্যক্তির জীবন মরণের উপর নিবদ্ধ থাকবে না, বরং নিবদ্ধ থাকবে সত্যের উপর। তার কর্তব্য হবে সত্যকে প্রতিষ্ঠা দান। যুদ্ধ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যু সংবাদ শুনে বিচলিত হওয়া এবং যুদ্ধ ছেড়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে পড়া অথবা ভেগে যাওয়া মুসলিমের পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়। এ হচ্ছে তার ঈমানী দুর্বলতার পরিচায়ক। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাহাদতের গুজব শোনা মাত্র তাদের বৃহত্তর সংখ্যক লোক কেন অভিভূত হয়ে পড়লো? তারা কি ধরে নিয়েছিল যে, সত্যের পরাজয় ঘটল? সত্য বিধ্বস্ত হল? যে চিরঞ্জীব আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে হককে প্রেরণ করেছেন– তিনি কি বিদ্যমান নেই?

সাহাবীদের মধ্যে অন্ততঃ কিছু সংখ্যক লোক এমন অটল বিশ্বাসে বলীয়ান ছিলেন যে, সাংঘাতিকভাবে আহত এবং মৃত্যুপথ-যাত্রী হয়েও তাদের ঈমানের মধ্যে কোনরূপ সন্দেহ অথবা শিথিলতা আসতে পারেনি। একজন আনসার জখমী হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিলেন, আর একজন

www.waytojannah.com

Contents

আনসার সে দিক দিয়ে অতিক্রম করার সময় জিজ্ঞেস করলেন, ওগো অমুক! তুমি কি শুনেছ যে, মুহাম্মাদ ﷺ নিহত হয়েছেন? সেই মর্দে মু'মিন তখন গর্জে উঠলেন, মুহাম্মাদ ﷺ যদি শাহাদত বরণ করেই থাকেন, তাতে কী হয়েছে? তিনি হকের তাবলীগ তো করে গেছেন। তোমারও উচিত স্বীয় দীন-ধর্মের জন্য নিজের জীবনকে তাঁরই মত বিলিয়ে দেয়া। এর পরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি কুরআনের এ অবিস্মরণীয় আয়াত নাযিল হল:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِيْنَ.

"মুহাম্মাদ (ﷺ) রাসূল ব্যতীত আর কিছু নন, তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়ে গেছেন। সুতরাং যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে? (জেনে রাখ) কেউ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে সে কখনই আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।" (সূরা: আলে-'ইমরান: ১৪৪)

অতীতের আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিদের আত্মবিসর্জন

এর পরেই আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বে কত নাবী এবং তাদের সঙ্গে অগণিত সত্য সাধক যুদ্ধ করেছেন, নিহত হয়েছেন কিন্তু তাতে তাদের অনুসারী মর্দে মু'মিনগণ নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়েনি, বরং দৃঢ়তর সংকল্প ও হিম্মতের সঙ্গে আল্লাহর পথে সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন:

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوْا لِمَا أَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ.

"এবং কত নাবী যুদ্ধ করে গেছেন তাদের সঙ্গে থেকে, কত শত আল্লাহওয়ালাও যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহর পথে লড়াই করতে করতে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তাতে তারা হীনবল হয়নি, দেবেও যায়নি, হিম্মত হারিয়ে বসে পড়েনি, (জেনে রাখো!) আল্লাহ দৃঢ়পদ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।" (সূরা: আলে-'ইমরান: ১৪৬)

তাঁরা এ অবস্থায় আল্লাহর নিকট শুধু এ নিবেদনই জানিয়েছেন:

رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

"হে আমাদের প্রভু পরোয়ারদিগার! আমাদের গুনাহ খাতা এবং আমাদের কার্যে আমাদের সীমালঙ্ঘন তুমি মাফ করে দাও, আমাদের কদমগুলোকে সুদৃঢ় করে রাখো এবং (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী) কাফির কওমের উপর বিজয়লাভে আমাদের সাহায্য করো।" (সূরা: বাকারাহ: ২৮৬)

এ দৃঢ়নিষ্ঠা এবং ধৈর্য অবলম্বনের ফল কী হল? আল্লাহই তা বলে দিচ্ছেন:

فَآتَاهُمُ اللهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

"ফলে আল্লাহ তাদেরকে দান করলেন পার্থিব পুরস্কার এবং আখিরাতে প্রদান করলেন জান্নাতের ফল, আর আল্লাহ পছন্দ করে থাকেন সৎকর্মশীল ব্যক্তিদেরকে।" (সূরা: আলে-'ইমরান: ১৪৮)[৪৭]

---

[৪৭] এ যুদ্ধের প্রসঙ্গে সূরা আলে 'ইমরানের শেষের দিকে ৬০টি আয়াত মওজুদ রয়েছে। আর তার শুরু হচ্ছে " وَإِذْ غَدَوْتَ " থেকে (১২১ আয়াত)।

www.waytojannah.com

Contents

হানযালা (রা)-এর শাহাদত ও মর্যাদা

সদ্য বিবাহিত হানযালা (রা) যুদ্ধের সময় বাসর দিন যাপন করছিলেন। এজন্য যুদ্ধের গোড়ার দিকে যোগদান করতে পারেননি। মাদীনায় নব দম্পতি সুখ শয্যায় শায়িত রয়েছেন। এমন সময় উচ্চ নিনাদে উচ্চারিত উহুদের বিপর্যয় সংবাদ এবং যুদ্ধে যোগদানের উদাত্ত আহ্বান হানযালার কানে পৌঁছল। সে আহ্বান তার কানের ভিতর দিয়ে হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভুলে গেলেন তিনি তার বাসর রাতের সুখ বাহু বন্ধন, ভুলে গেলেন তাঁর ফরয গোসলের প্রয়োজনের কথা। প্রিয়ার বাহু বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে অবিলম্বে অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে তিনি ছুটে চললেন উহুদ যুদ্ধপ্রান্তরের দিকে। এসেই কুরাইশ নেতা আবূ সুফ্ইয়ানের উপর তীব্র আক্রমণ শুরু করে দিলেন। পিছনে থেকে শাদ্দাদ ইবনু আসওয়াজ তাঁর উপর অতর্কিত প্রতি আক্রমণ করে বসে। অচিরেই তিনি শাহাদতের পেয়ালা পান করে জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রস্থান করেন।

শহীদদের বিনা গোসলে– শাহাদতের পবিত্র খুন রঞ্জিত অবস্থায় দাফন করা হয়। কিন্তু শাহাদতের সময় হানযালা (রা) ছিলেন জনুবী– অপবিত্র। তাই ফেরেশতাগণ তাঁকে তুলে নিয়ে নিজেরাই গোসল দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দৃশ্য দেখতে পান এবং সাহাবীদেরকে এ খবর জানান। তিনি তাদেরকে বললেন, "হানযালার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে এর রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করো।" তাকে জিজ্ঞেস করে জানা যায়, তিনি যুদ্ধের আহ্বান শুনে গোসলের জন্য অপেক্ষা না করেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলে যান। সাহাবাগণ হানযালার কাছে এসে দেখতে পান তার চুল থেকে তখনও গোসলের পানি ঝরছে।

'আম্র (রা)-এর শাহাদত-অভিলাষ

'আম্র ইবনু জুমূহ ইবনু যাইদ ইবনু হারাম ছিলেন অন্যতম আনসার সরদার। তিনি ছিলেন খোঁড়া। তার চার পুত্রই উহুদ যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু চার পুত্রকে জিহাদে পাঠিয়েও তিনি তৃপ্ত হতে পারলেন না। নিজে খোঁড়া হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে যোগদানের জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অনেকে তাকে বাধা দিয়ে বললেন, আপনি মা'যূর, চলতে পারেন না, আপনি কেমন করে যুদ্ধে যোগদান করবেন। তদুত্তরে তিনি বললেন, আমার ছেলেরা শাহাদাত বরণ করে জান্নাতে যাবে আর আমি বাইরে থেকে যাব? আমি কি শাহাদাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকব? তিনি আল্লাহর নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা জানালেন।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيَ الشَّهَادَةَ وَلَا تَرُدَّنِيْ إِلَى أَهْلِيْ خَيْبًا

"আল্লাহুম্মার যুকনীশ্ শাহাদাতা ওয়ালা তারিদনী ইলা আহলী খাইয়্যিবান।"

"হে আল্লাহ! আমাকে শাহাদাত দিয়ে অনুগৃহীত কর, আর আমাকে নিরাশ করে আমার পরিবারের নিকট ফিরিয়ে এনো না।"

'আম্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাযির হয়ে তাঁর যুদ্ধে যোগদানের ব্যাকুলতা প্রকাশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে আপত্তি জানালেন কিন্তু পরে তাঁর অদম্য আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দর্শনে অনুমতি প্রদান করলেন। নাবী ﷺ-এর অনুমতি লাভ করে 'আম্র খোঁড়াতে খোঁড়াতেই যুদ্ধে যোগদান করেন। তুমুল যুদ্ধের মধ্যে তিনি তাঁর পা টেনে টেনে দৌড়িয়ে চললেন এবং দুশমনের উপর হামলা চালালেন। আক্রমণের সময় তাঁর মুখ দিয়ে তাঁর এ অন্তরাকাঙ্ক্ষাই পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হচ্ছিল– "হে আল্লাহ! আমি জান্নাতের অভিলাষী, আমি জান্নাতের অভিলাষী।" বলাবাহুল্য তাঁর সে অভিলাষ পূর্ণ হল। তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁর এক পুত্র খাল্লাদ ইবনু 'আম্রও তার পশ্চাতে অবস্থান করে যুদ্ধ করছিলেন। তিনিও শাহাদাত বরণ করলেন।

www.waytojannah.com

Contents

এক মহিয়সী মহিলার ধৈর্য ও নাবী প্রেম

উহুদ যুদ্ধে এক মহিলার স্বামী, ভ্রাতা এবং পুত্র শাহাদাত বরণ করেন। মহিলাটির নাম হিন্দ, স্বামী হচ্ছেন উপরোল্লিখিত 'আম্‌র ইবনু জামূহ, পুত্র হচ্ছেন খাল্লাদ ইবনু 'আম্‌র আল-বাদ্‌রী এবং ভ্রাতা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র খাযরাজী আল-বাদ্‌রী, প্রসিদ্ধ সাহাবী জাবির (রা)'র পিতা।

মহিয়সী মহিলা হিন্দ একে একে ভ্রাতা, পিতা এবং স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনেও কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিরাপত্তার খবর এবং একবার তার পবিত্র বদনমণ্ডল দেখার আকুল আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে বলেন, তিনি যখন বেঁচে আছেন এবং নিরাপদে রয়েছেন তখন আমার সব মুসিবাত সব শোক দুঃখ বরদাশত করা সহজ।

যুদ্ধ শেষে এ মহিলা তার স্বামী, পুত্র এবং ভ্রাতার মৃতদেহ খুঁজে বের করে উটের পিঠে তুলে মাদীনায় নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু উট মোটেই সেদিকে পা চালাল না। অনেক হাঁক ডাক, মারধর করার পরেও যখন তাকে কোন মতে মাদীনার দিকে প্রধাবিত করা গেল না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, এর কারণ কী? নিশ্চয় এর কোন গোপন রহস্য রয়েছে। মহিলাটি তখন তার স্বামী 'আম্‌র মাদীনা হতে আসার সময় তার পরিবারের সঙ্গে মিলিত না হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট যে দু'আ জানিয়েছিলেন তা প্রকাশ করলেন। নাবী ﷺ তখন বললেন, এ হচ্ছে সেই কারণ যেজন্য উট মাদীনার দিকে যেতে চাচ্ছে না। অবশেষে উহুদের প্রান্তরে হিন্দের ভ্রাতা 'আবদুল্লাহ এবং স্বামী 'আম্‌রকে একই কবরে দাফন করা হয়।

আর একজন নাবী প্রেমিক মহিলা

অন্য বিবরণে আর একজন মহিলা সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি উহুদে মুসলিমদের বিপর্যয়ের কথা শুনে মাদীনা থেকে উদাসিনী বেশে উহুদ পর্যন্ত ছুটে এসেছেন। এমন সময় কতিপয় মুসলিমের সাক্ষাৎ পেয়ে তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন: সংবাদ কী?

"সংবাদ আর কী বলব তোমার সহোদর নিহত হয়েছেন।"

"ইন্না লিল্লাহ- আল্লাহ তাঁর আত্মার মঙ্গল করুন! আর কী সংবাদ"

"তোমার স্বামী নিহত!"

"উহ্-ইন্না লিল্লাহি-তাঁর আত্মার কল্যাণ হোক! আর কী সংবাদ"

"তোমরা পিতা....."

"হায়, স্নেহময় পিতা নিহত! ইন্না লিল্লাহি, তাঁর আত্মার কল্যাণ হোক। রাসূলের সংবাদ কী তা-ই জিজ্ঞেস করছি!"

"ভদ্রে! সংবাদ শুভ, রাসূল ﷺ জীবিত আছেন এবং ঐ তোমার সম্মুখ দিকে অবস্থান করছেন।"

"আমাকে একবার দেখাও, সেই প্রাণ প্রতীম প্রিয়তম কোথায়?"

তখন মুসলিমগণ তাকে নিয়ে রাসূলের সম্মুখে উপস্থিত করলেন। এতক্ষণে তাঁর শান্তি হল এবং তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন: "কুল্লু মুসিবাতিন বা'দাকা জালাল!" তোমাকে পেলেই সব বিপদই নগণ্য![৪৮]

---

৪৮ "বহু চেষ্টার পরও এ মহিলার নাম সুনির্দিষ্ট করতে পারিনি। আসমা বিনতে ইয়াযিদ নামে এক বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন মহিলাকে আমরা দেখতে পাই। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করেছিলেন। তাঁর

www.waytojannah.com

Contents

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহ্বান

যুদ্ধের এক ভয়াবহ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এক তেজদৃপ্ত গম্ভীর ভাষায় মুসলিম যোদ্ধাদের উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করলেন: "নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে শত্রুর গতিরোধ করতে পারে এমন কেউ আছে কি?

আল্লাহর জন্য, ধর্মের জন্য, আল্লাহর নামে আত্মবলি– এটাইতো মুসলিম জীবনের সার্থকতা। জিয়াদ নামক জনৈক আনসার যুবক হুঙ্কার দিয়ে বললেন, আমি।"

জিয়াদ পাঁচ-সাতজন আনসার বীরকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রবর্তী শত্রু সেনাদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জিয়াদ ও তাঁর সহচরগণ মরণের হাতে অমর বর লাভের প্রত্যাশায় দৃঢ় সংকল্প হয়েই এমন অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য যে, শৌর্যবীর্য ও আত্মোৎসর্গের ফলে যুগপৎভাবে তাদের উভয় উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়েছিল। শত্রু সৈন্যগণ একটু সরে দাঁড়ালে দেখা গেল যে, জিয়াদের সহচরগণ তাঁর অভ্যর্থনার জন্য বহু পূর্বেই ফেরদৌসে প্রস্থান করেছেন। জিয়াদ তখনও মুমূর্ষু, রাসূলের আদেশে তাঁকে তুলে আনা হল। রাসূল তখন জিয়াদের মস্তক নিজের পদযুগলের উপর রক্ষা করে সজল নয়নে তাঁদের জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। এত সুখ এত সম্পদেও বুঝি জিয়াদের সাধ মিটল না। তাই মরণের পূর্ব মুহূর্তে তিনি রাসূলের চরণ যুগলের উপর 'উপুড়' হয়ে পড়লেন, জিয়াদের গণ্ডদেশ রাসূলের সেই ভক্তভর-নিবরণ কদম শরীফের স্পর্শ করল– মুহূর্তের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল।" (মুসলিম)

উহুদ যুদ্ধের পর

উহুদ যুদ্ধে যারা শাহাদাত বরণ করলেন তাদেরকে শহীদের খুন রাঙ্গা লিবাসেই কাফন ও দাফন সম্পন্ন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশিষ্ট মুজাহিদদের নিয়ে তৃতীয় হিজরীর ৭ই শওওয়াল শনিবার সন্ধ্যার পূর্বে মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

ওদিকে কুরাইশ বাহিনী মাক্কার পথ ধরে ফিলে চলল। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হয়েই তারা পরস্পর বলাবলি করতে শুরু করল– আমরা কী করতে এলাম আর কী করে ফিরে চললাম? আমরা মুসলিমদের পর্যুদস্ত করেছি– অনেকে নিহত হয়েছে, বেশিরভাগ আহত হয়েছে। আমরা তাদের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত না করেই ফিরে চলেছি– এ কেমন কথা! এখনও তাদের মূল শক্তি অক্ষুণ্ন রয়েছে, দু'দিন পর তারা তাদের ক্ষয়-ক্ষতি সামলিয়ে নিয়ে নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করবে এবং সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগবে। তখন তাদের পরাজিত করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

ওরা এখন দুর্বল ও নিস্তেজ, মাদীনা এখন অরক্ষিত। মাদীনা আক্রমণের এই তো অপূর্ব সুযোগ। চল আমরা ফিরে গিয়ে মাদীনা আক্রমণ করি, ইসলামের মূল শিকড় উপড়ে ফেলি। এ প্রস্তাবে কেউ কেউ আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত মাদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্তই গৃহীত হল। কুরাইশ দলপতিগণ তাদের নিজ নিজ লোকলস্কর নিয়ে মাদীনার পথে ঘুরে দাঁড়াল। মাদীনায় তারা হামলা চালাবে।

পিতা- ইয়াযিদ ইবনু সাকান আনসারী এবং ভাই 'আমির ইবনু ইয়াযিদ উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। কিন্তু কোন গ্রন্থেই আমি তাঁর স্বামীর নাম খুঁজে পাইনি। যদি কোন রিওয়ায়াতে তাঁর স্বামীর নাম পাওয়া যেতো আর তিনি উহুদে শহীদ হয়েছেন বলে জানা যেতো তাহলে উপরোক্ত ঘটনায় উল্লেখিত মহিলাটিকে নিশ্চিতভাবে 'আসমা' বলে নির্দেশ করা যেতো। আসমা (রা) নিজেও ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শাহাদত বরণ করেন।" *–অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

Contents

রাতেই এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কানে পৌঁছল। সংবাদ পেয়েই তিনি ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেললেন। শত্রু সৈন্যকে কিছুতেই মাদীনায় প্রবেশ করতে দেয়া উচিত হবে না। তাদের প্রতিরোধে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তের কথা সাধারণ্যে তখন তখনই ঘোষণা করলেন না। রাতের শেষে ফজরের সালাতের সময় তিনি ঘোষণা করলেন, বীর মুজাহিদগণ! প্রস্তুত হও, এ মুহূর্তে শত্রুর মুকাবেলার জন্য বেরিয়ে পড়তে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তিনি জানিয়ে দিলেন, উহুদ যুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছে, কেবলমাত্র তারাই এ প্রতিরোধ অভিযানে অংশ নেবে। মুসলিম বীর মুজাহিদগণ সঙ্গে সঙ্গে জওয়াব দিলেন– আপনার নির্দেশ আমাদের শিরোধার্য, আমরা প্রস্তুত।

মুহূর্ত কালেই যুদ্ধ-ক্লান্ত ও আহত বীরবৃন্দ– যার ঘরে যে খুন রাঙ্গা অস্ত্র ছিল তাই নিয়ে যুদ্ধের সাজে বের হয়ে এলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নবোৎসাহে উদ্দীপ্ত এ মুসলিম বাহিনী নিয়ে 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন। এখানে খুযা'আ গোত্রের সমাজপতি মা'বাদ ইবনু মা'বাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে গেল। তার গোত্রের অনেকেই ইতোপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তিনি তখন পর্যন্ত ইসলামে দীক্ষা নেননি। দীক্ষা না নিলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি তাঁর ছিল অকুণ্ঠ অনুরাগ এবং মুসলিমদের প্রতি ছিল পূর্ণ সহানুভূতি। ইসলামের প্রতি তিনি মনে মনে ঝুঁকেও পড়েছিলেন। উহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের বিপর্যয়ে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন কাজ হয় না। এবার আল্লাহর হুকুম এসে গেল, তিনি ইসলাম কবুল করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে মুহূর্তে তাকে ইসলামের খিদমাতের কাজে লাগালেন। তাকে (তার করণীয় কাজ বুঝিয়ে দিয়ে) কুরাইশ নেতা আবূ সুফ্ইয়ানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

মা'বাদ রাওহা নামক স্থানে আবূ সুফ্ইয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। মা'বাদ ইসলাম কবুল করেছে– এ খবর আবূ সুফ্ইয়ান জানত না। মা'বাদও এ সংবাদ গোপন রাখলেন।

মা'বাদকে দেখেই আবূ সুফ্ইয়ান বলে উঠলো– এই যে, মা'বাদ মুসলিমদের খবর কী?

মা'বাদ বললেন, খবর মোটেই ভাল নয়। মুহাম্মাদ ﷺ এবং সঙ্গী-সাথীরা এখন ভয়ঙ্কর উত্তেজিত– তারা তোমাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ– এক বিরাট বাহিনী সঙ্গে নিয়ে মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদের দিকে ধাবিত– এমন প্রস্তুতি তারা ইতোপূর্বে আর কখনও গ্রহণ করেনি।

আবূ সুফ্ইয়ান বললেন, তাহলে এ অবস্থায় আমাদের কী করণীয়? আপনি আমাদের কী পরামর্শ দেন?

মা'বাদ বললেন, বেশি বিলম্ব নেই– তাদের প্রথম দলটি অনতিবিলম্বে তোমাদের উপর অতর্কিত ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আবূ সুফ্ইয়ান বলল, আমরা তাদের মুকাবেলার জন্য আমাদের সৈন্যবাহিনী তৈরী করে রেখেছি।

মা'বাদ বললেন, না, এমনটি করতে যেয়ো না। আমি তোমাদের সদুপদেশ দিচ্ছি, আমি তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়েই এ কথা বলছি।

আবূ সুফ্ইয়ান এবার ভয় পেয়ে গেল। সে মাক্কার দিকে প্রত্যাবর্তনই শ্রেয় মনে করল। অতঃপর সে সৈন্যদেরকে স্বদেশে ফিরার নির্দেশ জারি করে দিল।

কয়েক দিন সেখানে অবস্থানের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম বাহিনী নিয়ে মাদীনায় ফিরে এলেন।

www.waytojannah.com

Contents

চতুর্থ হিজরীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

খুবাইব (রা)-এর অগ্নি পরীক্ষা

রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনায় ফিরে এসে শওওয়ালের অবশিষ্ট দিনগুলো যুলক্বাদা ও যুলহিজ্জা মাস নির্বিঘ্নেই কাটালেন।

চতুর্থ হিজরীর মুহাররম মাস অতিক্রান্ত হয়ে সফরের আগমন ঘটল। জঙ্গে উহুদের পর কুরাইশরা মুসলিমদের কৌশলে ক্ষতিগ্রস্ত করার বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে চলল। তার মধ্যে তাদের একটি ষড়যন্ত্র এবং নির্মম আচরণের দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করছি।

উযিল ও ফারা গোত্রের ৭ ব্যক্তিকে তারা নাবী ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করল। তারা গিয়ে বললো, আমাদের সমগ্র গোত্র ইসলাম কবুল করতে প্রস্তুত হয়ে আছে। মেহেরবানী করে আমাদের সঙ্গে কতিপয় মুবাল্লিগ পাঠিয়ে দিন। তারা আমাদের ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তিনি তাদের সঙ্গে ১০ জন মুবাল্লিগ পাঠিয়ে দিলেন। যখন মুবাল্লিগণ তাদের আয়ত্তাধীন সীমার ভিতর পৌঁছে গেলেন– তখন পূর্ব ষড়যন্ত্র অনুসারে দু'শত অস্ত্রসজ্জিত লোক তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসল এবং আত্মসমর্পণের আহ্বান জানাল। মুবাল্লিগগণ বন্দীত্ব অপেক্ষা শাহাদাত বরণ শ্রেয় মনে করে তাদের প্রতিরোধে দাঁড়িয়ে গেলেন। অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে তাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ৮ জন শাহাদাত বরণ করলেন। অবশিষ্ট দু'জন– খুবাইব ইবনু 'আদী এবং যাইদ ইবনু দাসিনা দুশমনের হাতে বন্দী হলেন।

বিশ্বাসঘাতকের দল তাঁদের উভয়কে শিকলে বেঁধে মাক্কায় নিয়ে গেল এবং কুরাইশদের নিকট বিক্রি করে ফিরে এল। খুবাইব এবং যাইদ (রা) উভয়েই বাদ্‌র যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। মাক্কার এক অথবা দু'জন কাফির তাদের হাতে নিহত হয়েছিল। নিহতদের আপনজন এখন প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে উৎফুল্ল এবং হিংস্রমূর্তি ধারণ করল।

বেশ কিছুদিন তারা তাদের বন্দী করে রাখল এবং তাদের উপর যতদূর সম্ভব নির্যাতন ও নিপীড়ন চালিয়ে গেল। তারা যাইদকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গ্রীবাদেশে পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত করতে লাগল। কালিমায়ে তাওহীদ উচ্চারণ করতে করতে যাইদ পরম ধৈর্যের সঙ্গে শাহাদত বরণ করলেন।

এবার খুবাইব (রা)-এর পালা। মাক্কার অদূরে তান'ঈম নামক স্থানে যূপকাষ্ঠ স্থাপিত হয়েছে। সেই যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ করে তাকে অস্ত্রের আঘাতে কষ্টের পর কষ্ট দিয়ে তিলে তিলে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। প্রথমে তাকে কা'বা প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হল। সেখান থেকে নেয়া হল তান'ঈমে। নির্মম হত্যার সেই নিষ্ঠুর তামাশা দেখার জন্য সেখানে এক বিপুল জনসমাগম হল। মৃত্যুর স্বাদগ্রহণের পূর্বে তাঁর কোন কামনা বাসনা আছে কিনা জিজ্ঞেস করা হল। খুবাইব (রা) তাঁর একটি আকাঙ্ক্ষার কথা জানালেন, তিনি দু'রাক'আত সালাত পড়তে চাইলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাঁর প্রাণপ্রিয় প্রভু পরোয়ারদিগারকে প্রাণভরে ডাকার ইচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। তাঁকে সে সুযোগ দেয়া হল, তিনি দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। সালাম ফিরিয়ে তিনি তাঁর হত্যাকারীদের উদ্দেশ্য করে বললেন– আমার আরও কিছু সালাত পড়ার বড় সাধ ছিল। কিন্তু তোমরা হয়তো বলবে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে সময় কাটাচ্ছি– এই ভেবেই আমি বারিত হয়েছি।

www.waytojannah.com

Contents

ক্রুশে বিদ্ধ করার পূর্ব মুহূর্তে জীবনের বিনিময়ে ইসলাম পরিত্যাগের আহ্বানও তাকে জানানো হয়েছিল। সে আহ্বান তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

আঘাত শুরু হয়েছে– এমন সময় আবূ সুফ্ইয়ান তাঁর নিকট এসে বললো, খুবাইব! এখন যদি মুহাম্মাদ ﷺ-কে যুপকাষ্ঠে আবদ্ধ করা হয় এবং তার ফলে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে তোমার পরিবার পরিজনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়– তুমি খুশী হবে? খুবাইব সঙ্গে সঙ্গে দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, না, আল্লাহর কসম! আমি সে অবস্থায় আমার পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে এবং এ জীবন বাঁচিয়ে মোটেই খুশী হবো না। বরং আমি তো এটাও বরদাশত করতে পারব না যে, আমি বেঁচে যাই আর আমার প্রাণপ্রিয় নাবী ﷺ-এর পবিত্র পায়ে একটা কাঁটা বিঁধুক!

খুবাইব (রা) মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে উপস্থিত ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের রচিত কয়েক পংক্তি কবিতার মাধ্যমে তাঁর শেষ সময়ের যে দৃশ্য অঙ্কিত এবং মনোভাব ব্যক্ত করে গেছেন সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী, ইবনু হিশাম প্রভৃতির কল্যাণে তা চির অম্লান, চির অক্ষয় হয়ে থাকবে এবং অনন্তকাল অবধি ফিদায়ে দীন ও জিন্দাদিল মুসলিমের জন্য প্রেরণার এক মহা উৎসরূপে বিবেচিত হবে। নিম্নে তার ভাবার্থ পেশ করা হচ্ছে:

"তারা দলে দলে এসে আমার চারদিকে সমবেত হয়েছে, তারা সকল গোত্রের লোককে ডেকে এনেছে।"

"তারা সবাই আমার বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করছে, আমার বিরুদ্ধে সকলেই খড়্গহস্ত, আর আমি এ বধ্যভূমিতে রজ্জু বন্ধন অবস্থায় বন্দী হয়ে আছি।"

"তারা নিজেদের নারী সমাজ এবং বালক-বালিকাদেরও এখানে সমবেত করেছে, আর আমি সুদৃঢ় ও সুউচ্চ যুপকাষ্ঠের সন্নিধানে নীত হয়েছি।"

"তারা আমাকে কুফর অথবা মৃত্যু– এ দু'টির একটিকে বেছে নেয়ার এখতিয়ার দিয়েছে– কিন্তু মরণই যে দু'টির মধ্যে সহজতর! আমার চক্ষুদ্বয় অবিরাম অশ্রুপাত করে চলছে কিন্তু তাতে ভীরুতার কলঙ্ক নেই।"

"আমি দুশমনের সম্মুখে হেয়তা স্বীকার করব না, আমি উচ্চরবে কাঁদব না, আমি চিৎকার করব না, আমি জানি আল্লাহর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন।"

"আমি মরে যাব– এজন্য আমি মৃত্যু-ভয়ে শঙ্কিত নই, আমার ভয় হচ্ছে (মৃত্যুর পর) পরিবেষ্টনকারী নরক-অগ্নির।"

"আল্লাহ আমাকে এ বিপদে ধৈর্যধারণের শক্তি দিয়েছেন, দেখো– তারা টুকরো করে আমার শরীরের গোশত কেটে নিচ্ছে– আমার জীবন প্রদীপ নিভে আসছে!"

এরপর খুবাইব-এর পবিত্র যবানে দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে–

إلـــى الله أشكوا غربتي ثـــم كربتي

وما ارصد الاحزاب لي عند مصرعي

"আল্লাহর নিকটই ফরিয়াদ জানাচ্ছি আমি আমার একাকিত্ব ও অসহায়ত্বের, আর আমার উপর আপতিত বিপদের এবং সে না-পাক ইচ্ছার যা এ সব লোক আমার মৃত্যুর পর কার্যে পরিণত করতে চাচ্ছে।"

www.waytojannah.com

فلست أبالـــي حين اقتل مسلما

على أي شق كان في الله مصرعي

"আমি পরওয়া করি না কোন কিছুই- যখন নিহত হচ্ছি মুসলিমরূপে, যেদিকেই আমাকে ফিরানো হোক- সেদিকেই বিরাজমান আল্লাহ, তাঁর পানেই আমার প্রত্যাবর্তন।"[৪৯]

وذلك في ذات الإله وإن يشا

يبارك على أوصال شلو ممزع

"এ মৃত্যুবরণ সে পাক পরোয়ারদিগার আল্লাহরই উদ্দেশে যদি মর্জি হয় তাঁর- আমার প্রতিটি কর্তিত অঙ্গের বিক্ষিপ্ত টুকরোগুলো বরকত সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।"[৫০]

---

[৪৯] "নির্দিষ্ট সময় শূল কাষ্ঠে তাঁকে চড়ান হল। তিনি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু কাফিররা পার্শ্ব ফিরিয়ে দিল। তখন তিনি বললেন, "সেদিকেই মুখ করা যায়, যেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান।" (মাহবুবে খোদা) *-অনুবাদক।*

[৫০] তার সর্বশেষ দু'আ ছিল-

اَللّٰهُمَّ بَلِّغْنَا رِسَالَةَ رَسُوْلِكَ فَبَلِّغْهُ مَا يَسُوْءُنَا بِنَا.

আল্লাহুম্মা বাল্লাগনা রিসালাতা রাসূলিকা ফা-বাল্লিগহু মা ইয়াসনা'উনা বিনা-

"প্রভু হে! আমরা তোমার রাসূলের পয়গাম এদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি, এখন এরা আমাদের সঙ্গে কী নিষ্ঠুর ব্যবহার করছে তা তোমার রাসূলের নিকট তুমিই পৌছিয়ে দাও।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনায় সাহাবাদের নিয়ে বসে আছেন, এমন সময় জিবরাঈল (আ) সেখানে উপস্থিত হয়ে খুবাইব (রা)-এর সালাম এবং শাহাদাতের সংবাদ পৌছিয়ে দেন। নাবী ﷺ 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ" বলে প্রতি সালাম জানান। (মাহবুবে খোদা ৩৩৭ পৃষ্ঠা)

'উমার ফারূক (রা)-এর খিলাফতকালে তার উম্মাল- সা'ঈদ ইবনু 'আমির মাঝে মাঝে বেহুশ হয়ে যেতেন- সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতেন। 'উমার ফারূক কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সা'ঈদ বললেন, "আমার দেহে কোনই রোগ নেই, অন্য কোন অভিযোগও নেই। যখন খুবাইব (রা)-কে শূলে চড়ানো হয় আর তার প্রতি নির্মম অত্যাচার চালানো হয় তখন সে সমাবেশে আমি উপস্থিত ছিলাম। যখনই সে লোমহর্ষক দৃশ্যের কথা আমার মনে হয় তখনই আমি কাঁপতে কাঁপতে বেহুশ হয়ে যাই।" (রহমাতুল্লিল 'আলামীন, ১ম খণ্ড: ১৩২ পৃষ্ঠা)

পাঠক! একবার স্থির হয়ে ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখুন! ধৈর্যের, ঈমানের এবং আল্লাহর উপর আত্মনির্ভরের- এমন কল্যাণময় আদর্শ জগতের ইতিহাসে বিরল, নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাইবেলে কথিত মতে, দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর পূর্বে যীশু খৃষ্টকেও নাকি এরূপে ক্রুশে আবদ্ধ করে নিহত করা হয়েছিল (কুরআনের সাক্ষ্য এই যে, তা সত্য নয়) কিন্তু ইতিহাস হিসেবে এ সকল লেখার কোনই মূল্য নেই- সুতরাং তার উপর আস্থা স্থাপন করা যেতে পারে না। পক্ষান্তরে ঐগুলোকে ক্ষণিকের জন্য বিশ্বস্ত বলে ধরে নিলেও, বাইবেল যীশুর এ সময়কার চাঞ্চল্য ও দুর্বলতার যে চিত্রখানা দুনিয়ার সম্মুখে উপস্থাপিত করেছে, খুবাইব-এর সাথে তার তুলনা হতে পারে না। বাইবেলের যীশু মৃত্যু বিভীষিকা দর্শনে চঞ্চল হয়ে চীৎকার করে বলছেন, ঈলী! ঈলী! লিমা সাবাকতানী?

হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে কেন পরিত্যাগ করলে?

আর ক্রুশে আবদ্ধ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি দেহ হতে কর্তিত হওয়ার পর খুবাইব কী বলছেন, আমরা তা পূর্বেই অবগত হয়েছি।....

খুবাইব (রা) মুহাম্মাদ মোস্তফা ﷺ-এর শ্রীচরণের একজন দাস মাত্র। যার শিক্ষা ও সাহচর্যের ফলে যাইদ, খুবাইব-এর ন্যায় শত সহস্র মহামানবের উদ্ভব হয়েছিল, তিনি কত মহান, কত মহিমময়! আশা করি, আলোচনার সময় আমাদের নিরপেক্ষ পাঠকগণ তা বিস্মৃত হবেন না। *-অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

Contents

মা'উনা কূপের হত্যাকাণ্ড

চতুর্থ হিজরীর সফর মাস। নজদের অধিবাসী এক বৃদ্ধ মাদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাযির হলেন। বৃদ্ধের নাম- আবূ বারা 'আমির ইবনু মালিক। বৃদ্ধ লোকটি ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহ দেখালেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইসলাম কবূল করার আহ্বান জানালেন। বৃদ্ধ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলেও তখন ইসলামের দীক্ষা নিলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ'র খিদমাতে আরয করলেন, আপনি আপনার সহচরদের মধ্যে থেকে কয়েকজন ধর্ম-প্রচারককে নজদে পাঠিয়ে দিন তারা সেখানে গিয়ে নজদবাসীদের আপনার দীনের প্রতি আহ্বান জানালে, আমি আশা করি, তারা সবাই সে আহ্বানে সাড়া দেবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতঃস্ততঃ করলেন, বললেন– আমার আশঙ্কা হয় নজদবাসীরা তাদের ক্ষতি সাধন করবে। আবূ বারা' আশ্বাস দিয়ে বললেন, কোন ভয় নেই, আমরাই সেখানে নেতৃস্থানীয়, আমাদের কথা মতই তারা চলে, আমি আপনার লোকদের দায়িত্ব নিচ্ছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার আশ্বাস বাণীর প্রতি আস্থা স্থাপন করে ইবনু ইসহাকের মতে ৪০ জন আর সহীহুল বুখারীর হাদীস মতে ৭০ জন মুবাল্লিগের সমবায়ে গঠিত (সহীহুল বুখারীর রিওয়ায়াতই বিশুদ্ধ) একটি প্রচার মিশন আবূ বারা'র সঙ্গে নজদে পাঠালেন। এ মহাজনগণ ছিলেন মুসলিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক, ক্বারী, পণ্ডিত এবং নেতৃস্থানীয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুনযির ইবনু 'আম্‌রকে এ মিশনের নেতৃত্ব প্রদান করলেন। নজদের নেতা 'আমির ইবনু তুফাইলের নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ একখানা চিঠি মিশন নেতার হাতে দিলেন।

এ প্রতিনিধিদল নজদের অদূরে বি'রে মা'উনায় পৌছে সেখানেই অবস্থান করলেন। হারাম ইবনু মিলহাত (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ'র চিঠিখানা দিয়ে নজদ নেতা 'আমির ইবনু তুফাইলের নিকট পাঠানো হল। কিন্তু সেই দুরাচার নব ধর্মের পয়গাম-বাহক নাবী ﷺ-এর প্রতি পূর্ব থেকেই রুষ্ট ও বিদ্বিষ্ট ছিল। সে পত্রটির দিকে ফিরেও তাকাল না, বরং চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করে অবধ্য দূতকে হত্যার জন্য তার এক লোককে নির্দেশ দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করাল। ঘাতক অতর্কিতে পিছন থেকে এসে বর্শার এক প্রচণ্ড আঘাতে হারাম (রা)-কে বিদ্ধ করল, তাঁর দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হল। তিনি সেই অবস্থায় বলে উঠলেন, **ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা-** (কা'বার প্রভু আল্লাহর শপথ!) আমি সিদ্ধকাম। এ নিষ্ঠুর ও পাশবিক অপকর্ম করেই সে নরপিশাচ থামল না। সে 'আমির গোত্রের লোকদের ডেকে বাকী সবাইকে হত্যার জন্য প্ররোচিত করল। বৃদ্ধ আবূ বারা'র আশ্রিত বলে তারা তার প্ররোচনায় সাড়া দিল না। তখন সেই দুরাচার বানী সালিম গোত্রের লোকেদের সহায়তায় নাবী ﷺ প্রেরিত মুবাল্লিগদের ঘেরাও করে তাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল। নাবীর সহচরগণ বীর বিক্রমে তাদের মুকাবেলা করলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মারাত্মক অস্ত্রসজ্জিত পাষণ্ডদের সঙ্গে পেরে উঠলেন না। আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে একে একে প্রায় সবাই শাহাদাত বরণ করলেন। একমাত্র কা'ব ইবনু যাইদ ঘটনাচক্রে বেঁচে গেলেন। তিনি আহত অবস্থায় শহীদদের সঙ্গে মৃতবৎ ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় পড়ে থাকলেন। অন্যান্যদের ন্যায় তাঁকেও মৃত মনে করে কাফিররা চলে যায়। কা'ব (রা) পরে খন্দকের যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন।

আরও দু'জন মুসলিম অন্যত্র থাকায় বেঁচে গিয়েছিলেন। তাঁদের একজনের নাম মুনযির ইবনু 'উকবা, অপর জনের নাম 'আম্‌র ইবনু 'উমাইয়া আযযামরী। তাঁরা তাদের বাহক উটগুলোকে চারণ ভূমিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে কতিপয় মৃতদেহভোজী পাখী আকাশে উড়তে দেখে কোন দুর্ঘটনার আশঙ্কায় আঁতকে উঠলেন। তারপর কাছে এসে স্বচক্ষে দুর্ঘটনা দেখতে পেলেন, দেখে স্তম্ভিত হলেন। পলায়ন অথবা যুদ্ধ এ দু'টো মাত্র পথই তাদের জন্য খোলা ছিল। তারা বীরের পথ–যুদ্ধই বেছে নিলেন। মুনযির

www.waytojannah.com

Contents

শাহাদত বরণ করলেন এবং 'আম্‌র বন্দী হলেন। দুষ্ট 'আমির ইবনু তুফাইলের মা'র একটি মানৎ ছিল– একটি গোলাম আযাদ করার। পুত্র 'আমির বন্দী 'আম্‌র (রা)-কে মুক্ত করে দিয়ে তার মা'র মানৎ পুরা করল।

মুক্তিপ্রাপ্ত 'আম্‌র ইবনু উমাইয়া দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মাদীনার পথ ধরলেন। পথে এক বৃক্ষতলে যখন তিনি আশ্রয় নিলেন, সেখানে ঘটনাচক্রে বানী কিলাব গোত্রের দু'জন লোককে অবতরণ করতে দেখে তাদেরকে আমির গোত্রের লোক মনে করলেন। এদের উপর দিয়েই প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশে অতর্কিত হামলা করে তিনি তাদের ইহলীলা সাঙ্গ করে দিলেন।

মাদীনায় ফিরে 'আম্‌র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাযির হয়ে সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিশিষ্ট সাহাবা এবং দীনের খিদমাতে উৎকৃষ্ট প্রাণ সহচরদের মৃত্যু সংবাদে মর্মাহত হলেন। অপরপক্ষে দু'জন নিরীহ লোকের অবাঞ্ছিত হত্যার খবর পেয়েও অত্যন্ত ব্যথিত হলেন।

ভুলক্রমেই এ দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। এ ধরনের ভুলে-সংঘটিত হত্যার জন্য শাস্তি হচ্ছে নির্দিষ্ট অর্থদণ্ড। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই অর্থদণ্ডের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য মাদীনার আহলে-কিতাব তথা ইয়াহূদী গোত্র বানী নাযীর-এর কাছে গমন করলেন, কেননা বানী নাযীর আর নাজদের বানী 'আমিরের মধ্যে ছিল মিত্রতা। কিন্তু সেখানে গিয়ে ইয়াহূদ গোত্রের যে মারাত্মক ষড়যন্ত্রের পরিচয় পেলেন তাতে তাদেরকে মাদীনা থেকে বহিষ্কার করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল। অতঃপর সেই কাহিনীই বিবৃত হচ্ছে।

বানী নাযীর গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান

'আম্‌র ইবনু 'উমাইয়া (রা) কর্তৃক বানী কিলাব গোত্রের দু'জন নিরপরাধ লোক ভুলক্রমে নিহত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মনস্তাপের কথা ইতোপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। তিনি উক্ত হত্যার রক্তপণ আদায়ের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং এ উদ্দেশে বানী নাযীর গোত্রের সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজনবোধ করলেন। মাদীনার একপ্রান্তে অবস্থানরত বানী নাযীর নামক ইয়াহূদী গোত্রের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্ধি ছিল। সন্ধির শর্তানুসারে তিনি এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য কামনা করলেন। এ উদ্দেশে সৎ নিয়্যাতে ও সরল মনে তিনি স্বয়ং তাদের নিকট গমন করলেন। অবশ্য তাঁর বিশ্বস্ত সহচর আবূ বাক্‌র, 'উমার, 'আলী এবং আরও কতিপয় সাহাবাদের (রা) কেউ তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

ইয়াহূদীগণ হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের মধ্যে পেয়ে বাহ্যিক তাদের অভ্যর্থনা দেখাতে ত্রুটি করল না কিন্তু তারা তাকে এ সুযোগে হত্যা করার জন্য ভিতরে ভিতরে এক দুরভিসন্ধি আঁটতে লাগল। আল্লাহ যার রক্ষক, তাঁর কেশ স্পর্শ করার সাধ্য কার থাকতে পারে? রাব্বুল 'আলামীনের তরফ থেকে জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে এসে হাযির হলেন এবং তাদের দুরভিসন্ধির কথা জানিয়ে গেলেন। সে মতে তিনি সেখান থেকে কৌশলে দ্রুত চলে আসেন এবং তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন।

ফিরে এসে তাদের হীন চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধির মূলোৎপাটনের জন্য তাদেরকে অনতিবিলম্বে মাদীনা ছেড়ে অনত্র চলে যাওয়ার কড়া নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন।[৫১] তারা এ নির্দেশ অমান্য করায় রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল মুসলিম মুজাহিদ নিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তাদের দুর্গ অবরোধ করে ফেললেন।

---

[৫১] এ অভিযানের মোটামুটি এরূপ:

এহেন নীচ ষড়যন্ত্র এবং ভীষণ শত্রুতাচরণের সময়ও রাসূল বর্তমান যুগের সভ্যতম গভর্নমেন্টগুলোর ন্যায় তাদেরকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন না অথবা বিনা বিচারে তাদেরকে কারাগারে আবদ্ধ করার কিংবা তাদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

www.waytojannah.com

Contents

বানী নাযীর গোত্রের বিরুদ্ধে এ অভিযানটি ঘটেছিল চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউওয়াল মাসে। মাদীনা ত্যাগের সময় তাদেরকে সব জিনিসই নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল কিন্তু একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছিল আর তা হচ্ছে তাদের অস্ত্রশস্ত্র। এছাড়া তাদের রেখে যেতে হল যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি।

বানী নাযীরের একদল গিয়ে আস্তানা গাড়ল খায়বারে, অপর দল গেল শাম দেশে (সিরিয়ায়)। মাত্র দুই ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে রয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'জনের সয়-সম্পদ তাদের অধিকারেই রেখে দিলেন। বাকী সমস্ত সম্পদ তিনি প্রথম হিজরতকারী সম্পদহীন গরীব মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। দু'জন অভাবগ্রস্ত আনসার– আবূ দুজানা এবং সাহল ইবনু হানীফকেও তিনি কিছু অংশ প্রদান করলেন।[৫২]

করে নেয়ার আদেশ প্রদান করলেন না। তিনি তাদেরকে নতুন করে সন্ধিপত্র লিখে দিবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু ইয়াহূদীগণ তখন প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত– তারা একদিকে নানা প্রকার বাহানা করে কালক্ষেপণ করতে লাগল, অন্যদিকে মাদীনার পৌত্তলিক ও কপটগণের সাথে সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করে নিতে লাগল। রাসূল ﷺ এ সকল ব্যাপার অবগত হয়ে কালবিলম্ব করা সঙ্গত বলে মনে করলেন না। তিনি জনৈক দূত পাঠিয়ে ইয়াহূদীদেরকে বলে পাঠালেন যে, "তোমাদের সমস্ত দুরভিসন্ধির বিষয় আমরা অবগত হয়েছি। স্বদেশের শান্তি এবং স্বজাতির ধনপ্রাণ ও মানসম্ভ্রম বিনষ্ট ও বিধ্বস্ত করার জন্য তোমরা চেষ্টার ত্রুটি করছো না। আমরা পুনঃ পুনঃ সন্ধির প্রস্তাব করা সত্ত্বেও তোমরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। এ অবস্থায় তোমাদেরকে মাদীনায় থাকতে দেয়া আমাদের পক্ষে আর সম্ভবপর হবে না। অতএব তোমাদেরকে আদেশ দেয়া যাচ্ছে যে, তোমরা অনতিবিলম্বে মাদীনার বাইরে চলে যাও।"

তারা রাসূলকে বলে পাঠাল: "আমরা তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না, তোমার যা ইচ্ছা করতে পার।" ইয়াহূদী দূতের মুখে এ 'আল্টিমেটাম' প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই রাসূল গাত্রোত্থান করলেন এবং মুসলিমগণকে সঙ্গে নিয়ে অবিলম্বে ইয়াহূদীদের পল্লীটি ঘেরাও করে ফেললেন।

ইয়াহূদীগণ তখন পল্লীর প্রবেশ দ্বারাদি উত্তমরূপে বন্ধ করে দিয়ে সুরক্ষিত দুর্গগুলোত আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তারা মনে করল মাদীনার দুই হাজার (মুনাফিক) সৈন্য আর বানী কুরাইযার (অপর ইয়াহূদ গোত্র) বহুসংখ্যক যোদ্ধা এখনই এসে পড়বে। তখন মুসলিমগণ 'বুকে পিঠে– নিষ্পেষিত হয়ে যাবে। কিন্তু কাপুরুষগণের এ প্রকার নীচ ষড়যন্ত্র যে কখনই সফলতা লাভ করতে পারে না, তা তারা জানত না।

"বহু দিনের অবরোধের পর তারা নিরাশ হয়ে পড়ল এবং একজন দূত পাঠিয়ে রাসূলের নিকট প্রস্তাব করল যে, আমরা তোমাদের পূর্বেকার আদেশ মেনে নিয়ে মাদীনা ত্যাগ করে যাচ্ছি। আমাদেরকে মুক্তি দাও। বলা বাহুল্য যে, বহু দিনের অবরোধের ফলে দুর্গে অবস্থান করা এখন আর তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় হয় ক্ষুৎ পিপাসায়, না হয় মুসলিমদের অস্ত্রে সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত তাদের গত্যন্তর ছিল না। রাসূল ﷺ তাদের প্রতি কোন প্রকার দণ্ড বা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করে এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। অধিকন্তু অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত আর সমস্ত ধনসম্পদ ও তৈজসপত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। এজন্য তাদেরকে দশ দিনের সময়ও দেয়া হল। ইয়াহূদগণ শত উট বোঝাই দিয়ে নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে বহির্গত হল। এটা ব্যতীত মাথায় করে যা গেল, তা স্বতন্ত্র। ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াহূদগণ ঘরের জানালা দরজা ও ছোট ছোট কাঠের টুকরাগুলি কুড়িয়ে নিয়ে যেতেও বিস্মৃত হয়নি। যা হোক, ইয়াহূদগণ দশদিন পরে যথেষ্ট সমারোহ সহকারে মাদীনা হতে বহির্গত হল।" –অনুবাদক।

[৫২] বানী নাযিরদেরকে বিতাড়িত করার ফলে মুসলিমদের অনেক সুবিধা হল। ষড়যন্ত্রকারীদেরকে সরিয়ে দেয়ায় কুরাইশগণ অসুবিধায় পড়ল। সাধারণের চক্ষে মুসলিমদের প্রতিপত্তিও অনেক বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহূদীদের পরিত্যক্ত ভূ-সম্পত্তি ও অস্ত্রশস্ত্র নিজেদের অধিকারে আসায় তারা বেশ লাভবান হলেন। কৌশলের দিকে দিয়ে এ বহিষ্করণ খুবই সঙ্গত হয়েছিল সন্দেহ নেই। *–অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

Contents

এ বছর মদ্যপান চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।[৫৩]

---

৫৩ মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা। মদ্যপান সম্পর্কে চরম নিষেধাজ্ঞামূলক আয়াতটি হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! নিশ্চয় সকল প্রকার মাদকদ্রব্য, সর্ববিধ জুয়া, সমস্ত 'আনসাব' ও 'আযলাম জঘন্য শয়তানী কাজ, সুতরাং তোমরা এ জঘন্যতা বর্জন কর- তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে।" (সূরা মায়িদা- ৯০)

পরবর্তী আয়াতে মদ্যপান এবং জুয়ার অপকারিতা ও ক্ষয়-ক্ষতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

"নিশ্চয়ই মদ এবং জুয়ার মাধ্যমে শয়তান চায় তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিতে, সে আরও চায় আল্লাহর যিক্‌র থেকে, (বিশেষ করে) সালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব মদ্যপান থেকে তোমরা বিরত হচ্ছ কি?" (সূরা মায়িদা- ৯১)

মদ্যপান ও জুয়ার চরম নিষেধাজ্ঞামূলক আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশক্রমে তা মাদীনার সর্বত্র- মুসলিম পল্লীগুলোতে প্রচার করে দেয়া হয়। আনাস ইবনু মালিক বলেন, আবূ তালহার বাড়ীতে সেদিন আমাদের মদ্যপানের একটা উৎসব চলছিল, আর আমি ছিলাম সেদিনের সাকী-মদ্য পরিবেশক। পানভোজন পুরাদমে চলছে, এমন সময় বাইরে হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারিত হল- ألا إنما الخمر قد حرمت

"সাবধান- সবাই জেনে রাখো, আজ থেকে মদ (চিরতরে) হারাম হয়ে গেল"

মদ সম্পর্কে কুরআনের সদ্য অবতীর্ণ আয়াত পঠিত হল:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ.

"নিশ্চয় মদ্যপান...শায়তানের জঘন্য ঘৃণিত কাজ- তার থেকে বিরত হও।" (সূরা মায়িদা- ৯০)

ঐ হুঁশিয়ার বাণী ও নিষেধাজ্ঞা শ্রবণমাত্র আবূ তালহা বলে উঠলেন, আর নয়, দূর করে দাও সমুদয় মদ বাড়ী থেকে, ফেলে দাও মদ যেখানে যা আছে।

সত্য সত্যই যেখানে যে বাড়ীতে যত মদ সঞ্চিত ছিল সব ঢেলে ফেলে দেয়া হল। মাদীনার রাস্তা পথ ও অলিগলি দিয়ে মদের স্রোত বয়ে চলল।

উদ্ধৃত দ্বিতীয় আয়াতের শেষে প্রশ্ন করা হয়েছে- فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ "অতএব তোমরা কি বিরত হচ্ছ?"

রাব্বুল 'আলামীনের এ প্রশ্নের জওয়াবে অভূতপূর্ব সাড়া দিয়ে- সাহাবীগণ সহস্র কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, হাঁ বিরত হলাম, হে আমাদের রব, আমরা বারিত হলাম।

মদ্যপানে আরববাসীরা অতিরিক্ত আসক্ত ছিল। এ বদ-অভ্যাসে যারা অতিরিক্ত আসক্ত তাদের পক্ষে তা হঠাৎ করে ছেড়ে দেয়া সহজ ব্যাপার নয়। ইসলাম স্বভাব ধর্ম, তাই কোন ব্যাপারেই স্বভাবের বিপরীত পন্থা অবলম্বন করেনি। এ ব্যাপারেও নয়। ধীরে ধীরে মদ পরিহারের চূড়ান্ত পথে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রথম বলা হয়েছে, মদে উপকার অপেক্ষা অপকার বেশি। (সূরা বাকারাহ- ২১৯)

তারপর বলা হয়েছে- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.

"মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকট যেও না যে পর্যন্ত না (সালাতে) তোমরা যা বল তা হৃদয়ঙ্গম করতে পার।" (সূরা নিসা- ৪৩)

কুরআন কর্তৃক মাদকদ্রব্যের নিন্দাবাদ শ্রবণে কেউ কেউ প্রথম থেকেই পানাসক্তি ছেড়ে দেন। তারপর যখন সালাতের পূর্বে মদ খাওয়া প্রকারান্তরে নিষেধ করা হল তখন আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ইবাদাত সালাত সুস্থ মস্তিষ্কে পড়ার জন্য অনেকেই মদ্যপান ছেড়ে দিতে থাকেন। কারণ ৫ (পাঁচ) ওয়াক্ত সালাতের মধ্যবর্তী বিরতি সময় এমন সুদীর্ঘ নয় যে, তখন মদ্যপান করলে মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে। তারপর চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হওয়ার পর সমস্ত মুসলিম সঙ্গে সঙ্গেই এ জঘন্য শায়তানী কাজ- সমস্ত অপকর্মের মূল এ বদঅভ্যাস সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন- যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে। -অনুবাদক।

www.waytojannah.com

Contents

চতুর্থ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আরও দু'টো অভিযানে স্বয়ং নেতৃত্ব প্রদান করতে হয়েছিল। আর একটি 'যাতুর রিকা" নামে অভিহিত, অপরটি "বাদ্‌র-ই সানী" বা দ্বিতীয় বাদ্‌র অভিযানরূপে পরিচিত।

যাতুর রিকা

কুরাইশ এবং ইয়াহূদীরা সম্মুখ যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি কোন উপায়েই যখন মুসলিম শক্তিকে প্রতিহত এবং নিস্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হল না, বরং ক্রমে তাদের সংখ্যা ও শক্তি বেড়ে চলল, তখন তারা সারা আরবের পৌত্তলিক গোত্রগুলোকে ইসলাম এবং তার প্রচারক ও অনুসারীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলল। ফলে আরবের কেন্দ্রে কেন্দ্রে গোত্রে গোত্রে ইসলামের বিরুদ্ধে সৈন্য সঞ্চয় ও রণসজ্জা শুরু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সতর্ক থাকায় প্রয়োজনে চার দিকে দূত ও গুপ্তচর পাঠিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতেন এবং যখনই কোন স্থানে রণসজ্জার সংবাদ পেতেন তখনই তা ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য আগে আগে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতেন।

চতুর্থ হিজরীর ৫ম মাস– জামাদিউল উলা। বানী গাতফানের এমনি এক রণ প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে, তিনি চারশত– মতান্তরে সাতশত সাহাবী সঙ্গে নিয়ে নাজদের দিকে– 'যাতুর রিকা' অভিযানে বের হয়ে পড়লেন। মাদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্তরূপে রেখে গেলেন জলীলুল কদর সাহাবী আবূ যার গিফারীকে। কোন কোন মতে 'উসমান (রা)-কে। নির্দিষ্ট স্থানে গাতফানদের একটা দল দেখা গেল। কিন্তু মুসলিমদের শক্তি এবং রণ প্রস্তুতি দেখে তারা আক্রমণ করতে সাহস পেল না, রাসূলুল্লাহ ﷺ আক্রমণের হুকুম দিলেন না। অবশেষ কয়েকদিন অবস্থানের পর তারা মাদীনায় ফিরে এলেন।

দ্বিতীয় বাদ্‌র

পূর্ববর্তী বছর উহুদ প্রান্তর থেকে ফিরার পথে আবূ সুফ্‌ইয়ান দম্ভের সাথে ঘোষণা করে গিয়েছিল যে, অধিকতর রণ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে আগামী বছর বাদ্‌র প্রান্তরে আবার মুসলিমদের সঙ্গে তাদের মুকাবেলা হবে। সে মতে আবূ সুফ্‌ইয়ান দু'হাজার সৈন্য যোগাড় করে বাদ্‌র অভিমুখে রওয়ানা হয়। সৈন্য দলে ছিল পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী। কিন্তু যে কোন কারণে হোক, আবূ সুফ্‌ইয়ান বেশি দূর অগ্রসর না হয়ে এবারের মত ফিরে যাওয়াই শ্রেয় মনে করে। ওদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সংবাদ পেয়ে পনের শত যোদ্ধাসহ যথাসময়ে বাদ্‌র প্রান্তরে এসে হাজির হন। কিন্তু শত্রুসৈন্য দেখতে না পেয়ে সেখানে তাদের জন্য আট দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। এ সময়ে বাদ্‌রে একটা মেলা বসেছিল। মুসলিমগণ সে সুযোগে তাতে বেচাকেনায় অংশগ্রহণ করে প্রচুর লাভবান হন। অতঃপর বিনা মুকাবেলায় সেখান থেকে তারা মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ অভিযানের সময়টি ছিল শা'বান মাস, কেউ কেউ বলেন, যুলক্বাদা।

গাযওয়া-ই দূমাতুল জান্দল

বিভিন্ন দিকে সাজ সাজ রব। মুসলিমদের ইসলাম প্রচারের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য এক যুদ্ধের পর আর এক যুদ্ধের আয়োজন। একটুখানি শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই শান্তিকামী মুসলিমদেরকে দুশমন-প্রতিরোধে এগিয়ে যেতে হয়। পঞ্চম হিজরীর রবিউল আউওয়াল মাসে খবর পাওয়া গেল, দূমাতুল জান্দল প্রদেশের অধিবাসীরা বহু সৈন্য-সামন্ত জড়ো করে মাদীনা আক্রমণের প্রস্ত

www.waytojannah.com

Contents

তি গ্রহণ করছে। সংবাদ পেয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ কাল বিলম্ব না করে এক হাজার মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে সেদিকে অগ্রসর হন। দুমাতুল জান্দল মাদীনা থেকে সিরিয়ার দিকে পনের দিনের পথ। মুসলিম বাহিনীর অতি দ্রুত অগ্রগমনের সংবাদ পেয়ে কাফিরদের অন্তরে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে সরে পড়ে। নাবী ﷺ সেখানে উপস্থিত হয়ে শত্রু সৈন্যের কোন চিহ্ন দেখতে না পেয়ে যথাসময়ে মাদীনায় ফিরে আসেন। মুসলিমরা দুশমনের মুকাবেলা করার জন্য যে সদা প্রস্তুত, শত্রুর সমরায়োজন যত বড়ই হোক, আরবের যে কোন স্থানেই কাফিররা সংঘবদ্ধ হোক, গোপনে যে ষড়যন্ত্রই পাকাক, মুসলিমরা তাদের সুদক্ষ দূত মারফত সে খবর সংগ্রহ করতে যে সক্ষম এবং আল্লাহর নামে তার মুকাবেলার জন্যও যে তৈরী, এ ধারণা সৃষ্টি করে দেয়াই ছিল এসব অভিযানের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য এবং তা সফলও হয়েছিল নিঃসন্দেহে।

গাযওয়া-ই-মুরাইসী'আ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সংবাদ আসল যে, হারিস ইবনু আবি যিরারের নেতৃত্বে বানী মুস্তালিক গোত্রের সমস্ত লোক মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই এর জন্য রণসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছে। তাদের সঙ্গে আরবের অন্যান্য গোত্রের বহু লোকও যোগ দিয়েছে। সংবাদের সত্যতা যাচাই এর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বুরাইদা ইবনু হুসাইব আল-আসলামী (রা) কে তথায় প্রেরণ করলেন, তিনি এসে স্বয়ং বানী মুস্তালিক নেতা হারিসের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি তার সঙ্গে কৌশলে কথাবার্তা বলে ভিতরের সমস্ত সংবাদ জেনে নিলেন। তারপর মাদীনায় ফিরে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে পেশ করলেন।

সঠিক সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে মুসলিম বাহিনী নিয়ে বানী মুস্তালিকের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হয়ে পড়লেন। এবার তাঁর সঙ্গে একদল মুনাফিকও শরীক হলো। ইতোপূর্বে তারা অপর কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। ৫ম হিজরীর শা'বান মাসের দুই তারিখে এই যাত্রা শুরু হয়। মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত তেজের সঙ্গে পথ চলে যখন দুশমন দলের সামনাসামনি গিয়ে হাজির হল, তখন তারা মুসলিমদের এই অকল্পনীয় দ্রুতগতি ও অতর্কিত আক্রমণের ভয়ে হতচকিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। আরবের অন্যান্য গোষ্ঠীর লোক নিশ্চিত পরাজয়ের আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ পিঠ টান দিয়ে সরে পড়ল। কিন্তু বানী মুস্তালিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুরাইসী'অ' নামক জলাশয়ের কাছে গিয়ে যথাযথভাবে মুসলিম সৈন্যদের সুবিন্যস্ত করে নিলেন। তারপর যুদ্ধ শুরু হল। মুসলিম বাহিনী অল্পায়াসেই যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। কোন কোন মতে দুশমনরা যুদ্ধ না করে যে যেদিকে পারল পালালো কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক লোক বন্দী হল। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন কাফিরদের নেতা হারিসের কন্যা জুয়াইরিয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে পরে আযাদ করে দেন এবং স্বীয় সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করে তাঁকে অনুগৃহীতা করেন।

www.waytojannah.com

Contents

গাজওয়ায়ে আহযাব বা খন্দক যুদ্ধ

যুদ্ধের কারণ

ইয়াহূদীরা যখন উহুদ যুদ্ধে মাক্কার কাফিরদের বিজয় এবং মুসলিমদের বিপর্যয়ের সংবাদ পেল এবং শুনতে পেল যে কাফির দলপতি আবূ সুফ্ইয়ান আগামী বছর পুনরায় মুসলিমদের উপর আক্রমণ চালাবে, তখন তারা খুব খুশী এবং তাদের হৃত সাহস পুনঃ চাঙ্গা হয়ে উঠল।

কিছু দিন পর নির্বাসিত ইয়াহূদ সরদার মাক্কায় গিয়ে কুরাইশদের সঙ্গে সাক্ষাত করল। সে তাদেরকে আক্রমণের জন্য উৎসাহ দিল। উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা চালাল এবং নিজেদের সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস ও অঙ্গীকার প্রদান করল। ইয়াহূদীদের এই আশ্বাস ও অঙ্গীকার পেয়ে কুরাইশদের সাহস বেড়ে গেল। তারা ইয়াহূদীদের সঙ্গে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা এবং পরামর্শ করল– এবং পরামর্শ অনুসারে আরবের বেদুঈন কবীলাগুলোকে নিজেদের পতাকাতলে সমবেত করার কাজে লেগে গেল। অল্প দিনের মধ্যে অস্ত্রসজ্জিত এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেল। কুরাইশ, ইয়াহূদী এবং মরুচারী আরবীদের নিয়ে মোট যোদ্ধার সংখ্যা দশ হাজারে গিয়ে উপনীত হল। আবূ সুফ্ইয়ান এই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হল। বাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাদীনার আশ-পাশে গিয়ে প্রতীকী আক্রমণ শুরু করে দিল।

মুকাবেলার জন্য মুসলিমদের প্রস্তুতি

শত্রুপক্ষের এই বিরাট প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে তাদের প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের নিয়ে বসলেন। সত্য সাধক সালমান ফার্সী তখন সেই পরামর্শ সভায় উপস্থিত। তিনি পারস্যের লোক, সেই দেশের যুদ্ধ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে মাদীনার প্রতিরক্ষার জন্য শহরের আশ-পাশে পরিখা খননের সুপারিশ জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সুপারিশকৃত নতুন পদ্ধতিটি পছন্দ করলেন। ফলে পরিখা তথা খন্দক খননের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

পরিখা খননের কাজ শুরু করে দেয়া হল। খনন ও মাটি বহনের কাজে সাহাবীদের সঙ্গে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ অংশ গ্রহণ করলেন। তিনি অন্যান্য কাজও সঙ্গে সঙ্গে সম্পন্ন করে চললেন।

তারপর যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশের কাজ শুরু হল। মুসলিম মুজাহিদদের সংখ্যা তিন হাজার পর্যন্ত গিয়ে পৌছল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এদের সঙ্গে নিয়ে খন্দকের কাছে সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ করলেন।

বানী কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতা

ঠিক এই সংকট মুহূর্তে জানা গেল মাদীনায় অবস্থানরত অবশিষ্ট ইয়াহূদী গোত্র– বানী কুরাইযা রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গে যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন সেই সন্ধি ভেঙ্গে ফেলেছে। সন্ধির চুক্তি অনুসারে মাদীনা আক্রান্ত হলে তার প্রতিরোধে মুসলিমদের সঙ্গে একযোগে প্রতিরক্ষায় অংশ গ্রহণে তারা বাধ্য। কিন্তু জানা গেল কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে তারা তাদের সঙ্গেই যোগ দিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য প্রস্তুত।

www.waytojannah.com

Contents

সংবাদের সত্যতা যাচাই এর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবনু ম'আয, সা'দ ইবনু 'উবাদা এবং আরও কতিপয় সাহাবাকে তাদের পল্লীতে পাঠিয়ে দিলেন।

তাঁরা গিয়ে দেখতে পেলেন অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। কাল যারা ছিল মুসলিমদের মিত্র আজ তারা তাদের জানী দুশমনে পরিণত। মুসলিমদের খুনের পিপাসা তাদের পেয়ে বসেছে। তারা সাহাবাগণ সম্বন্ধে, এমন কি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে যা তা বলে চলেছে। তারা বেয়াদবীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে এবং প্রকাশ্যেই তাদের দুশমনির কথা ঘোষণা করছে।

সাহাবাগণ অবস্থা অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ এবং তাদের কথা শ্রবণ করে ফিরে এলেন। এসে নাবী ﷺ-কে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করলেন।

যুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মিত্র দলের এ পরিবর্তনের কথা শুনে মুসলিম দলের কিছু লোক ঘাবড়িয়ে গেল। মুনাফিকদের কপটতার পরদা খুলে গেল। বানী হারিসার কোন কোন মুসলিম তাদের ঘর অরক্ষিত এবং অন্যান্য ওযুহাত দেখিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি চাইল। প্রকৃত প্রস্তাবে এটা ছিল তাদের ফিরে যাবার একটা তৈরী করা বাহানা।

মাদীনা অবরোধ

ইতোমধ্যে মাক্কার মুশরিকগণ মাদীনার কাছে এসে গেছে। তারা অবিলম্বে চারদিক থেকে মাদীনা ঘেরাও করে ফেলল। তবে শহরের উপর আক্রমণ চালাতে গিয়ে পরিখা দেখে প্রথমটা তারা স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

পরে তারা তীর নিক্ষেপ, প্রস্তর বর্ষণ এবং পরিখা আক্রমণের চেষ্টা চালাতে লাগল। তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হল কিন্তু অবরোধের সময় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল। ফলে অবরুদ্ধ মুসলিমদের কষ্ট বর্ধিত হয়ে চলল।

কুরাইশদের সঙ্গে যে সব দুর্ধর্ষ বেদুঈন মাদীনা আক্রমণের জন্য সমবেত হয়েছিল তাদের মধ্যে একটি কবীলার নাম ছিল গাতফান। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই গাতফান কবীলাটিকে মুশরিকদের মধ্যে থেকে পৃথক করার উপায় খুঁজলেন। পরিশেষে তাদেরকে মাদীনার খেজুর বাগানসমূহের উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ প্রদান করে কুরাইশদের মধ্য হতে খসিয়ে নিয়ে তাদের বিদায় করে দেয়ার কথা চিন্তা করছিলেন। এই ব্যাপারে প্রাথমিক আলোচনাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আনসার নেতা সা'দ ইবনু মু'আয, ও সা'দ ইবনু 'উবাদার পরামর্শ চাইলেন, তখন তারা এ কাজ অপছন্দ করলেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আল্লাহ আপনাকে এই ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার হুকুম দিয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের বলার কিছুই নেই; আমরা নত মস্তকে তা মেনে নিচ্ছি। আমরা সে অবস্থায় সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহর নির্দেশ পালন করব, কিন্তু যদি আমাদের কষ্টের দিকে নজর রেখে করে থাকেন, তাহলে আমরা ব্যাপারটি অনুমোদন করব না। যখন আমরা মুশরিক ছিলাম, মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিলাম তখনও তাদের মাদীনা আক্রমণ করার দুঃসাহস হয়নি। কিন্তু এখন আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন এবং আমাদেরকে আপনার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন, এখন আমরা কী করে এদের সম্মুখে মাথা নত করতে এবং আমাদের ফসল প্রভৃতি তাদের কাছে সোপর্দ করতে পারি? আল্লাহর কসম! তাদেরকে দেয়ার মত আমাদের কাছে একটিই মাত্র বস্তু রয়েছে আর সেটি হচ্ছে আমাদের তলোয়ার।"

কথাগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খুব পছন্দ হল। তিনি বললেন, এটা আমি বলেছিলাম অবস্থা দৃষ্টে তোমাদেরই কল্যাণার্থে। কারণ সমস্ত আরব তোমাদের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়েছে!

www.waytojannah.com

Contents

আল্লাহ তা'আলার হস্তক্ষেপ

পূর্ণ একমাস অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে অবরোধ অব্যাহত রইল। অবশেষে আল্লাহ স্বয়ং এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন এবং দুশমনদের বিপর্যয় ও পলায়নের অভাবিত ব্যবস্থা তিনিই করে দিলেন।

ব্যাপার ঘটল এই যে, কুরাইশদের মিত্র– কবীলায়ে গাতফানের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নু'আঈম ইবনু মাস'উদের হৃদয় আপনা আপনি ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়ল এবং শত্রু শিবিরেই ইসলামের আলোকে নিজেকে তিনি দীপ্ত করে তুললেন। তিনি তার ইসলাম গ্রহণের কথাটি গোপন রাখলেন। কাউকে কিছু না বলে তিনি সংগোপনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে হাজির হলেন। তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর অশেষ ফজল ও করমে ইসলাম কবুল করেছি। ইসলামের এই নাজুক পরিস্থিতিতে কিছু খিদমাত করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। আমার সাধ্যানুসারে যে কোন কাজের হুকুম দিন, প্রতিপালন করার জন্য বান্দা হাযির।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি একা তেমন কী করতে পারবে? হাঁ একটি কাজ তুমি করতে পার– তোমার ইসলাম গ্রহণ এখনও শত্রু-মিত্র সকলের নিকট অজ্ঞাত, তোমার দ্বারাই সম্ভব দুশমন দলে ভাঙ্গন সৃষ্টির কূটনৈতিক তৎপরতা। যদি সম্ভব হয় তবে এ কাজটি তুমি করতে পার। জেনে রাখো! যুদ্ধ হচ্ছে কূটকৌশল যার অপর নাম হিলা ও তদবির।

নু'আঈমের কূটনৈতিক তৎপরতা

নু'আঈম খুশী মনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আকাঙ্ক্ষিত কূটনৈতিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন, তিনি নিজ শিবিরে ফিরে এলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্বন্ধে তখনও কেউ কিছুই জানত না। তিনি ছিলেন একজন ইয়াহূদী, তার গোত্রের লোক সবাই ইয়াহূদী। এই ইয়াহূদী গোত্রের সঙ্গে মাদীনার ইয়াহূদী গোত্র বানী কুরাইযার সম্পর্ক ছিল পুরাতন ও ঘনিষ্ঠ। দৃশ্যতঃ গাতফান গোত্রের প্রতিনিধিরূপে শুভানুধ্যায়ীর ভূমিকা গ্রহণ করে তিনি বানী কুরাইযা মহলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। লৌকিকতার আদান প্রদানের পর পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, এই যুদ্ধে কুরাইশ পক্ষই জয়লাভ করবে– এমন কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। যদি তারা জয়লাভ করে ভাল, কিন্তু যদি না করতে পারে, তখন? তোমরা তো মুহাম্মাদের ﷺ বিপক্ষে চলে গেলে, কুরাইশরা যদি সুযোগ পায় তোমাদের মাধ্যমে কল্যাণ আহরণ করবে নতুবা তারা তোমাদেরকে মুহাম্মাদের ﷺ করুণা এবং প্রতিশোধের মধ্যপথে নিক্ষেপ করে সরে পড়বে। তখন তোমরা কেমন করে নিজেদের বাঁচাবে– একবার ভেবে দেখেছ কি?

সুতরাং এখনও সময় রয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখো।

বানী কুরাইযা নু'আঈমের আলোচনা এবং ইশারা ইঙ্গিত মনোযোগ দিয়ে শুনল এবং তার সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করল। অবশেষে তারা তারই নিকট পরামর্শ চাইল– তাদের কী করা উচিত। নু'আঈম মনে মনে উৎসাহিত হয়ে বললেন, আমার মতে কুরাইশরা যাতে কোন অবস্থাতেই তোমাদের বিপদের মুখে ফেলে পালাতে না পারে তার রক্ষাকবচ স্বরূপ তাদের কিছু সংখ্যক লোককে প্রতিভূরূপে তোমাদের নিকট রেখে দেয়ার দাবী জানান উচিত।

নু'আঈমের এই পরামর্শ তাদের বেশ মনঃপুত হল। বলল, ভাল পরামর্শ দিয়েছেন আপনি। নাঈম তার একদিককার কূটনৈতিক তৎপরতা সফলতার সঙ্গে শেষ করে কুরাইশ বাহিনীর দিকে এগিয়ে

www.waytojannah.com

Contents

চললেন। তাদের ছাউনীতে ঢুকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জড় করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমার বন্ধুত্বের প্রতি আস্থাশীল? তারা বলল, হাঁ; নিঃসন্দেহে আমরা তোমার প্রতি আস্থা রাখি। নু'আঈম বলতে লাগলেন, তা হলে শুনুন, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, বানী-কুরাইযা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সঙ্গে সন্ধি ভঙ্গ করে এখন অনুতপ্ত, তারা এখন মুসলিমদের সঙ্গে সালাম কালাম শুরু করে দিয়েছে। আমি যতদূর বুঝতে পারলাম তারা তোমাদের প্রবঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে তোমাদের সহায়তা দানের মূল্য স্বরূপ তোমাদের কতিপয় সরদারকে যামীনরূপে তাদের কাছে রাখার দাবী জানাবে। এ দাবী মেনে নিলে তারা (কুরাইযা-মুসলিম) মৈত্রীর প্রমাণ স্বরূপ তাদেরকে মুহাম্মাদের ﷺ হাতে সঁপে দিবে। তারপর তারা তোমাদের উপর মিলিতভাবে হামলা চালাবে। কাজেই বন্ধুরূপে আমার পরামর্শ হচ্ছে এই যে, সত্য সত্যই তারা এরূপ যামানত তলব করলে তাতে তোমরা কক্ষনো রাযী হবে না।

ইয়াহূদদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে কুরাইশরা অবহিত ছিল। সুতরাং নাঈমের এ সংবাদ তারা উপেক্ষা ভরে উড়িয়ে দিতে পারল না। তারা তার কাছেই ইতিকর্তব্যের পরামর্শ চাইল। নু'আঈম বললেন, "শনিবার হচ্ছে ইয়াহূদীদের পবিত্র দিবস কর্মবিরতির দিন। সেদিন তারা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে বসবে-এরূপ ধারনা মুসলিমদের মনে কিছুতেই জাগবে না। কাজেই তাদের আন্তরিকতা যাচাই করার জন্য শনিবারেই মুসলিমদের উপর হামলা চালাতে বলুন। এ আক্রমণ হবে অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত এবং তাতে জয়লাভ সুনিশ্চিত। কুরাইশ প্রধানগণ এ পরামর্শ শুনে রাখল কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল না। তারা এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল।

নু'আঈম এবার স্বীয় গোত্র– গাতফানের নিকট গেলেন। সেখানেও অনুরূপ কূটনৈতিক চাল চাললেন।

শত্রুশিবিরে সন্দেহের দানা বেঁধে উঠল, প্রত্যেকেই একে অপরের আন্তরিকতা সম্পর্কে পরীক্ষা করতে চাইল। আবূ সুফ্ইয়ানই এই পরীক্ষা গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ নিলেন। তিনি ইয়াহূদীদের কাছে লিখে পাঠালেন, আমরা এখানে বিদেশী, দীর্ঘদিন এখানে অবস্থানের ফলে আমাদের রসদপত্র নিঃশেষ হয়ে আসছে। আমাদের আর বেশি বিলম্ব করা চলে না। চলুন, আমরা কালই একযোগে মুসলিমদের উপর হামলা চালিয়ে দেই– আমরা বাইরে থেকে, আপনারা ভিতর থেকে।"

এই চিঠি পেয়ে বানী-কুরাইযা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, নু'আঈমের কথা তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল এবং তার কথার যথার্থতাও হাতে কলমে প্রমাণিত হয়ে গেল। হাঁ, নু'আঈম তো ঠিকই বলেছে। অবিলম্বে তারা চিঠির জওয়াব দিল।

জওয়াবী চিঠিতে তাঁরা লিখল, আপনারা জানেন যে কাল শনিবার, আর শনিবার আমাদের সাপ্তাহিক বিরতির দিবস, এই দিবসে (যুদ্ধ তো দূরের কথা) কোন কাজই আমরা করি না। অতীতে এই দিবসে (আল্লাহর হুকুম অমান্য করে) কার্যরত হওয়ায় আমাদের উপর কী বিপর্যয় নেমে এসেছিল তাও আপনারা জানেন। এর সঙ্গে এখন অবস্থা দৃষ্টে আপনাদেরকে আমাদের এ কথাও জানাতে হচ্ছে যে, আমরা আপনাদের সঙ্গে একত্রে আর যুদ্ধ করব না– যে পর্যন্ত না আপনাদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে আমাদের নিকট যামীন স্বরূপ পাঠিয়ে দিচ্ছেন।"

কুরাইশরা দূত মারফত এই পত্রে নু'আঈমের কথার সত্যতা উপলব্ধি করল। তারা বলল, আল্লাহর কসম! নু'আঈম সত্য কথাই বলেছে। কুরাইযা গোত্রের নিকট তারা পত্র লিখে জানিয়ে দিল, "আল্লাহর কসম! আমরা তোমাদের নিকট যামীন স্বরূপ একজন লোকও পাঠাতে প্রস্তুত নই। তোমরা বের হয়ে এসো, একত্রে মিলে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হই।"

www.waytojannah.com

Contents

গায়িবী সাহায্য ও বিজয়

অপরদিকে (প্রায় সপ্তাহকাল অতিবাহিত হবার পর আল্লাহ তা'আলা এক আঁধার রাতে প্রবল মরু ঝড় এবং তার সাথে এক অদৃশ্য সৈনবাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। কুয়াশাচ্ছন্ন ঝড়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। ঝড়ের বেগ ক্রমেই বেড়ে চলল। কুরাইশদের তাঁবুগুলো খুঁটি সমেত ছিন্নভিন্ন হয়ে এদিক সেদিক গিয়ে পড়ল। রশদ পত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। ফেরেশতারা কুরাইশদের হৃদয়ে ভয়ভীতি ও ত্রাস ঢুকিয়ে দিলেন। ফলে তারা ভোর হতে না হতেই দিশেহারা হয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ভগ্ন হৃদয়ে মাক্কার দিকে ফিরে চলল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হুয়াইফা ইবনু ইয়ামানকে খবর নেয়ার জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি তাদের বিপর্যয়ের করুণ দৃশ্য অবলোকন করলেন, দেখলেন দিশাহারা অবস্থায় নিরাশ মনে তারা মাক্কার পথে এগিয়ে চলেছে। ফিরে এসে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ খবর দিলেন। নাবী ﷺ আশ্বস্ত হলেন। এ ভাবে আল্লাহর অনুগ্রহে বিপদের কাল মেঘ কেটে গেল। আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করলেন, এবং ইসলামের শত্রুদের পরাভূত করলেন।[৫৪]

বানী কুরাইযার সন্ধিভঙ্গ ও তার শাস্তি

কাফিরদের ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মাক্কার দিকে ফিরে চলার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও সাহাবাদের নিয়ে মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

নাবী ﷺ তাঁর অস্ত্রশস্ত্র খুলে উম্মু সালামার গৃহে গোসল করতে বসেছেন, এমন সময় জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর এ হুকুম পৌঁছে দিলেন:

"এক্ষুনি বানী কুরাইযার সন্ধিভঙ্গের শাস্তি দানের জন্য অভিযান চালাতে হবে।"

হুকুম পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান জারি করে দিলেন। আহ্বানকারীর মারফত তিনি ঘোষণা করে দিলেন, প্রতিটি অনুগত মর্দে মুজাহিদ এই মুহূর্তে বের হয়ে বানী কুরাইযার দুর্গদ্বারে গিয়ে পৌঁছবে এবং সেখানে পৌঁছে আসরের সালাত পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ প্রতিপালিত হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ পরক্ষণে সেখানে পৌঁছে গেলেন। তিন হাজার মুসলিম সৈন্য বানী কুরাইযার মহল্লা অবরোধ করে ফেললেন। নাবী ﷺ তাদেরকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানালেন কিন্তু খাইবার প্রভৃতি স্থান থেকে তাদের সাহায্যার্থে তাদের স্বজাতিগণ এসে পড়বে– এরূপ এক আশা ও আশ্বাসের কুহকে পড়ে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহ্বানে সাড়া দিল না। বেশ কিছুদিন পরে যখন তারা বুঝতে পারল কোনস্থান থেকে কোন সাহায্য আসার কোনই সম্ভাবনা নেই, আত্মসমর্পণ ছাড়া বাঁচার কোনও পথ নেই, তখন তারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হল। কিন্তু নাবী ﷺ-এর ফয়সালায় আশ্বস্ত হতে না পেরে তারা সা'দ ইবনু মা'আযকে

---

[৫৪] সূরা আহযাবে এই যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে। তাতে একস্থানে আল্লাহর নি'মাতের প্রতি মুসলিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا.

"হে ঈমানদার বান্দাগণ! আল্লাহর সেই অপার দয়া অনন্য নিয়ামাতের কথা স্মরণ কর যখন সমবেত বাহিনী তোমাদের উপর চড়াও করে বসল। অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেই প্রবল ঝটিকা এবং এমন সৈন্যবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি।" (সূরা: আহযাব– ৯) –*অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

Contents

বিচারক মনোনীত করার প্রস্তাব পেশ করল। নাবী ﷺ সে প্রস্তাবে রাযী হলে তারা দুর্গ ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল।

পরিখার যুদ্ধে আহত মু'আয (রা) পরিখার যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ইয়াহুদী পুরুষ যোদ্ধাদের হত্যার আদেশ প্রদান করলেন, অবশিষ্ট পুরুষ, নারী ও শিশুদের বন্দী করা হল।

খন্দক যুদ্ধ এবং কুরাইযা অভিযানে মোট দশ জন মুসলিম শহীদ হন। আহত সা'দও হত্যার নির্দেশ দেয়ার পর ইন্তিকাল করেন।[৫৫]

হুদায়বিয়ার অভিযান ও সন্ধি

"দীর্ঘ ছয়টি বৎসর অতিবাহিত প্রায়–মুহাজিরগণ ধর্মের নামে দেশ ত্যাগী হয়েছেন। মাদীনার আনসারগণের আন্তরিক যত্ন ও অনুপম ত্যাগ স্বীকারের ফলে, তাদের কোন বিষয়েই বিশেষ অভাব নেই সত্য, কিন্তু জননী জন্মভূমির প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তা তো যাওয়ার নয়। বিশেষতঃ তাদের বড় আদরের, বড় যত্নের, বড় সম্মানের কাবা– অর্ধযুগ হতে তার ছায়া দর্শনের সৌভাগ্যও তারা লাভ করতে পারেনি। তাই আনসার ও মুহাজিরগণ একবার মাক্কায় যাওয়ার এবং সেখানে গিয়ে কা'বায় 'ইবাদাত সম্পন্ন করার নিমিত্তে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। করুণার ছবি রহমাতের নাবী মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ ও ব্যাকুলচিত্তে সেই সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। সাহাবাগণ যখন ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করতেন: হে রাসূলুল্লাহ ﷺ! কা'বার তীর্থ করা কি আর আমাদের ভাগ্যে ঘটবে না? নাবী ﷺ তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তার সুযোগ করে দিবেন। ইসলামের বয়স এখন ১৯ বছর। এই

---

[৫৫] কুরআন মাজীদে বানী কুরাইযার এই আত্মসমর্পণ ও হত্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে:

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا.

"যে সব গ্রন্থধারী ইয়াহুদী কুরাইশদের সহায়তা করেছিল, আল্লাহ তাদেরকে তাদের দুর্গ থেকে বহির্গত করলেন, তাদের হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করলেন, তোমরা তাদের একদলকে নিহত করলে এবং অপর দলকে বন্দী করে ফেলে।" (সূরা আহযাব ৩৩: ২৬)

জঙ্গে খন্দকের এবং বানী কুরাইযার যুদ্ধের পর আরবের কাফির ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর কী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল এক্ষুনি একবার তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর 'বিশ্বনবী'তে সংক্ষেপে একটা চমৎকার চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

"এ যুদ্ধকেই ইসলামের চূড়ান্ত যুদ্ধ বলা যেতে পারে। এই যুদ্ধে কুরাইশগণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ পেল যে, ইসলামের গতি দুর্নিবার। তিন তিনবার তারা ইসলামের শক্তি পরীক্ষা করে দেখেছে, তিন তিনবারই তারা বিফল মনোরথ হয়েছে। বাদ্‌র যুদ্ধে তারা শোচনীয়রূপে পরাজিত হয়ে ফিরে গেছে। উহুদে তারা জয়লাভের পূর্ণ সুযোগ পেয়েও মুসলিমদেরকে পরাজিত করতে পারেনি। খন্দকে তারা আরবের সমস্ত শক্তি নিয়েও ব্যর্থকাম হয়েছে। শুধু কুরাইশই বা বলি কেন। কুরাইশ, ইয়াহুদী, পৌত্তলিক ও বেদুইন সমস্ত গোত্রই বুঝতে পেরেছে:

মুহাম্মাদ অজেয়। খন্দক যুদ্ধের পর তাই তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল, একটা হীনতা ও পরাজয়ের মনোভাব এবার সকলকেই পেয়ে বসল; পক্ষান্তরে মুসলিমদের বুকে নব বল ও নবপ্রেরণার সঞ্চার হল। নির্ভীক উন্নত শিরে বিশ্বের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হলেন। কোন বাধাই যে তাদেরকে আটকে রাখতে পারবে না, সকল শত্রুই যে তাদের পদানত হবে, ইসলাম যে জয় যুক্ত হবে এ কথা এই যুদ্ধের পর হতেই তাঁরা সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করলেন। রাসূল ﷺ-এর মহিমা ও মর্যাদাও পূর্বাপেক্ষা শতগুণ বর্ধিত হল। একটা অপূর্ব বিস্ময়ের বস্তুরূপে তিনি সকলের চোখে প্রতিভাত হতে লাগলেন।" *–অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

Contents

দীর্ঘকালব্যাপী শাইতান নিজের সমস্ত শক্তি নিয়ে তার সাথে সংগ্রাম করেছে। দৈত্য দানবগণের অনুচরগণের তাণ্ডব নৃত্যে আরব দেশ কেঁপে গেছে। কিন্তু শায়তান ও তার অনুচরগণের সমস্ত চেষ্টা ও সকল উদ্যোগকে উপেক্ষা করে সত্য আত্মরক্ষা করে চলেছে। তাই শত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও আজ আরবের বিভিন্ন কেন্দ্রে তাওহীদের বিজয় দুন্দুভি নিনাদিত হতে আরম্ভ হয়েছে। শাইতান নতজানু হয়ে পরাজয় স্বীকার করেছে। কুরাইশরা এখন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, মুসলিমদেরকে পিষে মারার সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর হবে না। তারা এটাও বুঝতে পেরেছে যে, মুহাম্মাদ অজেয় কিন্তু তখনও তারা বুঝে উঠতে পারেনি যে, মুহাম্মাদ অজেয় এর একমাত্র কারণ এই যে "সত্য অজেয়"। এখন তারই সূত্রপাত হতে চলেছে।"

অভিযানের বিবরণ

হিজরী ষষ্ঠ বর্ষের যিল-কাদ মাস। রাসূলুল্লাহ ﷺ উমরা করার উদ্দেশে মাক্কা মু'আযযামা যাওয়ার সঙ্কল্প করলেন। আনসার ও মুহাজিরগণ উৎসুক হয়ে উঠলেন। দেখতে দেখতে ১৫ শত সাহাবী নাবী ﷺ-এর সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে তাঁরা রওয়ানা হলেন। যিল-কাদ মাস নিষিদ্ধ চারটি মাসের অন্যতম। এই সময়ে আরবে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকত। "এই সময়ে তীর্থ যাত্রা এবং বাণিজ্য কার্য্যে কোন বাধা-বিঘ্নের আশঙ্কা থাকত না। শত্রু মিত্র সকলেই মাক্কায় আগমন করে নিরাপদে কা'বা গৃহে তাওয়াফ করে যেতে পারত। কেউ বাধা দিত না, দেয়ার অধিকার কারও ছিল না। আরবরা এটাকে পাপ মনে করত।"

কিন্তু মুসলিমদের প্রতি কুরাইশদের শত্রুতা এবং হিংসা বিদ্বেষের কথা বিবেচনা করে সতর্কতা স্বরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কার কাছাকাছি পৌছে অগ্রভাগে একজন গুপ্তচর পাঠিয়ে দিলেন। মুসলিম তীর্থযাত্রী দল যখন 'আসফান' নামক স্থানে এসে পৌছলেন, তখন গুপ্তবার্তাবাহক এসে খবর জানালেন যে, মুসলিমদের আগমন সংবাদ পেয়ে বাধা দেবার জন্য কুরাইশরা প্রস্তুত হয়ে গেছে। তারা পার্শ্ববর্তী আরব গোত্রগুলোকেও উত্তেজিত করে তুলেছে। তারা কিছুতেই মুসলিমদের মাক্কায় ঢুকতে দেবে না, কা'বা গৃহ তাওয়াফের সুযোগ প্রদান করবে না। তারা তাদের পথরোধ করতে এবং বাধা দিতে দৃঢ় সঙ্কল্প।

গুপ্তবার্তাবহের সংবাদের সত্যতা তখন প্রমাণিত হল যখন জানা গেল যে, বীরশ্রেষ্ঠ খালিদ ইবনু ওয়ালীদ এবং আবূ জাহ্লের পুত্র ইকরিমা কয়েকশত অশ্বারোহী নিয়ে এগিয়ে আসছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের পথ পরিহার করে শত্রুসেনার চোখ এড়িয়ে 'হুদায়বিয়া' নামক স্থানে এসে পৌছলেন। এখানে একটি কূয়া ছিল। সেই কূয়ার পানি কিঞ্চিৎ ব্যবহারের পরই নিঃশেষিত হয়ে গেল। পিপাসায় তখন সকলে অস্থির। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে সাহাবাগণ অবস্থা জানাতেই তিনি দু'আ করলেন, ফলে কূয়াটি পুনঃ পানিতে ভর্তি হয়ে গেল। সেই পানিতে ১৫ শত লোকের সকল প্রয়োজন মিটে গেল, সকল অভাব দূর হয়ে গেল।

তারপর চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে সাহাবাদের নিয়ে নাবী ﷺ পরামর্শ সভায় বসলেন। পরামর্শে স্থির হল উপযুক্ত লোক পাঠিয়ে কুরাইশদের বুঝানো হোক যে, মুসলিমরা ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টির জন্য আসেনি, এসেছে নিরাপদে শান্তির সঙ্গে কা'বা গৃহের তাওয়াফ প্রভৃতি ধর্ম-কর্ম করতে। প্রথমে তিনি 'উমার (রা)-কে ডেকে তাঁকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নেয়ার প্রস্তাব করলেন। 'উমার (রা) বিনীতভাবে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মাক্কায় বিপদে পড়লে রক্তের টানে এগিয়ে আসবে সেখানে এমন আপন জন এখন

www.waytojannah.com

Contents

আমার কেউ নেই। বরং 'উসমান (রা) কে পাঠানো আমি উত্তম মনে করি, কেননা সেখানে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, প্রচারক হিসেবেও তিনি উত্তম আর প্রচারকার্যও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উসমান ইবনু আফ্‌ফানকে ডেকে পাঠালেন। তিনি নত মস্তকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নাবী ﷺ তাঁকে বলে দিলেন, তাদের গিয়ে বলবে, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি, আত্মরক্ষার জন্য দরকারী সামান্য হাতিয়ার ছাড়া যুদ্ধের কোন অস্ত্রশস্ত্রও নিয়ে আসিনি, আমরা এসেছি নির্বিঘ্নে উমরা করে ফিরে যেতে। তিনি আরও বললেন, তাদেরকে তুমি ইসলামের পথে আহ্বানও জানাবে।

'উসমান (রা) মাক্কায় গেলেন। গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পয়গাম কুরাইশদের নিকট পৌঁছে দিলেন। তিনি তাদের উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিলেন যে, শান্তির সঙ্গে তিনি কা'বা গৃহের তাওয়াফ করে যেতে চান। শান্তিই তাঁর কাম্য, তোমাদের সঙ্গে সন্ধিই তাঁর অভিপ্রেত। কুরাইশরা 'উসমানের কথা শুনলো কিন্তু কান দিলো না। ফিরতে তাঁর বিলম্ব ঘটতে লাগল। (কোন কোন বিবরণে জানা যায় তারা তাঁকে আটকে রাখল।) তাঁর প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব দেখে মুসলিমদের মনে নানারূপ সন্দেহের উদ্রেক হতে লাগল। কেউ কেউ এরূপ ধারণাও করে বসল যে, 'উসমান (রা) হয়ত তাওয়াফের কাজ সম্পন্ন করে আসছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ অসঙ্গত ধারণার কথা শুনে বললেন, আমরা এখানে পড়ে আছি আর আমাদের রেখে 'উসমান (রা) তাওয়াফ সমাধা করবে– এ হতে পারে না। অন্যদের মনে তাঁর বিলম্বের জন্য নানারূপ আশঙ্কা দেখা দিল– উদ্বেগ এবং অস্থিরতার মধ্যে সময় কাটতে লাগল।

এমন সময় খবর আসল কুরাইশরা 'উসমান (রা)-কে হত্যা করে ফেলেছে। এ সংবাদ শুনামাত্র মুসলিমরা অত্যন্ত দুঃখিত, বিক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুঃখের সীমা রইল না। তিনি সকলকে একটি বৃক্ষের ছায়াতলে আহ্বান করলেন। ১৫ শত সাহাবী আনসার ও মুহাজির সকলে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর খিদমাতে হাযির হলেন। তিনি নিজের হাতে তাদের প্রত্যেকের হাত রেখে তাদের কাছ থেকে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন– "দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাব– কোন অবস্থাতেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদ্বর্তী হব না।"

'উসমান তখন অনুপস্থিত। তিনি এই 'বাইআত রিযওয়ান' থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছেন দেখে নাবী ﷺ নিজের বাম হাত ডান হাতে রেখে বললেন এ বাইআত হচ্ছে 'উসমান (রা)-এর পক্ষে।[৫৬]

'বায়আত' কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর পরই 'উসমান (রা) ফিরে এলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনে স্বভাবতঃ সকলে স্বস্তি লাভ করলেন। তারা বললেন, আমরা তো মনে করেছিলাম, আপনি তাওয়াফের কাজ সমাধা

---

[৫৬] ইসলামের ইতিহাসে এই বাইআত "বাইআতে রিযওয়ান" বা সন্তোষের বাইআত নামে পরিচিত। কারণ এই বাইআতের মাধ্যমে ইসলামের জন্য তাদের আত্মোৎসর্গের যে স্পৃহা প্রকটিত হয়েছে তাতে আল্লাহ সন্তোষ লাভ করেন। কুরআন মাজীদের সূরা ফাত্‌হায় এই সন্তোষের কথা ঘোষণা করা হয়েছে এভাবে:

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيْباً – وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَأْخُذُوْنَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيْزاً حَكِيْماً.

"আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা বৃক্ষতলে আপনার নিকট, হে রাসূল! বায়আত গ্রহণ করল– শপথ নিল। এর মাধ্যমে আল্লাহ জেনে নিলেন তাদের অন্তরে কী আছে! অতঃপর তিনি তাদের হৃদয়ে শান্তি ও স্বস্তি নামিয়ে দিলেন। ফলতঃ তিনি তাদের জন্য স্থির করে রেখেছেন আশু বিজয়, বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ মালপত্র–গণীমাত যা তারা লাভ করবে, আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।" (সূরা ফাত্‌হ– ১৮-১৯) –অনুবাদক।

www.weryoyamin.com

Contents

করে আসছেন! উত্তরে তিনি বললেন, আমার সম্বন্ধে আপনারা খুবই মন্দ (অবাঞ্ছিত) ধারণা পোষণ করছিলেন। যাঁর হাতে আমার জীবন ন্যস্ত, সেই আল্লাহর কসম করে বলছি, সেখানে যদি দীর্ঘ এক বৎসরও আমাকে থাকতে হ'ত– আর রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ায় অবস্থান করতেন তা হলেও– রাসূলুল্লাহ ﷺ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি কিছুতেই তাওয়াফ করতাম না। কুরাইশরা আমাকে যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করে বলছিল– "তুমি নিজে তো তাওয়াফ কাজ সেরে নাও।" কিন্তু আমি কিছুতেই রাযী হইনি। এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি এটা জানতাম, আমি ধারণায় তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যা হোক, 'উসমান (রা)-এর প্রত্যাবর্তনের পর মুসলিমদের উত্তেজনা কমে আসল। ওদিকে মুসলিমদের শপথ অনুষ্ঠান এবং যুদ্ধের জন্য তাদের প্রস্তুতি ও দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা জানতে পেরে কুরাইশদের টনক নড়ে উঠল।

খুযা'আ গোত্রের নেতা বুদাইল ইবনু ওরাকা এই সময় নিজ গোত্রের কতিপয় লোকসহ নাবী ﷺ-এর নিকট আগমন করেন। এরা মাক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোক এবং পৌত্তলিক হলেও রাসূলুল্লাহর সঙ্গে এদের মিত্রতা ছিল। তিনি এসে কুরাইশদের মনোভাবের কথা জানালে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি গিয়ে তাদের বল যে, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি– আমরা 'উমরা পালন করতে এসেছি। আমাদের কথা হচ্ছে যে, কুরাইশরা আমাদের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধি করুক এবং আমাদের ও আরব জাতিকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্বাধীনভাবে স্ব স্ব কর্তব্য করতে ছেড়ে দিক। তারা যদি এই প্রস্তাবে রাযী হয় ভাল, নতুবা আমরা শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে যাব– যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাঁর নির্ধারিত বিধি বলবৎ করেন।

বুদাইল কুরাইশদের নিকট ফিরে এসে সমস্ত বিষয় জানালেন। তাদের মধ্যে যারা ছিল দুষ্ট প্রকৃতির তারা শোনা মাত্র বলে উঠল দরকার নেই আমাদের তার সঙ্গে কোন কথা বলার। আমরা এ সব শুনতে চাই না। কিন্তু যারা ছিল বুদ্ধিমান তারা তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল। কুরাইশদের অন্যতম প্রধান 'উরওয়া ইবনু মাস'উদ সাকাফী বলে উঠলেন, তোমরা রাযী হলে আমি নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁর কথা শুনে আসতে পারি।

সে মতে অনুমতি পেয়ে 'উরওয়া নাবী ﷺ-এর কাছে এলেন। মহানাবী ﷺ তাকেও সেই কথাই বললেন, যে কথা বুদাইলকে বলেছিলেন। 'উরওয়া নাবীর ﷺ সম্মুখে যেভাবে এবং যে সুরে কথা বলছিলেন তাতে তার অহমিকা এবং আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি আরবের প্রথা অনুসারে পুনঃ পুনঃ নাবী ﷺ-এর দাড়িতে হাত দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শানে তার এই আচরণ সাহাবীদের নিকট তার ধৃষ্টতা বলে মনে হল। তারা তার বেওতমিযী সহ্য করতে পারলেন না। আবূ বাক্‌রের মত ধীরস্থির লোকও এ আচরণ বরদাশত করতে পারলেন্ না। তিনি তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন, অন্যান্য সাহাবাগণও উত্তেজনার ভাব দেখালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি তাঁর শিষ্যবৃন্দের দরদের আন্তরিকতা এবং শ্রদ্ধার গভীরতা দর্শনে 'উরওয়া বিস্মিত এবং চমকিত হলেন।

'উরওয়া কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "ওগো লোকসকল! তোমরা শোন, পারস্যের কিসরা, রোমের কাইসার এবং আবিসিনিয়ার নাজ্জাশীর দরবারে দূতরূপে আমি উপস্থিত হয়েছি কিন্তু আমি তাঁর শিষ্যবর্গকে মুহাম্মাদের ﷺ যেরূপ সম্মান করতে দেখেছি এমনটি আর কোন রাজ্যে দেখিনি, কোন সম্রাটকেও তাঁর প্রজাবৃন্দ কর্তৃক এমন ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে দেখতে পাইনি।

www.waytojannah.com

Contents

আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম তাঁর দেহের ঘাম নির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা তার সেই ঘাম তুলে নিয়ে তাদের মুখে, তাদের শরীরে মেখে নিচ্ছে, তিনি যখন ওযু করছেন, তখন ওযুর পরিত্যক্ত পানি সংগ্রহের জন্য সবাই প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ছে। তিনি যখন কোন বিষয়ে আদেশ করছেন দ্রুত সে আদেশ তারা প্রতিপালন করছে। তারা যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলছে তখন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে অনুচ্চ আওয়াজে বলছে। বিনয়, সম্ভ্রম ও ভক্তির এমন দৃশ্য আমি কোথাও দেখিনি। তিনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেটা খুবই যুক্তি সঙ্গত প্রস্তাব। আমি বলি তোমরা এটা মেনে নাও।"

'উরওয়ার পর আরও কয়েক গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ পর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁর উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন। তারা ফিরে গিয়ে নিজেদের অভিমত জানালেন এবং মুসলিমদেরকে তীর্থ যাত্রার সুযোগ দেয়ার জন্যও সুপারিশ জানালেন। ফলে কুরাইশরা অবস্থা উপলব্ধি করতে সক্ষম হল এবং সুহাইল ইবনু আমরকে কতিপয় বিশিষ্ট লোকসহ সন্ধির শর্ত নিরূপণের দায়িত্ব দিয়ে নাবী ﷺ-এর নিকট পাঠিয়ে দিল।

সন্ধির কথাবার্তা শুরু হল। উভয় পক্ষের শর্ত নিয়ে আলোচনা হল। মুসলিমদের প্রধান দাবী ছিল মাক্কার পথে কুরাইশদের প্রতিরোধ তুলে নিতে হবে যাতে করে মুসলিমরা খানায়ে কা'বা নির্বিঘ্নে তাওয়াফ করে আসতে পারে। সুহাইল এ প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে বললো, না এবার এ কাজটি হতে পারবে না, কারণ তাহলে সমস্ত আরব ভাববে, আমরা তোমাদের দাপটে ভয় পেয়ে নতি স্বীকার করেছি, তোমরা এবার ফিরে যাবে, তবে আগামী বছর তোমরা 'উমরা পালনে আসতে পারবে।

শান্তির খাতিরে এবং ভবিষ্যতের বৃহত্তর কল্যাণে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রস্তাবে রাযী হলেন। কিন্তু মুসলিমগণ মনে মনে ব্যথিত হলেন। চারদিক থেকে অসন্তোষের গুঞ্জন ধ্বনি শ্রুত হতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝিয়ে তাদের শান্ত করলেন। অন্যান্য শর্তসমূহও স্থিরিকৃত হল।

শর্তগুলো মোটামুটি এই:

ক. আগামী ১০ বছরের জন্য যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে, অতঃপর কোন পক্ষ অন্য পক্ষের সাথে কোনরূপ শত্রুতাচরণ করবে না।

খ. মুসলিমরা এ বৎসর ফিরে যাবে, আগামী বছর 'উমরা পালনের জন্য আসতে পারবে– কিন্তু যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে আনতে পারবে না– পারবে শুধু পথিকের আত্মরক্ষার উপযোগী অস্ত্র আর তলোয়ার আনতে, তবে তলোয়ার কোষবদ্ধ করে আনতে হবে।

গ. তারা মাক্কায় মাত্র ৩ দিন অবস্থান করতে পারবে– তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ফিরে যেতে হবে।

ঘ. এই দশ বছরের মধ্যে যেসব মুসলিম (পুরুষ) কুরাইশদের নিকট এসে যাবে, তাদের ফেরত পাঠান হবে না, কিন্তু মাক্কার যেসব লোক (অমুসলিম অথবা মুসলিম) মুসলিমদের নিকট গমন করবে, মুসলিমগণ তাদের ফেরত পাঠাবেন।

ঙ. আরবের যে কোন গোত্র স্বেচ্ছামত যে কোন পক্ষের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে।

সন্ধির শর্ত শুনে একমাত্র আবূ বাক্‌র ছাড়া প্রায় সকল সাহাবী মর্মাহত হলেন। দুঃখে ও ক্ষোভে তারা অভিভূত হলেন। তাদের ক্ষুব্ধ মনের অভিব্যক্তি ঘটতে লাগল তাদের কথোপকথনে, তাদের আচরণে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্বিকার।

www.waytojannah.com

Contents

সন্ধির শর্তসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য তিনি আলী (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে প্রথমেই নির্দেশ দিলেন: লিখো–

بسم الله الرحمن الرحيم করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে শুরু করছি। কুরাইশ প্রতিনিধিদলের নেতা সুহাইল আপত্তি জানিয়ে বললেন, এ রহমান শব্দটি লিখা চলবে না, আল্লাহর কসম! রহমান কে- আমরা জানি না। বরং লিখো যা আমরা চিরদিন লিখে এসেছি-

بسمك اللهم হে আল্লাহ! তোমার নামে শুরু করছি। মুসলিমরা প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললো, তা হতে পারে না 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম'ই লিখতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীকে বললেন, তুমি "বিসমিকা আল্লাহুম্মা'ই লিখো। তারপর লিখো:

هذا ما قضى عليه محمد رسول الله.

"এই সব শর্তে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এই সমঝোতায় পৌছেন।

সঙ্গে সঙ্গে সুহাইল বলে উঠলো, না তা হবে কেন? আল্লাহর কসম! আমরা যদি জানতাম (আর মেনে নিতাম) যে, আপনি আল্লাহর রাসূল তাহলে আপনার সঙ্গে আমাদের ঝগড়া বিবাদ আর যুদ্ধ বিগ্রহের কোন কারণই থাকতো না। কাজেই লিখুন মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ।

মুসলিমগণ এমনিতেই অত্যন্ত নাখোশ এবং মনে মনে ক্ষুব্ধ। এখন এই ব্যাপারে তাদের ধৈর্য রক্ষা কঠিন হয়ে পড়লো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সংযত হবার উপদেশ দিয়ে– সুহাইলকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমাকে মিথ্যা জানলেও– আমি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল, আচ্ছা লিখো মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ। আমি তো আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ বটেই। 'আলী (রা) ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। কারণ নাবী ﷺ সত্য সত্যই আল্লাহরই রাসূল- তিনি সেই পরম সত্য কথাটি কাটবেন কী করে? নাবী ﷺ তার মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, আচ্ছা– আমাকে দেখিয়ে দাও কোথায় লিখা রয়েছে সেই শব্দ– দেখিয়ে দেয়ার পর তিনি নিজ হাতে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি কেটে দিলেন।

সন্ধিপত্র লিখিত হয়ে গেল। দৃশ্যতঃ এই হেয়তাজনক ও অবমাননাকর সন্ধিতে সকলেই বিক্ষুব্ধ– চারিদিকে অসন্তোষের গুঞ্জন-ধ্বনি। এমন সময় কুরাইশ প্রতিনিধিদলের নেতা সুহাইল-এর পুত্র আবূ জান্দল লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ অবস্থায় মাক্কা হতে তথায় এসে হাজির! সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় তার স্বজনবৃন্দ তাকে নানা উপায়ে নির্মমভাবে উৎপীড়ন করেছে। সে এই বার সুযোগে তাদের বেষ্টনী থেকে পালিয়ে হুদায়বিয়ায় এসে মুসলিমদের ক্যাম্পে পৌছে গেছে।

তাকে দেখেই সুহাইল বলে উঠল, এবার সন্ধির শর্ত সততার সঙ্গে পালনের প্রথম পরীক্ষা উপস্থিত! রাসূলুল্লাহকে ﷺ লক্ষ্য করে সে বললো, তাকে কুরাইশদের নিকট ফেরত পাঠাতে সন্ধিসূত্রে আপনি বাধ্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ জান্দলের অবস্থা দৃষ্টে সুহাইলকে এই বিশেষ ঘটনায় তার দাবী ছাড়তে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু সুহাইল কিছুতেই রাযী হলো না। অবশেষে সন্ধির মর্যাদা রক্ষার জন্য নাবী ﷺ আবূ জান্দলকে বুঝিয়ে মাক্কায় ফিরে যেতে বললেন। আবূ জন্দল মাক্কাবাসীদের নির্মম উৎপীড়নে অতিষ্ঠ; তার দৈহিক যন্ত্রণা দুঃসহ। তিনি মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে ফরিয়াদ জানালেন, আমি মুসলিম হয়ে তোমাদের কাছে এসেছি আর আমাকে মুশরিকদের নিকট পুনঃ ফেরত পাঠানো হচ্ছে! আল্লাহর উপর ঈমান আনায় তারা আমাকে আঘাতের পর আঘাতে কেমন ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে– সেখানে ফেরত পাঠালে আবার তো সেই শাস্তিরই পুনরাবৃত্তি করা হবে!

www.waytojannah.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আবূ জান্দলকে লক্ষ্য করে বললেন, "আবূ জান্দল! তোমার পরীক্ষা খুবই কঠিন। তুমি সবর কর, দৃঢ়তা অবলম্বন কর, আল্লাহর নামে শক্তি সঞ্চয় করে সমস্ত কষ্ট বরদাশত করে চল। তোমার এবং তোমার ন্যায় অপর সকল উৎপীড়িত মুসলিমের জন্য আল্লাহ শীঘ্রই উপায় বের করে দেবেন। আমরা এইমাত্র যে সন্ধি করেছি, তার অমর্যাদা করা অসম্ভব।"

উমার (রা) আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি প্রকাশ্যেই বললেন, ইসলাম গ্রহণের পর– আমি এ পর্যন্ত এত প্রচণ্ড ব্যথা আর পাইনি যা আজ এই সন্ধিপত্রের ফলে পেয়েছি। তিনি সোজা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে গিয়ে হাজির হলেন। গিয়ে নিবেদন করলেন:

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আল্লাহর নাবী নন?" তিনি বললেন, নিশ্চয়ই! তারপর 'উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই? আর আমাদের শত্রুরা কি বাতিলের পথে– অসত্যের দাবি নিয়ে দণ্ডায়মান নয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ দৃপ্তকণ্ঠে জওয়াব দিলেন, হাঁ। 'উমার তখন বললেন, তবে কেন আমরা দুনিয়ার জন্য দীনের অবমাননা স্বীকার করে নিচ্ছি? রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাঁকে প্রত্যয় দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, শান্ত হও হে 'উমার! আমি আল্লাহর রাসূল– তিনি আমার সাহায্যকারী– আমি তার অমান্যকারী নই– তাঁরই ইচ্ছাক্রমে বৃহত্তর ও স্থায়ী কল্যাণ সামনে রেখে এই সন্ধি স্থাপিত হয়েছে। জেনে রাখো মাক্কায় আমি শীঘ্রই ফিরে আসবো এবং কা'বার তাওয়াফ করবো।

'উমারের মনের ক্ষোভ তখনও মিটেনি। তিনি মনের সেই দুঃখতাপ নিয়ে এলেন আবূ বাক্‌র (রা)-এর নিকট।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে যেভাবে বুঝিয়ে ফেরত দিয়েছিলেন আবূ বাক্‌রও (রা) তেমনি তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত থাকতে বললেন। অতিরিক্ত তাঁকে এই উপদেশ দিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে চল– যতদিন তুমি জীবিত থাক।

সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর

সন্ধিপত্র লেখা সমাপ্ত এবং উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনার পথে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে উমরাহর জন্য আনীত উট কুরবানী করার এবং মাথা মুণ্ডানোর মাধ্যমে এহরাম থেকে ফারেগ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন, তিনি মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে আদেশ দিলেন, উঠো! তোমরা কুরবানী কর এবং মাথা মুণ্ডাও। সাহাবাগণ তখন সন্ধির হেয়তাজনক শর্তে এতই মর্মাহত যে, তাদের কেউ এই ব্যাপারে উৎসাহ দেখালেন না– কেউ তাঁর হুকুম তামিলের জন্য সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার তাঁর নির্দেশ শুনালেন। কিন্তু কোনই ফল হল না।

এই সফরে তাঁর সহধর্মিণীদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে ছিলেন উম্মু সালামা (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষণ্ন মনে তাঁর নিকট গমন করলেন। তাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখে উম্মু সালামা কারণ জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট অবস্থা বর্ণনা করলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি যোগ্য সহধর্মিণীর ন্যায় তাকে পরামর্শ দিলেন "ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনি এক কাজ করুন, কাউকে কোন কথা না বলে আপনি নীরবে আপনার পশু কুরবানী করুন, হাজ্জামকে ডেকে আপনার নিজের মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলুন। এই পরামর্শ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খুব পছন্দ হল। তিনি তাই করলেন। ফলে তাঁর দেখাদেখি সমস্ত মুসলিম কুরবানী করার কাজ শুরু করে দিলেন এবং একে অপরের মাথা মুণ্ডাতে লেগে গেলেন।

এভাবে একজন দূরদর্শী সহধর্মিণীর পরামর্শে তিনি একটি কঠিন সমস্যার সহজ সমাধানের পথ খুঁজে পেলেন।

www.islamicboi.com

Contents

মুহাজির নারীদের সম্বন্ধে হুকুম

এ সময় কতিপয় মুসলিম নারী তাদের কাফির স্বামীদের ছেড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে এসে হাজির হন। তাদের সম্বন্ধে কী করণীয়- এ চিন্তায় রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উদ্বিগ্ন তখন কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হল:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ.

"হে মু'মিনগণ! যখন মু'মিন নারীরা হিজরত করে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়, তখন তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখবে, তাদের ঈমান সম্বন্ধে আল্লাহই হচ্ছেন অধিকতর বিদিত, তবে তোমরা যদি (বাহ্যিক আচরণে) তাদের মু'মিন বলে জানতে পার, সে অবস্থায় তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফিরিয়ে দিও না, এ নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় আর কাফিররাও মু'মিন নারীদের পক্ষে বৈধ নয়।"

(সূরা মুমতাহিনা- ১০)

এই সন্ধির পর খুযা'আ গোত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে এবং বানী বাক্‌র কুরাইশদের মিত্ররূপে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর এই সন্ধিকে আল্লাহ তা'আলা 'ফাতহুম মুবীন' বা প্রকাশ্য বিজয় বলে আখ্যায়িত করেন।

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيْناً.

"নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।" (সূরা: ফাত্‌হ- ১)

আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় প্রদান করলাম। 'উমার বিস্মিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন এ কি সত্যই আমাদের বিজয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হাঁ- সত্যই এটা আমাদের জন্য এক মহা বিজয়, অগ্রগতির এক শুভ সূচনা।[৫৭]

---

[৫৭] "সন্ধির পর মুসলিমগণ কাফিরদের সঙ্গে অসংকোচে মেলামেশার সুযোগ পেলেন, তাদের নিকট মুক্ত কণ্ঠে ইসলামের বাণী প্রচারের সুযোগ তারা লাভ করলেন। ইতোপূর্বে দুশমনি ভাব বিদ্যমান থাকায় কাফিররা ইসলামের কথা শুনতেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠত, কিন্তু এখন ধীরস্থিরভাবে ভেবে দেখার মত মানসিক অবস্থা তারা অনুভব করতে লাগল। ফল হল এই যে, এরপর থেকে দু'একজন করে নয়, দলে দলে তারা মুসলিম হতে লাগল। হুদায়বিয়ায় সন্ধির পূর্বে ১৯ বছরে যত লোক ইসলাম কবুল করেছিলেন, সন্ধির পর মাত্র দু'বছরে তার চাইতে বেশি লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন ১৪০০ মুসলিম আর সন্ধির দু'বছর পরেই বিজয়ের ঝাণ্ডা বয়ে যখন তিনি মাক্কায় প্রবেশ করলেন তখন তার সঙ্গী হয়েছিলেন দশ হাজার মুসলিম। আর তার তিন বৎসর পর বিদায় হাজ্জে হাজ্জব্রত পালনের জন্য সমবেত হয়েছিলেন এক লক্ষ পঁচিশ হাজার মুসলিম। *-অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

Contents

খায়বারের যুদ্ধ

"হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই রাসূলুল্লাহ ﷺ গুপ্ত বার্তাবাহকের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, খায়বারে বসবাসকারী ইয়াহুদীগণ এবং মাদীনা থেকে বিতাড়িত ইয়াহুদীরা একজোট হয়ে মাদীনা আক্রমণের তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে বেদুঈন গোত্র গাতফান। সংবাদ শুনেই সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসে ১৬ শত মুজাহিদের এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। তিনি যাত্রাপথ এমনভাবে বেছে নিলেন যাতে করে শত্রু পক্ষের ধারণা জন্মে যে, খায়বারে নয়, গাতফান গোত্রের বাসস্থানের দিকেই মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে।

গাতফানরা খায়বারের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল; মুসলিম বাহিনী তাদের বাসস্থানের দিকে সফর নির্ধারণ করেছে জানতে পেরে তারা তাদের আবাস ভূমির প্রতিরক্ষার তাগিদে যাত্রাভঙ্গ করে নিজেদের গৃহে ফিরে এল। খায়বারে গিয়ে ইয়াহুদীদের সঙ্গে মিলিত হওয়া তাদের আর ঘটে উঠল না।"

খায়বারে মুসলিম বাহিনীর বিজয় এবং প্রচুর গনীমতের মাল লাভের খোশখবর আল্লাহ তা'আলা ওয়াহীর মাধ্যমে হুদায়বিয়াতেই দিয়ে রেখেছিলেন। সূরা ফাত্হায় বলা হয়েছে:

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيْباً – وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَأْخُذُوْنَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيْزاً حَكِيْمًا.

"তিনি প্রদান করেন পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে একটি বিজয় (যা) সন্নিকট".....'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে প্রচুর গনীমতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যা তোমরা লাভ করবে, শীঘ্রই উক্ত গনীমত তিনি তোমাদের মিলিয়ে দিবেন এবং অন্য লোকদের হাত তোমাদের উপর থেকে প্রতিহত করবেন।"

(সূরা ফাত্হ: ১৮-১৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে যথা সময়ে বিনা প্রতিবন্ধকতায় খায়বারে পৌছে গেলেন। এখানে ৬ টি সুরক্ষিত মজবুত কেল্লায় ইয়াহুদীরা ২০ হাজার সৈন্য সমাবেশ করেছিল এবং বিস্তর অস্ত্র সম্ভার জমা করে রেখেছিল।

একে একে ৫টি দূর্গ দখল করার পর বাকি থাকল ৬ষ্ঠ দূর্গ। এটির নাম ছিল কামূস– সব চেয়ে দুর্ভেদ্য দূর্গ। এটি জয় করতে মুসলিমদের বেশ বেগ পেতে হয়। অবশেষে আল্লাহর সিংহ নামে খ্যাত আলীর নেতৃত্বে বীর মুজাহিদরা দুর্বার বেগে দূর্গটি আক্রমণ করলেন। ইয়াহুদীদের পক্ষে এই প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হলো না, ফলে একদিন কামূস দূর্গের পতন ঘটল।

ইয়াহুদীরা যুদ্ধে পরাভূত এবং পর্যুদস্ত হল বটে কিন্তু তাদের সঞ্চিত ধন-দৌলতের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। কারো মুখ দিয়েই সঞ্চিত ধনের গোপন তথ্য ফাঁস হচ্ছিল না। কিন্তু মুসলিমরা সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে তারা এক ইয়াহুদীকে বাগে আনতে সমর্থ হলেন। তার কাছে গোপন তথ্য জেনে নিয়ে মুসলিমরা নির্দিষ্ট স্থানে মাটির নিচে প্রোথিত অজস্র ধন-দৌলতের সন্ধান পেয়ে গেলেন। সন্ধানদাতাকে এ জন্য প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত করা হল।

www.waytojannah.com

Contents

ইয়াহূদীদের সঙ্গে সন্ধি

আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) রিওয়ায়াত করছেন যে, পরাজয় বরণের পর ইয়াহূদীরা এই মর্মে সন্ধি করতে বাধ্য হল যে, তারা নির্বাসিত হবে এবং অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া তারা তাদের অর্থ, ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী ও তৈজসপত্র যতটা নিজেরা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে নিয়ে যাবে। কিন্তু দেশ ত্যাগের যখন সময় হয়ে এল, তখন জন্মভূমির মায়া ছাড়তে না পেরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে তারা এই আরয পেশ করলো,

"আপনি মেহেরবানী করে আমাদের এখানেই অবস্থান করতে দিন, আমরা এখানকার কৃষি ভূমির চাষাবাদ সম্পর্কে পুরাপুরি অভিজ্ঞ। আমরা যত্নের সঙ্গে চাষাবাদ করে উৎপন্ন ফসলের একটা নির্দিষ্ট অংশ আপনাদের দেব।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যারা ছিলেন চাষাবাদের ব্যাপারে তারা তেমন অভিজ্ঞ ছিলেন না। কাজেই ইয়াহূদীদের দরখাস্ত তিনি মঞ্জুর করলেন এবং নির্বাসন দণ্ড সাময়িক ভাবে মুলতবী করে ফসলের আধা-আধি বণ্টনের শর্তে আবাদের জন্য তাদের হাতে জমি ছেড়ে দিলেন। সন্ধি পত্রে কোন সময়-সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্জির উপর এটা ছেড়ে দেয়া হয়। যতদিন তিনি সঙ্গত মনে করবেন, ততদিনই তাদের থাকতে দেয়া হবে।

এক নও মুসলিম দাসের আত্মোৎসর্গ

খায়বারের এক ইয়াহূদীর ছিল এক ক্রীতদাস– আবিসিনিয়ার অধিবাসী, কৃষ্ণকায় এবং কদাকার। সে তার প্রভুর ছাগল চরাত। হঠাৎ সে দেখতে পেল যে, খায়বারের ইয়াহূদীরা সবাই অস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সে তাদের জিজ্ঞেস করল ব্যাপার কী? তোমরা কি করতে চাচ্ছ? তারা বলল, আমরা সেই লোকটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব (অথবা তাকে হত্যা করব) যে নাকি ধারণা করছে যে, সে একজন নাবী!

"নাবী!" এই একটি মাত্র কথা তার হৃদয় স্পর্শ করল– তার অন্তরে এক আলোড়ন সৃষ্টি করল। সে তার ছাগলসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে এসে হাযির হ'ল। তাঁকে সে জিজ্ঞেস করল আপনি লোকদের কী বলে থাকেন, তাদের কিসের পানে আহ্বান জানান?

রাসূলুল্লাহ ﷺ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "আমি আহ্বান জানাই ইসলামের প্রতি; আর বলি, তোমরা এই সাক্ষ্য দান কর যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল আর আমি এ কথাও বলি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারও 'ইবাদাত করবে না, কারও নিকট মাথা নোয়াবে না, কারও আনুগত্য স্বীকার করবে না।"

সেই কৃষ্ণকায় কদাকার ক্রীত দাসটি তখন বলল, আমি যদি সেই সাক্ষ্য প্রদান করি এবং মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহর উপর ঈমান আনি তাহলে আমি কী পাব? রাসূলুল্লাহ ﷺ জওয়াবে বললেন, তুমি যদি সেই অবস্থায় মারা যাও তাহলে তুমি জান্নাতে স্থান লাভ করবে।

ক্রীতদাস ইসলাম গ্রহণ করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে আরয করল এই ছাগলের পাল আমার কাছে রয়েছে– এটা তো একটা আমানত– আমি এগুলোর এখন কী করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার আমানাত মালিককে প্রত্যর্পণ করে তুমি মুক্ত হও। সে তাই করল, মালিককে সে ছাগলগুলো ফেরৎ দিয়ে এল। ইয়াহূদী মালিক বুঝতে পারল, সে ইসলাম কবূল করেছে।

www.waytojannah.com

Contents

তারপর ইয়াহূদীদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ নসীহাত করলেন এবং সেই নসীহাতে সাহাবীদের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন, যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্তদের মধ্যে[৫৮] সেই কৃষ্ণকায় হাবশী দাসও একজন।

দাফনের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের সামনে এসে ঘোষণা করলেন, আল্লাহ এই দাসকে এক মহা সম্মানে সম্মানিত করেছেন, তাঁকে তিনি অজস্র কল্যাণে পুরস্কৃত করেছেন। তাকে সম্বর্ধনার জন্য তাঁর মাথার কাছে দু'জন সুদর্শন হুরকে আমি দেখতে পেয়েছি– অথচ আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি বারও সে সিজদায় প্রণত হওয়ার সুযোগ পাইনি।

সাফিয়্যা (রা)-এর সাথে নাবী ﷺ-এর বিবাহ

এই যুদ্ধে ইয়াহূদীদের মধ্যে কতিপয় নারী ও পুরুষ মুসলিমদের হাতে ধরা পড়ে, তাদেরকে বন্দী করে রাখা হয়। এই বন্দীদের মধ্যে ছিলেন সাফিয়্যা বিনতি হুয়াই। তাঁর পিতা হুয়াই ছিল ইয়াহূদীদের অন্যতম প্রধান নেতা আর তাঁর স্বামী কিনানা ইবনু আবিল হুকাইক ছিল কামূস দুর্গের অধিরক্ষক। কিনানা নিহত হওয়ায় সাফিয়্যা এখন বিধবা। এই মহিলা পূর্ব থেকেই ইসলাম এবং ইসলামের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি আকৃষ্টা ছিলেন, বন্দী হওয়ার পরই তিনি ইসলাম ধর্ম কবূল করেন। একজন ইয়াহূদী নেতার মেয়ে এবং ইয়াহূদী নেতার স্ত্রী বিধায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিজের সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। তাঁকে তিনি প্রথমে আযাদ করে দেন এবং ঐ আযাদীকেই মোহরানারূপে নির্ধারণ করেন। শুভ বিবাহ যথানিয়মে সম্পন্ন হওয়ার পর পথে 'সাদদুর রাওহা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনদিন অবস্থান করেন। সেখানে বিবাহের ওয়ালিমার[৫৯] ব্যবস্থা করা হয় এবং নাবী ﷺ সাফিয়্যা (রা) এর সাথে বাসর রাত্রি যাপন করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিষ খাওয়ানো

এই যুদ্ধ শেষে বিশ্বাসঘাতক ইয়াহূদীরা নাবী ﷺ-কে হত্যা করার জন্য এক জঘন্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তাদের প্ররোচনায় এক ইয়াহূদী রমণী– যয়নব বিনতে হারিস ছাগলের গোশত পাকিয়ে

---

[৫৮] এই যুদ্ধে কোন মতে ১৯ জন, কোন মতে ২৩ জন মুসলিম শহীদ হন, ইয়াহূদীদের মধ্যে ৯৩ জন কতল হয়

[৫৯] সাহাবীদের সঙ্গে যে সব খাদ্য ছিল তার থেকে যে পরিমাণ খাদ্য মাদীনা পৌঁছা পর্যন্ত প্রয়োজন হতে পারে সেই পরিমাণ খাদ্য রেখে উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য হাযির করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের নির্দেশ দেন। ফলে সাহাবীদের কেউ খুরমা, কেউ পনীর কেউ বা ঘি হাযির করতে থাকেন। সমস্ত খাদ্য একত্র করে দস্তরখানে বন্টন করা হয়। ১৫ শতাধিক সাহাবা দলে দলে সেই দস্তরখানগুলোর চারিপার্শ্বে বসে আহার করেন।

"কথিত আছে সাফীয়্যা (রা)-এর চোখের উপর ভাগে একটি আঘাতের চিহ্ন ছিল। প্রথমবার যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে উপস্থিত হলেন তখনই তাঁর দৃষ্টিতে পড়ল সেই আঘাতের দাগ। নাবী ﷺ কারণ জিজ্ঞেস করায় সাফিয়্যা যা বললেন তা হচ্ছে এই:

একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম আকাশ থেকে উজ্জ্বল চাঁদ এসে পড়ল আমার কোলে। আমি এর তাৎপর্য বুঝতে না পেরে স্বামী কিনানাকে স্বপ্নের কথা বললাম। শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন, ক্রুদ্ধ হলেন, রাগের মাথায় বললেন, কী! হিজাজের বাদশাহকে স্বামীরূপে পেতে তোমার বাসনা! আর তাই তিনি স্বপ্নে তোমার কোলে এসে পড়েন। এই না বলে তিনি আমার মুখে কষে দিলেন এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত। আঘাতের সেই চিহ্নটিই রয়ে গেছে চোখের উপর।"
–অনুবাদক।

www.waytojannah.com

Contents

হাদিয়া স্বরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠিয়ে দেয়। সে জিজ্ঞেস করেছিল, কোন গোশত নাবীর ﷺ নিকট অধিক প্রিয়? তাকে বলা হয়েছিল– সামনের রান। তাতেই বেশি করে বিষ মিশিয়ে দেয়। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ গোশত খেতে শুরু করলে আল্লাহর হুকুমে সেই গোশতের টুকরার যবান খুলে যায়– ঐ গোশতের টুকরা তাকে জানায় যে, তাতে বিষ মাখানো আছে–[৬০] ফলে তিনি গোশত খেতে বিরত হন এবং সাহাবীদের খেতে নিষেধ করেন। কিন্তু ইতোপূর্বে বিশ্‌র ইবনু বারা গোশত ভক্ষণ করে ফেলেছিলেন। ফলে তাঁর দেহে বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হুকুম করলেন, এখানে যত ইয়াহূদী আছে সকলকে আমার সম্মুখে একত্রিত কর। ফলে তাদের একত্রিত করা হল। তাদেরকে দু'টো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার পর রাসূলুল্লাহ পুনঃ তাদের বললেন, আমি তোমাদেরকে আর একটি কথা জিজ্ঞেস করব– তোমরা কি সত্য কথা বলবে? তারা বলল, হাঁ আবুল কাসিম! আমরা সত্য কথাই বলব। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিসে তোমাদের এই কাজে প্ররোচিত করেছিল? তারা বলল, আমরা চেয়েছিলাম যে, আপনি যদি মিথ্যাবাদী হন, তাহলে এ কাজ করে আপনার কবল থেকে আমরা নিস্কৃতি পাব। আর আপনি যদি সত্য সত্যই নাবী হন, তাহলে এই বিষ আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।[৬১]

তারপর সেই স্ত্রী লোকটিকে ডাকা হল যে নিজ হাতে বিষ মিশিয়ে ছিল। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন্ উদ্দেশে এ কাজ করেছিলে? সে বলল, আমি আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তোমাকে সে ক্ষমতা দেন নাই। সাহাবীগণ বললেন, আমরা কি তাকে হত্যা করে ফেলব না। তিনি বললেন, না। (সহীহ মুসলিম)

তখন পর্যন্ত বিশ্‌র ইবনু বারা বিষ ক্রিয়ায় মারা যাননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষ প্রয়োগকারিণী রমণীকে ক্ষমা করে দেন।

কিন্তু পরে সেই বিষ ক্রিয়ার ফলে বিশ্‌র ইবনু বারা যখন মারা যান তখন হত্যার অপরাধে উক্ত ইয়াহূদী রমণীটিকে হত্যা দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

আবিসিনিয়া থেকে মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন

মাক্কার কুরাইশদের অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যেসব মুসলিম আবিসিনিয়া হিজরত করেছিলেন, তাদের একদল পূর্বেই ফিরে এসেছিলেন, অবশিষ্টদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুদিন পূর্বে লোক প্রেরণ করেন। আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা নাজ্জাশীর সাহায্য ও সহযোগিতায় তারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আরব ভূমিতে সহী সালামতে অবতরণের পর তারা জানতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের নিয়ে খায়বার অভিযানে বের হয়েছেন। তারা সোজা সেখানে গিয়ে খায়বার বিজয়ের শেষ দিবসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাদের আপন জনের সঙ্গে মিলিত হন।

---

[৬০] বিশ্বস্ত হাদীস গ্রন্থগুলোতে গোশতের টুকরার কথা বলে উঠার বিবরণ পাওয়া যায় না। বুখারী ও মুসলিমের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গোশত খেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই বিষের ক্রিয়াতেই তিনি ইন্তিকাল করেন– অর্থাৎ তিনি শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। *–অনুবাদক।*

[৬১] হাদীসে বর্ণিত হয়েছে আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আল-জিহ্বায় আমরা ঐ বিষের চিহ্ন বরাবর দেখে এসেছি। 'আয়িশাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে রোগে মারা যান, সেই রোগের সময়ে তিনি প্রায়ই বলতেন, "হে 'আয়িশাহ! খায়বারে যে খাদ্য আমি খেয়েছিলাম, তার যাতনা আমি বরাবর পেয়ে এসেছি। আর এখন আমি অনুভব করছি– ঐ বিষের কারণে আমার প্রাণশিরা ছিন্ন হওয়ার সময় উপস্থিত। *–অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

Contents

এই ফিরে আসা মুহাজিরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো ভাই– জা'ফর ইবনু আবূ তালিব ['আলী (রা)-এর ভ্রাতা], আবূ মূসা আশ'আরী এবং আসমা বিনতে উমাইস।

অন্যান্য ইয়াহূদী গোত্রসমূহের বশ্যতা স্বীকার

'ওয়াদি-উল-কুরা' নামক স্থানে এক ইয়াহূদী গোত্র বসবাস করতো, খায়বার বিজয়ের পর মাদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে ৩৮২ জন মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াদি-উল-কুরার দিকে অগ্রসর হন।

সেখানে পৌঁছে প্রথমেই ইয়াহূদীদের নিকট ইসলামের পয়গাম পৌঁছানো হল– মুসলিম হয়ে যাও, তোমাদের মঙ্গল হবে, তোমরা বেঁচে যাবে; তোমাদের ধন-সম্পদ সুরক্ষিত থাকবে। কিন্তু তারা এই মঙ্গলজনক আহ্বানে সাড়া দিল না। তারা প্রতিরোধ এবং যুদ্ধের জন্য তাদের প্রস্তুতির কথা জানাল। মল্ল যুদ্ধের জন্য প্রথমে এক ব্যক্তি এগিয়ে আসল। যুবাইর ইবনু আওনুলয়াম (রা) তার মুকাবেলায় অগ্রসর হলেন। একে একে দু'জন ইয়াহূদী তাঁর হাতে মারা গেল। তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন আলী (রা)। সেই ব্যক্তিও নিহত হল। এমনিভাবে ১১ ব্যক্তি- একের পর এক নিহত হওয়ার পর ইয়াহূদীদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ল। তারা পরাভূত হল। তাদের ধন দৌলত মুসলিমদের হস্তগত হল। অবশেষে খায়বারের অধিবাসীদের ন্যায় সন্ধিতে আবদ্ধ হয়ে তারা নিষ্কৃতি পেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে ৪ দিন অবস্থান করেন। এটি ৭ম হিজরীর মুহাররাম মাসের ঘটনা।

সফর মাসে ফাদাকের ইয়াহূদীদের সঙ্গে ঐ একইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। গালিব ইবনু আবদুল্লাহ লায়সীর নেতৃত্বে প্রেরিত অভিযানে ফাদাকের ইয়াহূদীরা প্রথমে বাধা প্রদানের দুর্বুদ্ধি প্রদর্শন করে। তাদের কিছু লোক নিহত হওয়ার পর তাদের চৈতন্যোদয় হয়। ফলে ঐ একইরূপ শর্তে সন্ধিতে আবদ্ধ হয়।

তাইমার ইয়াহূদীরা যখন খায়বার, ওয়াদি-উল-কুরা এবং ফাদাকের ইয়াহূদীদের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হল, তখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সন্ধি ও শান্তির দরখাস্ত প্রেরণ করল। তিনি তা মঞ্জুর করলেন। বিনা বাধায় এবং বিনা রক্তপাতে তাইমার অধিবাসীরা শান্তির পথ বেছে নিল।

এমনিভাবে সমগ্র আরবের ইয়াহূদী গোত্রসমূহ পরাভূত হয়ে মাদীনার কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হল। এই সমস্ত ইয়াহূদী গোত্র 'উমার (রা) এর খেলাফতের প্রথম পর্যায়ে এই অবস্থাতেই শান্তির সঙ্গে অবস্থান করে চলেছিল।

উমার (রা) তাঁর খিলাফাত কালে রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার খাতিরে খায়বার এবং ফাদাকের ইয়াহূদীদের নির্বাসিত করেন কিন্তু তাইমা এবং ওয়াদি-উল-কুরার ইয়াহূদীদের নিজ নিজ স্থানে অবস্থানের অনুমতি অক্ষুণ্ন রাখেন। এর প্রধান কারণ এই যে, পরবর্তী দু'টো স্থান সিরিয়ার এলাকাভুক্ত, অপর পক্ষে খায়বার ও ফদক হিজাযের পবিত্র ভূমির অভ্যন্তরে অবস্থিত; আর এই পবিত্র ভূমিকে সর্বপ্রকারের অমুসলিম থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখা তখন অপরিহার্য প্রয়োজনরূপে দেখা দেয়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সফর থেকে শওওয়াল পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দিকে প্রয়োজনের তাগিদে ছোটখাট অভিযান প্রেরিত হয়। তন্মধ্যে নজদের পথে বানী ফাযারার বিরুদ্ধে আবূ বাক্র (রা)-এর নেতৃত্বে একটি, হাওয়াযেনের দিকে তারিয়ার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে 'উমার ফারূকের (রা) নেতৃত্বে একটি, আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা-এর নেতৃত্বে বাশীর ইবনু ওয়ারাম ইয়াহূদীর বিরুদ্ধে একটি, গালিব ইবনু আবদুল্লাহ লায়সীর নেতৃত্বে দু'টি, যাইদ ইবনু হারিসার নেতৃত্বে একটি, উসামা ইবনু যাইদের নেতৃত্বে একটি এবং বাশীর ইবনু সা'দের নেতৃত্বে একটি অভিযান উল্লেখযোগ্য।

www.waytojannah.com

Contents

বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দলের মাদীনায় আগমন

ইসলাম বিশ্বধর্ম। এতদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আরববাসীদের মধ্যেই ইসলামের আহ্বান জানিয়ে এসেছেন। বাইরে এই আহ্বান জানানোর মত অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই শুভ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সপ্তম হিজরীর মুহাররাম মাস থেকে তিনি বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাহ ও শাসনকর্তাদের নিকট ইসলামের আহ্বান সম্বলিত চিঠি প্রেরণ শুরু করে দেন।

ইসলামের বাণী এবং নাবী মুহাম্মাদ মোস্তাফা ﷺ-এর নাম এবং খ্যাতি চার দিকে পরিব্যাপ্ত হওয়ার ফলে এই হিজরী সন থেকেই আরবের বিভিন্ন গোত্র এবং দূর-দূরান্ত হতে বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের একের পর এক মাদীনায় আগমন ঘটতে থাকে।

খায়বার যুদ্ধের পর হিংস্র পশুপক্ষী নিষিদ্ধরূপে ঘোষিত হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সময়ে গাধার মাংস খাওয়াও নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। আরব দেশে মুতা বিবাহ (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অস্থায়ী বিবাহ) দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত ছিল। এই সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশে এই গর্হিত প্রথাটিও রহিত হয়ে গেল।

মুলতবী উমরাহ

সপ্তম হিজরীর জিলকাদ মাস। এই সময় পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত উমরা আদায় করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু সংখ্যক সাহাবীসহ মাক্কার উদ্দেশে এসে 'উমরা পালন করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিনা বাধায় উমরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান, কা'বা ঘর যিয়ারাত, তাওয়াফ, সাফা মারওয়া সা'ঈ, মাথা মুণ্ডন, কুরবানী প্রভৃতি সম্পন্ন করে ৩ (তিন) দিন অবস্থানের পর প্রত্যাবর্তন করেন। ক্রোধ, হিংসা ও বিদ্বেষ বশতঃ কুরাইশ প্রধানগণ নিকটবর্তী আবূ কুবাইস পর্বত উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু মাক্কার জনসাধারণ মুসলিমদের নির্বিঘ্নে উমরা পালন করতে দেখে ভিতরে ভিতরে জ্বলে পুড়ে খাক হতে থাকে। কেউ কেউ মুসলিমদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে ও গালাগালি দিয়ে ঝগড়া বাধাবারও চেষ্টা করে। কোন কোন সাহাবী এতে উত্তেজিত হয়ে উঠলে দয়ার নাবী ও রহমাতের ছবি মুহাম্মাদ ﷺ তাদেরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ প্রদান করেন। ফলে তারা নিরস্ত হন।

মাইমূনা (রা)-এর সাথে রাসূল ﷺ-এর বিবাহ

ফিরবার প্রাক্কালে মাইমূনা নাম্নী এক বিধবা রমণী রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হওয়ার জন্য এক প্রস্তাব পাঠিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে তাকে আপন সহধর্মিণী রূপে গ্রহণ করেন।

এ বিবাহে এক চমৎকার ফল লাভ হয়। বীরপ্রবর খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ছিলেন মাইমূনার আপন ভগিনীর পুত্র। এই বিয়ের অল্প কিছু দিন পরেই তিনি মাদীনায় গিয়ে নাবী ﷺ-এর হাতে বাইআত পড়ে ইসলাম ধর্ম কবূল করেন। মাদীনার পথে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন আরও দু'জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। একজন প্রখ্যাত কবি 'আম্‌র, অপরজন কা'বা গৃহের কুঞ্জিরক্ষক 'উসমান ইবনু তালহা। এ তিনজন শক্তিমান ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের ফলে কুরাইশদের মেরুদণ্ড একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে।

একমাত্র আবূ সুফ্‌ইয়ান ও ইকরিমা ইবনু আবূ জাহল ছাড়া কুরাইশদের মধ্যে ইসলামের বিরোধিতার ভূমিকায় তেমন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি আর কেউ অবশিষ্ট রইল না।

www.waytojannah.com

Contents

মূতার যুদ্ধ[৬২]

বিপুল খৃস্টান বাহিনীর সাথে মুসলিমদের মুকাবেলা

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সময়ে দেশ বিদেশের রাজা বাদশাহ এবং গোত্রপতিদের নিকট ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে পত্র প্রেরণ করে চলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এমনি এক পত্র নিয়ে হারিস ইবনু 'উমাইর আল-আযদী বসরার শাসনকর্তার নিকট রওয়ানা হন। উমারকে বসরার পথে শুরাহ বিল ইবনু 'আম্র আল গাসসানী নামক জনৈক খৃস্টান প্রধান আটক করে ফেলে। অবশেষে হাত পা বেঁধে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে নৃশংসভাবে তাঁকে হত্যা করে।

এই দুঃসংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌছলে তিনি খৃস্টানদের এই নির্দয় আচরণে (সর্বকালের রেওয়াজ অনুসারে দূতকে নির্মমভাবে হত্যা করায়) অতিশয় মর্মাহত এবং সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হন।

সিরিয়া ছিল প্রবল প্রতাপান্বিত রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের শাসনভুক্ত একটি রাজ্য। দূত মারফত তাঁর নিকটও ইসলাম গ্রহণের জন্য নাবীর দাওয়াত পত্র প্রেরিত হয়। প্রথমতঃ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সশ্রদ্ধ ধারণা পোষণ করেন এবং মনে মনে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে নেন কিন্তু তাঁর সভাসদ এবং পরামর্শ দাতাদের চাপে তিনি ইসলামের প্রতি বৈরীভাব দেখাতে থাকেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আমরা পরে যথা সময়ে দেখতে পাব।

যা হোক ইসলামের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক শক্তি এবং অগ্রগতি দর্শনে তিনি বিপদ গুণতে থাকেন এবং এই বিজয়ের প্রতিরোধে বিপুল প্রস্তুতি শুরু করে দেন।

এই সময়ে হিরাক্লিয়াসের মনোভাব নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে অনুধাবন করা যেতে পারে।

"ফারওয়া ইবনু 'আমির নামক জনৈক মহাপ্রাণ ব্যক্তি সে সময় সিরিয়ার 'মা'আন' প্রদেশের গভর্নর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নিজে নাবীর বিষয় অনুসন্ধান করে যখন দৃঢ়রূপে বুঝতে পারলেন যে, বস্তুতঃ তিনি আল্লাহর সত্য নাবী এবং যীশুখৃষ্টের ['ঈসা (আ.)-এর] প্রতিশ্রুত সেই মহামহিম ভাববাদী, তখন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পত্র দ্বারা নাবীকে এ সংবাদ জানিয়ে দেন। নাবী ﷺ তখন মুসলিমদের জীবনের সাধনাগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করে ফারওয়ার পত্রের উত্তর প্রদান করলেন। এদিকে ফরওয়ার ইসলাম গ্রহণের কথা অবিলম্বে সর্বত্র প্রচারিত হল। তখন রোম সম্রাট তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যান এবং এই নব ধর্ম ত্যাগ করতে আদেশ করেন।

কিন্তু 'সত্য'কে যে সত্যভাবে পেয়েছে তা ত্যাগ করা তার সাধ্যাতীত। কাজেই ফারওয়া রাজ-আদেশ অমান্য করতে বাধ্য হলেন। তখন পদমর্যাদা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সকল প্রকার প্রলোভন দিয়ে ফারওয়াকে বশ করার চেষ্টা হতে লাগল। কিন্তু এ চেষ্টাও বিফল হয়ে গেল। প্রবল প্রতাপান্বিত রোম সম্রাট বজ্র কণ্ঠে ফারওয়াকে নৃশংসভাবে হত্যা করার আদেশ প্রদান করলেন। বলা বাহুল্য যে, সে আদেশ অবিলম্বে প্রতিপালিত হয়ে গেল। কিন্তু নব দীক্ষিত ফরওয়া নিজের ধন, মান এমনকি জীবনের কোন পরওয়া না

---

[৬২] মূতা সিরিয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত একটি স্থানের নাম। এখানে অষ্টম হিজরীর জামাদিউল উলায় খৃষ্টানদের সঙ্গে মুসলিমদের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। *–অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

Contents

করে ধীরস্থির চিত্তে ও ভক্তি গদগদ কণ্ঠে কালিমায়ে তাওহীদ পাঠ করতে করতে ক্রুশে আরোহণ করলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আনন্দ সঙ্গীত গাইতে গাইতে হাজার হাজার দর্শকের প্রাণে প্রাণে তাওহীদের ঝঙ্কার জাগিয়ে দিয়ে অনন্তধামে চলে গেলেন।

"ফারওয়া উত্তরে বলেন, আমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ধর্ম কখনই ত্যাগ করব না! আপনি উত্তমরূপে জানেন যে, যীশু ['ঈসা (আ)] পূর্বে এরই আগমনের সুসংবাদ দান করে গেছেন। কিন্তু সম্রাট! রাজ রাজত্বের মায়ায় পড়েই আপনি আজ এ সত্যকে অস্বীকার করছেন।" অতঃপর তাঁকে ক্রুশে দেয়া হল।

ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম মুজাহিদদের একটি বাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং সেই বাহিনীর সিপাহসালার নিযুক্ত করলেন যাইদ ইবনু হারিসকে।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই নির্দেশও প্রদান করলেন যে, যাইদ এই যুদ্ধে শহীদ হলে সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হবে জা'ফর ইবনু আবূ তালিব আর সেও শাহাদাত বরণ করলে সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা। আর সেও যদি শহীদ হয়ে যায় তা হলে মুজাহিদগণ তাদের পছন্দমত আর একজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করে নিবে।

এই অভিযানে মুসলিম যোদ্ধাবৃন্দের সংখ্যা ছিল তিন হাজার।[৬৩]

অতঃপর মুসলিম সেনাবাহিনী সিরিয়ার সীমান্তে 'মা'আন' নামক স্থানে পৌছলে খবর পেলেন যে, 'বালকা' নামক স্থানে এক লক্ষ খৃস্টান সৈন্য মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে এবং স্বয়ং রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাদের নেতৃত্ব প্রদান করছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আরও এক লক্ষ সৈন্য সংগৃহীত হচ্ছে।

এ খবর ছিল নিঃসন্দেহে ভয়াবহ এবং মুসলিমদের নিকট অকল্পনীয়। তারা সামনে আর অগ্রসর না হয়ে দুই রাত্রি সেখানে অবস্থান করে তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করতে লাগলেন।

অনেকেই বললেন, আমাদের উচিত হবে পরিস্থিতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহকে ﷺ লিখে জানান। আমরা তাঁকে শত্রুসেনার সংখ্যা এবং তাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করে তাঁর নির্দেশের প্রতীক্ষা করি। তিনি সম্ভবতঃ আরও লোক পাঠিয়ে আমাদের শক্তি বর্ধিত করবেন, অথবা তিনি যা সঙ্গত মনে করবেন সেই নির্দেশই আমাদের জানিয়ে দেবেন। আমাদের শক্তি বৃদ্ধি অথবা তাঁর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত বিপুল অস্ত্র সজ্জিত সুশিক্ষিত লক্ষ রোমক সৈন্যের মুকাবেলা করতে যাওয়া ঠিক হবে না।

সকলেই নীরব এমন সময় মহাবীর আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা দৃপ্তপদে এগিয়ে আসলেন এবং তেজদৃপ্ত ভাষায় বলে চললেন:

"হে কওমে মুসলিম! এ কী কথা তোমাদের মুখে শুনছি আজ! তোমরা যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বের হয়েছ, আল্লাহর কসম! তাই তোমাদের নিকট এমন অনাকাঙ্ক্ষিত মনে হচ্ছে! তোমরা বের হয়েছিলে

---

[৬৩] এই সেনাদলের যাত্রার সময় স্বয়ং রাসূল ﷺ এবং মদীনার মুসলিমগণ তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে "বিদায় উপত্যকা" পর্যন্ত গমন করেছিলেন। বিদায় দানের সময় মুহাম্মাদ ﷺ সকলকে সম্বোধন করে বললেন: আমি তোমাদেক সর্বদা সদ্ব্যবহার করতে উপদেশ দান করছি। আল্লাহর নামে যুদ্ধযাত্রা কর এবং সিরিয়ায় তোমাদের এবং আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধদান কর। তোমরা যে দেশে যাচ্ছ, সেখানকার মঠে সাধু-সন্ন্যাসীগণকে নিভৃত সাধনায় মগ্ন থাকতে দেখবে। সাবধান, তাদের কাজে কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করো না। সাবধান, শত্রুপক্ষের একটি বৃক্ষও ছেদন করো না। *–অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

শাহাদাতের গৌরব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে– সত্যের প্রচারে আত্মদানের উদ্দেশে! মুসলিম সংখ্যার জোরে পার্থিব শক্তির উপর ভরসা করে শত্রু সেনার সম্মুখীন হয় না। আমরা পার্থিব লাভের হিসাব করে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই না, আমরা যুদ্ধ করি একমাত্র এই দীনের সাফল্যের জন্য, যে দীন- যে জীবনব্যবস্থা দ্বারা– আল্লাহ আমাদের সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করেছেন। হে মুসলিম সেনানী, হে মুহাজিদ বাহিনী! এগিয়ে চল– বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, কোন অবস্থাতেই আমাদের ক্ষতির কোন কারণ নেই। আমরা হয় বিজয় লাভ করব, নয় শাহাদাত বরণ করব। দু'টোর যে কোনটিতেই আমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত।"

আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা এর এই ভাষণে সকলের মত এককভাবে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল, সকলেই যুদ্ধের জন্য মনেপ্রাণে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। "মুহূর্তের মধ্যে সব যুক্তি-তর্ক , সব দূরদর্শিতা এবং সমস্ত কৌশল কোথায় ভেসে গেল। সকলে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "আল্লাহর কসম, রাওয়াহা'র পুত্র সত্য কথা বলেছে।"

তিন হাজার মুসলিম এক লক্ষ খৃস্টানের মুকাবেলায় এগিয়ে চললেন। যথাসময়ে তারা 'মূতা' নামক স্থানে শত্রুসেনার মুকাবেলায় দণ্ডায়মান হলেন। সেনাপতি যাইদের হাতে ইসলামী ঝাণ্ডা।

শত্রুপক্ষ আক্রমণ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সিপাহসালার যাইদ বজ্র নির্ঘোষে হুকুম দিলেন, প্রতি আক্রমণ কর। অগ্রসর হও 'আল্লাহু আকবার'।[৬৪]

কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর সেনাপতি যাইদ শাহাদাত বরণ করলেন। নাবীর ﷺ নির্দেশ মত জা'ফর ইবনু আবূ তালিব পতিত ঝাণ্ডা স্বীয় হাতে তুলে নিলেন। তিনি অপূর্ব বল বিক্রমের সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে শত্রুর অসংখ্য আঘাতে জর্জরিত হয়ে অশ্বপৃষ্ঠ হতে ভূপাতিত হয়ে মাটি থেকেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর ডান বাহু কর্তিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, তিনি বাম হাতে পতাকা তুলে নিলেন। কিছুক্ষণ পর সেই হাতও কর্তিত হল, তবু তিনি ইসলামের ঝাণ্ডা অবনমিত হতে দিলেন না। দাঁতে মুখে ঝাণ্ডা আঁকড়িয়ে থাকলেন। তারপর তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। তখন তাঁর বয়স ৩৩ বছর। পরে দেখা গিয়েছিল তাঁর দেহের সম্মুখভাগে তালওয়ার ও বর্শার ৯০টি আঘাত। সামান্য একটু জায়গাও অক্ষত ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"মূতার যুদ্ধে জা'ফরের কর্তিত দুই বাহুর পরিবর্তে আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে দু'টি পাখা প্রদান করবেন, সেই পাখার সাহায্যে পাখির ন্যায় সে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই ঘুরে এবং উড়ে বেড়াবে।"

জা'ফর (রা) এর শাহাদাতের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মত আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা পতাকা নিজ স্কন্ধে তুলে নিলেন। তিনিও বীরবিক্রমে যুদ্ধ পরিচালনার পর শাহাদাতের গৌরব অর্জন করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্বাচিত তিনজন সেনাপতিই যখন একের পর এক শহীদ হয়ে গেলেন, তখন কিছু সময়ের জন্য মুসলিম সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা হতাশা এবং বিশৃঙ্খলার ভাব দেখা গেল। নেতা এবং পরিচালকের অভাবে বিক্ষিপ্ত মুসলিমদের অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। তখন দু'জন মুসলিম যোদ্ধাও একত্রে থাকতে পারেননি। শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণে যে যেদিকে পারলেন পালাতে বাধ্য হলেন। এমন সময়

---

[৬৪] "তিন হাজার কণ্ঠ সিরিয়ার গগণ পবন কম্পিত করে প্রতিধ্বনি করল– "আল্লাহু আকবার।" তার পর অস্ত্রের ঝনঝনা আর অস্ত্রের শনশনা, তলোয়ার তলোয়ারের চপলা চমক, বল্লমে বল্লমে দামিনী দমক। খালিদের হুঙ্কারে কায়সারের সিংহাসন পর্যন্ত কেঁপে উঠল, –সত্যের সাথে শায়তানের তুমুল সংগ্রাম বেধে গেল। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

সাবিত ইবনু আরকাম অবস্থার অশুভ পরিণতির কথা অনুধাবন করে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে মরণ-ব্যূহের মধ্যে বিদ্যুৎ বেগে ঢুকে পড়ে জাতীয় পতাকাটি তুলে ধরলেন। তারপর সকলকে ডাক দিয়ে বললেন, "কে কোথায় আছ ওগো মুসলিম মুজাহিদ! এখানে এই ঝাণ্ডার তলে সমবেত হও, আর নিজেদের মধ্যে একজন সেনাপতি নির্বাচন করে নাও।"

সেই ডাক শুনে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন মুসলিম সেনাবৃন্দ জাতীয় পতাকার তলে সমবেত হলেন। তারা আহ্বানকারী সাবিতকে বললেন, আপনিই হোন আমাদের সেনাপতি! তিনি বললেন, না, না, আমি একাজের যোগ্য পাত্র নই। তখন তাঁর এবং আর সকলের দৃষ্টি পড়ল খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রা)-এর উপর। খালিদকে তারা সেনাপতি মনোনীত করলেন। খালিদ আপত্তি জানালেন, কিন্তু কেউ তাঁর আপত্তি গ্রাহ্য করলেন না। খালিদ আল্লাহর উপর নির্ভর করে ইসলামের ঝাণ্ডা নিজ হাতে তুলে নিলেন।

অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও সমরকুশলী খালিদ সিপাহসালার নিযুক্ত হওয়ার পরক্ষণে মুসলিম যোদ্ধাবৃন্দের হৃত সাহস ফিরে এল– বুকে নব হিম্মত আবার জাগ্রত হল।

সেদিনের মত খালিদ সুকৌশলে মুসলিম সেনাদলকে সাফল্যের সঙ্গে হটিয়ে আনলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতোমধ্যে আর একদল সেনা মূল সৈন্যবাহিনীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছিলেন। তারা এসে যথাসময়ে খালিদের সঙ্গে মিলিত হলেন। আবার যুদ্ধ শুরু হল। নব বলে বলীয়ান মুসলিম বাহিনী খালিদের অনন্য নেতৃত্বে বেশ কিছুদিন সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। এই যুদ্ধে খালিদের একার হাতেই আটখানা তলোওয়ার ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে তিনি নবম তরবারি ব্যবহার করেছিলেন।

খালিদের নেতৃত্বে আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় গৌরবে ভূষিত করেন। খৃস্টানগণ শোচনীয়রূপে পরাজয় বরণে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে খৃষ্টানদের ফেলে যাওয়া বহু গণীমতের মাল মুসলিমদের হস্তগত হয়। মুসলিমদের মধ্যে ৩ জন সেনাপতিসহ ১৩ জন শহীদ হন।

www.waytojannah.com

Contents

ফাতহুল মাক্কাহ

এই সেই মহা বিজয়– যে বিজয়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাঁর দীনকে, তাঁর রাসূল ﷺ-কে এবং তাঁর মনোনীত দল ও সেনাবাহিনীকে প্রাধান্য প্রদান ও মহা সম্মানে পুরস্কৃত করলেন–

এই সেই মহাবিজয় যে বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর পবিত্র শহর এবং গৃহকে (যে গৃহকে সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য তিনি হিদায়াতের আলোক স্তম্ভরূপে স্থাপন করেছেন) কাফির এবং মুশরিকদের অপবিত্র হাত হতে এবং কলুষ-কালিমা-লেপিত ও হিংসা-বিদ্বেষ-দুষ্ট পরিবেশ থেকে মুক্ত করলেন–

এই সেই মহাবিজয় যে বিজয়ের ফলে আসমানের অধিবাসীবর্গ আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল, ধরণীর মযলুম বাসিন্দাগণ জালিমের জুলুম ও অত্যাচার হতে মহামুক্তির মহাসনদ লাভে ধন্য হল–

এই সেই মহাবিজয় যে বিজয়ের পর আল্লাহর পবিত্র দীনের শুভ্র জ্যোতি দিক হতে দিগন্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে বিচ্ছুরিত হতে লাগল, আকৃতি প্রকৃতি বর্ণ ভাষা, গোত্র জাতি নির্বিশেষে মানুষ দলে দলে বাতিল ধর্ম ও নাহক জীবনব্যবস্থা পরিত্যাগ করে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ও শাশ্বত জীবন বিধান– ইসলামকে দলে দলে কবূল করে স্ফীত বক্ষে সত্যের ঝাণ্ডা এবং আদল ও ইনসাফের বাণী পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে বহন করে চলল। নবুওয়াতের ২১শে বর্ষে অষ্টম হিজরী ১০ই রমাযানের পুণ্য প্রভাতে এই মহাবিজয় সুসম্পন্ন হয়।

মাক্কা অভিযান ও তার কারণ

হুদায়বিয়ার সন্ধির একটি শর্ত এই ছিল যে, অতঃপর আরবের যে কোন গোত্র তাদের ইচ্ছা অনুসারে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সঙ্গে অথবা কুরাইশদের সঙ্গে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। সে মতে মাক্কার পার্শ্ববর্তী দু'টি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র বানী খুযা'আ এবং বানী বাক্‌র যথাক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং কুরাইশদের সঙ্গে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হল। এই দুটি গোত্রের মধ্যে বহু পূর্ব থেকেই ভীষণ শত্রুতা চলে আসছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে তাদের মধ্যে বহু মারামারি ও কাটাকাটি হয়ে গেছে। নবুওয়াত লাভের পর সবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের 'সাধারণ দুশমনরূপে' দেখতে থাকায় পুরাতন দুশমনী সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে। কিন্তু হুদায়বিয়ার পর খুযা'আ গোত্র মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাদের মিত্ররূপে গ্রহণ করায় বানী বাক্‌রের হিংসার আগুন নতুন করে জ্বলে উঠে আর এই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে প্রচুর ইন্ধন যোগাতে থাকে ইসলামের চিরশত্রু কুরাইশগণ। খুযা'আ গোত্র 'ওয়াতির' নামক এক জলাশয়ের ধারে বাস করত। কুরাইশদের উস্কানিতে এবং তাদের দেয়া অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে এক অন্ধকার রজনীতে নওফেল ইবনু মু'আবিয়ার নেতৃত্বে বাক্‌র গোত্রের এক সশস্ত্র বাহিনী খুযা'আ গোত্রের উপর অতর্কিত হামলা করে বসে। এই আক্রমণে কুরাইশদের মধ্যে গোপনে সশরীরে অংশ গ্রহণ করে সাফওয়ান ইবনু 'উমাইয়া, হুয়াইতাব ইবনু আবদুল উয্‌যা, মাকরায ইবনু হাফস, শাইবা, সাহল, মিকরায প্রভৃতি। খুযা'আ গোত্রের নারী পুরুষ পুত্র কন্যা সবাই নিরুদ্বেগে যখন তাদের গৃহে নৈশ নিদ্রায় নিমগ্ন, তখনই হয় এই কাপুরুষোচিত পৈশাচিক আক্রমণ। ফলে বহুলোক নির্মমভাবে নিহত হয়, অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ কোন ক্রমে পলায়ন করে নিরাপদ আশ্রয়– পবিত্র কা'বা প্রাঙ্গণে এসে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু সেখানেও তারা রেহাই পেল না। ভীত সন্ত্রস্ত খুযা'আ গোত্রের লোকেরা মানবতার নামে বাক্‌র অধিপতিকে আকুল কণ্ঠে ডেকে বলল,

www.waytojannah.com

"হে নওফেল! আমরা পবিত্র হারামে আশ্রয় গ্রহণ করেছি। ইলাহাকা! ইলাহাকা! তোমার ভগবানের দোহাই! এখানে রক্তপাত করে হারামের পবিত্রতা নষ্ট করো না!' কিন্তু কে শোনে কার কথা! প্রতিহিংসা ও জিঘাংসায় তারা তাদের বিবেক ও উচিত-অনুচিতের বোধের বালাই তখন হারিয়ে ফেলেছে। নওফেল তখন হিংস্র জন্তুর নৃশংসতা এবং শাইতানের পিশাচতায় চিৎকার করে তার কওমের লোকদের সম্বোধন করে বলে উঠল– **লা- ইলা-হা লাহুল ইয়াওমা ইয়া বানী বাক্‌র,** "আজকের দিনে ভগবান বলে আর কেউ নেই, হে বানী বাক্‌র! আজ সাধ মিটিয়ে শত্রু বিনাশ করে চলো!" ফলে পবিত্র হারামে নির্মম হত্যাকাণ্ড সাধিত হল।

এ ঘটনার পর পরই খুযা'আ গোত্রের প্রতিনিধি কবি 'আম্‌র ইবনু সালিম মাদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাযির হয়ে যে করুণ শোক গাথা আবৃত্তি করেন তার এক অংশের বাংলা অনুবাদ এই:

প্রভু হে! আমরা মুহাম্মাদের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি।.....

মুহাম্মাদ! দোহাই! আল্লাহর দোহাই দিয়ে আর্তনাদ করছি।

কুরাইশরা আপনার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে তা ভেঙ্গে ফেলেছে, আপনার সেই সুদৃঢ় সন্ধির শর্তগুলো তারা তছনছ করে দিয়েছে, তারা আমাদের শুষ্ক তৃণ খণ্ডের ন্যায় দলিত মথিত করেছে, কারণ তারা মনে করছে যে, আমাদের (সাহায্যের জন্য) ডাকবার মত কেউ নেই। তারা ওয়াতিরে আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ করেছে, তারা আমাদের হত্যা করেছে– আমাদের অবনমিত অবস্থায়, আমাদের শায়িত অবস্থায়, অতএব আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন, আল্লাহর বান্দাদের আহ্বান করুন, সবাই মিলে আমাদের মদদ করুন!"

মিত্র এবং আশ্রিত গোত্রের উপর এই নাহক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর এর প্রতিকার না করে কী ন্যায়ের জীবন্ত আদর্শ আল্লাহর নাবী ﷺ নীরব হয়ে থাকতে পারেন?

এর কিছু দিন পরই খুযা'আ গোত্রপতি বুদাইল ইবনু ওরাকা খুযা'আ গোত্রের কতিপয় লোকসহ নাবীর খিদমাতে হাযির হয়ে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন এবং কুরাইশরা বানী বাক্‌রকে কিভাবে উত্তেজিত করেছে, কেমনভাবে সাহায্য সহায়তা করেছে সমস্ত খুলে বললেন শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। এ ব্যাপারে কী করণীয় তা তিনি মনে মনে স্থির করে নিলেন। কিন্তু প্রথমে কাউকে ঘুণাক্ষরেও এ বিষয়ে কিছুই জানতে দিলেন না।

মাক্কায় দূত প্রেরণ

নাবী একা একা রণসজ্জার আদেশ না দিয়ে প্রথমে কুরাইশদের নিকট দূত পাঠালেন। নাবী ﷺ-এর দূত মাক্কায় উপস্থিত হয়ে নিম্ন লিখিত তিনটি শর্ত পেশ করে বললেন, আপনারা এই তিনটির মধ্যে কোনটি অবলম্বন করবেন- জানতে চাই। শর্ত তিনটি, যথা:

ক. অর্থ দ্বারা এই অন্যায় হত্যার ক্ষতিপূরণ দেয়া হোক! অথবা

খ. কুরাইশ বানী বাক্‌র জাতির মিত্রতা পরিত্যাগ করুক! অথবা

গ. ঘোষণা করা হোক যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি ভেঙ্গে গেছে। তখন কুরাইশপক্ষ হতে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করা হল যে, আমরা তৃতীয় শর্ত মঞ্জুর করছি।

....এই দূত মাদীনায় ফিরে আসার পর নাবী ﷺ যখন দেখলেন যে, মাক্কা অভিযানে বহির্গত হওয়া ব্যতীত আর উপায়ান্তর নেই, তখন তিনি অতি সন্তর্পণে যাত্রার আয়োজন করতে প্রবৃত্ত হলেন।

www.waytojannah.com

আবূ সুফ্ইয়ানের মাদীনা আগমন

মাদীনার দূত ফিরে যাবার পর কুরাইশরা উপলব্ধি করলেন যে, কাজটি ভালো হল না। আর এর পরিণতি শুভ নয়। তারা ভীত এবং চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা ভাবল, হয়ত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ফলে মাক্কা আক্রমণ করতে পারেন। তারা অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে তাদের নেতা আবূ সুফ্ইয়ানকে হুদায়বিয়ার সন্ধি বহাল রাখার এবং তার মেয়াদ বর্ধিত করার উদ্দেশ্যে মাদীনায় প্রেরণ করল।

মাদীনায় পৌঁছে আবূ সুফ্ইয়ান প্রথমে তার কন্যা– রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম সহধর্মিণী উম্মু হাবীবার কাছে গেলেন। তিনি যখন তাঁর কামরায় বিছানো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফরাশের উপর বসতে যাবেন তখনই উম্মু হাবীবা বিছানাটি গুটিয়ে ফেললেন।

আবূ সুফ্ইয়ান বিস্ময়ে দুঃখে ক্রোধে অভিভূত হয়ে বললেন, বেটি! ফরাশটাই তোর নিকট এত অধিক প্রিয় আর আমি এত অপ্রিয়? কন্যা তখন পিতাকে বললেন, এটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাক পবিত্র ফরাশ– আর আপনি হচ্ছেন শির্কের পঙ্কিলতায় নাপাক- অপবিত্র।

অপমানের জ্বালায় অস্থির হয়ে তিনি এই বলে বের হয়ে আসলেনঃ দেখতে পাচ্ছি আমার গৃহ থেকে চলে আসার পর তোকে দুর্মতিতে ধরেছে।

যা হোক, সেখান থেকে বের হয়ে এসে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাজির হলেন। তাঁকে তার আগমনের উদ্দেশ্য নিবেদন করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন জওয়াব দিলেন না।

সেখানে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তিনি গেলেন আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-এর কাছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি তাঁকে অনুরোধ জানালেন। আবূ বাক্র এ ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন।

তিনি তাকে স্পষ্ট করেই বলে দিলেন: "আবূ সুফ্ইয়ান! আমার কাছে কোন সাহায্যের আশা করো না। তোমরাই তো অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র দিয়ে বনী বাক্র গোত্রকে এই নৃশংস অত্যাচারে লেলিয়ে দিয়েছ।"

তারপর তিনি গেলেন 'উমার ফারূক (রা)-এর নিকট। তাঁকে তিনি একই অনুরোধ জানালেন। 'উমার বললেন, আমি যাব তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে? ভেবেছ কী? যদি আর কিছুই না পাই- যেরা বল্লম দিয়ে হলেও আমি তোমাদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হব।

তারপর আবূ সুফ্ইয়ান 'আলী (রা)-এর কাছে গেলেন। ফাতিমা (রা) এবং শিশু পুত্র হাসান তখন কাছেই উপবিষ্ট। আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, রক্ত সম্পর্কে তুমি হচ্ছ আমাদের নিকটতম। আমি একটা উদ্দেশে নিয়ে এসেছি। সবার নিকট থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তোমার নিকট এসেছি, আশা করি তুমি আমাকে তেমনিভাবে ফিরিয়ে দিবে না। তুমি আমার জন্য মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে সুপারিশ জানাও।

'আলী (রা) তাঁর আত্মীয় আবূ সুফ্ইয়ানকে বিনীতভাবে জানালেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছেন। কাজেই সম্ভব নয়। এ কথা শুনে আবূ সুফ্ইয়ান বিচলিত অন্তরে বললেন, হে আবুল হাসান! (হাসানের পিতা!) ব্যাপারটা আমার জন্য এখন গুরুভার হয়ে উঠেছে, কী করণীয় আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আচ্ছা, তুমি আমাকে এ ব্যাপারে তোমার সৎপরামর্শ দাও। আমাকে একটা পথ বাতলিয়ে দাও। 'আলী (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আপনাদের কী উপদেশ দিব

www.waytojannah.com

বুঝতে পারছি না- যা হোক আপনি এক কাজ করুন, মাসজিদে নাব্বীতে গিয়ে দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা করে যান যে, আমি কুরাইশদের অভয় দিয়েছি (আশা করি মুহাম্মাদ ﷺ আমার অভয়দানের মর্যাদা রক্ষা করবেন)।

আবূ সুফ্ইয়ান বললেন, এতে কি কোন কাজ হবে? 'আলী (রা) বললেন, কাজ হবে কিনা তা আমি বলতে পারি না– তবে এ ছাড়া আপনার জন্য আমি আর কোন পথ খুঁজে পাইনি। অগত্যা আবূ সুফ্ইয়ান তাই করলেন। মাসজিদে দাঁড়িয়ে ঐ ঘোষণা প্রচার করে তিনি তার উটের পিঠে আরোহণ করলেন এবং মাক্কা অভিমুখে ফিরে চললেন।[৩৫]

মাক্কায় ফিরে এসে কুরাইশরা সব কথা শুনে বললো, মুহাম্মাদ ﷺ কি আপনার ঐ ঘোষণায় সায় দিয়েছেন? তিনি কি অনুমোদন করেছেন? তিনি বললেন, না। তারা তখন বলল, 'আলী (রা) আপনাকে নিয়ে একটা কৌতুক করেছে মাত্র। যে উদ্দেশে আপনাকে সেখানে পাঠান হয়েছে দেখতে পাচ্ছি তার কিছুই হল না, তাদের প্রতিক্রিয়াও কিছুই জানা গেল না! তিনি বললেন, এছাড়া করার মত আর কিছুই ছিল না।

অভিযানের প্রস্তুতি

আবূ সুফ্ইয়ান মাদীনা থেকে বিদায় নেয়ার পর পরই রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন। কিন্তু কোথায় যেতে হবে এবং কখন এই অভিযানের যাত্রা শুরু হবে তার কিছুই কাউকে বললেন না। এমন কি আবূ বাক্রও (রা) প্রথম অবস্থায় কিছুই জানতে পারেননি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের জানিয়ে দিলেন যে, এবারের যাত্রা হচ্ছে মাক্কা অভিমুখে। তিনি লোকদের যাত্রার জন্য তৈরী হওয়ার আদেশ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মাক্কাবাসীদের কানে যাতে এ সংবাদ পৌঁছতে না পারে তার জন্য কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন।

এক বাদ্‌রী সাহাবীর ভুল পদক্ষেপ

কিন্তু এর মধ্যে এক অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটে গেল। এক বাদ্‌রী (বাদ্‌র যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী) সাহাবী– হাতিব ইবনু আবি, বালতা'আ এক মস্ত বড় ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। যখন মুজাহিদগণ যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতিতে মশগুল তখন তিনি এক মহিলার মাধ্যমে কুরাইশদের নিকট এক পত্র পাঠালেন। সেই পত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাক্কা অভিযানের সমুদয় খবর লিখে জানালেন। উক্ত নারী তার কেশগুচ্ছের অভ্যন্তরে সেই পত্রখানি লুকিয়ে রেখে মাক্কা অভিমুখে রওয়ানা হল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ খবর জানতে পারলেন– আল্লাহই তাঁকে জানিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগামী অশ্বে আলী এবং যুবাইর ﷺ-কে (ইবনু ইসহাকের বিবরণে আলী এবং মেকদাদ) সেই চিঠি উদ্ধার করে আনার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। নাবী ﷺ এই নির্দেশ দিলেন: তোমরা 'রওযা-ই-খাক'-এ না পৌঁছা পর্যন্ত কোথাও থামবে না। সেখানে গিয়ে এক ক্রীতদাসীকে দেখতে পাবে, তার নিকট রয়েছে কুরাইশদের নিকট লিখিত এক গোপন চিঠি, সেটা তার কাছ থেকে বের করে নিয়ে আসবে।

---

[৩৫] কোন কোন মতে তিনি ঘোষণা করলেন যে আমি হুদায়বিয়ার সন্ধি 'রিনিউ' করে গেলাম। –*অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

হুকুম পেয়েই তাঁরা জোর কদমে ঘোড়া ছুটালেন আর ঠিক সেই কথিত জায়গাতেই মাহিলাটিকে পেয়ে গেলেন। তারা বললেন, পত্র বের করো। সে বলল, পত্র? কিসের পত্র? আমার কাছে তো কোন পত্র নেই। আমি পত্র পাব কোথায়?

তখন তারা তার রসদপত্রের ভিতরে এবং সম্ভাব্য সব জায়গায় খুব করে খুঁজে দেখলেন– বহু তয়-তল্লাস করলেন। কিন্তু কোথাও কোন চিঠি পাওয়া গেল না।

আলী তখন তাঁর হায়দারী হাঁকে ধমক দিয়ে বললেন, শিগগির বের করো, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি– রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও মিথ্যে বলেন না, আমরাও মিথ্যা কথা বলছি না। তোমার নিকট চিঠি অবশ্যই রয়েছে। হয় তুমি স্বেচ্ছায় বের করে দেবে, নইলে আমরা তোমার দেহ তল্লাসী করে হলেও পত্র বের করে ছাড়ব।

ধমক খেয়ে এবং দাপট দেখে ক্রীতদাসী ভড়কে গেল। চুলের গোছার নীচে লুকানো চিঠিটা সে বের করে দিল। তারা সেই চিঠি নিয়ে পুনঃ দ্রুত বেগে ঘোড়া চালিয়ে মাদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে চিঠিখানা পৌঁছে দিলেন।

চিঠি পড়ে দেখা গেল চিঠির লেখক হচ্ছেন হাতিব ইবনু আবি বালতা'আ, তাতে কুরাইশদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ অভিযান সংক্রান্ত সব গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়া হয়েছে।

হাতিব (রা)-এর কৈফিয়ত

হাতিব (রা)-কে তৎক্ষণাৎ ডেকে আনা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হাতিব! এ চিঠি সম্পর্কে তোমার কী বলার আছে?

হাতিব তখন বিনীত কণ্ঠে আরয করলেন, আমার অনুরোধ আমার সম্বন্ধে জলদি কোন সিদ্ধান্ত নিবেন না, (আমার কথা শুনুন, তারপর আপনার যা ব্যবস্থা তা আমি মাথা পেতে নেব।) আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি সত্য বলে ঈমান রাখি! আমি ইসলাম ছেড়ে কুফরীকে কবূল করিনি, আমার মনে এতটুকু পরিবর্তনও ঘটেনি। মাক্কার অভিযানের ফলশ্রুতির ব্যাপারে আমার মনে একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। দেখুন, রাসূল ﷺ! আমি নিজে কুরাইশ নই, কুরাইশদের সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাস করেছি। আমি হিজরত করে চলে এসেছি কিন্তু আমার পরিবার পরিজনের সবাই মাক্কায় কুরাইশদের ভিতর রয়ে গেছে। তাদের দয়া এবং অনুগ্রহের উপর তারা নির্ভরশীল। কুরাইশদের মধ্যে আমার এমন কোন আত্মীয়স্বজন বা আপনজন নেই যারা বিপদের সময় তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। অপর পক্ষে আপনার এবং অন্যান্য সহচরদের সবারই আপন জন সেখানে রয়ে গেছে। তারা তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখছে এবং রাখবে। আপন জনের হিফাযাতের চিন্তায় আমি মনে মনে ভাবলাম, তাদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি দেবার মত পরমাত্মীয় যখন কেউ নেই, তখন আমি কুরাইশদের প্রতি এমন একটা সহৃদয়তার কাজ করি যার বদলায় তারা আমার আপন জনের প্রতি আত্মীয়ের মতই দৃষ্টি রাখবে।

তুখোড় মেজাজ 'উমার ফারূক কাছেই ছিলেন। কৈফিয়ত শুনে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট আবেদন জানালেন, "আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলি। সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সে কপটাচারী!

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন "থামো, 'উমার! হাতিব বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিল। বদরীদের সম্বন্ধে আল্লাহ কী বলেছেন তা কি তোমার জানা নেই? আল্লাহ তাদের সব অপরাধ চিরতরে মাফ করে দিয়েছেন।"

www.waytojannah.com

উমার (রা)-এর হৃদয় তখন কেঁপে উঠল। তাঁর চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল। তিনি তখন বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিকতর ভাল জানেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতিবের কৈফিয়ত গ্রহণ করলেন– কাজটি তিনি অন্যায় করেছেন, কিন্তু নিয়ত তার খারাপ ছিল না। আপন জনের জন্য চিন্তাভাবনা এবং তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই তাকে এই অন্যায় কাজে প্ররোচিত করেছিল। তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।

যাত্রা শুরু

অষ্টম জিহরীর ৮ই রমাযান বাদ আসর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মহাঅভিযানে বের হয়ে পড়লেন। নাবী ﷺ সওম রেখেছেন, সঙ্গে যারা চলেছেন সবাই সায়িম। কিছুদূর গমন করে 'কুদায়দা' নামক স্থানে কাফেলা অবতরণ করলেন। এখানে সবাই মিলে ইফতার করলেন।

তারপর মনযিলের পর মনযিল অতিক্রম করে কাফিলা 'মররুয যাহরান' নামক স্থানে অবতরণ করলেন। এটা একটা পর্বতের উপত্যকা। এই সময়ে কাফেলার লোক সংখ্যা ১০ হাজার। স্থানটি মাক্কা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। এখানে শিবির সংস্থাপিত হল। যখন সন্ধ্যার আগমন ঘটল এবং রাত্রির আঁধার ঘনিয়ে আসতে লাগল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলো জ্বালাবার হুকুম দিলেন। ১০ হাজার লোক এক সঙ্গে নিজ নিজ শিবিরের সম্মুখে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলেন, সে এক অপূর্ব দৃশ্য! সমস্ত উপত্যকা ও পর্বতগাত্রে আলোর মেলা! চারিদিকে আলোর বিকীরণ, জ্যোতির বিচ্ছুরণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা 'আব্বাস ইবনু 'আবদিল মুত্তালিব ইতোপূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর পরিবার পরিজনসহ হিজরত করে মাদীনার দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। পথে 'জুহফা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তারপর কাফেলার সঙ্গে অভিযানে শরীক হয়ে 'মররুয যাহরানে' তিনিও অবতরণ করেন।

মাক্কাবাসীরা এ অভিযান সম্বন্ধে একরূপ অজানাই রয়ে গিয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে একটা অভিযান হতে পারে এটা তাদের ধারণা ছিল, কিন্তু এত শীঘ্র যে অভিযাত্রীরা মাক্কার কাছাকাছি এসে পৌছতে পারে এমন কল্পনাও তারা করেনি, করতে পারেনি।

'আব্বাস (রা) এটা জানতেন। তার ভয় হল, এত বড় বিরাট বাহিনী হঠাৎ করে মাক্কা আক্রমণ করে বসলে অজস্র রক্তপাত ঘটে যাবে। রক্তপাত যাতে না হয়, মাক্কাবাসীরা যাতে করে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে এটাই ছিল তার মনের আকাঙ্ক্ষা। তাই তিনি মাক্কায় ফিরার মত কোন লোক পাওয়া যায় কিনা তাই দেখার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর 'বায়যা' নামক খাস খচ্চরে আরোহণ করে এদিক সেদিক মাক্কা প্রত্যাবর্তনকারী লোক খুঁজে দেখতে লাগলেন।

'আব্বাস (রা) এভাবে ঘুরাঘুরি করে মাক্কার দিকে বেশ কিছু দূর চলে এসেছিলেন এমন সময় অন্ধকারে আবূ সুফ্ইয়ানের আওয়াজ তার কানে ভেসে আসল।

আবূ সুফ্ইয়ানের ইসলাম গ্রহণ

কুরাইশ নেতা আবূ সুফ্ইয়ান অন্যান্যদের সঙ্গে এই হঠাৎ প্রজ্জ্বলিত হাজার হাজার অগ্নিশিখা দেখে ভীত সচকিত হয়ে এর তত্ত্ব তলাস নিতে এগিয়ে আসছিলেন। তার সঙ্গে মাক্কার অপর দুই নেতা- হাকিম ইবনু হিযাম এবং বুদাইল ইবনু ওরাকা। আবূ সুফ্ইয়ান বুদাইলের সঙ্গে এই অগ্নি নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। আবূ সুফ্ইয়ানের কণ্ঠে বিস্ময় এবং ভীতির সুর-

www.waytojannah.com

আবূ সুফ্ইয়ান: বুদাইল! আল্লাহর কসম! আজকের মত এমন বহু সংখ্যক আগুন আর এত বিরাট সৈন্য সমাবেশ আমি আর কখনও দেখিনি? ব্যাপারটি কী? এরা কারা?

বুদাইল: মনে হচ্ছে এরা বানী খুযা'আ, তাদের উপর অত্যাচারের বদলা নেবার জন্য হামলা করতে আসছে।

আবূ সুফ্ইয়ান: না, না, খুযা'আ গোত্রের এত সংখ্যা এত শক্তি কোথায় যে এরূপ বিপুল সৈন্য সমাবেশ করবে, আর এত অধিক আগুন জ্বালাতে পারবে?

'আব্বাস (রা) এগিয়ে গেলেন এবং গলার স্বর শুনে বুঝতে পারলেন যে, আবূ সুফ্ইয়ান কথা বলছেন। তখন তাদের মধ্যে শুরু হল এই বাক্য বিনিময়।

'আব্বাস (রা): আবূ হানযালা না? (আবূ সুফ্ইয়ানের অপর কুনিয়াত ছিল আবূ হানযালা)

আবূ সুফ্ইয়ান: হাঁ, মনে হচ্ছে আবুল ফযল! [আবুল ফযল 'আব্বাস (রা)-এর কুনিয়াত]

আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক।

এই যে বিরাট সৈন্য সমাবেশ– এরা কারা? আর এই অগ্নির সমারোহ, এ সব কী?

'আব্বাস: এ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেনাবাহিনী। আল্লাহ জানেন কাল সকালে কুরাইশদের কী হবে!

আবূ সুফ্ইয়ান: বন্ধু, এখন উপায়? (তোমার মধ্যস্থতা ছাড়া এ বিপদ থেকে উদ্ধারের কোন পথ আমি দেখতে পাচ্ছি না)।

আব্বাস: বন্ধু! কোন মুসলিম যদি তোমাকে দেখে ফেলে তোমার দেহের উপর যে মাথা– সেটা থাকবে না, আমার পিছনে এই খচ্চরটার পিঠে তুমি চড়ে বস। আমি তোমাকে রাসূলের সামনে পেশ করে তাঁর কাছে তোমার নিরাপত্তার আরযি পেশ করব।

আবূ সুফ্ইয়ান তাঁর পশ্চাতে রাসূলের খচ্চরে আরোহণ করলেন। তাঁর দুই সঙ্গী মাক্কায় ফিরে চলল। আব্বাস তাঁকে সঙ্গে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিবিরের দিকে রওয়ানা হলেন।

যখনই কোন শিবিরের অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্ব দিয়ে তারা অতিক্রম করছিলেন তখনই বিভিন্ন কণ্ঠে ধ্বনিত প্রশ্ন হত– কে? অগ্নির আলোকে যখন দৃশ্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠত তখন তারা বলে উঠত, আরে এ যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খচ্চর, তাঁর বুযুর্গ চাচা হচ্ছেন এর আরোহী।

কিন্তু 'উমার (রা)-এর শিবিরের পার্শ্ব দিয়ে তারা অতিক্রম করছিলেন তখন 'উমার (রা) স্বয়ং জিজ্ঞেস করে উঠলেন– কে যাচ্ছে? সঙ্গে সঙ্গে তিনি খচ্চরটার কাছে চলে আসলেন। এসেই দেখলেন 'আব্বাস (রা)-এর পশ্চাতে আবূ সুফ্ইয়ান। তখন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন: আল্লাহর দুশমন আবূ সুফ্ইয়ান! আল-হামদু লিল্লাহ– সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যাঁর অনুগ্রহ ও হিকমতে তুমি আজ এখানে আমাদের হাতে!

এই বলেই 'উমার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিবিরের দিকে ধাবিত হলেন। 'আব্বাসও খচ্চরটাকে জোরে সেই দিকেই প্রধাবিত করলেন। 'আব্বাসই (রা) আগে পৌঁছলেন, পরক্ষণেই 'উমার (রা)। তিনি নিবেদন করলেন–

'উমার (রা): ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে আবূ সুফ্ইয়ান। অনুমতি দিন- আমি তার গর্দান মেরে দেই।

'আব্বাস (রা): ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ সুফ্ইয়ান আমার আশ্রিত!

'উমার (রা) আবূ সুফ্ইয়ানের মত এমন ইসলামের চির দুশমন, প্রচণ্ড নাবী বিরোধী, মুসলিমদের উপর ২১ বছরের নির্যাতন ও আট বছরব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহ ও ষড়যন্ত্রের প্রধান হোতাকে হত্যার জন্য যখন

www.waytojannah.com

পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তখন আব্বাস ধৈর্য হারিয়ে 'উমারকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন: 'উমার! আমার নিকট আত্মীয় আবূ সুফ্ইয়ানের হত্যার জন্য তুমি তো উঠে পড়ে লেগেছ– আচ্ছা বল দেখি! বানী আদী ইবনু কা'ব এর (উমারের গোত্র) যদি কেউ হতো তবে কি তুমি এমনটি করতে?

'উমার: আপনি কী বলছেন, ওগো আব্বাস! (এ তো কোন ব্যক্তি বা গোত্রের প্রশ্ন নয়, এখানে ইসলামের স্বার্থের প্রশ্ন) আল্লাহর কসম! যে দিন আপনি মুসলিম হলেন, সেদিন আমার আনন্দ ছিল আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের আনন্দ অপেক্ষাও বেশি। আর তার একমাত্র কারণ এই যে, আমার পিতার ইসলাম গ্রহণের চাইতে আপনার ইসলাম গ্রহণের ফলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অধিক আনন্দিত হতে দেখেছি। ওগো 'আব্বাস! আপনি কি জানেন না আমার নিজস্ব কোন আনন্দ নেই, আমার আনন্দ রাসূলের আনন্দের উপর নির্ভরশীল!

রাসূলুল্লাহ ﷺ এতক্ষণ নীরব ছিলেন। তিনি এখন 'আব্বাস (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি আজকের রাত আবূ সুফ্ইয়ানকে আপনার শিবিরে নিয়ে রাখুন। কাল সকালে তাকে নিয়ে আসুন। পর দিবস সকালে 'আব্বাস তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাযির হলেন। আবূ সুফ্ইয়ানকে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে উঠলেন,

রাসূলুল্লাহ: আবূ সুফ্ইয়ান! কী আশ্চর্য! আজও কি তোমার এ স্বীকৃতি দানের সময় আসেনি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের আর কোন ইলাহ নেই?

আবূ সুফ্ইয়ান: আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গিত হোক! যে মহান সত্তার অনুগ্রহে আপনি এতটা সাফল্য অর্জন করেছেন– যিনি আপনাকে এমন দয়া ও করুণার প্রতীক বানিয়েছেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, তিনিই পরম সত্য! আমাদের পূজিত প্রতিমাগুলোর যদি কোন ক্ষমতা থাকত, তা হলে আমার সমর্থন ও সাহায্যে তারা কিছু না কিছু অবশ্যই করত।

রাসূলুল্লাহ: তা হলে এ কথার কি স্বীকৃতি দানের সময় আসেনি যে, আমি সেই আল্লাহরই রাসূল?

মৃত্যুর বিভীষণ মূর্তি সামনে প্রত্যক্ষ করেও সত্যভাষী আবূ সুফ্ইয়ান তার অন্তরের কথা গোপন রাখেননি। তিনি অকপট হৃদয়ে বলে উঠলেন:

আবূ সুফ্ইয়ান: আপনার রাসূল হওয়ার সত্যতা সম্বন্ধে আমার মনে এখনও কিছু খটকা রয়ে গেছে। আমার মনটা এ ব্যাপারে এখনও পরিষ্কার হয়ে উঠেনি।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যে এসে তার মন পরিষ্কার হতে আর বেশি সময় লাগল না। 'আব্বাস (রা) তার হৃদয়কে সন্দেহ মুক্ত করতে সহায়তা করলেন। অতঃপর ইসলামের এত দিনকার জানী দুশমন আবূ সুফ্ইয়ান খালেস মনে, নিষ্কলুষ হৃদয়ে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন–

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বূদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

অতঃপর 'আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে এ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ সুফ্ইয়ান একজন সম্মানী লোক, চিরদিন সে তার গৌরব বজায় রেখে চলেছে। সে আপনার কাছেও সম্মান এবং গৌরব প্রত্যাশা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তা জানি। আপনি আমার পক্ষ থেকে এই ঘোষণা প্রচার করে দিন:

www.waytojannah.com

ক. যে ব্যক্তি আবূ সুফ্ইয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।

খ. যে ব্যক্তি নিজের গৃহদ্বার বন্ধ করে রাখবে (অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধের জন্য বের হবে না) সে নিরাপদ।

গ. যে ব্যক্তি মাসজিদে হারামে (কা'বাগৃহ প্রাঙ্গণে) প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচা আব্বাসকে (রা) আর একটি কথা বলে দিলেন। বললেন, আপনি আবূ সুফ্ইয়ানকে নিয়ে অমুক পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে দণ্ডায়মান হোন। উপত্যকা দিয়ে আল্লাহর লশকর বাহিনী যখন কুচকাওয়াজ করে অতিক্রম করবে তখন সেই দৃশ্য আপনারা অবলোকন করবেন। আব্বাস তাই করলেন।

রাসূল ﷺ-এর আদেশক্রমে বিভিন্ন গোত্রের মুজাহিদগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ পতাকা উড়িয়ে বিজয়ের আনন্দে কুচকাওয়াজের সঙ্গে মাক্কার দিকে এগিয়ে চলেছে।

আবূ সুফ্ইয়ান স্তম্ভিত হৃদয়ে বিস্ময় ভরা চোখে এ দৃশ্য নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। প্রথম দলটি অতিক্রমের সময় আবূ সুফ্ইয়ান জিজ্ঞেস করলেন, হে আব্বাস! এ কোন্ দল? তিনি বললেন, এ হচ্ছে খানদানে সালিম। দ্বিতীয়টি? ওটা হচ্ছে কাবিলা মুযাইনার সেনাবাহিনী। এমনি ভাবে ফওজের পর ফওজের এক একটি বাহিনী তাদের নিজস্ব পতাকা নিয়ে শান-শওকতের সঙ্গে এগিয়ে চলল আর প্রত্যেকটির পরিচয় আবূ সুফ্ইয়ান জেনে নিলেন। তার পর সর্বশেষে আগমন করলেন একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সৈন্যবাহিনী– তাদের পতাকাটি সবুজ বর্ণ, সে দলে আনসার এবং মুহাজিরদের সমাবেশ, প্রত্যেকেই লৌহ-বর্মে আবৃত। আর সেই দলের গৌরব বর্ধিত করে চলেছেন দু-জাহানের সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমাদ মুজতবা ﷺ।

আবূ সুফ্ইয়ান বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন– এরা কারা?

'আব্বাস: এরা হচ্ছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দল।

মুহাজির এবং আনসার উভয়েই এতে শামিল।

আবূ সুফ্ইয়ান: কোন শক্তিই এই বাহিনীর মুকাবেলা করতে পারে না। ভাগ্যবান তুমি, হে আবুল ফযল! তোমার ভাতিজা আজ এক মর্দে আযীম– এক অতুল্য মহাপুরুষে সে পরিণত!

'আব্বাস: তুমি এখনও বুঝে উঠতে পারনি হে, এ যে নবুওয়াত!

আবূ সুফ্ইয়ান: ঠিকই বলেছ তুমি, নবুওতের শক্তি ছাড়া এই বিস্ময়কর বিজয় ও সাফল্য সম্ভব ছিল না।

আনসারদের পতাকা ছিল সা'দ ইবনু উবাদার হাতে। আবূ সুফ্ইয়ানের পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় তিনি তাকে লক্ষ্য করে বলে গেছেন, আজকের দিন– চূড়ান্ত সংঘর্ষের দিন, আজ কাবার সম্ভ্রম হবে বিনষ্ট, আজ আল্লাহ কুরাইশদের করবেন অপমানিত। সাদের এই উক্তি শুনে আবূ সুফ্ইয়ান ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিলেন। তার পরপরই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেয়ে তিনি সাহস ভরে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন। গিয়ে দুরু দুরু বুকে, ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনি কি শুনেছেন সা'দ কী বলছেন? জিজ্ঞেস করে যখন তিনি সা'দ কী বলেছে জানতে পারলেন, তখন আবূ সুফ্ইয়ানকে আশ্বস্ত করে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়ে দিলেন, সা'দের কথা ঠিক নয়, আজ বরং কা'বার মর্যাদা চির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিন, আজ কুরাইশদের অবমাননার দিন নয়, আজকের দিনে বরং আল্লাহ তাদের সম্মান বৃদ্ধির পথেই এগিয়ে দেবেন, আজকের দিন প্রতিশোধ গ্রহণের দিন নয়, আজ প্রেম ও করুণা বিতরণের দিন!

www.waytojannah.com

সা'দের এ অবাঞ্ছিত উক্তির জন্য অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট লোক পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর হাত থেকে পতাকা কেড়ে নিয়ে নাবীর নির্দেশ মত তাঁর পুত্র কায়সের হাতে (মতান্তরে যুবাইরের হাতে) তা সমর্পণ করা হল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে নিজের মর্যাদা এবং কুরাইশদের নিরাপত্তার আশ্বাস লাভ করে আবূ সুফ্ইয়ান দ্রুতগতিতে মাক্কায় ফিরে এলেন। তিনি উচ্চ নিনাদে কুরাইশদের ডেকে বললেন,

"দেখ– হে কুরাইশের আবাল-বৃদ্ধবণিতা! পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত বিপুল সেনাবাহিনীসহ মুহাম্মাদ ﷺ এসে গেছেন। আজ প্রতিরোধ করে কোন লাভ নেই, তোমরা কিছুতেই এই বাহিনীর মুকাবেলা করতে পারবে না।

"তোমরা জেনে রাখো, আমি এখন তোমাদের সঙ্গী নই, আমি ইসলাম কবূল করেছি। এখন তোমাদের মধ্যে যারা আমার গৃহে আশ্রয় নিবে, তারা নিরাপদ।"

লোকেরা এ সংবাদ শুনে হতভম্ব এবং দিশাহারা হয়ে পড়ল। কেউ কেউ বলে উঠল, তোমার ঘরে কত জনের আশ্রয় মিলবে?

তিনি বললেন, "যারা কা'বা গৃহ প্রাঙ্গণে আশ্রয় নিবে তারাও নিরাপদ।"

আবূ সুফ্ইয়ান নিজ গৃহে গমন করলেন। তার উগ্র-মেজাজ ও ক্রুদ্ধ-স্বভাবা স্ত্রী হিন্দা বিনতে 'উতবা বিদ্যুতের গতিতে এসে তার গোঁফ ধরে বলে উঠল, এই গোঁফধারী পাহলোয়ানটাকে খুন করে ফেল! এরই জন্য সমস্ত কওমটা অপমানিত-অপদস্ত হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেল!

আবূ সুফ্ইয়ান ইসলামের পুণ্য প্রভায় ধৈর্যের মহিমা শিক্ষা করেছেন। তিনি অবিচলিত কণ্ঠে জবাব দিলেন, "প্রিয়তমা! আত্মম্ভরিতায় আর ধোঁকা খেয়ো না। অবস্থা বুঝার চেষ্টা কর। এই বিরাট ফওজ, এই অপরাজেয় লশকরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। কোন্ শক্তি এর মুকাবেলা করতে সক্ষম!"

অধিকাংশ লোক অবস্থার নাজুকতা উপলব্ধি করল– কেউ দৌড়ে গিয়ে কা'বা প্রাঙ্গণে আশ্রয় নিল, কেউ বা আবূ সুফ্ইয়ানের গৃহে, আর অনেকেই নিজ নিজ গৃহের কপাট বন্ধ করে গৃহাভ্যন্তরে কী হয় কী হয় করে ভয় চকিত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

মাক্কায় প্রবেশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মত বিভিন্ন মুজাহিদ বাহিনী নিজ নিজ নিশান উড়িয়ে বিভিন্ন পথে বীর পদভরে মাক্কার দিকে এগিয়ে চললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকতর– উঁচু পথে অগ্রসর হলেন আর খালিদ ইবনু ওয়ালীদকে তার বাহিনীসহ উপত্যকার– নিম্ন পথ দিয়ে নগরে প্রবেশের নির্দেশ দিলেন। তাঁকে তিনি এ নির্দেশও দিলেন যে, কেউ কোনরূপ বাধা না দিলে কারোর বিরুদ্ধেই কোন অস্ত্র ব্যবহার করবে না, কিন্তু বাধা দিতে আসলে কিংবা আক্রমণ করে বসলে তুমি তোমার তলোয়ার চালিয়ে পথ পরিষ্কার করে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে আমার সঙ্গে মিলিত হবে।

কুরাইশদের মধ্যে যারা অবস্থার নাজুকতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল তারা আবূ সুফ্ইয়ানের আহ্বান অনুসারে অস্ত্র ত্যাগ করে নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করল। কিন্তু দুর্দান্ত ও নীচ প্রকৃতির কিছু সংখ্যক হঠকারী লোক বাধা দেবার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল। তাদের পশ্চাতে ছিল ইকরিমা ইবনু আবূ জাহ্ল, সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া, সুহাইল ইবনু 'আমর প্রভৃতি কতিপয় নেতৃস্থানীয় কুরাইশ।

www.waytojannah.com

এই দলে অদূরদর্শী এবং শূন্যগর্ভ আস্ফালনকারী এক কবিও ছিল, তার নাম হাম্মাস ইবনু কাইস। রাসূলুল্লাহ ﷺ নগরে প্রবেশের পূর্বেই সে তার অস্ত্রে শান দিয়ে প্রস্তুত করে রাখছিল। তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করল– এ প্রস্তুতি কিসের জন্য? সে বলল, মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য। তার স্ত্রী বলল, ওয়াল্লাহি! আল্লাহর কসম! তোমার এ অস্ত্র মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর সহচরদের কিছুই করতে পারবে না। স্বামী উত্তরে বলল, দেখে নিও- আমি তাদের কয়েকজনকে পাকড়াও করে এনে তোমার খিদমাতে নিয়োজিত করব। তারপর সে একটা কবিতাংশ আবৃত্তি করে নিজের বাহাদুরি প্রদর্শনের চেষ্টা করল।

খালিদের সেনাবাহিনীকেই তারা বাধা দিতে গেল। সুতরাং খালিদকে বাধ্য হয়ে তাদের উপর প্রতি-আক্রমণের হুকুম দিতে হল। এ সংঘর্ষে দু'জন মুসলিম শহীদ হন, একজনের নাম কুয ইবনু জাবির ফিহরী, অপর জনের নাম খুনাইস ইবনু খালিদ। কুরাইশদের ১২ জন নিহত হল। তারপর কাফিররা পরাভূত ও পর্যুদস্ত হয়ে উর্ধশ্বাসে পালাতে লাগল। এই পলাতকদের মধ্যে পূর্বোক্ত অস্ত্রধারী কবি হাম্মাসও ছিল। ভীত সন্ত্রস্ত হৃদয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে তার গৃহদ্বারে গিয়ে স্বীয় বিবিকে ডাকতে লাগল–

খোল, খোল! দরজা খোল। তারপর তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করে দিয়ে আমাকে বাঁচাও!

স্ত্রী তখন সুযোগ পেয়ে বলল, তুমি অহংকার করে যা বলে গিয়েছিলে তার কী হল?

কবিতার ছন্দেই সে তার যে জওয়াব দিল তার মর্মার্থ হচ্ছে– যুদ্ধ শুরু হল, দুর্ধর্ষ মুসলিম বাহিনী তাদের তলোয়ার দিয়ে আমাদের সম্বর্ধনা জানাল, অশ্বারোহী আর পদাতিকরা সেই তলোয়ারের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হল। আমাদের নেতা সাফওয়ান এবং ইকরামা পলায়নের পথ ধরল....আমিও সেই পথই ধরলাম, আমায় তুমি গালি দিও না– তিরস্কার করো না!

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার দিকে এগিয়ে চললেন, মুহাজির এবং আনসারগণ তাঁর অগ্রে, তাঁর পশ্চাতে, তাঁর ডানে, তাঁর বামে দল বেঁধে কাতারে কাতারে কা'বার দিকে বিজয়ীর বেশে কদমে কদমে অগ্রসর হলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে তাঁর মুক্ত ক্রীতদাস যাইদের পুত্র উসামাকে পিছনে তুলে নিয়ে নীরবে কা'বার দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছেন।

বিজয়ী বেশে কা'বা গৃহে

অবশেষে তিনি কা'বা প্রাঙ্গণে পৌছে গেলেন। প্রথমে হাজরে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হলেন, সেখানে পৌছে সেই কৃষ্ণ প্রস্তরে চুমু দিলেন, তারপর কাবা গৃহ তাওয়াফ করলেন। কা'বা গৃহে এবং তাঁর আশে পাশে তিন শত ষাটটি ঠাকুরদেবতার মূর্তি দণ্ডায়মান! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে একটি ছড়ি, সেই ছড়ি দিয়ে তাদের প্রতি ইশারা ক'রে বা কপালে খোঁচা দিয়ে তিনি আবৃত্তি করে চললেন কুরআন মাজীদের এই আয়াত:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.

"সত্য এসে গেল, মিথ্যা বিনষ্ট হল, মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।" (সূরা: বানী ইসরাঈল: ৮১)

তারপর তিনি পাঠ করে চললেন–

www.waytojannah.com

جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ

"সত্য এসে গেছে, মিথ্যা আর কখনও আবির্ভূত হবে না, অসত্য আর কস্মিনকালে ফিরে আসবে না।"

আশ্চর্য ব্যাপার! অপূর্ব দৃশ্য! নাবী ﷺ এক একটি মূর্তির সম্মুখে গিয়ে উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে ছড়ির সাহায্যে খোঁচা দিচ্ছিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বিগ্রহের প্রথমে মুখ পরে দেহ ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ছিল। তাদের পূজারীদের চোখের সম্মুখে এই বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে চলেছিল, তারা হতভম্ব হয়ে এ দৃশ্য দেখছিল– মুখে একটা কথা নাই, অস্ফুট কোন ধ্বনি নাই! আসমান ও যমীনের মহাপ্রভু- আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের খাস গৃহ চিরদিনের তরে মিথ্যা দেবতার অপবিত্র স্পর্শ থেকে পাকপুতঃ হয়ে গেল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উসমান ইবনু তালহাকে ডেকে পাঠালেন। তার কাছ থেকে কাবার চাবি চেয়ে নিলেন। কাবা গৃহের প্রবেশ দ্বার খুলতে বললেন। দ্বার খোলা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। দেখতে পেলেন কাবার প্রাচীর গাত্রে অসংখ্য চিত্র অঙ্কিত; তার মধ্যে ইব্রাহীম এবং ইসমাঈল (আ) এর চিত্র! সেগুলো মুছে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলা হল। ওগুলো পরিষ্কার হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই প্রাচীরের দিকে এগিয়ে গেলেন যেটি ছিল প্রবেশ দ্বারের সম্মুখবর্তী। সেই প্রাচীরের তিন হাত ব্যবধানে দাঁড়িয়ে তিনি সালাত আদায় করলেন– শুকরিয়ার সালাত।

তারপর কা'বার দিকে দিকে কোণে কোণে তিনি ছুটে গেলেন। প্রত্যেক স্থানে আল্লাহর তাকবীর ধ্বনি (আল্লাহু আকবার) উচ্চারণ করে আল্লাহর মহত্বের ও তাওহীদের জয় ঘোষণা করলেন। অতঃপর ফিরে এসে যখন দ্বার প্রান্তে পৌছলেন তখন দেখতে পেলেন বাইরে কুরাইশদের বিপুল সমাবেশ! ব্যাকুল হৃদয়ে তারা প্রতীক্ষমান। নাবী ﷺ কী বলেন কী করেন তা শুনার এবং দেখার জন্য তারা অধীর, তারা অস্থির! তারা উৎকণ্ঠিত, উৎকলিত!

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অতুল্য ভাষণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের লক্ষ্য করে একটা নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه صَدَقَ وَعْدَه وَنَصَرَ عَبْدَه وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه.

"নেই কোন উপাস্য– প্রভু, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া, তাঁর কোনই শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন আর একাই দুশমন বাহিনীগুলোকে পরাভূত–পর্যুদস্ত করেছেন।".....

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অতুল্য খুৎবায়– অমূল্য ভাষণে বলে চললেনঃ সমবেত জনমণ্ডলী! মনোযোগ দিয়ে শোন! জাহিলিয়াত যুগের সর্বপ্রকার অহঙ্কার, সর্বপ্রকার অধিকারহরণ, সর্বপ্রকার রক্তক্ষরণ আজ আমার এই দুই পদতলে দলিত মথিত (অর্থাৎ অতীতে যত রকমের অহমিকা এবং দাম্ভিকতা প্রদর্শিত হয়েছে, যত সব অধিকার হরণ করা হয়েছে এবং যে নির্মম উপায়ে অজস্র রক্তপাত ঘটান হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে যুগ-যুগান্তর ধরে পুরুষানুক্রমে কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ চলে আসছে, হিংসাবিদ্বেষের আগুন থেকে থেকে জ্বলে উঠেছে, প্রতিশোধ নেবার দুর্বার ইচ্ছা বিভেদ বিচ্ছেদকে বাঁচিয়ে রেখেছে– ফলে আরবীয়রা একটা মিলিত সমাজরূপে, একটা সংঙ্ঘবদ্ধ শক্তিশালী জাতিরূপে গড়ে উঠতে পারছে না) সেই অহমিকা, অধিকারহরণ এবং রক্তক্ষরণ চিরদিনের তরে রহিত হয়ে গেল, অতীতে যা ঘটে গেছে তা আজকার দিনে

www.waytojannah.com

মাফ হয়ে গেল। পুরাতন প্রথা রহিত হল– কিন্তু কা'বা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাজীদের পানি পান করানোর পূর্বেকার নিয়মই অব্যাহত থাকবে।

"অতঃপর যদি কেউ ইচ্ছাপূর্বক কাউকে হত্যা করে সেজন্য সে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবে– আর মৃত্যুদণ্ডই হবে তার সাজা। কিন্তু ভুলক্রমে হত্যার জন্য হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একশত উষ্ট্র দিতে হবে।"

"হে কুরাইশ জাতি! জাহিলিয়াত যুগের অহমিকা এবং বাপদাদার জন্য গর্ববোধ আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে দূর করে দিলেন। শোন, উত্তমরূপে শ্রবণ কর– সমগ্র মানবজাতি আদম (আ) থেকে জাত আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।"

তারপর তিনি কুরআন মাজীদের এ আয়াত পাঠ করলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

"হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলকেই (একই উপাদানে) পুরুষ ও স্ত্রী (এর মিলন) থেকে সৃষ্টি করেছি, এবং তোমাদেরকে শুধু এ জন্য বিভিন্ন শাখা ও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছি যে, এর সাহায্যে তোমরা একে অপরের নিকট পরিচিত হতে পারবে– অহমিকা দেখান, কৌলিন্য প্রদর্শন এবং অত্যাচার ও শোষণ করার জন্য নয়। (জেনে রাখো) তোমাদের মধ্যে যারা অধিক পরহেযগার– অধিকতর সঙ্গত ও সংযমশীল তারাই আল্লাহর নিকট অধিক মহৎ– অধিক সম্ভ্রান্ত, অধিক সম্মানের পাত্র। নিশ্চয়, আল্লাহ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা: হুজুরাত- ১৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অতুল্য ক্ষমা– সাধারণ মার্জনা

তারপর যা জানার জন্য তারা উৎকণ্ঠিত ও উৎকর্ণ, যা শোনার জন্য তারা আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন ও আশায় প্রতীক্ষারত- মহানুভব মুহাম্মাদ মুস্তাফা ﷺ-এর কণ্ঠ থেকে এবারে তাই ধ্বনিত হল। সূচনায় তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন,

"আমি তোমাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করব বলে তোমরা মনে মনে ভাবছ?"

এ প্রশ্নের ধরন দেখেই কুরাইদের হৃদয়ে সাহস সঞ্চারিত হল– আশার ঝলক দর্শনে বুকে হিম্মত জেগে উঠল, সকলে সাহসে ভর করে সমস্বরে বলে উঠলো)

"হে আমাদের দয়াল ভ্রাতা! তোমার কাছে আশা করছি কল্যাণের, আশা করছি মঙ্গল লাভের! হে আমাদের মহানুভব ভ্রাতুষ্পুত্র! আজ তুমি বিজয়ী, আমাদের শাস্তিদানে আজ তুমি ক্ষমতাবান, তবু আমরা তোমার করুণা লাভেরই প্রত্যাশা করছি (যদিও আমরা শত অপরাধে অপরাধী, যদিও আমরা দণ্ডলাভের যোগ্য!)

দয়ার নাবী, রহমতের অনুপম ছবি, করুণার মূর্ত প্রতীক মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমাদে মুজতবা ﷺ তখন মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন:

"আজকের দিনে আমি তোমাদের সেই কথাই বলব যে- কথা বলেছিলেন ইউসুফ (আ) তার ভ্রাতাগণকে– لا تثريب عليكم اليوم

www.waytojannah.com

'আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।" (সূরা: ইউসুফ: ৯২)

যাও তোমরা সবাই মুক্ত, সবাই আযাদ।

ইউসুফ (আ) সেদিন তাঁর বিদ্বেষদুষ্ট হিংসাপরায়ণ ভাইদের উদ্দেশে আরও বলেছিলেন:

يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين

"আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিন, তিনি হচ্ছেন সকল দয়ালুর উপরে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু।"

(সূরা ইউসুফ- ৯২)

এই সাধারণ মার্জনায় কোন শর্ত ছিল না- কোন কিন্তু পরন্তুর ব্যতিক্রম ছিল না। আর ছিল না বলেই- আবূ সুফ্ইয়ানের স্ত্রী হিন্দা নৃশংসতা আর পৈশাচিকতায় যার দ্বিতীয় কোন নযীর পাওয়া যাবে না- সেও ক্ষমা লাভে ধন্য হয়েছিল, ইসলামের জানী দুশমন আবূ জাহ্লের ছেলে ইকরিমা- প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এমন কি নাবী ﷺ-এর সৈন্য বাহিনী বিজয়ীর বেশে মাক্কায় প্রবেশের পথে যে ব্যক্তি বাধা দিতে এগিয়ে গিয়েছিল এবং অপরাধ মার্জনার অযোগ্য মনে করে যে ব্যক্তি পলায়নের পথ ধরেছিল- সেও ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে ইসলামের জন্য নিজের জীবন দান করে শাহাদাতের গৌরব অর্জনের সুযোগ পেয়েছিল।

হিন্দা

অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে হিন্দা সাফা পাহাড়ের পাদদেশে বাইআত গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছে- রাসূলুল্লাহ ﷺ মেয়েদের ওসীয়াত করছেন- এমন সময় এক প্রশ্নে পরিচিত নারীকণ্ঠ চিনতে পেরেই জিজ্ঞেস করলেন- তুমিই কি হিন্দা?

হিন্দা: জি হাঁ! আমিই হিন্দা- আমাকে মাফ করুন- ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।

এই সেই হিন্দা যার ইসলাম বিদ্বেষ এবং মুসলিমদের প্রতি প্রতিহিংসার উৎকট পরিচয় মেলে উহূদের যুদ্ধপ্রান্তে তার পৈশাচিক আচরণে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় চাচা বীর সিংহ হামজা (রা) শহীদ হওয়ার পর- যে পিশাচিনী নারী তাঁর বুক চিরে কলিজা বের করে উক্ত কাঁচা কলিজা দাঁত দ্বারা চিবিয়ে চিবিয়ে, তার কর্তিত নাক কান প্রভৃতি কেটে কেটে সুতায় মালা গেঁথে হিংস্রতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়েছিল!

রহমাতের নাবী সব কথা আজ ভুলে গেলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে ইসলামের স্বার্থে মহা-অপরাধিনী হিন্দাকে মার্জনা করলেন।

ইকরিমা

ইসলাম আর মুসলিমের প্রতি শত্রুতায় আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরোধিতায় ইকরিমা ছিল আবূ জাহ্লেরই নিজস্ব নমুনা। বদর থেকে শুরু করে মাক্কা বিজয় পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধে এবং প্রতিটি ষড়যন্ত্রে ইকরিমা সিংহভাগ গ্রহণ করে আসছিল। এমন কি মুসলিমদের মিত্র খুযা'আ গোত্রের উপর নৃশংস আক্রমণ আর তাদের পাইকারী হত্যা সাধনের মূলেও ছিল এই ইকরিমা। তারপর শেষ মুহূর্তে মুসলিমদের মাক্কা প্রবেশ পথে বাধা প্রদান এবং সংঘর্ষ বাধানোর পশ্চাতেও ছিল ইকরিমা। পরাজয়ের পর অবস্থা বেগতিক দেখে নিজের জান বাঁচানোর মতলবে- সে দেশ ত্যাগ করার মনস্থ করে। বাহরে কুলযুমে একটা নৌকা পেয়ে তাতেই আরোহণ করে সে পলায়নের চেষ্টা করে।

www.waytojannah.com

এদিকে তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাযির হয়ে তাঁর স্বামীর নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তার খোঁজে বের হয়ে পড়ে। তালাশ করতে করতে সে সমুদ্র তীরে এসে পৌঁছে।

ওদিকে ইকরিমা তখন নৌকায় সমুদ্র বক্ষে! সহসা এক ঝড় উত্থিত হয়, ঝড়ের দাপটে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে নৌকা টলটলায়মান! যে কোন সময় নৌকা সমুদ্রের অতল গর্ভে ডুবে যেতে পারে। ইকরিমা শঙ্কিত হৃদয়ে কুরাইশদের পূজ্য দেবতা লাত আর উয্যাকে আকুলভাবে ডাকতে থাকে। নৌকার মাঝি মাল্লারা বলে উঠে, আজ লাত আর উযযাকে ডেকে এ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। সেই বিশেষ অবস্থায় সেই আতঙ্কিত পরিবেশে মাঝি-মাল্লাদের কথা তার চোখের পরদা ও হৃদয়ের আবরণ ছিন্ন করে ফেলে। সে তখন লা-শারীক আল্লাহর দরবারে বিনীত প্রার্থনা জানায়:

"হে পরোওয়ারদিগারে আলম- আমি ওয়াদা করছি– এই তুফান থেকে যদি তুমি আমাকে রক্ষা কর, তাহলে আমি নিজেকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর খিদমাতে হাজির করব– তাঁর হাতে আমি হাত রাখব, তাঁর কাছে বাই'আত পড়ে ইসলাম কবুল করব– এবং আমি এই বিশ্বাস রাখি যে, তাঁকে আমার মার্জনাকারী এবং অনুগ্রহপরায়ণ ও দয়াশীল রূপেই লাভ করব।"

আল্লাহর রহমে ঝড় থেমে গেল, নৌকা তীরে ভিড়ল। তীরে নেমেই সে দেখতে পেল তাঁরই তালাশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মার্জনার সুস্পষ্ট সংবাদ নিয়ে হাজির তাঁরই সহধর্মিণী উম্মু হাকিম বিনতে হারিস!

স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে সে যথাসময়ে রাসূল ﷺ-এর খিদমাতে হাজির হল। উভয়ের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইকরিমাকে মার্জনা করলেন। ইকরিমা ইসলাম কবুল করলেন এবং ইসলামের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন। পরবর্তী বহু জিহাদে অংশ গ্রহণ করে তিনি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। অবশেষে নিজের জীবন দিয়ে মুসলিমদের শ্রেষ্ঠ কাম্য- শাহাদাত বরণ করেন।

সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া

মাক্কার কুরাইশদের অন্যতম নেতা সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া। ইসলামের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের দুশমনী ছাড়াও ইকরামার ন্যায় সেও মুসলিমদের মিত্র গোত্র বনী খুযা'আর উপর অতর্কিত অন্যায় আক্রমণ এবং মাক্কায় প্রবেশের সময় খালিদ ইবনু ওয়ালীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করেছিল। পরাজয়ের পর সেও সমুদ্রের অভিমুখে চলে গিয়েছিল।

তার চাচাত ভাই উমাইর ইবনু ওহাব আল জাম'য়ী তার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সুপারিশ পেশ করেন। তিনি নিরাপত্তার অভয় দান করেন। সাফওয়ান সমুদ্র পাড়ি দেবার উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করতে যাচ্ছিল এমন সময় উমাইর সেখানে হাযির হয়ে তাকে মাক্কায় নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পেশ করেন। সাফওয়ানের মন থেকে তখনও কুফর ও শির্কের কলুষ কালিমা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়নি। সে দুই মাস চিন্তা ভাবনার সময় চাইল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চার মাস সময় প্রদান করলেন। কিন্তু এই সময় পার হবার পূর্বেই সে হুনায়ন যুদ্ধের পরই কালিমা তাওহীদ পাঠ করে ইসলামকে মনে প্রাণে কবুল করে নিল।

www.waytojannah.com

হাব্বার ইবনু আসওয়াদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা যায়নাব (রা)-কে তাঁর মাক্কাবাসী স্বামী আবুল 'আস এক পূর্ব নির্ধারিত শর্ত মুতাবেক মাক্কা থেকে মাদীনায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। পথে হাব্বার এবং তৎসহ হুবায়রিস তাঁর অঙ্গে এবং তার বাহন উটটিকে সাংঘাতিকভাবে বর্শা দ্বারা আঘাত করায় তিনি উটের পিঠ থেকে আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যান। তিনি তখন অন্তঃসত্ত্বা। আঘাত এবং পতনের ফলে তাঁর গর্ভপাত হয়ে যায় এবং রক্তপাত ঘটে আর ঐ আঘাতের পরিণতিতেই তিনি মাদীনায় ইন্তিকাল করেন। মাক্কা বিজয়ের পর হাব্বার পলাতক অবস্থায় এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কা থেকে হুনাইন এবং তায়েফ হয়ে যখন মাদীনার দিকে ফিরে চলেছেন, তখন পথে 'জিইররানা' নামক স্থানে সে নাবীর দরবারে হাজির হয়। সাহস ভরে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে সে বলে উঠে:

আস্‌সালামু 'আলাইকা ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।"

"হে আল্লাহর নাবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

"আমার সম্বন্ধে আপনার নিকট যে সংবাদ পৌছেছে তার সমস্তটাই সত্য। নিজের জান বাঁচানোর উদ্দেশে আমি স্বদেশ পরিত্যাগ করে আজমে চলে যাওয়ার এবং বিদেশেই অবস্থানের মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু দুশমনের প্রতিও আপনার অতুল্য দয়া ও করুণার কথা জানতে পেরে আপনার চরণপ্রান্তে আশ্রয় নেয়াই উত্তম মনে করলাম।

"হে আল্লাহর নাবী! এতদিন আমরা শির্কের কলুষ-কালিমায় ডুবে ছিলাম, আল্লাহ আপনার বদৌলতে আমাদের হিদায়াতের সোজা পথ প্রদর্শন করেছেন। নিজের দোষ স্বীকার করে আমি এখন আপনার অনুগ্রহের ভিখারী।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। বললেন, ইসলাম পূর্বকৃত সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়, সমস্ত অপরাধের শাস্তি মওকুফ করে দেয়। আল্লাহ তোমাকে যেরূপ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, তেমনি তোমার ভবিষ্যৎকে তিনি মঙ্গলময় এবং কল্যাণদীপ্ত করে তুলুন!

'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবী সরাহ

পূর্বে সে মুসলিম ছিল। শুধু তাই নয়, মাদীনায় সে অন্যতম কাতেবে ওহীও ছিল (অর্থাৎ কুরআন মাজীদের আয়াত লিখে রাখার সম্মানও তাকে দেয়া হয়েছিল) কিন্তু নফসের ফেরেবে পড়ে সে ইসলাম ত্যাগ করে মাক্কায় এসে তার পুরাতন দোস্ত আহবাবের সঙ্গে মিলে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা চালাতে থাকে। (এমন কি সে এমন কথাও বলে বেড়াতো যে, ওয়াহী তো আমার কাছেই আসত, মুহাম্মাদ ﷺ আমার কাছে আসত, মুহাম্মাদ ﷺ আমার কাছে শুনে লিখিয়ে রাখতেন।) মুরতাদের (ইসলাম পরিত্যাগকারীর) নির্দিষ্ট শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। এহেন মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য অপরাধীকেও যখন তার দুধ-ভ্রাতা 'উসমান ইবনু আফফান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে নিয়ে হাজির করলেন তখন দয়ার নাবী ﷺ তাকেও ক্ষমা করে দিলেন।

পরবর্তীকালে এই আবদুল্লাহ ইবনু সা'দের নেতৃত্বে আফ্রিকার এক বৃহৎ অংশ ইসলামের জন্য বিজিত হয়।

www.waytojannah.com

ফুযালা ইবনু উমাইর

মাক্কা বিজয়ের পর দ্বিতীয় দিবসে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিরাপদ পরিবেশে প্রশান্ত মনে কা'বা গৃহে তাওয়াফ করছেন, এমন সময় মাক্কার কাফিরদের মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁকে এই সুযোগে হত্যা করার দুরভিসন্ধি নিয়ে রাসূল ﷺ-এর দিকে এগিয়ে চলল।

অত্যন্ত সর্তকতা ও সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে যখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছে গেল তখন তার প্রতি নাবীর দৃষ্টি নিপতিত হল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ: ফুযালা নাকি?

ফুযালা: জি হাঁ, আমি ফুযালা, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ: তুমি মনে মনে কী ফন্দি এঁটে চলেছ?

ফুযালা: না, কিছু নয় তো, এই আল্লাহর যিকর আযকার করছিলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ: ফুযালার কথা শুনে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, সেই আল্লাহর নিকটেই মার্জনা চাও।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফুযালার বুকে তাঁর পবিত্র হাত সংস্থাপন করলেন। তার বিস্ময়-বিমূঢ় এবং অনুতাপদগ্ধ হৃদয় তখন শান্ত হল– স্বস্তি লাভ করল।

ফুযালা নিজে পরবর্তীকালে গর্বের সঙ্গে বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমার বুক থেকে তাঁর হাত তুলে নিলেন তখন আমি সম্পূর্ণ এক রূপান্তরিত মানুষ। আমার কাছে তখন মনে হচ্ছিল– রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাইতে প্রিয় আর কোন বস্তু আল্লাহ সৃষ্টি করেননি।

ফুযালা যখন ইসলামের পবিত্র পানিতে বিধৌত হয়ে শুদ্ধ-বুদ্ধরূপে গৃহে ফিরছিলেন তখন পথে তার এক প্রিয় রক্ষিতা তাকে ডেকে বলল, ওগো প্রিয়- ওগো প্রিয়তম!

হালুম্মা ইলাইয়া, আল-হাদীস!

একবার এদিকে এসো, একটা কথা শুনে যাও।

ফুযালা বলছেন– আমি তখন তাকে বললাম,

না, আর সম্ভব নয়। তোমার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রাখতে আমাকে এখন বারণ করছে আমার আল্লাহ এবং আমার ইসলাম।

মৃত্যুদণ্ড

মাত্র ছয় ব্যক্তির (মতান্তরে ১০ ব্যক্তির) উপর তাদের পূর্বকৃত গুরুতর অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের হুকুম জারি করা হয়েছিল। এ ছয় জনের মধ্যে ছিল চারজন পুরুষ এবং দু'জন স্ত্রী। পুরুষরা হচ্ছেন: ১। আবদুল্লাহ ইবনু খাতাল, ২। মাকীস ইবনু সুবাবা, ৩। আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ এবং ৪। ইকরিমা ইবনু আবূ জাহ্ল। কোন কোন বিবরণে হুওয়াইরিস ইবনু নাফিসের নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। স্ত্রী লোকদের মধ্যে ছিল ইবনু খাতলের দুই দাসী- যাদের নাম সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

এদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ এবং ইকরিমা ইবনু আবূ জাহ্লকে ক্ষমা করে দেয়া হয়– ইতোপূর্বেই আমরা তা জানতে পেরেছি। বাকী যে দু'জনের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিতরূপে কার্যকরী করা হয় তাদের একজন হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনু খাতাল এবং অপরজন মাকীস ইবনু সুবাবা। এদের ক্ষমা করা হয়নি। কারণ, তারা ছিল ইচ্ছাকৃত হত্যার দোষে দুষ্ট। নিম্নে তাদের অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হচ্ছে।

www.waytojannah.com

ইবনু খাতাল

ইবনু খাতাল মুসলিম হয়ে মাক্কায় অবস্থান করছিল। এ সময় নাবী ﷺ আর দু'জন মুসলিমের সঙ্গে তাকে যাকাত আদায় করার জন্য স্থানান্তরে প্রেরণ করেন। এ দু'জনের মধ্যে একজন মুজায়না বংশের আর একজন আনসার। এ আনসারকেই নাবী ﷺ এ ক্ষুদ্র দলের আমির করে দেন। আনসারীর নিকট (সরকারী তহবিলের) অর্থকড়ি মওজুদ ছিল। পথিমধ্যে সুযোগ বুঝে ইবনু খাতল নাবীর নিয়োজিত আমিরকে হত্যা করে তাঁর তহবিলের সমস্তটা ছিনতাই করে এবং আত্মরক্ষার্থে মাক্কায় পালিয়ে যায়। অপর লোকটিও পালিয়ে মাক্কায় উপস্থিত হয়। এ বিশ্বাসঘাতকতা, ইচ্ছাকৃত নরহত্যা, রাজদ্রোহিতা ও সরকারী তহবিল তসরুফের অপরাধে– সে সময় সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। বলা আবশ্যক যে, মাক্কা বিজয়ের পর এ অপরাধের জন্যই তাকে হত্যা করার আদেশ দেয়া হয়েছিল।

মাকীস

মাকীস ও তাঁর সহোদর হিশাম ইসলাম গ্রহণপূর্বক মাদীনায় অবস্থান করতে থাকেন। এ সময় একটা যুদ্ধে জনৈক আনসার ভুলক্রমে (শত্রু মনে করে) হিশামকে হত্যা করেন। যথাসময়ে রাসূলের নিকট এ মুকাদ্দামার বিচার হয়ে যায় এবং রাসূল ﷺ অনিচ্ছাকৃত নরহত্যার জন্য মিকইয়াসকে যথাবিধি ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। নরাধম এই ক্ষতিপূরণের টাকা নেবার পর উপরোক্ত আনসারকে হত্যা করে মাক্কায় পলায়ন করে। সে সময় ইচ্ছাকৃত নরহত্যার অপরাধে তার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হয় এবং মাক্কা বিজয়ের পর সে আদেশ কার্যকর করা হয়।

দণ্ডঘোষিত দু'জন স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন তার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে ক্ষমা চাওয়ায় তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। অপরজনকে ইচ্ছাকৃত নরহত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

কা'বা গৃহের চাবি

কুরাইশদের দু'টি প্রসিদ্ধ গোত্র বানী কুস্‌সা এবং বানী আব্দে মনাফ যথাক্রমে কা'বা গৃহের চাবি সংরক্ষণ এবং হাজ্জ ও উমরাহর উদ্দেশ্যে আগত যাত্রীদের মিঠা পানি পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করে আসছিল। এ সময় কুসসার অধঃস্তন সপ্তম পুরুষ 'উসমান ইবনু তালহার নিকট ছিল কা'বার চাবি। আর আবদুল মুত্তালিবের বংশধরের (রাসূলুল্লাহ ﷺ'র আপন গোত্রের) উপর ছিল পানি পান করানোর দায়িত্ব।

মাক্কাবাসীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা গৃহে গিয়ে বসলেন। 'আলী (রা) তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। ইতোপূর্বে 'উসমান ইবনু তালহার কাছ থেকে চাবি নিয়ে কাবার দওয়াজা খুলবার পর সেই চাবিগুচ্ছ ছিল 'আলী (রা)-এর কাছে। তিনি নাবীর খিদমাতে আরয করলেন:

ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! পানি পান করানোর দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে কাবার চাবি সংরক্ষণের দায়িত্বটাও আমাদেরকেই প্রদান করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আলীর কথার কোন জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'উসমান ইবনু তালহা কোথায়?

তাঁকে ডেকে আনা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন: এ নাও তোমার চাবি। হে 'উসমান! আজকের দিন প্রতিশোধ গ্রহণের দিন নয়, আজকের দিন কল্যাণের দিন, আমানত যথাস্থানে প্রত্যর্পণের দিন।

www.waytojannah.com

এ দিন আর সেদিন। 'উসমান ইবনু তালহার মনে পড়ছে সে দিনের কথা যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের পূর্বে কা'বা যিয়ারতে এসেছিলেন আর 'উসমান তাঁর মুখের উপর কা'বার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

'উসমানের যবানেই দিবসের ঘটনার বিবরণ শোনা যাক।

'উসমান বলেছেন: "জাহিলিয়াত যুগে আমরা সোমবার আর বৃহস্পতিবারে কা'বার দরজা খুলতাম। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা গৃহে প্রবেশের জন্য অন্যান্য কতিপয় মুসলিমকে সঙ্গে নিয়ে কা'বা প্রাঙ্গণে এসে হাজির হলেন। তিনি কা'বা গৃহে ঢুকতে যাচ্ছিলেন এমন সময় আমি তাঁকে হটিয়ে দিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিলেন। তখন তাঁর আর আমার মধ্যে এই কথোপকথন হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ: হে 'উসমান।

(আজ তুমি আমাকে আল্লাহর এই ঘরে ঢুকতে দিলে না কিন্তু) এক দিন আসছে– এবং সেদিন শীঘ্রই আসছে যেদিন এই ঘরের চাবি তুমি আমার হাতে দেখতে পাবে এবং আমি যাকে ইচ্ছে, তার হাতেই এ চাবি সমর্পণ করব।

'উসমান: যেদিন তোমার হাতে চাবি যাবে সে দিনটি হবে কুরাইশদের জন্য অপমানের দিন, তাদের লাঞ্ছনা এবং অধঃপতনের দিন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ: না, বরং সে দিনই হবে কুরাইশদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির শুভসূচনার দিন।

'উসমান বলছেন, সে দিন সত্যই সমাগত হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিজয়ীর বেশে মাক্কায় প্রবেশ করলেন। আমি বিশ্বাস করলাম, তিনি যা বলেছিলেন, ঠিক তাই ঘটতে যাচ্ছে।

তিনি আমার কাছে চাবি চাইলেন। চাবি এনে আমি তাঁকে দিলাম। তিনি আমার কাছ থেকে সে চাবি গ্রহণ করলেন। পুনঃ আমারই হাতে উক্ত চাবি প্রত্যর্পণ করে বললেন,

"এটা তুমি গ্রহণ কর এবং চিরদিন সংরক্ষণ করে চলো। তুমি এবং তোমার বংশ চিরদিন এই চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে যাবে। জালিম ছাড়া আর কেউ তোমাদের নিকট থেকে এই চাবি ছিনিয়ে নেবে না।

"হে উসমান! জেনে রাখো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকেই তার গৃহের আমানতদার বানিয়েছেন। তোমরা এর আয় থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে তোমাদের জীবিকা নির্বাহের খরচ গ্রহণ করবে।"

চাবি নিয়ে যখন আমি চলে আসছিলাম তখন রাসূল ﷺ আমাকে আবার ডাকলেন। আমি ফিরে গেলাম। তিনি বললেন, 'উসমান! আমি তোমাকে সেই অতীতে (হিজরতের পূর্বে) যা বলেছিলাম তোমার কী তা মনে আছে? আমি বললাম, জী হাঁ, সবই মনে আছে। আপনি বলেছিলেন, "এক দিন আসছে এবং সেদিন শীঘ্রই আসছে যেদিন এই ঘরের চাবি তুমি আমার হাতে দেখতে পাবে এবং আমি যাকে ইচ্ছা করব তার হাতেই এই চাবি সমর্পণ করব।" আপনি যা বলেছিলেন- তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে।

أشهد أنك رسول الله

(আশ্‌হাদু আন্নাকা রাসূলুল্লাহ!)

আমি (নতুন করে জোরে শোরে) সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল।

www.waytojannah.com

সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব উল্লেখ করেছেন যে, সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বুযুর্গ চাচা 'আব্বাসও (রা) চেষ্টা করেছিলেন যাতে কা'বা গৃহের চাবির দায়িত্ব বানী হাশিমের কারো উপর অর্পণ করা হয়। কিন্তু সে চেষ্টা কার্যকর হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজ গোত্র বানী হাশিমের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন।

কেন করবেন না? তিনি ছিলেন আদল ও ইনসাফের মূর্তপ্রতীক। স্বজনপ্রীতি তাঁকে কখনো আদল ও ইনসাফের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। আপনজনের আবদার রক্ষার জন্য তিনি প্রকৃত হকদারকে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না। তাঁর মাধ্যমেই যে উম্মাতের জন্য আল্লাহর এই শাশ্বত নির্দেশটি ঘোষিত হয়েছে:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهِ.

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন আমানাত তার প্রকৃত হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে।"
(সূরা আন-নিসা ৪: ৫৮)

উম্মু হানী (রা)-এর গৃহে সালাতে শুক্র

চাবি প্রত্যর্পণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ তালিবের কন্যা তাঁর চাচাতো বোন এবং 'আলী (রা)-এর আপন ভগ্নি- উম্মু হানীর গৃহে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি গোসল করলেন এবং তার গৃহেই আট রাক'আত সালাত আদায় করলেন। সময়টি ছিল যুহা (দিবা ভাগের প্রথম অংশ), এজন্য কেউ কেউ ধরে নিয়েছেন যে, এটা ছিল সালাতুয্ যুহা বা চাশতের সালাত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এটা ছিল সালাতে শুকুর- যা এই মহা বিজয়ের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশে তিনি আদায় করেছিলেন। এর প্রমাণ হচ্ছে স্বয়ং উম্মু হানীর হাদীস। তিনি বলেছেন: এ দিবসের পূর্বে এবং পরে আমি আর কখনও তাকে এ সালাত পড়তে দেখিনি। এছাড়া ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইসলামের স্বর্ণ যুগের আমীর উমারারা যখনই কোন শহর কিংবা দুর্গ জয় করেছেন তখন অনুরূপ শুকরিয়ার সালাত আদায় করেছেন।

কুরাইশদের ইসলামে দীক্ষা ও বাই'আত গ্রহণ

মাক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পর্বত থেকে তাঁর দেশবাসীকে নতুন করে ইসলামের পানে উদাত্ত আহ্বান জানালেন। এই আহ্বানে মাক্কার কুরাইশ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন বিপুলভাবে সাড়া প্রদান করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পর্বতের উপত্যকায় বসে নব-দীক্ষিত মুসলিমদের বায়'আত গ্রহণ করলেন। 'উমার (রা) এক এক জন ক'রে লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পেশ করছিলেন আর প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে হাত রেখে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করছিল:

ক. আমি আল্লাহর সঙ্গে- তাঁর সত্ত্বায়, তাঁর গুণাবলীতে এবং তাঁর 'ইবাদাতের হকে কাউকেই শরীক করব না।

খ. আমি চুরি করব না, ব্যভিচারে লিপ্ত হ'ব না, অন্যায় খুন খারাবী করব না, নারীর প্রতি নির্যাতন চালাব না এবং কারও প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করব না।

গ. আমি সত্য-কর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ আমার শক্তি ও সাধ্য অনুসারে পালন করে চলব।

নারীদের নিকট অতিরিক্ত নিম্ন বর্ণিত স্বীকৃতি আদায় করা হচ্ছিল:

কারো শোকে হাত-পা ছুঁড়বো না, মুখ থাবড়াবো না, আমার চুল ছিঁড়ব না, পরিধেয় বস্ত্রের বুক ফাড়ব না, কালো পোশাক পরব না, কবরে বসে মাতম করব না।

www.waytojannah.com

মুহাজিরদের সয়-সম্পদ

মাক্কা থেকে হিজরতকারী হাজার হাজার মুসলিমদের যেসব স্থাবর অস্থাবর সয়-সম্পদ অন্যায়ভাবে কুরাইশরা জবর দখল করে বসেছিল এবারে মুহাজির মুসলিমরা তাদের সেই সব সম্পত্তি বাড়ি-ঘর, আসবাবপত্র ফেরত পাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরযি পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দরখাস্ত না-মঞ্জুর করলেন। তিনি তাদের বললেন, তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে যা ছেড়ে দিয়ে গেছ আবার কেন তার দাবি জানাচ্ছ?

দেব-দেবীর প্রতিমা অপসারণ

কা'বাগৃহ থেকে ৩৬০টি দেব-প্রতিমা অপসারণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে মাক্কায় নব দীক্ষিত মুসলিমদের গৃহে গৃহে যে সব পুতুল প্রতিমা ছিল সেসব ভেঙ্গে ফেলা হলো।

মাক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় লাত, উয্যা, মানাত প্রভৃতি বড় বড় দেব-দেবীর প্রতিমাগুলোও ধ্বংস করে দেয়া হলো। কিছুটা দূরবর্তী প্রতিমাগুলোও ভাঙ্গার জন্য কয়েকটি ছোট খাট অভিযান প্রেরিত হলো। এসব অভিযানের দু'টিতে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ, একটিতে 'আমর্ ইবনু 'আস এবং আর একটিকে সা'দ ইবনু যাইদ আল-আশহালী নেতৃত্ব প্রদান করেন।

আনসারদের অভয় দান

মাক্কা বিজিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সেখানকার ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করার জন্য বেশ কিছুদিন অবস্থান করলেন তখন মাদীনার আনসারগণ মনে মনে ধারণা করলেন এবং পরস্পর আলোচনাও করলেন যে, মাক্কা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মস্থান এবং তাঁর নিজের শহর। হয়ত বা তিনি এখানেই থেকে যেতে পারেন! এই ব্যাপার নিয়ে তারা উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দরগাহে দু'আ করছিলেন। তিনি আনসারদের ঐ উদ্বেগের কথা জানতে পেরে দু'আ শেষে তাদের ডেকে বললেন– তোমরা কী বলাবলি করছিলে? প্রথমে তারা বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পীড়াপীড়িতে তারা তাদের মনের আশঙ্কা প্রকাশ না করে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাদের লক্ষ্য করে বললেন:

মা'আযাল্লাহ! এমন কাজ থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় ভিক্ষা চাচ্ছি। আমার জীবন তোমাদের জীবনের সঙ্গে আর আমার মৃত্যু তোমাদের মৃত্যুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। (কাজেই এজন্য তোমাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কোনই কারণ নেই।)

স্বভাবতঃই এ জওয়াবে তাঁরা আশ্বস্ত হলেন, তাঁরা খুশী হলেন।

www.waytojannah.com

মাক্কা বিজয়ের দু'টি প্রতিক্রিয়া

মাক্কা বিজয়ের বহু ফলাফলের মধ্যে একটি ছিল মাক্কার সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী বহু কবীলা ও গোত্রের উপর তার শুভ প্রতিক্রিয়া। এসব গোত্রের ধারণা ছিল মাক্কার উপর এমন কোন লোক বিজয়ী হতে পারে না যার প্রতি আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন নেই। ৬০ বৎসর পূর্বে আবরাহার বিপুল সৈন্য ও হস্তীবাহিনী কিভাবে পর্যুদস্ত ও বিধ্বস্ত হয়েছিল সে স্মৃতি বৃদ্ধদের হৃদয় থেকে তখনও মুছে যায়নি।

এবার যখন মুহাম্মাদ ﷺ বিজয়ী বেশে মাক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো যে, তাঁর পিছনে নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য এবং সমর্থন রয়েছে। তারা বুঝতে পারল, কুরাইশদের শক্তির দাপট এখন ভেঙ্গে মিসমার হয়ে গেছে এবং মুসলিমগণ আল্লাহর সহায়তায় অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে দলে দলে লোক ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং ইসলামকেই মুক্তির একমাত্র পথরূপে গ্রহণ করে চলেছে।

কিন্তু অপর পক্ষে তায়েফের সাকীফ গোত্র এবং প্রতিবেশী হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা অন্য রকম ধারণার বশবর্তী হয়ে এটাকে তাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি বর্ধিত করার জন্য একটি সুযোগরূপে গ্রহণ করল। আরবে কুরাইশরাই ছিল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র। সেই গোত্রের শক্তি নিঃশেষিত হওয়ায় তারা মনে করল এখন ক্রমে বেড়ে উঠা শক্তি-মুসলিমদের ধ্বংস করতে পারলেই আরবে তাদের সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত এবং প্রাধান্য সূচিত হবে। এছাড়া তায়েফে কুরাইশদের যে সব বাগ-বাগিচা এবং জায়গীরাদি রয়েছে সবই তাদের হস্তগত হবে।

তাই মাক্কা আক্রমণের জন্য তারা দ্রুত বিপুল প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলল।

হুনাইনের যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানতে পারলেন যে, কবীলা হাওয়াযিন এবং তাদের সঙ্গে সাকীফ গোত্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বিপুলভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে তখন তার সত্যতা নির্ধারণের জন্য 'আবদুল্লাহ ইবনু আবি-হাদরাদ আল্-আসলামীকে গুপ্তবার্তাবাহকরূপে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদের কাছে গিয়ে এবং ভিতরে ঢুকে ফিরে এসে সমস্ত অবস্থার বিবরণ প্রদান করলেন। বিবরণ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ উপলব্ধি করলেন এবং তাঁর এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে গেল যে, ঐ মুহূর্তে যদি তিনি এগিয়ে গিয়ে তাদের মুকাবেলা না করেন তাহ'লে শত্রুকে আর প্রতিরোধ করা যাবে না, তারা সোজা মাক্কায় চলে আসবে এবং পবিত্র শহর অবরোধ করে ফেলবে, সুতরাং তিনি রণসজ্জায় ব্যাপৃত হলেন।

প্রতিপক্ষ বিরাট সৈন্য বাহিনী এবং অস্ত্রসম্ভার নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। তাছাড়া তারা ছিল নিপুণ যোদ্ধা। তাদের মুকাবেলা করার জন্য মুসলিমদের পক্ষেও অস্ত্রসম্ভারের প্রয়োজন, কিন্তু তাদের কাছে তেমন অস্ত্র ছিল না, যুদ্ধের রসদ পত্রেরও অভাব ছিল।

মাক্কার অন্যতম কুরাইশ নেতা সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার নিকট প্রচুর বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র মওজুদ ছিল। তাকে ডেকে আনা হলো। তখনও কিন্তু সে মুশরিক। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, সাফওয়ান! তোমাদের নিকট যুদ্ধের প্রচুর হাতিয়ার মওজুদ রয়েছে– সাধারণ শত্রুর মুকাবেলার জন্য সেগুলো আমাদের প্রয়োজন। কাজেই ওগুলো আমাদের দিয়ে দাও। সে বলল, আপনি কি আমার হাতিয়ারগুলো দখল করে নিতে চান? তিনি বললেন, না বরং আমি ওগুলো চাচ্ছি ঋণ হিসেবে-কাজ শেষে ফেরত দেয়া হবে। সাফ্ওয়ান রাজী হলো। তার কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করা হলো।

যুদ্ধ যাত্রা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ১২ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে হুনাইনের উদ্দেশে বের হলেন। এদের মধ্যে ১০ হাজার ছিল নাবী ﷺ-এর সেসব সহচর যাদের নিয়ে তিনি মাদীনা থেকে বের হয়েছিলেন এবং যাদের সহায়তায় তিনি মাক্কা জয় করলেন। বাকি দু'হাজার ছিল মাক্কার অধিবাসী যাদের কতক ছিল নব-দীক্ষিত মুসলিম আর কতক তখন পর্যন্ত মুশরিক। আত্তার ইবনু উসাইদ (রা)-এর উপর মাক্কার শাসন ভার অর্পণ করা হ'ল।

রং বেরং এর পতাকা উড়িয়ে কৌচ করে যখন এই বার হাজার সৈন্য শান-শওকতের সঙ্গে আরবের মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে চলছিল তখন তাদের মনে এই প্রতীতি জন্মে গিয়েছিল: আমাদের গতি দুর্বার, আমদের শির উন্নত, আমাদের শক্তি অদম্য- আমরা দুর্ধর্ষ, আমরা দুর্জয়, আমরা অপ্রতিরোধ্য।

কিন্তু শক্তির মূল উৎস যে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এবং জয় পরাজয় সেই উৎস থেকেই হয় নিয়ন্ত্রিত, সংখ্যা দ্বারা নয়, অস্ত্রবহুল তাতেও নয়- এ কথা বোধ হয় সাময়িকভাবে তারা ভুলে গিয়েছিল। তাই সেই বিস্মৃত শাশ্বত কথাটি তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে চিরদিনের জন্য সতর্ক করার উদ্দেশে তাদের সাময়িক বিপর্যয়ের প্রয়োজন ছিল।

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ছিলেন এই অভিযানের অন্যতম অংশগ্রহণকারী। তিনি বর্ণনা দিচ্ছেন, "আমরা যখন হুনাইন উপত্যকার কাছে গিয়ে উপনীত হ'লাম, তখন রাত্রি কাটিয়ে অতি প্রত্যুষে আমাদের

www.waytojannah.com

এক অতি উৎসাহী (নব-দীক্ষিত মুসলিম ও অমুসলিমের) দল ত্রস্তপদে উপত্যকা অতিক্রম করার জন্য এগিয়ে চলল। তখনও অন্ধকার দূরীভূত হয়নি। ওদিকে শত্রুদল আগে ভাগেই এসে পাহাড়ের আড়ালে নিজ নিজ পজিশন নিয়ে ওৎ পেতে অপেক্ষা করছিল। মুসলিম বাহিনী নিঃশঙ্ক নির্ভাবনায় এবং বেখবর অবস্থায় এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ তাদের উপর বিপদ চেপে বসল। দু'দিক থেকে অদৃশ্যভাবে বৃষ্টিধারার মত অবিরাম তীর বর্ষণ শুরু হলো। দুর্দান্ত দুশমন অতর্কিতভাবে ভীষণ আক্রমণ করে চলল, প্রতিরোধ এবং প্রতি আক্রমণের সুযোগটুকু পর্যন্ত আমরা পেলাম না।"

ফলে অগ্রবর্তী সেনাদল প্রচণ্ড তীর বর্ষণের মাঝে টিকে থাকতে পারল না, তারা মুখ ফিরিয়ে পিছু হটে আসতে বাধ্য হলো। অগ্রবর্তী সেনাদলের এই পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াযিন গোত্রের ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা অকস্মাৎ প্রচণ্ড বেগে সমগ্র মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে আক্রমণের বেগ প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে- যে যেদিকে পারল পলায়ন করল। ফলে অল্পক্ষণেই ১২ (বার) হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসাধারণ দৃঢ়তা

এ অপ্রত্যাশিত ভয়াবহ দুর্যোগ ও ভীষণ বিপর্যয়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মুহূর্তের জন্যও ভয়ে বিচলিত এবং নৈরাশ্যে অভিভূত হলেন না। তিনি মুসলিমদের পুনঃ একটি কেন্দ্রে সমবেত এবং তাদের হৃদয়ে সাহস সঞ্চারিত করার জন্য উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়ে বললেন, "কোথায় তোমরা হে লোক সকল! আমার দিকে চলে এসো, এই যে আমি- আমি আল্লাহর রাসূল- আমি 'আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ ﷺ।"

এ সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মুহাজির এবং তাঁর আপন পরিবারের অল্প কয়েকজন ব্যতীত আর কেউ ছিলেন না। যারা এই সময়ে তাঁর সঙ্গে অনড় ও অটলভাবে সাবেত কদম ছিলেন তারা হলেন:

আবূ বাক্‌র, 'উমার, 'আলী, 'আব্বাস, আবূ সুফ্‌ইয়ান ইবনু হারিস ও তার পুত্র, ফায্‌ল ইবনু 'আব্বাস, রাবীআ' ইবু হারিস, উসামাহ ইবনু যাইদ এবং আইমান ইবনু উম্মু আইমান (রাযি আল্লাহু তা'আলা আনহুম)।

'আব্বাস (রা) নিজে বিওয়ায়াত করছেন, হুনাইনের যুদ্ধ দিবসে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম এবং তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের যখন বিপর্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পলায়নপর দেখতে পেলেন, তখন উচ্চ নিনাদে ডেকে বললেন, লোক সকল! তোমরা কোথায় যাচ্ছ। এদিকে এসে সমবেত হও। কিন্তু সেই অবস্থায় তাঁর আওয়াজ কারো কানে পৌছল না। আমি ছিলাম এক বিরাট বপু ও বুলন্দ আওয়াজের লোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ দিলেন– আপনি চীৎকার দিয়ে বলুন: হে আনসারবৃন্দ! হে সামুরার বাই'আত গ্রহণকারীগণ! (হে মুহাজিরবৃন্দ) তোমরা কোথায়? এদিকে ছুটে এসো! আমি তাই করলাম। আর সেই ডাক দিকে দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জওয়াব এলো– ইলাইকা লাব্বায়িক, লাব্বায়িক! এই যে আপনার দিকেই আমরা হাজির, আমরা হাজির।

এক বিবরণ মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাঁর অশ্বতর থেকে নিচে নামলেন। মাটি থেকে এক মুষ্টি ধূলা গ্রহণ করে কাফিরদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন-আর বললেন: "شاهت الوجوه" তাদের মুখগুলো কালো হয়ে যাক! ফলে তাদের মধ্যে তখন এমন একটা প্রাণীও বাকি রইল না যার চক্ষু সেই ধূলায় ধুসরিত না হলো। সঙ্গে সঙ্গে তারা উদ্যমহীন ও নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

www.waytojannah.com

মুসলিমগণ এবার নতুন উদ্যমে তীব্র আক্রমণ শুরু করলেন আর আল্লাহর হুকুমে তাদের সঙ্গে এসে যোগদান করলেন আসমান থেকে ফেরেশতার অদৃশ্য বাহিনী।

হুনাইন যুদ্ধের পর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ স্বয়ং এ আসমানী সাহায্যের কথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ – ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْزَلَ جُنُوْداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ.

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে বহু যুদ্ধক্ষেত্রেই সাহায্য করেছেন- বিশেষ করে হুনাইনের (যুদ্ধ) দিবসে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে মুগ্ধ (সম্মোহিত এবং উল্লাসিত) করে তুলেছিল। কিন্তু তা (ঐ সংখ্যাধিক্য) তোমাদের কোনই কাজে আসেনি, বরং যমীন তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল-তার প্রশস্ততা সত্ত্বেও। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে গিয়েছিলে। তারপর আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি এবং মু'মিনদের প্রতি তাঁর নিজের তরফ থেকে প্রেরণ করলেন স্বস্তি আর প্রেরণ করলেন এমন সৈন্যবাহিনী (ফেরেশতার দল) যাদের তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি শাস্তি প্রদান করলেন কাফিরদের আর তাই হচ্ছে কাফিরদের সমুচিত প্রতিফল! (সূরা তাওবা: ২৫-২৬)

এবারে আল্লাহর সাহায্যপুষ্ট মুসলিমদের আক্রমণের চাপে দুশমন দল দিশেহারা হয়ে পালাতে শুরু করল। তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে একদল তায়েফের দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল। এদের নেতা ছিল মালিক ইবনু 'আওফ। অপর দল আওতাসের ঘাঁটিতে গিয়ে আত্মগোপন করল। তাদের সঙ্গে ছিল তাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা এবং পশু সম্পদ ও নগদ টাকা কড়ি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফের দুর্গ অবরোধ করার হুকুম দিলেন আর আওতাসের দিকে আবূ আমির আশ'আরীর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করলেন। এখানে শত্রুদল বাধা দানে এগিয়ে এলো এবং সংঘর্ষে আবূ 'আমির আশ'আরী শহীদ হলেন। মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর যোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র আবূ মূসা আশ'আরীকে সেনাপতি মনোনীত করে গেলেন আর ওসীয়াত করলেন, "বৎস! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে আমার সালাম পৌছাবে আর আমার জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের অনুরোধ জানাবে।"

আবূ মূসা আশ'আরী চাচার পরিত্যক্ত পতাকা হাতে তুলে নিলেন, চাচার হন্তাকে হত্যা করলেন এবং আল্লাহ তাঁকে দিয়ে হাওয়াযিনদের চরম পরাজয় ঘটালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ সংবাদ পৌছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুই বাহু তুলে আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা জানালেন:

اللهم اغفر لعبيد أبي عامر وأهله واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك

"হে আল্লাহ! তুমি উবাইদ আবূ 'আমিরকে মার্জনা কর এবং তার পরিবারকেও মার্জনা কর আর কিয়ামাত দিবসে তোমার বহু সৃষ্ট প্রাণীর উর্ধ্বে তাকে স্থান দান কর।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর জন্যও দু'আ করলেন। এই যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক যোদ্ধা, শিশু, নারী ও বৃদ্ধ মুসলিমদের হাতে বন্দী হলো। পশু ও রসদপত্র যা পাওয়া গেল তা অকল্পনীয়। নর-নারী, বালক-বালিকা ও সৈন্যসহ মোট বন্দীর সংখ্যা হলো ৬ হাজার। আর মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হলো উট ২৪ হাজার, ছাগল, মেষ ও দুম্বা ৪০ হাজারের উর্ধ্বে আর চার সহস্র রৌপ্য মুদ্রা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত বন্দী এবং গনীমতের সমস্ত মাল- উট, ছাগল, দুম্বা একত্রিত করে মাক্কার নিকটবর্তী 'জি'আরানা' নামক উপত্যকায় সংরক্ষণের হুকুম প্রদান করলেন। সে মতে বন্দী পশুপালগুলোকে সেখানে নিয়ে রাখা হলো।

www.waytojannah.com

তায়েফ অবরোধ

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফের দিকে অগ্রসর হলেন। অগ্রবর্তী দলটি মহাবীর খালিদ ইবনু ওয়ালীদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। হাওয়াযিন গোত্রের পলাতক লোকজন এবং সাকীফ গোত্রের সমুদয় লোক তায়েফের সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল। এক বৎসরের জন্য প্রয়োজনীয় আহার্য বস্তু এবং রসদাদি তারা এই দুর্গে সংগ্রহ করে রেখেছিল। "দুর্গ মালার তোরণে তোরণে গুরুভার প্রস্তর এবং উত্তপ্ত লৌহ খণ্ডাদি নিক্ষেপ করার জন্য নানা প্রকার মারণযন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল।"

মুসলিমগণ দুর্গের নিকটবর্তী হলে তায়েফী সৈন্যরা তীর এবং অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। ফলে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলিম আহত হলেন এবং ১২ জন শাহাদাত লাভ করলেন। দুর্গের চারদিকে প্রচুর আঙ্গুরের বাগান ছিল। এই আঙ্গুরের বাগানের আড়াল থেকে তাদের আক্রমণ পরিচালনার সুবিধা হয়েছিল আর মুসলিমরা এজন্যই প্রতি আক্রমণে অসুবিধা ভোগ করছিল।

ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত আঙ্গুর বাগান কেটে ফেলার নির্দেশ প্রদান করলেন। হুকুম পেয়ে মুসলিমগণ আঙ্গুরের বাগান কাটতে শুরু করলেন। এবার তায়েফবাসীরা প্রমাদ গুণল। তারা উপলব্ধি করল, এই মূল্যবান সম্পদ কেটে শেষ করে ফেললে তাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাই তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে দূত প্রেরণ করে আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের প্রতি রহম করার আবেদন জানায়। মনে হয় ভীতি সৃষ্টিই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় বিনা বাক্য ব্যয়ে তিনি তাদের অনুরোধ রক্ষা করলেন। তবে এই সঙ্গে তিনি আর একটি কাজ করলেন। তিনি ঘোষণাকারীর মাধ্যমে প্রচার করে দিলেন- দুর্গের অভ্যন্তরে যে সমস্ত ক্রীতদাস রয়েছে তারা যদি বাইরে এসে মুসলিমদের সঙ্গে যোগ দেয় তবে তারা হবে আযাদ-সম্পূর্ণ মুক্ত, তাদের আর দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ থাকতে হবে না। এই আহ্বান শুনে বেশ কিছু সংখ্যক ক্রীতদাস দুর্গ থেকে পালিয়ে চলে এসে মুসলিমদের সঙ্গে যোগ দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিলেন। তারা মুসলিমদের সঙ্গে একযোগে তায়েফীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলো। তায়েফবাসীরা এবার বিচলিত হলো। এদিকে মুসলিমরা নব উদ্যমে আক্রমণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আক্রমণের অনুমতি দিলেন না।

ভয় দেখিয়ে তায়েফবাসীদের বিদ্রোহাচরণ হ'তে নিবারণ করাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য। নতুবা খায়বার বিজয়ী মুসলিম বীরগণের পক্ষে এই দুর্গটি অধিকার করে নেয়া কখনই অসাধ্য হতো না।

যা হোক দু'পক্ষকাল অবরোধের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উমারকে নির্দেশ দিলেন মুসলিম বাহিনীকে জানিয়ে দিতে যে, আল্লাহ চান তো আগামীকাল অবরোধ তুলে নিয়ে এখান থেকে আমরা ফিরে যাচ্ছি। হুকুম মত এ সংবাদ প্রচারিত হলো।

তায়েফ জয় না করেই ফিরে যাবার কথা শুনে মুসলিমগণ বলাবলি করতে লাগল, এ কী কথা! আমরা তায়েফ দুর্গ জয় না করেই ফিরে যাব? তারা আক্রমণ শুরু করার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম বাহিনীর উক্ত আলোচনার কথা শুনতে পেয়ে বললেন, বেশ! আগামীকাল আক্রমণ শুরু করে দাও। তাই করা হলো। ফলে মুসলিম বাহিনীর কিছু সংখ্যক লোক আহত হলেন। তারা দুর্গ জয়ের কিছুই করতে পারলেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনঃ ঘোষণা করে দিলেন, আমরা আগামীকাল ইনশাআল্লাহ এখান থেকে চলে যাচ্ছি। এবার কিন্তু কেউ অমত করলেন না। সকলেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। তারা ফিরে যাওয়ার

www.waytojannah.com

জন্য প্রস্তুত হলেন। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বিদায়ের দৃশ্য দেখে মুচকি হাসলেন। যখন সকলে রওয়ানা হলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা সবাই বল–

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

"আমরা ফিরে চলেছি- আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়ে এবং তাঁর আনুগত্য বরণ করে, আমরা প্রশংসা জ্ঞাপন করছি আমাদের প্রভু পরোয়াদিগারের।"

অবরোধ ত্যাগের সময় একদল লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তায়েফবাসীদের বিপক্ষে দু'আ করার আবেদন জানালে তিনি এই দু'আ করলেন– আল্লাহুম্মাহদি সাকীফা ওয়া আ'তি বিহিম

"হে আল্লাহ! সাকীফা গোত্রকে আপনি হিদায়াত করুন- সুপথে আসার সুমতি দিন, তাদেরকে আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার তাওফীক দিন!"

আল্লাহর কাছে এ দু'আ কিভাবে কবুল হয়েছিল আমরা তা কিছু পরেই জানতে পারব।

তায়েফ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'জি'আরানা' গেলেন। হুনাইনের যুদ্ধ বন্দীগণ এবং গনীমতের পশু এখানে সুরক্ষিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ধারণা ছিল হাওয়াযিন গোত্রের প্রধান পক্ষ তাঁর খিদমাতে হাযির হবে।

গনীমতের মাল বিতরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ 'জি'আরানায়' পৌঁছে কয়েক দিন অপেক্ষা করলেন। কিন্তু হাওয়াযিন গোত্রের কোন প্রতিনিধি দল তার খিদমাতে হাযির না হওয়ায় তিনি গনীমতের মাল বণ্টন করে দিতে বাধ্য হলেন। যারা 'মুআল্লাফাতুল কুলূব' (অর্থাৎ যারা সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের হৃদয় আকর্ষণের জন্য) তাদেরকেই বেশি করে দিলেন। ইসলামের বিরোধিতায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শত্রুতায় সর্বাধিক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণকারী– মিল্লাতে মুসলিমার ২১ বর্ষব্যাপী জানী দুশমন, নবদীক্ষিত মুসলিম– আবূ সুফ্ইয়ান ইবনু হরবকে দিলেন ৪০ উকিয়া রৌপ্য এবং একশতটি উট। আবূ সুফইয়ান এই পরিমাণ মালে গনীমত পেয়ে আরয করলেন– আর আমার ছেলে ইয়াযীদের জন্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকেও ৪০ উকিয়া রৌপ্য এবং একশতটি উট প্রদান করলেন। তারপরেও আবু সুফ্ইয়ান বললেন, আর আমার অপর পুত্র মু'আবিয়ার জন্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ মু'আবিয়াকেও সমপরিমাণ রৌপ্য এবং উট দেবার নির্দেশ প্রদান করলেন।

এভাবে হাকীম হিযামকে একশতটি উট দেয়া হলো। সে আরও একশত উট প্রার্থনা করায় তাও মঞ্জুর করা হলো। তারপর নযর ইবনু হারিসকে একশত, 'আলা ইবনু হারিসা সাকাফীকে পঞ্চাশ, (কোন কোন মতে একশত) আর আব্বাস ইবনু মিরদাসকে ৪০টি উট দেয়া হলো, পরে তাকে আরো ৬০টি উট দিয়ে একশত পূর্ণ করা হলো।

এভাবে মুয়াল্লাফাতুল কুলূবদের মধ্যে বিতরণ কার্য সম্পন্ন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাকি সমস্ত পশু হাযির করতে এবং সাধারণ মুসলিমদের উপস্থিত হতে বললেন। লোক এবং পশুর সংখ্যা হিসাব করে প্রত্যেককে ৪টি করে উট এবং ৪০টি করে ছাগল জাতীয় পশু দেয়া হলো। আর আশ্বারোহীদের দেয়া হল তার তিনগুণ বেশি। অর্থাৎ ১২টি করে উট এবং ১২০টি করে ছাগল জাতীয় পশু।

www.waytojannah.com

আনসারদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) রিওয়ায়াত করেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনি উদার হস্তে কুরাইশ এবং বেদুঈন কাবীলাসমূহের লোকদের ভিতর মালে গনীমত ভাগ করে দিলেন এবং আনসারদের ভাগে কিছুই পড়ল না তখন তারা অন্তরে ব্যথা অনুভব করলেন আর অন্তরের সেই ব্যথা তাদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ পেতে লাগল। কেউ কেউ বলেই ফেলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ এখন নিজের কওমের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে চললেন!

সা'দ ইবনু উবাদাহ আনসারী (রা) আনসারদের এ মনোভাব এবং বাক্যালাপ জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সে সম্পর্কে অবগত করার প্রয়োজন বোধ করলেন। তিনি তাঁর খিদমাতে হাযির হয়ে সমস্ত অবস্থা খুলে বললেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সা'দ! এ ব্যাপারে তুমি কোথায়? অর্থাৎ তোমার নিজস্ব প্রতিক্রিয়া কী? সা'দ (রা) বললেন, আমি আমার কওমের বহির্ভূত নই অর্থাৎ আমিও তাদের সঙ্গেই রয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, তাদের সকলকে একত্রিত কর, আমি আসছি।

তারা একত্রিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সমাবেশে তশরীফ নিয়ে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবিস্মরণীয় ভাষণ

তিনি প্রথমে আল্লাহ জাল্লাজালালুহুর প্রশস্তি বর্ণনা করলেন, তারপর তিনি আনসারদের সম্বোধন করে বললেন: হে আনসার! এ কী আলোচনা তোমরা করছ– যা আমার কানে এসে পৌঁছেছে! কী সে অভিযোগ যা আমার সম্বন্ধে তোমাদের মনে জেগেছে? এ কথা কি সত্য নয় যে, তোমরা ভ্রান্ত পথে চলেছিলে আর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে সঠিক পথে এনে দিয়েছেন? এও কি সত্য নয় যে, তোমরা হয়ে গিয়েছিলে দেউলিয়া- আর আল্লাহ আমার মধ্যস্থতায় তোমাদের ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছেন? এও কি সত্য নয় যে, তোমরা ছিলে নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষে পরস্পর শত্রু-ভাবাপন্ন, বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত আর আল্লাহ আমারই হাতে তোমাদের হৃদয়ের ছিন্ন সূত্রগুলোকে পুনঃ যুক্ত করে দিয়েছেন? ফলে তোমরা একের প্রতি অপরে হৃদ্যতায় সখ্যতায় হলে আকৃষ্ট?

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ক্ষণিকের জন্য খামোশ হলেন, তখন সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, আমাদের প্রতি আল্লাহ এবং রাসূলের অনুগ্রহ অফুরন্ত, অবদান অসংখ্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আমার প্রশ্নের সরাসরি জওয়াব দিচ্ছ না কেন? তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কী জওয়াব দেব? আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুগ্রহ ও নি'মাতের কথা বলে আমরা শেষ করতে পারব না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দেখ! তোমরা যদি বলতে এবং বললে তা সত্য কথাই বলা হতো আর আমিও তোমাদের প্রতিটি কথাকেই সত্য বলে মেনে নিতাম– যদি তোমরা বলতে পারতে, 'আপনাকে সবাই যখন মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করল- আর আপনি আমাদের মধ্যে আগমন করলেন তখন আমরা আপনাকে সত্য বলে বরণ করে নিলাম। কেউ ছিল না আপনার সাহায্যকারী– আমরাই আপনাকে সাহায্য করলাম। আপনাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হলে আমরাই আপনাকে আশ্রয় দিলাম। আপনি ছিলেন অভাবগ্রস্ত, আমরা আপনার অভাব দূর করে দিলাম।"

www.waytojannah.com

হে আনসার সমাজ! তোমরা এই সামান্য ব্যাপারেই হৃদয়ে দুঃখ পেলে যে, আমি কতক লোককে পার্থিব কিছু সামগ্রী দিয়ে তাদের হৃদয়কে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলাম আর তোমাদেরকে তোমাদের ইসলামের প্রতি অটল অবস্থার আস্থায় ছেড়ে দিলাম।

তোমরা কী এতে সুখী নও যে, কতক লোক ভেড়া বকরী আর উট নিয়ে বাড়ী যাচ্ছে আর তোমরা ফিরে চলেছ তোমাদের গৃহে আল্লাহর রাসূলকে সঙ্গে নিয়ে? কসম সেই মহান সত্তা যাঁর হাতে রয়েছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রাণ! তোমরা যে বস্তু নিয়ে ফিরে চলেছ সেই বস্তু তারা যেসব বস্তু নিয়ে যাচ্ছে তার চাইতে অনেক অনেক বেশি মূল্যবান, অনেক অনেক বেশি উৎকৃষ্ট!

যদি হিজরাত না হ'তো, তাহলে আমি নিজেকে আনসাররূপে পরিচয় দিতে গৌরববোধ করতাম। সমস্ত লোক যদি এক পথে চলে আর আনসাররা অন্য পথে, তা হলে আনসারদের পথই হবে আমার পথ। আনসাররা হচ্ছে মস্তিষ্ক আর সমুদয় লোক হচ্ছে বহিরাঙ্গ। তারপর তিনি প্রার্থনা করলেন–

اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الأَنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ.

"হে আল্লাহ! তুমি আনসারদের উপর রহম কর, তাদের সন্তান-সন্ততির উপর রহম কর, তাদের সন্তানদের সন্তান-সন্ততির উপর রহম কর।"

আন্তরিকতায় ভরপুর এই হৃদয়স্পর্শী ভাষণ আনসারদের অন্তরদেশকে গভীরভাবে আলোড়িত ও বিগলিত করে দিল। আবেগে আনন্দে তাঁরা কাঁদতে লাগল, এত কান্না তাঁরা কাঁদল যে, অশ্রুধারায় তাঁদের দাড়িগুলো সিক্ত হলো। তারা চিৎকার দিয়ে বলে উঠল– রাযীনা বি-রাসূলিল্লাহি ﷺ কাসমান ও হায্যান।

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমাদের অংশে লাভ করে আমরা খুশী হয়ে গেলাম-আমরা ধন্য হলাম। (আমাদের আর কিছুরই প্রয়োজন নেই)"

দুধ-ভগ্নি শাইমার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যবহার

হাওয়াযিন গোত্রের নারী পুরুষ বন্দী দলের মধ্যে শাইমা বিনতি হারিস নামে এক মহিলাও ছিলেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাযির হয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি আপনার দুধ-ভগ্নি (হালিমার কন্যা)!

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে তাকে চিনতে পারলেন না। পরে পরিচয় চিহ্ন পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে যখন তিনি চিনে ফেললেন, তখন তার সম্মানে তাঁর নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন, কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন এবং তার প্রতি উত্তম ব্যবহার করলেন। বললেন, যদি আমার সঙ্গে থাকা শ্রেয় মনে করো তবে তাই হবে উত্তম! আর যদি ফিরে যেতে চাও, তা হলে সে ইচ্ছাও পূরণ করা হবে। তিনি নিজ কওমের কাছে ফিরেই যেতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সসম্মানে তার কওমের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

হাওয়াযিন প্রতিনিধি দলের আগমন

অতঃপর ১৪ সদস্যের এক হাওয়াযিন প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাজির হলো। তারা তাদের ধৃত বন্দী এবং মাল ফিরে পাবার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুগ্রহ কামনা করল।

www.waytojannah.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তোমাদের প্রত্যাশাই করছিলাম! আমি তোমাদের প্রতীক্ষায় থেকে- দু' সপ্তাহের বেশি সময় গণিমতের মাল ও যুদ্ধ বন্দীদের ভাগ বন্টন বিলম্বিত করেছিলাম। কিন্তু এখন তো গনীমতের মাল বন্টন হয়ে গেছে! রয়েছে শুধু বন্দীরা।

যা হোক, তোমরা কাল ফজরের সালাতের পর এসো। এসে সব মুসলিমদের সামনে তোমরা প্রার্থনা জানাও।

সেই সময়েই তারা এলো এবং তাদের প্রার্থনা পেশ করল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি আমার নিজের এবং আবদুল মুত্তালিব গোত্রের লোকদের ভাগে প্রাপ্য বন্দীদের ছেড়ে দিলাম।

এই দেখে আনসার এবং মুহাজিররা বলে উঠলেন– আমাদের ভাগে যা প্রাপ্য তার সমস্তই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর। অর্থাৎ সে সব ছেড়ে দেয়া না দেয়া তাঁরই এখতিয়ারভুক্ত। ফলতঃ তারাও ছেড়ে দিল।

কিন্তু অন্যান্যরা ভাবল, এ কেমন ব্যাপার। যুদ্ধ জয় করে বন্দীদের লাভ করেছি- এমনিতেই ছেড়ে দেব? বানী তামীম, বানী ফাযারা: বানী সলিম প্রভৃতি তাদের অংশে প্রাপ্য কয়েদীদের বিনা পণে ছাড়তে রাযী হলো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ডাকলেন। বললেন, প্রত্যেক কয়েদীর বিনিময়ে ৬টি করে উট। তিনি সে সব আদায় করে দিলেন এবং এভাবে ৬ হাজার বন্দী নর-নারী মুক্তি লাভ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায়ের সময় প্রত্যেক বন্দীকে একটি করে বস্ত্র প্রদান করলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কায় উমরা পালন করে মাদীনায় ফিরে এলেন অষ্টম হিজরীর শেষের দিকে।

নবম হিজরীর শুরুতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরবের বিভিন্ন দিকে যাকাত ও সদাকাহ আদায়ের জন্য বিভিন্ন লোককে দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন গোত্র ও কবীলার নিকট প্রেরণ করলেন। এছাড়া কয়েকটি ছোটখাট অভিযানও এদিকে সেদিকে প্রেরণ করতে হয়।

গাজওয়ায়ে তাবুক বা তাবুকের অভিযান

নবম হিজরীর ৭ম মাস রজবুল মুরাজ্জব। সিরিয়া থেকে একটি কাফেলা মাদীনায় ফিরে এলো। তারা খবর দিল, রোমকরা সিরিয়ায় বিপুল সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছে। তারা এক বৎসরের প্রয়োজনীয় সমস্ত রসদপত্র যোগাড় করে ফেলেছে। আরব সীমান্তের লাখম, জুযাম, আমিলা এবং গাস্সান প্রভৃতি খৃষ্টান গোত্রসমূহও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অগ্রবর্তী বাহিনী মার্চ করে 'বালকা' পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মূতার যুদ্ধে লজ্জাকর পরাজয়ের বদলা নেবার জন্য রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস এবার যেন বদ্ধপরিকর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ অবস্থার নাজুকতা ও ভয়াবহতা উপলব্ধি করলেন। একটি বিরাট দুশমন বাহিনী তার বিপুল শক্তি নিয়ে ইসলামের কেন্দ্র মাদীনা আক্রমণ করতে আসছে। তখনকার অর্ধ পৃথিবীর অধিশ্বর হচ্ছে রোম সম্রাট। প্রতিদ্বন্দ্বী পারস্য সম্রাটের উপর সদ্য বিজয় লাভ করে তার সাহস ও রণ পিপাসা আরও বর্ধিত হয়েছে।

শক্তি গর্বিত এই বিরাট বাহিনীকে আরবের সর-যমীনে ঢুকতে দেয়া চলে না। আরব সীমান্তে প্রবেশের পূর্বেই বাধা দিতে হবে।

সময়টি ছিল অত্যন্ত অভাব অনটনের; প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থাই বলা চলে। বিপুল অস্ত্রসজ্জিত রোমক বাহিনীর মুকাবেলা করার মত হাতিয়ার ও সাজ-সরঞ্জাম মুসলিমদের হাতে ছিল না। দূর দারাজের রাস্তা। পথও কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কন্টকাকীর্ণ ও বন্ধুর। গরমের মৌসুম, আবহাওয়া অত্যন্ত গরম, আরবের স্বাভাবিক গরম এবার আরও অধিকতর গরম। নিদাঘতপ্ত বালুকা ও কংকরময় রাস্তায় চলা এই দুঃসহ গরমে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

এদিকে মাদীনার বৃক্ষসমূহের ফল ও শস্য পাকার সময় হয়ে এসেছে। লোকেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন ফল ফসল ঘরে তুলবে, আর বৃক্ষের ছায়ায় আরাম করবে।

এমন সময় হুকুম হলো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। নাবী ﷺ সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য লোকদের নিকট সাধ্যমত দান খায়রাতের আবেদন জানালেন। সকলেই অন্তর দিয়ে বিপুলভাবেই সাড়া দিলেন। সব চাইতে বেশি দান করলেন 'উসমান (রা)। তিনি দিলেন সাজ ও সামানসহ তিনশত উট এবং এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

সরাসরি হাদীস গ্রন্থ থেকে এ দানের বিবরণ পেশ করছি। 'আবদুর রহমান ইবনু খাব্বাব বলেন:

তাবূক অভিযানের প্রাক্কালে অভাব অনটনের সেই কঠিন সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন যুদ্ধের খরচ নির্বাহ ও সাজ-সরঞ্জামের জন্য আল্লাহর পথে দান খায়রাতের প্রতি লোকদের উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করছিলেন আমি তখন সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'উসমান দণ্ডায়মান হলেন। দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নামে (ধরুন) সাজ ও সামানসহ আল্লাহর রাহে একশত উট! রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও উৎসাহ দিলেন- ফলে 'উসমান বললেন: আমার নামে সাজ ও সামানসহ আল্লাহর পথে দুইশত উট। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও উৎসাহ দিলেন, ফলে 'উসমান বললেন, আমার নামে ফী সাবীলিল্লাহ সাজ ও সামানসহ তিনশত উট। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বর থেকে নেমে অত্যন্ত খুশীর সঙ্গে বললেন, এরপর 'উসমান যে 'আমালই করুক কিছুই তার বিরুদ্ধে যাবে না– তার গুনাহ খাতা সবই এ 'আমালের দ্বারা কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

www.waytojannah.com

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে, 'আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'উসমান এক হাজার দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) সহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করে দু'বার এই কথা বললেন, 'উসমান আজকের দিনে যা 'আমাল করল তার বদলায় কোন ক্ষতি তাকে স্পর্শ করবে না।

নিম্নলিখিত হাদীস থেকে 'উমার (রা) এবং আবূ বাক্র (রা)-এর রাসূল অনুবর্তিতা ও ইসলাম-প্রিয়তার পরিমাপ করা যাবে।

'উমার (রা) বলছেন: তাবূকের অভিযানের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দান খয়রাতের নির্দেশ প্রদান করলেন, তখন আমি মনে মনে স্থির করলাম কোন নেক কাজেই আবূ বাক্রকে পরাভূত করতে পারি না। এবার আমি তার অগ্রগামী হবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবেদনের পর বাড়ি গিয়ে ধন ও সম্পদের অর্ধেক নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাযির হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ? আমি বললাম, যা এখানে এনেছি ঠিক তার সমপরিমাণ রেখে এসেছি।

তারপর আবূ বাক্র (রা) আসলেন। তিনি ঘরে যা কিছু ছিল, সমস্তই সঙ্গে নিয়ে এসেছেন- কিছুই রেখে আসেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ সব দেখে বললেন, ইয়া আবা বাক্র! তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ? তিনি জওয়াবে বললেন, তাদের জন্য রেখে এসেছি আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসা এবং রাসূলের প্রতি অনুরাগই আমার এবং আমার পরিবারের সম্বল। 'উমার (রা) বলছেন, এরপর ভবিষ্যতে আর কখনই আবূ বাক্রের অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা আমি করিনি।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন।

এ উপলক্ষে 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ প্রদান করেন ৪০ হাজার দিরহাম।

নিঃসম্বল লোকেরাও পিছিয়ে থাকেননি। যার ঘরে যা ছিল তাই সাধ্যমত এনে দিয়েছে। আবূ আফিল আনসারীর ঘরে কিছুই ছিল না। সে দু'সের খুরমা এনে নাবী ﷺ-এর খিদমাতে পেশ করল, আর বলল সারা রাত একটি ক্ষেতে পানি সিঞ্চন করে পারিশ্রমিক স্বরূপ চার সের খুরমা পেয়েছিলাম। দু'সের বিবি বাচ্চার জন্য রেখে বাকি দু'সের নিয়ে এসেছি। নাবী ﷺ নির্দেশ দিলেন, এই খুরমা দু'সেরও নিয়ে অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে মিশিয়ে রাখ।

মোট কথা মাদীনার ছোট বড় সব মুসলিম অকপট হৃদয়ে এবং মুক্ত হস্তে দান করলেন। কেবল ৮২ জন নামে মুসলিম- কিন্তু আসলে কপটাচারী-মুনাফিক ঘরে বসে রইল। প্রসিদ্ধ মুনাফিক নেতা 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই এদের সান্ত্বনা দিয়ে বলে চলল: এবার মহাশক্তিশালী রোমক সম্রাটের শক্ত পাল্লায় পড়ে মুহাম্মাদ ﷺ এবং তার সাথীরা ফিরে আসতে পারবে না। তোমরা দেখে নিও রোমের কায়সার তাদের বন্দী ক'রে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে পাঠিয়ে দেবে।

তারা মুসলিমদের নানাভাবে নিরুৎসাহিত করার জন্য নানা কথা বলে বেড়াতে লাগল। এক পর্যায়ে বলল, এই অসহ্য গরম, এর মধ্যে কি অভিযানে বের হওয়া চলে? যেয়ো না যেয়ো না। এর জওয়াবে কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হলো:

وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ.

"তারা বলে এই গরমে অভিযানে বের হয়ো না, (হে রাসূল!) আপনি বলে দিন জাহান্নামের আগুন এর চাইতে অনেক বেশী গরম- অতীব ভয়ংকর। আহ! যদি তাদের বুদ্ধি থাকত। (সূরা তাওবাহ: ৮১)

www.waytojannah.com

মুনাফিকদের সংখ্যা ছিল ৮২ জন যারা মিথ্যা ওযর বাহানায় মাদীনায় রয়ে গেল। এদের নেতা ছিল 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই। আর খাঁটি মুসলিমদের মধ্যে- যাই যাচ্ছি করে ৩ জন পিছনে পড়ে রইলেন, তারা এ অভিযানে আর শামিল হতে পারলেন না। এরা হচ্ছেন কা'ব ইবনু মালিক, হিলাল ইবনু উমাইয়া এবং মুরারা ইবনু রাবী'। এদের গাফলতির জন্য যথেষ্ট ফলভোগ করতে হয়েছিল। সে কথা পরে আসছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনার শাসন কার্যের জন্য তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে গেলেন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ আল-আনসারীকে– কোন কোন মতে সাবি' ইবনু উরফূতাতাকে। আর 'আলী (রা)-কে মাদীনায় রেখে ভার দিয়ে গেলেন রাসূল-পরিবারকে দেখাশুনার জন্য।

মাদীনা এবং আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মুজাহিদীনের মোট সংখ্যা হলো ৪০ হাজার। এর মধ্যে ৩০ হাজার পদাতিক আর ১০ হাজার সওয়ারী অশ্বারোহী অথবা উষ্ট্রারোহী।

প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে দুর্গম পথে এই অভিযাত্রীদের যেরূপ কষ্ট করতে হয়েছিল, উপযুক্ত আহার্য বস্তু এবং পানির অভাবেও তাদের তেমনি দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। কোন কোন স্থলে খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা খেয়েও মুজাহিদদের ক্ষুণ্নিবৃত্তি করতে হয়েছিল। অনেক স্থানে মোটেই কোন পানির সন্ধান পাওয়া যায়নি। ফলে উটের সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক উট জবাই করে তাদের পাকস্থলী হতে সঞ্চিত পানি বের করে আল্লাহর পথে বহির্গত সৈনিকদের তৃষ্ণা নিবারণের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে পথের সমস্ত কষ্ট তারা হৃষ্ট মনে সহ্য করে মনযিল মকসূদের দিকে এগিয়ে চললেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন 'জুরফ' নামক স্থানে পৌছলেন তখন সেখানে 'আলী (রা) তার সঙ্গে মিলিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে তিনি এই সুযারিশ পেশ করলেন যে, মুনাফিকরা তাঁকে বিভিন্নভাবে বিদ্রূপ করতে থাকায় তাঁর আত্মসম্মানে প্রচণ্ড আঘাত লাগে, ফলে যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশে তিনি চলে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার এই কৈফিয়তে খুশী হতে পারলেন না। তিনি বললেন, তারা যাই বলুক আমি তোমাকে রেখে এসেছি আমার এবং তোমার পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধানের জন্য। তোমার চলে আসা ঠিক হয়নি। তুমি ফিরে যাও আর যে দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়েছে গিয়ে তাই পালন কর। অবশেষে তাঁকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন–

মূসার মুকাবেলায় হারূনের যে পদমর্যাদা ছিল, তুমি আমার মুকাবেলায় সেই পদমর্যাদা পেয়ে কি সন্তুষ্ট নও– যদিও আমার পর আর কোন নাবী নেই?

এরপর 'আলী (রা) হৃষ্টমনে মাদীনায় ফিরে এলেন এবং তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে চললেন।

একটি অবিস্মরণীয় ভাষণ

বায়হাকী দালায়িলুন নাবুওয়াহ গ্রন্থে এবং হাকিম 'উক্‌বাহ ইবনু 'আমির (রা) হতে রিওয়ায়াত করেছেন- তিনি বলেন: আমরা তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মনযিলে অবতরণ করলেন। সেখানে রাত্রি কাটালেন। কিন্তু ফাজ্‌রের সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং অপর কারোরই ঘুম ভাঙ্গল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই প্রথম জাগলেন– কিন্তু তখন পূর্ব দিগন্তে সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উঁচুতে উঠে গেছে।

www.waytojannah.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা)-কে ডেকে বললেন, হে বিলাল! তোমাকে না বলেছিলাম আমাদের ফাজ্‌রের জন্য জাগিয়ে দিতে? বিলাল আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে ঘুম আপনাকে অচেতন রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিল সেই ঘুমই আমাকেও সেখানেই নিয়ে রেখেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই মনযিল ত্যাগ করে অদূরে একস্থানে অবতরণ করে ফাজ্‌রের সালাত সম্পন্ন করলেন। তারপর দিনের অবশিষ্ট সময় এবং রাত্রিভর চলে ভোরের দিকে তাবূকে গিয়ে পৌছলেন। সেখানে পৌছে আল্লাহর যথাসম্ভব প্রশংসাগীতির পর এক সুদীর্ঘ অনন্যসুলভ এক অবিস্মরণীয় ভাষণ দিলেন।

তাতে তিনি বললেন:

সব কথার সেরা সত্য কথা– আল্লাহর কিতাব।	أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله
সবচেয়ে বড় ভরসার বস্তু– কালিমায়ে তাক্‌ওয়া- আল্লাহর ভীতি ও সংযমশীলতা।	وأوثق العرى كلمة التقوى
সবচেয়ে উত্তম মিল্লাত– ইব্‌রাহীম (আ)-এর মিল্লাত।	وخير الملل ملة إبراهيم
সব পথের শ্রেষ্ঠ পথ– মুহাম্মাদ ﷺ অনুসৃত ও প্রদর্শিত পথ।	وخير السنن سنة محمد
সব চাইতে উত্তম কথা– আল্লাহর যিক্‌র আযকার।	وأشرف الحديث ذكر الله
সব চাইতে সুন্দর বৃত্তান্ত– এই কুরআন।	وأحسن القصص هذا القرآن
সব চাইতে উত্তম কাজ– সেই কাজ যার পশ্চাতে থাকে দৃঢ়সংকল্প।	وخير الأمور عوازمها
সব চাইতে নিকৃষ্ট কাজ বিদ'আতী কাজ– এমন কাজ যা নেকীর আশায় করা হয়, অথচ শারী'আতে তার কোন প্রমাণ নেই।	وشر الأمور محدثاتها
সব চাইতে উত্তম আদর্শ নাবীগণের আদর্শ।	وأحسن الهدي هدي الأنبياء
সব চাইতে সম্ভ্রান্ত মৃত্যু– শহীদদের মৃত্যু।	وأشرف الموت قتل الشهداء
ঘোরতম অন্ধত্ব হচ্ছে– হিদায়াতের পর গোমরাহী- পথের সন্ধান লাভের পর ভ্রষ্টতা।	وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى
শ্রেষ্ঠ 'আমাল হচ্ছে– সেই 'আমাল যা কল্যাণবহ।	وخير الأعمال ما نفع
শ্রেষ্ঠপথ– সেই পথ যা অনুসরণযোগ্য- যে পথে মানুষ চলতে সক্ষম।	وخير الهدى ما اتبع
নিকৃষ্টতম অন্ধত্ব হৃদয়ের অন্ধত্ব।	وشر العمى عمى القلب
উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম অর্থাৎ যে হাত দান করে তা শ্রেষ্ঠ সেই হাত অপেক্ষা যা গ্রহণ করে।	واليد العليا خير من اليد السفلى
যে বস্তু কম অথচ সকলের প্রয়োজন মিটায় তা সেই বস্তু হতে উত্তম যা বেশি অথচ অপব্যবহারে কম পড়ে যায়।	وما قل وكفى خير مما كثر وألهى
অতি নিকৃষ্ট সেই তাওবাহ– যা করা হয় তখন, মৃত্যু উপস্থিত হয়ে ঘাড়ের উপর সওয়ার হয় যখন।	وشر المعذرة حين يحضر الموت
সবচেয়ে ব্যর্থ অনুশোচনা– কিয়ামাত দিবসের অনুশোচনা।	وشر الندامة يوم القيامة
মানুষের মাঝে কতক লোক এমন আছে– যারা জুমু'আয় আসে (দেহ নিয়ে) কিন্তু তাদের হৃদয় থাকে পশ্চাতে পড়ে।	ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا
তাদের মধ্যে এমন লোক আছে– যারা অতি অল্প সময়ই আল্লাহর স্মরণ করে থাকে।	ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا

www.waytojannah.com

সবচেয়ে বড় গুনাহ- মিথ্যা কথা।	ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب
সর্বোত্তম ঐশ্বর্য- হৃদয়ের ঐশ্বর্য।	وخير الغنى غنى النفس
সবচেয়ে উত্তম পাথেয়- আল্লাহভীতি। সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমত্তার কাজ হলো হৃদয়ে আল্লাহ ভয়-ভীতি পোষণ করা।	وخير الزاد التقوى ورأس الحكم مخافة الله عز وجل
হৃদয়ের মাঝে দৃঢ় ও স্থায়ীভাবে ধরে রাখার উৎকৃষ্ট বস্তু হচ্ছে- ইয়াকীন তথা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস।	وخير ما وقر فى القلوب اليقين
সন্দেহ-সন্দিগ্ধতা কুফরের একটি শাখা।	والارتياب من الكفر
মৃত ব্যক্তির জন্য চিল্লিয়ে বিলাপ করা- জাহিলী যুগের কাজ।	والنياحة من عمل الجاهلية
আমানাতী মালে খিয়ানতকরণ- জাহান্নামের তাপ গ্রহণ।	والغلول من جثا جهنم
(অবাঞ্ছিত) কবিতা- ইবলিসের কর্মকাণ্ড।	والشعر من إبليس
মাদকদ্রব্য গ্রহণে মাতাল হওয়া মানে- অগ্নিতে পতিত হওয়া।	والسكر كي من النار
মদ্যপান সমুদয় পাপের উৎস।	والخمر جماع الإثم
ইয়াতীমের ধন আত্মসাৎকরণ সর্বনিকৃষ্ট কাজ আর সর্বনিকৃষ্ট আহার ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ।	وشر المأكل مال اليتيم
ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি- যে অপরের নিকট হতে নাসীহত গ্রহণ করে।	والسعيد من وعظ بغيره
প্রকৃত দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি- যে মাতৃগর্ভেই হতভাগ্য।	والشقي من شقي في بطن أمه
তোমাদের কেউ পতিত হবে চার হাত জায়গায় আর তার কাজ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে কিয়ামত দিবসে।	وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع والأمر إلى الآخرة
সর্বোত্তম 'আমল ব্যক্তির সর্বশেষ 'আমল।	وملاك العمل خواتمه
নিকৃষ্ট স্বপ্ন হচ্ছে- মিথ্যা স্বপ্ন।	وشر الرؤيا رؤيا الكذب
যা ঘটবার- তা শীঘ্রই ঘটবে।	وكل ما هو آت قريب
মু'মিনকে গালি দেয়া- ফাসিকী কাজ।	وسباب المؤمن فسوق
মু'মিনকে হত্যা করা- কুফরী কাজ।	وقتاله كفر
মু'মিনের গীবাত করা আল্লাহর নাফরমানীর অন্তর্ভুক্ত।	وأكل لحمه من معصية الله
(অন্যায়ভাবে) মু'মিনের মাল গ্রহণ সেরূপই হারাম- যেমন হারাম তার খুন গ্রহণ (হত্যাকরণ)।	وحرمة ماله كحرمة دمه
যে ব্যক্তি আল্লাহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়- আল্লাহ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন।	ومن يتألى على الله يكذبه
যে কাউকে ক্ষমা করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।	ومن يغفر يغفر له
যে ব্যক্তি অপরকে ক্ষমা করে দেয়- আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।	ومن يعف يعف الله عنه
যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে- আল্লাহ তার প্রতিদান দিয়ে থাকেন।	ومن يكظم الغيظ يأجره الله
যে ব্যক্তি তার ক্ষতির জন্য ধৈর্য ধারণ করে- আল্লাহ তাকে তার বদলা দেন।	ومن يصبر على الرزية يعوضه الله
যে ব্যক্তি নিজের খ্যাতি চায় আল্লাহ তার খ্যাতিকে মানুষের মাঝে ব্যাপক করে দেন (কিন্তু এ খ্যাতির কারণে পরকালে সাওয়াব পাবে না)।	ومن يبتغ السمعة يسمع الله به

www.waytojannah.com

যে ব্যক্তি (বিপদাপদে ও শোকে দুঃখে) ধৈর্য ধারণ করে– আল্লাহ তার শক্তি ও মান মর্যাদা বর্ধিত করেন।	ومن يتصبر يضعف الله له
যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করে– আল্লাহ তাকে শাস্তি প্রদান করেন।	ومن يعص الله يعذبه الله

অতঃপর তিনি ﷺ তিন বার 'আসতাগফিরুল্লাহ' পাঠ করেন।

তাবূকে অবস্থিতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূক নামক স্থানে পৌছে শিবির সংস্থাপন করলেন। তিনি সেখানে ১৩ দিন কিংবা আরও কিছু বেশী সময় অবস্থান করলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষের কোন তৎপরতার সন্ধান পেলেন না।

রোমক সম্রাট মুসলিম বাহিনীর সংখ্যার আধিক্য এবং প্রস্তুতির বিপুলতার কথা জানতে পেরে মুকাবেলার জন্য এগিয়ে আসা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন না। এ অবস্থায় স্থানীয় খৃষ্টানগণ যারা রোমক সম্রাটের বলে নিজেদের বলীয়ান মনে করেছিল তারা হতোদ্যম হয়ে গেল!

তাদের প্রতিনিধিরূপে আইলাহ্‌র সরদার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাযির হয়ে সন্ধির প্রার্থনা জানাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন– খৃষ্টানরা জিয্‌য়া দেবার প্রতিশ্রুতি দিল, ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে তাদের "আমানত লিপি" লিখে দিলেন:

বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম

এটি হচ্ছে একটি নিরাপত্তা-লিপি যাতে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর তরফ থেকে ইউহান্না ইবনু রাওয়া এবং তাঁর কওম আইলাহ্‌র অধিবাসীর জন্য দেয়া হচ্ছে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। আইলাহ্‌র অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের সহযোগী সিরিয়া, ইয়ামান ও বাহরাইনের অধিবাসীরাও জলে, স্থলে- নৌকায় আর কাফেলায় যে অবস্থায় থাকুক আল্লাহ এবং তার রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর আশ্রিত হয়ে থাকবে। কিন্তু তারা যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটায় এবং তাদের অঙ্গীকারের কোন খেলাফ কাজ করে তবে তাদের জান এবং মালের হিফাযাতের দায়িত্ব থেকে আল্লাহর রাসূল ﷺ মুক্ত।"

প্রত্যাবর্তন পথে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনায় ফিরে আসার সঙ্কল্প করলেন। পথে কতিপয় মুনাফিক ছদ্মবেশ ধারণ করে এক পাহাড়ী ঘাঁটিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলা দেয়ার ষড়যন্ত্র আঁটে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর প্রিয় নাবীকে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে দেন এবং তিনি অন্য পথ দিয়ে বের হয়ে আসেন। কুরআন মাজীদে এই ঘটনার প্রতিই ইশারা করা হয়েছে- এভাবে: وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا "তারা সঙ্কল্প করেছিল (একটি অপকর্মের) যা তারা কাজে পরিণত করতে সক্ষম হয়নি।" (সূরা আত্‌-তাওবাহ ৯: ৭৪)

এই ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল আবূ 'আমির নামীয় এক খৃষ্টান। সে ছিল প্রথমে মাদীনায়, এখান থেকে বিদায় নিয়ে মাক্কার কুরাইশদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং উহূদ যুদ্ধে তাদের সঙ্গে শারীক হয়। ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতায় তার জুড়ি ছিল না। মাক্কা বিজয়ের পর সে তায়িফে এসে আশ্রয় নেয়, তায়িফ থেকে সে সিরিয়ায় চলে যায়। সেখানে থেকেই সে মাদীনার মুনাফিকদের উস্কানি দিয়ে চলে।

www.waytojannah.com

মাসজিদে যিরার

মুনাফিকদেরকে একটি মাসজিদ তৈরী করার দুষ্ট বুদ্ধি সেই আবূ 'আমিরই প্রদান করে। ইবনু 'আব্বাস রিওয়ায়াত করেছেন যে, আবূ 'আমির মুনাফিকদের এই পরামর্শ দেয়:

"তোমরা নিজেদের জন্য একটা মাসজিদ বানাও এবং যতটা তোমাদের সাধ্যে কুলায় লোক-লস্কর এবং অস্ত্রশস্ত্র জমা করে রাখো। আমি রোমক সম্রাটের দরবারে হাযির হয়ে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসছি। আমি মুহাম্মাদ ও তাঁর সহচরদের (মাদীনা থেকে) বের করে দেব।"

তার পরামর্শ মত মাসজিদ তৈরী হয়ে যায়। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাযির হয়ে আরযি পেশ করে– হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে যারা রুগ্ন এবং অভাবগ্রস্ত তাদের এবং বৃষ্টিবাদল ও প্রয়োজনীয় কাজের সময় অন্যান্যদের পক্ষে দূরবর্তী কুবা মাসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে অসুবিধা হয়। এজন্য আমাদের সুবিধামত স্থানে একটা মাসজিদ তৈরী করেছি। আপনি মেহেরবানী করে সেখানে তাশরীফ নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে আসলে আমাদের জন্য খুবই বারাকাতের কারণ হয়।"

সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সরল বিশ্বাসে জওয়াব দিয়েছিলেন, "আমি তো এখন অভিযানে বের হচ্ছি- ঘোড়ার রেকাবে এখন পা রাখব, কাজেই এখন মোটেই সময় হচ্ছে না। ফিরে আসার পর স্মরণ করিয়ে দেবে। আল্লাহর যদি মর্জি হয় তবে তোমাদের মাসজিদে সালাত আদায় করে দিয়ে আসব।"

তাবূক থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনার কাছাকাছি 'যি-আওয়ানা' নামক স্থানে পৌছলে আসমান থেকে এই ওয়াহী নাযিল হয় এবং উক্ত তথাকথিত মাসজিদ সম্পর্কে নাবী ﷺ-কে সতর্ক করে দেয়া হয়:

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيْقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنٰى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ – لاَ تَقُمْ فِيْهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ.

"এবং যেসব লোক একটি (নতুন) মাসজিদ বানিয়েছে জিদের বশবর্তী হয়ে (অথবা ক্ষতি করার উদ্দেশে) এবং বিদ্রোহের উপর, আর মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ ঘটানোর মতলবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে সেই ব্যক্তির জন্য গুপ্ত ঘাঁটি বানাবার ফিকিরে, আর দেখো! নিশ্চয় তারা কসম খেয়ে বলবে- আমরা তো ভাল বৈ মন্দ কিছু করতে চাইনি, কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা নিশ্চিত মিথ্যাবাদী – সুতরাং আপনি সেখানে কিছুতেই দণ্ডায়মান হবেন না, নিশ্চয় যে মাসজিদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরহেযগারীর উপর প্রথম দিবস থেকেই, তাতে দণ্ডায়মান হওয়াই আপনার পক্ষে সর্বতোভাবে কর্তব্য। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে যারা কায়মনোবাক্যে পবিত্র থাকতেই পছন্দ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ পছন্দ করেন পাকসাফ– শুদ্ধবুদ্ধ লোকদেরকে।" (সূরা: আত্-তাওবাহ: ১০৭-১০৮)

এই ওয়াহী প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মালিক ইবনু দুখশাম এবং মা'আন ইবনু 'আদী আল-আজলানীকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা গিয়ে মাসজিদটিকে ধ্বসিয়ে দেবে এবং আগুনে জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তারা গিয়ে তাই করলেন। মাসজিদ যারা তৈরী করেছিল, তারা ভয়ে এদিক সেদিকে পালিয়ে আত্মগোপন করে।

www.waytojannah.com

মাদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যর্থনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাদীনার উপকণ্ঠে পৌছলেন তখন সংবাদ পেয়ে মাদীনায় অবস্থানরত নারী-পুরুষ বালকবৃদ্ধ সবাই তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য শহর থেকে বহির্গত হলেন।

তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অভিনন্দন জানিয়ে এই শ্লোক আবৃত্তি করলেন:

طلع البدرعلينا ... من ثنيات الوداع

وجب الشكرعلينا ... ما دعا لله داعي

অর্থ: পূর্ণচন্দ্র আমাদের উপর উদিত হয়েছে-

সানীয়াতুল ওয়াদা'অ থেকে (তিনি বিজয়ী বেশে ফিরে এসেছেন)

এজন্য আল্লাহর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ওয়াজিব হয়ে পড়েছে-

যতদিন আহ্বানকারী আল্লাহকে আহ্বান করতে থাকবে, অর্থাৎ চিরদিনের জন্য।

এ কবিতা পংক্তি সম্পর্কে কোন কোন রাবী ভুল করে বসেছেন। তারা তাদের রিওয়ায়াতে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাক্কা থেকে হিজরাত করে মাদীনা শুভাগমন করেন তখন এটা গাওয়া হয়। এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। কারণ এখানে 'সানিয়াতিল ওয়াদাঅ'-এর উল্লেখ হয়েছে, আর সানিয়াতিল ওয়াদাঅ' মাদীনা থেকে সিরিয়ার দিকে অবস্থিত একটি স্থান, এটা মাক্কা থেকে মাদীনায় আসার পথে অবস্থিত নয়।

মাদীনার মাসজিদে মুনাফিকদের কৈফিয়ত গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চিরাচরিত নিয়মমাফিক মাদীনায় প্রবেশ করে সর্বপ্রথম মাসজিদে-নাববীতে তাশরীফ রাখেন। তিনি সেখানে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন, তারপর লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের জন্য বসলেন। যারা তাবূক অভিযানে শরীক হয়নি, সেই সব লোক (মুনাফিকের দল- যারা ভেবেছিল রোমক সম্রাটের সঙ্গে মুকাবেলায় পরাস্ত হয়ে মুহাম্মাদ ﷺ বন্দীদশায় কোন দূরবর্তী দ্বীপে নির্বাসিত হবেন) একে একে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে এসে হাযির হতে লাগল এবং যুদ্ধে যোগদান করতে না পারার জন্য একেক জন একেক ওযর পেশ করতে লাগল। তারা তাদের ওযরকে জোরদার করার জন্য কসমও কাটতে লাগল। এদের সংখ্যা ছিল ৮৩। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মুখের ঘোষণা অনুসারেই তাদের কৈফিয়ত গ্রহণ করলেন, এমনকি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে মার্জনাও চাইলেন আর তাদের দিলের মু'আমিলা-মনের আসল খবরের দায়-দায়িত্ব আল্লাহর হাওলায় ছেড়ে দিলেন।

কা'ব ইবনু মালিকের ঘটনা: মুসলিম বান্দার অগ্নিপরীক্ষা

এরপর কা'ব ইবনু মালিক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে গেলেন। (কা'ব ছিলেন আল্লাহর এক অকপট বান্দা, একজন খাঁটি মুসলিম। তিনি ছিলেন মাদীনার 'সাবিকূনাল আওয়ালুন' যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ সূরা ওয়াকি'আয় 'উলায়িকাল্ মুকাররাবূন' বলে সম্মানিত করেছেন। অর্থাৎ অগ্রবর্তী দল যারা ইসলামের প্রাথমিক সংকট যুগে তা বরণ করে তা লালন পালন করেছেন, এজন্য অশেষ দুঃখ-কষ্ট বরণ করেছেন, অতুল্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন আর সেজন্যই আল্লাহ তাদেরকে তাঁর অতিশয় নৈকট্যপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি ছিলেন সেই ৭৩ জনের অন্যতম যারা মাক্কার নিকটবর্তী

www.waytojannah.com

'উক্‌বার দ্বিতীয় বায়'আতে দীন ইসলামের হিফাযাত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি ইসলামের বিশিষ্ট কবিদেরও অন্যতম ছিলেন।)

তাবূক অভিযানে তিনি শারীক হতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসার পর লাজ নম্র হৃদয়ে ইতস্ত ত পদক্ষেপে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর খিদমাতে সালাম পেশ করলেন, রাসূল ﷺ তখন মুচকি হাসলেন। সে হাসিতে ছিল ক্রোধের আভা।

কেন? ৮৩ জন মুনাফিকের কৈফিয়ত বিনা বাক্যে তিনি গ্রহণ করলেন, আর একজন খাঁটি মুসলিমের প্রতি তাঁর কেন এই ক্রোধমিশ্রিত হাসি? কেন এই রক্তাভ দৃষ্টি?

এর জওয়াব পাওয়া যাবে কা'ব ইবনু মালিক (রা)-এর নিজস্ব বিবরণে। তিনি ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা দিয়েছেন। আমরা নিম্নে সেই বিবরণের অনুবাদ পেশ করছি।

কা'ব (রা) বলেন, এই অভিযানে শরীক না হয়ে আমার গৃহে অবস্থান করার কাজটি ছিল আমার জন্য এক পরীক্ষা। যুদ্ধে যেতে আমার কোন অনিচ্ছা ছিল না, না যাওয়ার পিছনে সত্যিকার কোন ওযরও ছিল না। অভিযানে যোগদানের জন্য প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জামও ছিল প্রস্তুত। উৎকৃষ্ট উটও আমার কাছে মওজুদ। দু'টো হৃষ্টপুষ্ট উট আমি কিনে রেখেছি। এর পূর্বে একসঙ্গে দু'টো উট আমার কখনই ছিল না। আমার আর্থিক অবস্থাও এই সময়ে বেশ সচ্ছল, পূর্বের যে কোন সময়ের চাইতে উত্তম। আমি স্থির করে রেখেছিলাম, যেদিন ইসলামী সেনাবাহিনী মার্চ করে যাত্রা শুরু করবে, সেদিনই আমি তাদের সঙ্গে মিলিত হবো এবং একত্রে যাত্রা করব।

কিন্তু ইসলামী ফৌজ যেদিন কুচকাওয়াজ করে রওয়ানা হ'ল, ঘটনাচক্রে সেদিন আমার কিছু কাজ পড়ে গেল। আমি মনে মনে ভাবলাম, ঠিক আছে, আমি আজ কাজটা সেরে ফেলি। আমার কাল গেলেও চলবে। কিন্তু সেই 'কাল' যখন আসলো আমার যাওয়া হ'ল না। এভাবে নানা ওযর-বাহানা আর আলস্য আমাকে আটকে রাখল। এভাবে দুদেল-মনায় দোলায়িত অবস্থায় দু'তিন দিন কেটে গেল! ইতোমধ্যে লস্করে-ইসলাম এতটা দূরে চলে গেছে যে, তখন রওয়ানা হয়ে তাদের নাগাল পাওয়া আমার নিকট খুব কষ্টকর ব্যাপার বলে মনে হ'ল। মাঝে মাঝে আমার মনে অনুতাপ অনুশোচনার উদ্রেক হ'ত। বিবেক আমাকে প্রশ্ন করত, তুমি এ কী করলে?

একদিন আমি গৃহ থেকে বের হ'লাম। পথে দেখা হ'ল শুধু সেসব মুনাফিকের সঙ্গে যারা মিথ্যা বাহানা ও ঝুট ওযর-আপত্তি পেশ করতে চিরাভ্যস্ত অথবা এমন লোকের সাক্ষাৎ পেলাম যারা ছিল মা'যূর-যুদ্ধে যোগদানে সত্য সত্যই অপারগ। এছাড়া আর কাউকে দেখা গেল না। এ দৃশ্য দেখে আমার তনু মনে দুঃখ ও বেদনা, অনুতাপ ও অনুশোচনার আগুন জ্বলে উঠল। দিনের পর দিন আমার এই অবস্থাতেই কাটতে লাগল। অবশেষে অভিযান শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিজয়ী বেশে মাদীনায় ফিরে এলেন।

আমি তখন উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমার কী হ'বে এই ভেবে ভেবে আমি অস্থির হলাম। কোন স্থির সংকল্প গ্রহণে অক্ষম হয়ে কেবলই ভাবতে লাগলাম। কী করি, কী বলি, আর কেমন করেই বা রাসূল ﷺ-এর অসন্তোষ ও ক্রোধ থেকে রেহাই পাই। কেউ কেউ আমাকে কিছু হিলা-বাহানা শিখিয়ে দিয়ে বলল, গিয়ে 'এই কথা বল', 'এই কাজ কর'। কিন্তু তাদের পরামর্শ আমার পছন্দ হ'ল না। অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, একমাত্র সত্য বলেই আর সত্যনিষ্ঠার মাধ্যমেই আমার মুক্তিলাভ সম্ভব। আমি সাহসে ভর করে নাবী ﷺ-এর খিদমাতে গিয়ে হাজির হ'লাম।

www.waytojannah.com

তাঁকে আমি সালাম জানালাম। তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং মুচকি হাসি হাসলেন। সে হাসিতে ক্রোধের আভা ফুটে বের হচ্ছিল। দেখে তো আমার অজ্ঞান হওয়ার মত অবস্থা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কাছে ডাকলেন, আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কা'ব! বল তো, তুমি কেন পিছে পড়ে থাকলে–কেন আমাদের সঙ্গী হলে না? তুমি কি যুদ্ধের সামানাদি সংগ্রহ করতে পারনি?

আমি আরয করলাম, আমি যদি দুনিয়ার কোন লোকের সামনে কৈফিয়ত দিতে বসতাম তা হলে তার ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য কোন ওযর, কোন বাহানা পেশ করে বেঁচে যেতে পারতাম, কিন্তু আমি জানি আজ কার সামনে আমি কৈফিয়ত পেশ করতে বসেছি। আমি বিশ্বাস করি, আজ যদি আপনার নিকট কোন মিথ্যা কথা বানিয়ে বলি, আপনি হয়তো সেটা বিশ্বাস ক'রে আমার কৈফিয়ত গ্রহণ করবেন, আমার প্রতি আপনার ক্রোধের অবসান ঘটবে এবং আপনি আমার প্রতি রাযী হয়ে যাবেন। কিন্তু আল্লাহ শীঘ্রই আপনার নিকট গুপ্ত ভেদ উদ্‌ঘাটিত করে দেবেন আর আমার উপর আপনার ক্রোধ স্থায়ীভাবে নিপতিত হবে। আর যদি সত্য কথাটাই আমি প্রকাশ করি, তাহলে আমি আশা রাখতে পারি যে, আল্লাহ আমাকে মার্জনা করবেন। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার সত্যিকার কোন ওযর ছিল না। আমি কসম করে বলছি আমি যখন আপনার সঙ্গে অভিযানে বের না হয়ে মাদীনাতেই থেকে যাই, তখন আমার অবস্থা পূর্বের চাইতে অধিকতর সচ্ছল। আমি পূর্বাপেক্ষা সবল। হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে তখন সব কিছুই ছিল। আমাকে গাফেল করে রেখেছিল আমার নফস্–আমার প্রবৃত্তি। আলস্য আমার মনের উপর তার প্রভাব ছড়িয়ে দিয়েছিল, শয়তান আমার উপর আক্রমণ চালিয়ে আমাকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল, আমার চলার শক্তি কেড়ে নিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মন্তব্য করলেন, এ লোক সত্য কথাই বলেছে। আমাকে লক্ষ্য ক'রে তিনি বললেন, কা'ব! তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও আর আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করতে থাক।

আমি গৃহে ফিরে এলাম। আর সেখানেই সমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করতে লাগলাম। কতক লোক আমার কাছে এসে সহানুভূতির সুরে বলতে লাগল, তুমি তো এর পূর্বে কোন অপরাধ করেছ বলে আমরা জানি না। এই প্রথমবার তোমার ত্রুটি হয়ে গেছে। তুমি ছাড়া আরও যারা অভিযানে শরীক হয়নি, তাদের মত তুমিও যদি কোন হিলা-বাহানা বানিয়ে তাই পেশ করতে, তবে তো এই অবস্থা হ'ত না। আমি বললাম, তাহলে সেই অবস্থায় ওয়াহীর মাধ্যমে মিথ্যাটা উদ্‌ঘাটিত হয়ে যেতো, তখন আমার অবস্থাটা কী হতো? তাহলে আমার দাঁড়াবার কোন স্থান থাকতো কি?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, যে হুকুম আমার উপর জারি হয়েছে আর কারোর উপরও কি তা হয়েছে? তারা বলল, হ্যাঁ, হয়েছে। আরও দু'জনের এই একই দশা হয়েছে। তাদের একজন হচ্ছে মুরারাহ ইবনুর রাবী' আল-আমিরী; অপরজন– হিলাল ইবনু উমাইয়াহ আল-ওয়াকিফী।

এ কথা শুনে আমি কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করলাম। ভাবলাম অপরাধ আমি একাই করিনি, আল্লাহর আরও দুই মুখলেস বান্দা আমারই মতো অবস্থাতে নিপতিত হয়েছে।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হুকুম জারি করে দিলেন: কোন মুসলিম যেন আমাদের এই তিন জনের সঙ্গে কোন কথাবার্তা না বলে, আমাদের কাছে এসে না বসে। এই হুকুমের ফলে আমরা সম্পূর্ণরূপে সমাজ-বর্জিত হয়ে পড়লাম। আমাদের পক্ষে জীবন ধারণ কঠিন হয়ে উঠল! দুনিয়াটাই সংকীর্ণ হয়ে এলো!

www.waytojannah.com

আমার দুই সহভোগী–হিলাল ও মুরারাহ বার্ধক্যে উপনীত হয়ে ছিলেন। তারা গৃহেই আবদ্ধ থাকতেন, বাইরে বের হ'তেন না। কিন্তু আমি এই তিনজনের মধ্যে ছিলাম বয়োকনিষ্ঠ, বলিষ্ঠতম এবং অধিকতর মনোবলের অধিকারী। আমি ঘর থেকে বের হ'তাম, মাসজিদে-নাববীতে যেতাম। সালাত আদায় করে পবিত্র মাসজিদের এক কোণে বসে থাকতাম।

আমি বাজারেও ঘুরে বেড়াতাম। দেখা হ'ত অনেকের সঙ্গেই কিন্তু কেউ একটা কথাও বলতো না। একদিন মাসজিদে সালাতের পর নাবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর প্রতি সালাম নিবেদন করলাম। মনে মনে স্থির করলাম যে, সালামের প্রত্যুত্তরে তাঁর ওষ্ঠদ্বয় নড়ে কিনা–আমি দেখব। আমি বুঝতে পারলাম আমার প্রতি তাঁর মহব্বতের দৃষ্টি রয়েছে। আমি তাঁর নিকটেই সালাত (সুন্নাত অথবা নফল) আদায় করতে শুরু করলাম। আমি চোরা দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলাম, তিনি আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। কিন্তু যখনই আমি রাসূল ﷺ-এর দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছি তখনই তিনি তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছেন।

এভাবে এরূপ অস্বস্তিকর অবস্থায় দিন কেটে চলল। মুসলিমদের মধ্যে কেউ কথা বলা তো দূরের কথা, সালাম দিলে জওয়াব পর্যন্ত দিত না।

যখন অবস্থা আমার পক্ষে একেবারেই দুঃসহ হয়ে উঠল, তখন অত্যন্ত বেদনা-দগ্ধ মনে আমি মাদীনার উপকণ্ঠে আমার চাচাতো ভাই আবূ কাতাদার বাগান বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন, আমাদের উভয়ের মধ্যে এক প্রীতিস্নাত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁর সামনে ছিল একটি প্রশস্ত বাগান। তিনি সেই বাগান বাড়িতে একটা প্রাচীর তৈরী করছিলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। আমি তাঁকে সালাম জানালাম। কিন্তু তিনি সালামের জওয়াব দিলেন না, এমনকি একটা কথা পর্যন্ত বললেন না। আমি বললাম, দেখ, আবূ কাতাদাহ! তুমি তো ভালো করেই জান যে, আমি আল্লাহকে ভালোবাসি এবং তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালবাসি–আর অন্তর দিয়েই ভালোবাসি। তিনি কোনই জওয়াব দিলেন না। আমি দ্বিতীয়বার ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করলাম। তিনি নীরব। আমি তৃতীয়বার যখন সেই একই কথা উচ্চারণ করলাম তখন তিনি মুখ খুললেন–এবং শুধু একটি কথা বললেন। কথাটি হচ্ছে: আল্লাহু ওয়ারাসূলুহু আ'লামু– আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই উত্তম জানেন।

এ কথার তাৎপর্য বুঝতে আমার দেরী হ'ল না। আমার অন্তর কেঁপে উঠল, আমার চোখ দিয়ে দর দর করে অশ্রু ঝরতে লাগল।

আমি শহরে ফিরে এলাম। মাদীনার বাজার পথে হেঁটে চলেছি, এমন সময় জানতে পারলাম সিরিয়া থেকে এক খৃস্টান এসেছে–সঙ্গে এনেছে কিছু খাদ্যদ্রব্য মাদীনার বাজারে বিক্রি করতে। সঙ্গে সঙ্গে আমারও সন্ধান নিচ্ছে। লোকদের জিজ্ঞেস করছে কা'ব ইবনু মালিক লোকটি কে? তাকে আমার প্রয়োজন। কেউ কি দেখিয়ে দেবে?

আমাকে বাজারে দেখতে পেয়ে লোকেরা আমার প্রতি ইশারা ক'রে তাকে দেখিয়ে দিল।

সে আমার সঙ্গে দেখা করে একখানা চিঠি আমার হাতে দিল। চিঠিখানা সে বয়ে এনেছে গাস্সানের বাদশার নিকট থেকে। চিঠিখানা পড়লাম। তাতে লেখা ছিল:

আম্মাবা'দ–পর সমাচার এই:

"আমার নিকট খবর এসেছে আপনার নেতা আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। অন্যান্যরাও আপনাকে বয়কট করেছেন। কিন্তু আমরা আপনার পদমর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। আপনি এমন ব্যক্তি নন যে, আপনার প্রতি তারা এমন অবাঞ্ছিত অমর্যাদাকর ব্যবহার করতে পারে। আপনার সম্মানের প্রতি এটা হানিকর একটা নির্মম আঘাত বৈ আর কিছুই নয়। আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি এই চিঠি পাওয়া মাত্র আমার নিকট চলে আসুন–দেখুন আমরা আপনার প্রতি কতটা শ্রদ্ধাবান।"

www.waytojannah.com

চিঠিখানা পড়লাম। পড়েই বুঝতে পারলাম আমার উপর এটা আর এক নতুন পরীক্ষা। শুধু ন্যূনতমই নয়, একটা গুরুতর পরীক্ষা। এর চাইতে গুরুতর কথা আর কী হতে পারে যে, একজন খৃস্টান আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে আমাকে আমার দীন থেকে স্খলিত করতে চায়! আমাকে কুফরের আমন্ত্রণ জানায়! এই উপলব্ধির ফলে আমার চিন্তা ও উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল–দুঃখ ও বেদনার ক্ষত আরও গভীর হয়ে উঠল।

আমি তৎক্ষণাৎ পত্র-বাহকের সম্মুখেই চিঠিখানা অগ্নিতে সমর্পণ করে পুড়ে ফেললাম। তাঁকে বললাম, যাও, তোমার প্রভুকে আমার এ কথা জানিয়ে দাও–"আপনার সৌজন্য অপেক্ষা আমার প্রভুর অসৌজন্য লক্ষ গুণ উত্তম।"

তখন বয়কটের চল্লিশ দিন চলছিল। আমি গৃহে ফিরে এলাম। মন বিচলিত, হৃদয় উদ্বেলিত, মস্তিষ্কে চিন্তার ঘুরপাক। এ অবস্থায় বাড়িতে পা রেখেই দেখি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রেরিত এক লোক আমার গৃহে অপেক্ষমান। তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন আমার প্রতি রাসূল ﷺ-এর এই নতুন ফরমান: "তুমি তোমার স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে থাকবে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমি কি তাঁকে তালাক দিয়ে দেব? উত্তর এলো, "না, আপনি তাঁর থেকে শুধু পৃথক হয়ে থাকবেন। তার কাছে যাবেন না।"

আমি জানতে পারলাম, আমার দুই সহযোগীর নিকটেও অনুরূপ হুকুম পাঠানো হয়েছে।

আমি আমার স্ত্রীকে ডেকে বলে দিলাম, তুমি তোমার পিতৃ গৃহে চলে যাও। যে পর্যন্ত এই ব্যাপারে আল্লাহর নতুন নির্দেশ না আসে সে পর্যন্ত সেখানেই থাকবে। (বলাবাহুল্য তিনি তাই করলেন)

ওদিকে হিলাল ইবনু উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাযির হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হিলাল ইবনু উমাইয়াহ একজন বৃদ্ধলোক, দুর্বল এবং কমজোর, তাছাড়া তাঁর খিদমাত করার মত কোন খাদেমও নেই। আমি যদি শুধু তাঁর খিদমাতের জন্য থেকে যাই তবে কি আপনার নিকট তাও অবাঞ্ছিত হবে?

রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, না, অবাঞ্ছিত হবে না। তবে তুমি তার শয্যাশায়িনী হবে না, দূরে অবস্থান করবে।

হিলাল-সহধর্মিণী বললেন, আল্লাহর কসম! এখন তার এসব দিকে মোটেই দৃষ্টি নেই। অন্য কোন কিছু খেয়াল করা তার পক্ষে সম্ভবই নয়। আল্লাহর কসম! বয়কটের পর থেকে এ পর্যন্ত তিনি তো শুধু কেঁদেই চলেছেন।

কা'ব বলেন, আমাকে আমার পরিবারের কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন, আপনিও আপনার স্ত্রীর খিদমাত লাভের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আবেদন জানালে অনুরূপ অনুমতি আপনিও পেতে পারেন।

আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তা করব না। কেননা আমি তো বৃদ্ধ নই। আমি অচলও নই। আমি এখনও যুবক, আমি সচল এবং কর্মক্ষম।

স্ত্রীর সাহচর্য ও খিদমাত-বঞ্চিত অবস্থায় আরও দশ দিন কেটে গেল। ৫০ দিন পূর্ণ হ'ল। এই ৫০ রাত্রি পূর্ণ হওয়ার পর এলো ৫১ দিবসের ফাজ্‌রের ওয়াক্ত। আমি আমাদের এক গৃহের ছাদে সবেমাত্র ফাজ্‌রের সালাত শেষ করেছি–আমি আমার এই দুঃসহ দুঃখময় অবস্থার কথা ভাবছি। এ বিপদ এ পরীক্ষা আর কত দিন চলবে–এ নিয়ে উদ্বেগ ও অস্থিরতা অনুভব করছি এমন সময় 'সালঅ্' পাহাড়ের চূড়া থেকে (যা ছিল কা'বের গৃহের কাছাকাছি) একটা আওয়াজ শ্রুতিগোচর হ'ল।

www.waytojannah.com

একজন উচ্চ নিনাদকারী সর্বোচ্চস্বরে ডেকে বলছে: কা'বকে অভিনন্দন: তাঁর জন্য শুভ সংবাদ, তাঁর তাওবাহ আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছে।

এই খোশ-খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আমার কপাল মাটিতে সংস্থাপন করলাম এবং শুকরের সাজদাহ আদায় করে তার পরক্ষণেই অতি দ্রুত পদক্ষেপে দৌড়ালাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে নিজেকে হাযির করলাম।

পথে দলে দলে মুসলিমগণ একের পর এক আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। এই অভিনন্দনের মিছিল পার হয়ে আমি মাসজিদে নাববীতে যখন প্রবেশ করলাম তখন দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে বসে আছেন আর তার চারপার্শ্বে রয়েছে আনসার মুহাজির প্রমুখ নাবী সহচরবৃন্দ।

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম আরয করলাম। আনন্দে সমুজ্জ্বল তাঁর চেহারা দেখে মনে হ'ল-যেন চাঁদের একটা টুকরা। আমরা তাঁর চেহারা দেখেই তাঁর আনন্দের পরিমাপ করতে পারতাম।

আমাকে দেখেই (সালামের জওয়াব দানের পর) তিনি ইরশাদ করলেন, মুবারক হে কা'ব! যেদিন তোমার মা তোমাকে প্রসব করেছে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যতদিন চলে গেছে তার মধ্যে আজকের দিনটিই হচ্ছে তোমার জন্য সবচেয়ে উত্তম-সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। তুমি আজ দায়মুক্ত।

আমি জিজ্ঞেস করলাম। এ কি আপনার তরফ থেকে, না আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের তরফ থেকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, এ আল্লাহর তরফ থেকে-তিনি তোমার তাওবাহ কবুল করেছেন।

আমি বললাম, এ তাওবা কবুলিয়াতের শুকরানা স্বরূপ আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ, সমস্ত মাল-দৌলত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর পথে সদাক্বাহ স্বরূপ দান করতে চাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না সমস্ত নয়, তোমার নিজের ভরণ-পোষণের উপযোগী কিছু সম্পদ রাখা চাই।

তখন আমি বললাম, তাহলে খায়বারে আমার অংশে যে জমি জমা রয়েছে তাই আমি রাখছি নিজের জন্য, বাকি সব আল্লাহর রাহে সদাক্বাহ করছি।

অন্য বিবরণে বলা হয়েছে-কা'ব বললেন, আমি আমার সব মাল আল্লাহর রাহে সদাক্বাহ স্বরূপ দান করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, সব নয়, আমি বললাম, তা হলে অর্ধেক? তিনি বললেন, তাও নয়। তখন আমি বললাম, তবে তিন ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিন ভাগের এক ভাগই যথেষ্ট এবং এই এক ভাগের পরিমাণও কম নয়।

এরপর আমি রাসূল ﷺ-এর খিদমাতে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন (তাওবাহ) এবং সত্য কথনের জন্যই আল্লাহ আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন এবং এই মহা পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ করেছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি-যতদিন বেঁচে থাকব কোন অবস্থাতেই আমি সত্য ছাড়া মিথ্যে বলব না।

এ উপলক্ষে আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর রাসূল ﷺ-এর উপর কতিপয় আয়াত অবতীর্ণ হয়।

একটি মহৎ জীবন ও তাঁর অবসান

তাবূকের অভিযান সংক্রান্ত বিষয় শেষ করার আগে তাবূকে শাহাদতপ্রাপ্ত এক বুযুর্গ ব্যক্তির ইসলামের প্রতি আকর্ষণ ও বিস্ময়কর ত্যাগের কাহিনী উল্লেখ না করে পারছি না।

www.waytojannah.com

তার নামটি ছিল 'আবদুল্লাহ। আরবের এক মরু অঞ্চলের ধনী পিতার পুত্র সে; শৈশবেই সে হয় পিতৃহারা। চাচা তাকে লালন-পালন করে। বয়স হওয়ার পর উট, বকরী এবং গোলাম বুঝিয়ে দিয়ে তাকে ভাল অবস্থায় ছেড়ে দেয়।

ইসলামের পয়গাম সে অঞ্চলেও পৌছে গিয়েছিল। 'আবদুল্লাহ ইসলাম সম্বন্ধে শুনতে পেল–তার হৃদয়ে তাওহীদের আগ্রহ জন্মে গেল। কিন্তু চাচাকে সে ভয়ংকর ভয় করত, তার কাছে গিয়ে তার এই ইসলামের প্রতি আকর্ষণের কথা বলতে সে মোটেই সাহস সঞ্চয় করতে পারছিল না।

কিন্তু যখন মাক্কার বিজয় সংবাদ তার কানে গেল, তখন সে আর নীরব থাকতে পারল না। চাচার নিকট হাজির হয়ে সে বলল,

"প্রিয় চাচা! আমি কয়েক বৎসর থেকেই প্রতীক্ষা করে চলেছি যে, কবে আপনার হৃদয়ে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং আপনি মুসলিম হয়ে যান। কিন্তু আপনার ভিতরে কোন পরিবর্তনই আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি আর সইতে পারছি না–মানুষের হায়াত মওতের কোনই ভরসা নেই। আমাকে আপনি অনুমতি দিন, আমি ইসলাম কবূল করি, মুসলিম হয়ে যাই।"

চাচা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে জওয়াব দিল: "দেখ! তুই যদি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দীন কবূল করতে চাস–কর্ গিয়ে, কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি– আমি তোর কাছ থেকে সব ছিনিয়ে নেব–তোর গায়ের চাদর আর পরণের তহবন্দটাও (লুঙ্গী) বাকি থাকবে না।"

'আবদুল্লাহ এবার ভয়লেশহীন চিত্তে জওয়াব দিল, চাচাজী! মুসলিম আমি হ'বই–মুহাম্মাদ ﷺ-এর দীন আমি অবশ্যই কবূল করব। বুৎপরস্তী এবং অন্যান্য শির্কের কাজের প্রতি আমি ত্যক্ত বিরক্ত। এখন আপনার যা ইচ্ছা করুন। আমার জিম্মার যে ধন-মাল সয়-সম্পদ আছে–সব কিছুর দায়-দায়িত্ব আপনি নিয়ে নিন। আমি জেনেছি, আমি বুঝে দেখেছি! একদিন ধন-মাল সবকিছু এই দুনিয়াতেই ছেড়ে যেতে হবে। সঙ্গে যাবে শুধু ধর্ম, আমি এই অস্থায়ী দ্রব্যসামগ্রীর মোহে আটকে পড়ে সেই স্থায়ী বস্তু–সত্য ধর্মকে কবূল না করে পারি না।

এ কথা বলেই 'আবদুল্লাহ তার পরণের সকল কাপড় খুলে ফেলে চাচার সামনে নিক্ষেপ করে যেরূপ নাঙ্গা অবস্থায় প্রথমে মাতার কোলে উঠেছিলেন তেমনি নাঙ্গা অবস্থায় মা'র কাছে গিয়ে হাযির হ'লেন।

মা যুবক পুত্রকে ঐ অবস্থায় দেখে তো অবাক! এ কী হ'ল তার পুত্র 'আবদুল্লাহর? পাগল হয়নি তো?

'আবদুল্লাহ তাঁকে আশ্বস্ত করল। বলল, আমি ইসলাম কবূল করেছি। মু'মিন মুওয়াহ্হিদ হয়ে গিয়েছি। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর খিদমাতে রওয়ানা হব। এই মুহূর্তেই আমার 'সতর' ঢাকার জন্য কাপড়ের প্রয়োজন। আপনি আমাকে কিছু কাপড় দিন। মা তাকে একটা কম্বল দিলেন। সেটাকে ফেড়ে দু'ভাগ করে অর্ধেক দিয়ে বানিয়ে নিল এক তহবন্দ, বাকী অর্ধেক চাদরের মত করে পরল গায়ের উপর। এই বেশেই সে মাদীনার পথ ধরল, সারারাত চলে প্রত্যুষে সে মাদীনায় পৌছে গেল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদ মুবারকে তাশরীফ নিয়েই তাকে দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? তোমার পরিচয় কী?

সে বলল: আমার নাম 'আবদুল উয্যা। আমি নিঃস্ব এবং পথিক। আমি সৌন্দর্যের আকর্ষণ এবং সত্য পথের সন্ধানে বহু দূর থেকে এখানে সমাগত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এখন 'আবদুল উয্যা নও। তোমার নতুন নাম 'আবদুল্লাহ–আল্লাহর দাস। তুমি আমার কাছে অবস্থান করবে, মাসজিদ প্রাঙ্গণেই তুমি থাকবে।

www.waytojannah.com

'আবদুল্লাহ এখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম সাহাবা। তিনি আসহাবে সুফ্ফায় শামিল হয়ে গেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কুরআন শিখতে লাগলেন। তিনি দিন রাত বিপুল আগ্রহে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কুরআন পড়তেন। মাঝে মাঝে উৎসাহের আতিশয্যে ও আবেগের প্রাবল্যে তাঁর কণ্ঠে কুরআনের সুললিত বাণী উচ্চ গ্রামে নিনাদিত হয়ে উঠত।

একদা 'উমার (রা) অভিযোগের সুরে বললেন, লোকেরা সালাত আদায় করছে–আর মরুর অধিবাসী এই লোকটি এত বেশি জোরে কুরআন পাঠ করে চলেছে যে, তাতে করে অন্যদের কিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, 'উমার! ওকে কিছু বলো না। এই লোকটি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে এসেছে।

তাবূকের অভিযানে বের হওয়ার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে–এ দৃশ্য দেখার পর আসহাবে সুফ্ফার অন্যতম উৎকৃষ্ট প্রাণ–ফকীর 'আবদুল্লাহ রাসূল ﷺ-এর খিদমাতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যেন শহীদ হয়ে মরতে পারি– এই দু'আ করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যাও। কোন বৃক্ষের ছাল তুলে নিয়ে আস। 'আবদুল্লাহ ছাল তুলে নিয়ে আসলে নাবী ﷺ ঐ ছাল তার বাহুতে বেঁধে দিলেন এবং স্বীয় পবিত্র জিহ্বায় উচ্চারণ করে বললেন, "হে আল্লাহ! আমি কাফিরদের উপর এর রক্ত হারাম করে দিচ্ছি।"

'আবদুল্লাহ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো শাহাদতেরই আকাঙ্ক্ষী! নাবী ﷺ বললেন, ধর্ম যুদ্ধের নামে তুমি বের হয়ে যদি জ্বরাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ কর তাহলে তোমার সে মৃত্যু শাহাদতরূপেই গণ্য হবে।

তাবূকে পৌঁছার পর তাই ঘটে গেল। 'আবদুল্লাহর শরীরে জ্বর দেখা দিল, আর সে জ্বর ক্রমেই বেড়ে চলল, অবশেষে এই নশ্বর জগৎ ছেড়ে তাঁকে অবিনশ্বর জগতের দিকে প্রস্থান করতে হ'ল।

সাহাবী বিলাল ইবনু হারিস আল-মুয্ইনী (রা) এক বিবরণীতে বলেন, আমি 'আবদুল্লাহকে দাফন হতে দেখেছি।

তখন রাত্রিকাল। বিলালের হাতে বাতি। আবূ বাক্র (রা) ও 'উমার (রা) কবরের লহদে লাশ স্থাপন করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও কবরে নামলেন আর আবূ বাক্র ও 'উমারকে বললেন, "আদাবান ইলা আখাকুমা" সম্মানের সঙ্গে, সম্মানের সঙ্গে রাখ, তোমাদের ভাইয়ের প্রতি যেন কোন অসম্মান, কোন বেআদবী না হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই তাঁর কবরের উপর ইট বা মাটি সংস্থাপন করেন। তারপর তিনি তাঁর উদ্দেশে এই দু'আ করেন:

"হে প্রভু পরোয়ারদিগার! আজ সন্ধ্যা অবধিও আমি এর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম, তুমিও এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।" ইবনু মাস'উদ বলেন, আহ্! যদি এই কবরে আমাকে রাখা হ'ত।

www.waytojannah.com

আরবের বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে মাদীনায় প্রতিনিধি দলসমূহের আগমন

খায়বার যুদ্ধ এবং মাক্কা বিজয়ের পর আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, বিভিন্ন কবীলার পক্ষ হতে একের পর এক মাদীনায় প্রতিনিধি দলের সমাগম ঘটতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনঃ পুনঃ প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লেও, তাঁর প্রধান কর্তব্য ইসলামের তাবলীগ তথা দা'ওয়াত পৌছানোর কাজ যথাযথভাবেই আঞ্জাম দিয়ে চলেছিলেন।

ইসলামের আহ্বান শুনে আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাফল্যের পর সাফল্যের সংবাদ পেয়ে আরবের প্রতি প্রান্তে, প্রতিটি গোত্র ও কবীলার মধ্যে এক অসাধারণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়ে চলে। ফলে ইসলামের আহ্বানকারীকে দেখার, তাঁর বাণী শুনার, তাঁকে যাচাই করার এবং ভালো লাগলে তাঁকে নাবী রূপে স্বীকার করার উদ্দেশে মাদীনায় প্রতিনিধি দলের ভিড় জমতে থাকে। নবম ও দশম হিজরী সালে সর্বাধিক প্রতিনিধির সমাগম ঘটে।

তায়েফের সাকীফ প্রতিনিধি দলের কথা

নবম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তায়েফ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রমাযান মাসে তায়েফের সাকীফ গোত্র পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত এক প্রতিনিধি দল মাদীনায় রাসূলের সকাশে প্রেরণ করে।

'উরওয়াহ ছিলেন তায়েফের সাকীফ গোত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে তিনি কুরাইশদের উকীল হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ খিদমাতে উপস্থিত হন।

তায়েফের অবরোধ উঠিয়ে আনার পর 'উরওয়ার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হন। ইসলাম তাঁর দিলে আকর্ষণ সৃষ্টি করে। তিনি রাসূলের পিছনে পিছনে মাদীনায় এসে হাজির হন এবং ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হন। 'উরওয়ার ঘরে ছিল দশ বিবি, ইসলাম চার বিবি পর্যন্ত রাখার অনুমতি দেয়। হুকুম হ'ল: 'উরওয়াহ! চার স্ত্রী রেখে বাকিদের তালাক দিয়ে দাও। 'উরওয়াহ সঙ্গে সঙ্গে ৬ বিবির সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। 'উরওয়াহ রাসূলের সাহচর্যে থেকে ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান আহরণ করলেন। ইসলামের জোশ তার মনকে চঞ্চল করে তুলল। রাসূল ﷺ-এর সকাশে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, এবার আমাকে নিজ গোত্রের নিকট গিয়ে ইসলাম প্রচারের অনুমতি দিন। রাসূল ﷺ বললেন, তোমার আগ্রহ প্রশংসনীয়। কিন্তু আমার ভয় হয়–তোমার মুখে ইসলামের কথা শুনে তোমার কওম তোমাকে কতল করে ফেলবে।

'উরওয়াহ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কওম আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসে ঠিক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে যেমনটি ভালবাসে। রাসূল ﷺ তাঁর উৎসাহ দেখে তাঁকে যেতে অনুমতি দিলেন।

'উরওয়াহ (রা) তায়েফে ফিরে এলেন। ইসলামের দা'ওয়াত স্বীয় কওমের নিকট পৌছে দেয়ার কাজ শুরু করে দিলেন। তাঁর কওমের লোক তাদের নেতার 'মতি বিভ্রমে' ক্ষেপে উঠল। একদিন তিনি স্বীয় গৃহে জানালার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে একনিষ্ঠ মনে সালাত আদায় করছিলেন–এমন সময় এক দুরাচার তাঁর দেহ লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে বসে। ফলে 'উরওয়াহ 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। দেখতে দেখতে মহামতি 'উরওয়াহ্র অমর আত্মা তার দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করে অনন্তলোকে প্রস্থান করে। (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজি'উন)

www.waytojannah.com

'উরওয়াহ (রা) বিদায় নিলেন কিন্তু যে মহান উদ্দেশে তিনি তাঁর কওমের নিকট ফিরে এসেছিলেন তা' ব্যর্থ হলো না। স্বীয় ভক্তিভাজন নেতার এই নির্মম হত্যা অনেকের হৃদয়েই আলোড়ন সৃষ্টি করল। তারা বলাবলি শুরু করল, 'উরওয়াহ তো সত্য কথাই বলেছিলেন, সত্য পথই ধরেছিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর দীন তো দিন দিন বেড়েই চলেছে, সমগ্র আরবই তাঁর ধর্ম কবূল করে চলেছে, তাঁর বিরোধী সবাই তো পর্যুদস্ত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রতিমা ঠাকুরগুলো তো কোন কিছুই করতে পারছে না। তারা অনুতপ্ত হল। অবশেষে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিল।

এই প্রতিনিধি দলের নেতা নির্বাচিত হলেন কিনানা ইবনু 'আবিদ ইয়ালীল। ইনি সেই ইবনু 'আব্দ ইয়ালীল যিনি ১২ বৎসর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তায়েফবাসীদের ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন তখন তাঁর কথা শুনতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন, তিনিই তায়েফের অধিবাসীদেরকে নাবী ﷺ-এর প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ এবং তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার কাজে লাগিয়েছিলেন। এছাড়া তার ইশারা-ইঙ্গিতে দুষ্ট ছেলে ছোকরারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর নিষ্করুণভাবে পাথরের বৃষ্টি বর্ষিয়ে চলেছিল।

ইসলামের সেই চরম দুশমন আজ স্বীয় হৃদয়ে ইসলামের প্রতি অনুরাগের অনুভূতি নিয়ে পাঁচ সদস্যের নেতারূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির।

সাহাবী মুগীরা ইবনু শু'বা (রা) ছিলেন তায়েফের এই সাকীফ গোত্রেরই লোক। তিনি এই প্রতিনিধি দলের আগমনে রাসূল ﷺ-এর খিদমাতে এসে নিবেদন করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! এরা তো আমারই কওমের লোক। সুতরাং এঁদের আমার গৃহে অবতরণ ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করুন–আমি এঁদের যত্ন ও তা'যীমের দায়িত্ব গ্রহণ করছি।

নাবী ﷺ বললেন, তুমি যদি তোমার কওমের লোকদের প্রতি সম্মান দেখাতে চাও, আমি তাতে বাধা দিতে চাই না। তবে আমার মনে হয়, তাদেরকে মাসজিদ প্রাঙ্গণে রাখার ব্যবস্থা করলেই অধিকতর কল্যাণ হবে–তারা কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শুনতে পাবে, লোকেদের মাসজিদে আসার এবং সালাত আদায় করার দৃশ্য দেখতে পাবে, ওয়াজ নাসীহাতও শুনতে পাবে এবং তাতে করে ইসলামকে বুঝবার এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগ পাবে।

তাই করা হ'ল। মাসজিদ প্রাঙ্গণেই তাদের জন্য তাঁবু খাটানো হ'ল। সেখান থেকে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কণ্ঠনিঃসৃত প্রাণবন্ত আওয়াজে এবং হৃদয়-মোহিনী সুরে পঠিত কুরআন শুনে, মুসলিমদের সালাত আদায় করতে দেখে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খুৎবাহ শুনার সুযোগ পেয়ে ধীরে ধীরে ইসলামের প্রতি আকর্ষণবোধ করে চললেন।

তারা প্রত্যেক দিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে গিয়ে বসতেন এবং তাদের মধ্যে বয়সে সর্বকনিষ্ঠ–'উসমান ইবনু আবুল 'আসকে শিবিরে রেখে যেতেন। প্রতিনিধি দল তাঁবুতে ফিরে এলে 'উসমান (রা) রাসূল ﷺ-এর খিদমাতে গিয়ে হাজির হতেন এবং ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতেন। নাবী ﷺ যখন ঘুমে থাকতেন তখন তিনি আবু বাক্‌র (রা)-এর কাছে যেতেন। এভাবে তিনি ইসলাম সম্পর্কে নিজের আগ্রহে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আয়ত্ব করে নিলেন।

যা হোক, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যবস্থানুযায়ী প্রতিনিধি দলের প্রত্যেকের অন্তরে ইসলামের প্রতি অনুরাগ বেড়ে চলল এবং তারা ইসলাম কবূল করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু ইসলাম কবূল করার পূর্বে তারা তাদের গোত্রের স্বভাব অভ্যাস ও অনুরাগ বিরাগের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামের বিধি নিষেধ ও হুকুম আহ্‌কাম সম্পর্কে কোন 'কনসেশন' লাভ এবং কোন কোন ব্যাপারে অব্যাহতি পাওয়া যায় কিনা সে চেষ্টা করে দেখল।

www.waytojannah.com

এ ব্যাপারে তাদের এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হচ্ছে।

তারা একবার নিবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল! ৫ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিতভাবে আদায় করা আমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এ ব্যাপারে আমাদের অব্যাহতি দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জওয়াবে বললেন, যে ধর্মে সালাত নেই– আল্লাহর নিকটে অবনমিত ও আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা নেই– সে ধর্মে কোনই কল্যাণ নেই। তখন তারা জানাল: আচ্ছা, সে থাক। আমাদের জিহাদে যোগদানের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি এবং যাকাত আদায় করা থেকে রেহাই দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাময়িকভাবে এটা মেনে নিলেন এবং সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, ইসলামের প্রভাবে পরে এরা নিজেরাই এই দুই কাজ করার জন্য এগিয়ে আসবে।[৬৬]

প্রতিনিধি দলের নেতা কিনানা ইবনু 'আব্দ ইয়ালীল রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ব্যভিচারের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? আমাদের কওমের লোককে অনেক সময়েই বাড়ি ছেড়ে দূর-দূরান্তরে অবস্থান করতে হয়। প্রকৃতির তাড়নায় অবৈধ যৌন সংযোগ ছাড়া তাদের তো উপায়ান্তর নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, ব্যভিচার তোমাদের জন্য সর্বাবস্থায় হারাম। এ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে:

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً.

"এবং তোমরা ব্যভিচারের নিকটও যেয়ো না, নিশ্চয়ই ব্যভিচার হচ্ছে অত্যন্ত নির্লজ্জতার ব্যাপার এবং অতিশয় কুৎসিৎ পন্থা।" (সূরা বানী ইসরাঈল: ৩২)

ইবনু 'আব্দ ইয়ালীল পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সুদ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? এর সম্পূর্ণটাই তো আমাদের প্রাপ্য।

রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের প্রাপ্য শুধু আসল টাকাটা, তোমরা শুধু সেই পরিমাণ ফেরত নিতে পার। দেখ, এ সম্পর্কে আল্লাহ কী বলছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল এবং সুদের বাকি বকেয়া সব ছেড়ে দাও–যদি তোমরা সত্যিকার মু'মিন হয়ে থাকো।" (সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৮)

তারপরের প্রশ্ন হচ্ছে–হে আল্লাহর রাসূল! মদ পান সম্বন্ধে আপনি কী বলেন, এ তো আমাদের দেশেরই উৎপাদিত এক ফলের নির্যাস। এ না হলেই যে আমাদের নয়। এছাড়া যে আমাদের জীবনই অচল।

নাবী ﷺ বললেন, আল্লাহ স্বয়ং মদ হারাম করে দিয়েছেন, কাজেই কারোর (এবং আমারও) এতে কোন হাত নেই, কোন বক্তব্য নেই। তারপর তিনি সংশ্লিষ্ট আয়াত পাঠ করলেন যার অর্থ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

---

[৬৬] নওমুসলিমদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কনসেশন ও সাময়িক অব্যাহতি দানের কথা আজকের দিনে সমাজের আলিম সমাজের বিশেষভাবে খেয়াল রাখা প্রয়োজন–অনুবাদক।

www.waytojannah.com

"হে মু'মিন বান্দাগণ! নিশ্চয়ই মদ (যাবতীয় মাদকদ্রব্য), সকল প্রকারের জুয়া, আনসাব ও আযলাম অতি জঘন্য শাইতানী কাজ; অতএব বর্জন কর ঐ জঘন্যতাকে যাতে করে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা মায়িদাহ ৫: ৯০)

আর একদিনের কথা। প্রতিনিধি দল রাসূলের খিদমাতে এসে নিবেদন করল, আচ্ছা আমরা আপনার সব কথাই মেনে নিলাম। এখন আমরা একটা বিষয়ে পরিষ্কার হতে চাই। আমাদের এত দিনের পূজ্য দেবী রাব্বাহকে আপনি কী করতে চান?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওটাকে ভেঙ্গে চুরে ধূলিসাৎ করে দাও। প্রতিনিধি দল আতংকিত হয়ে বলে উঠলো, হায়! হায়! রাব্বাহ যদি জানতে পারে যে, আপনি তাকে ধূলিসাৎ করে দিতে চাচ্ছেন তা হলে তো সে ক্ষিপ্ত হয়ে তায়েফের সব অধিবাসীকে ধ্বংস করে দিবে।[৬৭]

'উমার (রা) এই কথোপকথনের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি (সম্ভবতঃ) প্রতিনিধি দলের অন্তরের কথা হৃদয়ঙ্গম না করতে পেরে বলে উঠলেন:

আফসোস! হে ইবনু 'আব্দ ইয়ালীল! তোমরা এখনও এই সোজা সত্য কথাটি বুঝতে পারছ না যে, ওটা একটা পাথর, একটা প্রাণহীন জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইবনু 'আব্দ ইয়ালীল বিরক্তির সুরে বলে উঠল, থাম ইবনু খাত্তাব! আমরা তোমার সঙ্গে কথা বলছি না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললেন, রাসূল! উক্ত প্রতিমূর্তি ভাঙবার দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে না দিয়ে আপনি নিজেই গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বেশ, আমি ভূমিসাৎকারী লোক পাঠিয়ে দেব, ক্ষণ। তারা হবেন এমন লোক যারা উক্ত প্রতিমূর্তি ভাঙবার জন্য হবে যথেষ্ট।

'আব্দ ইয়ালীল বললেন, রাসূল! তাদের পাঠাবার পূর্বে আমাদের বিদায় গ্রহণের অনুমতি দিন। আমাদের পিছনে পিছনে তাদের পাঠিয়ে দিন। কারণ আমরা আমাদের কওমের অবস্থা ও মানসিক হাল হাকীকাত সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল।

ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। তাদের প্রতি তিনি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন।

বিদায় গ্রহণের পূর্বে তারা আর একটা নিবেদন জানালেন। তারা বললেন, আমাদের মধ্য থেকে আমাদের একজন ইমাম নির্বাচিত করে দিন। বলা বাহুল্য, ইতোপূর্বেই প্রতিনিধি দলের সবাই প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করেছিলেন। প্রতিনিধি দলের মধ্যে বয়সে যিনি ছিলেন সবচাইতে ছোট সেই 'উসমান ইবনু আবুল 'আসকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ইমাম মুকাররার করে দিলেন। কেননা তিনি ইতোমধ্যেই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে প্রতিনিধি দলের অজ্ঞাতে কুরআন মাজীদের কয়েকটি সূরা শিখে ফেলেছিলেন এবং শরীয়াতের জরুরী হুকুম আহকামও জেনে নিয়েছিলেন। প্রতিনিধি দলের সবাই রাসূলের নির্বাচিত ইমামকে বিনা বাক্য ব্যয়ে নত মস্তকে মেনে নিলেন।

প্রতিনিধি দল পথে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে স্থির করল যে, আমাদের কওমের নিকট প্রথমে সমস্ত তথ্য গোপন রাখতে হবে এবং তাদের অন্তরে নৈরাশ্য আনয়ন করতে হবে। তাদের অন্তরে যুদ্ধ, মৃত্যু এবং ধ্বংসের ভীতি সঞ্চার করতে হবে।

---

[৬৭] লক্ষণীয় যে, যিনি ধূলিসাৎ করতে বলছেন তাঁর এবং যারা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে তাদের কোন ক্ষতির আশংকা প্রকাশ করা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে তাদের ক্ষতির কথা যারা সেই প্রতিমূর্তির প্রতি বিশ্বাস তখনও অটুট রেখেছে। *–অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

পরামর্শ মতই তারা কাজ করেন। তাদের দেশে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন এসে তাদের ঘিরে ধরল। তারা জিজ্ঞেস করল: তোমরা মাদীনায় কী নিয়ে গেলে, আর কী ক'রে এলে?

তারা জওয়াবে বললেন, আমরা এক কঠোর-মেজাজ ও রূঢ়ভাষী লোকের পাল্লায় পড়েছিলাম। তিনি আমাদের হুকুম দিলেন: লাত, উয্যা, রুব্বাহ প্রভৃতি আমাদের সব দেবদেবীগুলোকে ভেঙে ফেলতে হবে, সমস্ত সূদী টাকা ছেড়ে দিতে হবে, মদ্যপান এবং ব্যভিচারকে হারাম জানতে হবে।

কওমের সমস্ত লোক তখন বলে উঠল, আল্লাহর কসম! আমরা এর একটাও মানতে রাজী নই।

প্রতিনিধি দলের লোকেরা তখন এক বাক্যে বলে উঠলেন, তাহলে তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো ঠিক করে নাও, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও এবং দুর্গগুলো মেরামত করে দুর্ভেদ্য করে তোল।

সাকীফ গোত্রের লোকেরা উপস্থিত ক্ষেত্রে উক্ত পরামর্শই মেনে নিল। যুদ্ধই তারা করবে– এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা বাড়ী ফিরল। কিন্তু তিন দিনের মধ্যে তাদের মনের পরিবর্তন ঘটল।

মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে ত্রাস ঢুকিয়ে দিলেন। যুদ্ধের পরিণামের কথা ভেবে তারা ভয় পেয়ে গেল। তারা এসে বললো, আল্লাহর কসম করে বলছি: আমরা যুদ্ধ করব না, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা কোথায়? সমস্ত আরবই এখন তাঁর পদানত। সকলেই তো তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে।

সুতরাং তোমরা আবার তাঁর কাছে ফিরে যাও। গিয়ে বল: "আমরা আপনার সব কথাই মেনে নিচ্ছি।"

প্রতিনিধি দল তখন বললেন, এবার তোমরা সঠিক পথে এসেছ আর সঠিক কথাই বলছ। এবার তবে শুন আমাদের সঠিক কথা।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর মত লোক আর হয় না। লোকদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন সবচাইতে রহম-দিল, সর্বাধিক দয়ালু; সত্যবাদিতায় তাঁর জুড়ি নেই, অঙ্গীকার পূরণে তিনি বে-নযীর, তাক্ওয়ায় তিনি অতুলনীয়। তাঁর সঙ্গে কারোর কোন তুলনাই হয় না। এই সফরে তাঁর সংস্পর্শে এসে আমরা প্রভূত কল্যাণ লাভ করে এসেছি।

সাকীফ গোত্রের লোকেরা তখন বলল, তাহলে এই বাঞ্ছিত তথ্য আগে আমাদের কাছে গোপন রেখেছিলে কেন? কেন আমাদেরকে চিন্তায় এবং পেরেশানে নিক্ষেপ করেছিলে?

তারা বললেন, আমরা চেয়েছিলাম আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তর থেকে শয়তানী প্রবঞ্চনা দূর করে দিন–শয়তান তোমাদের অন্তরে যে ধোঁকার বীজ ঢুকিয়ে রেখেছে সেটা দূর হয়ে যাক।

যা হোক, তারা এরপর পরই সবাই ইসলাম কবূল করল, সবাই (অন্ততঃ মুখে) মুসলিম হয়ে গেল।

কয়েকদিন পরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রেরিত প্রতিনিধি দল এসে হাজির হলেন। তাদের নেতা হয়ে এলেন দুর্ধর্ষ রণবীর খালিদ ইবনু ওয়ালীদ। তাঁর দলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মাক্কার ইসলাম বৈরীদের প্রধান নেতা আবূ সুফ্ইয়ান ইবনু হার্‌ব। আল্লাহর কী শান! যে প্রতিমা বিগ্রহগুলোর প্রভুত্ব কায়িম রাখার জন্য তিনি দীর্ঘ বিশ বৎসর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন, আজ তিনিই এসেছেন তায়েফের সেই প্রতিমা ভেঙ্গে মিসমার করে দেয়ার জন্য। এই দলে ছিলেন মুগীরা ইবনু শু'বা এবং আরও অনেকে।

এসেই তারা প্রধান প্রতিমা-দেবী 'লাত'কে ভূমিসাৎ করার কথা ঘোষণা করলেন।

www.waytojannah.com

ইসলাম কবূল করলেও এতদিনের পূজ্য লাত দেবী সম্বন্ধে সাকীফ গোত্রের লোকদের বদ্ধমূল ধারণা হৃদয় থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। তারা মনে মনে ভাবতে লাগল, এতদিন যে ঠাকুরাণীকে তারা শক্তির আধার বলে বিশ্বাস করে এসেছে, তাকে ভেঙ্গে চুরে মিসমার করে দেয়া কি সম্ভব হবে?

সন্দেহ দোলায় দোলায়িত মন নিয়ে নারী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ সবাই নিজ নিজ ঘর থেকে বের হয়ে এলো এবং তামাসা দেখার জন্য জড় হ'ল।

খালিদের অনুমতি নিয়ে মুগীরা ইবনু শু'বা প্রতিমা লক্ষ্য করে তাঁর প্রথম তীর নিক্ষেপ করলেন। ঘটনাচক্রে তীর নিক্ষেপের সময় দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে তিনি নিজেই মাটিতে পড়ে যান। এই না দেখে সাকীফ গোত্রের লোকেরা সোল্লাসে চিৎকার করে বলে উঠল, আল্লাহ মুগীরাকে দূরে নিক্ষেপ করেছে–'রুব্বাহ' তাকে ধ্বংস করে দিবে। কেউ প্রতিমা ধ্বংস করতে সক্ষম হবে না।

এ কথা শুনে মুগীরা (রা) লাফিয়ে উঠে বললেন, হে সাকীফ গোত্রের লোক সকল! তোমরা এ কী বলছ? তোমরা ভেবেছ কী? এই প্রতিমা পাথরের টুকরো ছাড়া আর কী? তোমরা আল্লাহর প্রদত্ত কল্যাণ কবূল করে নাও এবং একমাত্র তাঁরই বন্দেগী কর।

তিনি এবার উঠে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে প্রথমে সেই প্রতিমাটিকে আঘাতের পর আঘাত হেনে ভূমিসাৎ করে দিলেন। তারপর অন্যান্য মুসলিমকে সঙ্গে নিয়ে দেয়ালটিকে ভূমিসাৎ করতে গেলেন। তারা প্রাচীরের পাথরের একেকটা টুকরা খসিয়ে দূরে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এরপর খালিদের অনুমতি নিয়ে মন্দিরের ভিত্তি খুদে ফেলে তায়েফবাসীদের অন্তরের মিথ্যা বিশ্বাস ও অন্ধ সংস্কার উৎপাটিত করে ইসলামের বুনিয়াদ তথায় চিরদিনের জন্য পাকাপোক্ত করে দিলেন।

মন্দিরের নিম্নদেশে গুপ্তভাবে লুক্কায়িত অলংকার এবং বস্ত্রসম্ভার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিনিধি দলের হস্তগত হ'ল। তারা সেগুলো নিয়ে মাদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে পেশ করলেন। আল্লাহর নাবী ﷺ সে সবই লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন, আল্লাহ তাঁর নাবী ﷺ-কে সাহায্য করায় এবং তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করায় তিনি আল্লাহর প্রশস্তি গাইলেন।

'আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল

বুখারী এবং মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, যখন "আবদুল কায়সের" প্রতিনিধি দল রাসূলের খিদমাতে উপস্থিত হলেন, তখন রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন: তোমরা কোন্ কওমের লোক? কোথা থেকে এসেছ? তারা বলল, আমরা কওমে রাবী'আর লোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা শুনে তাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন।

তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের এবং আপনার মাঝে অর্থাৎ মাদীনায় আসার পথে মুযার গোত্রের কাফিররা প্রতিবন্ধক স্বরূপ দণ্ডায়মান। আমরা শুধু হাজ্জের মৌসুমেই রাসূলের খিদমাতে উপস্থিত হতে পারি। এজন্য আমরা রাসূলের কাছে আরজি পেশ করছি, আমাদের স্পষ্টভাবে ইসলামের মোক্ষম বাণী শিখিয়ে দিন যার উপর আমরা নিজেরা 'আমাল করতে পারি এবং স্বীয় কওমের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারি এবং তার বদৌলতে জান্নাত লাভের তাওফীক পেয়ে ধন্য হই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয়ে 'আমাল করার এবং চারটি ব্যাপার থেকে বিরত থাকার আদেশ করছি।

www.waytojannah.com

আমি আদেশ করছি যে, তোমরা–

ক. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। তোমরা কি জান যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান কী? তা হচ্ছে এই যে, তোমরা এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া পূজনীয় প্রভু নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিবে যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

খ. তোমরা ঠিক ঠিকভাবে সালাত কায়িম করবে।

গ তোমরা যাকাত আদায় করবে এবং

ঘ. তোমরা রমাযান মাসে সওম পালন করবে আর গনীমতের মাল থেকে এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে জমা করে দিবে।

আর আমি চারটি বিষয়ে তোমাদের নিষেধ করছি। ১। দুব্বা, ২। হান্‌তাম, ৩। নাকীর এবং ৪। মুযাফ্‌ফাত– নামক পেয়ালা ও বর্তন ব্যবহার করবে না।[৬৮]

বানী হানীফার প্রতিনিধি দল ও মুসাইলামাহ কায্‌যাবের কথা

সুমামাহ ইবনু উসালের চেষ্টায় বানী হানীফার লোকদের মধ্যে ইসলামের প্রচার ঘটেছিল। এদের প্রতিনিধি দল মাদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমাতে হাজির হয়ে ইসলাম কবূল করেন।

এ দলের মধ্যে মুসাইলামাহ আল-কায্‌যাব বলে এক ব্যক্তি ছিল। কিছু গড়িমসি করার পর সেও মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফেরার পথে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সত্য নাবী বলে স্বীকৃতি দিয়েও নিজেকেও অন্যতম নাবী বলে ঘোষণা করে দিল।

সে কুরআনের মুকাবেলায় অদ্ভুত অদ্ভুত কথার সমন্বয়ে বাক্য রচনা করে চলল।

সে নিজস্ব শরীয়াত জারি করল। সালাত মাফ করে দিল। মদ্য এবং ব্যভিচারের অনুমতি প্রদান করল।

বানী হানীফার বেশ কিছু সংখ্যক সরলপ্রাণ লোক তার ধোঁকায় পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে চিঠিও লিখে পাঠাল। তাতে লিখল:

"আল্লাহর রাসূল মুসাইলামাহর নিকট হতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সমীপে–

অতঃপর বক্তব্য এই যে, আমাকে আপনার শরীকদার বানিয়ে দেয়া হয়েছে। সাম্রাজ্যের অর্ধেক আমাদের জন্য। বাকি অর্ধেক কুরাইশদের জন্য। কিন্তু কুরাইশরা ইনসাফ করতে জানে না। আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই চিঠির উত্তর দিলেন। তাতে তিনি লিখলেন:

---

[৬৮] এসব পেয়ালা ও থালায় মদ্যপান করা হ'ত অথবা মদ্য রাখা হ'ত। এসব বাসনপত্র ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা জারি করে তিনি এই কওমের মদ্যপান বারণ করতে চান। যখন উক্ত কওম মদ্যপান হ'তে নিরাসক্ত হয়ে উঠে তখন তা ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। –মালিহাবাদী

www.waytojannah.com

বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট থেকে নাবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার মুসাইলামাহর নিকট।

সালাম তাদের জন্য যারা হিদায়াতের পথে চলে।

অতঃপর জেনে রাখো, সাম্রাজ্য সমস্তই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তাকেই তার উত্তরাধিকার করেন। শুভ পরিণতি পরহেযগার–তথা আল্লাহভীরু সংযমশীল লোকদের জন্যই।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ হাবীব ইবনু যাইদ ইবনু আসিম (রা)-কে এই চিঠিসহ মিথ্যুক নাবীর নিকট প্রেরণ করেন।

মিথ্যুক মুসাইলামাহ এই চিঠি পেয়ে রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠে এবং সাধারণ নিয়ম কানুনের বিপরীত পত্র বাহকের দুই হাত এবং দুই পা কেটে দেয়ার নির্মম আদেশ প্রদান করে–এবং নিষ্ঠুরভাবে তা কার্যকরী করা হয়।[৬৬]

নবুওয়াতের দশম বর্ষে এ দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হয়।

নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধি দল

রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানের অধিবাসীদের নিকট ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে একখানা চিঠি পাঠান। নাজরানের অধিবাসীরা ছিল খৃস্টান আর তাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল আসকাফ তথা খৃস্টান ধর্মযাজকের।

আসকাফ চিঠি পড়ে অস্থির এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। কবীলা হামাদানের এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের নাম ছিল শুরাহ্বিল। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে শাসনকর্তা কিংবা বিশপ কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন না।

তাঁকে তিনি ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে চিঠিখানা তার হাতে দিলেন। পরে জিজ্ঞেস করলেন, এ সম্পর্কে আপনার রায় কী?

শুরাহ্বিল বললেন, এ কথা তো সবারই জানা যে, আল্লাহ ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে ওয়াদা করেছেন যে, ইসমাঈল (আ)-এর বংশে নবুওয়াত আসবে। আমার মনে হয় ইনিই সে-ই প্রতিশ্রুত নাবী। তবে ব্যাপারটি হচ্ছে ধর্ম সংক্রান্ত, আপনিই তা ভাল বুঝেন।

যদি পার্থিব কোন ব্যাপার হত তাহলে ভেবে চিন্তে নিজের সুস্পষ্ট অভিমত জানাতে পারতাম।

আসকাফ বললেন, আচ্ছা, বসুন। এই বলে তিনি কাওমে হিময়ার-এর 'আবদুল্লাহ ইবনু শুরাহ্বিলকে ডেকে আনলেন। তাকে অনুরূপভাবে চিঠি পড়িয়ে জিজ্ঞেস করায় তিনিও একই রকম জওয়াব দিলেন।

আসকাফ তৃতীয় আর এক ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন। তার নাম জাব্বার ইবনু ফাইয। তিনি বনী হারিস ইবনু কা'ব গোত্রের লোক। ইনিও পূর্বের দুই ব্যক্তির মতই জওয়াব দিলেন।

---

[৬৬] আবূ বাক্রের খিলাফতকালে নবুওয়াতের অন্যান্য মিথ্যা দাবীদারদের সঙ্গে সঙ্গে মুসাইলামাহ কায্যাবের বিরুদ্ধেও অভিযান পরিচালিত হয়। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ এই অভিযানের নেতৃত্ব প্রদান করেন। মুসাইলামাহ ওয়াহ্শীর হাতে নিহত হয়। *–অনুবাদক।*

www.waytojannah.com

আসকাফ এবার হুকুম দিলেন, "গির্জার ঘন্টা বাজাও। আর গির্জার পর্দা ঝুলিয়ে দাও।" সেই দেশে এটা এক নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, দিনের বেলায় কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হলে তার মীমাংসার জন্য লোকদের জড়ো করার উদ্দেশে গির্জার ঘন্টা অনবরত বাজানো হ'ত এবং গির্জার পরদা ঝুলিয়ে দেয়া হ'ত। আর রাত্রি বেলায় এরূপ প্রয়োজন দেখা দিলে ঘন্টা ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের চূড়ায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হ'ত।

এই গির্জার অধীনে ৭৩টি গ্রাম ছিল আর তাতে এক লক্ষ যুদ্ধোপযোগী যুবক ছিল। দূর দূরান্তর এলাকা থেকে সব লোক যখন এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে সমবেত হ'ল, তখন বিশপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিঠিখানা তাদের শুনালেন এবং সকলের অভিমত জানতে চাইলেন।

অভিমতের আদান প্রদান ও শলা-পরামর্শের পর স্থির হ'ল শুরাহ্বিল, 'আবদুল্লাহ এবং জাব্বারকে নাবী ﷺ-এর খিদমাতে পাঠানো হোক। তারা নিজেরা সব দেখে এবং শুনে এসে রিপোর্ট প্রদান করুন।

এরা যথাসময়ে মাদীনায় নাবী ﷺ-এর খিদমাতে হাজির হন। তারা বেশ কিছু দিন তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করেন এবং ঈসা (আ)-এর স্বরূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জওয়াব শুনে, আচরণ দেখে এবং তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি অবলোকন করে তাঁর সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা গঠন করেন। তারা রাসূল ﷺ-এর উপরেই নাজরানের খৃস্টানদের সম্বন্ধে ফায়সালার ভার অর্পণ করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত উদারতার সঙ্গে নাজরানের খৃস্টানদের মু'আমিলায় তাঁর রায় প্রদান করেন। তিনি জিয়্যার বিনিময়ে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা, ধর্মমত ও বিশ্বাসের পূর্ণ স্বাধীনতা, হক ও অধিকারের নিশ্চয়তা–একটি ফরমানে লিপিবদ্ধ করিয়ে তাদের হাতে প্রদান করেন।

তারা সেই ফরমান নিয়ে হৃষ্টচিত্তে নাজরানের পথে ফিরে চলেন। তাদের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে বিশপ স্বয়ং এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি এক মনযিল অগ্রসর হয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

প্রতিনিধি দল আসকাফকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফরমানটি তাঁর হাতে সমর্পণ করেন। আসকাফ পথ চলতে চলতেই তা পাঠ করেন এবং তিনি নাবী ﷺ সম্পর্কে একটি সুধারণা প্রকাশ করেন। তার চাচাতো ভাই বিশর ইবনু মু'আবিয়াহ রাসূলের সম্বন্ধে মোটামুটি তথ্য অবগত হয়েই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের এক তীব্র তাড়না অন্তরে অনুভব করতে থাকেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করে তার উটনীর গতি মাদীনার দিকে ঘুরিয়ে দেন। তিনি আসকাফকে বলেন, আমি তাঁরই খিদমাতে চললাম। উটনীর পালান তাঁর কাছে পৌঁছেই খুলব– তাঁর পূর্বে নয়। বিশপ তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু হৃদয়ে যে প্রেরণা, অন্তরে যে জোশ আছে তিনি অনুভব করছেন তা হচ্ছে লোহায় এক মহা শক্তিশালী চুম্বকের আকর্ষণ। আসকাফ কী করে তা ঠেকিয়ে রাখবে? সেই মহা আকর্ষণে তিনি ছুটে চললেন। মাদীনায় পৌঁছে তাঁর গতি থামল।

নাবী ﷺ-এর খিদমাতে হাজির হয়ে তিনি ইসলাম কবুল করে শান্ত হন। অবশেষে পরবর্তী এক সুযোগে শাহাদতের গৌরব অর্জন করে তিনি তাঁর আত্মসমর্পিত জীবনকে সফলতার উচ্চ মার্গে পৌঁছে দেন।

প্রতিনিধি দল নাজরানে পৌঁছার পর মাদীনার খবর আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মোটামুটি পরিচয় সবারই জানাজানি হ'ল। গির্জার সর্বোচ্চ অংশে তখন বাস করতেন এক সন্ন্যাসী। তিনি বছরের পর বছর সেখানেই অবস্থান করতেন। তাঁর কানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খবর পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তা তার অন্তর জগতে পৌঁছে গেল। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। চিৎকার করে বলতে লাগলেন– আমাকে নিচে নামিয়ে দাও। নতুবা আমি উপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ব।

www.waytojannah.com

তাকে নিচে নামানো হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাদীনার পথ ধরলেন। সঙ্গে নিলেন একটি পেয়ালা, একটি লাঠি আর একটি চাদর। এগুলো তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে উপহার স্বরূপ পেশ করেন। আব্বাসীয় খলীফাদের সময় পর্যন্ত এগুলো যত্নের সঙ্গে সুরক্ষিত ছিল। (সম্ভবতঃ মোঙ্গলদের আক্রমণে বাগদাদ বিধ্বস্তির সময় তা ধ্বংস হয়ে যায়।)

সন্ন্যাসী মাদীনায় কিছু দিন অবস্থান করে ইসলামের শিক্ষা ও নীতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি নিয়ে এবং ফিরে আসার ওয়া'দা করে নাজরানে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু নাবী ﷺ-এর পবিত্র জীবনকালে তার পক্ষে মাদীনায় ফিরে যাওয়া আর সম্ভব হয়নি।

নাজরানের দ্বিতীয় ডেপুটেশন

তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলের প্রত্যাবর্তনের পর আসকাফ আবুল হারিসের নেতৃত্বে ৬০ সদস্যের এক সুবৃহৎ ডেপুটেশন মাদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে গিয়ে হাজির হয়। এদের ভিতর জজ ও হাকিম, গভর্নর ও আমীর এবং ২৪ জন প্রসিদ্ধ সরদার ছিলেন।

তারা যখন মাদীনায় পৌঁছেন তখন 'আসরের ওয়াক্ত। (সম্ভবতঃ সেই দিবসটি ছিল রবিবার) তাদের প্রার্থনার সময় সমুপস্থিত। তারা মাসজিদেই তাদের প্রার্থনার কর্তব্য সম্পন্ন করতে উদ্যত হলে লোকেরা আপত্তি জানাল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের অনুমতি প্রদান করলেন। তারা মাসজিদে নাববীতে বসেই পূর্বমুখী হয়ে তাদের সালাত–তথা প্রার্থনা সমাধা করলেন।

তারা সেখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করলেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে নিজেই জওয়াব দিতেন অথবা ওয়াহীর অপেক্ষা করতেন। মাদীনার ইয়াহূদী 'আলিমরাও মাঝে মাঝে তাদের কাছে আসতেন। তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কও হ'ত।

এক বারের কথা। ইয়াহূদী পণ্ডিতরা বললেন, ইব্‌রাহীম (আ) ইয়াহূদী ছিলেন। খৃস্টান পণ্ডিতরা তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, না, তিনি নাসারা (খৃস্টান) ছিলেন। এই তর্ক-বিতর্কের পরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াত নাযিল হ'ল। তিনি সেগুলো তাঁদের সামনে পড়ে শুনিয়ে দিলেন।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ – يَآ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِي إِبْرَاهِيْمَ وَمَآ أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيْلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُوْنَ – هَآ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُوْنَ – مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيْفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

"আপনি (হে রাসূল!) বলুন, হে আহলে কিতাব ইয়াহূদ ও খৃষ্টানগণ! তোমরা কী কারণে ইব্‌রাহীম সম্বন্ধে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছ? তাওরাত ও ইঞ্জীল তো নাযিল করা হয়েছিল তার (বহু যুগ) পরে। তোমরা কি বুঝে দেখ না!

দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল, তা নিয়ে তোমরা তো তর্ক করেছ, কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের কোনই জ্ঞান নেই, তা নিয়ে কেন তোমরা তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছ? বস্তুতঃ (ঐ সব বিষয়ে) একমাত্র আল্লাহই জ্ঞাত আছেন, তোমরা জ্ঞাত নও।

www.waytojannah.com

ইব্‌রাহীম ইয়াহূদীও ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না, বরং সে ছিল একজন একনিষ্ঠ মুসলিম, আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" (সূরা আলে-'ইমরান ৩: ৬৪-৬৭)

কুরআনের এই আয়াত শুনে এক ইয়াহূদী পণ্ডিত বলে উঠলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি এই আশাই পোষণ করেন যে, আমরা আপনারও তেমনি 'ইবাদাত শুরু করে দেই যেমন খৃস্টানরা 'ঈসার 'ইবাদাত করে থাকে?

খৃস্টানদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, আপনার কি এটাই মতলব? আর এই আকীদার প্রতিই আপনার আহ্বান?

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, মা'আযাল্লাহ! আমি এর থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। এ কী করে সম্ভব হতে পারে যে, আমি আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারোর এবং অন্য কিছুর প্রতি আহ্বান জানাব? অথবা কাউকে আল্লাহ ছাড়া অপর কিছুর 'ইবাদাতের হুকুম দিব? আল্লাহ আমাকে এ কাজের জন্য পাঠাননি। আর আমাকে এ রকম কোন হুকুমও করেননি।

এরপর পরই কুরআন মাজীদের এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হ'ল:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ – وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

"আল্লাহ যে ব্যক্তিকে কিতাব দেন এবং হিকমাত ও নবুওয়াত প্রদান করেন সে এসব পেয়ে লোকদেরকে বলবে যে, তোমরা সকলে আমার বান্দা হয়ে যাও আল্লাহকে বাদ দিয়ে–এটা তার পক্ষে শোভন নয়–সম্ভব নয়। বরং সে বলবে, তোমরা সবাই রব্বানী হয়ে যাও– আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর। আর সেই ব্যক্তি তোমাদের এরূপ হুকুমও দিতে পারে না যে, তোমরা ফেরেশতাদেরকে এবং নাবীদেরকে রব্‌রূপে গ্রহণ কর। সে কি তোমাদেরকে মুসলিম হওয়ার পর কাফির হয়ে যাওয়ার আদেশ দিতে পারে?" (সূরা আলে-'ইমরান– ৭৯-৮০)

এরপর নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, 'ঈসা (আ) সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী আমরা জানতে চাই যেন আমরা লোকদের এ কথা জানিয়ে দিতে পারি। তিনি বললেন, আমি এ সম্পর্কে আজ কিছু বলব না। কাল আল্লাহর তরফ থেকে আমাকে যা জানিয়ে দেয়া হবে তাই তোমাদের অবহিত করব। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হ'ল:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

"আল্লাহর নিকট 'ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের মতই। তাকে আল্লাহ মাটি থেকে পয়দা করেছিলেন, তারপর তাকে বলেছিলেন–'হও', ফলে সে হয়ে গেল–অস্তিত্বে এলো। (সূরা আলে-'ইমরান– ৫৯)

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ – فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ.

"এই সত্য সমাগত হয়েছে আপনার প্রভু পরওয়ারদিগার হ'তে, সুতরাং আপনি সংশয়-সন্দিগ্ধ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

www.waytojannah.com

আপনার নিকট এই সত্য জ্ঞান আসার পরেও আপনার সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হতে চাইবে যারা, তাদের আপনি জানিয়ে দিন, এসো, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে, তারপর সমবেত হয়ে আমরা বিনীত আবেদন জানাই এবং তলব করি মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(সূরা আলে-'ইমরান- ৬০-৬১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সকালেই খৃষ্টানদেরকে আল্লাহর এই ওয়াহী শুনিয়ে দিলেন এবং 'মুবাহালাহ' করার জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সাহস না পেয়ে মুবাহালার পথ গ্রহণে অস্বীকার করলেন। দ্বিতীয় দিবসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দৌহিত্র হাসান এবং হুসাইন (রা)-কে কোলে তুলে নিয়ে তাদের কাছে এলেন। ফাতিমা (রা)ও তাঁর পিছে পিছে আসলেন। নাবী ﷺ পুনঃ মুবাহালার আহ্বান জানালেন। কিন্তু তারা এবার সম্পূর্ণভাবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তারা আর অগ্রসর হতে সাহস পেলেন না। তারা সন্ধি কামনা এবং নিরাপত্তার প্রার্থনা জানালেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাঁর স্বাভাবিক উদারতার পরিচয় দিয়ে তাদের অভয় দিলেন এবং নাজরানের অধিবাসীদের নামে একখানা সনদ লিখিয়ে দিলেন।

সনদের অনুবাদ নিম্নে পেশ করা হচ্ছে:

বিসমিল্লা-হির রাহমা-হির রাহীম

প্রধান আসকাফ আবুল হারিস, অন্যান্য আসকাফ ও পাদরী পুরোহিতবৃন্দ, তাদের অনুসারীগণ, তাদের ধর্মাবলম্বীগণ এবং সাধারণ অধিবাসীবৃন্দ!

তাদের উপস্থিত, অনুপস্থিত স্বজাতীয় ও অনুগত সকলের জন্য আল্লাহর নামে তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতিজ্ঞা এই যে, সকল প্রকার সম্ভাব্য চেষ্টা দ্বারা আমরা তাদের নিরাপদ রাখব। তাদের দেশ, তাদের বিষয় সম্পত্তি ও ধন-সম্পদ এবং তাদের ধর্ম ও ধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় আচার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ন, অব্যাহত ও নিরাপদ থাকবে। তাদের কোন সমাজগত আচার ব্যবহারের, কোন বিষয়গত স্বত্বাধিকারের এবং কোন ধর্মগত সংস্কারের উপর কখনও কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না। অল্প হোক, বিস্তর হোক যা কিছু তাদের আছে তা সম্পূর্ণরূপে তাদেরই আছে, তাদেরই থাকবে। মুসলিম তাদের নিকট অর্থের বিনিময়ে ব্যতীত কোন প্রকার উপকার নিতে পারবে না। তাদের নিকট থেকে ওশর গ্রহণ করা হবে না। তাদের দেশের মধ্য দিয়ে সৈন্য চালনা করা হবে না। আল্লাহর নামে তাদেরকে আরও প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে যে, কোন ধর্মযাজককে তার পদ থেকে অপসৃত করা হবে না, কোন সন্ন্যাসীর সাধনায় কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করা হবে না। যতদিন তারা শান্তি ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করে চলবে ততদিন এ সনদের লিখিত সমস্ত শর্ত সমানভাবে বলবৎ থাকবে।

"তারা অত্যাচারী না হোক এবং তারা অত্যাচারিত না হোক।"

সনদ লাভের পরে ডেপুটেশন নিজ দেশে ফেরার জন্য প্রস্তুত হ'ল। বিদায় গ্রহণের পূর্বে তারা রাসূল ﷺ-এর খিদমাতে এই দরখাস্ত পেশ করল যে, আমাদের সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত-আমানাতদার লোক পাঠিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আমি একজন প্রকৃত আমানাতদার লোক তোমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে

www.waytojannah.com

দেব। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবূ 'উবাইদাহ (রা)-কে ডাক দিয়ে বললেন, কুম ইয়া আবা 'উবাইদাহ ইবনুল জার্‌রাহ। "হে আবূ 'উবাইদাহ ইবনু জার্‌রাহ! তুমি দাঁড়িয়ে যাও।" যখন তিনি দাঁড়ালেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিনিধি দলকে লক্ষ্য করে বললেন, এই লোক হচ্ছে এই উম্মাতের আমীন–বিশ্বস্ত আমানতদার।

আবূ 'উবাইদাহ সেখানে গমন করার পর তাঁর সাধু সাহচর্যে উক্ত এলাকায় ইসলাম প্রসারিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আলী (রা) ইবনু আবূ তালিবকে তথায় সাদাকাহ এবং জিয্‌য়া আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন।

আয্‌দ গোত্রের প্রতিনিধি দল

এই প্রতিনিধি দল ছিল সাত সদস্য বিশিষ্ট। এরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাজির হলেন তখন তাদের কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ আর চাল-চলন দেখে তিনি চমকিত এবং আনন্দিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পরিচয় কী?

তারা বললেন, আমরা মু'মিন। এ কথা শুনেই রাসূলুল্লাহ ﷺ একটু মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন, প্রত্যেক কথার একটা হাকীকাত–সত্যস্বরূপ থাকে। তোমাদের কথার এবং ঈমানের হাকীকাত কী?

তারা বললেন, আমরা ১৫টি চরিত্রে অভ্যস্ত হয়েছি। এর মধ্যে পাঁচটি বিশ্বাস সংক্রান্ত যার উপর আপনার প্রেরিত দূতগণ আমাদেরকে ঈমান রাখতে হুকুম করেছেন। আর পাঁচটি 'আমাল সংক্রান্ত যা তারা আমাদের সম্পাদন করতে বলেছেন। অপর পাঁচটি হচ্ছে এমন অভ্যাস যা জাহিলিয়াতের যুগ থেকে আমাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যরূপে চলে আসছে। আমরা এ পর্যন্ত এই ১৫টি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি আর থাকবও, অবশ্য আপনি যদি তার কোনটি অপছন্দ না করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন,

আচ্ছা, কী সেই পাঁচটি বস্তু যার উপর আমার প্রেরিত ব্যক্তিগণ তোমাদের ঈমান রাখতে বলেছেন?

তারা বললেন, আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন ঈমান আনতে– ১। আল্লাহর উপর, ২। তাঁর মালায়িকার (ফেরেশতাদের) উপর, ৩। তাঁর প্রেরিত গ্রন্থসমূহের উপর, ৪। তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের উপর এবং ৫। মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আচ্ছা সেই পাঁচ বস্তু কী যা তারা 'আমাল করতে হুকুম দিয়েছেন?

তারা বললেন, আমাদেরকে তারা হুকুম দিয়েছেন: ১। ঘোষণা করতে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনই মা'বূদ নেই। ২। আর হুকুম দিয়েছেন সালাত কায়িম করতে। ৩। যাকাত পুরোপুরি এবং ঠিক ঠিক মত আদায় করতে। ৪। রমাযান মাসে সওম পালন করতে এবং ৫। সামর্থ্যে কুলালে হাজ্জব্রত পালন করতে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষে জিজ্ঞেস করলেন, জাহিলিয়াতের যুগ থেকে যে ৫টি বস্তু তোমরা তোমাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যরূপে পালন করে আসছ, সেগুলো কী?

তারা বললেন: ১। প্রাচুর্যের সময় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, ২। বিপদাপদের সময় ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন করা, ৩। আল্লাহ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকা, ৪। পরীক্ষার স্থানসমূহে এবং পরীক্ষার সময়গুলোতে সত্যের প্রতি অবিচল ও অটল থাকা এবং ৫। দুশমনের দুঃখে আনন্দ প্রকাশ না করা।

www.waytojannah.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ এদের কথা শুনে বললেন, যারা প্রথম এসব কথা শিখিয়েছিলেন, তারা ছিলেন নিশ্চিতরূপে বিচক্ষণ 'আলিম এবং প্রজ্ঞাশীল হাকিম। তাদের বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতায় মনে হয় হয়ত বা তারা নাবী ছিলেন। আচ্ছা আমি আর পাঁচটি জিনিস বর্ধিত করে তোমাদের জন্য ২০টি চরিত্র পুরো করে দিচ্ছি।

তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে যা বলছ তা যদি সত্য হয় তাহলে–

১. তোমরা এমন বস্তু জমা করে রেখো না যা তোমরা খাবে না। অর্থাৎ তোমাদের প্রয়োজনীয় আহার্য ছাড়া অন্য কোন বস্তু জমা করে রাখবে না।

২. এমন গৃহ বানাবে না যেখানে বসবাস করা যাবে না (বা বসবাস করা হয়ে উঠবে না)।

৩. এমন কথা কোন সময় বলো না, যে কথা থেকে আগামীকাল তোমাদের ফিরে আসতে হবে (অর্থাৎ যে কথা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। ভবিষ্যতে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হবে–এমন কথা মুখে উচ্চারণ বা জনসমক্ষে ঘোষণা করো না)।

৪. সমীহ করে চলো আল্লাহকে যার দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে এবং যাঁর সামনে তোমাদের হাজির করানো হবে।

৫. আর সেই বস্তুর প্রতি প্রবণতা রেখো– সেই দিকে কায়মনোবাক্যে ঝুঁকে পড়ো যা আখিরাতে কাজে আসবে। সেখানেই তোমরা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

এরপর উক্ত প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তারা তাঁর উপদেশগুলো স্মরণ রাখেন এবং সেগুলো পুরোপুরি মেনে চলেন।

এই প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন সুয়াইদ ইবনুল হারিস। তিনি হচ্ছেন এই হাদীসের মূল রাবী এবং ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণদাতা।

বনু উযরা গোত্রের প্রতিনিধি দল

নবম হিজরীর সফর মাসে এই গোত্রের কারো ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়। হামযা ইবনু নুমান এদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন–

"আমরা উযরার বংশধর মায়ের দিক থেকে উযরা ছিল কুসাই এর ভাই।"

রাসূল ﷺ পরম আনন্দের সাথে তাদের 'আহলান ওয়া সাহলান' বলে সাক্ষাৎ জানালেন। তারা সবাই সর্বান্তঃ করণে ইসলাম গ্রহণ করল। রাসূল ﷺ তাদেরকে সুসংবাদ শুনালেন, সিরিয়ায় রোম সাম্রাজ্যের রাজত্ব বিলুপ্ত হবে এবং হিরাক্লিয়াস পালিয়ে যাবে। রাসূল ﷺ তাদেরকে জ্যোতিষীদের খবর জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করলেন এবং একমাত্র ইবরাহীমের শেখানো কুরবানী ছাড়া অন্য সমস্ত কুরবানী পরিত্যাগ করতে বললেন, সকল প্রতিনিধি দলকে রীতি মোতাবেক পাথেয় দেন।

মুররা গোত্রের প্রতিনিধি দল

সরদার হারিস ইবনু আওফের নেতৃত্বে এই গোত্রেরও ১৩ জন মদিনায় পৌছে। তারা নিজেদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ-কে জানায়, আমরা লুয়াই বিন গালিবের বংশধর এবং আপনার সাথে আমাদের বংশীয় সম্পর্ক রয়েছে। রাসূল ﷺ তাদের কাছে তাদের এলাকার অবস্থা জানতে চান। তারা

www.waytojannah.com

সেখানকার দুর্ভিক্ষের এক করুন চিত্র তুলে ধরে এবং তাঁর দু'আ চায় রাসূল ﷺ তৎক্ষণাৎ দু'আ করেন। গোত্রে ফিরে গিয়ে তারা জানতে পারে যে রাসূল ﷺ যেদিন দু'আ করেছেন ঠিক সেই দিনই বৃষ্টি হয়েছিল এবং যমীন শস্য শ্যামল হয়ে উঠল। ইসলামের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য তারা কয়েকদিন মদিনায় থাকেন এবং তারপর বিদায় হন। তাদেরকে পথ খরচ দেয়া হয়।

গাসসান গোত্রের প্রতিনিধি দল

গাসসান যদিও বংশগতভাবে আরব গোত্র ছিল। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার কারণে রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে আরব অঞ্চলের উপর সামনে চালাত। ১০ম হিজরীতে এই গোত্রের তিন ব্যক্তি মাদীনায় এসে রাসূল ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা জানায়, আমাদের গোত্রের লোকরা বর্তমানে যে পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, তা পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করবে না। রাসূল ﷺ তাদের পথখরচ দিয়ে বিদায় করলেন। তারা গিয়ে আবার দাওয়াত দিল। কিন্তু তাও বিফলে গেল। তিনজনই পরিস্থিতির চাপে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা গোপন রাখলেন। এদের একজন ইয়ারমুক যুদ্ধের সময় আবূ উবাইদার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ইসলামের উপর নিজের অবিচল আস্থার কথা ব্যক্ত করেন। অন্য দু'জন তার আগেই মারা গিয়েছিলেন।

অন্যান্য প্রতিনিধি দল

অন্যান্য অঞ্চল থেকেও নবম ও দশম হিজরী সালে আরও অনেক প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটতে থাকে। এভাবে বানী আসাদ, কিন্দা আশ'আর, হিময়ার, বানী সা'দ, 'আবদুল কায়স, বানী তাই, হামদান, তারিক ইবনু 'আবদুল্লাহ, নাজির, দিরা'আ, খাওলান, মাহারিব, বানী আল-হারিস, বানী আইশ, গামিদ, বানী ফাযারা, সালামান, নাখা'আ প্রভৃতি আরবের প্রাচীন ও নামকরা গোত্রের দূত ও প্রতিনিধিগণ রাসূল ﷺ-এর দরবারে হাজির হন। এদের মধ্যে কেউ ছিল পৌত্তলিক, কেউ পারসিক, কেউ বা খৃস্টান। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংস্পর্শে এসে ও তাঁর কথা শুনে অনেকে ইসলাম কবূল করেন, আবার কোন কোন দল জিয্য়া দিতে স্বীকৃত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন। পরে অবশ্য এরাও ইসলামের মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হয়ে মুসলিম হয়ে যান।

আরবের বিভিন্ন প্রান্তের নব-দীক্ষিত মুসলিমদের কোন কোন প্রতিনিধি দলও রাসূল ﷺ-কে চোখে দেখার এবং তাঁর মুখের বাণী শোনার তীব্র বাসনায় মাদীনায় তাঁর খিদমাতে হাজির হন।

প্রত্যেক দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে মহৎ ব্যবহার করেন এবং প্রত্যেকের উপযোগী যেসব উপদেশ প্রদান করেন তার সবই আকর্ষণীয় এবং উল্লেখযোগ্য। স্থানাভাবে তার সংকলন করা সম্ভব হ'ল না।

www.waytojannah.com

মক্কা বিজয় ও প্রসঙ্গিক কিছু আলোচনা

মক্কা জোরপূর্বক বিজয় হওয়ার প্রমাণসমূহ–

১. কেউ নাবী থেকে এ কথা বর্ণনা করেননি যে, তিনি মক্কা বিজয়ের সময় মক্কাবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেছেন। এবং মক্কাবাসীদের কেউ সন্ধির উদ্দেশ্যেও আসেনি। আবু সুফিয়ান রাসূল ﷺ-এর নিকট এসেছিল। অতঃপর রাসূল ﷺ আবু সুফিয়ানের বাড়িকে নিরাপত্তার আশ্রয়স্থল হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, যে আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নেবে এবং যে অস্ত্র বহন করবে না এবং যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তার প্রাণ নিরাপদ। যদি সন্ধির মাধ্যমে মক্কার বিজয় হত তবে এমনটি কখনো বলতেন না। কেননা সন্ধি ব্যাপক নিরাপত্তার দাবিদার।

২. নবী ﷺ বলেছেন–

إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه أذن لى فيها ساعة من نهار.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ হস্তীবাহিনী থেকে মক্কাকে সংরক্ষণ করেছেন এবং রাসূল এবং মু'মিনদেরকে তার উপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন এবং নিশ্চয়ই তিনি আমাকে দিনের এক অংশে এর অনুমতি দিয়েছেন।"

অন্য শব্দে–

إنها لا تحل لأحد قبلى، ولن تحل لأحد بعدى، وإنما أحلت لى ساعة من نهار.

"মক্কা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল ছিল না এবং আমার পরে কখনো কারো জন্য হালাল হবে না। আমার জন্য দিবসের এক অংশে হালাল করা হয়েছিল।" এ হাদীস থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মক্কা জোরপূর্বক বিজিত হয়েছে।

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন খালিদ ইবনু ওলীদকে সেনাদলের ডান পার্শ্বে এবং যুবাইর (রা)-কে বামপার্শ্বে দাঁড় করান। আর আবূ উবাইদাহকে হুস্সার উপত্যকায় দাঁড় করান। এরপর বললেন, হে আবূ হুরাইরা, আনসারদেরকে ডাকো। আনসাররা দৌড়ে আসল। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, হে আনসারীরা তোমরা কি কুরাইশদের বিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করেছ? তারা বলল, হ্যাঁ! রাসূল ﷺ বললেন, মনে রেখো তোমরা যখন আগামীকাল তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে তখন তাদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত করে দিবে। এবং তাঁর হাত দিয়ে বিষয়টিকে গোপন করলেন। তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখলেন।

এরপর বললেন, তোমরা ছাফা পাহাড়ে অবস্থান করবে। এ দিন কুরাইশদের যে নেতাই আক্রমণের জন্য এসেছে সাহাবারা তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করে দিয়েছে। এ দিন রাসূল ﷺ পর্বতে আরোহণ করেন এবং আনসাররা এসে ছাফা পাহাড়কে চারদিক দিয়ে বেষ্টন করে নেয়। এরপর আবূ সুফিয়ান এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল আজ কুরাইশরা নির্মূল হয়ে যাবে। আজ তাদের কোনো রক্ষা নেই। তখন রাসূল ﷺ ঘোষণা দিলেন, যে আবূ সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নেবে এবং যে ব্যক্তি মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে এবং যে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিবে সে নিরাপদ।"

www.waytojannah.com

তাছাড়া উম্মু হানী একজনকে আশ্রয় দিলে আলী লোকটিকে হত্যার মনস্থ করলেন। রাসূল ﷺ বললেন, "উম্মু হানী! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম।" এটি হয়েছিল মক্কা বিজয়ের পর ঠিক দ্বিপ্রহরে। এ ঘটনা থেকেও একথা বুঝে আসে যে, মক্কা বিজিত হয় বলপূর্বক এবং জবরদস্তির মাধ্যমে।

রাসূল ﷺ মাকীস ইবনু সুবাবাহ, ইবনু খাতাল এবং দু'জন ক্রীতদাসীকে এ দিনে হত্যার নির্দেশ দেন। মক্কা যদি সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হত তবে রাসূল ﷺ তাদের কাউকে হত্যার নির্দেশ দিতেন না। বা তাদেরকে সন্ধির চুক্তি থেকে বাদ দিতেন। সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেন, তোমরা দু'জন মহিলা এবং চারজন পুরুষ ব্যতীত বাকিদের নিরাপত্তা দাও। এদেরকে হত্যা করো যদিও তারা কা'বার গিলাফ ধরে লটকে থাকুক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হিযরত করতে সক্ষম হলে মুসলমানকে মুশরিকদের মধ্যে অবস্থান করতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ করেছেন, আমি প্রত্যেক ঐ মুসলিম থেকে মুক্ত যে মুশরিকদের মাঝে অবস্থান করে। বলা হলো, আল্লাহর রাসূল! কেন? রাসূল ﷺ বললেন, "তুমি কি তাদের জাহান্নামকে দেখতে পাও না।"

তিনি আরো বললেন, "যে মুসলিম কোন মুশরিকের সঙ্গে একত্রে বসবাস করবে সে তার অনুরূপ।"

রাসূল ﷺ বলেন, "তওবা বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত তওবা বন্ধ হবে না এবং বলেন, "হিজরতের পর হিজরত হবে। অতঃপর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সে যে ইবরাহীমের ন্যায় হিজরত করবে। আর পৃথিবীতে নিকৃষ্টতর মানুষরা অবশিষ্ট থাকবে। তাদের পৃথিবী তাদের বের করে দিবে। আল্লাহ তাদেরকে অপদস্থ করবেন এবং জাহান্নাম তাদেরকে বানর ও শূকরের সঙ্গে একত্রিত করবে।"

ইফকের হাদীস

রাসূল ﷺ বনী মুস্তালিকের যুদ্ধে তার পূর্বকার অভ্যাস অনুযায়ী লটারিতে আয়িশার নাম উঠলে তাঁকে নিয়ে সফর করেন। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মাদীনায় ফিরার পথে এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান করল। আয়িশার পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন পড়লে তিনি জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হার ছিঁড়ে পড়ে হারিয়ে যায়। সেখানে তিনি হার তালাশ করতে লাগলেন। যাঁদের দায়িত্ব ছিল উটের পিঠে বসার আসনকে বসিয়ে দেয়ার তারা ভিতরে আয়িশা আছেন ভেবে আসনটি উটের পিঠে বসিয়ে দিলেন। আসনটির শূন্যতা তারা অনুধাবন করতে পারলেন না। কারণ আয়িশা ছিলেন অল্পবয়স্কা ক্ষীণাঙ্গিনী।

অপরদিকে আয়িশা তাঁর স্থানে ফিরে এসে দেখলেন কাফেলা চলে গেছে। তিনি তার হারানো গলার হার খোঁজ করছিলেন। সেখানে কাউকে ডাকবেন এমন কেউ ছিল না। তাই তিনি এদিক-ওদিক তালাশ করার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসেছিলেন। তিনি মনে করলেন যে, রাসূল ﷺ ও তদীয় সঙ্গীরা যখন জানতে পারবে যে, আমি আসনে অনুপস্থিত তখন আমার খোঁজে তাঁরা এখানে আসবেন। আল্লাহ তার কর্ম সম্পর্কে অবগত। তিনি যা ইচ্ছা করবেন তা-ই করেন। আয়িশা কিছুক্ষণের মধ্যে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

www.waytojannah.com

অপরদিকে সাফওয়ান ইবনু মুয়াত্তাল কাফেলার পশ্চাতে সফর করতেন এবং কাফেলা রওয়ানা হওয়ার পর কোনো কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নিতেন। সফওয়ান যখন রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী বলে আয়িশাকে চিনতে পারলেন তখন তার অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠের ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আওয়াজ শুনে আয়িশা জেগে উঠেন। সহীহ আবূ হাতিম এবং সুনানের কিতাবসমূহে এসেছে যে, তিনি আয়িশাকে দেখে চিনে ফেললেন, তিনি পর্দাপ্রথা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তাঁকে দেখেছিলেন। তিনি তাঁকে চেনার পর অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠের সাথে "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন" পড়লেন। এরপর সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। আয়িশা তাতে সাওয়ার হয়ে গেলেন। সাফওয়ান তাঁর সঙ্গে একটি কথাও বলেননি আর আয়িশা "ইন্না লিল্লাহ...." ছাড়া তার থেকে আর কিছুই শুনেননি। এরপর সাফওয়ান নিজে উটের নাকের রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। কাফেলা দ্বিপ্রহরে মদিনায় এসে পৌছল। লোকেরা এ অবস্থা দেখে কান-কথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠল।

এদিকে দুশ্চরিত্র মুনাফিক ও রাসূলের চরম শত্রু আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। এই হতভাগা আবোল-তাবোল বলতে শুরু করল এবং তোমাদের মাঝে নানান কথা প্রচার করতে লাগল। কখনো একত্রে দলবদ্ধ হয়ে আবার কখনোবা একাকী। অতঃপর তারা যখন মদিনায় পৌছলেন তখন অপবাদ আরোপকারীরা নানান কথা বলতে থাকে। রাসূল ﷺ তখন চুপ ছিলেন কোন কথা বলতেন না। অতঃপর রাসূল ﷺ আয়িশাকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। আলী ইঙ্গিতে তাকে তালাক দেয়ার প্রস্তাব দেন। আর উসামা ও অন্যান্যরা তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখার পরামর্শ দেন এবং শত্রুদের কথার প্রতি কর্ণপাত না করার কথা বলেন। আলী (রা) রাসূল ﷺ-এর পেরেশানী ও দুঃখ দেখে লোকদের সন্দেহকে নিশ্চিত মনে করে এমনটি পরামর্শ দেন আর উসামা জানতেন যে, আয়িশা (রা) রাসূল ﷺ-কে এবং তাঁর পিতা-মাতাকে যে পরিমাণ ভালোবাসেন এবং তার পবিত্রতা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, দীনদারি ও ধার্মিকতার প্রতি লক্ষ করে এ পরামর্শ দেন তিনি আল্লাহর নিকট রাসূল ﷺ-এর মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে জানতেন যার কারণে তিনি বুঝেছিলেন যে, আল্লাহ রাসূল ﷺ-এর সহধর্মিনী ও তাঁর বন্ধু সিদ্দীকের কন্যা থেকে এ ধরনের অপরাধ কখনো সংঘটিত হতে পারে না। এ কারণে আবূ আইউব এবং বড় বড় সাহাবাদের অনেকে এ অপবাদের কথা শুনে বললেন–

هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ.

"এটাতো এক গুরুতর অপবাদ।" (সূরা নূর– ১৬)

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, রাসূল ﷺ এক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করলেন কেন? এমনকি এ ব্যাপারে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন এবং সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শও পর্যন্ত করলেন। অথচ তিনি আল্লাহ সম্পর্কে ভালো অবগত এবং তিনি একথা বললেন না কেন, যে আল্লাহ তো পবিত্র মহান এবং এটা তো এক গুরুতর অপবাদ। যেমনটি বলেছেন বড় বড় সাহাবীগণ?

উত্তর: এটা মূলত আল্লাহর হিকমাত ও প্রজ্ঞার বহিপ্রকাশের একটি। তিনি এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তা প্রকাশ করার ইচ্ছে করেছেন। তাছাড়া এ ঘটনায় তিনি রাসূল ﷺ এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মাতকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করেছেন। যাতে এ ঘটার মাধ্যমে একদল লোককে সম্মানিত ও একদল লোককে অপদস্থ করেন এবং ঈমানদারদের ঈমান, হিদায়াত এবং অত্যাচারীদের লাঞ্ছনা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ এক মাস ওহী আসা বন্ধ করে দেন। যাতে

www.waytojannah.com

এর মাধ্যমে ঈমানদার সত্যবাদীদের ঈমান সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহ তা'আলা, রাসূল ﷺ , তাঁর পরিবার পরিজন এবং আল্লাহর সত্যবাদী বান্দাদের প্রতি সুধারণা তৈরি হয়। আর মুনাফিকদের অপবাদ আরোপ এবং নেফাকী এবং কপটতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া দীর্ঘ একমাস ওহী অবতীর্ণ না হওয়ার কারণ এটাও ছিল যে, ঈমানদারদের অন্তর আল্লাহ এ ব্যাপারে তাঁর নবীর উপর কী বিধান অবতীর্ণ করেন তার অপেক্ষায় চাতক পাখির ন্যায় অধীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়েছিল। অতঃপর রাসূল ﷺ তাঁর আহলে বাইত এবং আবূ বাকার সিদ্দীক (রা) ও তার পরিবার এবং সাহাবায়ে কেরাম এবং মুমিনদের অপেক্ষার প্রহরের সমাপ্তি ঘটে। রাসূল ﷺ-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ যদি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটির ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ করতেন তাহলে এ হিকমত ও বিজ্ঞতার সমাপ্তি ঘটত।

আল্লাহ চেয়েছিলেন তাঁর নিকট তাঁর রাসূল এবং রাসূল ﷺ-এর পরিবারের কি মর্যাদা তা প্রকাশ করতে, নিজে এর সমাধান করতে এবং শত্রুদের কথা খণ্ডন করতে। আর রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীর ব্যাপারে যে অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে রাসূল ﷺ জানতেন যে, এ অপবাদ থেকে তার স্ত্রী সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র তথাপি সে ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার ক্ষেত্রে নীরবতা পালন করেছেন নাউযুবিল্লাহ! এমনটি নয় যে তিনি তাঁর পরিবারের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করতেন। এ কারণেই অপবাদ আরোপকারীদের নিকট তিনি যখন ওজর পেশ করলেন তখন বললেন, "এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমার ওজর কে শুনবে যার থেকে আমার পরিবার কষ্ট পেয়েছে। আল্লাহর শপথ আমি আমার পরিবার সম্পর্কে শুধু ভালোই জানি। তারা এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে আপত্তি পেশ করছে যার সম্পর্কেও আমি শুধু ভালোই জানি। সে আমার সঙ্গ ব্যতীত আমার গৃহে কখনো প্রবেশ করেনি।"

এরপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর যারা অপবাদ আরোপ করেছিল রাসূল ﷺ তাদেরকে ৮০টি করে বেত্রাঘাত করেন। নরাধম আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইকে বেত্রাঘাত লাগানো হয়নি যদিও সেই এ অপবাদ রটানোর হোতা।

গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম প্রসঙ্গে

গৃহপালিত গাধার গোশতকে খায়বারের যুদ্ধের দিন হারাম ঘোষণা করা হয়। এর কারণ গাধার গোশত নাপাক। সাহাবাদের কেউ কেউ এর হারাম হওয়ার কারণ বলেছেন ভারবাহী পশু হওয়া। আবার কারো মতে যাকাত হিসেবে এর পঞ্চমাংশকে না দেয়ার কারণে একে হারাম করা হয়েছে।

আবার কারো মতে গাধা গ্রামের আশপাশে থাকার কারণে এবং নাপাক ও মলমূত্র ইত্যাদি খাওয়ার কারণে তার গোশত খাওয়া হারাম করা হয়েছে। তবে সঠিক বক্তব্য সেটাই যা রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত এবং এ মতটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা অন্যান্যরা কারণ হিসেবে যা উল্লেখ করেছে তা বর্ণনাকারীর ধারণা মাত্র।

এ হারাম হওয়া এবং আল্লাহর ইরশাদ–

قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ.

এর মাঝে কোনো বিরোধ নেই। কারণ এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন এ চারটি জিনিসকেই হারাম ঘোষণা করা হয়। এরপর ধীরে ধীরে এর সঙ্গে আরো অনেক জিনিসকে যোগ করা হয়। গাধার গোশতকেও পরবর্তীতে হারাম ঘোষণা করা হয়। গাধার গোশতকে হারাম ঘোষণা করা একটি স্বতন্ত্র বিধান। এটা কুরআনের বৈধতা বিরোধীরা তার ব্যাপকতা বিনষ্টকারী নয়। নাসিখ বা রহিতকারী হওয়া তো অনেক দূরের বিষয়।

www.waytojannah.com

মুত'আ বিবাহ হারাম হওয়া প্রসঙ্গে

খাইবার যুদ্ধে মুত'আকে হারাম করা হয়নি। বরং সঠিক মতানুসারে মক্কা বিজয়ের বছর মুত'আকে হারাম করা হয়। একদল আলেম মুত'আ খাইবারের যুদ্ধের দিন হারাম করা হয়েছে বলে মনে করেন। তাদের দলিল সহীহাইনে বর্ণিত আলী (রা)-এর হাদীস রাসূল ﷺ খাইবারের দিন মুত'আ বিবাহকে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

সহীহাইনে আরো এসেছে যে, "আলী (রা) ইবনু আব্বাসকে মুত'আর ব্যাপারে নম্রতা করতে শুনেছেন।"

তারা যখন দেখলেন যে, রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর মুত'আকে বৈধ বললেন। এরপর হারাম ঘোষণা করলেন। তাই তাদের বক্তব্য হলো, মুত'আ বিবাহকে প্রথমে অবৈধ ঘোষণা করা হয় এরপর বৈধ ঘোষণা করা হয় এবং পুনরায় অবৈধ ঘোষণা করা হয়।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, শুধু মুত'আ, ব্যতীত অন্য কোনো জিনিসকে হারাম করার পর হালাল করা হয়েছে এবং এরপর পুনরায় আবার হারাম করা হয়েছে এমনটি নেই। তারা বলেন, দু'বার মুত'আ বিবাহকে রহিত করা হয়েছে। অন্যান্যরা এক্ষেত্রে তাদের বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেন, মুত'আ বিবাহকে শুধু মক্কা বিজয়ের বছরই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। অবশ্য এর পূর্বে বৈধ ছিল।

তারা বলেন, আলী (রা) মুত'আর এবং গৃহপালিত গাধা হারাম হওয়ার রিওয়ায়াতকে একত্রে বর্ণনা করার কারণ ইবনু আব্বাস (রা) এ দুটো জিনিসকে বৈধ মনে করতেন। নিঃসন্দেহে গাধার গোশত হারাম হয়েছে খাইবারের দিন। আলী গাধার গোশত হারাম হওয়ার দিন হিসেবে খাইবারের দিনকে উল্লেখ করেছেন এবং মুত'আ বিবাহ হারাম হওয়ার জন্য কোন দিন বা সময় উল্লেখ করেননি।

এমনটিই সহীহ সনদে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে এসেছে যে–

حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وحرم متعة النساء.

"রাসূল ﷺ খাইবার যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশতকে হারাম করেছেন এবং মুত'আ বিবাহ হারাম করেছেন।"

সুতরাং অনেকে মনে করেছেন যে, খাইবারের দিনই হলো উভয়টির হারাম হওয়ার দিন। তাই তারা উভয়টির ক্ষেত্রে "খাইবারের দিন" এর শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং পরবর্তীরা আরো সংক্ষেপ করে শুধু একটির ক্ষেত্রে অর্থাৎ গাধার গোশতের ক্ষেত্রে হারাম হবার বিধান প্রযোজ্য বলে মনে করেন।

এখানে আরেকটি বিষয় জানার আছে তা হলো, রাসূল ﷺ একবার একসঙ্গে একই বছরে নিকাহে মুতআ'কে অবৈধ করেননি বরং প্রয়োজনের তাগিদে একে বৈধ করেছেন এবং প্রয়োজন না থাকার কারণে পুনরায় হারাম করেছেন। ইবনু আব্বাস (রা)-এর পদ্ধতিও এমন ছিল, তিনি প্রথমে মৃত প্রাণী, রক্ত এবং শূকরের গোশতের ন্যায় একে হারাম মনে করতেন এবং প্রয়োজনের তাগিদে এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হবার আশঙ্কার কারণে একে সাময়িক বৈধ মনে করতেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত না হয়ে একে একেবারে হারাম মনে করতে থাকে এবং এ ব্যাপারে কবিতা আবৃতি করতে থাকে। ইবনু আব্বাস (রা) এ অবস্থা দেখে হারাম হওয়ার মতের দিকে ফিরে আসেন।

www.waytojannah.com

উৎপাদিত শস্যের বিনিময়ে বাগান ও জমিন বর্গা

উৎপাদিত ফল ও শস্যের এক নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে বাগান ও জমিন বর্গা দেয়া জায়েয। যেমনটি রাসূল ﷺ খায়বারের ইহুদীদের সঙ্গে করেছিলেন। এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ লেনদেনকে বৈধ রাখেন। তার পরে সাহাবারাও এর উপর আমল করেন। এটা ভাড়ায় দেয়া নেয়া তথা লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং মুশারাকা তথা যৌথ মূলধন কারবার এবং মুদারাবার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে মুদারাবাকে বৈধ আর বাগান ও জমিন বর্গা দেয়াকে অবৈধ মনে করে সে স্বজাতীয় জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করছে।

গুপ্তচর হত্যা প্রসঙ্গে

উল্লিখিত যুদ্ধ থেকে গুপ্তচর হত্যার বৈধতা পাওয়া যায়। যদিও গুপ্তচর মুসলমান হোক। কেননা উমার (রা) মক্কাবাসীদের নিকট যুদ্ধের গোপন খবর প্রকাশের এদ্দেশ্যে মক্কায় গমনকারী হাতিব ইবনু আবী বালতাআহর হত্যা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল ﷺ উত্তরে সে মুসলিম তাকে হত্যা করা বৈধ নয় এমনটি বলেননি। বরং বলেছেন, তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ বদরে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা তা কর। রাসূল ﷺ-এর এ উক্তি থেকে গুপ্তচর হত্যার বৈধতা পাওয়া যায়। এটি ইমাম মালিকের মাযহাব। ইমাম আহমাদের এক বর্ণনায় এটি জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী এবং আবূ হানীফা বলেন, গুপ্তচর হত্যা করা জায়েয নেই। ইমাম আহমাদের জাহেরী মাযহাবও এটাই। উভয় দলই হাতিবের ঘটনা দিয়ে দলিল পেশ করেছেন। তবে সঠিক মতামত হলো গুপ্তচর হত্যা করা না করার দায়িত্ব হলো ইমাম বা সরকারের। ইমাম যদি গুপ্তচরকে হত্যা করাকে ভালো মনে করেন তবে হত্যা করবেন। আর যদি জীবিত রাখাকে ভালো মনে করেন তবে তাকে জীবিত রাখবেন।

মহিলা গুপ্তচরকে উলঙ্গ করা জায়েজ কি না

প্রয়োজনের তাগিদে এবং জনকল্যাণের স্বার্থে মহিলা গুপ্তচরকে হত্যা করা জায়েজ। কেননা আলী ও তার সঙ্গী শিবিকারোহিনী মহিলাকে বললেন, তুমি পত্র বের কর নচেৎ আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে ফেলব। সুতরাং প্রয়োজনের তাগিদে যখন মহিলা গুপ্তচরকে উলঙ্গ করা জায়েজ তাহলে ইসলামও মুসলমানের কল্যাণের খাতিরে তা অবশ্যই জায়েজ হবে।

কেউ যদি কোনো মুসলমানকে ব্যাখ্যাস্বরূপ মুনাফিক বা কাফির বললে বা আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য রাগে কাউকে মুনাফিক বলে তবে এর কারণে কাফের তো হবেই না বরং গোনাহগারও হবে না। বরং তার ইচ্ছা ও নিয়্যাতের কারণে সাওয়াব দেয়া হবে। তবে বিদ'আতীরা এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয় কারণ যারা তাদের মতের বিরোধী তারা তাদেরকে কাফের বেদআতী ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে থাকে।

হুনাইন যুদ্ধের কতিপয় ফিকহী মাসআলা-মাসায়েল এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ বর্ণনার বিবরণ

আল্লাহ সত্য প্রতিশ্রুতিদাতা তিনি তাঁর নাবীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যখন মক্কা বিজয় হবে তখন লোকেরা দলে দলে তার ধর্মে দীক্ষিত হবে। অতঃপর মক্কা যখন বিজয় হয়। আল্লাহ তার প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ী হাওয়াজিন গোত্র এবং তার অনুসারীদের অন্তরকে ইসলামকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। তিনি ইচ্ছে করেছিলেন যে তারা যেন রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নেয় যাতে আল্লাহ তার রাসূলের যথার্থ

www.waytojannah.com

সম্মান প্রকাশ এবং তার ধর্মের সহযোগিতা করেন এবং হাওয়াজিন এবং তার অনুসারীদের থেকে প্রাপ্য গনীমত মক্কাবিজয়ীদের জন্য পুরস্কারস্বরূপ হয়। আর আল্লাহ যেন তার রাসূল এবং বান্দাদেরকে এবং তাঁর শক্তিকে এক্ষেত্রে প্রকাশ করে দেখান। যাতে এর পরে আরবের আর কেউ তাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে না পারে। আল্লাহর হিকমত ছিল তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং ব্যাপক প্রস্তুতির পরেও মুসলমানদের প্রথমত পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করান যাতে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে যে শরীর উচ্চ হয়েছিল তাতে যেন বিনয়ী ভাব সৃষ্টি হয় এবং তাদের কেউ যেন রাসূল ﷺ-এর ন্যায় তাঁর হারামে কখনো প্রবেশ না করে। কেননা এ হারাম শরীফ সাময়িক সময়ের জন্য রাসূল ﷺ-এর জন্য করা হয়েছিল রাসূল ﷺ-এর পূর্বে হারাম শরীফ বৈধ ছিল না এবং রাসূল ﷺ-এর পরেও কারো জন্য বৈধ হবে না এবং আজ আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে পরাজয় বরণ করব না এ কথা যে বলেছিল তার সামনে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেয়ার জন্য যে, জয় পরাজয় সংখ্যার কারণে হয় না বরং আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন তাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না আর আল্লাহ যাকে পরাজিত করেন তাকে কেউ জয় এনে দিতে পারে না। আল্লাহ তা'আলাই তাঁর রাসূল এবং দীনের সাহায্য করেছেন। তোমাদের এ আধিক্য নয় যা দেখে তোমরা বিস্মিত হয়েছে। কেননা এটা তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না সুতরাং তোমরা পলায়ন করলে। অতঃপর আল্লাহ তার রাসূল এবং মু'মিনদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাদের জন্য সাহায্যস্বরূপ সৈন্যদল প্রেরণ করলেন তোমরা যাদের দেখতে পাওনি। আর আল্লাহর নিয়ম হলো দুর্বল এবং যাদের হৃদয় ব্যর্থ মনোরথ হয়ে পড়েছে তাদের উপর সাহায্য অবতীর্ণ করা। ইরশাদ হয়েছে–

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ.

অর্থাৎ, "দেশে যাদের দুর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করবে এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশঙ্কা করত।" (সূরা: আল-ক্বাসাস: ৫-৬)

আল্লাহর আরেকটি হিকমাত এটা ছিল যে, মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমানদেরকে স্বর্ণ-রূপা এবং অন্য কোন জিনিসের গনীমতের মালিক বানান নি। ওহাব ইবনু মুনাব্বিহ বলেন, আমি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম মক্কা বিজয়ের দিন আপনারা গনিমতস্বরূপ কোন জিনিসের মালিক হয়েছিলেন কি? উত্তরে তিনি বলেন, না।

এরপর আল্লাহ মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেন। তাদের সমুদয় সম্পদ, এবং যা কিছু আছে সব নিয়ে যুদ্ধে বের হওয়ার প্রেরণা যোগান। আর তাদের এ সম্পদকে রাসূল ﷺ-এর সেনাদলের জন্য গনীমতের সম্পদ বানিয়ে দিলেন। আর তার রাসূল এবং ঈমানদার বান্দাদেরকে সাহায্য করলেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন এবং এরপর গনীমতের সম্পদ বন্টনে যখন আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য অংশ রাখা হলো তখন তাদের অনেকে আপত্তি তুললে আল্লাহ তাদেরকে তাওবা নসীব করেন ফলে তারা ফিরে আসে।

আল্লাহ আরবের যুদ্ধের সূচনা করিয়েছেন বদরের মাধ্যমে এবং শেষ করেছেন হুনাইনের মাধ্যমে, আর এ কারণে উভয় যুদ্ধকে একত্রে "বদর হুনাইন" বলা হয় যদিও উভয় যুদ্ধের মধ্যে দীর্ঘ সাত বছরের

www.waytojannah.com

ব্যবধান। এ উভয় যুদ্ধেই মুসলমানদের সঙ্গে ফেরেশতারা অংশগ্রহণ করে। এ উভয় যুদ্ধে রাসূল ﷺ মুশরিকদের চেহারায় ধূলা নিক্ষেপ করেছিলেন। প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ আরববাসীদেরকে ভয় দেখান এবং তাদের শক্তিকে দুর্বল করে দেন। আর দ্বিতীয়টির মাধ্যমে সমস্ত আরববাসীকে অপমানিত ও অপদস্থ করেন। অবশেষে ইসলাম কবুল ছাড়া তাদের আর কোনো গতি ছিল না।

ইমামের (বাদশাহর) উচিত শত্রুপক্ষের সংবাদ সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য শত্রুপক্ষের নিকট গুপ্তচর প্রেরণ করা। আর ইমাম (শাসক) যখন শত্রুদলের আগমনের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হবেন তখন তার উচিত শত্রুদলের আগমনের অপেক্ষায় বসে না থেকে শত্রুদলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা। যেমনটি রাসূল ﷺ করেছেন এবং অবশেষে হুনাইনে গিয়ে শত্রুদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

ইমামের জন্য মুশরিকদের থেকে অস্ত্র ধার নেয়া জায়েজ। যেমন, রাসূল ﷺ সাফওয়ান থেকে লৌহবর্ম ধার নিয়েছিলেন। অথচ সাফওয়ান তখন মুশরিক ছিল। তাওয়াক্কুলে পূর্ণতা হলো শরীয়ত প্রত্যেক জিনিসের জন্য যে মাধ্যম রেখেছেন সম্পূর্ণরূপে তা অনুসরণ করে আল্লাহর উপর ভরসা করা।

কেননা রাসূল ﷺ এবং তার সাহাবীরা ছিলেন সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহনির্ভর। তথাপি তারা যুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে শত্রুদের মোকাবিলায় অগ্রসর হতেন। আর এ কারণেই রাসূল ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তার মাথায় হেলমেট ছিল। আর আল্লাহ তার উপর অবতীর্ণ করেছেন যে, "আল্লাহ আপনাকে লোকদের থেকে হিফাজত করবেন।"

অনেকে এমন আছেন যে, তাহকীক বা গবেষণা ছাড়াই একথা বলে থাকেন, রাসূল ﷺ এমনটি করেছিলেন উম্মাতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। আবার অনেকে বলেন, রাসূল ﷺ এমনটি করেছিলেন তার উপর আয়াত অবতীর্ণ হবার পূর্বে। অথচ এ সবই ভুল বুঝার কারণে সৃষ্ট।

রাসূল ﷺ-এর উক্তি– "আমি তোমাদের উদ্বুদ্ধ করিনি বরং আল্লাহ তোমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন"-এর অর্থ প্রসঙ্গে

ما أنا حملتكم، ولكن الله حملكم.

"আমি তোমাদের উদ্বুদ্ধ করিনি বরং আল্লাহ তোমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন।"

রাসূল ﷺ-এর এ উক্তিটি তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিটির অনুরূপ–

والله لا أعطى أحدا شيئا، ولا أمنع، وإنما أنا قاسم، أضع حيث أمرت.

"আল্লাহর শপথ আমি কাউকে কোন কিছু প্রদান করি না এবং দিতে নিষেধও করি না বরং আমি তো একজন বণ্টনকারী মাত্র। যেখানে রাখার আদিষ্ট হই সেখানে রাখি।"

কেননা রাসূল ﷺ হলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁর আদেশ পালন করেন। আল্লাহ তাকে কোন জিনিসের নির্দেশ করলে তিনি তা পূর্ণ করেন। দেয়া না দেয়ার মালিক তো কেবল আল্লাহ। আর রাসূল হলো তাঁর আদেশ প্রয়োগকারী। আর আল্লাহর উক্তি:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ.

www.waytojannah.com

"আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ।" (সূরাঃ আল-আনফালঃ ১৭)

এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, মাটির ঐ মুষ্টি যা রাসূল ﷺ কাফেরদের মুখের দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন। অতঃপর তাদের সকলের চোখে তা পৌঁছেছিল। এ আয়াতে রাসূল ﷺ-এর নিক্ষেপকে আল্লাহর দিকে সম্বোধন করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে পৌঁছানোর প্রতি লক্ষ করে। কেননা পৌঁছানোর ক্ষমতা বান্দার নেই মুশরিকদের চোখে এ মাটি পৌঁছানোর ক্ষমতা শুধু আল্লাহর।

মুনাফিক ও তাদের স্বজাতীয় অন্যান্যদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর ধৈর্য

মুনাফিকদের থেকে সুস্পষ্ট কুফুরী প্রকাশের পরও রাসূল ﷺ তাদেরকে হত্যা করেননি। অনেকে এর থেকে এ কথার দলিল পেশ করেছেন যে, নাস্তিক থেকে তওবা প্রকাশ পেলে তাকে হত্যা করা যাবে না। কারণ তারা রাসূল ﷺ-এর সম্মুখে এ কথার কসম খেয়েছিল যে তারা রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে কিছু বলেনি এবং এটি অস্বীকার না হলে তওবা করেছে বলে ধরা হবে।

আমাদের আসহাবদের মতে যার ব্যাপারে মুরতাদ হওয়ার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। অতঃপর সে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তার রাসূল বলে সাক্ষ্য দিবে। তার ব্যাপারে আর যাচাই বাছাই করা হবে না। কতক ফেকাহবিদদের মতে, স্বধর্ম ত্যাগ করাকে অস্বীকার করাই তার জন্য যথেষ্ট। আর যারা বলেন, তিনি নাস্তিকের তওবাকে কবুল করেন না তাদের মতে মুনাফিকদের ব্যাপারে কোনো প্রমাণ দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাসূল তাদের উপর নিজের জ্ঞান অনুযায়ী ফায়সালা করেন নি। এবং রাসূল ﷺ-এর নিকট যে ব্যক্তি তাদের সংবাদ পৌঁছে ছিল যে দলিল উত্থাপনের পরিমাণ পূর্ণ করেনি বরং একজন সাক্ষী দিয়েছিল। এ উত্তরটিতে আপত্তি রয়েছেঃ কেননা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই এর নিফাকী নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের নিকট মুতাওতেরের ন্যায় প্রসিদ্ধ ছিল। সাহাবাদের অনেকে মুখে তা স্বীকারও করেছেন। রাসূল ﷺ-কে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, আপনি তাদেরকে হত্যা করছেন না কেন? তখন তিনি একথা বলেন নি যে, তাদের ব্যাপারে কোনো দলিল আসেনি বরং তিনি বলেছিলেন, লোকেরা যেন একথা মনে না করে যে মুহাম্মাদ তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করছে।

এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হলো রাসূল ﷺ একটি কল্যাণ জন্য মুনাফিকদের হত্যা করেন নি আর তা হলো রাসূলের ব্যাপারে সকলের সন্তুষ্টি এবং রক্ষা করা সকলের মাঝে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা এবং সকলকে এক বাক্যের উপর উঠানো। তাদের হত্যা করলে মানুষের মধ্যে রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি হত। আর রাসূল ﷺ স্বভাব ছিল মানুষের মন রক্ষা করা এবং যে কাজ করলে মানুষের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি হয় তা থেকে বিরত থাকা।

রাত্রে দাফন দেয়া প্রসঙ্গে

রাত্রে দাফন দেয়া বৈধ। রাসূল ﷺ যালবাজাদাইনকে রাত্রে দাফন করেছেন। ইমাম আহমাদকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এতে কোন ক্ষতি নেই। আলী (রা) ফাতিমাকে রাত্রে দাফন করেছেন। আয়িশা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ-কে দাফন করার সময় রাত্রির শেষভাগে কোদালের আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।

www.waytojannah.com

উসমান, আয়িশা এবং ইবনু মাসউদ (রা)-কে রাত্রে দাফন করা হয়। তিরমিযীতে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ রাত্রে এক কবরে নামলেন, অতঃপর তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করা হলো। অতঃপর রাসূল ﷺ তা কেবলার দিক দিয়ে দিলেন এবং বললেন–

رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن.

"আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন, তুমি যদি অধিক কান্নাকাটি করতে এবং কুরআন বেশি বেশি তেলাওয়াত করতে।" তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

বুখারীতে এসেছে যে, রাসূল ﷺ এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, বললেন, "লোকটি কে?" সাহাবায়ে কিরাম উত্তর দিলেন অমুক গতরাত্রে মৃত্যুবরণ করেছে। অতঃপর রাসূল ﷺ তার জানাযা পড়েন।

প্রশ্ন: যদি বিষয়টি এমনই হয় তবে মুসলিম শরীফের হাদীসের উত্তর আপনারা কী দিবেন। হাদীসটি হলো, রাসূল ﷺ একদা ভাষণ দিলেন এবং তার একজন মৃত সাহাবী সম্পর্কে আলোচনা করলেন যাকে সংকীর্ণ কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছে এবং রাত্রে দাফন করা হয়েছে। অতঃপর জানাযা পড়ার পূর্বে রাত্রে সমাহিত করা থেকে নিষেধ করলেন। তবে হ্যাঁ প্রয়োজনে এমনি করা যাবে বলে উল্লেখ করলেন। ইমাম আহমাদ বলেন, এটিই আমার মত।

উত্তর: আলহামদুলিল্লাহ। আমরা উভয় হাদীসের উপরই আমল করব এবং একটি করলে অপরটি প্রত্যাখ্যান করব না। সুতরাং বলব, প্রয়োজন ছাড়া রাত্রে দাফন করা মাকরূহ। তবে প্রয়োজনে অর্থাৎ, মুসাফিরদের সঙ্গে থাকাবস্থায় রাত্রে কেউ মারা গেলে এবং রাত্র পর্যন্ত অপেক্ষা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হলে। এমনিভাবে মৃতকে দাফন না করলে মাইয়্যেতের দেহ যদি ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে রাত্রে দাফন করা জায়েয।

দুনিয়াতে শাস্তি ত্বরান্বিত করা বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রাহমাতস্বরূপ

সকলের মধ্য হতে শুধু যে তিন জনকে পেছনে রাখা হয়েছিল এবং তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। তাদের সাথে কথা বলা থেকে নিষেধ করা তাদের সত্যবাদিতা আর বাকিদের মিথ্যাবাদী হওয়ার দলিল। তাই রাসূল ﷺ সত্যবাদীদেরকে এ গুনাহর ব্যাপারে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্য তাদের সঙ্গে কথা পরিহারের নির্দেশ দেন। আর মুনাফিকদের অপরাধ বড় হওয়ার কারণে তাদের ক্ষেত্রে কথা বন্ধ রাখার নির্দেশ তাদের অপবাদ সমতুল্য নয়। এবং এতে কোনো ফায়দায়ও নেই। শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ এমনটিই করে থাকেন। সুতরাং আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাকে আদব শিক্ষা দেন। তার থেকে কোনোরূপ পদস্খলন বা অপরাধ প্রকাশ পেলে আল্লাহ তাকে সতর্ক করে দেন। আর আল্লাহর অপছন্দনীয় বান্দাদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে কোনো অন্যায় করলে আল্লাহ তার নেয়ামতকে আরো বাড়িয়ে দেন। কিন্তু যে মনে করে এটা তার কারামাত। সে এটা অনুধাবন করতে পারে না যে তার সঙ্গে এমনটি করা হচ্ছে তুচ্ছতা স্বরূপ। প্রসিদ্ধ হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ যখন কোনো বান্দার ব্যাপারে কল্যাণ চান দুনিয়াতে তার শাস্তি ত্বরান্বিত করে দেন। আর যখন কোনো বান্দার ব্যাপারে অকল্যাণ চান দুনিয়াতে তার থেকে শাস্তিকে উঠিয়ে নেন। এবং কিয়ামতের দিবসে তার অন্যায়ের কারণে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন।" এ হাদীস থেকে আলিম এবং অনুসরণীয় ব্যক্তিদের থেকে অপরাধ সংঘটিত হলে শাস্তিস্বরূপ তাদের সঙ্গে কথোপকথন বর্জন করা জায়েজ এবং এটা তার জন্য ওষুধ হিসেবে কাজ করবে।

www.waytojannah.com

বিদ'আতী এবং কুপ্রবৃত্তি অনুসারীদের সঙ্গে লেনদেন প্রসঙ্গে

সাহাবী হিলাল ইবনু উমাইয়া এবং মুরারা তারা নিজ বাসায় অবস্থান করত এবং সেখানেই নামায পড়ত। জামাতে শরীক হত না। এখান থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, মুসলমানরা কারো সঙ্গে কথোপকথন বর্জন করলে এ লোকটির জন্য জামাতে শরীক না হওয়া জায়েজ। অথবা বলা হবে, কারো সঙ্গে সম্পর্ক বর্জনের পূর্ণতা হবে মুসলমানদের নামাযের জামাতে শরীক না হওয়ার দ্বারা।

তবে বর্ণিত আছে যে, কা'ব নামাযের জামাতে শরীক হতেন কিন্তু রাসূল ﷺ তাকে এর থেকে নিষেধ করেননি এবং যুদ্ধে না যাওয়ার কারণে রাসূল ﷺ তাদের কোন তিরস্কারও করেননি। এ ভিত্তিতে বলা হয় যে, মুসলমানদেরকে যখন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জনের নির্দেশ দেয়া হলো তখন তারা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জন করে তাদেরকে কোন কিছুর আদেশ-নিষেধ করত না এবং তাদের সঙ্গে কথোপকথনও করত না। তাদের কেউ নামাযের জামাতে শরীক হলে তাকে নিষেধ করা হত না। আর কেউ জামাতে নামায না পড়লে তাকেও কিছু বলা হত না।

সদকার (দানের) পরিমাণ সম্পর্কে

কা'বের উক্তি:

يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي.

"হে আল্লাহর রাসূল, আমার তওবা হলো আমি আমার সমুদয় অর্থ সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব।"

তার এ উক্তি থেকে একথা বুঝে আসে যে, তওবার সময় যতটুকু সম্ভব সদকা করা মুস্তাহাব। আর রাসূল ﷺ-এর উক্তি:

أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك.

"তুমি তোমার সম্পদের কিছু অংশ তোমার নিকট রেখে দাও, এটা তোমার জন্য উত্তম হবে।"

এ থেকে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কেউ তার সমুদয় সম্পদ সদকা করার ইচ্ছে করলে সমুদয় সম্পদ সদকা করা ওয়াজিব হয় না, বরং নিজের জন্য কিছু রেখে দেয়া তার জন্য জায়েয। এ ব্যাপারে রিওয়ায়াতের ভিন্নতা আছে। সহীহাইনে এসেছে যে, নবী ﷺ কা'বকে বললেন–

أمسك عليك بعض مالك.

"তুমি তোমার সম্পদের কিছু অংশ নিজের নিকট রেখে দাও।"

রাসূল ﷺ এক্ষেত্রে পরিমাণ নির্ধারণ করেন নি। বরং পরিমাণ নির্ণয়ের দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন কা'বের ইজতিহাদের উপর এবং এটাই সহীহ। কেননা যে সম্পদ তার এবং তার পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয় সেখান থেকে সদকা করা বৈধ নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে মান্নত করা বৈধ হবে না এবং তা পূর্ণ করাও জরুরী নয়। এটাই শরীয়তের দাবি। আর এ কারণে যেসব আর্থিক জরিমানা আদায় করা আবশ্যক চাই তা আল্লাহর হক হোক যেমন, কাফ্ফারা, হাজ্জ ইত্যাদি বা বান্দার হক যেমন, ঋণ পরিশোধ এর পূর্বে নিজের এবং নিজের পরিবারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ হওয়া আবশ্যক। সুতরাং একজন দরিদ্র ব্যক্তির বসবাসের জন্য একটি ঘর একজন খাদেম, পোশাক ও চাকরি বা ব্যবসায়ের পণ্য থাকা

www.waytojannah.com

অপরিহার্য। ইমাম আহমাদ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার সমুদয় সম্পত্তি সদকা করার মান্নত করেছে তার জন্য সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ আদায় করাও বৈধ। ইমাম আহমাদের শিষ্যরা এর দলিল বর্ণনা করেছেন কা'বের ঘটনা দিয়ে যে, কা'ব রাসূল ﷺ-কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ এবং রাসূলের নিকট আমার তওবা হলো আমার সমুদয় সম্পদ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের জন্য সদকা করে দেয়া। রাসূল ﷺ বললেন, না। আমি বললাম, সমুদয় সম্পদের অর্ধেক, রাসূল ﷺ বললেন না, আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ। রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ! আমি বললাম, তবে আমি আমার খায়বারের অংশকে আমার জন্য রেখে দিব। **(আবু দাউদ)**

হাদীসটির ব্যাপারে আপত্তি আছে। কেননা কা'বের ঘটনার সহীহ বর্ণনা হলো যা যুহরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, যুহরী কা'ব ইবনু মালিকের এক সন্তানদের থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূল ﷺ কা'বকে বললেন, তুমি তোমার সম্পদের কিছু অংশ তোমার জন্য রেখে দাও। রাসূল ﷺ এক্ষেত্রে পরিমাণ নির্ধারণ করে দেননি। এবং তাঁর পুত্ররা এ ঘটনা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত। কারণ তারা তার পুত্র। সুতরাং তারা এ ঘটনা সম্পর্কে বেশি জানবেন এটাই স্বাভাবিক।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, যদি এমনটিই হয় তবে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীস এর উত্তর কী দিবেন? হাদীসটি হলো, আবু লুবাবা ইবনু আব্দুল মুনযিরের যখন তওবা নসীব হলো, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার তওবা হলো আমি আমার বাড়ি ঘর ত্যাগ করে আপনার নিকট বসবাস করব এবং আমার সমুদয় সম্পত্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য সদকা করে দিব। অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তোমার জন্য এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ সম্পত্তি ছদকা করাই যথেষ্ট।"

উত্তর: এ হাদীসটি দিয়েই ইমাম আহমাদ দলিল পেশ করেছিলেন কা'বের হাদীস দিয়ে নয়। কেননা আহমাদের ছেলে আব্দুল্লাহর রেওয়ায়েত থেকে এটি সুস্পষ্ট বুঝে আসে।

রাবীআ'হ ইবনু আবী আব্দুর রহমান বলেন, কেউ যদি তার সমুদয় সম্পদ সদকা করার নিয়াত করে তবে সে তার সম্পত্তি থেকে যাকাত পরিমাণ সম্পদ সদকা করে বাকি সম্পদ নিজের জন্য রেখে দিবে। জাবির ইবনু যায়িদ বলেন, যদি দুই হাজার বা তার চেয়ে বেশি পরিমাণের সম্পদের মালিক হয় তবে সমুদয় সম্পদের এক-দশমাংশ সদকা করতে হবে। আর এক হাজার বা তার চেয়ে কমের মালিক হলে এক-সপ্তমাংশ সদকা করতে হবে আর পাঁচশ' টাকা বা তার চেয়ে কমের মালিক হলে এক-পঞ্চমাংশ সদকা করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, তার সমুদয় সম্পত্তির যে পরিমাণ অংশের যাকাত দেয়া ওয়াজিব এবং যে পরিমাণ অংশের যাকাত দেয়া ওয়াজিব নয় সবগুলো সদকা করে দিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তার উপর সমুদয় সম্পত্তি সদকা করা ওয়াজিব। ইমাম মালেক, যুহরী, এবং আহমাদ (র) এর মতে সমুদয় সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ সদকা করা ওয়াজিব। একদল আলেমের মতে, তার উপর শুধুমাত্র শপথের কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হবে।

সত্যবাদিতা প্রসঙ্গে

সত্যবাদিতার মর্যাদা অনেক। ইহকাল পরকালের সকল সফলতা এবং এতদুভয়ের সমুদয় অকল্যাণ থেকে মুক্তি শুধু সততার মাধ্যমেই অর্জন সম্ভব। আল্লাহ যাকে মুক্তি দিয়েছেন সত্যবাদিতার মাধ্যমেই

www.waytojannah.com

মুক্তি দিয়েছেন। আর যাকে ধ্বংস করেছেন মিথ্যা বলার কারণেই ধ্বংস করেছেন। আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দাদের সত্যবাদিদের সঙ্গ দিতে নির্দেশ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।" (সূরা: আত্-তাওবা: ১১৯)

আল্লাহ তার মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন: সৌভাগ্যবান এবং হতভাগা। সৌভাগ্যবান করেছেন তাদেরকে যারা সত্যবাদী এবং সত্যকে ভালোবাসে। আর হতভাগা তারা যারা মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যা বলতে পছন্দ করে। সুতরাং সৌভাগ্যবান হওয়ার সম্পর্ক সত্যতার সঙ্গে আর হতভাগা হওয়ার সম্পর্ক হলো মিথ্যার সঙ্গে।

আল্লাহ মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন সত্যতা ছাড়া বান্দার অন্য কোন কিছু উপকারে আসবে না। তিনি মুনাফিক চেনার নিদর্শন বানিয়েছেন কথায় ও কর্মে মিথ্যা বলাকে। সত্যবাদিতা ঈমানের রাহবার, যানবাহন, পরিচালক, সৌন্দর্য এবং পোশাকস্বরূপ। বরং সত্যবাদিতা হলো ঈমানের মজ্জা এবং আত্মা। আর মিথ্যা হলো কুফর এবং নিফাকের রাহবার, যানবাহন, পরিচালক, সৌন্দর্য ও পোশাকস্বরূপ। মিথ্যার সাথে ঈমানের সম্পর্ক হলো তাওহীদের সাথে শিরকের সম্পর্কের মতো। ঈমান এবং মিথ্যা কখনো এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হতে পারে না। আল্লাহ তিন সাহাবীকে তাদের সত্যবাদিতার কারণে মুক্তি দিয়েছেন। আর অন্যান্যদেরকে তাদের মিথ্যার কারণে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ইসলাম গ্রহণের পরে সত্যবাদিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত আর কিছু হতে পারে না। সত্যবাদিতা ইসলামের খোরাক এবং জীবনস্বরূপ। আর ইসলাম গ্রহণের পরে মিথ্যা বলার চেয়ে বড় পরীক্ষা আর কিছু নেই। মিথ্যা ইসলামের ব্যাধিস্বরূপ।

আল্লাহ ইরশাদ করেন–

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ.

অর্থ: "আল্লাহ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নাবীর সঙ্গে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়।" (সূরা: আত্-তাওবা: ১১৭)

আল্লাহর নিকট বান্দার তওবার গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝাবার জন্য এ আয়াতটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তওবা হলো একজন মু'মিনের পূর্ণতার গন্তব্য। কেননা আল্লাহ যুদ্ধের পরে তাদেরকে এ মর্যাদা প্রদান করেছেন এ যুদ্ধে তারা তাদের জানমাল সবকিছু ব্যয় করেছেন। আল্লাহর জন্য ঘরবাড়ি ত্যাগ করেছেন। আর সর্বশেষে প্রতিদান হিসেবে তারা পেয়েছেন আল্লাহর ক্ষমা। আর এ কারণেই রাসূল ﷺ কা'বের তওবা কবুল হওয়ার দিনকে কা'বের জন্মের পর থেকে অদ্যাবধি যতদিন তার উপর অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন বলে ঘোষণা করেছেন। এ বিষয়ে প্রকৃত পরিচয় তার পক্ষেই সম্ভব যে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পেরেছে। আল্লাহর হক সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছে। নিজের দায়-দায়িত্ব, নফসের গুণাবলী এবং কর্ম সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছে।

www.waytojannah.com

চুক্তি বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কেউ যদি কোন অপরাধ করে তখন কী করণীয়

যারা চুক্তি বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে তাদের কারো থেকে ইসলামের ক্ষতি হয় এমন কোন কর্মকাণ্ড প্রকাশ পেলে তার জান এবং সম্পদের ক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম যদি এ কাজটি আঞ্জাম দিতে অক্ষম হয় তাহলে যে তাকে হত্যা করবে সেই তার সম্পদের মালিক হয়ে যাবে। যেমনটি রাসূল ﷺ আইলাবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করার সময় বলেছিলেন–

فمن أحدث منهم حدثا، فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وهو لمن أخذه من الناس.

"তোমাদের কেউ কোনো অপরাধ করলে তার সম্পদ হালাল হয়ে যাবে এবং লোকদের যে এটা নিবে তা তার হয়ে যাবে।" কেননা সে এখন আহলে হারর তথা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তির হুকুমে।

বনী আসাদের প্রতিনিধি দল

রাসূল ﷺ-এর নিকট বনী আসাদের ১০ জন লোক আগমন করল। তাদের মধ্যে ওয়াবিস ইবনু মা'বাদ এবং তালহা ইবনু খুওয়াই ছিল। রাসূল ﷺ তখন তার সাহাবীদেরকে নিয়ে মাসজিদে বসাছিলেন। তারা এসে কথা বলল। তাদের পক্ষ থেকে যে কথা বলছিল সে বলল–

يا رسول الله، إنا شهدنا أن الله وحده لا شريك له، وأنك عبده ورسوله، وجئناك يا رسول الله، ولم تبعث إلينا بعثا، ونحن لمن وراءنا.

"হে আল্লাহর রাসূল, আমরা সাক্ষ্য দিই যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ একজন। তার কোনো শরীক নেই এবং আপনি তার বান্দা ও রাসূল। আপনি তো কোনো প্রচারক দল আমাদের কাছে পাঠাননি আমরা নিজে নিজেই ইসলাম গ্রহণ করেছি।"

মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব বলেন, তাদের এই মনোভাব রদ করার জন্য রাসূলের নিকট আল্লাহ ওহী অবতীর্ণ করলেন–

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

অর্থাৎ, "নিজেদের ইসলাম গ্রহণকে একটা অনুগ্রহ হিসেবে আমার কাছে পেশ কর না। বরং এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ যে তিনি তোমাদেরকে ইসলামের সাথে চালিত করেছেন।" (আল-হুজরাত: ১৭)

এরপর এই প্রতিনিধি দল পাখি দ্বারা ভাগ্য জানা ও ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা এবং পাথর নিক্ষেপ করে পণ্য চিহ্নিত করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান জানতে চায়। রাসূল ﷺ এসবের বিরোধিতা করেন। সবার শেষে তারা জানতে চায়, চিঠি লেখা জায়েজ কি-না?

রাসূল ﷺ বললেন–

علمه نبي من الأنبياء، فمن صادف مثل علمه علم.

"এটা তো কোন একজন নবীই চালু করেছেন। এর চেয়ে ভালো বিদ্যা আর কি হতে পারে।"

www.waytojannah.com

নাবী ﷺ-এর চিকিৎসা প্রসঙ্গে

অসুস্থতা দুই প্রকার–

১. আত্মিক অসুস্থতা এবং

২. শারীরিক অসুস্থতা।

উভয়টির আলোচনাই কুরআনে এসেছে।

আত্মিক অসুস্থতা

সন্দেহ ও সংশয়ের অসুস্থতা, অবাধ্য ও প্রবৃত্তির অসুস্থতা। উভয়টার কথাই কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। সন্দেহের অসুস্থতা সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেন–

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً.

অর্থ: "তাদের অন্তঃকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।" (আল বাকারা: ১০)

অন্যত্র ইরশাদ করেন–

وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً.

অর্থ: "এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা এবং কাফেররা বলে, যে আল্লাহ্ এর দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছেন।" (সূরা মুদ্দাস্সির: ৩১)

আল্লাহ ও কুরআনের বিচার মেনে নেয়ার জন্য বলার পরও যে তা অস্বীকার করে তার সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেন

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

অর্থ: "আর তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে; না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই তো অস্বীকারকারী।" (আন-নূর: ৪৮-৫০)

যেসব অসুস্থতার কথা বলা হয়েছে এর সবই হলো সন্দেহ ও সংশয়ের অসুস্থতা।

আর কুপ্রবৃত্তির অসুস্থতা সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেন–

يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ.

অর্থ: "হে নবীপত্নীগণ, তোমরা অন্য নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে।" (আল-আহযাব: ৩২)

আয়াতের এ অসুস্থতা হলো কুবাসনা ও কুপ্রবৃত্তির অসুস্থতা।

www.waytojannah.com

শারীরিক রোগ

শারীরিক রোগ ও অসুস্থতা সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেন–

ينساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض.

অর্থ: "হে নবীপত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষদের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে।" (আল-আহযাব: ৩১)

আল্লাহ রোযা, হাজ্জ এবং ওজু এ তিনটি জায়গায় শারীরিক অসুস্থতার কথা আলোচনা করেছেন। যার দ্বারা কুরআনের মাহাত্ম্য আরো সুস্পষ্ট হয়। শরীরের সুস্থতার মূলনীতি তিনটি:

১. সুস্থতার সংরক্ষণ;

২. স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন জিনিস থেকে বেঁচে থাকা এবং

৩. ক্ষতিকর উপাদানকে নিঃশেষ করা।

আল্লাহ তা'আলা রোযার আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন–

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

অর্থ: "অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে যে রোযা পূরণ করে নিতে হবে।" (আল-বাকারা: ১৮৪)

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে অসুস্থ ব্যক্তিকে তার অসুস্থতার কারণে রোযা ভাঙ্গার অনুমতি দিয়েছেন। আর মুসাফিরকে তার স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সফর অবস্থায় রোযা ভঙ্গের নির্দেশ দিয়েছেন।

হাজ্জের আলোচনায় ইরশাদ করেছেন–

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ.

অর্থ: "আর তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ হয়ে পড়বে, কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোযা করবে কিংবা দান-খায়রাত দেবে অথবা কোরবানী করবে।" (আল-বাকারা: ১৯৬)

এ আয়াতে অসুস্থতা কিংবা যার মাথায় কষ্ট আছে যেমন, উকুন বা চুলকানি অথবা অন্য কিছু। তার জন্য পঁচা ও নষ্ট দুর্গন্ধ দূর করণার্থে এহরাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডানোর অনুমতি দিয়েছেন। কারণ এসব দুর্গন্ধময় পঁচা জিনিসের কারণে হাজীর মাথায় কষ্ট হবে। আর মাথা মুণ্ডিয়ে ফেললে নতুন লোমকূপ গজায় আর এর কারণে দুর্গন্ধ বের হয়ে যায়। এবং এ নিঃশেষ করার উপর সেসব জিনিসের নিঃশেষ করাকে অনুমান করে নিতে হবে যা আটকে রাখলে কষ্ট অনুভব। আর যেসব জিনিস আটকে রাখলে শরীরে কষ্ট অনুভব হয় সেগুলো দশ প্রকার: প্রবাহিত রক্ত, স্খলিত বীর্য, পেশাব, পায়খানা, পায়ুপথে নির্গত বায়ু, বমি, হাঁচি, ঘুম, ক্ষুধা, পিপাসা। এগুলোকে আটকে রাখলে শরীরে কষ্ট অনুভব হয়।

আর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সম্পর্কে আল্লাহ ওজুর আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে–

وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً.

www.waytojannah.com

অর্থ: "আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি প্রসাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাক, কিন্তু পরে যদি পানি প্রাপ্তি হয় সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও।" (আল-নিসা: ৪৩)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা অসুস্থ ব্যক্তিকে পানির ব্যবহারে অক্ষম হলে মাটি ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে তার শরীর কষ্টদায়ক জিনিস থেকে সুরক্ষিত থাকে। এ আয়াতে আল্লাহ তার বান্দাদের চিকিৎসার মূলনীতির প্রতি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আমরা রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা সম্পর্কে আলোচনা করব।

আর অন্তরের রোগের চিকিৎসার জন্য নিজেকে রাসূলের আদর্শের প্রতি সঁপে দিতে হবে। আর এটা শুধু রাসূলদের আদর্শ অনুসরণ করলেই কেবল অর্জন সম্ভব। কারণ আত্মার বা অন্তরের পরিশুদ্ধি হলো আল্লাহর পরিচয় তাঁর নামসমূহ, গুণাবলি, বিধি-বিধান, কর্মসমূহ এবং ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং তার সন্তুষ্টির পথে চলা তাঁর সকল নিষেধ মেনে চলা এবং নিষিদ্ধ জিনিস থেকে বিরত থাকা। এর মাধ্যমেই আত্মশুদ্ধি অর্জন সম্ভব। আর এসবগুলো রাসূলদের অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল অর্জন সম্ভব। যারা তাদের অনুসরণ ব্যতীত আত্মাশুদ্ধি অর্জন সম্ভব বলে মনে করেন তারা ভুলের উপর আছেন। বরং তখন এ আত্মা চতুষ্পদ পশুর আত্মায় পরিণত হবে। সুতরাং যারা অনুসরণ করা ও না করাকে সমান মনে করে তাদের উচিত নিজের আত্মার প্রাণ নিজে বিলাপ করা। কেননা এ আত্মা তো মৃত এবং আত্মার জ্যোতি নিয়ে ক্রন্দন করা কারণ তার আত্মা অন্ধকারে নিমজ্জিত।

শারীরিক চিকিৎসার প্রকারভেদ

শারীরিক চিকিৎসা দুই প্রকার:

এক. প্রকৃতিগত চিকিৎসা, যাতে মানুষ ও সকল জীব সমান। এ প্রকারের ক্ষেত্রে কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। যেমন– ক্ষুধা, পিপাসা, ঠাণ্ডা, গরম, ক্লান্তি এবং এর বিপরীত জিনিসসমূহের চিকিৎসা ইত্যাদি।

দুই. এমন চিকিৎসা যার জন্য গবেষণার প্রয়োজন। যেমন– মেজাজ বা প্রকৃতিতে সৃষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যধিসমূহের প্রতিকার। এসব ব্যাধির কারণে শরীর তার স্বাভাবিক অবস্থায় বহাল থাকে না। হয়তো শরীরে ঠাণ্ডা, উষ্ণতা, আর্দ্রতা বা শুষ্কতা ভাব দেখা দেয়। অথবা এগুলোর যে কোন দুটোর সমন্বয়ে শরীরে একটা ভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি হয়।

পদার্থ বা ধাতু সংক্রান্ত ব্যাধিসমূহ: এসব ব্যাধি তার কারণের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্যাধির সঙ্গে তার কারণ জানা থাকলে সর্বপ্রথম কারণে দূর করার চেষ্টা করা উচিত এরপর ব্যাধির নিরাময়ের চিকিৎসা করা এবং তৃতীয় পর্যায়ে ওষুধ ব্যবহার করা উচিত। আর যেসব ব্যাধি কোন প্রকার কারণ ব্যতীত স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয় এবং এর কারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার স্বাভাবিক অবস্থা হারিয়ে ফেলে।

সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যাধি: ঐ সকল ব্যাধি যার কারণে প্রকৃতি বা মেজাজ তার স্বাভাবিক অবস্থা হারিয়ে ফেলে। এ জাতীয় ব্যাধি সর্বমোট ৮ প্রকার; ৪ প্রকার হলো স্বাভাবিক ব্যাধি যাতে কোন জিনিসের সংমিশ্রণ হয়নি: ঠাণ্ডা, উষ্ণ, শুষ্ক এবং আর্দ্র আর ৪ প্রকার হলো মিশ্র এবং যৌগিক ব্যাধি: উষ্ণ ও শুষ্ক, আর্দ্র ও শীতল, আর্দ্র ও উষ্ণ, শীতল ও শুষ্ক।

www.waytojannah.com

শরীরের মোট তিনটি অবস্থা: স্বভাবগত, স্বভাব বহির্ভূত এবং উভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা। প্রথমটি হলে শরীর সুস্থ বলে ধরা হবে। দ্বিতীয়টি হলে অসুস্থ। তৃতীয়টি হলে উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থা বলে মনে করতে হবে। কারণ বিপরীত জিনিস মাধ্যম ব্যতীত তার বিপরীত বস্তুতে স্থানান্তরিত হতে পারে না। শরীর তার স্বাভাবিক ও স্বভাবগত অবস্থার ব্যতিক্রম হয়ত আভ্যন্তরীণ কারণে হবে। কেননা, তা উষ্ণতা এবং শীতলতা দ্বারা এবং শুষ্কতা ও আর্দ্রতা দ্বারা গঠিত। নতুবা বহির্গত কারণে হবে, কেননা তার শরীরের অবস্থাগুলো কখনো কখনো তার অনুকূলে হয় আবার কখনো এর বিপরীত। আর মানুষের শরীরের রোগসমূহ কখনো অস্বাভাবিক ভাবে প্রকৃতি বিনষ্ট হবার কারণে হয়ে থাকে আবার কখনো ভিন্ন কারণেও হয়ে থাকে। সুতরাং ডাক্তার মানুষের দেহে কোন জিনিস থাকা জরুরী, কোন জিনিস না থাকা জরুরী, কোন জিনিস পরিমাণে বেশি এবং কোন কোন জিনিস পরিমাণে কম হওয়া জরুরী তা নির্ধারণ করে দেন। যার ফলে হারানো সুস্থতা আবার ফিরে পাওয়া যায় এবং শরীরের বর্তমান অবস্থাকে তাকে তার বিপরীত জিনিস দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে দেন। আর এসব কিছুর যথার্থ ও পর্যাপ্ত বর্ণনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকনির্দেশনায় আপনি দেখতে পারবেন।

আরোগ্য লাভে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

রাসূল ﷺ নিজে চিকিৎসা করাতেন এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবাদের যে অসুস্থ হত তাকে চিকিৎসা নিতে নির্দেশ করতেন। তবে রাসূল ﷺ এর সাহাবীদের কেউ "আকরবাযীন" নামক যৌগিক ও মিশ্র ওষুধ ব্যবহার করতেন না। বরং তারা সাধারণত মিশ্রণহীন ওষুধ ব্যবহার করতেন। আবার কখনো এর সঙ্গে সহযোগী ওষুধও যোগ করতেন। আরব, তুর্কি এবং বেদুঈনরা সাধারণ এ জাতীয় ওষুধই ব্যবহার করে থাকে। আর গ্রাম্যরা ইতালী এবং ইউনানী, যৌগিক ও মিশ্র ওষুধ ব্যবহার করো আর হিন্দুস্থানিরা বেশির ভাগ অমিশ্রণহীন ওষুধ ব্যবহার করে থাকে।

সকল ডাক্তার এ ব্যাপারে একমত যে যতক্ষণ খাবারের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব ততক্ষণ পর্যন্ত ওষুধ ব্যবহার করা অনুচিত। এবং যতক্ষণ মিশ্রণহীন ওষুধের দ্বারা চিকিৎসা করা সম্ভব ততক্ষণ পর্যন্ত মিশ্র ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করা অনুচিত।

ডাক্তারদের বক্তব্য হলো, ডাক্তারদের উচিত রোগীদেরকে ওষুধ সেবনে অনুপ্রাণিত না করা। কারণ শরীরে কোন ব্যাধি না থাকলে ওষুধ সেবন শরীরে রোগ জন্ম দিবে। অথবা যদি ব্যাধি থাকে আর ব্যাধি অনুযায়ী চিকিৎসা না করা হয় তবে এ কারণে ব্যাধি আরো বৃদ্ধি পাবে।

এ ব্যাপারে গবেষণার পর এ বিষয়টি উঠে এসেছে যে, ওষুধ হলো খাদ্য জাতীয় বস্তু। সুতরাং যাদের অধিকাংশ খাবার হবে অমিশ্রণ। তারা অসুস্থ হবে কম। এবং তাদের চিকিৎসা মিশ্রণ ওষুধ দ্বারা করা সম্ভব। আর শহরবাসী যাদের অধিকাংশ খাবারই হলো যৌগিক ও মিশ্র তাদের চিকিৎসার জন্য যৌগিক ও মিশ্র ওষুধের প্রয়োজন হবে। কারণ তাদের ব্যাধিসমূহ সাধারণত মিশ্র ও যৌগিক। তাই তাদের ক্ষেত্রে যৌগিক ও মিশ্র ওষুধ সর্বাধিক উপকারী আর যারা গ্রাম্য লোক তাদের ব্যাধিসমূহ অমিশ্র হয়ে থাকে তাই তাদের ক্ষেত্রে অমিশ্র ওষুধ সর্বাধিক উপকারী।

আমাদের মতে, এখানে আরো একটি বিষয় সম্পর্কে জানা থাকা দরকার সেটা হলো চিকিৎসকদের চিকিৎসা ঠিক ঝাড়ফুঁককারীদের ঝাঁড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা করার অনুরূপ। কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানকে

www.waytojannah.com

চিকিৎসাবিদদের অনেকে অনুমান নির্ভর বিষয় বলে আখ্যা দিয়েছেন। আবার কেউ বলেছেন এটি একটি অভিজ্ঞতা আবার কেউ কেউ একে এলহাম এবং স্বপ্নে প্রাপ্ত বস্তু মনে করেছেন।

ডাক্তারদের অনেকে আবার একথাও বলেছেন যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধিকাংশ জিনিস চতুষ্পদ জন্তু থেকে গৃহীত। যেমন আমরা দেখতে পাই যে, বিড়াল যখন বিষ মিশ্রিত কোন খাবার খেয়ে ফেলে তখন সে প্রদীপের নিকট গিয়ে তার তেল চেটে খায় এবং সুস্থ হয়ে উঠে। এমনি সাপ যখন গর্ত থেকে বের হয় এবং সে অন্ধ হয় তখন 'রাজয়াঞ্জ' নামক গাছের নিকট গিয়ে চোখে ঘষা দেয় এবং এতে সে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায় ইত্যাদি। সুতরাং চিকিৎসকদের এ জাতীয় থিওরীকে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সুস্থতা এবং অসুস্থতার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর নাবীর নিকট যে ওহী প্রেরণ করেছেন তার সঙ্গে তুলনা করা কখনো ঠিক হবে না বরং অনেক ব্যাধি এমন আছে যার সন্ধান এখনো কোন ডাক্তার পায়নি। তাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, এবং অনুমানে এর চিন্তাও আসেনি।

সূরা ফাতিহার মাধ্যমে কিভাবে বিচ্ছু ইত্যাদির দংশনে চিকিৎসা করা যায় আমরা এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করব।

প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা আছে

ইমাম মুসলিম তাঁর "সহীহ"-তে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক রোগের ওষুধ আছে। সুতরাং ওষুধ যখন রোগের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন আল্লাহর হুকুমে রোগী সুস্থ হয়ে উঠে।

সহীহাইনে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন যে, ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء! "আল্লাহ এমন কোনো রোগ নাযিল করেননি, যার ওষুধ তৈরি করেননি।"

মুসনাদে ইমাম আহমাদে উসামা ইবনু শারীক থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর কাছে ছিলাম বেদুঈনরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি ওষুধপত্র ব্যবহার করব? তিনি বললেন–

نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع له شفاء غير داء واحد.

"হ্যাঁ। হে আল্লাহর বান্দাগণ, চিকিৎসা করো। কেননা বার্ধক্য রোগ ব্যতীত আল্লাহ্ তায়ালা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নাই, যার নিরাময় সৃষ্টি করেননি।"

অন্যত্র এসেছে:

إن الله لم يزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নাই যার নিরাময় তিনি সৃষ্টি করেননি। যে তা জানার সে জেনেছে আর যে জানার নয় সে তা জানেনি।"

'মুসনাদ' এবং 'সুনানে' আবু খিযামাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা যে ঝাড়ফুঁক এবং ওষুদের মাধ্যমে চিকিৎসা করি এটা কী আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত বিধানকে পরিবর্তন করতে পারে? তিনি বললেন, এটাও আল্লাহর কদরের একটি।

এসব হাদীসসমূহ মাধ্যম গ্রহণের বৈধতা এবং যারা এ মাধ্যমে অবিশ্বাসী তাদের বক্তব্যের অসারতার প্রমাণ বহন করে। হাদীসের لكل داء دواء বাক্যটি দ্বারা ব্যাপকতাও উদ্দেশ্য হতে পারে। আর তখন

www.waytojannah.com

এতে অন্তর্ভুক্ত হবে। জীবননাশক রোগ এবং যে রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে ডাক্তাররা অজ্ঞ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সে রোগের নিরাময় সৃষ্টি করে মানুষদেরকে সে সম্পর্কে অজ্ঞ করে রেখেছেন। তাই ডাক্তারদের পক্ষে সে রোগের নিরাময় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কেননা আল্লাহ শিক্ষা দেয়া ছাড়া বান্দারা তা শিখবে কি করে। তাই তো রাসূল ﷺ বলেছেন, রোগ অনুযায়ী চিকিৎসা করলেই সুস্থতা অর্জন সম্ভব। কেননা সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুর একটি বিপরীত বস্তু থাকে। এমনিভাবে প্রতিটি রোগেরও বিপরীত ওষুধ রয়েছে যা দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। তাই রাসূল ﷺ এমনটি বলেছেন। কেননা রোগ অনুযায়ী যদি ওষুধ না হয় বা রোগের পরিমাণের চেয়ে যদি বেশি ওষুধ দেয়া হয় তবে এ ওষুধ অন্য আরেকটি রোগ সৃষ্টি করবে। আর যখন যে রোগের যে পরিমাণ ওষুধ দেয়া দরকার তা না দিয়ে যদি পরিমাণে তার চেয়ে কম দেয়া হয় তবে এ চিকিৎসা হবে অসম্পূর্ণ। রোগী অনুযায়ী ওষুধ না দিলে বা রোগ অনুযায়ী ওষুধ না হলে কখনোই আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নয়। সময়, যুগ এবং স্থান যখন চিকিৎসার উপযুক্ত না হবে তখন চিকিৎসা ফলপ্রসূ হবে না। অথবা রোগী যদি চিকিৎসা গ্রহণে অক্ষম হয় বা কোন কারণে চিকিৎসা যদি তার উপকারী না হয়। তখন এ চিকিৎসা রোগীর কোনো উপকারে আসবে না। বরং যখনই রোগ অনুযায়ী চিকিৎসা করা হবে তখনই সুস্থতা অর্জন সম্ভব।

রোগ নিরাময়ে নাবী (রা)-এর চিকিৎসা

রোগ নিরাময়ে নাবী ﷺ তিন ধরনের চিকিৎসা করতেন:

১. প্রকৃতিগত ওষুধ দ্বারা।

২. আল্লাহ প্রদত্ত ওষুধ দ্বারা।

৩. উভয়ের দ্বারা যুক্ত বস্তু দিয়ে।

আমরা এখানে তিন প্রকারের আলোচনা করব। প্রথমে প্রকৃতিগত ওষধের আলোচনা করব এবং এরপর আল্লাহ প্রদত্ত ওষধের এবং সর্বশেষে তৃতীয় প্রকারের। এ বিষয়ে আলোচনা করার কারণ রাসূল ﷺ-কে পথ প্রদর্শন, আল্লাহর ও তার জান্নাতের প্রতি আহ্বানকারী, আল্লাহর পরিচয় প্রদানকারী, তার সন্তুষ্টির অসন্তুষ্টি মাধ্যম সম্পর্কে অবগতকারী এবং পূর্ববর্তী রাসূল ও তাদের সঙ্গে তাদের উম্মতের আচরণ সম্পর্কে সংবাদ প্রদানকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি মানুষদের সৃষ্টি, মৃত্যু, আত্মার সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য এবং কারণ সম্পর্কে পথনির্দেশ করেছেন।

শারীরিক চিকিৎসা বিষয়ে তার দিকনির্দেশনা ছিল শরীয়তের পূর্ণতা স্বরূপ। মূল উদ্দেশ্যে বলে নয়। প্রয়োজন হলে ওষুধ ব্যবহার করা। আর যদি প্রয়োজন না হয় তবে নিজের সকল শক্তি সার্মথ্য দিয়ে আত্মা ও রূহের চিকিৎসায় মনোযোগ দেয়া আত্মার সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি দূর করে আত্মাকে পূত-পবিত্র করা এবং আত্মাশুদ্ধিতে যত্নবান হওয়া। আত্মাশুদ্ধি অর্জন হয়ে যাওয়ার পর শারীরিক রোগ ব্যাধি হলে এতে ততটা ক্ষতি নেই কারণ শারীরিক এ ব্যাধি অচিরেই দূর হয়ে যাবে এবং আত্মশুদ্ধির করলে এরপর স্থায়ী শান্তি অর্জন হবে।

www.waytojannah.com

জ্বরের চিকিৎসায় রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

সহীহাইনে ইবনু ওমার থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন– "জ্বর বা জ্বরের কষ্টের উৎপত্তি জাহান্নামের তাপ থেকে। সুতরাং তোমরা পানি দ্বারা তা ঠাণ্ডা করো।" অনেক মূর্খ ডাক্তার এ হাদীসের উপর প্রশ্ন তুলেছেন এবং হাদীসের বর্ণনা জ্বরের চিকিৎসা বিরোধী বলে মনে করেন। আমরা বলব, রাসূল ﷺ-এর সম্বোধন সাধারত দু'ধরনের–

১. পৃথিবীর সকলের জন্য।

২. কতকের জন্য।

কথাটি রাসূল ﷺ-এর সাধারণ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। আর দ্বিতীয়টি রাসূল ﷺ-এর কথা তোমরা "কেবলার দিকে ফিরে পেশাব-পায়খানা করো না। বরং পূর্ব বা পশ্চিমে ফিরে তোমরা পেশাব-পায়খানা করো" এর মত। রাসূল ﷺ-এর এ কথাটি ছিল মদীনাবাসীদের জন্য ইরাক বা পূর্ব-পশ্চিমে অবস্থিত লোকদের জন্য নয়।

সুতরাং হাদীসে "পানি দ্বারা ঠাণ্ডা করার" যে কথা বলা হয়েছে তা সকলে জন্য নয় বরং হিজাজবাসীদের জন্য। আর তখন সাধারণত জ্বর হতো সূর্যের তাপের কারণে। আর এর জন্য ঠাণ্ডা খুবই পানি উপকারী। জ্বর দু'প্রকার:

১. আকস্মিক: যা ব্যথা, সূর্যের উত্তাপ অধিক কাজ বা প্রচণ্ড রাগের কারণে অনুভব হয়।

২. রোগ সম্বন্ধীয়: এটা আবার তিন প্রকার। এ প্রকার জ্বর প্রথমত কোন একটি অঙ্গে দেখা দেয় এবং ধীরে ধীরে পূর্ণ শরীরে ছড়াতে থাকে। এ জ্বরের শুরুতে যদি আত্মার সম্পর্ক থাকে তবে তাকে একদিনের জ্বর বলা হয়। যা তিন দিনের মধ্যে ভালো হয়ে যায়। আর শুরুতে যদি সম্পর্ক হয় যৌগিক জিনিসের সঙ্গে তবে একে আফলিয়া বলা হয় যা সর্বমোট চার প্রকারের হয়ে থাকে: পিত্ত বর্ণের, কৃষ্ণবর্ণের, শ্লেষ্মা জাতীয় এবং রক্তিম। আবার এ চার প্রকারের প্রত্যেকটির অধিনে একাধিক প্রকার রয়েছে।

আমাকে কতক অভিজ্ঞ ডাক্তার বলেছেন যে, আমরা জ্বর থেকে অনেক রোগের সুস্থতার সুসংবাদ গ্রহণ করি। কেননা রোগীর জন্য অনেক সময় ওষধের চেয়ে জ্বর হওয়া অনেক উপকারী। কেননা এর কারণে শরীরের নষ্ট উপাদানগুলো বের হয়ে যায়। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, হাদীসে জ্বরের জন্য যে চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে তা আকস্মিক জ্বরের সম্পর্কে।

তবে হ্যাঁ হাদীসে উল্লিখিত বক্তব্য সকল প্রকার জ্বরের ক্ষেত্রেও হওয়া সম্ভব। চিকিৎসা বিজ্ঞানী হাকীম জালিনুস একথার স্বীকার করে বলেন, জ্বরের ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা পানি অনেক উপকারী। তিনি তার "হীলাতুল বুরয়ি" গ্রন্থের দশম প্রবন্ধে বলেছেন যে, একজন সুঠাম দেহের যুবক যদি প্রচণ্ড দাবদাহে এবং জ্বরে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল করে বা তাতে সাঁতার কাটে তবে এটা তার উপকারে আসবে। তিনি আরো বলেন, এবং নির্দ্বিধায় রোগীকে আমরা এর নির্দেশ দিয়ে থাকি। ইমাম রাযী তার রচিত "কারীর" গ্রন্থে বলেন, শরীরে যদি প্রচুর শক্তি থাকে আর জ্বরও প্রচণ্ড হয় এবং পেটে কোন ব্যাথা না থাকে তবে তার উচিত ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করা। জ্বরের উত্তাপ জাহান্নামের তাপের কারণে এর দুটি ব্যাখ্যা আছে–

www.waytojannah.com

১. জ্বরের তাপ জাহান্নামের তাপের একটি নমুনা মাত্র যাতে মানুষ জ্বরের তাপের মাধ্যমে জাহান্নামের তাপ অনুধাবন করতে পারে। আল্লাহ এমনিভাবে মানুষের শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য জান্নাতের নেয়ামত আনন্দ সুখ এবং শান্তিকে এ দুনিয়াতে প্রকাশ করেছেন ঠিক জাহান্নামের শাস্তির কতিপয় নমুনাও দুনিয়াতে প্রকাশ করেছেন।

২. হাদীসে শুধু সাদৃশ্য বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অন্য কিছু নয়।

হাদীসে উল্লিখিত فابردوا শব্দটি দু'ভাবে পড়া যায়। আর হাদীসে যে পানির কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়:

ক. সর্বপ্রকার পানি এবং এ মতটিই সঠিক।

খ. যমযমের পানি।

যারা বলেন, হাদীসে যমযমের পানি উদ্দেশ্য তাদের দলিল হলো বুখারীর হাদীস, যা নাযর ইবনু ইমরান, আদ্‌দুবাঈ রেওয়ায়েত করেছেন যে, আমি ইবনু আব্বাস (রা) এর সঙ্গে মক্কায় বসা ছিলাম। এমন সময় আমি জ্বর অনুভব করলাম। তখন তিনি আমাকে বললে, যমযমের পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর।

কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন যে, জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের তাপ হতে সুতরাং তোমরা পানি দ্বারা তা ঠাণ্ডা কর। আবারো বললেন যে, তোমরা যমযমের পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর। হাদীসে পানি দ্বারা ঠাণ্ডা করার কথা বলা হয়েছে। এখন এর দ্বারা কি পানি ব্যবহার করা উদ্দেশ্য না পানি সদকা করা উদ্দেশ্যে এ নিয়ে ইখতেলাফ আছে। তবে সঠিক হলো পানি ব্যবহার করা।

আবু নুআঈম মারফূ সূত্রে আনাস থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, "তোমাদের কারো জ্বর হলে যে দিন হতে জ্বর শুরু সে দিন হতে তিন রাত্র সে যেন তার মাথায় পানি ঢালে।"

"ইবনু মাজাহ" এ আবু হুরাইরা (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, "জ্বর হলো জাহান্নামের হাপর স্বরূপ সুতরাং ঠাণ্ডা পানি দ্বারা তোমরা তা অপসারিত কর।"

মুসনাদ ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে সামূরা থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, জ্বর হলো জাহান্নামের টুকরা সুতরাং ঠাণ্ডা পানি দ্বারা তোমরা তা ঠাণ্ডা কর।"

রাসূল ﷺ-এর জ্বর হলে তিনি পানির পাত্র আনতে বলতেন। অতপর তা মাথায় ঢেলে গোসল করতেন।

সুনানের কিতাবে আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ-এর সামনে আমি আমার জ্বরের কথা বললে এক ব্যক্তি জ্বরকে গালি দিল। রাসূল ﷺ বললেন, "তাকে গালি দিয়ো না কারণ জ্বর গোনাহকে মোচন করে যেমনিভাবে আগুন লোহার ময়লা দূর করে দেয়।

পাতলা পায়খানার চিকিৎসা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

সহীহাইনে আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, আমার ভাইয়ের পাতলা পায়খানা হয়েছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে মধু পান করালো। সে আবার এসে বলল, আমি তাকে মধু পান করিয়েছি, এতে তার দাস্ত আরও বেড়ে গেছে। এইভাবে তিনি তিনবার বললেন। (অর্থাৎ, লোকটি এসে তার ভাইয়ের দাস্ত ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার

www.waytojannah.com

অভিযোগ জানাতো) অতঃপর সে চতুর্থবার এসে একই অভিযোগ করল। এইবারও নবী ﷺ বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে বলল আমি অবশ্যই তাকে মধু পান করিয়েছি। কিন্তু তার দাস্ত আরও বেড়ে গেছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ (তাঁর কালামে) যা বলেছেন তা সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা।

সহীহ মুসলিম: "আমার ভাইয়ের পেটে হযম হয় না" এ ধরনের শব্দ এসেছে।

মধুর উপকারিতাসমূহ: মধু স্নায়ু ও পাকস্থলির দূষিত পদার্থ অপসারক। কফজনিত রোগের জন্য খুবই উপকারী বিবেচক, লিভার ও যকৃৎ সুরক্ষায় কার্যকর, পেশাব পরিষ্কারক, কাশি উপশম হয় গোলাপের তেলের সঙ্গে মধু পান করল। ক্ষতিকর প্রাণী ও কীটের দংশন থেকে নিরাময় লাভ করা যায়। এ্যালকোহলের ক্ষেত্রে এবং ব্যবহার খুবই উপকারী। আর শুধু পানির সঙ্গে মিলিয়ে পান করলে জলাতঙ্ক রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়। এমনিভাবে মধুর সঙ্গে কাকড়ী শস্য, খিরাই, বেগুন মিশিয়ে সেবন করলে অন্যান্য বস্তু খাওয়ার চেয়ে ৬ মাস বেশি শরীর সুস্থ থাকে। এভাবে মধু সেবনে মৃত দেহ পচন ধরে দেরিতে। মধু উকুন নাশক। মানব চুলে লাগালে চুল লম্বা হলো এবং উকুন মারা যায়। মধু দিয়ে চোখে সুরমা লাগালে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। মধু দিয়ে মেসওয়াক করলে দাঁত পরিষ্কার হয় মজবুত হয় এবং মাড়ি সুস্থ থাকে। মুখের সকল বদ-বু দূর হয়ে যায় রজঃস্রাব নিয়ন্ত্রণে থাকে, পাকস্থলির সকল দূষিত পদার্থকে পরিষ্কার করে দেয়। এমনিভাবে মধু কিডনি, লিভার এবং মূত্রথলির জন্য খুবই উপকারী। মধু অন্যান্য খাদ্যের এক প্রকার খাদ্য অন্যান্য পনির ন্যায় এক প্রকার পানীয় এবং অন্যান্য মিষ্টি এবং মালিশের ন্যায় এক প্রকার মিষ্টি ও মালিশ। আর এ কারণেই হাজারো বছর ধরে প্রাচীন চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মধুকে বিভিন্ন রোগের নিরাময়ের জন্য একমাত্র মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন। রাসূল ﷺ কফজনিত রোগে পানির সঙ্গে মধু মিশিয়ে পান করতেন।

সুনানে ইবনু মাজাহ এ আবু হুরাইরা (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন ভোরে কিছু মধু চেটে খাবে সে কোন বড় ধরনের বিপদে বা রোগে আক্রান্ত হবে না।" অন্য একটি আছারে এসেছে যে, নিরাময়কারী দুটি জিনিসকে তোমরা আঁকড়ে ধর। তা হলো: মধু এবং কুরআন।

উল্লিখিত হাদীসে দাস্তের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ মধু পানের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে পাকস্থলিতে জমে থাকা দূষিত পদার্থগুলো বেরিয়ে যায়। কারণ মধু এক্ষেত্রে খুবই উপকারী এবং ঐ ব্যক্তির পাকস্থলিতে চটচটে এবং আঠালো জাতীয় পদার্থ জমে গিয়েছিল যার কারণে পাকস্থলির খাবার হযমের শক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এমন জিনিস দিয়ে তার চিকিৎসা করা উচিত যা চটচটে ভাব দূর করতে সক্ষম। আর মধু এর জন্য খুবই উপকারী। তাই মধু পানের নির্দেশ দিয়েছেন। আর বারবার পান করার নির্দেশের কারণ ওষুধের একটি পরিমাণ আছে। রোগের হিসেবে ওষুধের পরিমাণ নির্ণয় হয় রাসূল ﷺ যখন তাকে মধু পানের নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন সে তাকে এ পরিমাণ মধু পান করাইনি যা তার রোগ নিরাময়ে যথেষ্ট তাই একাধিক বার মধু পান করানোর নির্দেশ দেন যাতে এ মধু তার রোগ নিরাময়ের জন্য যথেষ্ট হয়। অবশেষে সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। আর রোগী এবং তার রোগের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের নীতিমালার অন্যতম একটি বিধান।

রাসূল ﷺ-এর চিকিৎসা অন্যান্য ডাক্তারদের চিকিৎসার মতো নয়। কেননা তাঁর চিকিৎসায় সুস্থতা সুনিশ্চিত। কারণ এ চিকিৎসা ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত। নবুওয়াতের উৎস এবং মহাবিজ্ঞানীর কথা থেকে গৃহীত। আর অন্যান্যদের চিকিৎসা সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞতা ও অনুমান নির্ভর। তবে একথা অস্বীকার করার

www.waytojannah.com

নয় যে নাবী চিকিৎসাও অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর নয় না। কেননা নবীচিকিৎসা শুধু তার ক্ষেত্রে উপকারী যে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সঙ্গে নব্বীচিকিৎসাকে গ্রহণ করে। এই কুরআন সকল আত্মিক রোগের ওষুধ। কেউ যদি এ কুরআনকে গ্রহণ না করে তবে সে কি পূর্ণ সুস্থ হতে পারবে? বরং এ কুরআন তো মুনাফিকদের মুনাফিকীকে আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে। সুতরাং নব্বীচিকিৎসা থেকে বিমুখতা উপকারী ওষুধ কুরআনের মাধ্যমে আত্মিক রোগের চিকিৎসা না করার নামান্তর।

শোথ রোগ এবং এর চিকিৎসা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

সহীহাইনে আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উরাইনা এবং উকল সম্প্রদায়ের একটি প্রতিনিধি দল রাসূল ﷺ-এর নিকট আগমন করল। মাদীনার আবহাওয়া তাদের প্রতিকূল হলো। রাসূল ﷺ-এর নিকট তারা এসে এর অভিযোগ করল, তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা সদকার উটের নিকট গিয়ে তার দুধ ও পেশাব পান কর। তারা তা করল ফলে সুস্থ হয়ে উঠল এবং রাখালদেরকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে চলে গেল এবং তারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করল। রাসূল ﷺ তাদের পেছনে পেছনে লোক প্রেরণ করলেন। অতঃপর তাদেরকে ধরে এনে হাত এবং পাদ্বয় কেটে এবং তাদের চোখ উপড়ে ফেলে রৌদ্রে ফেলে রাখা হল; অবশেষে তারা মৃত্যুবরণ করল।

তাদেরকে এ রোগটি শোথ রোগ ছিল এর দলিল হলো মুসলিম শরীফে এসেছে যে, তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে অভিযোগ করল যে, "মদিনার আবহাওয়া তাদের প্রতিকূল হয়েছে। এতে তাদের পেট ফুলে গেছে, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল হয়ে গেছে।"

জাওয়া: এক প্রকারের ব্যাধি যার কারণে পেটে এবং পানিজনিত রোগ সৃষ্টি হয়। এটি এমন একটি ব্যাধি যার কারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুলে যায়। ব্যাধি তিন প্রকারের হয়ে থাকে: মাংস সম্পর্কীয় ব্যাধি যা সবচেয়ে মারাত্মক। এ ব্যাধির নিরাময়ের জন্য এমন আকর্ষণধর্মী ওষুধের প্রয়োজন যাতে স্বাভাবিক গতি আছে। আর এটা উটের দুধ এবং পেশাবে বিদ্যমান। তাই রাসূল ﷺ তাদেরকে উটের দুধ এবং পেশাব পানের নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ উটের দুধে এক প্রকার স্বচ্ছতা, নমনীয়তা এবং মৃদু প্রবাহ সৃষ্টির ক্ষমতা বিদ্যমান। কেননা উটের অধিকাংশ খাবার হলো শুষ্ক প্রকারের এবং ঘাস ও ডেইজী ফুল ইত্যাদি যা শোথ রোগ নিরাময়ে খুবই উপযোগী।

শোথ রোগ: সাধারণত যকৃৎ প্রদাহের কারণে হয়ে থাকে আর এর জন্য উটের দুধ খুবই উপশমী।

ইমাম রাযী বলেন, উটের দুধ যকৃতের ব্যাথা নিরাময়ে বেশ উপকারী। ইসরাঈলী বলেন, উটের দুধ সবচেয়ে তরল এবং এর তিব্রতা সবচেয়ে বেশি। যার ফলে উটের দুধ লিভারের রোগ প্রতিরোধে খুবই উপকারী। এর দুধে এক প্রকার উষ্ণতা আছে যার কারণে লিভারের সমস্যার কারণে সৃষ্ট হেপাটাইটিস বি এবং পেট ফুলে যাওয়ার ব্যাধিতে খুবই কার্যকর।

কানূন গ্রন্থের লিখক বলেছেন, যারা বলেন যে, দুধের প্রকৃতি শোথ রোগ বিরোধী এটা ঠিক নয়। বরং উটের দুধ এ রোগের জন্য খুবই উপকারী। কারণ এর দুধে এক প্রকার তরলতা বিদ্যমান যা রোগ নিরাময়ে খুবই কার্যকর। আর উটের পেশাব অন্যান্য পেশাবের চেয়ে অধিক উপকারী।

হাদীসে উল্লিখিত ঘটনা উটের দুধ এবং পেশাব দ্বারা চিকিৎসার বৈধতার দলিল। একথারও দলিল যে, যেসব প্রাণির গোশত হালাল তার পেশাব পবিত্র। কেননা হারাম জিনিসের মাধ্যমে চিকিৎসা করা

www.waytojannah.com

নাজায়েজ। তাছাড়া হাদীস থেকে নিম্নোক্ত বিধান বুঝে আসে: অপরাধকারীকে আর অপরাধ সমপরিমাণ শাস্তি প্রদান বৈধ। একজনের হত্যার কারণে একদলকে হত্যা করা জায়েজ। কোন অপরাধকারীর মধ্যে হত্যার বিধান এবং দণ্ডের বিধান একত্রিত হলে উভয়টিই প্রয়োগ করা বৈধ। কেউ সম্পদ চুরি করলে এবং হত্যা করলে তার হাতকাটা এবং হত্যা করা উভয়টাই বৈধ ইত্যাদি ইত্যাদি বিধান।

ক্ষত, জখম, এবং নাকের রক্তক্ষরণ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

সহীহাইনে আবু হাকিম থেকে বর্ণিত তিনি সাহল ইবনু সা'দকে উহুদের দিনে রাসূল ﷺ-এর ক্ষতকে কি দ্বারা চিকিৎসা করা হয়েছিল সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন। অতঃপর বললেন যে, রাসূল ﷺ-এর চেহারা মোবারক জখম হয়েছিল তাঁর সামনের দুটি দাঁত ভেঙ্গেছিল এবং হেলমেট তাঁর মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। ফাতিমা (রা) রাসূল ﷺ-এর রক্ত ধুতে ছিলেন আর আলী ঢাল দিয়ে তাকে পাহারা দিচ্ছিলেন।

অতঃপর ফাতেমা যখন দেখলেন রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে না তখন এক টুকরো চাটাই নিয়ে জ্বালিয়ে ছাই করে রাসূল ﷺ-এর ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। পরে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। চাটাইয়ের ছাইয়ে রক্ত বন্ধের অসাধারণ ক্ষমতা আছে। কেননা এটি একটি শুষ্ক জিনিস, সাথে সাথে তাতে ব্যাথাও কম তাই এটা রক্ত পড়া বন্ধে খুবই কার্যকর ওষুধ। আর একে শুধু ছাই বা সিরকার সঙ্গে মিশ্রিত করে নাকের রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত রোগীর নাকের ফুঁ দিলে নাকের রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়।

মধু সেবন, সিঙ্গা এবং তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ দেয়া সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

সহীহ বুখারীতে সাঈদ ইবনু জুবাইর সূত্রে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ বলেছেন–

الشفاء فى ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتى عن الكى.

"তিনটি জিনিসের মধ্যে রোগের নিরাময় আছে– শিংগা লাগানো, মধু পান করা এবং তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ দেয়া। তবে আমি আমার উম্মাতকে দাগ দেয়া থেকে নিষেধ করেছি।"

আবু আব্দুল্লাহ আল-মাঝেরী বলেন, পূর্ণ শরীরে যে সব রোগ ছড়িয়ে থাকে তা হয়ত রক্ত সংক্রান্ত হবে নচেৎ পিতবর্ণের, কৃষ্ণবর্ণের অথবা কফ জাতীয় হবে। রক্ত সংক্রান্ত রোগ হলে এর নিরাময় হলো রক্ত বের করে দেয়া। আর বাকি তিন প্রকারের ক্ষেত্রে তরল জাতীয় খাবার ব্যবহার করলে সুস্থতা লাভ করা যায়। আর মধু হলো সবচেয়ে তরল খাবার। শিংগা লাগানোর কথা হাদীসের– شرطة محجم শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। যেকোন ওষুধই যখন কাজে আসবে না তখন দাগ লাগানোই হলো রোগের একমাত্র চিকিৎসা।

হাদীসে যে বলা হয়েছে যে, "আমি আমার উম্মাতকে দাগ লাগাতে নিষেধ করেছি বা আমি দাগ লাগানোকে পছন্দ করি না"-এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজন ছাড়া এর মাধ্যমে চিকিৎসা না করা উচিত বরং নিয়ম হলো সর্বশেষে এর দ্বারা চিকিৎসা করা। কারণ অনেক সময় দাগ লাগানোর কষ্ট যে রোগের জন্য দাগ লাগানো হচ্ছে এর চেয়েও অধিক কষ্টকর হয়ে থাকে।

www.waytojannah.com

অনেক চিকিৎসকদের মতে, প্রকৃতিগত ব্যাধি কখনো বস্তুগত কারণে হয় আবার কখনো বস্তুগত না হয়ে অন্য কোন কারণেও হয়ে থাকে। বস্তুগত কারণ যেমন–উষ্ণতা, ঠাণ্ডা, আর্দ্রতা, শুষ্কতা এবং উল্লিখিত কারণসমূহের সমন্বয়ে গঠিত কোন কারণ ইত্যাদি। এ চার অবস্থার মধ্যে দুটি সরাসরি সৃষ্টি হয়: উষ্ণতা এবং ঠাণ্ডা, আর অপর দুটি অন্যের মাধ্যমে প্রভাবান্বিত হয়।

এর থেকে বুঝা গেল যে, প্রকৃতিকগত ব্যাধিসমূহ উষ্ণতা এবং ঠাণ্ডার অনুগামী। আর ব্যাধি যদি উষ্ণ হয় তবে, এক্ষেত্রে শরীয়তের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আমরা রক্ত বের করার মাধ্যমে চিকিৎসা করি, চাই তা শিঙ্গার মাধ্যমে হোক বা টেনে রক্ত বের করার মাধ্যমে হোক। কারণ এর কারণে প্রকৃতি শিতল হয়ে যায়। আর শীতল হলে গরম জিনিসের মাধ্যমে চিকিৎসা করা অত্যান্ত ফলদায়ক আর মধুর মধ্যে এ গুণটি বিদ্যমান।

আর তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ দেয়ার নির্দেশকরণ বস্তুগত সকল রোগের ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়। তবে যদি রোগ পুরাতন এবং দীর্ঘদিনের হয় তবে এক্ষেত্রে তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ দেয়া শরীরের জন্য খুবই উপকারী।

ফোড়া, পাঁচড়া এবং চিকিৎসা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

ইবনুস সুন্নী তার কিতাবে রাসূল ﷺ-এর জনৈক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ আমার নিকট আসলেন। আমার হাতের আঙুলে তখন ফোড়া হয়েছিল।

রাসূল ﷺ বললেন, "তোমার কাছে কি 'যারীরা' নামক সুগন্ধি আছে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

তিনি বললেন, "একে এর উপর ঢাল এবং এ দু'আ পড়ো–

اللهم مصغر الكبير، ومكبر الصغير، صغر ما بي.

বড়কে ছোটকারী এবং ছোটকে বড়কারী হে আল্লাহ, আপনি আমার এ রোগকে ছোট করে দিন।"

যারীরা: যারীরা বাঁশের তৈরি ওষুধ যা ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। এ ওষুধটি খুব উষ্ণ ও শুষ্ক হয়ে থাকে যা পাকস্থলি লিভার এবং শোথ রোগের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী। এ সুগন্ধি আত্মার খুব শক্তিবর্ধক। আয়িশা বলেন, ইহরাম এবং হালাল অবস্থায় বিদায় হাজ্জে আমি আমার নিজ হাতে রাসূল ﷺ-কে যারীরা সুগন্ধি লাগিয়েছি।

বাছারা (ফোড়া): শরীরের উষ্ণতার কারণে সৃষ্ট এক প্রকার ফোঁড়া। যা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হয়ে থাকে। এ রোগের চিকিৎসা হলো এর জন্য এমন জিনিস ব্যবহার করা যার কারণে ফোঁড়া পেকে যায় আর যারীরা এর জন্য খুবই উপকারী। এমনটিই বলেছেন 'কানূন' গ্রন্থো রচয়িতা।

তিন আঙ্গুলে খাবার খাওয়া সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

রাসূল ﷺ তিন আঙ্গুলে খাবার খেতেন এবং তিনি আঙ্গুলে খাবার খাওয়া রুচিসম্মতও বটে। কেননা এক বা দুই আঙ্গুলে খাবার খেলে আহারকারী খাবারে ততটা স্বাদ অনুভব করে না যতটা অনুভব করে তিন আঙ্গুলে খাবার খেলে। আর পাঁচ আঙ্গুল বা হাতের তালু দিয়ে খাবার খেলে পাকস্থলির ক্ষতি হওয়ার

www.waytojannah.com

সম্ভাবনা থাকে আবার অনেক সময় নাড়িভুড়ির সঞ্চালন বন্ধ হয়ে মারা যাবারও আশঙ্কা থাকে। তাই খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো রাসূল ﷺ-এর পদ্ধতি।

রাসূল ﷺ-এর খাবার সম্পর্কে কেউ চিন্তা করলে সে দেখবে যে, রাসূল ﷺ কখনও মাছ ও দুধ একসঙ্গে খাননি। এমনিভাবে একসঙ্গে দুধ ও টক জাতীয় খাবার, এক সঙ্গে দুই প্রকার গরম খাবার ও দুই প্রকার ঠাণ্ডা খাবার এবং এক সঙ্গে তৈলাক্ত ও গাঢ় খাবার আহার করেননি। কখনো দ্রুত হযম হয় এমন খাবার এবং আস্তে আস্তে হযম হয় এমন খাবার একত্রে খাননি। খাননি ভুনা ও সাধারণভাবে রান্না করা খাবার একত্রে একসঙ্গে। এমনিভাবে যে খাবার আজকে রান্না করা হয়েছে তিনি তা পরবর্তী দিন গরম করে খেতেন না। কখনো চাটনি ও লবণাক্ত খাবার একত্রে খেতেন না। কারণ এ সকল খাবার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক।

তিনি অনেক সময় অনেক খাবারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াকে অন্য কোনো খাবারের মাধ্যমে দূর করে খাবারের উপযোগী করতেন। তাই কখনো গরম খাবারকে ঠাণ্ডা এবং শুকনো খাবারকে তরল খাবারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত করে নিতেন। আর এ উদ্দেশ্যে কাকড়ীর (শসা) সঙ্গে খেজুর এবং ঘি দিয়ে খেজুর ইত্যাদি খেতেন।

তিনি রাতের খাবারের নির্দেশ করতেন চাই এক মুষ্টি খেজুর দিক হোক। আর ইরশাদ করতেন, ترك العشاء مهرمة "রাতের খাবার না খাওয়া বার্ধক্যের কারণ।" হাদীসটি ইমাম তিরমিযী এবং ইবনু মাজাহ রেওয়ায়েত করেছেন। আর তার থেকে আবু নু'আঈম রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূল ﷺ রাতের খাবার না খেয়ে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, এটা কলবকে কঠোর করে দেয়।

আর এ কারণে যারা সুস্থ থাকতে চায় তাদেরকে ডাক্তাররা রাতের খাবারের পরে একশত কদম হাঁটার পরামর্শ দেন। এবং খাবার খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে যেতে নিষেধ করেন। কারণ এটা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ধার্মিক মুসলমান ডাক্তারদের পরামর্শমতে রাতের খাবার খাওয়ার পর নামায পড়া শ্রেয় কারণ এর কারণে পাকস্থলিতে খাবারটা স্থায়ী হয়। যার কারণে সহজেই খাবার হযম হয়। তিনি খানা খাওয়া অবস্থায় পানি পান করতেন না। বিশেষ করে ঠাণ্ডা বা গরম হলে তো আর কথাই নেই। কারণ এটা ক্ষতিকারক।

তিনি ব্যায়াম, ক্লান্তি এবং সহবাসের পরে খাবারের আগে ও পরে এবং ফল খাওয়ার পরে পানি পান করতে অপছন্দ করতেন। এমনিভাবে ঘুম থেকে উঠার সময় এবং টয়লেট থেকে আসার পরে পানি পান করতেন না। কারণ এসবগুলোই স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

শরবত পানে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

স্বাস্থ্য রক্ষায় রাসূল ﷺ-এর বাতানো পানি পান পদ্ধতি বড় উপকারী। তিনি ঠাণ্ডা পানির সাথে মধু মিশিয়ে পান করতেন। সকল ডাক্তার এ ব্যাপারে একমত যে, এভাবে পান করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। কারণ এভাবে পান করলে কফ দূর হয়ে যায় পাকস্থলির দুর্বলতা কেটে যায়। সহবাসের জন্য উপকারী এবং এছাড়াও এভাবে পানি পান করলে পেট খারাপ ও পাতলা পায়খানা ভালো হয়। মূত্রথলী এবং যকৃৎ শক্তিশালী হয়। এভাবে পান করা মিষ্টি দ্রব্যাদি তৈরি সকল ওষুধ থেকে উপকারী।

www.waytojannah.com

পানিতে যখন শীতলতা এবং মিষ্টতা একত্রিত হয় তখন এ পানি স্বাস্থ্যকর হয়। লিভার, রূহ এবং ক্বলবকে শক্তিশালী করে। এ জাতীয় পানীয় অঙ্গের প্রতিটি শিরায় শিরায় পৌছে তাতে সতেজতা এনে দেয়। ঠাণ্ডা পানি শরীরের সকল উত্তাপ ও উষ্ণতা দূর করে তাতে নতুন আমেজ ফিরিয়ে দেয়। এর দ্বারা শরীরে পুষ্টি সৃষ্টি হয়।

এর কারণে শরীরের পুষ্টি সৃষ্টি হওয়া না হওয়া নিয়ে ডাক্তারদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। অনেকের মতে, এ জাতীয় পানীয় পানে শরীরে পুষ্টি শক্তি সৃষ্টি হয় এবং শরীরের বর্ধন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে যখন পানি পানের চাহিদা বেশি হবে তখন এ ধরনের পানি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।

তারা বলেন, জীব ও জড় পদার্থের মধ্যে একাধিক দিক দিয়ে মিল রয়েছে। উদ্ভিদ এ তার উপযোগী এনার্জি থাকে। আর এ কারণে উদ্ভিদের আহার হলো পানি। সুতরাং এ পানি যে জীবকুলের এক প্রকার আহার তা অস্বীকারের কিছু নেই। তাছাড়া তরল পানির মাধ্যমেই খাদ্য হজম হয়ে থাকে। সুতরাং পানি না হলে হজম হওয়া অসম্ভব। পানি জীব ও উদ্ভিদের প্রাণের উপাদান। আর নিয়ম হলো যে জিনিস উপাদানের অধিক নিকটবর্তী তার মাধ্যমে পুষ্টি ও শারীরিক বর্ধন সম্ভব। আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ.

"প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা: আম্বিয়া: ৩০)

কোনো পিপাসার্ত যখন পানি পান করে সিক্ত হয় এবং তৃষ্ণা নিবারণ করে তখন আমরা তার দেহে এক নতুন উদ্যমতা দেখতে পাই। অল্প পানি পানেই সে যে পরিমাণ উদ্যমতা আর পুষ্টি লাভ করে এবং শরীরে সতেজতা ফিরে পায় প্রচুর খাবার খেলেও এ ধরণের সতেজতা পাওয়া যায় না।

অপর একদল ডাক্তারদের মতে, পানির মাধ্যমে পুষ্টি ও শক্তি অর্জন অসম্ভব। কারণ শুধু পানি পানই যথেষ্ট না বরং এর সাথে অন্যান্য খাবারের প্রয়োজন হয়। সুতরাং বুঝা গেল শুধু পানি পুষ্টি ও শরীরের এনার্জির জন্য যথেষ্ট নয়।

আয়িশা বলেন, রাসূল ﷺ-এর নিকট ঠাণ্ডা সুমিষ্ট পানি অধিক পছন্দনীয় ছিল। সুমিষ্ট পানি দ্বারা ঝরনা ও কূপের পানিও উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার মধু ও পানি মিশ্রিত শরবত বা কিসমিস ও খেজুর ভেজানো পানিও হতে পারে। এবং শেষ মতটিই অধিক স্পষ্ট।

সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেছেন– "তোমার নিকট যদি পাত্রে বাসি পানি থাকে তবে আমরা চুমুক দিয়ে তা পান করব।" এ হাদীস থেকে পাত্রে মুখ লাগিয়ে এবং চুমুক দিয়ে পানি পানের বৈধতা পাওয়া যায়। পাত্রের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে পান করার অর্থ হলো হাউজ ইত্যাদিতে মুখ দিয়ে পানি পান করা। প্রয়োজনের কারণে রাসূল ﷺ মুখ লাগিয়ে এভাবে পান করেছেন বা রাসূল ﷺ এভাবে পান করে মানুষকে একথা শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যে, এভাবেও পানি পান করা জায়েয। তবে ডাক্তারদের মতে, এভাবে পানি পান করা পাকস্থলির জন্য খুবই ক্ষতিকর। ইবনু ওমার থেকে এ বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, হাদীসটির মান আমার জানা নেই। হাদীসটি হলো– "নাবী ﷺ আমাদেরকে পাত্রে চুমুক দিয়ে এবং এক অঞ্জলিতে পানি নিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মতো না চাটে। যাচাই করা ছাড়া রাত্রে পাত্র থেকে পানি পান না করে। তবে পাকানো হলে তা পান করতে পারবে।" বুখারীর হাদীস এর চেয়েও সহীহ। আর এ হাদীসটি যদি সহীহও হয় তদুপরি উভয় হাদীসের মাঝে কোনো বৈপরিত্য নেই।

www.waytojannah.com

দাঁড়িয়ে এবং বসে পানি পান প্রসঙ্গ

রাসূল ﷺ-এর নিয়ম ছিল পানি বসে পান করা এবং এটাই ছিল রাসূল ﷺ-এর সাধারণ অভ্যাস। সহীহ সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এবং যে দাঁড়িয়ে পানি পান করে তাকে বমি করে দিতে বলা হয়েছে। তবে সহীহ সূত্রে দাঁড়িয়ে পানি পান করাও প্রমাণিত।

একদল আলিমের মতে, দাঁড়িয়ে পান করার হাদীসের মাধ্যমে বসে পান করার হাদীস রহিত হয়ে গেছে। আবার কারো মতে, রাসূল ﷺ-এর দাঁড়িয়ে পান করা তা ছিল দাঁড়িয়ে পান করা হারাম না হওয়ার দলিল। বরং দাঁড়িয়ে পান করা উত্তম পন্থা পরিহার করা ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

আবার অনেকের মতে, রাসূল ﷺ প্রয়োজনের কারণে দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন। আর তাদের বক্তব্য হলো, উল্লিখিত বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। কেননা রাসূল ﷺ যখন কূপের নিকট আসলেন তখন সাহাবারা সেখান থেকে পানি পান করছিল। তারা রাসূল ﷺ-কে পানি পানের পাত্র দিলে রাসূল ﷺ সেখানে দাঁড়িয়েই পানি পান করেন।

দাঁড়িয়ে পান করার ক্ষতিসমূহ: দাঁড়িয়ে পান করলে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। পানি পাকস্থলীতে স্থির হয় না যার ফলে যকৃৎ তা বিভিন্ন অঙ্গে পৌছাতে পারে না, দ্রুত এবং একত্রে পানির চাপ পাকস্থলিতে পরে, যার কারণে পাকস্থলির উষ্ণতা শীতল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং কোনো ধারাবাহিকতা ছাড়াই দ্রুত দেহের নিচে চলে যায়। আর এসবগুলোই পানি পানকারীর জন্য ক্ষতিকর। হ্যাঁ প্রয়োজন বা মাঝে মধ্যে কোনো কারণে যদি এমনটি করা হয় তবে তাতে সমস্যা নেই।

পানি পানের মাঝে শ্বাস নেয়া প্রসঙ্গ

সহীহ মুসলিমে আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ পান করার সময় তিনবার শ্বাস নিতেন এবং বলতেন, তা অধিক স্বাস্থ্যসম্মত ও অধিক তৃপ্তিদায়ক।

শরীয়তের পরিভাষায় 'শরাব' বলা হয় পানিকে আর তানাফ্ফুস ফীশ শারাব বলা হয় পান পাত্রকে মুখ থেকে সরিয়ে নেয়া এবং পাত্রের বাইরে শ্বাস ফেলা। এরপর আবার পান করাকে। একটি হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, "তোমাদের কেউ যখন পানি পান করবে তখন সে যেন পানপাত্রে শ্বাস না নেয়, বরং পাত্রকে মুখের সামনে থেকে যেন সরিয়ে নেয়। এভাবে পানি পান করায় অনেক উপকারিতা আছে, রাসূল ﷺ হাদীসে এর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এভাবে পান করা তৃপ্তিদায়ক, এবং স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ও লঘুপাক।

তাছাড়া এভাবে পান না করলে অনেক সময় পানি গলায় আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এভাবে পান করার আরো উপকারিতা হলো, পানকারী যখন প্রথমবার পানি পান করে তখন যকৃৎ ও হৃৎপিণ্ডে ঠাণ্ডা পানি পরার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে ধোঁয়ার মতো এক বাষ্প উপরের দিকে উঠে আসে এরপর যখন দ্বিতীয়বার পানি পান করা হয় তখন ঠাণ্ডা পানি নিচে নামার সময় বাষ্পের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এবং এর কারণে গলায় খাদ্য আটকা পড়ে এবং গলায় যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়। অবশেষে তৃপ্তি অর্জন হয় না। ইবনুল মুবারাক ও বাইহাকী রাসূল ﷺ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তোমাদের কেউ পানি পান করলে যেন চুষে চুষে পান করে গিলে গিলে নয়। কারণ এটি যকৃৎ প্রদাহ এবং লিভারের ব্যাথা সৃষ্টিকারী। অভিজ্ঞতার আলোকে জানা গেছে যে, একসঙ্গে একত্রে গিলে পানি পান করলে যকৃৎ দুর্বল হয়ে যায় এবং যকৃতে

www.waytojannah.com

ব্যাথা সৃষ্টি হয়। যদি ধীরে ধীরে পান করা হয় তবে যকৃতের কোনো ক্ষতি হয় না। এটা ঠিক উত্তপ্ত কড়াইতে ঠাণ্ডা পানি ঢালার মতো। যাতে আস্তে আস্তে এবং ধীরে ধীরে পানি ঢাললে কোনো ক্ষতি হয় না। ইমাম তিরমিযী তার জামে'তে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তোমরা উটের ন্যায় এক শ্বাসে পান করবে না; বরং দুই কিংবা তিন শ্বাসে পান করবে। আর যখন পান করবে (শুরুতে) بسم الله "বিসমিল্লাহ" পড়বে এবং যখন (পানান্তে) পেয়ালা মুখ থেকে সড়াবে তখন الحمدلله "আলহামদুলিল্লাহ" বলবে।

ইমাম আহমাদ বলেন, কোনো খাবারে যখন চারটি জিনিসের উপস্থিতি ঘটবে তখন সে খাবার পূর্ণাঙ্গ হয়েছে বলে মনে করা হবে: (ক) শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পড়া, (খ) শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়া, (গ) খাবারের দস্তরখানে লোকসংখ্যা বেশি হওয়া এবং (ঘ) খাবার হালাল হওয়া।

ব্যায়াম ও শরীরচর্চা প্রসঙ্গে

আমরা জানি, শরীর সুস্থ রাখার জন্য খাবারের প্রয়োজন এবং এ খাবারের মাধ্যমে শরীরকে তখনই সুস্থ রাখা সম্ভব যখন এ খাবার ঠিকমত হজম হবে। এরপর খাবার হজম হলে শরীর আকার, আকৃতি এবং পরিমাণের দিক দিয়ে বাড়তে থাকবে। ফলে এক সময় শরীর ভারী হয়ে যাবে। যার কারণে দেহে নানারকম ব্যাধি দেখা দিতে পারে। এ ব্যাধিগুলোকে যদি ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয় তবে শারীরিক ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে। শরীর থেকে উপকারী ধাতু বেরিয়ে যায় এবং শরীরে নানারকম উত্তাপ, জ্বর ও পচন রোগ ইত্যাদি দেখা দেয়। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে শরীরের স্বভাবজাত উষ্ণতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নানান প্রকার ঠাণ্ডাজনিত রোগ দেখা দেয়। ব্যায়াম এগুলোর প্রতিরোধের একমাত্র অন্যতম মাধ্যম। কারণ নিয়মিত ব্যায়াম করলে শরীর সতেজ থাকে এবং এ ব্যায়াম দেহের অপ্রয়োজনীয় অংশকে বের করে দেয়। দেহকে খাবার গ্রহণের যোগ্য করে তুলে। শরীরের কব্জা, জোড়া এবং স্নায়ুসমূহকে মজবুত করে এবং সর্বপ্রকার বস্তুগত ব্যাধি থেকে শরীর নিরাপদে থাকে।

ব্যায়াম করার সবচেয়ে উত্তম সময় হলো খাবার হজম হয়ে যাওয়ার পরের সময়। স্বাভাবিক ব্যায়াম বলতে যে ব্যায়াম করলে শরীরের চামড়া রক্তিম বর্ণের হয়ে যায় এবং শরীর ফুলতে থাকে। তবে যে ব্যায়ামে শরীর থেকে ঘাম ঝরে সে ব্যায়াম স্বাভাবিক ব্যায়াম নয় বরং এ ব্যায়ামকে বলা হয় মাত্রাতিরিক্ত ব্যায়াম। যে অঙ্গের ব্যায়াম বেশি হবে সে অঙ্গ শক্তিশালী হবে। বরং এটি সব ধরনের শক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ যে মুখস্ত রাখার প্রতি বেশি যত্নবান হয় তার মুখস্ত শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনিভাবে যে বেশি বেশি গবেষণা করে তার গবেষণার শক্তি বৃদ্ধি পায়। শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের বিশেষ বিশেষ ব্যায়াম আছে। বক্ষের ব্যায়াম হলো পাঠ করা। সুতরাং আস্তে আস্তে পড়তে শুরু করে ধীরে ধীরে আওয়াজকে উচ্চ করতে হবে। আর এটাই হলো বক্ষের ব্যায়াম।

কানের ব্যায়াম হলো শ্রবণ করা এবং ধীরে ধীরে কথা বলা। মুখের এবং চোখের ব্যায়ামও একই রকম।

আর ঘোড়াদৌড় শর নিক্ষেপণ এবং দৌড় প্রতিযোগিতা হলো শরীরের ব্যায়াম। এ ব্যায়াম শোথ রোগ, কুষ্ঠরোগ এবং এ জাতীয় অন্যান্য রোগ থেকে শরীরকে নিরাপদে রাখে। আত্মার ব্যায়াম হলো আদব এবং শিষ্টাচার শিক্ষা করা, হাসিখুশী থাকা, ধৈর্যধারণ করা, দান-খয়রাত করা এবং অন্যান্য

www.waytojannah.com

কল্যাণধর্মী কর্মে নিয়োজিত থাকা। আত্মার সবচেয়ে উপকারী ব্যায়াম হলো ধৈর্য ধরা, ভালোবাসা, বীরত্ব প্রকাশ এবং অনুগ্রহ করা।

রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা নিয়ে কেউ ভাবলে সে দেখতে পাবে যে, রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা সুস্থতা সংরক্ষণ এবং শক্তি অর্জনের সর্বোত্তম মাধ্যম। যা জীবন যাপনের জন্য খুবই উপকারী।

নিঃসন্দেহে নামায শরীর সুস্থতা সংরক্ষণের অন্যতম মাধ্যম। এ নামায যেমনি ঈমানের জন্য উপকারী ঠিক তেমনি দেহের জন্যও খুবই উপকারী। এমনি নামায ইহকাল ও পরকালের সফলতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। এমনিভাবে তাহাজ্জুদের নামায সুস্থতা ঠিক রাখার এবং বিভিন্ন প্রকারের রোগ প্রতিরোধে খুবই কার্যকরী। এর কারণে শরীর, কলব এবং আত্মায় উদ্যমতা সৃষ্টি হয়। সহীহাইনে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "তোমাদের কেউ ঘুমালে শয়তান তার ঘাড়ে তিনটি গিঁট দিয়ে দেয় এর প্রত্যেক গিঁঠের সময় বলে, রাত্র এখনো অনেক বাকি ঘুমাও। অতঃপর সে যখন জাগ্রত হয় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে তবে একটি গিঁট খুলে যায়। এরপর যখন ওজু করে তবে দ্বিতীয়টি খুলে যায়। এরপর যখন সে নামায পড়ে তবে সবকটি গিঁট খুলে যায়। অবশেষে সে প্রাণবন্ত ও চাঙ্গা হয়ে উঠে। অন্যথায় অলস ও অপবিত্র অবস্থায় সকাল অতিবাহিত করে।

শরীয়তসম্মত রোযা সুস্থতা রক্ষা শরীরচর্চা এবং আত্মার জন্য খুবই উপকারী। যা একজন বিবেকবান ব্যক্তি কখনো তা অস্বীকার করতে পারবে না।

জিহাদ এবং তাতে যেসব ব্যায়াম হয় তা শরীরের শক্তি সুরক্ষা, সুস্থতা সংরক্ষণ, দেহ ও আত্মার দৃঢ়তা উভয়ের নিষ্প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহকে প্রতিরোধ করা এবং চিন্তা এবং দুঃখ ও পেরেশান দূর করণে খুবই কার্যকরী। এমনিভাবে হাজ্জ, কোরবানীর যাবতীয় কার্যাদি, ঘোড়া ইত্যাদির প্রতিযোগিতা, তীরের প্রতিযোগিতা, প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে উপার্জন করা, রোগীর সেবা করা, আত্মীয়-স্বজনের প্রয়োজন পূর্ণ করা, জানাযায় শরীক হওয়া জুমু'আ ও জামাতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়া এবং ওজু গোসল করা ইত্যাদি শরীরের সুস্থতায় খুবই উপকারী। সুতরাং এখান থেকে একথা বুঝা গেল যে, দেহ, আত্মা এবং উভয়ের সুস্থতা রক্ষায় রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা সকল দিকনির্দেশনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

সহবাস সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

সহবাসের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর ﷺ দিকনির্দেশ না ছিল সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ। যে নির্দেশনা অনুযায়ী চললে শরীর সুস্থতা, আত্মপ্রশান্তি ও সহবাসের উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব। সহবাস মূলত তিনটি উদ্দেশ্যে বৈধ করা হয়েছে–

১. বংশধর সংরক্ষণ;
২. শরীরের ক্ষতিকারক পানি বের করে দেয়া;
৩. মনোবাঞ্ছা পূরণ এবং আনন্দ উপভোগ করা।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, দৈহিক মিলন শারীরিক সুস্থতা সংরক্ষণের একটি অন্যতম মাধ্যম। হাকীম জালীনূস বলেছেন, বীর্যের মূল উপাদান হলো আগুন ও বাতাস এর প্রকৃতি হলো উষ্ণ ও ঠাণ্ডা। কারণ বীর্য সৃষ্টি হয় পরিচ্ছন্ন রক্ত থেকে। সুতরাং বীর্যের গুরুত্ব যখন বুঝা গেল। তাই একে সন্তান জন্ম দেয়ার উদ্দেশ্যে অথবা শরীর থেকে ক্ষতিকর ব্যাধি দূর করার উদ্দেশ্যে বের করা চাই।

www.waytojannah.com

অনেক সালাফে সালেহীন বলেছেন, তিনটি বিষয়ে পুরুষদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া উচিত–

১. হাঁটা চলা বন্ধ না করার;

২. খাওয়া-দাওয়া বর্জন না করার, কেননা এর কারণে পাকস্থলি সংকীর্ণ হয়ে যায়।

৩. সহবাস বর্জন না করা। কারণ কূপের পানি বের না করলে কূপ শুকিয়ে যায়।

মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া বলেন, কেউ যদি দীর্ঘ দিন সহবাস না করে তবে এতে তার স্নায়ুর শক্তি দুর্বল হয়ে যায় ও লিঙ্গ সঙ্কুচিত হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, আমি একদল লোককে দেখেছি, যারা সন্ন্যাসী জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে সহবাস বর্জন করেছিল। ফলে তাদের দেহ শীতল হয়ে গিয়েছিল এবং আন্দোলন ও স্পন্দন তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে গিয়েছিল এবং সহবাসের উত্তেজনা কমে গিয়েছিল।

সহবাসের উপকারিতাসমূহ: "দৃষ্টি অবনত থাকে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়, হারামে পতিত হওয়া থেকে বিরত থাকার শক্তি অর্জন হয়। সহবাস পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য উপকারী। আর এ কারণে রাসূল ﷺ স্ত্রীদেরকে ভালোবাসতেন এবং বলতেন–

حبب إلى من دنياكم: النساء والطيب.

"তোমাদের দুনিয়ার জিনিসসমূহ থেকে নারী ও সুগন্ধি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়।"

রাসূল ﷺ তাঁর উম্মতকে বিবাহে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم.

"তোমরা বিবাহ কর, কেননা আমি তোমাদের সংখ্যায় অন্যান্য উম্মতের উপর জয়ী হতে চাই।"

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, "স্ত্রী যার বেশি সেই আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।"

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন–

إني أتزوج النساء، وأنام وأقوم، وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني.

"আমি বিবাহ করি, ঘুমাই, রাত্র জেগে নামায পড়ি, রোযা রাখি এবং রোযা ভাঙ্গি। সুতরাং যে আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।"

রাসূল ﷺ আরো ইরশাদ করেন–

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.

"হে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ চক্ষুকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে; আর যে সামর্থ্য রাখে না সে যেন রোযা রাখে, রোযা হলো তার জন্য খোজা হওয়া।"

জাবির (রা) যখন বিবাহিত নারীকে বিবাহ করল তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন, "জাবির! কুমারী নারীকে বিবাহ করলে না কেন?"

ইবনু মাজাহ তার সুনানে আনাস ইবনু মালেক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ (রা) বলেছেন, "যে আল্লাহর সঙ্গে পূত-পবিত্র অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে চায় সে যেন স্বাধীন নারীকে বিবাহ করে।" তার সুনানে ইবনু আব্বাস থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, "বিবাহের ন্যায়

www.waytojannah.com

পরস্পরের মুহাব্বাত সৃষ্টিকারী আমি আর কিছু দেখিনি।" সহীহ মুসলিমে ইবনু উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, "গোটা দুনিয়াটাই হলো সম্পদ; আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো সাধ্বী নারী।"

তিনি কুমারী, সুন্দরী এবং দানবীর নারীকে বিবাহ করার নির্দেশ করতেন। সুনানে নাসায়ীতে আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম নারী কে? উত্তরে তিনি বললেন, স্বামীর যার দিকে তাকালে সে স্বামীকে খুশী করে, আদেশ করলে মানে। এবং সে তার নিজের বিষয়ে এবং স্বামীর মালের বিষয়ে স্বামী যা অপছন্দ করে তার বিরোধিতা করে না।

সহীহাইনে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীকে বিবাহ করা হয় চার কারণে: (ক) নারীর সম্পদের কারণে, (খ) তার বংশ মর্যাদার কারণে, (গ) তার সৌন্দর্যের কারণে এবং (ঘ) তার দীনের কারণে। সুতরাং দীনদার ধার্মিক নারী লাভে তুমি সচেষ্ট হও, তুমি ধ্বংস হও (যদি অন্য নারীকে বিবাহ করতে চাও)।

রাসূল ﷺ বন্ধুভাবাপন্ন, সুহৃদ নারীকে বিবাহ করতে উৎসাহিত করতেন। উৎসাহিত করতেন অধিক সন্তান প্রসবকারিনী নারীকে বিবাহ করতে। সুনানে আবু দাউদে মা'ফিল ইবনু ইয়াসির থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি নাবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, "আমি একজন সুন্দরী ও উচ্চ বংশের নারীর উপর আসক্ত হয়ে পড়েছি কিন্তু তার সন্তান হয় না। আমি কি তাকে বিবাহ করতে পারি?" উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, "না," এরকমভাবে দু'বার বলেন এবং তৃতীয়বার বলেন, "তোমরা বন্ধুভাবাপন্ন ও অধিক সন্তান প্রসবিনী নারীকে বিবাহ কর। কেননা আমি তোমাদের সংখ্যায় অন্যান্য উম্মতের উপর জয়ী হতে চাই।"

তিরমিযীতে মারফূ সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, চারটি জিনিস নাবীদের সুন্নাত: বিবাহ, মিসওয়াক, সুগন্ধি ব্যবহার, এবং মেহদী। আবুল হাজ্জাজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মেহদীর স্থলে খতনা হবে।

সহবাসের পূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে খেলা করা তাকে চুম্বন করা এবং তার জিহ্বা চাটা উচিত। রাসূল ﷺ তার বিবিদের সঙ্গে খেলা করতেন এবং তাদের চুম্বন করতেন।

আবু দাউদে এসেছে, রাসূল ﷺ আয়িশা (রা)-কে চুম্বন করতেন এবং তার জিহ্বা চুষতেন। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, স্ত্রীর সঙ্গে খেলা করার পূর্বে সহবাসে লিপ্ত হওয়াকে রাসূল ﷺ নিষেধ করতেন। রাসূল ﷺ কখনো এক গোসলে তাঁর সকল স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করতেন আবার কখনো বিবিদের প্রত্যেকের সঙ্গে সহবাসের পর প্রত্যেকবার গোসল করতেন। সহীহ মুসলিমে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এক গোসলে তার সকল বিবিদের সঙ্গে সহবাস করতেন। আবু দাউদে আবু রাফি থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ তার প্রত্যেক বিবির সঙ্গে সহবাসের পরে প্রত্যেকবার গোসল করলে আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "এটা পবিত্রতর এবং শ্রেষ্ঠতর।" মুসলিম শরীফে আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন যে, তোমাদের কেউ তার বিবির সঙ্গে সহবাস করার পর পুনরায় করতে চাইলে সে যেন ওজু করে নেয়।

সহবাসের সর্বোত্তম সময় এবং সর্বোত্তম পদ্ধতি প্রসঙ্গে

খাবার হজম হবার পরে এবং শরীরের স্বাভাবিক অবস্থায় যে সহবাস হয় সে সহবাস সবচেয়ে বেশি উপকারী। ভরা পেটে সহবাস করার চেয়ে খালি পেটে সহবাস শরীরের জন্য বেশি ক্ষতিকর। এমনিভাবে

www.waytojannah.com

শুষ্কতার অবস্থার সহবাস আর্দ্রতার অবস্থার সহবাসের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর। এমনিভাবে ঠাণ্ডা অবস্থার সহবাস শরীরে উষ্ণতা ও উত্তাপ অবস্থার সহবাসের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর। উত্তেজনা প্রবল হওয়ার পরে সহবাস করা উচিত। বৃদ্ধা ও সহবাসের অযোগ্য মেয়ের সাথে সহবাস করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এমনিভাবে যে মেয়ের কামভাব নেই, অসুস্থ মহিলা, কুৎসিত চেহারার নারী, এবং অপছন্দনীয় নারীর সঙ্গে সহবাস করা থেকেও নিজেকে বিরত রাখা যেসব ডাক্তার বিবাহিত নারীদের সঙ্গে সহবাস করাকে কুমারী নারী অপেক্ষা উপকারী মনে করেন তাদের ধারণা ভুল এবং তাদের এ উক্তি জ্ঞানীদের বক্তব্য শরীয়ত এবং প্রকৃতি বিরোধী।

কুমারী নারীর সঙ্গে সহবাস করলে সহবাসকারী এবং তার স্ত্রীর মাঝে যে মুহাব্বাত সৃষ্টি হয় বিবাহিত নারীকে বিবাহ করলে সেরূপ মুহাব্বাত সৃষ্টি হয় না। নাবী ﷺ জাবিরকে বলেছিলেন, "তুমি কুমারী মেয়েকে বিবাহ করলে না কেন?" আল্লাহ তা'আলা জান্নাতী হুরদের পূর্ণতা ঘোষণা করে বলেছেন, তাদেরকে ইতঃপূর্বে কেউ স্পর্শ করেনি। আয়িশা (রা) নবী ﷺ-কে বললেন, আপনি যদি এমন একটি বৃক্ষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন যাতে উট চরানো হয়েছে এবং এমন একটি বৃক্ষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন যেতে উট চরানো হয়নি আপনি এ বৃক্ষ দুটির কোনটিতে উট চরাবেন? উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, ঐ বৃক্ষে উট চরাব যেখানে উট চরানো হয়নি। পছন্দনীয় এবং প্রিয় নারীর সঙ্গে সহবাস করলে শরীর দুর্বল কম হয় সাথে সাথে বীর্যও বেশি নির্গত হত। আর অপছন্দনীয়, ঘৃণিত ও অপ্রিয় মহিলার সঙ্গে সহবাস করলে শরীর দুর্বল হয়ে যায় এবং বীর্যও কমে যায়। হায়েযাবস্থায় স্ত্রী সহবাস শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। কারণ এটি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। ডাক্তারদের মতেও এটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর।

সহবাসের সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, স্বামী স্ত্রীকে চুম্বন এবং তার সঙ্গে আনন্দদায়ক খেলতামাশা করার পর স্বামী স্ত্রীর উপর উঠে স্ত্রীকে বিছানার মত বানিয়ে সহবাস করা। আর এ কারণে মহিলাকে বিছানা বলা হয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, "সন্তান হলো বিছানার জন্য।" এর মাধ্যমে নারীর উপর একজন পুরুষের পূর্ণ ক্ষমতা বুঝে আসে। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, "পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল।" আল্লাহ অন্যত্র ইরশাদ করেন– هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ. "তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা (পুরুষেরা) তাদের (নারীদের) পোশাক।" আর উপরোক্ত সহবাস করলেই কেবল পোশাকস্বরূপ বলা চলে। সহবাসের উপর্যুক্ত পদ্ধতিটি এ আয়াত হতে গৃহিত। সবচেয়ে নিকৃষ্টতর সহবাস হলো, মহিলা পুরুষের উপরে হওয়া এবং এমতাবস্থায় সহবাস করা। এ ধরনের সহবাস হলো প্রকৃতি বিরোধী সহবাস। এ ধরনের সহবাসে নানারকম ক্ষতিকর দিক রয়েছে, বীর্য বের হতে কষ্ট হয় এবং অনেক সময় অঙ্গের মধ্যে বীর্য আটকে থাকে যার কারণে বিভিন্ন প্রকারের রোগ জন্মায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে মহিলার লজ্জাস্থান থেকে ক্ষতিকারক আর্দ্রতা পুরুষের লিঙ্গের দিকে নেমে আসে। আহলে কিতাবরা তাদের স্ত্রীদের পার্শ্বদেশ দিয়ে সহবাস করত এবং বলত, মহিলাদের জন্য এটা খুবই আরামদায়ক। কুরাইশ ও আনসাররা স্ত্রীদের ঘাড়ের পেছনের দিক দিয়ে আনন্দ দিত। ইহুদীরা তাদের অভ্যাস নিয়ে সমালোচনা করলে আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করেন–

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.

"তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র।" (সূরা: আল-বাকারাহ– ২২৩)

www.waytojannah.com

সহীহাইনে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্ত্রীর পেছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করলে ইহুদীরা সন্তান টেরা হয় বলে ইহুদীরা বিশ্বাস করত। অতঃপর আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। পেছনের রাস্তায় সহবাস করা কোনো নাবীর যুগে বৈধ ছিল না। যারা কতিপয় সালাফে সালেহীনদের ব্যাপারে এ ধরনের ধারণা করে থাকেন তারা ভুল করছেন। সুনানে আবু দাউদে আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, "সে অভিশপ্ত যে আপন স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস করে।"

মুসনাদে আহমাদ এবং ইবনু মাজাহয় তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি আপন স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস করবে, আল্লাহ তার প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি করবেন না।"

বায়হাকীতে এসেছে যে, "যে পুরুষ নারীর মলদ্বারে সহবাস করবে সে কুফুরী করল।"

ওমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূল ﷺ থেকে এরশাদ করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না তোমরা নারীদের মলদ্বারে সহবাস করো না।" তিরমিযীতে এসেছে, তোমরা নারীদের মলদ্বারে সহবাস কর না কেননা আল্লাহ সত্যকথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না।" ইবনু আদী কমেলে তার সূত্রে ইবনু মাসউদ থেকে মারফূ সূত্রে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। আবু যার (রা) মারফূ সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো পুরুষ বা নারীর মলদ্বারে সহবাস করে সে কুফুরী করল।"

মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির জাবির থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন, "তোমরা আল্লাহ থেকে লজ্জা করো। কারণ আল্লাহ বলতে লজ্জা করেন না, তোমরা মহিলাদের মলদ্বারে সহবাস করো না।"

বাগাবী তার সানাদে কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, কাতাদাকে স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাসকারীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, অতঃপর কাতাদা বলেন, আমর ইবনু শুআইব তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে পরম্পরায় বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, ওটা হলো ছোট সমকামিতা।

মুসনাদে আহমাদে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন– نساؤكم حرث لكم আয়াতটি সেসব আনসারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ যারা রাসূল ﷺ-কে স্ত্রীর মলদ্বার দিয়ে সহবাস করা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। অতঃপর রাসূল ﷺ তাদেরকে বলেছেন, "তোমরা স্ত্রীর যোনিপথে যেভাবে ইচ্ছা সহবাস কর।"

মুসনাদে ইবনু আব্বাস থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, (একদা) আবু ইবনুল খাত্তাব রাসূল ﷺ এর নিকটে হাজির হয়ে বলল, রাসূল ﷺ আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসূল ﷺ বললেন, কোন জিনিস তোমাকে ধ্বংস করল? ওমার বললেন, গতরাত্রে আমি আমার যাত্রা পরিবর্তন করে দিয়েছে। অতঃপর– نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. আয়াতটি রাসূল ﷺ-এর অবতীর্ণ হলো। রাসূল ﷺ ওমারকে বললেন, সামনে এবং পেছন দিয়ে সহবাস কর তবে ঋতুবতী এবং স্ত্রীর মলদ্বার দিয়ে সহবাস করার থেকে বিরত থাক।

তিরমিযীতে ইবনু আব্বাস থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করেন না যে কোনো পুরুষ বা মহিলার সঙ্গে পায়ুপথে সহবাস করে।

বারা ইবনু আযেব (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। "এ উম্মতের দশ প্রকার ব্যক্তি আল্লাহর কুফরীতে লিপ্তঃ হত্যাকারী, যাদুকর, অসতী স্বামীর স্ত্রী, পায়ুপথে সহবাসকারী, যে যাকাত দেয় না, যার উপর হজ্জ ফরজ হওয়ার পরও সে হাজ্জ করল না, মদপানকারী, ফিতনা সৃষ্টিকারী, বিধর্মীদের নিকট অস্ত্র বিক্রেতা

www.waytojannah.com

এবং যে তার মাহরাম মহিলাকে বিবাহ করেছে। উকবা ইবনু আমির (রা) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, "সে অভিশপ্ত যে স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করে।"

মুসনাদে হারেস ইবনু আবী উসমাতে আবু হুরায়রা এবং ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আমাদের সম্মুখে ভাষণ দেন। এটাই ছিল তার প্রদত্ত মাদীনার সর্বশেষ ভাষণ এবং এরপরে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি তাঁর এ ভাষণে বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মহিলা, পুরুষ বা কোনো শিশুর পায়ুপথে সহবাস করবে কেয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে, তার থেকে মৃত ব্যক্তির চেয়েও পঁচা দুর্গন্ধ বের হতে থাকবে। এ দুর্গন্ধে অন্যান্য লোকদের কষ্ট হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহ তার সকল সৎকর্ম নষ্ট করে দিবেন। তিনি তার কোনো আবেদন ও অভিযোগ শুনবেন না। তাকে আগুনের একটি সিন্দুকে ঢুকিয়ে তার উপর দিয়ে আগুনের কীলক মেরে দেয়া হবে।" আবু হুরাইরা বলেন, "এটি তার ক্ষেত্রে যে তওবা করেনি।"

ইমাম শাফেয়ী তার সূত্রে ইবনু খুযাইমা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে মহিলাদের পায়ুপথে সহবাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল রাসূল ﷺ বললেন, (এটা) বৈধ, এরপর লোকটি যখন চলে যেতে লাগল তখন তাকে ডেকে বললেন, "তুমি এ প্রশ্ন কিভাবে করলে সুঁইয়ের পুঁতি এবং ফুটার দুই ছিদ্রের কোন ছিদ্র দিয়ে! পিছন থেকে সামনের দিকে নাকি সামনে থেকে পিছনের দিকে। না এমনটি করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সত্য বলতে পছন্দ করেন। মহিলাদের পায়ুপথে তোমরা সহবাস করো না।"

হায়েয অবস্থায় সহবাস করলে মহিলাদের কষ্ট হবে বিধায় আল্লাহ এ সময় মহিলাদের সহবাস করাকে হারাম করেছেন। সুতরাং বালক ও মহিলাদের পায়ুপথে সহবাস করা যা এর চেয়ে অধিক কষ্টকর এটা কি হারাম হবে না?

সহবাসের ক্ষেত্রে স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার আছে, পায়ুপথে সহবাস করলে এ অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এবং মহিলার উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকে। মলদ্বারকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি এবং এটা এর কাজও নয়। এ কাজের জন্য তো যোনিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং যারা এ ধরনের অন্যায় করে তারা আল্লাহর শরীয়ত ও প্রজ্ঞা বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত।

এ ধরনের সহবাস পুরুষের জন্য ক্ষতিকর আর এ কারণে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। কেননা যোনিতে পানি টেনে নেয়ার এক প্রকার শক্তি আছে এবং পুরুষের জন্য যোনি পথে সহবাস করা আরামদায়কও বটে। আর পায়ুপথ এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

পায়ুপথে সহবাস করা প্রকৃতি বহির্ভূত হবার কারণে এ পথে সহবাস করতে প্রচুর পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়।

পায়ুপথে সহবাস মহিলার জন্য ক্ষতিকর। কারণ এটি প্রকৃতি বিরোধী (পায়ুপথ) মলমূত্র এবং ময়লা আবর্জনার পথ।

এ পথে সহবাস করলে পেরেশানী এবং বিষণ্নতা সৃষ্টি হয় এবং সহবাসকারী এবং সহবাসকৃতের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। পায়ুপথে সহবাস করলে– চেহারা কালো হয়ে যায়; অন্তর অন্ধকার হয়ে যায়; কলবের নূর নিভে যায় এবং চেহারায় এর প্রভাব ফুটে উঠে। যার সামান্যতম অন্তর্দৃষ্টি আছে সে তা অনুভব করতে পারে।

www.waytojannah.com

পায়ুপথে সহবাস করলে পরস্পরে ঘৃণা এবং শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এ অপকর্মের দরুন যে কাজ করে এবং যার সঙ্গে উভয়ের চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। যার সংশোধনের কোনো আশা অসম্ভব। তবে আল্লাহ চাইলে মন থেকে তওবা করলে মাফ করে দিতে পারেন। পায়ুপথে সহবাসের ফলে উভয়ের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। পায়ুপথে সহবাস নেয়ামত বিলুপ্তির এবং শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার অন্যতম কারণ। কারণ এর কারণে তারা আল্লাহর অভিশাপ ও শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। আল্লাহ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

এর কারণে লজ্জা শেষ হয়ে যায়। আর লজ্জা হলো আত্মার প্রাণ, এর কারণে মানুষ আল্লাহর দেয়া প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে পশুর প্রকৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। পায়ুপথে সহবাস করলে মানুষ এ পরিমাণ নির্লজ্জ ও বেশরম হয়ে যায় এবং এমন স্পর্ধা সৃষ্টি হয় যা অন্য কোনো অপকর্মে সৃষ্টি হয় না।

এ অপকর্মে লিপ্ত হলে মানুষ এত নীচ, অপমানিত এবং অপদস্থ হয় যা অন্য কোনো অপকর্মে লিপ্ত হলে হয় না।

পায়ুপথে সহবাস করলে সহবাসকারীর মধ্যে শত্রুতা এবং হিংসা সৃষ্টি হয়। মানুষ তাকে ঘৃণা করে এবং তুচ্ছ ও নীচু মনে করে। এটি একটি প্রত্যক্ষজাত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা।

ক্ষতিকর সহবাস প্রসঙ্গে

ক্ষতিকর সহবাস দু'প্রকার:

১. শরীয়তের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর।

২. প্রকৃতিগত ক্ষতিকর।

শরীয়তের দৃষ্টিতে যে সহবাস ক্ষতিকর তা হারাম। এটা আবার কয়েক প্রকার। কোনোটা কোনোটার চেয়ে বেশি মারাত্মক। শরীয়তের পক্ষ থেকে আরোপিত হারাম অপরিহার্য হারাম অপেক্ষা হালকা। যেমন, ইহরাম, রোযা, ইতেকাফ এবং হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি।

অপরিহার্য হারাম দুই প্রকার:

১. যার বৈধতার কোনো প্রকার সুযোগ নেই। যেমন, যাদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ নয় তাদের সঙ্গে সহবাস করা। এটা সবচেয়ে নিকৃষ্টমানের সহবাস। কোনো কোনো আলিমদের মতে, যারা এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হবে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

   এটি ইমাম আহমাদের মত। এবং এ সম্পর্কে একটি মারফূ হাদীস আছে।

২. যা বৈধ হওয়ার সুযোগ আছে। যেমন, অপরিচিত কোনো নারীর সঙ্গে সহবাস করা। অপরিচিত মহিলা যদি বিবাহিতা হয় তবে তার সঙ্গে সহবাস করার কারণে দু'জনের হক নষ্ট করা হবে, আল্লাহর হক ও মহিলার স্বামীর হক। মহিলা যদি এ কুকর্মে রাজি না থাকে বরং তাকে ধর্ষণ করা হয় তবে এতে আল্লাহর হক, মহিলার স্বামীর হক, মহিলার নিজের হক্ব এবং তার পরিবার থাকলে পরিবারের হক নষ্ট করা হবে। আর এ মহিলা যদি তার মাহরাম তথা এমন নারীদের থেকে হয় যাদের সঙ্গে বিবাহ করা সর্বদার জন্য হারাম তবে এতে ৫ জনের হক নষ্ট করা হবে।

www.waytojannah.com

স্বভাবগতভাবে যে সহবাস হারাম এটা আবার দু'প্রকার: এক প্রকার সহবাস যা আকৃতি ও ধরনের দিক থেকে হারাম। দ্বিতীয় এমন সহবাস যা পরিমাণ ও পরিমাপের দিক থেকে হারাম। যেমন, বেশি বেশি সহবাস করা। কারণ এর কারণে শরীরের শক্তি কমে যায়। স্নায়ু দুর্বল হয়ে যায়। শরীরে কাঁপুনি সৃষ্টি হয় ধনুষ্টঙ্কার এবং পক্ষাঘাত রোগ দেখা দেয়, দৃষ্টিশক্তি এবং স্বভাবজাত উষ্ণতা কমে যায়।

আর সহবাসের সর্বোত্তম সময় হলো, পাকস্থলিতে খাবার হজম হওয়ার পর স্বাভাবিক অবস্থায় সহবাস করা। ক্ষুধা অবস্থায় নয়। কেননা এর কারণে স্বভাবজাত উষ্ণতা দুর্বল হয়ে পড়ে। ভরা পেটে সহবাস না করা, কারণ এর কারণে নানারকম রোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ক্লান্ত অবস্থায়, গোসলের পূর্বে এবং পরে চিন্তিত অবস্থায়, পেরেশানি অবস্থায় এবং খুব আনন্দের সময় সহবাস না করা।

সবচেয়ে উত্তম সহবাস হলো খাবার হজম হয়ে যাওয়ার পর রাত্রের কোনো অংশে সহবাস করা এবং সহবাসের পর গোসল বা অযু করে ঘুমানো। এর কারণে সহবাসের কারণে যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে তা দূর হয়ে যাবে। সহবাসের পর ব্যায়াম করা এবং নড়াচড়া ইত্যাদি করা শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

প্রেম রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

প্রেম রোগ একটি আত্মিক ব্যাধি। এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাধি। প্রেম রোগ মজবুত হয়ে গেলে ডাক্তারদের পক্ষে চিকিৎসা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা দু'প্রকার লোকের প্রেমের আলোচনা করেছেন: মহিলাদের প্রেমের এবং সমকামী পুরুষদের। সুতরাং তিনি মিশরের মন্ত্রী আব্দুল আযীযের স্ত্রীর প্রেম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যে ইউসুফ (আ)-এর প্রতি আসক্ত হয়েছিল। এবং লূত (আ)-এর সমকামী সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের নিকট ফেরেশতা আগমনের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন–

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. قَالَ إِنَّ هَؤُلاءِ ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِ. قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ. قَالَ هَؤُلاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ.

অর্থাৎ, "শহরবাসী আনন্দ-উল্লাস করতে করতে পৌঁছল। লূত বললেন, তারা আমার মেহমান। অতএব আমাকে লাঞ্ছিত করো না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার ইয্যত নষ্ট করো না। তারা বলল, আমরা কি আপনাকে জগদ্বাসীর সমর্থন করতে নিষেধ করিনি। তিনি বললেন: যদি তোমরা একান্ত কিছু করতেই চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে। আপনার প্রাণের কসম, তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল।"

যেসব নরাধমরা রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে এ কথা বলে যে তিনি যায়নাব বিনতে জাহাশের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছিলেন এবং তিনি যয়নাবকে দেখে বলেছিলেন, سبحان الله يا مقلب القلوب "সুবহানাল্লাহ হে অন্তরকে পরিবর্তনকারী।" এরপর রাসূল ﷺ-এর প্রতি যয়নাবের ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং রাসূল ﷺ যায়িদ ইবনু হারিসাকে বললেন, "তুমি যয়নাবকে তোমার বিবাহ বন্ধনে রাখ।" এরপর আল্লাহ তাঁর প্রতি আয়াত অবতীর্ণ করেন–

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ.

www.waytojannah.com

অর্থ: "আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করেছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আপনি লোক নিন্দার ভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত।" (সূরা: আল-আহযাব- ৩৭)

যারা রাসূল ﷺ-এর সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা পোষণ করে তারা বলে এটি ছিল রাসূল ﷺ-এর প্রেম এবং তাদের অনেকে প্রেম সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছে এবং সে গ্রন্থে আম্বিয়াদের প্রেমের আলোচনা করেছে। আর উপরে উল্লিখিত ঘটনাটিও উল্লেখ করেছে। যারা এ ধরনের ধারণা পোষণ করে তারা কুরআন ও রাসূল ﷺ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই এমনটি করে থাকে। কেননা যয়নাব বিনতে জাহাশ ছিল যায়িদ ইবনু হারেছার স্ত্রী। যায়িদ ছিল রাসূল ﷺ-এর পালক পুত্র। তাকে রাসূল ﷺ-এর ছেলে বলা হত। যয়নাবের মধ্যে ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং গোত্রগত কৌলিন্যাভিমান ছিল। তাই যায়িদ যয়নাবকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর সাথে পরামর্শ করল। রাসূল ﷺ যায়িদকে বললেন, "তুমি তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।" এদিক দিয়ে রাসূল ﷺ-এর অন্তরে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, যদি যায়িদ যয়নাবকে তালাক দিয়ে দেয় তবে তিনি যয়নাবকে বিবাহ করবেন। তবে লোকেরা এ অপবাদ দেবে যে, তিনি নিজ পুত্রবধুকে বিয়ে করেছেন। তাই তিনি যয়নাবকে বিবাহ করতে ভয় করছিলেন। আর এ কারণে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করে রাসূল ﷺ-এর উপর তাঁর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাঁকে অবগত করেন যে, আল্লাহ তাঁর জন্য যে জিনিস হালাল করেছেন সে বিষয়ে আপনি কাউকে ভয় করবেন না। বরং আল্লাহ সর্বাধিক ভয়ের যোগ্য। এরপর আল্লাহ রাসূল ﷺ-কে জানিয়েছেন যে, যায়িদ যখন যয়নাবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি যয়নাবকে আপনার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীদের বিবাহ করার ব্যাপারে মু'মিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে। তবে আপন সন্তানের স্ত্রী হালাল হবে না।

আল্লাহ ইরশাদ করেন:

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ.

"(তোমাদের জন্য হারাম করেছেন...) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী।" (সূরা: নিসা- ২৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ.

"মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন।" (সূরা: আহযাব- ৪০)

সূরা আহযাবের শুরুতে ইরশাদ করেছেন:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ.

"তিনি তোমাদের পোষ্য পুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র।" (সূরা: আহযাব- ৪)

তবে হ্যাঁ রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে ভালোবাসতেন। স্ত্রীদের মধ্যে তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিল আয়িশা (রা)। তবে তিনি তার স্ত্রী ও সকল মানুষের চেয়ে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন আল্লাহকে।

www.waytojannah.com

ফটো প্রেম প্রসঙ্গে

যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রেম নেই তারাই কেবল ফটো প্রেমে লিপ্ত হয়। মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রেরণা থাকলে সে কখনও ফটো বা ছবির প্রেমে পড়তে পারে না।

এ কারণেই আল্লাহ ইউসুফ (আ) সম্পর্কে এরশাদ করেন–

فارسوا وارده فادلى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَـــذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ.

"অতঃপর তাদের পানি সংগ্রহককে প্রেরণ করল। সে বালতি ফেলল। বলল, কি আনন্দের কথা। এতো একটি কিশোর। তারা তাকে পণ্যদ্রব্য গণ্য করে গোপন করে ফেলল। আল্লাহ খুব জানেন যা কিছু তারা করছে।" (ইউসুফ: ১৯)

এ আয়াত থেকে একথা বুঝা যায় যে, ইখলাস হলো প্রেম রোগ ও এর কারণে যতসব অশ্লীলতার সৃষ্টি হয় সবগুলোর প্রতিকারক। তাই তো সালাফে সালেহীনদের অনেকে বলেছেন: "প্রেম হলো শূন্য হৃদয়ের স্পন্দন।" আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ.

অর্থ: সকালে মূসার জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসাজনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন।" (সূরা: কাছাছ– ১০)

প্রেম দুটি জিনিসের সমন্বয়ে সৃষ্ট: প্রেমাস্পদের অনুগ্রহ, এবং তার সাক্ষাতের অধীর আগ্রহ। দুটির কোনো একটি না থাকলে সেটা আর প্রেম থাকে না। প্রেমের কারণ নির্ণয়ে অনেক বিজ্ঞানী ক্লান্ত হয়েছেন কিন্তু তার যথাযথ কারণ নির্ণয় করতে পারেননি।

আমরা বলব, আল্লাহর হিকমাত যে, তিনি তার সৃষ্টির মধ্যে প্রত্যেক জিনিসকে তার সমমনা ও অনুরূপ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ আর বিরোধী জিনিসের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাই জাতি তার স্বজাতির প্রতি আসক্ত হয় এবং বিপরীত জিনিস তার বিপরীত ও স্ববিরোধী জিনিসকে ঘৃণা করে। আল্লাহ ইরশাদ করেন:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا.

"তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে; আর তার থেকেই তৈরি করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে।" (সূরা: আরাফ: ১৮৯)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, স্ত্রীর নিকট স্বামীর স্বস্তির একমাত্র কারণ হলো স্বজাতীয় হওয়া। আর আয়াতে যে স্বস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটাই হলো প্রেম ভালোবাসা।

সহীহ বুখারীতে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন–

الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف.

অর্থ: "রূহসমূহ হলো যুদ্ধের জন্য সমবেত সেনাদল। এদের পরস্পরে পরিচিত হলে মুহাব্বাত সৃষ্টি হয়। আর পরস্পরে অপরিচিত হলে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়।"

মুসনাদে আহমাদে এ হাদীসের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে এসেছে যে, মক্কায় একজন মহিলা ছিল সে লোকদেরকে হাসাত। অতঃপর সে যখন মাদীনায় আসে তখন তার সম্পর্কে রাসূল ﷺ এ হাদীসটি ইরশাদ করেন।

www.waytojannah.com

আল্লাহর শরীয়তের নিয়ম হলো প্রত্যেক জিনিসের বিধান হবে তার অনুরূপ জিনিসের মতো। সুতরাং পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ দুটি জিনিসের মাঝে কখনো বিভেদ হবে না এবং বিপরীত দুটি জিনিস কখনো একত্রিত হবে না। এটি যেমন দুনিয়ার ক্ষেত্রে ঠিক কেয়ামতের দিনও এমনটিই হবে। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "একত্রিত কর গোনাহগারদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত তারা করত। অতঃপর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে।"

ওমার ইবনুল খাত্তাব বলেন, পুরুষদের স্ত্রীরা হলো তাদের অনুরূপ। মুহাব্বাত বা ভালোবাসা কয়েক প্রকারে বিভক্ত:

১. যার মাঝে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা হলো, আল্লাহর জন্য আল্লাহকে ভালোবাসা। এর দাবি হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা ভালোবাসেন তা ভালোবাসা।
২. তরীকা, কর্ম পদ্ধতি, দীন, ধর্ম, আত্মীয়তা, পেশা বা যে কোনো উদ্দেশ্যে একমত হওয়ার কারণে সৃষ্ট ভালোবাসা।
৩. প্রিয়জনের উদ্দেশ্য অর্জনের মুহাব্বাত যেমন, সম্মান, প্রিয়জনের নৈকট্য বা তার সম্পদ, শিক্ষা বা দিকনির্দেশনা পাওয়ার উদ্দেশ্যে মুহাব্বাত।

প্রেম রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

প্রেম রোগ যখন এক প্রকার রোগের অন্তর্ভুক্ত। তাই এর জন্য চিকিৎসারও প্রয়োজন আছে। প্রেম রোগের একাধিক চিকিৎসা আছে। প্রেম যদি এমন হয় যে, শরীয়তসম্মত পন্থায় প্রেমিক্ এবং প্রেমাস্পদের মধ্যে জুড়ে দেয়া সম্ভব তাহলে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে সম্পর্ক জুড়ে দেয়াই হলো এ প্রেমের চিকিৎসা। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে "সহীহাইনে" ইবনু মাসউদ (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন–

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.

অর্থ: "হে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা, তা চক্ষুকে আনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে; আর যে সামর্থ্য রাখে না সে যেন রোযা রাখে; রোযা হলো তার জন্য খোজা হওয়া।"

সুনানে ইবনু মাজাহ এ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, "তোমরা প্রণয়ীর মধ্যে বিবাহের ন্যায় উত্তম বন্ধন আর কিছু দেখবে না।" আর স্বাধীন ও ক্রীতদাসীদের হালাল হবার আলোচনার পর আল্লাহ এ অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেন–

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا.

"আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে।" (নিসা: ২৮)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ এক্ষেত্রে অনেক হালকা করে দিয়েছেন এবং মানুষ এ কামনার ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল এবং আল্লাহ একজন পুরুষের জন্য মহিলার বিষয়টি হালকা করে দিয়েছেন এবং তার জন্য পছন্দমতো (একটি) দুটি, তিনটি বা চারটি পর্যন্ত বিবাহ করার বৈধতা দিয়েছেন। এমনিভাবে ক্রীতদাসীদের মধ্য থেকেও যাকে ইচ্ছে বিবাহ করা বৈধ করেছেন দুর্বল সৃজিত মানুষের বোঝাকে হালকা করণার্থে এবং তার উপর দয়াপরবশ হয়ে।

www.waytojannah.com

বিবাহ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নাবী ﷺ-এর রায় ও বিধি-বিধান

কুমারী ও বিধবাদের বিবাহ প্রসঙ্গে নাবী ﷺ-এর বিধিনিষেধ

নাবী ﷺ থেকে সহীহাইনে বর্ণিত হয়েছে যে, খানাসা বিনতে খিদামকে তার বাবা বিবাহ দিচ্ছিল, তবে খানাসা তা মানতে নারাজ ছিল। ঐ সময় সে বিধবা ছিল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলে তিনি উক্ত বিবাহ রহিত করে দেন।

সুনান কিতাবে ইবনু আব্বাসের এক হাদীসে এসেছে, এক কুমারী মেয়ে নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল যে, তার বাবা তাকে বিবাহ দিয়েছে তবে সে তাতে নারাজ। তখন নবী ﷺ তাকে স্বাধীনতা দান করেছেন। এটি ছিল খানাসার বিপরীত। দেখা গেল যে, দুটি রায় এসেছে এক দিকে বিধবার ব্যাপারে স্বাধীন ইচ্ছার রায় দেওয়া হয়েছে অপর দিকে কুমারীকে স্বাধীন ইচ্ছার রায় দেয়া হয়নি।

নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে এসেছে যে, তিনি বলেন, অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত কুমারী মেয়েকে বিবাহ দেওয়া সিদ্ধ নয়। তারা (সাহাবাগণ) আরজ করলেন, কিভাবে তার অনুমতি বুঝা যাবে? তিনি বললেন, সে চুপ করে থাকবে।

সহীহ মুসলিমে এসেছে, কুমারী মেয়ের কাছে অনুমতি চাওয়া হবে। তার চুপ থাকাকে অনুমতি বা সম্মতিরূপে গ্রাহ্য করা হবে।

উল্লিখিত বিধান থেকে জানা যায় যে, প্রাপ্তবয়স্ক কুমারী মেয়েকে বিবাহের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করা যাবে না। তার অমতে তাকে বিবাহে আবদ্ধ করানো সিদ্ধ হবে না। এমতটি পূর্বসূরী সকল বিদ্বানের। আবূ হানিফা ও আহমাদের এক মতামত এটিই। এ বক্তব্যকে আমরা আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করছি। এর বিপরীত বক্তব্যের ব্যাপারে আমরা বিশ্বাস রাখি না। এ বিধানটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিধান, আদেশ, নিষেধ, শরঈ বিধান ও উম্মতের কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

অভিভাবকহীন বিবাহের ব্যাপারে নবী ﷺ-এর বিধান

সুনানে আয়িশাহ (রা)-এর হাদীসে নাবী ﷺ-এর বরাতে এসেছে, যে রমণী তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহে আবদ্ধ হবে তার উক্ত বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। বাতিল হয়ে যাবে। বাতিল হয়ে যাবে। (এ প্রকারের বিবাহে) যদি পুরুষ স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলিত হয় তবে তার দরুন তাকে মোহর দিতে হবে। যদি তারা পরস্পর ঝগড়া করে তবে যার অভিভাবক নেই, বাদশাহ তার অভিভাবক বলে বিবেচেতি হবে। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

সুনানে আরবা'আতে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না।

আরও বর্ণিত হয়েছে, এক স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোককে বিবাহ দিতে পারে না এবং কোনও স্ত্রীলোক নিজে নিজেই বিবাহে আবদ্ধ হতে পারে না। কারণ, কেবল ব্যভিচারিণীই নিজেকে বিবাহে আবদ্ধ করতে পারে।

যদি দু'জন অভিভাবক বিবাহ দেয়

যদি কোনো মহিলাকে দু'জন অভিভাবক বিবাহ দিয়ে থাকে তবে প্রথম অভিভাবকের বিবাহ ধর্তব্য হবে। যদি কোনো ব্যক্তি দু'জন ব্যক্তির কাছে কোনো বস্তু বিক্রয় করে তবে প্রথম ক্রেতার ব্যাপারে বিক্রয় সাব্যস্ত হবে।

www.waytojannah.com

মহর নির্ধারণ করা ব্যতীত বিবাহের বিধান

নাবী ﷺ থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, তিনি এমন এক ব্যক্তির জন্য কম-বেশ করা ছাড়া 'মহরে মিছ্ল' প্রদান করার জন্য রায় দিয়েছিলেন যে এক স্ত্রী লোককে বিবাহ করেছিল তবে সে তার জন্য মহর নির্ধারণ করেছিল না এবং সে তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিল। এক্ষেত্রে মহিলা (মৃত স্বামীর) উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে এবং তাকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে।

তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, আমি তোমাকে অমুকের (মেয়ের) সঙ্গে বিবাহ দিচ্ছি তুমি কি তাতে রাজি আছ? লোকটি বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি মহিলাটিকে বললেন, আমি তোমাকে অমুকের সঙ্গে বিবাহ দিচ্ছি, তুমি কি তাতে রাজি? সে হ্যাঁ বলল। এরপর তারা একে অপরের বিবাহত্বে চলে গেল। লোকটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলিত হল। এক্ষেত্রে মহিলার মহর নির্ধারণ করা হয়েছিল না। লোকটিও তাকে কিছু দেয়নি। যখন সে মৃত্যুপ্রায় ছিল তখন সে মহরের পরিবর্তে মহিলাটিকে তার প্রাপ্ত খায়বরের অংশ দিয়েছিল।

উল্লিখিত বর্ণনায় এসকল বিধান সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহর নির্ধারণ করা ছাড়াও বিবাহ বৈধ। মহর নির্ধারণের পূর্বে মিলিত হওয়াও বৈধ। (স্বামীর) মৃত্যুর পর মহরে মিছ্ল সুনির্ধারিত হয়, যদিও সে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত না হয়। স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলিত না হলেও স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীলোকের ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ইবনু মাসউদ (রা) এবং ইরাকের ফুকাহা তথা আইনবিদগণ এ হাদীস মোতাবেক রায় দেন। হাদীস বিশারদগণের মধ্য থেকে আহমদ (র) এবং শাফেয়ী (র)-এর একটি বক্তব্য এমনই।

আলী ইবনু আবি তালিব ও যাইদ ইবনু সাবিত (রা) বলেন, এক্ষেত্রে স্ত্রী মহর পাবে না। মদীনাবাসীগণ এ বক্তব্য অনুসারে আমল করেন। মালিক (র) এবং শাফেয়ী (র)-এর অপর বক্তব্য এ মোতাবেক রয়েছে।

বিবাহের পর স্ত্রীকে গর্ভবতী দেখলে

সুনান ও মুসান্নাফে সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব বাসরাহ ইবনু আকছামের সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি এক পর্দাশীল কুমারী মেয়েকে বিবাহ করি। যখন আমি তার সঙ্গে মিলিত হই তখন তাকে গর্ভবতী হিসেবে আবিষ্কার করি। নাবী ﷺ বললেন, তুমি তাকে বৈধ পন্থায় ভোগ করেছ এবং এর পরিবর্তে সে মোহর পাবে এবং সন্তান তোমার দাস হিসেবে থাকবে। স্ত্রী লোকটি প্রসব করলে তাকে দোররা লাগাবে। এরপর তিনি তাদের বিবাহে বিচ্ছেদ ঘটান।

উল্লিখিত বিধানের সূত্রে জানা গেল যে, ব্যভিচারের ফলে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। মদীনাবাসী, ইমাম আহমাদ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ তথা আইনবিদদের মতামত এমনই। (আরও জানা গেল যে,) নিকাহে ফাসেদ তথা অশুদ্ধ বিবাহতে নির্ধারিত মোহর ওয়াজিব হয়। এ মতটি এ ব্যাপারে বর্ণিত তিনটি মতের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

দ্বিতীয় মতামত যা ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহর তা হলো, মোহরে মিছ্ল ওয়াজিব হবে।

তৃতীয় মতামত মোহরে মিছ্ল ও নির্ধারণকৃত মোহরের মধ্যে যার পরিমাণ কম হবে তা-ই ওয়াজিব হবে।

স্বীকারোক্তি কিংবা সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকলেও গর্ভবর্তী হওয়ার দরুন তার উপর (সন্তান প্রসবের পর) দণ্ডবিধি কার্যকর করতে হবে। কারণ, গর্ভই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রমাণ। এটি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এবং মদীনাবাসীর মতামত। আহমাদ (র)-ও এমন একটি মন্তব্য করেন। তবে এ প্রসঙ্গে তার ভিন্ন মতও আছে।

www.waytojannah.com

অপর দিকে সন্তান স্বামীর দাস হিসেবে বিবেচিত হবে এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, সন্তানটি যেহেতু ব্যভিচারের ফলে জন্ম নিয়েছে এবং তার পিতা এখন এক প্রকারের নেই-ই। অপর দিকে এ লোকটিকে এক প্রকার ধোঁকা দিয়ে মহিলাটি তার সঙ্গে বিবাহে বসেছে এবং মোহর আদায় করেছে। কাজেই লোকটি তার সন্তানকে কাজে লাগাবে। তবে এক্ষেত্রে তাকে দাসত্ব সাব্যস্ত করা যাবে না। বরং দাস বা গোলামের স্থানে বিবেচনা করা হবে। কারণ, তার মা স্বাধীন হিসেবে বিবাহে আবদ্ধ হয়েছিল। কাজেই মায়ের স্বাধীন হওয়ার দরুন সন্তানও স্বাধীন বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারটি অবশ্য কিছুটা সন্দেহজনক।

এমনও ধারণা করা যেতে পারে যে, সন্তানের মা কর্তৃক স্বামীকে ধোঁকায় ফেলা এবং তার ব্যভিচারর দরুন সন্তানকে দাসত্বের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তবে এ বিষয়টি কেবলই নাবী ﷺ ও ঐ সন্তানটির ব্যাপারে সীমাবদ্ধ। অন্যদের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। এমনও সম্ভাবনা আছে যে, বিধানটি রহিত হয়ে গেছে।

ঐ ব্যক্তি যে একই সঙ্গে তিন তালাক দিয়েছে

একই শব্দে তিন তালাক (যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল, আমি তোমাকে তিন তালাক দিলাম) প্রদানের কার্যকারিতা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণত চারটি মতামত রয়েছে।

প্রথমত এক্ষেত্রে তালাক কার্যকর হবে। উল্লিখিত মতটি হলো, চার ইমাম, সংখ্যাগরিষ্ঠ তাবেয়ী ও অসংখ্য সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমের। দ্বিতীয়ত তালাক কার্যকর হবে না। বরং বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ, এভাবে তালাক দেওয়া বিদ'আত ও হারাম। বিদআত পরিত্যাজ্য বিষয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যদি কোনো ব্যক্তি এমন কাজ করে বসে যা আমাদের ধর্মের রীতিবিরুদ্ধ তবে তা পরিত্যাজ্য বলে গণ্য হবে।"

উল্লিখিত মতটি হলো আবূ মুহাম্মাদ ইবনু হাযমের, ইমাম আহমাদের ব্যাপারে এ মতটিকে সম্পর্কীত করা হয় তবে তিনি তা নাকচ করে দিয়ে বলেন যে, এটি রাফেজীদের বক্তব্য।

তৃতীয়ত এক্ষেত্রে তালাক কার্যকর হবে, তবে তা এক তালাকে রাজয়ী হিসেবে গণ্য হবে। এটি ইবনু আব্বাস থেকে প্রমাণিত যা আবূ দাঊদ তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, এটি হলো, ইবনু ইসহাকের মতামত। তিনি বলেন, এটি সুন্নাতের বিপরীত তবে তাকে সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাউস ও ইকরিমারও একই বক্তব্য। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এ বক্তব্য গ্রহণ করেছেন।

উল্লিখিত বিষয়ে একান্তে মিলিত হওয়া স্ত্রী এবং একান্তে মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়নি এমন স্ত্রীর মাঝে পার্থক্য থাকবে। যার সঙ্গে একান্তে মিলিত হয়েছে এক্ষেত্রে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে আর যার সঙ্গে মিলন হয়নি তার উপর এক তালাক পতিত হবে।

উপর্যুক্ত মতটি ইবনু আব্বাসের একদল সঙ্গীর اختلاف العلماء নামক কিতাবে মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী ইসহাক ইবনু রাহওয়াই-এর সূত্রে উল্লিখিত মতটি তুলে ধরেন।

অতঃপর যারা বলেন যে, তিন তালাক একসঙ্গে কার্যকর হবে না তারা এভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, বিদআহ তালাক হারাম। বিদআত পরিত্যাজ্য। আবূ মুহাম্মদ ইবনু হাযম স্বীকার করেন যে, তালাক যদি বিদআত ও হারাম হয় তবে তাকে রহিত ও বাতিল করা আবশ্যক। তবে তিনি শাফেয়ীর মাযহাব 'অবশ্যই একসঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাক বৈধ, হারাম নয়।' এ মতটি গ্রহণ করেছেন। এ বক্তব্যটির প্রমাণ একটু পরে আলোচিত হবে।

যারা এ ব্যাপারে এক তালাকের পক্ষপাতী তারা নস (এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হাদীসের বর্ণনা) ও কিয়াসের সাহায্যে প্রমাণ পেশ করে থাকেন।

www.waytojannah.com

নসের সাহায্যে প্রমাণ মা'মার ও ইবনু জুরাইজ তাউস ও তার বাবার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাহবা ইবনু আব্বাসকে বলেন, আপনি কি জানেন না রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একত্রে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক বলে গণ্য করা হত? এভাবে আবূ বাকর ও উমার-এর আমলের প্রথমভাগেও এমনই গণ্য করা হত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহাতে বর্ণনা করেন।

অন্য শব্দে এভাবে এসেছে, আপনি কি জানেন না একই সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আবূ বাকর (রা)-এর যুগে এবং উমারের খেলাফতের প্রথমভাগে এক তালাক বলে বিবেচিত হত? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

ইমাম আহমাদ বলেন, সা'দ ইবনু ইবরাহীম আমাদের তাঁর বাবার সূত্রে এবং তিনি মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক, দাউদ ইবনুল হুসাইন এবং ইবনু আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম ইকরামার সূত্রে বলেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, রুকানা ইবনু আবদ ইয়াযীদ যিনি বনী মুত্তালিবের ভ্রাতৃকুলের ছিলেন। তিনি তার স্ত্রীকে একই বৈঠকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। এরপর তিনি এ কাজের দরুন প্রচণ্ড চিন্তায় পড়ে যান। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি তাকে কিভাবে তালাক দিয়েছ?" তিনি জবাব দিলেন, আমি তাকে তিন তালাক দিয়েছি। তিনি জানতে চাইলেন। একই বৈঠকে কি তা দিয়েছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, "তা এক (তালাক) হবে, যদি তুমি চাও তবে তাকে ফিরে নিতে পার। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়েছিল। এরপর থেকে ইবনু আব্বাস (প্রত্যেক) পবিত্র অবস্থায় কেবল তালাক গণ্য হবে বলে মত দেন।

অতঃপর কিয়াস হলো এই যে, একই সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করা বিদআত ও হারাম। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। বিদ'আত প্রত্যাখ্যাত। কারণ, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নীতি নয়। তারা বলে থাকেন যে, পূর্বে এ প্রকার তালাক হারাম হওয়ার ব্যাপারে যে-সকল আলোচনা রয়েছে তা একই শব্দে কার্যকর হবে না বলে বুঝিয়ে থাকে।

এরপর যারা এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর মিলন হওয়া ও না হওয়া নিয়ে পার্থক্য রচনা করে থাকেন তাঁদের প্রমাণ হলো, আবূ দাউদ তাউসের বরাতে সহীহ সানাদে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি যার নাম ছিল আবু সাহবা তিনি ইবনু আব্বাসকে আধিক প্রশ্ন করতেন। তিনি তাকে বলেন, আপনার কি জানা নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আবূ বাকরের যুগে এবং উমারের শাসনামলের শুরুতে কেউ যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিত ঐসময় যখন সে তার সঙ্গে একান্তে মিলিত হয়নি তবে তা এক তালাক বলে বিবেচিত হত এরপর যখন উমার দেখলেন যে, মানুষ ব্যাপকহারে এ কাজ করে যাচ্ছে তখন তিনি বললেন, এক্ষেত্রে পুরুষদের কর্মকাণ্ডকে মহিলাদের ব্যাপারে যথেষ্ট মনে করা হবে। (অর্থাৎ এরূপ করলে তিন তালাক হয়েছে বলে গণ্য হবে)

যারা তিন তালাক কার্যকর হওয়ার মতবাদী তাদের বক্তব্য হলো, শাফেয়ী, আবু ছাত্তার, আহমাদ ইবনু হাম্বল একটি স্বতন্ত্র বক্তব্যে এবং আহলে জাওয়াহের সম্প্রদায় বলেন যে, একত্রে তিন তালাক প্রদানও শুদ্ধ পদ্ধতি তথা সুন্নাত। তারা এর প্রমাণে যে আয়াত পেশ করেন তা হলো এই–

فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তিন তালাককে একত্রে কিংবা পৃথক পৃথকভাবে বলে উল্লেখ করেননি। কাজেই আল্লাহ যেখানে যুক্তভাবে বলেছেন সেখানে আমরা পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করব না। আবার যেখানে আল্লাহ পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন তা আমরা একত্র বলে গণ্য করব না।

সহীহাইনে এসেছে যে, উয়াইমির আল আজলানী তার স্ত্রীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে তিন তালাক দিয়েছিলেন তাকে তালাক প্রদানের আদেশ দেওয়ার পূর্বেই।

www.waytojannah.com

সন্তানকে লালন-পালন করার ব্যাপারে কে অধিক হকদার প্রসঙ্গত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিধান

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، أن امرأة قالت: يا رسول الله! إنّ ابنى هذا كان بطنى له وعاء، وثديي له سقاء، وحجرى له حواء،وإن أباه طلقنى، فأراد أن ينتزعه منى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحى.

আবূ দাউদ তাঁর সুনানে 'আমর ইবনু শু'য়াইব তাঁর পিতা ও দাদা 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আসের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, জনৈক রমণী বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার এ সন্তানকে আমি পেটে ধারণ করেছি, দুধ পান করিয়েছি এবং আমার কোলে তাকে প্রতিপালিত করেছি। তার বাবা আমাকে তালাক দিয়েছে। সে তাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "তুমি (অন্য কোথাও) বিবাহে আবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তার ব্যাপারে তুমিই অধিক হকদার।" (অর্থাৎ শিশুকে প্রতিপালনে স্ত্রীলোকই অধিক দাবি রাখে)

من حديث البراء بن عازب، أن ابنة حمزة اختصم فيها على، وجعفر وزيد. فقال على: أنا أحق بها وهى ابنة عمى، وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى، وقال: زيد: ابنة أخى، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم.

সহীহাইনে বারা ইবনু 'আযিব এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, হামযার কন্যাকে নিয়ে আলী জা'ফার ও যাইদের মধ্যে বিতর্ক হয়। আলী বললেন, সে আমার চাচাত বোন কাজেই আমি তার (লালন-পালনের) ব্যাপারে অধিক হকদার। জা'ফার বললেন, সে আমার চাচাত বোন এবং তার খালা আমার স্ত্রী, কাজেই আমি তার ব্যাপারে অধিক হকদার। যাইদ বললেন, সে আমার ভাতিজি (কাজেই আমি তার ব্যাপারে যুক্তিসংগত দাবিদার)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার খালার কাছে দেয়ার রায় দিয়ে বললেন, "খালা মা তুল্য।"

সুনান গ্রন্থের সংকলকগণ আবূ হুরাইরা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন বালেগ সন্তানকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাবা-মার (তাদের তালাকের পর উভয়ের যে কারও সঙ্গে থাকার) ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছেন। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ।

সুনান গ্রন্থের রচয়িতা তাঁর (আবূ হুরাইরাহ) সূত্রে আরও বর্ণনা করেন, এক রমণী এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার স্বামী আমার পুত্রকে নিয়ে যেতে চায়। সে আবূ আনবাহ কূপ থেকে পানি আনে এবং আরও কাজ করে থাকে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তার ব্যাপারে তোমরা লটারি করো। রমণীটির স্বামী বলে উঠল আমার পুত্রের ব্যাপারে কে তার দাবি উঠাচ্ছে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ (পুত্রকে লক্ষ করে) বললেন, "এ হলো তোমার বাবা আর এ তোমার মা; যাকে মন চায় তুমি তার হাত ধরো।" পুত্রটি তার মায়ের হাত ধরল। এরপর রমণীটি পুত্রকে নিয়ে চলে গেলেন।" তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ।

عن عبد الحميد بن جعفر الأنصارى، عن أبيه، عن جده، أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال فأجلس النبى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا، ثم خيره وقال اللهم اهده، فذهب إلى أبيه.

www.waytojannah.com

সুনানে নাসায়ীতে এসেছে, আব্দুল হুমাইদ ইবনু জা'ফর আল আনসারী তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তার দাদা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার দাদি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। অতঃপর সে তার এক নাবালেগ পুত্রকে নিয়ে আসে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পিতাকে এক পাশে আর মাকে এক পাশে বসিয়ে পুত্রকে স্বাধীনতা দেয় এবং তিনি বলেন, "হে আল্লাহ তাকে (পুত্রকে) সঠিক পন্থা বাতলে দিন।" পুত্রটি তার বাবার নিকট চলে যায়।

আবূ দাউদ তার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার দাদা রাফে' ইবনু সিনান আমাকে বলেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন আর তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। সে নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, এ আমার কন্যা সে দুধ ছেড়েছে অথবা এ জাতীয় কিছু বলেছেন। রাফে' বলল, আমার কন্যা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এক পাশে বসো। অপর দিকে স্ত্রীলোকটিকে বলল এক পাশে বসো। এরপর তিনি শিশু কন্যাকে তাদের মাঝখানে বসালেন। এরপর বললেন, তোমরা উভয়েই তাকে ডাকো। শিশুটি তার মায়ের দিকে ঝুঁকে পড়লে নাবী ﷺ বললেন, "হে আল্লাহ তাকে সঠিক পথ দেখাও।" এরপর সে তার বাবার দিকে ঝুঁকে পড়লে সে তার হাত ধরল।

শিশুর ব্যাপারে বাবা-মার মাঝে কে হকদার বেশি?

হাদীসের ভাষ্য মতে এ বিষয় জানা গেল যে, যদি মা-বাবার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে আর তাদের সন্তান থাকে তবে সন্তানের ব্যাপারে বাবা অপেক্ষা মায়ের হক অধিক। যদি এমন কোনও প্রতিবন্ধকতা থাকে যার দরুন মায়ের অগ্রাধিকারের বিষয়টি বাধাপ্রাপ্ত হয় কিংবা পিতার ক্ষেত্রে এমন কোনও বিষয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে যার দরুন তার অনাগ্রাধিকার আবশ্যক হয়ে পড়ে তবে তা আলাদা বিষয়। এটি এমন এক নীতি যার ব্যাপারে কারও কোনও প্রকার মতবিরোধ নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খালিফা আবূ বাকর (রা), উমার ইবনুল খাত্তাবের ব্যাপারে এমনই ফায়সালা করেছেন। তবে এ ব্যাপারে কেউ কোনও আপত্তি তুলেনি। এরপর যখন উমার খলিফা হন তখন তিনি এরূপ ফায়সালা করেন। মালিক মুয়াত্তায় ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদের সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি কাসেম ইবনু মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি যে, উমার ইবনুল খাত্তাবের স্ত্রীত্বে আনসারী এক রমণী ছিলেন সে আসিম ইবনু উমারকে জন্ম দেয়। এরপর উমার তার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটায়। উমার একদিন কুফাতে গেলেন; সেখানে তিনি মাসজিদের প্রাঙ্গনে তার পুত্র আসিমকে খেলাধুলা করতে দেখে তিনি তার বাহু ধরে তাকে বাহনের উপর বসিয়ে দিলেন। শিশুটির দাদা তাকে এরূপ দেখে তাঁর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক জুড়ে দিলেন। এক পর্যায়ে তারা আবু বাকর সিদ্দিক (রা)-এর নিকট গেলেন। উমার (রা) বললেন, এ আমার পুত্র। স্ত্রী লোকটি বলল, এ আমার পুত্র। অতঃপর আবু বকর (রা) [উমার (রা)-কে লক্ষ করে] বললেন, স্ত্রী লোকটি ও তার পুত্রের ব্যাপারে দাবি ছেড়ে দাও। এরপর উমার কোনও বাক্য ব্যয় করেনি।

ইবনু আবদিল বার বলেন, সম্মিলিত ও বিচ্ছিন্ন সানাদের দিক থেকে এ হাদীসটি মশহুর পর্যায়ের। বিদ্বানগণ একে গ্রহণ করেছেন। তারা এর উপর আমলও করেন। উমারের স্ত্রী যিনি তার পুত্র আসিমের মাতা, প্রকৃতপক্ষে তিনি হলেন জামিলা বিনতু আসিম ইবনু ছাবিত ইবনু আবিল আক্বলাহ আল-আনসারী।

তিনি বলেন, উল্লিখিত বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, উক্ত বিষয়ে উমার আবু বাকরের বিপরীত মত পোষণ করতেন। তবে তিনি বিচারক ও বিধানকারীর ফায়সালার প্রতি অনুগত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তার খিলাফাত আমলে এর প্রতিই তার ফায়সালা ও রায় এসেছিল। সন্তান যতদিন ছোট তথা অল্পবয়সী

www.waytojannah.com

থাকে তার ব্যাপারে কোন প্রকার ভেদাভেদ ব্যতীতই তিনি আবু বাকরের বিরোধিতা না করে একমত পোষণ করেন। অপর দিকে কোনও সাহাবাও তাদের বিরোধিতা করেননি।

আব্দুর রায্যাক ইবনু জুরাইজের সূত্রে বলেন যে, ইবনু আব্বাসের এক সূত্রে আ'তা আলী খোরাসানী তাকে জানান যে, উমার ইবনুল খাত্তাব তার পুত্র আসিমের মাতা আনসারী স্ত্রীকে তালাক দেন। রমণীটি মাহসারে পুত্রকে কোলে নিয়ে আছেন এমন মুহূর্তে উমার তাকে দেখে। তখন সন্তানটি দুধ ছেড়েছিল; হাঁটতেও শিখেছিল। উমার ছেলেটির হাত ধরে রমণীর থেকে টেনে নিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে রমণীটির সঙ্গে বাক-বিতণ্ডা হয় এবং শিশুটি ব্যথা পেয়ে কাঁদতে থাকে। উমার (রা) বলেন, এ পুত্রটির ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমি অধিক হকদার। তারা উভয়েই আবূ বাকরের নিকট নালিশ জানাল। তিনি রমণীর পক্ষে রায় দিয়ে বললেন, তার ঘ্রাণ তার বিছানা ও তার কোল তোমার চেয়ে অনেক গুণে উত্তম। পরিণত বয়সে উপনীত হলে সে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবে।

'মাহসার' কুবা ও মদীনার মধ্যবার্তী একটি বাজারের নাম।

ছাওরী থেকে বর্ণিত তিনি আসিম ও ইকরামার সূত্রে বলেন যে, এক রমণী আবূ বাকরের নিকট উমারের ব্যাপারে নালিশ করল। উমার তাকে তালাক দিয়েছিলেন। আবূ বাকর বললেন, মা অধিক দয়াপরবশ, স্নেহশীল ও কৃপার পাত্র। কাজেই যতদিন পর্যন্ত সে বিবাহে আবদ্ধ না হবে সেই তার দেখা-শুনা করবে।

মা'মার থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি যুহরীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন যে, আবূ বাকর উমারের পুত্রের ব্যাপারে তার বিপরীতে রায় দেন; পুত্রের মায়ের পক্ষে রায় যায়। তিনি (আবু বকর) বলেন, মা যতদিন পর্যন্ত বিবাহে আবদ্ধ না হবে ততদিন পর্যন্ত সে সন্তানের ব্যাপারে অধিক হকদার।

প্রশ্ন: এখানে বর্ণনার মাঝে বৈচিত্র লক্ষ করা গেছে যে, প্রথমে তাঁর ও পুত্রের মায়ের মাঝে বাক-বিতণ্ডা সংঘটিত হয়। এরপর তাঁর ও পুত্রের নানার মাঝে। কিংবা এমনও হতে পারে যে, একই সময়ে স্ত্রীলোক ও পুত্রের নানার সঙ্গে তাঁর বাকবিতণ্ডা ঘটে।

জবাব: এ ব্যাপারে বিষয়টি খুবই স্পষ্ট এভাবে যে, বাক-বিতণ্ডার দাবি প্রথমে মায়ের পক্ষ থেকে উঠে। যদিও এ ব্যাপারে তার নানারও দাবি ছিল। এ ব্যাপারে আবূ বাকর সিদ্দিকের রায় এ কথা বুঝাচ্ছে যে, সর্বাগ্রে মায়ের হক।

সন্তানের প্রতি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার রকমফের

সন্তানের প্রতি প্রতিষ্ঠা স্থাপন দু' প্রকার। এক প্রকার এমন কিছু বিষয় যেখানে কিছু ক্ষেত্রে মায়ের উপর বাবাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তা হলো, সম্পদ ও বিবাহের ব্যাপারে। অপর এক প্রকার রয়েছে যেখানে বাবার চেয়ে মাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। তা হলো, সন্তান লালন-পালন ও দুধ পান করার অধিকার। বাবা-মার প্রত্যেককে যে কিছু ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে তা সন্তানের মঙ্গলের জন্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অগ্রাধিকার বিবেচিত হবে বাবা-মার প্রতি নির্ভর করে এ ব্যাপারে তাদের যথাযোগ্যতাও বিবেচিত হবে।

সন্তান প্রতিপালনে মেয়েরা অধিক জ্ঞাত। এতে তারা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে। এ ব্যাপারে তারা ধৈর্যশীল, স্নেহপরবশ ও ঝঞ্ঝাটহীন। কাজেই এ ক্ষেত্রে বাবার চেয়ে মাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। আয়-উপার্জন ও অর্থ-সম্পদ কামায়ের ক্ষেত্রে পুরুষ যেহেতু অধিক যোগ্যবান হয়ে থাকে সেহেতু সেক্ষেত্রে বাবাকে মায়ের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

মোদ্দাকথা সন্তানের দেখভাল ও লালন-পালন ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে মা অধিক উপযুক্ত। অপর দিকে অর্থ-সম্পদ ও বিবাহ-শাদির ক্ষেত্রে বাবার অধিকার সন্তানের প্রতি মায়ের চেয়ে অগ্রগণ্য।

www.waytojannah.com

কুকুর ও বিড়ারের মূল্য গ্রহণ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিধান

আবু মাসউদ (রা)-এর সূত্রে সহীহাইনে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের মূল্য, পতিতাবৃত্তির মূল্য এবং গণকের ভেট গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

আবিয যুবাইর এর সূত্রে সহীহ মুসলিমে এসেছে, তিনি বলেন, আমি জাবিরকে কুকুর ও বিড়ালের (মূল্য নেয়া বৈধ কি না?) ব্যাপারে জিজ্ঞেসা করলে তিনি বললেন, নাবী ﷺ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

সুনানে আবূ দাউদে তার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ কুকুর ও বিড়ালের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

সহীহ মুসলিমে রাফি ইবনু খাদীজের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, ঘৃণিত-নিকৃষ্ট উপার্জন হলো, পতিতাবৃত্তি করে উপার্জন করা, কুকুর বিক্রয়ের মূল্য গ্রহণ করা এবং সিঙ্গা লাগিয়ে মূল্য নেয়া।

ব্যভিচারের বিনিময় প্রসঙ্গ

তৃতীয় বিধান হলো, ব্যভিচারের বিনিময় গ্রহণ করা। এটি যেভাবেই হোক রাসূলুল্লাহ ﷺ একে খবীছ তথা জঘন্য বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যভিচারী মহিলা স্বাধীন হোক বা ক্রিতদাসী। সে যুগে সাধারণত দাসীরাই ব্যভিচার করে বিনিময় গ্রহণ করত স্বাধীন নারীরা নয়। আর এ কারণেই হিন্দা যখন বাইআত গ্রহণ করেন তখন বলেন, স্বাধীন নারীরাও কি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়? বালেগা বুদ্ধিমান স্বাধীন নারী যদি কোনও পুরুষকে তার সাথে ব্যভিচারের সুযোগ দেয় তাহলে ফেকাহবিদদের সর্বসম্মতিক্রমে এ নারী মোহর বা বিনিময় পাবে না। তবে জোরপূর্বক যে স্বাধীন নারীর সাথে ব্যভিচার করা হয়েছে এবং যে দাসী বিনিময় গ্রহণের উদ্দেশ্যে কারো সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে এ দুটি মাসয়ালা নিয়ে ফেকাহবিদগণ এখতেলাফ করেছেন। জোরপূর্বক যে স্বাধীন নারীর সাথে ব্যভিচার করা হয়েছে তার ব্যাপারে চারটি মতামত রয়েছে এবং এসবগুলো ইমাম আহমাদ (র) থেকে বর্ণিত:

১. সে কুমারী হোক বা বিবাহিতা সর্বাবস্থায় সে মোহর পাবে। ব্যভিচার সামনের পথে হোক বা পেছনের পথে।

২. বিবাহিতা হলে মোহর পাবে না। কুমারী হলে মোহর পাবে। তবে তার কুমারিত্ব নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে কি না? এ ব্যাপারে দু'ধরনের বর্ণনা রয়েছে। এটিই হলো আবূ বাকরের মতামত।

৩. মহিলা মাহরাম হলে সে মোহর পাবে না। তবে মাহরাম না হলে মোহর পাবে।

৪. যে মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ হারাম যেমন– মাতা, মেয়ে এবং বোন ইত্যাদির মেয়েরা তাদের সঙ্গে ব্যভিচার করলে মহিলা এক্ষেত্রে মোহর পাবে না, তবে যে মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ যেমন খালাতো, মামাতো বোন ইত্যাদি এক্ষেত্রে মহিলাকে মোহর প্রদান করতে হবে।

আবূ হানীফা (র) বলেন, যে মহিলাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয়েছে সে কুমারী হোক বা বিবাহিতা কোন অবস্থায় সে মোহর পাবে না।

যারা মোহর দেয়া আবশ্যক হবার কথা বলেন, তাদের মতে শরীয়ত মোহরকে ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্জিত মজার বিনিময় বানিয়েছে। তবে যে নারী স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয় সে যেহেতু নিজেই নিজের বিনিময়কে নষ্ট করেছে তাই সে মোহর পাবে না। এটি ঠিক অঙ্গ নষ্ট করার অনুরূপ।

www.waytojannah.com

আর যারা মোহর প্রদানকে আবশ্যক মনে করেন না তারা বলেন, শরীয়ত চুক্তি বা চুক্তির সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে এমন জিনিসের ক্ষেত্রে এ ধরনের মজা অর্জনের জন্য মোহরকে আবশ্যক করেছে আর ব্যভিচারের মধ্যে এটি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। আর বিবাহের উপর ব্যভিচারকে কেয়াস করা সবচেয়ে জঘন্য প্রকারের কেয়াসের অন্তর্ভুক্ত।

তারা বলেন, মোহর ওয়াজিব হওয়া না হওয়া বুঝা যাবে নসের বর্ণনাভঙ্গি, আলোচনা, অর্থ, ব্যাপকতা এবং সম্বোধনের মাধ্যমে। আর এগুলোর কোনোটাই এক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

মোহর হলো বিবাহের বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি তাই তো বলা হয় "বিবাহের মোহর" এবং কখনো ব্যভিচারের দিকে সম্বোধন করে এমনটি বলা হয় না। নবী করীম ﷺ হাদীসে মোহর শব্দ উল্লেখ করে আকদকে বুঝিয়েছেন। সুতরাং ইরশাদ হয়েছে–

إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মদ, মৃত প্রাণী, শূকর এবং মূর্তি কেনাবেচাকে হারাম করেছেন।" এমনিভাবে ইরশাদ করেছেন–

ورجل باع حرا فأكل ثمنه.

"এবং যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মহিলাকে বিক্রি করে তার বিনিময় ভক্ষণ করে।"

প্রথম মতের আলেমগণ বলেন: শরীয়ত ইচ্ছাকৃত ব্যভিচারে লিপ্ত নারীর ক্ষেত্রে মোহর প্রদানে নিষেধ করেছেন। যাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয়েছে ঐ নারী এ হুকুমের আওতাভুক্ত নয়। সুতরাং তার মোহর বা বিনিময় প্রদান আবশ্যক।

যারা কুমারী এবং বিবাহিতা নারীর মাঝে পার্থক্য করেন তারা মনে করেন ধর্ষণকারী বিবাহিতা নারীকে ধর্ষণ করে শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে বটে কিন্তু এর কারণে শরীয়ত তার উপর কোনো প্রকার আর্থিক জরিমানা ওয়াজিব করে না। তবে কুমারী নারীর বিষয়টি এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কেননা ধর্ষণকারী তার ধর্ষণের মাধ্যমে তার কুমারিত্ব নষ্ট করে ফেলেছে তাই এক্ষেত্রে ধর্ষণকারীর উপর আর্থিক জরিমানা প্রদান করা আবশ্যক।

"মুগনীর" লেখক বলেন, দুগ্ধপানের কারণে যাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম তাদের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে উপর্যুক্ত বিধানই আরোপিত হবে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, যে নারীকে জোরপূর্বক তার পেছনের পথে ব্যভিচার করা হয়েছে বা যে দাসী স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে তাদের বিধান কী? তবে এর উত্তরে বলা হবে, তারা সর্বাগ্রে বিনিময় না পাওয়ার উপযুক্ত। এমনিভাবে সমকামিতায় লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রেও সে কোনও বিনিময় পাবে না। এ মাসয়ালাটিতে শাইখাইন তথা ইবনু তাইমিয়া এবং আবূ মুহাম্মাদ ইবনু কুদামা মতবিরোধ করেছেন। ইবনু তাইমিয়া তার "মুহাররার" কিতাবে মোহর দেয়াকে আবশ্যক বলেছেন।

আর আবূ মুহাম্মাদ তার "আল মুগনীতে" মোহর দেয়া আবশ্যক নয় বলে উল্লেখ করেছেন এবং তার উক্তিটি সর্বাধিক সঠিক।

গণক-ঠাকুরের পারিশ্রমিক

পঞ্চম বিধান হলো: গণক-ঠাকুরের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা। আল্লামা ইবনু আব্দুল বার (র) বলেন, গণক ও ঠাকুরের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম এবং অন্যায়ভাবে মাল উপার্জন এর অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে এর পারিশ্রমিক গ্রহণ হারাম হওয়াতে কোনও প্রকার বিরোধ নেই। আভিধানিক অর্থে হুলওয়ান বলা হয় "দেওয়াকে। আলকামাহ বলেন–

www.waytojannah.com

فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي ● يبلغ عني الشعر إذ مات قائله

অর্থাৎ, কে আছে এমন যাকে আমি আমার উট এবং সফরের সামানপত্র প্রদান করব সে আমার পক্ষ থেকে কবিতা পৌঁছে দিবে যখন তার কবির মৃত্যু ঘটবে।

গণকের পারিশ্রমিক গ্রহণ হারাম হওয়া থেকে জ্যোতিষী, বালুতে রেখা টেনে, পাথরে মেরে বা গণনা করে লটারির মাধ্যমে যারা ভবিষ্যতের সংবাদ দিয়ে থাকে তাদের পারিশ্রমিক হারাম হওয়াও বুঝে আসে। নবী করীম ﷺ গণকদের নিকট যেতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, যে ব্যক্তি গণকের নিকট গেল এবং তার কথাকে সত্য মনে করল সে নাবীর উপর অবতীর্ণ বিষয়কে অস্বীকার করল। নিঃসন্দেহে নাবীর ﷺ আনিত বিষয়াদির উপর ঈমান এবং গণকদের বক্তব্যের উপর ঈমান কোনও মানুষের অন্তরে একত্র হতে পারে না। যদিও তাদের কথা কখনো কখনো সত্য হয়ে থাকে। সুতরাং সত্যের তুলনায় তাদের থেকে মিথ্যাই বেশির ভাগ প্রকাশ পায়। শয়তান মানুষের মাঝে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কখনো কখনো সত্য খবরও তাদের নিকট এসে বলে থাকে।

অজ গ্রাম্য, মূর্খ এবং মহিলারাই সাধারণত তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখে। তারা তাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করে যদিও এ গণকরা মুশরিক বা প্রকাশ্য কাফের হোক। তারা তাদের জন্য মান্নত করে তাদের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সফর করে এবং তাদের নিকট দু'আ প্রার্থনা করে। এসবের মূল কারণ হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে যে দ্বীন এবং হেদায়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা তাদের নিকট অস্পষ্ট। এরশাদ হয়েছে–

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ.

অর্থ: আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই। (সূরা: নূর: ৪০)

সাহাবায়ে কেরাম নাবী ﷺ-কে বললেন, তাদের কথা তো অনেক সময় সত্য হয়ে থাকে। নাবী ﷺ বললেন, এটা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। শয়তান তাদের নিকট এসে সত্য খবর বলে, অতঃপর তারা তার সঙ্গে সত্য মিথ্যা মিশিয়ে লোকদের নিকট বর্ণনা করে। আর যারা আসহাবুল মালাহেম তথা ভবিষ্যদ্বাণী করে তারা তাদের এ ভবিষদ্বাণীতে নিম্নোক্ত ৬টি জিনিসের সাহায্য নিয়ে থাকে:

১. গণকদের সংবাদ ও খবরসমূহ দ্বারা;
২. আহলে কিতাবীদের উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্য কিতাবে বর্ণিত সংবাদ ও বর্ণনাসমূহ দ্বারা;
৩. ঐসব বিষয় দ্বারা যার সম্পর্কে বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ নবী ﷺ প্রদান করেছেন;
৪. ঐসব বিষয় দ্বারা যার সম্পর্কে আহলে কাশফ সাহাবায়ে কেরামগণ এবং তাদের পরবর্তী বুযুর্গানে কেরাম সংবাদ দিয়েছেন;
৫. সামগ্রিক বা আংশিক বিষয় সম্পর্কিত স্বপ্নের দ্বারা;
৬. ঊর্ধ্বজগতের ঐসব "আছারের" দ্বারা যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ঐহিক বিষয়ের জন্য নির্দশন বা কারণ বানিয়েছেন এবং অধিকাংশ মানুষই এ সম্পর্কে অজ্ঞ। কেননা আল্লাহ কোনো জিনিসকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ ঊর্ধ্বজগতকে পার্থিব জগতের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। সুতরাং কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্র গ্রহণ হয় না। যদিও সূর্যের এবং চন্দ্র গ্রহণের মূল কারণই হলো পৃথিবীর মাঝে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়া।

www.waytojannah.com

আল্লাহ তাআলা সূর্য ও চন্দ্রের আন্দোলন এবং উদয়স্থল এর পরিবর্তনকে ঠাণ্ডা ও গরমের কারণ বানিয়েছেন। এবং ঋতুর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সূর্য ও চন্দ্রের প্রভাব রয়েছে কৃষকদের নিকট যা পরিচিত। শরীয়ত গণকদের নিকট গমন করাকে তাদের নিকট গিয়ে অর্থ খরচ করাকে হারাম করেছেন। গণক ও জ্যোতিষীরা তাদের গণনায় এবং জ্যোতির্বিদ্যায় শয়তানের আশ্রয় নিয়ে থাকে। এতদুভয়ের বিদ্যা কোনো নেককার ভালো মানুষ থেকে প্রকাশিত হয় না। গণক ও জ্যোতিষীদের অধিকাংশ কার্যকলাপ যাদুকরদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। যাদুকর কুরআন-সুন্নাহ, শরীয়ত এবং দ্বীন থেকে যত দূরে থাকবে তার যাদু তত মজবুত ও শক্তিশালী হবে ঠিক গণকদের বিষয়টিও এমন।

রক্তমোক্ষণ ব্যবসা প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ বিধান হলো, রক্তমোক্ষণ ব্যবসা ঘৃণিত হওয়া প্রসঙ্গ এবং শিঙ্গা ইত্যাদির হুকুম এ হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত। তবে ডাক্তার এবং যারা চিকিৎসাবিশেষজ্ঞ তারা অর্থ এবং শাব্দিক কোনোভাবেই এ হুকুমের আওতাভুক্ত নয়। নাবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে এ ব্যবসা ঘৃণিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত এবং তাঁর থেকে সহীহ সূত্রে একথাও বর্ণিত যে, তিনি শিঙ্গা লাগিয়েছেন এবং যে শিঙ্গা লাগিয়েছে তাকে পারিশ্রমিক প্রদান করেছেন। সুতরাং বিপরীতধর্মী মাসআলা হওয়ার কারণে এর সমাধান নিয়ে ফেকাহবিদগণ জটিলতায় পড়েছেন। ইমাম তহাবী (র) এর মতে, পারিশ্রমিক নিষেধ হওয়ার হাদীস পারিশ্রমিক গ্রহণের হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। তিনি বলেন, এটি ঠিক কুকুর বিক্রির মাসয়ালার মতো। হুজুর ﷺ প্রথমে কুকুর হত্যার নির্দেশ দেন এরপর বলেন, তাদের এবং কুকুরের কী হলো অতঃপর শিকারী কুকুর এবং পাহারাদার কুকুর রাখার অনুমতি দেন। তখন কুকুর বিক্রি করা এবং কুকুর দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম ছিল এবং কুকুর হত্যাকারী তার উপর ওয়াজিব দায়িত্ব পালন করেছে বলে মনে করা হত পরে তা মানসূখ তথা রহিত হয়ে যায়। এরপর কুকুর দিয়ে পশু শিকারের অনুমতি দেয়া হয়। ইমাম তহাবী বলেন, এমনটিই ঘটেছে রক্তমোক্ষণ তথা শিঙ্গা লাগিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের ক্ষেত্রেও। নবী ﷺ বলেছেন– كسب الحجام خبيث "রক্তমোক্ষণ ব্যবসা জঘন্য।" এরপর তিনি নিজেই রক্তমোক্ষককে পারিশ্রমিক প্রদান করেছেন।

তার এ মতামতটির সবচেয়ে সহজ উত্তর হলো এটি দলিলহীন শুধু একটি দাবিই মাত্র। সুতরাং তা গ্রহণ করা হবে না। কারণ স্বয়ং হাদীস দ্বারা এর অসারতা প্রমাণিত। কেননা নাবী ﷺ প্রথমে কুকুর হত্যার নির্দেশ দেন এবং এরশাদ করেন, مابالهم وبال الكلاب তাদের এবং কুকুরগুলোর কী হলো। এরপর শিকারী কুকুর ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়। ইবনু ওমর (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ শিকারী এবং পাহারাদার কুকুর ছাড়া অন্য সকল কুকুর হত্যার নির্দেশ দেন।

এমনটিই বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা) নবী করীম ﷺ থেকে। হাদীস দুটি সহীহাতে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এর থেকে বুঝা যায় যে, শিকারী কুকুর এবং পাহারাদার কুকুর এর ব্যবসা সম্পর্কিত নির্দেশ এসেছে কুকুর হত্যার নির্দেশের পরে। আর যে কুকুর সংগ্রহে রাখার নির্দেশ রাসূল ﷺ দিয়েছেন শুধু ঐ কুকুরেরই ব্যবসাকে তিনি হারাম বলে ঘোষণা করেছেন এবং একে জঘন্য বলে উল্লেখ করেছেন। তবে যে কুকুরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন ঐ কুকুরের বিষয়টি এরূপ নয়। যে কুকুরের ক্ষেত্রে হত্যার নির্দেশ এসেছে ঐ কুকুর বিক্রি করে তার পারিশ্রমিক গ্রহণের বিষয়টি একটি অনর্থক বিষয়। কেননা এ ধরনের কুকুর সাধারণত কেউ কেনাবেচা করে না, অর্থ গ্রহণ তো অনেক দূরের কথা। সুতরাং নসখ হয়েছে বলে যে কথা বলা হয়েছে তা সঠিক নয়।

www.waytojannah.com

আর নাবী ﷺ রক্তমোক্ষককে যে, পারিশ্রমিক দিয়েছেন তার সাথে এবং كسب الحجام خبيث এর সাথে কোনও বৈপরিত্য নেই। কারণ তিনি পারিশ্রমিক প্রদানকে জঘন্য বলেননি বরং এটি হয়ত ওয়াজিব, মুস্তাহাব বা জায়েয। তবে গ্রহণ করাটা হলো জঘন্য এবং এর কারণে হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা নবী ﷺ পেঁয়াজ এবং রসুনকে খবীছ বা মন্দ বলেছেন কিন্তু এরপরও এগুলোকে খাওয়া জায়েয। আর নবী ﷺ এর পারিশ্রমিক প্রদান করেছেন বলে এটি গ্রহণ করা এবং খাওয়া বৈধ হবে না। কেননা তিনি বলেছেন, আমি অনেককে দান করি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করণার্থে। তাছাড়া তিনি লোকদের সন্তুষ্ট করার লক্ষেও যাকাত এবং গনীমতের সম্পদ প্রদান করতেন। এমনটি করতেন যাতে তারা ইসলামমুখী হয় এবং আনুগত্য প্রকাশ করে।

সুতরাং শিঙ্গা লাগিয়ে অর্থ উপার্জন করা ঠিক ঐরকম ঘৃণিত যেরূপ ঘৃণিত পেঁয়াজ এবং রসুন।

যদি প্রশ্ন করা হয় পাক-পবিত্র, হালাল উপার্জন কোনটি? উত্তরে বলা হবে এ ব্যাপারে ফেকাহবিদদের তিন ধরনের উক্তি রয়েছে:

১. ব্যবসা
২. শিঙ্গা ইত্যাদির মতো নিম্নমানের উপার্জন বর্জন করে নিজ হাতে হালাল উপার্জন করা
৩. কৃষিকাজ করা

ষাঁড় দ্বারা পাল বা প্রজননের মজুরি গ্রহণ সম্পর্কে নবীর ﷺএর নির্দেশ

সহীহ বুখারীতে ইবনু উমার থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ ষাঁড়ের প্রজননের মজুরি গ্রহণ করাকে নিষেধ করেছেন।

সহীহ মুসলিমে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ষাঁড়ের পাল থেকে নিষেধ করেছেন। দ্বিতীয় হাদীসটি প্রথমটির ব্যাখ্যাস্বরূপ। এ ধরনের মজুরি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ চাই তা কেনাবেচার মাধ্যমে হোক বা লিজের মাধ্যমে। জমহুর আলেমদের মতামত এটাই। এদের মধ্যে ইমাম আহমাদ, শাফেয়ী, ইমাম আবূ হানিফা এবং তার শিষ্যগণ অন্তর্ভুক্ত।

আবূল ওফা ইবনু আকীল বলেন, আমার মতে এটি বৈধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, এটি একটি মুনাফা অর্জনের চুক্তি। সুতরাং "জি'র" এর মাসয়ালার মতো এটিও একটি চুক্তি। সুতরাং এটাও বৈধ হতে পারে।

মালেক (র) থেকে এটির বৈধতার কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে তার আসহাব এর ব্যাখ্যা করেছেন। জাওয়াহেরের রচয়িতা বলেন, প্রজননের উদ্দেশ্যে ষাঁড় ভাড়া নেয়া না-জায়েয। কেননা এটি অর্পণ করা অসম্ভব বা গাইরে মাকদুরুত্ তাসলীম। তবে নির্দিষ্ট সংখ্যার ভিত্তিতে যদি প্রজননের উদ্দেশ্যে ভাড়া দেয়া হয় তবে তা জায়েয। কারণ এক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট এবং অর্পণ করাও সম্ভব বা মাকদুরুত্ তাসলীম। তবে সঠিক বক্তব্য হলো সর্বাবস্থায়ই এটির মজুরি গ্রহণ করা হারাম। মজুরি দেয়া এবং নেয়া উভয়টাই নিষিদ্ধ। তিনি নিষিদ্ধ হবার একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন:

১. এখানে পণ্যকে বিক্রেতা অর্পণে সক্ষম নয়। তাই এটা পলাতক দাস ভাড়া দেয়ার অনুরূপ।
২. এখানে উদ্দেশ্য হলো ষাঁড়ের বীর্য আর এটির পরিমাণ এবং সত্তা অজানা। আর এটি জি'র এর মাসয়ালার বিপরীত। সুতরাং এটির উপর অনুমান করা জায়েয হবে না। বলা হয় ষাঁড়ের মাধ্যমে প্রজনন করে অর্থ উপার্জন নিষিদ্ধ হওয়া শরীয়তের পূর্ণতার পরিচায়ক।

www.waytojannah.com

কেননা ষাঁড়ের মাধ্যমে প্রজনন করিয়ে বিনিময় গ্রহণ করাকে জ্ঞানীরা অপছন্দ করেন। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের বিশেষ করে মুসলমানদের প্রকৃতিকে ভালো-মন্দ নির্ণয়ের মাপকাঠি বানিয়েছেন। তাই তো মুসলমানরা যাকে ভালো মনে করে আল্লাহর নিকটও তা ভালো, আর মুসলমানরা যাকে অপছন্দ করে আল্লাহর নিকটও তা অপছন্দনীয়। তাছাড়া ষাঁড়ের বীর্যের কোনো মূল্য নেই এবং এটি এমন জিনিস নয় যার বিনিময় গ্রহণ করা যায়। আর এ কারণেই কারো ষাঁড় যদি অন্যের পালিত গাভীর সঙ্গে মিলন করে এবং এর কারণে বাচ্চা জন্ম নেয় তবে বাচ্চাটির মালিক হয় গাভীর যে মালিক সে। তাই শরীয়তে কামাল বা পূর্ণতা হলো এক্ষেত্রে বিনিময় গ্রহণ না করা বরং বিনিময় ব্যতীতই মিলিত হতে দেয়া; নাবী ﷺ এরশাদ করেন, "এর হক্ব হলো বিনামূল্যে পাল বা মিলিত হতে দেয়া।"

প্রশ্ন: গাভীর মালিক যদি ষাঁড়ের মালিককে উপহারস্বরূপ মিলিত হওয়ার করার অনুমতি দেয় তবে এটি জায়েয কি না?

উত্তর: শর্ত বা বিনিময়স্বরূপ হলে এটি নাজায়েয, এমন না হলে তাতে কোন সমস্যা নেই।

ইমাম আহমাদ এবং শাফেঈ-এর শিষ্যরা বলেন, হাদিয়া, উপহার বা সম্মানার্থে এমনটি হলে তা জায়েয। আমার আসহাব আনাসের হাদীস দিয়ে এক্ষেত্রে দলিল পেশ করেছেন। আনাস বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সম্মানার্থে এমনটি হলে তাতে কোনও সমস্যা নেই। 'মুগনী" গ্রন্থের লেখক বলেন, হাদীসটির অবস্থা সম্পর্কে আমার জানা নেই।

যৌথ মালিকানাধীন পানি বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর নির্দেশ

মুসলিম শরীফে জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء.

রাসূল ﷺ জমি ও এর সেচ ব্যবস্থা কাউকে চাষ করতে দিয়ে তার বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

তার থেকে আরো বর্ণিত, রাসূল ﷺ উষ্ট্র দ্বারা পাল দিয়ে তার মজুরি গ্রহণ করতে এবং জমি ও এর সেচ ব্যবস্থা কাউকে চাষ করতে দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

সহীহাইনে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূল ﷺ বলেছেন–

لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ.

অর্থ: স্বয়ং উৎপন্ন ঘাসের থেকে নিষেধ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি গ্রহণ থেকে নিষেধ করতে পারবে না।

মুসনাদে আহমাদে আমর ইবনু শুআইব তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে পরম্পরায় বর্ণনা করেন। রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি (কাউকে) তার প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি এবং স্বয়ং উৎপন্ন ঘাস থেকে নিষেধ করবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে তার প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিস থেকে নিষেধ করবেন।

সুনানে ইবনু মাজাহতে আবূ হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, "তিনটি জিনিস নিষেধ করা নিষেধ: (১) পানি (২) আগুন এবং (৩) স্বয়ং উৎপন্ন ঘাস।"

সুনানে ইবনু মাজাহতে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, "মুসলমানরা তিনটি জিনিসে পরস্পরে অংশীদার : (১) পানি (২) আগুন এবং (৩) স্বয়ং উৎপন্ন ঘাস এবং এগুলোর বিনিময় গ্রহণ করা হারাম।"

www.waytojannah.com

সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে ﷺ বলেছেন:

ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها، رضى، وإن لم يعطه منها، سخط، ورجل أقام سلعة بعد العصر فقال: والله الذى لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل.

অর্থ: কেয়ামতের দিন তিন প্রকার লোকের প্রতি আল্লাহ দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদের পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১. যে ব্যক্তি রাস্তায় প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি আছে এরপরও সে পথিককে সেখান থেকে নিষেধ করে।
২. যে ব্যক্তি তার ইমামের হাতে দুনিয়ার উদ্দেশ্যে বাইয়াত করে, অতঃপর ইমাম (নেতা) তাকে দিলে সে সন্তুষ্ট থাকে আর না দিলে অসন্তুষ্ট হয়।
৩. যে ব্যক্তি আছরের পর পণ্য বিক্রি করে এবং বলে আল্লাহর শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই এ পণ্যের কারণেই আমাকে এমন এমন দেয়া হয়েছে। অতঃপর লোকেরা তাকে সত্যায়ন করল।

রাসূল ﷺ অতঃপর এ আয়াতটি পাঠ করলেন–

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً.

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কোনও অংশ নেই।" (সূরা: আলে-ইমরান: ৭৭)

সুনানে আবূ দাউদে বুহাইসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বাবা নবী ﷺ এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং তার কাছে গিয়ে বসলেন এরপর বললেন, হে আল্লাহর নবী ﷺ! কোন জিনিস থেকে বাধা দেয়া নিষেধ? তিনি বললেন, পানি। আমার বাবা বললেন, হে আল্লাহর নবী ﷺ কোন জিনিস থেকে বাধা দেয়া নিষেধ? তিনি উত্তরে বললেন, লবণ। (আমার বাবা আবার) বললেন, হে আল্লাহর নবী ﷺ! কোন জিনিস থেকে বাধা দেয়া নিষেধ? উত্তরে তিনি ﷺ বললেন, তুমি কল্যাণকর কাজ করবে এটাই তোমার জন্য শ্রেয়।" পানি এমন একটি জিনিস যা থেকে উপকারিতা অর্জনে মানুষ এবং প্রাণী সকলেই সমান। সুতরাং এককভাবে কেউ নিজের জন্য পানিকে আটকে রাখতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি তার পাত্র বা বালতিতে পানি জমিয়ে রাখবে তার বিধান সম্পর্কে হাদীসে আলোচনা করা হয়নি এটি অন্যান্য সকল মুবাহ জিনিসের অনুরূপ। অর্থাৎ সংগ্রহ করলে সে তার মালিক হয়ে যাবে যেমন লাকড়ি, ঘাস এবং লবণ ইত্যাদি। নবী ﷺ বলেছেন–

لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتى بحزمة حطب على ظهره فيبيعها، فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أومنعوه.

"তোমাদের কেউ তার দড়ি নিয়ে পিঠে লাকড়ির বোঝা উঠিয়ে তা বিক্রি করে মানুষের নিকট চাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা তার জন্য অতি উত্তম মানুষের নিকট হাত পাতা থেকে। তারা তাকে তা প্রদান করুক বা না করুক।" (সহীহ বুখারী)

www.waytojannah.com

সহীহাইনে আলী (রা) বলেন, আমি বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে গনীমতের মাল থেকে একটি বৃদ্ধ উটনী প্রাপ্ত হই এবং রাসূল ﷺ আমাকে আরো একটি উটনী প্রদান করেন। আমি উভয়টিকে আনসারী এক সাহাবীর দরজার নিকটে বসালাম। ইযখির ঘাস সংগ্রহ করে তাদের উপর উঠিয়ে দিয়ে (বাজারে) বিক্রি করব বলে। এমনিভাবে নদীর মাছ বৃষ্টির পানি এবং সমুদ্রের পানিও মুবাহ জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেউ তা নিজের জন্য সংগ্রহ করলে অন্য কেউ তা নিষেধ করতে পারবে না।

কেউ তার নিজের, পশুর এবং চাষাবাদের প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহের পরে যদি অতিরিক্ত পানি সংগ্রহ করে রাখে তাহলে অন্যের জন্য বিনামূল্যে তা থেকে পান করা এবং নিজের পশুদেরকে পান করানোর অধিকার থাকবে। পানি সংগ্রহকারী তাদের নিষেধ করতে পারবে না এবং পানকারীদের জন্য কোনও প্রকার বিনিময় প্রদানও আবশ্যক হবে না। তবে হ্যাঁ, পানি সংগ্রহকারীর বালতি বা পাত্রের সাহায্যে তারা পান করলে তার বিনিময় প্রদান আবশ্যক কি না? এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়, যা ইমাম আহমাদ (র) এর আসহাবদের থেকে বর্ণিত। তবে বিশুদ্ধ মতামত হলো আবশ্যক হবে। ইমাম আহমাদ বলেন, এ বিধানটি গ্রাম এবং মরুভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শহরের ক্ষেত্রে নয়, তবে পানি সংগ্রহকারীর জন্য তার প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি অন্যের চাষাবাদের জন্য প্রদান করা আবশ্যক কি না? এ নিয়ে দুটি বর্ণনা রয়েছে, উভয়টিই ইমাম আহমদ (র) থেকে।

১. আবশ্যক নয় এবং এটিই ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব।
২. আবশ্যক। যারা এ উক্তিটি গ্রহণ করেছেন তারা এর দলিলস্বরূপ উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ, সেগুলোর ব্যাপকতা এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকেন। ইবনু আমর এর "ওয়াহত" স্থানের জমির রক্ষক তার নিকট চিঠি লিখল এ মর্মে যে সে তার জমি সেচ করেছে এবং সেখান থেকে বেঁচে যাওয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে লোকেরা তা ক্রয়ে আগ্রহী। ইবনু আমরের নিকট পত্র পৌঁছার পর তিনি এর উত্তরে লিখেন, তুমি তোমার প্রয়োজন পরিমাণ পানি আটকে রাখো অতঃপর ধারাবাহিকভাবে নিকটবর্তীদেরকে সেচের জন্য পানি প্রদান করো কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করতে নিষেধ করতেন।"

প্রশ্ন: যদি কারো জমিতে বা বাড়িতে কূপ বা ঝরনা থাকে তবে সে তার মালিক হবে কি?

উত্তর: জমির মালিকই ঐ কূপ বা ঝরনার মালিক বলে গণ্য হবে তবে পানির ব্যাপারে দু'ধরনের উক্তি পাওয়া যায় এবং উভয়টিই ইমাম আহমাদের মাযহাব:

১. জমির মালিক ঐ পানির মালিক হবে না। কারণ এ পানি প্রবাহিত পানির অনুরূপ।
২. জমির মালিকই ঐ পানির মালিক হবে। ইমাম আবূ বাকর (র) এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

খনিজ সম্পদ, লবণ, ঘাস ইত্যাদিও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

আরছাম বলেন, আমি ইমাম আবূ আব্দুল্লাহকে এক সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুনেছি যে, তাদের একটি পুকুর আছে সেখান থেকে তারা তাদের জমিতে সেচ দিয়ে থাকে আজকে একজন এবং পরের দুদিন অপরজনের। তারা সকলেই তাদের অংশের ব্যাপারে একমত। অতঃপর আমার দিন এল, কিন্তু আমার পানির প্রয়োজন নেই এখন আমি কি দেরহামের বিনিময়ে আমার অংশের পানিকে ভাড়ায় দিতে

www.waytojannah.com

পারব? উত্তরে তিনি বলেন, আমার জানা নেই, তবে নাবী ﷺ পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। যেসব হাদীসসূহে পানির ক্ষেত্রে যৌথ মালিকানার কথা এসেছে সেসব হাদীস পানি বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ। এ মাসয়ালা সম্পর্কে ইমাম আহমাদ (র)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এবং শাম দেশে তিনি মাসয়ালার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি প্রথমে এর উত্তর প্রদানে নীরবতা পালন করেন তবে পরে বলেন যে, নাবী ﷺ পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

প্রশ্ন: আচ্ছা পানি বিক্রি তো নিষেধ। কিন্তু স্বয়ং কূপ বা ঝরনা বিক্রি করা যাবে কি?

উত্তর: নাবী ﷺ প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তবে কূপ ও ঝরনা ইত্যাদি বিক্রি করা বৈধ এবং ক্রেতাই ঐ কূপ বা ঝরনার পানির সর্বাধিক হকদার। এটি ইমাম আহমাদ (রা) এর বক্তব্য এবং সুন্নাতেও এর প্রমাণ। নাবী ﷺ এরশাদ করেন–

من يشترى بئر رومة يوسع بها على المسلمين وله الجنة.

অর্থ: যে ব্যক্তি রুমা কূপকে ক্রয় করবে এবং তা থেকে মুসলমানদের উপকৃত হবার সুযোগ দিবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।

হাদীসে এসেছে, "ওসমান (রা) রুমা কূপের অর্ধাংশকে ১২ হাজার দেরহাম দিয়ে ক্রয় করেন এবং ইহুদিকে বললেন, তোমার ইচ্ছা হয় তুমি সেখান থেকে একদিন পানি গ্রহণ করবে এবং আমি একদিন অথবা সেখান থেকে পানি গ্রহণের তোমার আলাদা বালতি থাকবে আর আমার আলাদা বালতি। অবশেষে ইহুদি একদিন একদিনকে গ্রহণ করল। ওসমান (রা)-এর দিনে লোকেরা সেখান থেকে পানি গ্রহণ করত। ইহুদি ওসমানকে বলল, তুমি আমার কূপ নষ্ট করেছ অবশিষ্ট অর্ধাংশও তুমি কিনে নাও। অতঃপর ওসমান (রা) কূপের বাকি অংশকে ৮ হাজার দেরহাম দিয়ে কিনে নেন।" এ হাদীস থেকে উপর্যুক্ত মাসয়ালার বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রবাহমান পানি প্রসঙ্গ

প্রবাহমান পানি যদি কারো মালিকানাধীন না হয়, যেমন বড় নদী ইত্যাদি তবে কেউ সে পানির মালিক হবে না। এ পানি যদি কারো জমিতেও প্রবেশ করে তবুও সে জমির মালিক ঐ পানির মালিক হবে না। এটি ঠিক পাখির মতো যা কারো জমিনে প্রবেশ করে থাকে। প্রত্যেকেই এ পাখি ধরতে এবং শিকার করতে পারে। তবে কেউ যদি তার জমিতে জলাশয়, হাউজ বা চৌবাচ্চা নির্মাণ করে এখানে এসে পানি জমা হয় এবং এখান থেকে অন্য জায়গায় প্রবাহিত হয় তবে এর বিধান ঠিক কূপের বিধানের অনুরূপ। তবে পানি সেখান থেকে অন্যত্র প্রবাহিত যদি না হয় তবে এ বিষয়ে ইখতেলাফ রয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানির বিধান পূর্বের বিধানের অনুরূপ।

শাইখ তার 'মুগনীতে" বলেছেন, জলাশয়ে জমে থাকা পানি যদি সেখান থেকে অন্যত্র প্রবাহিত না হয় এবং তা পরিমাণে অল্প হয় তাহলে জলাশয়ের মালিকই ঐ পানির মালিক থাকবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আমরা বৃষ্টির পানির অধ্যায়ে আলোচনা করব। অতঃপর তিনি বলেন, বৃষ্টির পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যেসব হাউজ ইত্যাদি তৈরি করা হয় এক্ষেত্রে উত্তম হলো যে এ পানি সংগ্রহ করবে সে-ই এ পানির মালিক হবে এবং এর পরিমাণ যদি জানা থাকে তবে তা বিক্রি করাও বৈধ। কেননা এটি মুবাহ জিনিস যা সে তার নিজের তৈরি করা হাউজে সংগ্রহ করেছে। তার এ হাউজ থেকে তার অনুমতি ব্যতীত

www.waytojannah.com

কারো জন্য পানি ব্যবহার করা জায়েয হবে না। তার এ কথার উপর আপত্তি রয়েছে দালিলিকভাবেও এবং মাযহাবের দৃষ্টিকোণ থেকেও। কেননা ইমাম আহমাদ (র) বলেন, কূপের প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করা এবং এর মাঝে কোনও পার্থক্য নেই। তাই বৃষ্টির জমা করে রেখে পানিও বিক্রি করা নাজায়েয।

এর পক্ষে দলীল হলো পূর্বের অধ্যায়ে উল্লিখিত নসসমূহ এবং বুখারীতে উল্লিখিত রাসূল ﷺ এর হাদীস:

والرجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل.

অর্থ: "এবং ঐ ব্যক্তি যে, তার প্রয়োনাতিরিক্ত পানি থেকে মুসাফিরকে নিষেধ করেছে।" অপর এক হাদীসে এসেছে নবী ﷺ বলেছেন, সকল মানুষ তিনটি জিনিসে শরীক (অংশীদার)।

অন্যত্র এসেছে যে, নাবী ﷺকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, কোন জিনিস থেকে নিষেধ করা জায়েয নয়? তিনি ﷺ উত্তরে বলেছেন পানি। নাবী ﷺ এক্ষেত্রে পানি যেখানে জমা থাকে সে জায়গা মুবাহ হওয়াকে আবশ্যক বলেননি।

নিজের দখলে নেই এমন বস্তু বিক্রি করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিধান

সুনানের কিতাবসমূহে এবং মুসনাদে আহমাদে এসেছে হাকীম ইবনু হিযাম (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, কেউ আমার নিকট এসে কোনও বস্তু ক্রয় করতে চায়, যা আমার কাছে নেই। আমি (কি) বাজার থেকে তার জন্য তা ক্রয় করে আনব? এ আশায় যে, আমি তার নিকট তা বিক্রি করব। উত্তরে নবী ﷺ বললেন, তোমার দখলে যা নেই তা বিক্রি করো না। (ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।)

সুনান ইত্যাদি কিতাবে ইবনু উমার থেকে বর্ণিত, যার শব্দ নিম্নরূপ

لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح مالم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك.

অর্থ: "ঋণ এবং ক্রয়-বিক্রয় একসঙ্গে জায়েয নয়। এক বিক্রয়ের সঙ্গে দুটি শর্ত জুড়ে দেওয়াও জায়েয নয়। যে বস্তুর খেসারতের দায়িত্ব বর্তেনি তার লাভের অধিকার হাসেল হবে না এবং যে বস্তু তোমার হস্তগত হয়নি, তা বিক্রি করাও জায়েয নেই।" যে বস্তু হস্তগত হয়নি তা বিক্রি করা নাজায়েয হবার কারণ তাতে 'গরার' তথা ধোঁকা বিদ্যমান। কেননা বিক্রেতা যখন কোনও নির্দিষ্ট বস্তু বিক্রি করবে অথচ জিনিসটি তার দখলে নেই অতঃপর সে তা নিজের জন্য প্রথমে ক্রয় করতে যাবে তখন বস্তুটি পাওয়া এবং না পাওয়া উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকার পাশাপাশি জুয়াও বিদ্যমান যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। অনেকের ধারণা এ ধরনের কেনাবেচা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ বস্তুটি মা'দুম (অস্তিত্বহীন)। আর মা'দুম জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। এক্ষেত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি অস্তিত্বহীন জিনিসের কেনাবেচা থেকে নিষেধ করেছেন। হাদীসের কোনও কিতাবে এ হাদীসের উল্লেখ নেই এবং এর কোনো আমলও নেই। তবে হাদীসটির সমর্থক হাদীস রয়েছে। অনেকে এ দুটি হাদীসকে এক মনে করেছেন। হাকীম ইবনু হিযাম এবং ইবনু আমর (রা) এর হাদীসদ্বয়ে এ ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করার কারণ পণ্য বা বস্তুটির অস্তিত্বহীনতা হওয়া যদি মেনেও নেয়া হয় তথাপি এটি এক বিশেষ প্রকার মা'দুম বা অস্তিত্বহীন বস্তু এবং এটি ঠিক পেটের বাচ্চার বাচ্চা বিক্রির মতো।

মা'দুম (অস্তিত্বহীন) কেনাবেচা তিন প্রকার:

১. পণ্যটি অস্তিত্বহীন তবে তার গুণগতমানের বর্ণনা এবং সে অনুযায়ী তা প্রদানের দায়িত্ব নিয়েছে বিক্রেতা। এ প্রকার সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। যদিও ইমাম আবূ হানীফা (র) এর জন্য চুক্তির সময় পণ্যটির উপস্থিতির শর্ত করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে করা হবে।

www.waytojannah.com

২. পণ্যটি অস্তিত্বহীন তবে অস্তিত্ব আছে এমন পণ্যের অনুগামী এটি দু'প্রকার:

ক. সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ: আর এটি হলো, বৃক্ষের একটি ফল খাবারের যোগ্য হবার পরই বৃক্ষের সকল ফল বিক্রি করে দেয়া।

খ. বিতর্কিত: যেমন– শশা এবং খাবারের আসবাবপত্রের বিক্রয়। এক্ষেত্রে দু'ধরনের মতামত পাওয়া যায়। একটি বৈধতার এবং অপরটি অবৈধতার। বৈধতার মতটি সর্বাধিক সঠিক। উম্মাতের আমল এর প্রমাণ, কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা, আছার এবং কেয়াসে সরীহ এর সাক্ষী। এটি ইমাম মালেক (র) এবং তার আসহাবদের মাযহাব। ইমাম আহমাদের একটি মতামত এটাও এবং এ মতটিকেই ইবনু তাইমিয়া (র) গ্রহণ করেছেন। অনেকে এ বৈধতার জন্য অল্প অল্প করে বিক্রি করার শর্ত করেছেন যা কোনভাবেই সঠিক নয়। না শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ আর না মানুষের পরিভাষায় বৈধ। যদি এটা সম্ভবত হয় উপরন্ত এটি খুব কঠিন।

৩. এমন অস্তিত্বহীন পণ্য যা অর্জন হওয়া না হওয়া উভয়টারই সম্ভাবনা রয়েছে। শরীয়ত এ প্রকারের কেনাবেচাকে মা'দুম হবার কারণে নিষেধ করেননি বরং এতে 'গারার' (ধোঁকা) আছে বিধায় একে হারাম বলেছেন। হাকীম ইবনু হিযাম এবং ইবনু উমারের হাদীসে এর কথাই উল্লেখ করত নিষেধ করা হয়েছে। কেননা বিক্রেতা যখন তার দখলভুক্ত নয় এমন বস্তুকে বিক্রি করবে এবং বস্তুটি ক্রেতার নিকট অর্পণের সামর্থ্যও তার নেই। তাই যখন সে বস্তুটি সংগ্রহ বা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে গমন করবে এবং পরে তা ক্রেতার নিকট অর্পণ করবে তখন এটি জুয়ায় রূপ ধারণ করবে। এমনিভাবে 'হাবলুল হাবলার' বিক্রয় অর্থাৎ উটের পেটের বাচ্চার বাচ্চা বিক্রি করা। এ নিষেধাজ্ঞা শুধু গর্ভের বাচ্চার বাচ্চার সাথে খাস নয় বরং উট, গরু এবং দাসীর পেটের বাচ্চার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটি জাহেলী যুগের কেনাবেচার অন্তর্ভুক্ত। অনেকে ধারণা করেন, বাইয়ে 'সলম' "দখলহীন বস্তুর বিক্রয় নিষেধ" এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং 'সলম'কে হাদীসের বিধান থেকে খাস করা হয়েছে। তাদের এ ধারণাটি ঠিক নয় কারণ 'বাইয়ে সলম' সংঘটিত হয় এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে যা প্রদান করা ওয়াজিব এবং বিক্রেতা এক্ষেত্রে পণ্যকে ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করতে সক্ষম হয় এবং এ কেনাবেচায় কোনও ধরনের 'গারার'ও থাকে না।

শাইখ ইবনু তাইমিয়া এ হাদীস সম্পর্কে খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

তিনি বলেন, এ হাদীস সম্পর্কে একাধিক উক্তি রয়েছে, কারো মতে, অন্যের কোনও নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রি করা। তখন হাদীসের অর্থ হবে, তোমার নিকট যে নির্দিষ্ট পণ্য নেই তা বিক্রি করো না। এ ব্যাখ্যাটি ইমাম শাফেঈ থেকে বর্ণিত। কারণ, তিনি নগদ 'সলমের' কেনাবেচাকে বৈধ বলেন।

অন্যান্যদের মতে, উপর্যুক্ত মতটি অত্যন্ত দুর্বল। কেননা হাকীম ইবনু হিযাম (রা) কখনো অন্যের নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রি করেননি এবং এরপর ঐ ব্যক্তির পণ্য ক্রয় করতে যাননি। এবং তার নিকট লোকেরা এসে কখনো এমনটি বলত না যে, "আমরা অমুকের গোলাম" বা "অমুকের ঘর চাই" বরং লোকেরা যা করত তা হলো তারা তার নিকট এসে বলত, "আমি অমুক অমুক খাবার" এবং "অমুক অমুক কাপড় ক্রয় করতে চাই ইত্যাদি ইত্যাদি।" আর তিনি বলতেন, হ্যাঁ দিচ্ছি এবং পণ্যটি তার নিকট বিক্রি করে দিতেন

www.waytojannah.com

এরপর অন্যের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করতে যেতেন। এক্ষেত্রে তৃতীয় একটি উল্লেখযোগ্য ও সর্বাধিক সঠিক উক্তি হলো, হাদীসে নগদ এবং বাকি কোনও 'সালম' কেনাবেচা সম্পর্কেই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি। হাদীসে নিজের দখলভুক্ত নয় এমন বস্তুর জিম্মা নিয়ে বিক্রি করাকে নিষেধ করা হয়েছে এবং এতে সে পণ্যের মালিক হবার পূর্বেই পণ্যের মুনাফা গ্রহণ করছে। এ ধরনের কেনাবেচায় 'গারার' বিদ্যমান। কেননা 'সলম' যদি নগদ হয় তবে নগদেই পণ্য হস্তান্তর করা বিক্রেতার উপর আবশ্যক। অথচ সে তা করতে অক্ষম। সুতরাং সলম যদি নগদে হয় এবং 'মুসলাম ইলাইহি' তা অর্পণে বা প্রদানে সক্ষম হয়, তবে তখন এ কেনাবেচা বৈধ। এমনটিই বলেছেন ইমাম শাফেঈ (রা)। এটাই যে নাবী ﷺ এর উদ্দেশ্য ছিল এর প্রমাণ হলো, প্রশ্নকারী তার নিকট মুতলাক ফিয্ যিম্মাহ এর বিক্রয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল যে সম্পর্কে আমরা ইতপূর্বে আলোচনা করেছি। সুতরাং এর বেচাকেনা যদি নাজায়েয হয় তাহলে মালিকানাধীন জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় আরো আগে অবৈধ। নগদ সলম এর ক্রয়-বিক্রয় যদি অবৈধ হত তবে নবী ﷺ প্রশ্নকারীর উত্তরে لا تبع ماليس عندك "তোমার নিকট যা নেই তা বিক্রি করো না" এমনটি বলতেন না। বরং বলতেন এটি বিক্রি করো না, পণ্যটি চাই তার নিকট থাকুক বা না থাকুক। তৃতীয় মতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

প্রশ্ন: "বাকী সলম" বৈধ প্রয়োজনের কারণে এটি মূলত নিঃস্ব ব্যক্তির কেনাবেচার মতো। কেননা বিক্রেতার নিকট বিক্রির পণ্য অনুপস্থিত তাই পণ্য প্রদানের জন্য সময় নিয়েছে। "নগদ সলম" কিন্তু এরূপ নয়। কেননা বিক্রেতা এক্ষেত্রে পণ্য হস্তান্তরে পূর্ণ সক্ষম। সুতরাং এমন কেনাবেচার প্রয়োজন নেই যার বর্ণনা প্রদান বিক্রেতার জিম্মায় আবশ্যক?

উত্তর: আমরা এটা মানি না যে, "সলম" এর বিক্রয় আসলের বহির্ভূত বিষয় বরং পণ্যকে পরে প্রদান করা ঠিক মূল্যকে পরে প্রদান করারই নামান্তর। আর উভয়টাতেই উপকারিতা বিদ্যমান।

অনুপস্থিত পণ্য বিক্রির ব্যাপারে তিন ধরনের উক্তি পাওয়া যায়: কেউ তো সম্পূর্ণ বৈধ বলেন। যেমন ইমাম শাফেঈ (রা)। কেউ সম্পূর্ণরূপে বৈধ বলেন না বরং নির্দিষ্ট এবং গুণগতমান বর্ণনা করা হয়েছে এমন পণ্যের ক্ষেত্রেই শুধু বৈধ মনে করেন যেমন, ইমাম আবূ হানীফা (র)। তৃতীয় উক্তি হলো, দু'ভাবেই কেনাবেচা বৈধ। যেমনটি সাহাবায়ে কেরামদের থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং এটিই হলো ইমাম আবূ হানীফা এবং আহমাদের একটি মত। ইমাম আহমাদের আসহাবদের মধ্যে কাযী এবং অন্যান্যরা নগদ সলমকে 'বিক্রির' শব্দেই কেবল কেনাবেচাকে বৈধ মনে করেন।

এক্ষেত্রে তাহকীকী মতামত হলো: শব্দ উল্লেখ করা না করায় কোনও পার্থক্য নেই। বরং চুক্তি বা উকূদের ক্ষেত্রে চুক্তিই মূল উদ্দেশ্য, শব্দ ধর্তব্য নয়।

যা হোক উল্লিখিত কেনাবেচায় "গারার" বিদ্যমান যা পাওয়া এবং না পাওয়া উভয়েরই সম্ভাবনা রয়েছে আর এটি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া দখলহীন পণ্য বিক্রিতে দুটি ক্ষতিও রয়েছে:

১. ব্যবসায়িক ক্ষতি এবং

২. মাইসির, যাতে অন্যায়ভাবে অন্যের মাল ভক্ষণ করা।

আল্লাহ তা'আলা 'মুলামাসা' এবং 'মুনাবাযার' মত এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম করেছেন। এমনিভাবে 'হাবলুল হাবালা' এবং ফল খাবারের উপযুক্ত হবার পূর্বেই তা বিক্রি করে দেয়ার মত এটিও হারাম। এতে হীলা বাহানার কোনও প্রকার অবকাশ নেই। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় (বা'ই) এর অন্তর্ভুক্তই নয়। বরং জুয়া এবং মাইসির এর শামিল। আর পণ্যটি যখন এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্রেতা তার অধীনে নিয়ে নিবে তখন এটি ব্যবসায়িক ক্ষতির অন্তর্ভুক্ত হবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

www.waytojannah.com

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ.

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করো তা বৈধ।" (সূরা নিসাঃ ২৯)

হাসাত, গরর, মুলামাসা এবং মুনাবাযা এর ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুকুম

সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন কাঁকর নিক্ষেপ করার ক্রয়-বিক্রয় এবং 'বাই-এ গরর'–অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় থেকে। সহীহাইনে তার থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুলামাসা এবং মুনাবাযা ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন। মুসলিম বৃদ্ধি করে বলেন, মুলামাসা হলো, চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই ক্রেতা-বিক্রেতার (বিক্রয়ের) কাপড়টি হাতে স্পর্শ করা। আর মুনাবাযা হলো, (কোনও বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনাকালে ক্রেতা ও বিক্রেতা) পরস্পর একজনের কোনও বস্ত্র অপরজনের প্রতি ছুঁড়ে মারা সহীহাইনে আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ বস্ত্র পরনের দুইটি নিয়ম প্রণালীকে নিষেধ করেছেন এবং ক্রয়-বিক্রয়েরও দুইটি প্রণালী নিষেধ করেছেন।

ক্রয়-বিক্রয়ের প্রণালীদ্বয় হলো, মুলামাসা এবং মুনাবাযা। মুলামাসা বলা হয় রাতে বা দিনে ক্রেতা-বিক্রেতার (বিক্রয়ের) কাপড়টি হাতে স্পর্শ করলে ঐ কাপড় গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। দেখার পর বিবেচনা করার কোন সুযোগ তার থাকবে না। মুনাবাযা বলা হয়, (কোনও বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনাকালে ক্রেতা ও বিক্রেতা) পরস্পর একজনের কোনও বস্তু অপরজনের প্রতি ছুঁড়ে মারলেই তাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। ক্রয়ের বস্তু দেখার সুযোগও থাকবে না এবং উভয়ের সম্মতিরও ধার ধারা হবে না।

"বাইয়ে হাসাত" মূলত বাইয়ে খিয়ার এবং বাইয়ুন নাসিয়া ইত্যাদির মতো মাসদার তার স্বজাতীয় জিনিসের প্রতি ইযাফত হয়েছে। বাইয়ুল মাইতা এবং দম এর মতো মফউলের দিকে ইযাফত হয়নি।

নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয় এ দু'প্রকারেই অন্তর্ভুক্ত। বাইয়ে হাসাতের নিম্নোক্ত সুরত বর্ণনা করা হয়েছে "এ কথা বলা যে, এ পাথরটি নিক্ষেপ করো" যে পণ্যের উপর তা পতিত হবে এক দিরহামের বিনিময়ে সেটার তুমি মালিক হয়ে যাবে। আরো বলা হয় যে, বিক্রেতা কর্তৃক তার জমিনের সে পরিমাণ অংশ বিক্রি করা যেখানে গিয়ে পাথর পতিত হয়েছে। কারো কারো মতে হাতের তালুতে পাথর নিয়ে এ কথা বলা যে, হাতের মুঠোয় যে কয়েকটি পাথর উঠবে সে কয়েকটি পণ্য তোমার কাছে বিক্রি করলাম। কারো কারো মতে ক্রেতা-বিক্রেতার একজন হাতে পাথর নিয়ে একথা বলা, যে পাথরটি যখন পড়ে যাবে তখন ক্রয়-বিক্রয় আবশ্যক হয়ে যাবে ইত্যাদি সুরত এবং উল্লিখিত সুরতগুলোর সবগুলোই অবৈধ, কারণ এগুলোতে অন্যায়ভাবে মাল ভক্ষণ করা হয়। আর বাইয়ুল গারার জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

"গারার" এর বিক্রয় প্রসঙ্গ

بيع الغرر এটি বাইয়ুল মালাকীহ এবং মাযামীন এর মত মাসদার যা তার মাফউলের দিকে ইযাফত হয়েছে। স্বয়ং পণ্যই হলো "গারার" এটি ক্রিয়া তবে মাফউলের অর্থে। অর্থাৎ গারার শব্দটি 'কবয' এবং 'সালব' ক্রিয়াদ্বয়ের মতো মাফউলের অর্থে। সুতরাং গারার অর্থ মাগরুর। এ ধরনের বিক্রয় ঠিক পলাতক

www.waytojannah.com

গোলাম যা ক্রেতার নিকট হস্তান্তর অসম্ভব, শূন্যের উপর পাখি বিক্রি, পাগলা ঘোড়া বিক্রি, গাছে যা আছে বা উটনীর গর্ভে যা আছে তা বিক্রি করা, যায়েদ যা দিবে, সন্তুষ্ট হবে বা উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হবে তা বিক্রি করার এবং এ জাতীয় যেসব ক্ষেত্রে বিক্রেতা পণ্যকে ক্রেতার নিকট হস্তান্তরে অক্ষম ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রের অনুরূপ এবং যে জিনিসের পণ্যের বাস্তবতা এবং পরিমাণ অজানা তারও অনুরূপ। যেমন 'হাবলুল হাবলার' বিক্রয়, সহীহাইনে এসেছে যে, নাবী ﷺ এর থেকে নিষেধ করেছেন। 'হাবলুল হাবলা' দ্বারা কী উদ্দেশ্য এ নিয়ে তিন ধরনের কথা পাওয়া যায়:

১. উটনীর পেটের বাচ্চার বাচ্চা বিক্রি করা।

২. এখানে হাবলুন দ্বারা আজাল তথা সময় উদ্দেশ্য। মুসলিম শরীফে এমনটিই এসেছে। উপর্যুক্ত উভয় প্রকারই গারার এর অন্তর্ভক্ত।

৩. আঙ্গুর বৃক্ষের ফল পাকার পূর্বেই তা বিক্রি করা।

মুবাররাদ বলেন, حبلة শব্দটির "বা" শব্দে সাকীন এবং যবর উভয়টাই পড়া যায়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছেন ইবনু উমার (রা) এবং এটিই ইমাম শাফেঈ এবং ইমাম মালেক (র) এর মত।

আবূ উবাইদাহ ব্যাখ্যা করেছেন, উটনীর পেটের বাচ্চার বাচ্চাকে বিক্রি করার দ্বারা এবং এ মতটিকেই গ্রহণ করেছেন ইমাম আহমাদ (র)। এমনিভাবে ভ্রূণ এবং ষাঁড়ের মেরুদণ্ডে অবস্থিত বীর্য বিক্রি করাও গারার এর অন্তর্ভুক্ত। একে বাইয়ুল মালাকীহ এবং বাইয়ুল মাযামীন বলা হয়। আবূ উবাইদ বলেন, মালাকীহ বলে, গর্ভের ভ্রূণ বিক্রি করাকে আর মাযামীন বলেন, ষাঁড়ের মেরুদণ্ডের বীর্যকে বিক্রি করাকে। জাহেলিয়াতের যুগে এ ধরনের কেনাবেচার প্রচলন ছিল। কবি বলেন:

إن المضامين التي في الصلب ● ماء الفحول في الظهور الحدب

অর্থ: "সুলবের মাযামীন হলো ষাঁড়ের পিঠের উত্তলাংশের পানি।"

গারার বিদ্যমান ক্রয়-বিক্রয়ের আরো একটি হলো 'বাইয়ুল মাজরি' নাবী ﷺ এর থেকে নিষেধ করেছেন। জনৈক বেদুঈন বলেন, মাজরি হলো: উটের ভ্রূণ বিক্রি করা, মাজরি হলো: সুদ, মাজরি হলো: জুয়া, মাজরি হলো: মুহাকালা ও মুযাবানা।

আরো একটি হলো বাইয়ুল মুলামাসাহ ও মুনাবাযাহ। স্বয়ং হাদীসে এর ব্যাখ্যা এসেছে, সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে–

نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه.

অর্থ: নবী ﷺ দু'প্রকার ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন: মুলামাসাহ এবং মুনাবাযাহ, মুলামাসাহ বলা হয়, ক্রেতা-বিক্রেতার কেউ বিক্রয়ের কাপড়টিকে কোনরূপ বিবেচনা ছাড়াই হাত দিয়ে স্পর্শ করা। আর মুলাবাযাহ বলা হয়, (কোনও বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনাকালে ক্রেতা ও বিক্রেতা) পরস্পর একজনের কোন বস্ত্র অপরজনের প্রতি ছুঁড়ে মারলেই তাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। ক্রয়ের বস্তু দেখার সুযোগও থাকবে না এবং উভয়ের সম্মতিরও প্রয়োজন হবে না।

সহীহাইনে আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বস্ত্র পরনের দুইটি নিয়ম প্রণালীকে নিষেধ করেছেন এবং ক্রয়-বিক্রয়েরও দুটি প্রণালীকে নিষেধ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ের প্রণালীদ্বয় হলো, 'মুলামাসাহ' ও 'মুনাবাযাহ'। মুলামাসাহ হলো, রাতে বা দিনে ক্রেতা-বিক্রেতার (বিক্রয়ের) ব্যাপারটি হাতে স্পর্শ করলেই সে কাপড় গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। তা দেখে বিবেচনা করার

www.waytojannah.com

কোনো সুযোগ তার থাকবে না। মুনাবাযাহ হলো, (কোনও বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনাকালে ক্রেতা ও বিক্রেতা) পরস্পর একজনের কোনও বস্ত্র অপর জনের প্রতি ছুঁড়ে মারলেই তাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। ক্রয়ের বস্তু দেখার সুযোগও থাকবে না। এবং উভয়ের সম্মতিরও ধার ধারা হবে না।

তবে জমিতে সে সকল শস্যাদি উৎপন্ন হয় যেমন, মূলা, গাজর, শালগম এবং পেঁয়াজ ইত্যাদি এগুলো বাইয়ে গারারের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এগুলো স্বভাবজাতভাবেই সকলের জ্ঞানা এবং প্রত্যেকেই এ সম্পর্কে অবগত। এগুলোর বাহ্য অবস্থা ভেতরের অবস্থার পরিচায়ক। আর গারার আছে বলে যদি ধরাও হয় তবুও তা খুবই সামান্য। যা অধিক উপকারিতার সামনে ক্ষমাযোগ্য। আর এ ধরনের গারারের কারণে কেনাবেচা নিষিদ্ধ হতে পারে না। কেননা পশু, ঘর এবং দোকান ভাড়া দেওয়াতেও গারার আছে তাই বলে কি এগুলোর ভাড়া দেয়া অবৈধ বলে কেউ মনে করে। এমনিভাবে ঘর ভাঙ্গা, গোসলখানায় প্রবেশ করা, পাত্রের মুখে মুখ লাগিয়ে পান করা। "সলম" ক্রয়-বিক্রয়, তরমুজ, ডিম, আনার, বাদাম এবং পেস্তা বিক্রিতেও গারার আছে তবে অতি সামান্য। সুতরাং প্রত্যেক গারারই কিন্তু হারাম নয়। গারার যদি সামান্য হয় এবং তার থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় তবে এ গারার এর কারণে চুক্তি অশুদ্ধ হবে না। আর জমিতে উৎপন্ন ফলফলাদি এবং শস্যাদিতে যে গারার পাওয়া যায় তা হলো সামান্য বা "গারারে ইয়াসির" যার কারণে বিক্রয় হারাম হয় না এবং এ জাতীয় বিক্রয় নাবী ﷺ এর নিষিদ্ধ করা "গারার" এর অন্তর্ভুক্তও নয়।

পুকুরে বা হাউজে থাকাবস্থায় মাছ বিক্রিও গারারের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটি নারিকেল, বাদাম এবং আখরোটের মধ্যের জিনিসটির মতো। কেননা মাছের হাউজ হলো মাছকে বিপদাপদ থেকে সংরক্ষণে রাখার মাধ্যম এবং হাউজের আর্দ্রতা এবং ঘ্রাণ মাছকে বেঁচে থাকার জন্য সর্বাধিক উপযোগী মাধ্যম এবং ধোঁকা ও গারার থেকে বেঁচে থাকার জন্যও এটি একটি বড় মাধ্যম। ব্যবসায়ীদের মাঝে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন আছে। তারা দেখেই মাছের পরিমাণ এবং গুণগত মান বলে দিতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে গারার নেই বললেই চলে। কেননা গারার বলা হয়, কোনও জিনিস প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তি নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকাকে। যা এখানে অনুপস্থিত। হাউজে মৎস্য বিক্রি বৈধ হওয়া ইমাম শাফেঈর আসহাবদের দু'প্রকার মতামতের এটি একটি এবং এ মতটিই দালিলিকভাবে শক্তিশালী। যারা একে অবৈধ মনে করেছেন তারা হাউজে মাছ বিক্রিকে খেজুরে থাকাবস্থায় খেজুরের আঁটি বিক্রির মতো মনে করেছেন। অথচ এগুলোর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

আর পাত্রে থাকা অবস্থায় ঘি বিক্রি করা এর ক্ষেত্রে কিছুটা তাফসীল রয়েছে। কেননা পাত্র খোলার পর ঘি এর উপরিভাগ যদি গুণাগুণ এবং মানের দিক দিয়ে দেখতে ঠিক ঘির মতো মনে হয় তবে পাত্রে রেখেই সে ঘি বিক্রি করা জায়েয এবং এটি পণ্যের স্তূপ দেখে ক্রয় করার অনুরূপ। আর যদি ক্রেতা ঘি না দেখে এবং তার নিকট ঘি-এর গুণাগুণ বর্ণনা না করা হয় তাহলে এ বিক্রি জায়েয হবে না। কেননা এটি ধোঁকার শামিল।

আর স্তনে রেখেই দুধ বিক্রি করাকে ইমাম শাফেঈ, ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আহমাদের আসহাবগণ নাজায়েয বলেছেন। তবে বিশুদ্ধ মত হলো এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা আছে পশুর দুধ স্তনে থাকাবস্থায় শুধু দুধ বিক্রি করা নাজায়েয। তবে পশুর সঙ্গে সঙ্গে তার স্তনের দুধও যদি বিক্রি করা হয় তবে তা জায়েয। কারণ শুধু দুধ বিক্রি করলে হুবহু পণ্য হস্তান্তর অসম্ভব। কেননা কী পরিমাণ অংশে ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে তা অজানা। যদিও তা দেখতে পাত্রের দুধের মতো কিন্তু যখন দুধ দোহন করা হয় তখন দুধের

www.waytojannah.com

শূন্য জায়গা পুনরায় ভরে যায় তাই বিক্রিত পণ্য এবং যা বিক্রি করা হয়নি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় অসম্ভব। ইবনু মাজাহার হাদীস যদি সহীহ হয় যা ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জীবিত পশুর গায়ের পশম এবং স্তনে থাকাবস্থায় পশুর দুধ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।" তবে তার থেকে উপর্যুক্ত বিষয়টিই বুঝে আসে। তবে পশুর স্তনের দুধ যদি ছা, ছা করে পরিমাপ করে বিক্রি করা হয় বা নির্দিষ্ট দিনে পশুর স্তনের দুধ বিক্রি করা হয় তবে এ বিক্রি ফল খাবারের উপযোগী হবার পূর্বেই তা বিক্রি করার মতো নাজায়েয।

আর যদি কোনোরূপ বর্ণনা ছাড়াই স্তনের দুধ বিক্রি করা হয় এবং তার পরিমাণ নির্ণয় এবং গুণাগুণের জিম্মাদারী বিক্রেতা গ্রহণ করে এবং এই গরু বা ছাগলের দুধ বলে নির্দিষ্ট করে দেয় তবে আমাদের শাইখ বলেছেন, তখন এ বিক্রি বৈধ হবে এবং এর প্রমাণ হলো মুসনাদে আহমাদের হাদীস।

আর নির্দিষ্ট সময়ে দুধ দোহনের জন্য যদি কোনও গরু বা ছাগল ভাড়া দেয়া হয় তবে জমহুর এর মতে তা নাজায়েয। কিন্তু আমাদের শাইখ বৈধতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে তিনি কতিপয় আহলে এলেমের উক্তি উল্লেখ করেছেন এবং এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। দুধ দোহনের জন্য তিনি বলেন, কেউ যখন দুধ দোহনের জন্য গরু বা বকরী বা উট ভাড়া নেয় নির্দিষ্ট দিনের জন্য আর এগুলোর খাবার খাওয়ানের দায়িত্ব গ্রহণ করে মালিক বা ক্রেতাই পশুর ঘাস খাওয়ানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে তবে 'যি'র" এর মতো আলেমদের জাহেরী উক্তি অনুযায়ী এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে এবং এটি বিক্রয় এবং ভাড়া উভয়ের সঙ্গেই সাদৃশ্যতা রাখে। আর এ কারণেই ফেকাহবিদদের অনেকে একে বিক্রয়ের অধ্যায়ে আবার অনেকে লিজ এর অধ্যায় উল্লেখ করেছেন। দুধ যদি ক্রেতার (ভাড়াটিয়ার) ঘাস খাওয়ানের কারণে সৃষ্টি হয় তবে তা বৃক্ষ ভাড়া নেয়ার সাদৃশ্য। আর ঘাস খাওয়ানোর দায়িত্ব যদি পশুর মালিক তা বিক্রেতার উপর হয় ক্রেতা শুধু দুধ গ্রহণ কর তবে এটি শুধু বিক্রি মাত্র। আর এটি গারার এর আওতাভুক্ত নয়। কেননা গারারে পাওয়া না পাওয়া উভয়টির সম্ভাবনা থাকে। আর এ কারণে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এটি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত; আল্লাহ তা'আলা একে হারাম করেছেন তাতে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করার কারণে এবং তা জুলুমের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ তাআলা যাকে হারাম করেছেন। আর উল্লিখিত ক্রয়-বিক্রয় তখনই হারাম হবে যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্য থেকে একজনের মাল প্রাপ্তি সুনিশ্চিত এবং অপরের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি উভয়টিরই সম্ভাবনা আছে। আর এটি পলাতক দাস বিক্রির মতো নাজায়েয।

প্রশ্ন: আকদে ইজারা বা ইজারার চুক্তির সম্পর্ক শুধু উপকারিতা গ্রহণের সঙ্গে মূল বস্তুর সঙ্গে নয়। আর এ কারণেই তো খাওয়ার জন্য খাদ্যদ্রব্য ভাড়ায় দেয়া জায়েয নয়। এমনিভাবে পানি পানের বিষয়টিও অনুরূপ। আর "যি'র" এর ইজারা তথা ভাড়া দেয়ার সম্পর্ক হলো মানফাআত বা উপকারিতা লাভের সঙ্গে আর তা হলো শিশুকে প্রতিপালন করা এবং তাকে স্তন্য দান করা আর দুধ এর প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে শিশুর দেহে প্রবেশ করে এবং এটি ঠিক ঘর ভাড়া দেয়ার পর ঘরের কূপ থেকে উপকারিতা লাভের অনুরূপ। আর নিয়ম হলো, যেসব জিনিস প্রাসঙ্গিক হিসেবে অর্জিত হয় তাকে যে পরিমাণ ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হয় উসূলের ক্ষেত্রে সেরূপ হয় না?

উত্তর: এর একাধিক উত্তর রয়েছে:

১. ইজারা শুধু মানাফের (উপকারিতা গ্রহণের) ক্ষেত্রেই হয় এমন কথা ঠিক নয়। কেননা এটি কুরআন সুন্নাহ এবং ইজমা এর দ্বারা প্রমাণিত নয় বরং সাহাবাদের থেকে এর বিপরীত

www.waytojannah.com

বক্তব্য বর্ণিত আছে। যেমন ওমার থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি উসাইদ ইবনু হুযাইর নামক সাহাবীর বাগানকে তিন বছরের জন্য ভাড়া নিয়েছিলেন এবং তিনি বিনিময় গ্রহণ করে তার দ্বারা নিজের ঋণ পরিশোধ করেছিলেন।" এটি উমারের মাযহাব। এক্ষেত্রে সাহাবাদের কেউ তার বিরোধিতা করেছেন বলে জানা যায় না এবং এ মতটিকেই আবূল ওফা ইবনু আকীল (র) গ্রহণ করেছেন। আমাদের শাইখও এমতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

২. ওয়াকফ এবং আরিয়াত ইত্যাদির ক্ষেত্রে বৃক্ষের ফল মানাফে এবং ফাওয়ায়েদ তথা উপকার বা লাভের অনুরূপ হয়ে থাকে। সুতরাং জমি ওয়াকফের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে তার ফসল দ্বারা ওয়াকফকারী উপকৃত হতে পারে তেমনিভাবে ওয়াকফকারী বৃক্ষের ফল দ্বারা উপকৃত হবার উদ্দেশ্যেও বৃক্ষ ওয়াকফ করতে পারবে। এমনিভাবে ধারে বৃক্ষ প্রদানও জায়েয এবং এ জাতীয় উপকার বা ফাওয়ায়েদ অনুদানের ক্ষেত্রে জায়েয। তাছাড়া যৌথ চুক্তিতেও জায়েয। সুতরাং কেউ যখন তার গরু ছাগল বা উটনীকে কারো নিকট এসবের দুধ বা বাচ্চার বিনিময়ে প্রদান করল তবে ইমাম আহমাদের দুটি বর্ণনার বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ইজারা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. আইন বা বস্তু দু'প্রকারের:

ক. যে বস্তু নিঃশেষ হয়ে গেলে কোনও জিনিস তার স্থলাভিষিক্ত হয় না।

খ. যে বস্তু নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং এতদুভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা অতি আবশ্যক। আর আমরা যেহেতু জানি যে, এটি মানাফে এর সঙ্গেই বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ তাই তার সাথে মিলানোও সর্বোত্তম।

৪. স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কোরআনে "যি'র" এর ইজারা এর কথা বর্ণনা করেছেন এবং এর বিনিময়স্বরূপ যা গ্রহণ করা হয় তাকে "আজর" তথা বিনিময় এবং পারিশ্রমিক বলে উল্লেখ করেছেন সুতরাং ইরশাদ হয়েছে–

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ.

অর্থ: যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে।" (আত-তালাক: ৬)

আমাদের শাইখ (র) বলেছেন, ধারণাকারী মনে করেছে, এটি কিয়াস বিরোধী তাই সে একথা বলেছে যে, ইজারা শুধু মানাফের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। অথচ বিষয়টি এমন নয়। বরং ইজারা প্রত্যেক ঐ বস্তুর মধ্যে জায়েয যার মূল বাকি রেখে উপকৃত হওয়া যায় চাই তা আইন (বস্তু) হোক বা মানফাআত (উপকার)।

৫. চুক্তি বা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল হলো অঙ্গীকার পূর্ণ করা। তবে আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা মুসলমানরা তাদের শর্তের উপরেই থাকবে। তবে হ্যাঁ হারাম শর্ত হলে নয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেসব চুক্তি বা শর্তকে হারাম করেছেন তা-ই শুধু হারাম অন্যান্য শর্ত বা চুক্তি হারাম হবে না। আর উপর্যুক্ত ইজারা হারাম হওয়ার ব্যাপারে নিষেধকারীদের কোনও দলিল নেই। তাদের দলীল শুধু কেয়াস।

৬. যারা এ ধরনের ইজারাকে হারাম বলেন, তারা 'যির' এর ইজারাকে কুরআন এবং ইজমার দ্বারা প্রমাণিত পেয়েছেন। আর আমাদের (চুক্তির) মূল উদ্দেশ্য হলো দুধ এবং এটি এমন

www.waytojannah.com

একটি বস্তু (আইন) যাকে বৈধ করণার্থে তারা এমন একটি খোড়া অজুহাত খাড়া করেছেন যার অসারতা সম্পর্কে তারা সম্যক অবগত। তারা মনে করেছেন ইজারার চুক্তি সংঘটিত হয়েছে শিশুর প্রতিপালন এর উপর আর দুধ হলো তার প্রাসঙ্গিক বিষয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা জানেন, এমনকি সকল জ্ঞানীরাও এর সাক্ষী যে বিষয়টি এমন নয়। সুতরাং 'যির' এর ইজারাকে কিয়াস বিরোধী বলা সম্পূর্ণ অমূলক।

৭. নাবী ﷺ তাঁর উম্মাতকে দুধ পানের জন্য ছাগল বা বকরি দানে উৎসাহিত করেছেন এবং এর সাওয়াবও উল্লেখ করেছেন আর সবাই জানে যে এটি বিক্রয় বা হেবা নয়। কেননা মা'দুম (অস্তিত্বহীন) জিনিসের বিক্রি সহীহ নয়। এটি দুধ দ্বারা উপকৃত হবার জন্য বকরি ধারে প্রদানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে জিনিস ধারের ক্ষেত্রে জায়েয তা ইজারার ক্ষেত্রেও জায়েয।

৮. যা আল্লামা কিরমানী তার "মাসায়েল"-এ উল্লেখ করেছেন। তিনি তার সূত্রে হিশাম ইবনু উরওয়া থেকে এবং তিনি তার তিনি থেকে বর্ণনা করেন উসাইদ ইবনু হুযাইর (রা) ছয় হাজার দিরহাম ঋণ রেখে মারা যান উমার (রা) তার পাওনাদারকে ডেকে তাদের থেকে তার জমিন দু'বছরের জন্য ভাড়া নেন। এবং তার জমিনে খেজুর বৃক্ষ এবং অন্যান্য বৃক্ষও ছিল। সুতরাং এ হাদীস থেকে ফল ক্রয়ের উদ্দেশে বৃক্ষ ভাড়া তথা ইজারা দেয়ার বৈধতা পাওয়া যায়। যে বলবে এটা ইজমা বিরোধী সে তার অজ্ঞতার কারণেই এমনটি বলেছে।

৯. শস্য চাষের উদ্দেশ্য জমি ইজারা নেয়া হলে সেখানে মূল উদ্দেশ্য থাকে শস্য অন্য কিছু নয়। অন্য কিছুর উদ্দেশ্য যদি থাকেও তবুও তা প্রাসঙ্গিক মূল নয়।

১০. শস্য উৎপাদনের উদ্দেশে জমি লিজে (ইজারায়) দেওয়াতে দুধের জন্য পশু ইজারার তুলনায় অধিক গারার এবং ক্ষতি বিদ্যমান। কেননা শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেরূপ বিপদ-আপদ এবং সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা দুধের ক্ষতির চেয়ে অধিক। সুতরাং যখন জমির ইজারা বৈধ তাই দুধের জন্য পশুর ইজারাও আরো আগে বৈধ হওয়া উচিত।

والحمد لله رب العالمين

www.waytojannah.com